মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত যোগবাশিষ্ঠ নামক প্রসিদ্ধ অধ্যাত্মশাস্ত্র

বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণ।

"যদিহাস্তি তদন্যত্র যন্নেহাস্তি ন তৎ ক্বচিৎ।
ইমং সমস্তবিজ্ঞান-শাস্ত্রকোষং বিদুর্ব্বুধাঃ॥"

যাহা বহু অধ্যাত্মশাস্ত্রে আছে, সে সমস্তই ইহাতে আছে।
যাহা এতদ্‌গ্রন্থে নাই, তাহা কুত্রাপি নাই। এই গ্রন্থ
অধ্যাত্মবিজ্ঞান শাস্ত্রের কোষস্বরূপ।

পূর্ব্বার্দ্ধ।

বৈরাগ্য, মুমুক্ষুব্যবহার, উৎপত্তি ও স্থিতি প্রকরণ।

অধ্যাপক

শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক
অনুভাষিত।

শ্রীযুক্ত নন্দলাল পাল কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট্ ২১৪-সংখ্যক ভবনস্থ
বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণ-যন্ত্রে
শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র দ্বারা
মুদ্রিত।

শকাব্দ ১৮১৫

বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণ।

বৈরাগ্যপ্রকরণ।

প্রথম সর্গ।

সৃষ্টিকালে যাঁহা হইতে সমুদায় ভূত আবির্ভূত হয়, বর্ত্তমানে যাঁহাতে স্থিতি করে ও প্রলয়কালে যাঁহাতে এ সকল উপশম প্রাপ্ত অর্থাৎ বিলীন হয়, সেই সত্যস্বরূপ অদ্বয় ব্রহ্মের উদ্দেশে নমস্কার[১]। যে চিদেকরস ব্রহ্ম বস্তু হইতে জ্ঞাতা, জ্ঞান, জ্ঞেয়, দ্রষ্টা, দর্শন, দৃশ্য, কর্ত্তা, হেতু ও ক্রিয়া, এই সকল ব্যবহারিক তত্ত্ব প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, সেই সাক্ষাৎজ্ঞানস্বরূপ পরব্রহ্মের উদ্দেশে নমস্কার করি[২]।

যে পরিপূর্ণ নিরতিশয়ানন্দমহোদধি হইতে আনন্দকণা আকাশে ও পৃথিবীতে অর্থাৎ ব্রহ্মলোকান্ত স্বর্গ লোকে ও মনুষ্যাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত জীবলোকে উচ্চাবচরূপে প্রকাশ পাইতেছে ও যাঁহার আনন্দকণা জীবের জীবন, সে আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্মকে নমস্কার[৩]।

১ ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দরূপী। সেই জন্য তাঁহাকে সৎ, চিৎ, আনন্দ, এই শব্দত্রয় দ্বারা অভিহিত করা হয়। তদনুসারে প্রথম শ্লোকে সদ্রূপের, দ্বিতীয় শ্লোকে চিদ্রূপের ও তৃতীয় শ্লোকে আনন্দরূপের স্মরণ করা হইয়াছে। ফলকথা সৎ, চিৎ, আনন্দ, এই তিন শব্দ একই বস্তুর বোধক হইয়া থাকে। যে সৎ, সেই চিৎ, সেই আনন্দ। সৎ, চিৎ ও আনন্দ, এই তিনে প্রভেদ নাই। শব্দভেদ আছে সত্য, পরন্তু অর্থভেদ নাই।

২ ঈদৃশ চিদ্ঘন ব্রহ্মই প্রতিবিম্বভাবে অন্তঃকরণরূপ উপাধিতে তপ্তলৌহপ্রবিষ্ট বহ্নির ন্যায় অনুপ্রবিষ্ট হইয়া অন্তঃকরণের জড়তা অভিভব করত, তাঁহাকে চেতনপ্রায় করায় জ্ঞাতা, স্ফুলিঙ্গের ন্যায় সমুত্থিত অন্তঃকরণ বৃত্তি উজ্জ্বলিত করায় জ্ঞান, প্রতিবিম্বদ্বারা পদার্থের মনোবৃত্তির আকার ধারণ করায় জ্ঞেয়। তিনিই জ্ঞানেন্দ্রিয় গ্রহণ করিয়া দ্রষ্টা, জ্ঞানেন্দ্রিয় জনিত মনোবৃত্তি ব্যাপ্ত হইয়া দর্শন, মনোবৃত্তির ফলব্যাপ্তি বা বিষয়ব্যাপ্তি দ্বারা তাদ্রূপ্য লাভ করায় দৃশ্য, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও প্রাণাদি গ্রহণ করায় কর্ত্তা, কর্ত্তৃভোক্তৃভাবে ক্রিয়াপ্রবর্ত্তনের কারণ হওয়ায় হেতু, ক্রিয়ানুসারী হওয়ায় ক্রিয়া। তিনি এতৎপ্রকারে সর্ব্বাত্মক.

পাতনিকা।

সুতীক্ষ্ণ নামক জনৈক ব্রাহ্মণ সংশয়াবিষ্টচিত্তে মহর্ষি অগস্তির আশ্রমে গমন করিয়া শিষ্যোচিত বিনয়াদি সহকারে অভিবাদনাদি করতঃ মুনিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! আপনি, ধর্ম্মরহস্যবেত্তা ও সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ। আমার এক মহান্ সংশয় উপস্থিত হইয়াছে তাহা আপনি কৃপা করিয়া বলুন। অর্থাৎ উপদেশ প্রদান দ্বারা আমার সে সংশয় অপনোদন করুন[৪]। আমার সংশয় এই যে, কর্ম্ম মোক্ষের কারণ? কি জ্ঞান মোক্ষের কারণ? অথবা কর্ম্ম, জ্ঞান, উভয়ই মোক্ষের সাধন? এই পক্ষত্রয়ের মধ্যে কোনটী যথার্থ তাহা আমাকে নিশ্চয় করিয়া বলুন[৫।৬]।

অগস্তি কহিলেন, সুতীক্ষ্ণ! পক্ষিগণ যেমন উভয় পক্ষ দ্বারা আকাশ পথে বিচরণ করে, এক পক্ষ অবলম্বনে গগনমার্গে বিচরণ করিতে সমর্থ হয় না, তেমনি জীবগণও জ্ঞান, কর্ম্ম, উভয় অবলম্বন করিয়া পরম পদ মোক্ষ লাভ করিয়া থাকে[৭]। কেবল কর্ম্মে ও কেবল জ্ঞানে মোক্ষ হয় না। জ্ঞান ও কর্ম্ম * উভয়ের দ্বারা মোক্ষলাভ হয় বলিয়া সাধুগণ উভয়কেই মোক্ষের সাধন অর্থাৎ উপায় বলিয়া জানেন। এই বিষয়ে তোমার নিকট একটী ইতিহাস বলি, শ্রবণ কর[৮]।

পূর্ব্বকালে অগ্নিবেশ্য মুনির পুত্র বেদবেদাঙ্গপারগ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ কারুণ্য নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি গুরুগৃহে অবস্থান করতঃ বেদাধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া দীর্ঘকাল পরে স্বগৃহে প্রত্যাগত হইলেন[৯।১০]।

পূর্ব্বে কর্ম্মকাণ্ডের প্রতি তাঁহার সংশয় জন্মিয়াছিল, এক্ষণে তিনি গৃহে আসিয়া কর্ম্মত্যাগী হইয়া নিষ্কর্ম্মে কালযাপন করিতে লাগিলেন। এদিকে অগ্নিবেশ্য দেখিলেন, পুত্র সন্ধ্যাবন্দনাদি অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম কিছুই করে না, কর্ম্ম-বর্জ্জিত হইয়া কালযাপন করিতেছে[১১]। অনন্তর তিনি পুত্রকে তাহার হিতার্থে এইরূপ এইরূপ কথা বলিতে লাগিলেন। "পুত্র! এ কি! তুমি স্বকর্ম্মের পালন করিতেছ না কেন?[১২] তুমি কর্ম্মবিবর্জ্জিত হইয়া কি প্রকারে

---

* জ্ঞান ও কর্ম্ম পরস্পর বিরোধী। জ্ঞান শব্দে তত্ত্ব জ্ঞান. জ্ঞানকালে কর্ম্ম হয় না, কর্ম্মকালে জ্ঞান অভিভূত হয়। সুতরাং বুঝিতে হইবে, জ্ঞান কর্ম্মের সমুচ্চয় নহে, কিন্তু অঙ্গপ্রধানভাব। অর্থাৎ উপকার্য্যউপকারকভাব। আগে কর্ম্ম, পরে তৎপ্রভাবে জ্ঞান। মর্ম্ম কথা, এই যে, কর্ম্মের দ্বারা চিত্তমল নষ্ট হয়; তাদৃশচিত্তে তত্ত্ব জ্ঞান প্রাদুর্ভূত হয়।

সিদ্ধিলাভ করিবে তাহা আমায় বল। এবং তোমার এই কর্ম্মপরিত্যাগের কারণ কি তাহাও বল”[১৩]।

কারুণ্য বলিলেন, “মরণাবধি অগ্নিহোত্রাদি যাগ করিবেক, নিত্য সন্ধ্যাবন্দনাদি করিবেক” এই সকল বাক্য (শ্রুতি) ও তদ্‌বোধিত ধর্ম্মসকল প্রবৃত্তি ঘটিত। এতদনুরূপ স্মৃতিবাক্যও আছে[১৪]।

“ধনের দ্বারা, কর্ম্মের দ্বারা ও সন্তানোৎপত্তির দ্বারা মোক্ষ হয় না। পূর্ব্বকালে প্রধান প্রধান যতিগণ কেবল মাত্র পরিত্যাগের দ্বারা অর্থাৎ সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাস দ্বারা মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন” এ সকল বাক্য নিবৃত্তিঘটিত[১৫]।

হে পিতঃ! “যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্রাদি করিবেক”। “নিত্য সন্ধ্যা উপাসনা (বন্দনা) করিবেক” ইহাও শ্রুতি বাক্য এবং “কর্ম্মাদির দ্বারা মোক্ষ হয় না, তাহা কেবল ত্যাগ দ্বারাই হয়” ইহাও শ্রুতি বাক্য। দ্বিবিধ শ্রুতি থাকায় উক্ত উভয়ের কোন্ পথ অবলম্বনীয় তাহা বুঝিতে না পারায় সন্দিগ্ধ হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠানে বিরত হইয়াছি[১৬]।

অগস্তি কহিলেন, কারুণ্য পিতাকে এইরূপ বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। অনন্তর অগ্নিবেশ্য পুত্রকে মৌন দেখিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন[১৭]। পুত্র! আমি তোমাকে একটী মহতী কথা বলি, শ্রবণ কর। শুনিয়া তাহা হৃদয়ে ধারণ করিও, বিচার করিও, পরে যাহা ইচ্ছা তাহা করিও[১৮]। পূর্ব্বে, হিমালয়ের যে শৃঙ্গে কামসন্তপ্তা কিন্নরীসমূহ কিন্নরগণের সহিত পরম সুখে বিহার ও ময়ূর ময়ূরীগণ প্রমোদ সহকারে ক্রীড়া করিয়া থাকে, যে স্থানে সর্ব্বপাপনাশিনী গঙ্গা ও যমুনা প্রবাহিতা হইতেছেন, সেই পরম পবিত্র প্রদেশে সুরুচীনাম্নী এক অপ্সরা একদা উপবিষ্টা ছিলেন[১৯।২০]। সুরুচি যদৃচ্ছাক্রমে নেত্র পরিচালন করিতে করিতে দেখিলেন, ইন্দ্রদূত তাঁহার সম্মুখস্থ অন্তরীক্ষ পথে গমন করিতেছেন। মহাভাগ্যবতী সুরুচি ইন্দ্রদূতকে দেখিয়া কহিলেন, হে মহাভাগ! আপনি কোথা হইতে আগমন করিতেছেন এবং সম্প্রতি কোথাইবা গমন করিবেন তাহা আমায় কৃপা করিয়া বলুন[২১।২২]।

দেবদূত বলিলেন, সুভ্রু! তুমি উত্তম কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ। যে নিমিত্ত যে স্থানে গিয়াছিলাম তাহা তোমার নিকট বর্ণন করি, শ্রবণ কর। হে বরবর্ণিনি! ধর্ম্মশীল রাজর্ষি অরিষ্টনেমি বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক পুত্রের প্রতি রাজ্যভার সমর্পণ করতঃ তপোনুষ্ঠান বাসনায় বনে গমন করিয়াছেন। তিনি এক্ষণে সুরম্য গন্ধমাদন পর্ব্বতে দুশ্চর তপস্যায় নিমগ্ন আছেন[২৩।২৪]।

আমি সুরপতির আজ্ঞায় তাঁহার নিকট গমন করিয়াছিলাম; এক্ষণে তাঁহার সেই আদিষ্ট কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া সে স্থানের বৃত্তান্ত বিদিত করিবার জন্য পুনর্ব্বার সুরপতির সন্নিধানে গমন করিতেছি[২৫]। সুরুচি বলিলেন, প্রভো! রাজর্ষির সহিত আপনার কিরূপ কথোপকথন হইল তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি। আমি বিনয়সহকারে জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি বলুন; অবহেলা করিবেন না[২৬]। দেবদূত কহিলেন, ভদ্রে! তথাকার সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণন করি, শ্রবণ কর।

রাজর্ষি অরিষ্টনেমি সেই গন্ধমাদনশৃঙ্গস্থ মনোহর কাননে যার পর নাই কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত আছেন[২৭]। সুররাজ ইন্দ্র তাহা জ্ঞাত হইয়া আমাকে আজ্ঞা করিলেন, "দূত! তুমি শীঘ্র অপ্সর, সিদ্ধ, কিন্নর ও যক্ষগণ পরিশোভিত এবং বেণু, বীণা ও মৃদঙ্গাদি বিবিধ সুমধুর বাদ্যে নিনাদিত উৎকৃষ্ট বিমান লইয়া গন্ধমাদন পর্ব্বতের শাল, তাল, তমাল, হিন্তাল প্রভৃতি তরুবর নিকর পরিশোভিত পবিত্র শৃঙ্গে গমন কর এবং সযত্নে তদুপরি রাজর্ষি অরিষ্টনেমিকে আরোহণ করাইয়া আমার এই স্থানে আনয়ন কর। তিনি এই স্থানে আসিয়া তপঃফল স্বর্গ ভোগ করুন[২৮।২৯।৩০।৩১]।

হে সাধুশীলে! দেবরাজ ইন্দ্র কর্তৃক আমি কথিত প্রকারে অনুজ্ঞাত হইয়া সেই নিখিলভোগোপকরণসমন্বিত সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন দেববিমান গ্রহণ-পূর্ব্বক অচলরাজ গন্ধমাদনের শিখর-প্রদেশে গমন করিলাম[৩২]। অনন্তর রাজর্ষি অরিষ্টনেমির আশ্রমে গমন পূর্ব্বক সুরপতি আমাকে যেরূপ আদেশ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহাকে সমস্তই বিদিত করিলাম[৩৩]। হে শুভে! রাজর্ষি অরিষ্টনেমি আমার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া সন্দিগ্ধ মনে বলিলেন, হে দূত! আমি তোমার নিকট কিছু জানিতে ইচ্ছা করি। তুমিই আমার প্রশ্নের প্রত্যুত্তর দিতে সমর্থ[৩৪]। স্বর্গে কি কি গুণ ও কি কি দোষ আছে তাহা আমার নিকট বর্ণন কর, আমি তাহা বিদিত হইয়া পশ্চাৎ রুচি অনুসারে স্বর্গে যাওয়া না যাওয়া, অর্থাৎ স্বর্গবাস স্বীকার করিব কি না তাহা স্থির করিব[৩৫]।

অনন্তর আমি কহিলাম, পুণ্যের প্রাচুর্য্য থাকিলে স্বর্গে উৎকৃষ্ট ফলভোগ হয়। উৎকৃষ্ট পুণ্য থাকিলে উৎকৃষ্ট স্বর্গ লাভ করা যায়[৩৬]। এবং মধ্যম পুণ্যে মধ্যম স্বর্গই লব্ধ হইয়া থাকে, তাহার অন্যথা হয় না। পুণ্যের অপকৃষ্টতা থাকিলে তাহার স্বর্গও তাদৃশ হইয়া থাকে[৩৭।৩৮]।

মহাশয়! পুণ্যের তারতম্য অনুসারে স্বর্গ স্থানের ও তত্রত্য সুখের

তারতম্য (উৎকর্ষাপকর্ষ) ঘটনা হইয়া থাকে। অনুত্তম স্বর্গীরা উত্তম স্বর্গী দিগের উৎকৃষ্টতা অসহ্য বোধ করে ও তুল্যস্বর্গীরাও পরস্পর পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা, স্পর্দ্ধা ও বিদ্বেষাদি করে। যাহারা উত্তম স্বর্গী তাহারা আপন অপেক্ষা হীন স্বর্গীর হীনতা অর্থাৎ অল্প সুখ দর্শন করিয়া সন্তোষ লাভ করে। যাবৎ না পুণ্যক্ষয় হয় তাবৎ স্বর্গবাসীরা ঐরূপ উত্তম অধম মধ্যম সুখ অনুভব করতঃ কাল যাপন করিতে থাকে, অনন্তর ক্ষীণপুণ্য হইয়া পুনর্ব্বার এই মর্ত্ত্য লোকে আসিয়া জন্ম গ্রহণ করে। মহারাজ! স্বর্গে এই এইরূপ গুণ ও দোষ বিদ্যমান আছে[৩৯]।

হে ভদ্রে! রাজা অরিষ্টনেমি স্বর্গের ঐ গুণ দোষ শ্রবণ করিয়া বলিলেন, দেবদূত! আমি এবম্বিধ স্বর্গভোগ বাঞ্ছা করি না[৪০]। সর্প যেমন জীর্ণ ত্বক্ পরিত্যাগ করে, তাহার ন্যায় আমি আজ হইতে আরম্ভ করিয়া ঘোরতর তপোনুষ্ঠান দ্বারা এই নিতান্ত ঘৃণ্য অশুদ্ধ দেহ পরিত্যাগ করিব[৪১]।

হে দেবদূত! তুমি যে স্থান হইতে আগমন করিয়াছ, এই বিমান লইয়া সেই স্থানে গমন কর অথবা সুরপতির সন্নিধানে গমন কর; আমি তোমাকে নমস্কার করি[৪২]। দেবদূত বলিলেন, ভদ্রে! অনন্তর আমি দেবরাজ সমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে তিনি স্বর্গভোগবিতৃষ্ণ অরিষ্টনেমির বাক্যাবলি শ্রবণ করিয়া সাতিশয় বিস্মিত হইলেন[৪৩]।

অনন্তর দেবরাজ মধুর বাক্যে পুনর্ব্বার আমাকে বলিলেন, দূত! তুমি পুনর্ব্বার সেই ভোগবিমুখ রাজর্ষি অরিষ্টনেমির সমীপে গমন কর। তাঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া পরমজ্ঞানী মহর্ষি বাল্মীকির অত্যুত্তম আশ্রম পদে গমন করিবে এবং মহর্ষিকে আমার সাদর সম্ভাষণ জানাইয়া বলিবে, এই রাজর্ষি অতিশয় বৈরাগ্যসম্পন্ন[৪৪।৪৫]। হে মহামুনে! ইনি শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়, অতিবিনয়ী, বিবেকগ্রস্ত ও স্বর্গভোগে বিমুখ, সে জন্য দেবরাজের আদেশ—যাহাতে ইঁহার তত্ত্বজ্ঞান জন্মে তাহা করিতে হইবে। অদ্যই যথার্থ বিধানে ইঁহাকে প্রবুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হউন[৪৬]। আপনার তাদৃশ উপদেশে এই সংসারদুঃখসন্তপ্ত রাজর্ষি ক্রমে মোক্ষপদ লাভ করিতে সমর্থ হইবেন। হে সুভ্রু! সুরপতি আমাকে এই দ্বিতীয় আদেশ প্রদান পূর্ব্বক পুনর্ব্বার রাজর্ষি অরিষ্টনেমির সমীপে প্রেরণ করিলেন[৪৭]। অনন্তর আমি সুরপতি ইন্দ্রের আদেশে রাজর্ষি অরিষ্টনেমিকে সমভিব্যাহারে লইয়া মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রম পদে গমন করতঃ তাঁহার নিকট রাজর্ষির মোক্ষসাধনের বিষয় নিবেদন করিলাম[৪৮]।

মহর্ষি বাল্মীকি প্রীতিপূর্ব্বক রাজাকে প্রথমতঃ অনাময় প্রশ্ন, তৎপরে আগমন-বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন[৪৯]। তদুত্তরে রাজা কহিলেন, ভগবন্! আপনি ধর্ম্ম-তত্ত্বজ্ঞ বিশেষতঃ সর্ব্ববিৎশ্রেষ্ঠ। আপনার দর্শনেই আমি কৃতার্থ এবং তাহাই আমার পরম কুশল[৫০]। হে ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্ন! সম্প্রতি আমি জিজ্ঞাসু ও সংসারদুঃখে কাতর। বিঘ্ন না হয় এরূপ করিয়া আমাকে প্রতিবোধিত করুন। যে উপায়ে আমি সংসারবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারি সেই উপায় আমাকে উপদেশ করুন[৫১]।

বাল্মীকি বলিলেন, রাজন্! আমি তোমার নিকট অখণ্ডতত্ত্বপ্রতিপাদক রামায়ণ বলি, শ্রবণ কর। তুমি যত্নপূর্ব্বক শুনিবে, শুনিয়া হৃদয়ে ধারণ করিবে, অনন্তর তাহাতেই জীবন্মুক্তিপদ লাভ করিবে[৫২]। বক্তব্য রামায়ণ বশিষ্ঠ-রাম-সম্বাদাত্মক। * তাহা মুক্তির অদ্বিতীয় উপায় ও নিতান্ত শুভাবহ। হে রাজেন্দ্র! তুমি তাহা বুঝিতে সমর্থ, আমি ও বুঝাইতে পারক। সেই কারণে আমি তাহা তোমাকে বলিব, প্রণিহিত হইয়া শ্রবণ কর[৫৩]। অনন্তর রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, মহর্ষে! রাম কে? কিংস্বরূপ? তিনি কোন্ রাম? তিনি কি বদ্ধ? না মুক্তস্বভাব? আপনি অগ্রে আমাকে তাহাই বিদিত করুন অর্থাৎ নিশ্চয় করিয়া বলুন[৫৪]। বাল্মীকি বলিলেন, নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ ভগবান্ হরি অভি-শাপ পালন ছলে রাজবেশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও ভক্ত বাক্য সত্য করিবার নিমিত্ত সামান্য মানবের ন্যায় অল্পজ্ঞ হইয়াছিলেন[৫৫]।

রাজা বলিলেন, ভগবন্! অপরাধী ব্যক্তিরাই শাপগ্রস্ত হয় এবং অপরাধও অপূর্ণকাম ও অজ্ঞ ব্যক্তিতেই সম্ভবে। যিনি চিদানন্দরূপী ও চিদ্ঘনমূর্ত্তি পরমে-শ্বর, তাঁহার আবার অভিশাপ কি? অতএব, তাঁহার প্রতি অভিশাপ হওয়ার কারণ কি এবং তাঁহার অভিশপ্তা কে তাহা আমাকে বলুন[৫৬]। বাল্মীকি কহি-লেন, বৎস! ব্রহ্মার মানস পুত্র সনৎকুমার কামক্রোধাদিবিবর্জ্জিত ও পরম

* বশিষ্ঠ-রাম-সম্বাদাত্মক, এই কথায় সূচিত হইয়াছে যে, বশিষ্ঠ রামকে উপদেশ দিয়াছিলেন। বশিষ্ঠ গুরু, রাম তাঁহার শিষ্য। কথাটী রাজর্ষির মনে সন্দেহ উৎপাদন করিয়াছিল। সন্দেহ এই যে, অজ্ঞ জীবেরাই অজ্ঞতানিবন্ধন জ্ঞান লাভের আশায় শিষ্য হইয়া থাকে, কিন্তু রাম স্বয়ংব্রহ্মমনা তন তিনি কেন শিষ্য হইবেন? সুতরাং তাঁহার সন্দেহ—কোন্ রাম! তিনি কি রামনামধারী কোন এক জীব? কি ভগবদবতার প্রসিদ্ধ রাম? এইরূপ সন্দেহ হওয়াতেই রাজর্ষি মহর্ষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন রামের কথা বলিবেন তাহা অগ্রে আমাকে বলুন।

জ্ঞানী। একদা তিনি ব্রহ্মসদনে উপবিষ্ট আছেন এমন সময়ে প্রভু ত্রৈলোক্যাধিপতি বিষ্ণু বৈকুণ্ঠ হইতে তথায় আগমন করিলেন[৭৭]। কমলযোনি সমুদয় ব্রহ্মলোকনিবাসীর সহিত গাত্রোত্থান ও অভ্যর্থনাদির দ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন; কেবল সনৎকুমার আপনাকে নিষ্কাম মনে করিয়া তাঁহার পূজা করিলেন না। তদ্দর্শনে প্রভু বলিলেন, সনৎকুমার! তুমি অহঙ্কৃত, তোমার চেষ্টা গর্ব্বসূচক (আমার আদর না করা), সেই কারণে তুমি শরজন্মা (কার্ত্তিকেয়) নামে বিখ্যাত ও কামনাপরতন্ত্র (কামাসক্ত) হইবে[৭৮]।[৭৯]। তৎশ্রবণে সনৎকুমারও সাতিশয় দুঃখিত হইয়া বিষ্ণুর প্রতি এই বলিয়া প্রতিশাপ প্রদান করিলেন যে, আপনাকেও সর্ব্বজ্ঞত্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক অজ্ঞ জীবের ন্যায় কিঞ্চিৎ কাল অবস্থিতি করিতে হইবে[৮০]। পূর্ব্বে মহর্ষি ভৃগুও * বিষ্ণুকর্তৃক স্বীয় ভার্য্যা নিহতা দেখিয়া ক্রোধভরে তাঁহাকে এই বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন যে, অহে বিষ্ণু! তুমি যেমন আমাকে স্ত্রীবিয়োগ দুঃখে দুঃখিত করিলে তোমাকেও এতদ্রূপ ভার্য্যাবিয়োগ দুঃখ অনুভব করিতে হইবে[৮১]। পূর্ব্বে বিষ্ণু জলন্ধররূপ † ধারণ করিয়া তদীয় পতিপ্রাণা ভার্য্যা বৃন্দাকে বিমোহিতা ও তাহার পাতিব্রত্য ভঙ্গ করিয়াছিলেন, তৎকারণে তিনি বৃন্দাকর্তৃকও অভিশপ্ত হইয়াছিলেন। বৃন্দা এই বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন যে,

* এস্থলে পৌরাণিক সংবাদ এই যে, খ্যাতি নাম্নী ভৃগুপত্নী পূর্ব্বকল্পে বিষ্ণুশরীরে লীনা হইবার প্রার্থিনী ছিলেন। বিষ্ণু তাঁহার সেই প্রার্থনা পূরণ করায় ভৃগু মনে করিলেন, বিষ্ণু আমার ভার্য্যা বিনাশ করিলেন। তাহাতেই তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া বিষ্ণুর প্রতি উক্ত প্রকার অভিশাপ প্রয়োগ করিয়াছিলেন।

† ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে লিখিত আছে, গোলকস্থ সুদাম গোপাল রাধার শাপে দানবকুলে জলন্ধর নামে ও তুলসীনাম্নী এক গোপী ধর্ম্মধ্বজ রাজার পত্নীতে উৎপন্না হইয়াছিলেন। জলন্ধর ব্রহ্মার বরে সকলের অবধ্য হইয়াছিল। ব্রহ্মা কাহাকেও নিতান্ত অমর করেন না, মরণের একটা না একটা নিমিত্ত রাখিয়া দেন। তাই জলন্ধরকে বলিয়াছিলেন, তোমার পত্নীর সতীত্বনাশ হইলে তোমার মরণ হইবে। নচেৎ তুমি সকলের অবধ্য থাকিবে। বরদৃপ্ত জলন্ধর বলপূর্ব্বক স্বর্গরাজ্য গ্রহণ করিলে দেবগণ, ব্রহ্মা ও শিব তদ্বৃত্তান্ত জ্ঞাপনার্থ বৈকুণ্ঠে গমন করেন। বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণ শিবকে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে বলেন। জলন্ধর শিবের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে বিষ্ণু জলন্ধররূপে তদীয় গৃহে গমন করত তদীয় পত্নীর সতীত্ব ভঙ্গ করিলেন, এ দিকে জলন্ধরেরও মৃত্যু হইল। বৃন্দা জলন্ধরের মৃত্যুর পর সেই বলপার জ্ঞাত হইয়া ভগবান্ বিষ্ণুকে ঐ প্রকার অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন। কোন কোন পুস্তকে জলন্ধরের পরিবর্ত্তে শঙ্খচূড় নাম দৃষ্ট হয়। পদ্মপুরাণে জলন্ধরের উপাখ্যান অন্যরূপে লিখিত আছে সত্য; পরন্তু তাহাতেও তৎপত্নী বিষ্ণুকর্তৃক মোহিতা হওয়া বর্ণিত আছে। ঐ উভয় পুরাণের প্রস্তাব আলোচনা করিয়া দেখিলে প্রতীত হইবে, বিষ্ণু বৃন্দাকে মাত্র বিমোহিতা করিয়াছিলেন এবং তাহাতেই বৃন্দার পাতিব্রত্য ভঙ্গ হইয়াছিল। সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিষ্ণু পুণ্য পাপে অলিপ্ত; সুতরাং তাঁহার ঐ কার্য্য দোষাবহ নহে।

অহে বিষ্ণো! তুমি যেমন ছলনা করিয়া আমার পাতিব্রত্য ভঙ্গ ও আমাকে সন্তাপিত করিলে, আমার বাক্যে তোমাকেও স্ত্রীবিয়োগনিবন্ধন সন্তাপ ভোগ করিতে হইবে[৬২]। ভগবান্ যখন নৃসিংহরূপ ধারণ করিয়াছিলেন তখন গর্ভবতী দেবদত্তভার্য্যা তাঁহাকে দেখিয়া পয়োষ্ণীনদীতীরে ভয়ে প্রাণপরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তাহাতে তদীয় স্বামী দেবদত্ত ভার্য্যাবিয়োগে কাতর হইয়া ভগবান্‌কে এই বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন যে, তুমি যেমন আমাকে স্ত্রীবিয়োগে কাতর করিলে, এইরূপ তুমিও কিঞ্চিৎকাল আত্মবিস্মৃত ও স্ত্রীবিয়োগে কাতর হইবে[৬৩।৬৪]।

ভক্তবৎসল নারায়ণ এইরূপে ভৃগু, সনৎকুমার, বৃন্দা এবং দেবদত্ত কর্ত্তৃক অভিশাপগ্রস্ত হইয়া মানবজন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের শাপানুসারী সেই সেই কার্য্য স্বীকার করিয়াছিলেন[৬৫]। অভিশাপ-ছলের সমুদায় কারণ তোমাকে বলিলাম, এক্ষণে প্রস্তাবিত কথা বলি; মন দিয়া শুন[৬৬]। তিনি স্বীয় শক্তির দ্বারা শাপমোচনে সমর্থ হইলেও ভক্তবৎসলতানিবন্ধন তাঁহাদের মর্য্যাদারক্ষার্থ সেই সেই কার্য্য করিয়াছিলেন। ভৃগুর ও বৃন্দার শাপে তাঁহার স্ত্রীবিয়োগ ও দেবদত্ত শাপে তাঁহার গর্ভবতী সীতার বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল। হে মহারাজ! যে যে কারণে ভূতভাবন ভগবান্ অভিশাপগ্রস্ত হইয়াছিলেন সে সমস্তই তোমার নিকট কথিত হইল। এক্ষণে তুমি মোক্ষোপায় সাধন বিষয়ে যাহা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছ তাহার নিমিত্ত দ্বাত্রিংশৎ সহস্র শ্লোক পরিমিত বাশিষ্ঠ নামক মহারামায়ণ তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর।

প্রথম সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিতীয় সর্গ।

মোক্ষকথাপ্রারম্ভ।

যিনি স্বর্গে, মহীমণ্ডলে, অন্তরীক্ষে, আমার অন্তরে, তোমার অন্তরে, সকলের অন্তরে ও বাহিরে নিরন্তর বিরাজমান অর্থাৎ যাঁহার সত্তায় ও প্রকাশে এ সকল সত্তাবান্ ও প্রকাশিত সেই সর্ব্বাত্মা ও সর্ব্বাবভাসক ব্রহ্মকে নমস্কার[১]।

বাল্মীকি কহিলেন, "আমি সংসাররূপ কারাগারে বদ্ধ আছি, ইহা হইতে আমাকে মুক্ত হইতে হইবেই হইবে।" যাহার এইরূপ ঔৎকট্য জন্মিয়াছে এবং যাহারা অত্যন্ত অজ্ঞ নহে, অত্যন্ত জ্ঞানীও নহে, তাহারাই এতৎ শাস্ত্র-শ্রবণের অধিকারী[২]। যাহারা পূর্ব্বসপ্তকাণ্ড রামায়ণ শ্রবণ পূর্ব্বক তত্ত্বদ্দেশ্য বিচার ও যুক্তিঅনুষ্ঠানাদির দ্বারা চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া এতৎগ্রন্থোক্ত মোক্ষসাধনে চিত্তার্পণ করতঃ মননাদিতে রত হন তাঁহারাই পুনর্জ্জন্ম জয় করিয়া কৃতার্থ হন। অর্থাৎ মুক্ত হন[৩]। *

হে অরিন্দম! আমি বর্ত্তমানে বিলক্ষণ ষট্পঞ্চাশৎ সহস্র শ্লোক পরিমিত পূর্ব্ব ও উত্তর দুই খণ্ড রামায়ণের মধ্যে রাগদ্বেষাদি দোষের উচ্ছেদক উত্তম উপদেশবিশিষ্ট সুতরাং মহাবল বা মহাসামর্থ্যযুক্ত রামকথারূপ চতুর্ব্বিংশতি সহস্র শ্লোক পরিমিত রামায়ণ গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়া যেরূপ রত্নাকর রত্নার্থীকে রত্ন প্রদান করেন সেইরূপ আমিও আমার প্রিয়শিষ্য বিনীত শ্রীমান্ ভরদ্বাজকে প্রদান করিয়াছিলাম। ধীমান্ ভরদ্বাজ আমার নিকট সেই অপূর্ব্ব পূর্ব্বরামায়ণ

* মূলে যে "কথোপায়" শব্দ আছে, তাহার অর্থ—পূর্ব্ব সপ্তকাণ্ড রামায়ণ (বালকাণ্ড, অযোধ্যাকাণ্ড, ইত্যাদিক্রমে যে সাত কাণ্ড রামায়ণ প্রখ্যাত আছে, তাহা) এ অর্থ "যে গ্রন্থ-কথায় বাল্মীকি মুনি কর্তৃক ধর্ম্মতত্ত্ব, জ্ঞানতত্ত্ব, ধর্ম্মানুষ্ঠান ও ঈশ্বরতত্ত্ব, নির্ব্বাণ জ্ঞানের উপায়-রূপে গ্রথিত হইয়াছে তাহা কথোপায়" এই ব্যুৎপত্তির দ্বারা লব্ধ হয়। প্রথমে পূর্ব্ব সপ্তকাণ্ড রামায়ণ শ্রবণ ও তদর্থ বা তত্ত্বদ্দেশ্য বিচার করিতে হয়। তাহাতে শমদমাদিসিদ্ধি ও সগুণ পরমেশ্বর বিষয়ক আপাত-জ্ঞান লাভ করা যায়। তদনন্তর নির্গুণ তত্ত্বে অধিকারী হওয়া যায় তাদৃশ অধিকারীর প্রতি এই বেদান্তবেদ্য সনাতন পরব্রহ্মপ্রতিপাদক গ্রন্থের উপদেশ।

প্রাপ্ত হইয়া কোন এক সময়ে সুমেরুপর্ব্বতস্থ মনোহর কাননে ভগবান্ ব্রহ্মার নিকট তাহা কীর্ত্তন করেন। তৎশ্রবণে লোকপিতামহ ব্রহ্মা ভরদ্বাজকে বলেন, পুত্র! আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছি; তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। ভরদ্বাজ বলিলেন, হে ভূত-ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের ঈশ্বর! হে ষড়ৈশ্বর্য্যশালিন্! জনগণ যাহাতে জন্মমরণাদি দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইতে অর্থাৎ মুক্তি পাইতে পারে তাহাই আমাকে বলুন। তাহাতেই আমার রুচি, এবং তাহাই আমার বর অর্থাৎ প্রার্থনীয়[৮]। ব্রহ্মা বলিলেন, বৎস ভরদ্বাজ! তুমি এক্ষণে আশ্রমস্থ মহর্ষি বাল্মীকি সমীপে গমন কর এবং যত্ন বিনয়াদি সহকারে প্রার্থনা কর। তিনি যে অনিন্দিত রামায়ণ প্রস্তুত করিতেছেন তাহারই শ্রবণে জনগণ অনাদি অবিদ্যা মোহ উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। জনগণ যেমন মহাগুণশালী রামসেতুর * দ্বারা মহাপাপসাগর উত্তীর্ণ হইতে পারে সেইরূপ বাল্মীকিমহর্ষিকৃত উত্তর রামায়ণ শ্রবণেও দুস্তর মোহমহাসাগর অর্থাৎ এই সংসার সমুদ্র অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে[১০]।

বাল্মীকি কহিলেন, পরমেষ্ঠী ভরদ্বাজকে এইরূপ বলিয়া, পরে তিনি তাঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া আমার আশ্রমে আগমন করিলেন[১১]। আমি সর্ব্বভূতহিতৈষী দেবাদিদেব মহাসত্ত্ব পরমেষ্ঠীকে দর্শন করিবামাত্র সত্বর গাত্রোত্থান ও পাদ্যপ্রদানাদির দ্বারা তাঁহার সপর্য্যা করিলাম। অনন্তর সেই মহাসত্ত্ব পিতামহ আমাকে সর্ব্বজীবের হিতার্থে বলিতে লাগিলেন[১২]।

হে মুনিবর! পবিত্র রামচরিতবর্ণন রূপ উত্তর রামায়ণ প্রস্তুত করিতে যদিও তুমি পরিশ্রান্ত হইয়াছ তথাপি সমাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত ইহা পরিত্যাগ করিও না। যাবৎ না এই অনিন্দিত রামচরিতপূর্ণ গ্রন্থ সমাপ্ত হয় তাবৎ এতৎ প্রতি যত্নবান্ হও[১৩]। মহর্ষে! যেমন শীঘ্রগামী পোত দ্বারা দুর্লঙ্ঘ্য মহাসাগর অনায়াসে উত্তীর্ণ হওয়া যায় সেইরূপ লোক সকল এই উত্তর রামায়ণের দ্বারা সংসার সঙ্কট অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে[১৪]। সেই জন্যই আমার অনুরোধ—তুমি লোকহিতসাধনার্থ এই মহৎ শাস্ত্র রামায়ণ শীঘ্র প্রকাশ কর। আমি ইহা বলিবার নিমিত্তই তোমার নিকট আগমন করিয়াছি[১৫]।

* রামকৃত সেতু—যাহা সেতুবন্ধ রামেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ। শাস্ত্রে আছে, জীব রামসেতু দর্শনে সর্ব্বপাপমুক্ত হয়। যেহেতু রামসেতু সর্ব্বপাপবিমোচন, সেই হেতু তাহা মহাগুণশালী বলিয়া কীর্ত্তিত হয়।

হে রাজন্! যেরূপ সলিলরাশি হইতে উত্তাল তরঙ্গ উত্থিত হইয়া তৎক্ষণাৎ বিলীন হইয়া যায়, সেইরূপ, ভগবান্ কমলযোনি ঐ কথা বলিয়া সেই মুহূর্ত্তেই আমার এই পবিত্র আশ্রম হইতে অন্তর্হিত হইলেন[১৬]।

ব্রহ্মা আগমন করিলে আমি সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলাম, সুতরাং আমি তৎকালে তদীয় বাক্যের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে সমর্থ হই নাই। অনন্তর তিনি গমন করিলে, আমি চিত্তের স্থিরতা লাভ করিয়া ভরদ্বাজকে জিজ্ঞাসা করিলাম,[১৭] ভরদ্বাজ! ভগবান্ পিতামহ ব্রহ্মা আমাকে কি বলিতে-ছিলেন তাহা তুমি আমায় শীঘ্র বল। আমি তাঁহার বাক্যের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারি নাই[১৮]। অনন্তর তৎশ্রবণে ভরদ্বাজ বাল্মীকি মুনিকে বলিলেন, মহর্ষে! ভগবান্ ব্রহ্মা বলিতেছিলেন "আপনি পূর্ব্বে যেরূপ চিত্তশুদ্ধিজনক রামায়ণ প্রস্তুত করিয়াছেন; এক্ষণে সেইরূপ সর্ব্বলোকহিতার্থ সংসার সমুদ্রের নৌকাস্বরূপ উত্তর রামায়ণ প্রস্তুত করুন"[১৯]। ভগবন্! এ বিষয়ে আমারও প্রার্থনা—মহামনা রাম, ভরত, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন, যশস্বিনী সীতা ও ধীসম্পন্ন রামানুযায়িগণ এই সংসারসঙ্কটে যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা বর্ণন করুন। তাঁহারা কি অজ্ঞ জীবের ন্যায় শোকসমাচ্ছন্ন হইয়া কালাতিপাত করিয়াছিলেন? কি মুক্তজীবের ন্যায় অসঙ্গ ছিলেন[২০।২১]? কিরূপে তাঁহারা দুঃখ পথ অতিক্রম করিয়াছিলেন তাহা বিশদরূপে বলুন, উপদেশ করুন, আমি ও সংসারস্থ অন্য মানব, আমরা সকলেই সেইরূপ করিব, করিয়া সংসার সঙ্কট হইতে ত্রাণ লাভ করিব[২২]।

মহারাজ! আমি মহর্ষি ভরদ্বাজ কর্তৃক সাদরে "বলুন" এইরূপ অভিহিত হইয়া ভগবান্ ব্রহ্মার আদেশানুসারে তাঁহাকে বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম[২৩]। বলিলাম, বৎস ভরদ্বাজ! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলে তাহা আমি তোমার নিকট সবিস্তর বর্ণন করি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। শ্রবণ করিলে তোমার সমুদয় মোহ দূরীভূত ও মনোবৃত্তি নির্ম্মল হইবে[২৪]। হে প্রাজ্ঞ ভরদ্বাজ! রাজীবলোচন রাম সকল বিষয়ে অনাসক্তচিত্ত থাকিয়া যেরূপে লোক যাত্রা নির্ব্বাহ করতঃ সুখী হইয়াছিলেন তুমিও সেইরূপে লোকব্যবহার সম্পন্ন কর, করিলে তুমিও সুখী হইতে পারিবে[২৫]। লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, কৌশল্যা, সুমিত্রা, সীতা, মহারাজ দশরথ[২৬] এবং রামসখা কৃতাস্ত্র ও অবিরোধ, পুরোহিত বশিষ্ঠ ও বামদেব, ইঁহারা সকলেই পরমজ্ঞানী ছিলেন। রামচন্দ্রের[২৭] ধৃষ্টি, জয়ন্ত, ভাস, সত্য অর্থাৎ সত্য বক্তা বিজয়, বিভীষণ, সুষেণ, হনুমান ও

সুগ্রীবামাত্য ইন্দ্রজিৎ, এই আট্ মন্ত্রী, ইঁহারাও মহামনা, জিতেন্দ্রিয় সমদর্শী, বিষয়াসক্তিশূন্য, প্রারব্ধক্ষয়প্রতীক্ষ ও জীবন্মুক্ত ছিলেন[২৮।২৯]। হে বৎস ভরদ্বাজ! ইঁহারা যেরূপে ও যে ভাবে শ্রুত্যুক্ত ও স্মৃত্যুক্ত হোম ও দান প্রভৃতি কর্ম্ম ও আদান প্রদান প্রভৃতি লৌকিক সদ্ব্যবহার ও ইষ্টচিন্তন প্রভৃতি বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেন তুমিও যদি সেইরূপ করিতে পার তাহা হইলে তুমিও অনায়াসে সংসারসঙ্কট মুক্ত হইতে পারিবে[৩০]। অধিক কি বলিব, উৎকৃষ্ট-জ্ঞানবলসম্পন্ন ব্যক্তি অপার সংসারসমুদ্রে পতিত থাকিলেও এই পরমযোগ লাভ করিয়া ইষ্টবিয়োগাদিজনিত শোক, দুঃখ, দৈন্য, সমুদয় সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ পান ও নিত্যতৃপ্ত হন[৩১]।

দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত।

তৃতীয় সর্গ।

অনন্তর ভরদ্বাজ জিজ্ঞাসা করিলেন; হে ব্রহ্মন্! আপনি রামকথা অবলম্বন করিয়া যথাক্রমে জীবন্মুক্তের স্থিতি অর্থাৎ লক্ষণ ও লৌকিক বৈদিক ব্যবহার বর্ণন করুন্ তাহা শ্রবণ করিয়া আমি পরম সুখ লাভ করিব[১]।

বাল্মীকি বলিলেন, সাধু ভরদ্বাজ! সাধু! অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। যদ্রূপ ভ্রম বশতঃ রূপহীন আকাশে নীল পীত প্রভৃতি বর্ণ প্রতিভাস প্রকাশ পায়, সেইরূপ, অজ্ঞান বশতঃ পরব্রহ্মে জগৎ ভ্রম প্রকাশ পাইতেছে। হে সাধো! সেই কারণে আমার মনে হয় যে, এই মিথ্যা জগৎ যাহাতে পুনর্ব্বার স্মৃতি-পদারূঢ় না হয় সেইরূপ ভাবে ইহার বিস্মরণ উৎপাদন করাই মঙ্গলাবহ বা শ্রেয়স্কর[২]।

ভরদ্বাজ! দৃশ্যমাত্রই ভ্রান্তিকল্পিত সুতরাং মিথ্যা। এই জ্ঞান যত দিন না দৃঢ়তররূপে উৎপন্ন হইবে তত দিন কোনও প্রকারে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইবে না। অতএব, যাহাতে অবিসম্বাদী আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পার তাহার উপায় অন্বেষণ কর[৩]। বৎস! তাদৃশ তত্ত্বজ্ঞান লাভের অসম্ভাবনা নাই, প্রত্যুত সম্ভাবনা আছে। কারণ, আমি তদুদ্দেশেই এই শাস্ত্র প্রস্তুত করিয়াছি। যদি তুমি ইহা ভক্তি শ্রদ্ধাদি সহকারে শ্রবণ কর, তাহা হইলে অবশ্যই তোমার তত্ত্বজ্ঞান উপস্থিত হইবে, অন্যথা কোনও কালে ভ্রমসংশোধন হইবে না, ভ্রম সংশোধন না হইলেও তত্ত্বজ্ঞান হইবে না[৪]। হে অনঘ! এই জগৎ বস্তুতঃ মিথ্যা অথচ ইহা ভ্রম বশতঃ আকাশবর্ণের ন্যায় আপাততঃ সত্যবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। কিন্তু যখন তুমি মোক্ষ শাস্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবে তখন নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবে যে, জগৎ কিছুই নহে[৫]। অধিকন্তু সম্পূর্ণ মিথ্যা। হে ভরদ্বাজ! দৃশ্য নাই। অর্থাৎ দৃশ্য মায়াবীর মায়ার ন্যায় মিথ্যা। যিনি ইহার দ্রষ্টা তিনিই সত্য। এই সত্য আত্মাই সর্ব্বত্র বিরাজমান ও প্রকাশমান। চৈতন্যস্বরূপ আত্মা ব্যতীত যে কিছু—সমস্তই জড় সুতরাং স্বাত্মকল্পিত ও মিথ্যা। এইরূপ জ্ঞান দ্বারা মন হইতে দৃশ্যবস্তুর মার্জ্জন অর্থাৎ অস্তিত্ব পরিহার করিতে পারিলেই পরমা নির্ব্বৃত্তি (নির্ব্বাণ নামক মোক্ষ) লাভ করিতে পারিবে[৬]। অন্যথা অজ্ঞানান্ধ হইয়া শত কল্প পর্য্যন্ত শাস্ত্ররূপ গর্ত্তে নিপতিত

ও কৃষ্টিত হইলেও স্বতঃসিদ্ধা পরমা নির্ব্বৃত্তি অর্থাৎ যাহা ব্রহ্মনির্ব্বাণ নামে খ্যাত তাহা লাভ করিতে পারিবে না। অধিক কি বলিব, তাহার সম্ভাবনা পর্য্যন্তও নাই বলিয়া অবধারণ করিবে৭। [বস্তুতঃই অনাত্মশাস্ত্রের আলোচনা ও উক্তরূপে দৃশ্য মার্জ্জন করা ব্যতীত ভ্রমপূর্ণ অনাত্মশাস্ত্রের ও অনাত্মশাস্ত্রোক্ত জ্ঞানের দ্বারা বিশোকাত্মক নির্ব্বাণ পদ লাভ করা যায় না।]

হে সজ্জন! নিঃশেষিতরূপে বাসনাপ্রবাহের পরিত্যাগ অর্থাৎ মূলোচ্ছেদ হইলে যে মোক্ষ হয় সেই মোক্ষই মুখ্য মোক্ষ * এবং সেই ক্রমই উত্তম ক্রম৮। অর্থাৎ প্রতিদিন পরাৎপর ভগবানের স্মরণ ও উপাসনাদির দ্বারা চিত্ত নির্ম্মল হইলে অল্পে অল্পে বাসনা জাল ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, বাসনা ক্ষয় হইলেই জন্মমরণাদি-রূপ সংসার ছিন্নমূল হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়। যেমন শীতাত্যয়ে হিমরাশি দ্রবীভূত হয়, সেইরূপ, বাসনাক্ষয়ে বাসনাপুঞ্জের অধিষ্ঠানভূত মনও বিগলিত হইয়া যায়৯। সুতরাং বাসনা হইতে উৎপন্ন ও বাসনার দ্বারা আবদ্ধ ও বর্দ্ধিত এই পাঞ্চভৌতিক স্থূলদেহ ও বাসনাশূন্য হওয়ায় অভাব প্রাপ্তের ন্যায় অবস্থান করে১০। বাসনা দুই প্রকার। শুদ্ধা ও মলিনা। মলিনা বাসনা জন্মের হেতু ও শুদ্ধা বাসনা জন্মবিনাশিনী১১। যাহা নিরবচ্ছিন্ন অজ্ঞানময় ও নিরতিশয় অহঙ্কারশালিনী, + পণ্ডিতেরা সেই পুনর্জ্জন্মবিধায়িনী বাসনাকে মলিনা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন১২। যাহা ভৃষ্টবীজের ন্যায় অঙ্কুরোৎ-পাদিকাশক্তিবিহীন হইয়া থাকে অর্থাৎ যাহা পুনর্জ্জন্মের উৎপাদক কারণ না হইয়া কেবল মাত্র প্রারব্ধবশতঃ দেহাদি অবলম্বন করিয়া অবস্থিতি করে অর্থাৎ দেহ ধারণ মাত্রে পর্য্যবসিত হয় তাহা শুদ্ধা বাসনা নামে বিখ্যাত১৩। এই পুনর্জ্জন্মনিবারণী শুদ্ধা বাসনা জীবন্মুক্তপুরুষ দিগের দেহে চক্রভ্রমের ন্যায় মৃত সংস্কার রূপে অবস্থান করে১৪। যাহারা শুদ্ধবাসনাবিশিষ্ট, তাঁহারাই জ্ঞাতজ্ঞেয় হন, হইয়া অনর্থভাজন পুনর্জ্জন্ম জয় করিয়া জীবন্মুক্ত পদ লাভ করে। সেইজন্য, তাঁহারাই প্রকৃতি বুদ্ধিমান্ বলিয়া গণ্য১৫। [ইহারা কৃত কর্ম্মের ফল উত্তর কালে ভোগ করেন না। এই জন্যেই সে সকল ভোগ-দ্বারা ক্ষয় করিয়া থাকেন।]

* বাসনা—মিথ্যা জ্ঞান বা কর্ম্মের সংস্কার। এই বাসনাই ভবিষ্যৎ জন্মাদির কারণ এবং তাহা অজ্ঞানরূপ ক্ষেত্রে অঙ্কুরিত হয়। পুনঃ পুনঃ বিষয়ানুসন্ধান তাহার পোষণ ও বর্দ্ধন করে এবং রাগ দ্বেষাদি তাহার সহায়তা করে। তাহার রোপণ কর্ত্তা অহঙ্কার।

+ সাযুজ্য, সারূপ্য, সালোক্য, এ সকল মুক্তি গৌণ। অর্থাৎ পরমমুক্তির কিঞ্চিৎ গুণ বা সাদৃশ্য আছে বলিয়া ঐ সকল মুক্তি নামে পরিভাষিত হইয়াছে।

বাল্মীকি বলিলেন, হে ভরদ্বাজ ! মহামতি রাম যে প্রকার সাধনার দ্বারা জীবন্মুক্তি পদ লাভ করিয়াছিলেন আমি জীবের জরামরণশান্তির নিমিত্ত তোমার নিকট সবিস্তরে তাহা কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পরম মঙ্গলদায়িনী রামকথা শ্রবণ করিলে তুমি সমস্ত তত্ত্ব অবগত হইতে পারিবে[১-৭]।

বৎস ভরদ্বাজ ! রাজীবলোচন রাম বিদ্যাগৃহ হইতে বিনির্গত হইয়া কিছু দিন বিবিধ লীলার দ্বারা অকুতোভয়ে স্বীয়গৃহে অবস্থিতি করতঃ অতিবাহিত করিলেন। কিয়ৎকাল অতীত হইলে যখন রাম পৃথিবী পরিপালনের ভার গ্রহণ করিলেন তখন প্রজা দিগের রোগ, শোক, ভয়, অকালমরণ প্রভৃতি সমস্তই তিরোহিত হইল[৮-১৯]। এই অবসরে তাঁহার চিত্ত তীর্থ ও পুণ্যাশ্রম দর্শন করিবার নিমিত্ত সাতিশয় উৎকণ্ঠিত হইল[২০]। অসীমগুণ পবিত্র তীর্থাদিদর্শনার্থ রাঘব চিন্তাপরায়ণ হইয়া আগ্রহ সহকারে হংস যেমন অভিনব পদ্ম আশ্রয় করে, সেইরূপ, পিতার নখকেশরবিরাজিত পাদপদ্মযুগল অবলম্বন করিলেন। অর্থাৎ তদীয় পাদপদ্ম গ্রহণ করিলেন[২১]। কহিলেন, পিতঃ ! তীর্থ, দেবালয়, বন, এবং আয়তনাদি দর্শন করিবার নিমিত্ত আমার মন সাতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়াছে[২২]। হে নাথ ! হে প্রার্থনাপূরক ! আপনি কৃপা করিয়া আমার এই প্রথম প্রার্থনা পূর্ণ করুন। পৃথিবীতে এমন কেহই নাই যে আপনার নিকট প্রার্থনা করিয়া অকৃতার্থ বা অপূর্ণকাম হইয়াছে[২৩]।

অনন্তর রাজা দশরথ রাম কর্তৃক কথিতপ্রকারে প্রার্থিত হইয়া ভগবান্ বশিষ্ঠ দেবের সহিত মন্ত্রণা করতঃ প্রথম প্রার্থী রামকে তীর্থদর্শনার্থ অনুমতি প্রদান করিলেন[২৪]। গুণশালী রাম পিতার অনুমতি গ্রহণ করতঃ প্রথমে মঙ্গলালঙ্কৃতবপু ও দ্বিজগণ কর্তৃক কৃতস্বস্ত্যয়ন হইলেন। পরে মাতৃগণচরণে অভিবাদন করিলেন। অনন্তর তাঁহাদিগের দ্বারা আলিঙ্গিত হইয়া লক্ষণ, শত্রুঘ্ন ও বশিষ্ঠ কর্তৃক নিয়োজিত শাস্ত্রজ্ঞ দ্বিজগণ ও কতিপয় শান্তস্বভাব রাজপুত্র সমভিব্যাহারে শুভনক্ষত্রসম্পন্ন দিবসে স্বগৃহ হইতে তীর্থ দর্শনার্থ বহির্গত হইলেন[২৬।২৭]। পুরবাসিগণ তাঁর মঙ্গলার্থ নানাবিধ বাদ্যবাদন করিতে লাগিল, নগরবাসিনী রমণীগণ চঞ্চল নয়নে মুহুর্মুহু তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত ও কমলকর দ্বারা তাঁহার শরীরে লাজ বর্ষণ করিতে লাগিল ; মহাপুরুষ রাম এই লাজবর্ষণে হিমকণাসংলগ্ন হিমাচলের ন্যায় পরম শোভা ধারণ করিলেন[২৮।২৯]। তীর্থযাত্রী রাম প্রথমতঃ দানাদির দ্বারা বিপ্রগণকে বিদায় করিলেন ; পরে প্রজাগণের আশীর্বাদ গ্রহণ পূর্বক চতুর্দিক্ অবলোকন করিতে করিতে

বনদর্শনোৎসুকচিত্তে গমন করিতে লাগিলেন[৩০]। সর্ব্বমানয়িতা রাম বর্ণিত প্রকারে স্বীয় রাজধানী কোশল হইতে আরম্ভ করিয়া স্নান, দান, ধ্যান, এবং তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে মন্দাকিনী, কালিন্দী, সরস্বতী, শতদ্রু, চন্দ্রভাগা, ইরাবতী, বেণী, কৃষ্ণবেণী, নির্ব্বিন্ধ্যা, সরযূ, চর্ম্মণ্বতী, বিতস্তা, বিপাশা প্রভৃতি নদী ও প্রয়াগ, নৈমিষ, ধর্ম্মারণ্য, গয়া, বারাণসী, শ্রীশৈল, কেদার, পুষ্কর, মানস-সরোবর, ক্রমপ্রাপ্তসরোবর (হ্রদবিশেষ), উত্তরমানস সরোবর, হয়গ্রীব-তীর্থ, বিন্ধ্যাচল, সাগর, জ্বালামুখী, মহাতীর্থ ইন্দ্রদ্যুম্নসরোবর, বহু হ্রদ, কার্ত্তিকেয় স্বামীর তীর্থ ও শালগ্রাম তীর্থ প্রভৃতি পুণ্যতীর্থ সকল এবং হরিহরের চতুঃষষ্টি স্থান; বিবিধ আশ্চর্য্য দেশ, পৃথিবীর চতুর্দ্দিকস্থ ও সমুদ্রের চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী তীর্থ-নিচয় ও বিন্ধ্য, হরকুঞ্জ এবং সুমেরু, কৈলাস, হিমালয়, মলয়, উদয়, অস্ত, সুবেল ও গন্ধমাদন, এই অষ্ট কুলাচল ও রাজর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, দেবগণের ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণের সমুদায় পুণ্যাশ্রম ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত ভূয়োভূয় দর্শন ও তত্তৎ স্থানের স্থানীয় অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন[৩১।৪১]। এইরূপে বৎসরাধিক কাল অতিবাহিত করিয়া ঐশ্বর্য্যশালী রাম সমস্ত জম্বুদ্বীপ পরিভ্রমণ পূর্ব্বক সমুদয় অবলোকন করিয়া দেবগণপূজিত শিবলোকগামী মহাদেবের ন্যায় অমর, কিন্নর ও মনুষ্যগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া স্বীয় গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন[৪২]।

তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত।
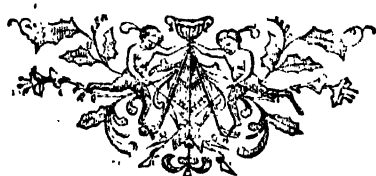
চতুর্থ সর্গ।
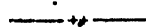
বাল্মীকি বলিলেন, ভরদ্বাজ! অযোধ্যাবাসীরা তীর্থপ্রত্যাগত রামচন্দ্রকে পুষ্পবর্ষণে আকীর্ণ করিলে তিনি দেবগণবেষ্টিত ইন্দ্রপুত্র জয়ন্তের ন্যায় অমরাবতী তুল্য অযোধ্যাপুরে প্রবেশ করিলেন[১]। পুরঃপ্রবেশ করিয়া প্রথমতঃ পিতৃচরণে প্রণাম করিলেন, পরে যথাযথ বশিষ্ঠ, ব্রাহ্মণগণ, এবং কুলবৃদ্ধ ভ্রাতৃগণ, সুহৃদ্গণ ও মাতৃগণকে প্রণাম করিলেন[২]। স্নেহাসক্ত সুহৃদ্গণ, মাতৃগণ, পিতা ও ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে বার বার চুম্বনালিঙ্গন ও আশীর্ব্বাদাদি প্রয়োগ করিলে তিনি অপার আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন[৩]। দশরথগৃহে রামদর্শনার্থ সমাগত জনগণ রামের মুখে নানা প্রিয় কথা শ্রবণ করতঃ আনন্দ বিশেষ অনুভব করিতে লাগিল ও উৎসবোৎফুল্লচিত্তে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে লাগিল[৪]। রামের আগমন জনিত ঐরূপ উৎসব আট দিন ব্যাপিয়া বিদ্যমান ছিল, এই আট দিন অযোধ্যানগরী সুখপ্রমত্ত জনগণের কলকোলাহলে পরিপূর্ণ ছিল[৫]। রাঘব এই কাল হইতে পরমসুখে নিজ ভবনে বাস করিতে লাগিলেন এবং ইতস্ততঃ যে সকল দেশ দেশাচার দেখিয়া আসিয়াছিলেন সে সকল সুহৃদ্গণের নিকট বর্ণন করিয়া সুখে কাল কর্ত্তন করিতে লাগিলেন[৬]। একদা রাম প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া যথাবিধি সন্ধ্যা বন্দনাদি নিত্য কার্য্য সমাপন পূর্ব্বক সভাস্থ ইন্দ্রতুল্য পিতার চরণ দর্শনার্থ গমন করিলেন। এই দিন তিনি সভায় সভ্যজনগণ কর্ত্তৃক বিশেষরূপে সম্মানিত ও বশিষ্ঠ বামদেবাদির সহিত বিবিধ জ্ঞানগর্ভ বাক্যালাপে পরিতুষ্ট হইয়া দিবসের চতুর্থভাগ পর্য্যন্ত অবস্থিত থাকিলেন[৭।৮]। অনন্তর পিতার নিকট মৃগয়া যাত্রার অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক পিতৃসকাশ পরিত্যাগ করিলেন। সেই দিবসেই তিনি মৃগয়াভিলাষে সেনা পরিবৃত হইয়া বরাহ মহিষ প্রভৃতি বিবিধ ভীষণ জন্তু সমাকীর্ণ নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক মৃগয়াপ্রবৃত্ত হইলেন[৯]। মৃগয়াবসানে গৃহে প্রত্যাগত হইয়া স্নানাদি আহ্নিক কার্য্য সমাধা করতঃ সুহৃদ্গণের ও ভ্রাতৃগণের সহিত মিলিত হইয়া পরমসুখে রজনী যাপন করিলেন[১০]। হে অনঘ ভরদ্বাজ! রাম এইরূপে

কখন মৃগয়া করিয়া কখন বা ভ্রাতৃগণের ও সুহৃদ্গণের সহিত আমোদে রত থাকিয়া সময়াতিপাত করিতে লাগিলেন এবং রাজোপযুক্ত মনোহর ব্যবহার দ্বারা স্বজনগণের চিত্তবৃত্তি দিন দিন সুশীতল করিতে লাগিলেন[১১।১২]।

চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চম সর্গ।

বাল্মীকি বলিলেন, ভরদ্বাজ! রামের ও রামের অনুগত লক্ষ্মণ প্রভৃতির বয়ঃকাল কিঞ্চিৎ ন্যূন ষোড়শ বর্ষ হইয়াছে, ভরত মাতামহগৃহে সুখে বাস করিতেছেন, এ দিকে রাজা দশরথও শাস্ত্রানুসারে রাজ্য পালন করিতেছেন[১।২]। মহাপ্রাজ্ঞ রাজা এক্ষণে কেবল রাজ্যপালন করিয়া পরিতুষ্ট নহেন। প্রত্যহই মন্ত্রিগণের সহিত পুত্রগণের বিবাহসম্বন্ধীয় মন্ত্রণায় প্রবৃত্ত আছেন[৩]। এ দিকে রাম তীর্থ যাত্রা হইতে প্রত্যাগত হইয়া নিজ গৃহে অবস্থান করতঃ দিন দিন কৃশ হইতে লাগিলেন। * যেমন শরৎকাল আগত হইলে নির্ম্মলজল সরোবর দিন দিন শুষ্ক হইতে থাকে, কুমার রামচন্দ্র সেইরূপ দিন দিন শোষ প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন[৪]। যদ্রূপ ভ্রমরপুংক্তিযুক্ত প্রফুল্ল শ্বেতারবিন্দ চরমে পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করে, কুমার রামচন্দ্রের আয়তলোচনান্বিত মুখপদ্ম সেইরূপ পাণ্ডুবর্ণ হইতে লাগিল[৫]। তিনি পদ্মাসনে আসীন হইয়া করতলে কপোল বিন্যাস করতঃ চিন্তারতচিত্তে প্রায়ই নিশ্চেষ্টের ন্যায় থাকেন; কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে

---

* শুদ্ধসত্বভাবে দীর্ঘকাল তীর্থ পর্য্যটন করিলে যজ্ঞ দান তপস্যা ও স্বাধ্যায়াদির ফল পাওয়া যায়। অর্থাৎ তীর্থ পর্য্যটনের দ্বারাও চিত্তশুদ্ধি ও বিষয়বৈরাগ্য হইয়া থাকে। শাস্ত্রান্তরে লিখিত আছে "এতে ভৌমাম্ময়া যজ্ঞাস্তীর্থরূপেণ নির্ম্মিতাঃ।" রাম বিশিষ্টাধিকারী, বিশেষতঃ শুদ্ধসত্বভাবে এক বৎসর তীর্থসেবা করিয়াছেন; তাই তৎপ্রভাবে আজ্ তাঁহার বিবেকবুদ্ধি ও বৈরাগ্য জন্মিয়াছে। বৈরাগ্য দুই প্রকারে উদিত হইয়া থাকে। কাহার কাহার ভুক্তবৈরাগ্য-ও কাহার কাহার অভুক্তবৈরাগ্য হয়। বিষয় ভোগ করিয়া পরে তাঁহার অসারতা নিশ্চয়ে তৎপরিত্যাগে যে যত্ন জন্মে, শাস্ত্রে তাহাকে ভুক্তবৈরাগ্য বলে। শাস্ত্রে বিষয়দোষের বর্ণনা শুনিয়া ও বিষয় ভোগের দুর্দ্দশা দেখিয়া শুনিয়া ও অনুভব করিয়া যে বিষয়বিমুখ হইবার চেষ্টা জন্মে, সে চেষ্টা অভুক্তবৈরাগ্য নামের নামী। মৃগয়া হইতে ফিরিয়া আসিয়াই রামের বৈষয়িক ব্যাপারের অসারতা প্রতীত হইয়াছিল; সেজন্য তাঁহার উপস্থিত বৈরাগ্যকে ভুক্তবৈরাগ্য বলিতেও পারা। তীর্থ পর্য্যটনে সত্বশুদ্ধি হইলে বিবেকবুদ্ধি জন্মে এবং ভোগ করিতে করিতে কদাচিৎ কাহার কাহার ভুক্তবৈরাগ্য উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা দেখাইবার নিমিত্ত এখানে রামের তীর্থ ভ্রমণ ও মৃগয়া বর্ণিত হইয়াছে।

উত্তর প্রদান করেন না।[৭] চিত্রলিখিতের ন্যায় নির্ব্বাক্ থাকেন। যতই দিন যাইতে লাগিল ততই তিনি অধিক চিন্তাগ্রস্ত, দুঃখিত, অত্যন্ত দুর্ম্মনা ও কৃশ হইতে লাগিলেন[৮]। পরিজনবর্গের নিরতিশয় অনুরোধে কেবল মাত্র সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্য কর্ম্ম ও সদাচার প্রতিপালন করেন, অন্য কিছু করেন না[৯]। গুণাকর রামচন্দ্রের তাদৃশী দশা অবলোকন করিয়া লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন সেইরূপ দশাপন্ন হইলেন; এবং মহীপাল দশরথ ও তৎপত্নীগণ পুত্রদিগকে সাতিশয় চিন্তাক্রান্ত ও কৃশাঙ্গ দেখিয়া চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইলেন[১০]।

একদা রাজা দশরথ শ্রীমান্ রামচন্দ্রকে ক্রোড়ে লইয়া স্নিগ্ধবাক্যে পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, বৎস! তোমার এরূপ গাঢ় চিন্তার কারণ কি? রাম পিতার তাদৃশ বাক্য শ্রবণে প্রথমতঃ কোনও কথা বলিলেন না[১১]। অনন্তর বলিলেন, "পিতঃ! আমার কিছু মাত্র দুঃখ হয় নাই।" পিতৃক্রোড়-গত রাজীবলোচন রাম মাত্র ঐ কথা বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন[১২]।

তদনন্তর রাজা দশরথ কার্য্যজ্ঞ ও বাগ্মী বশিষ্ঠ ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভো! রামচন্দ্র কি নিমিত্ত খেদান্বিত হইয়াছেন[১৩]?" মহর্ষি বশিষ্ঠ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া প্রত্যুত্তর করিলেন, রাজন্! দুঃখিত হইবেন না। রামচন্দ্রের খেদের বিশেষ কারণ আছে[১৪]। ধীর পুরুষেরা অল্প কারণে হর্ষ, বিষাদ বা কোপ প্রভৃতির বশ্য হন না। দেখুন, পৃথিব্যাদি মহাভূত সকল সৃষ্টিকাল ব্যতীত অন্য কালে স্বাভাবিক বিকার প্রাপ্ত হয় না[১৫]।

পঞ্চম সর্গ সমাপ্ত।

ষষ্ঠ সর্গ
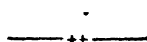
বাল্মীকি বলিলেন, ভরদ্বাজ! মুনিনাথ বশিষ্ঠ পরমখেদান্বিত ও সন্দেহ-নিমগ্ন রাজা দশরথকে ঐরূপ কহিলে তিনি মৌনাবলম্বন করিলেন[১]। রাজা দশরথ কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত মৌনী আছেন এবং রাজমহিষীগণ সাতিশয় কাতরা হইয়া রামচেষ্টাবিষয়ে সর্ব্বতোভাবে সাবধান আছেন, এমন সময়ে লোকখিখ্যাত মহাতেজা বিশ্বামিত্র মায়াবীর্য্যবলোন্মত্ত যজ্ঞবিঘ্নকারী রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক প্রপীড়িত ও নির্ব্বিঘ্নে যজ্ঞ সম্পাদনে অসমর্থ হওয়াতে বিঘ্নকারী নিশাচর গণের বিনাশসাধনপূর্ব্বক যজ্ঞসম্পাদন করা কর্ত্তব্য বিবেচনায় রাজদর্শনাভিলাষে অযোধ্যানগরীতে আগমন করিলেন[২।৩]। মহাতেজা বিশ্বামিত্র রাজদ্বারে উপনীত হইয়া দ্বারপাল দিগকে বলিলেন, দ্বারপালগণ! তোমরা শীঘ্র গিয়া রাজাকে বল, কুশিকবংশীয় গাধিরাজের পুত্র বিশ্বামিত্রনামা ঋষি রাজদর্শনাভিলাষে আগমন করিয়াছেন[৭]। দ্বারপালগণ মহর্ষির বাক্য শ্রবণ মাত্রেই শাপভয়ে ভীত হইয়া অনতিবিলম্বে রাজসমীপে গমন করিল ও রাজন্যমণ্ডল-মণ্ডিত সিংহাসনোবিষ্ট মহারাজ দশরথকে সংবাদ প্রদান করিল। সানুনয় বাক্যে কহিল, তরুণাদিত্যসন্নিভ মহাতেজস্বী অরুণবর্ণজটাজুটমণ্ডিত পরম-রূপবান্ বিশ্বামিত্রনামক এক মহাপুরুষ দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছেন। তদীয় তেজঃ দ্বারদেশ অবধি ঊর্দ্ধস্থ পতাকা পর্য্যন্ত ও হস্তী, অশ্ব, আয়ুধ প্রভৃতি সমস্ত বস্তু কাঞ্চনবর্ণের ন্যায় সমুজ্জ্বল করিয়াছে[১৩]। নৃপসত্তম দশরথ যষ্টি-হস্ত দ্বারপালের নিকট মহর্ষি বিশ্বামিত্রের আগমন বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ স্বর্ণ সিংহাসন ত্যাগ করিয়া যেখানে মহর্ষি দণ্ডায়মান ছিলেন মন্ত্রী ও সামন্তগণ সহ সত্বর পদসঞ্চারে তথায় উপনীত হইলেন। দেখিলেন, ক্ষত্র-তেজ ব্রহ্মতেজ উভয় তেজের আধার মুনিশার্দ্দূল বিশ্বামিত্র দ্বারদেশে ভূমিতলে দণ্ডায়মান আছেন। তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয়, যেন সূর্য্যদেব কোন অনির্দ্দেশ্য কারণে অবনীতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন[১৪।১৭]। বয়োধিক্য হেতু তাঁহার কেশ পক্ব, দেহ তপঃস্বভাবে রুক্ষ, তাঁহার স্কন্ধদেশ জটায় আবৃত। ইহাকে

খিবামাত্র সন্ধ্যাকালীন অরুণবর্ণ মেঘে সমুজ্জ্বল ও সুরঞ্জিত গিরিশিখর বলিয়া ম জন্মে[১৮]। মূর্ত্তি কমনীয়, তেজঃপ্রভাবে দুর্দ্দর্শ ও অধৃষ্য, প্রগল্‌ভদ্যোতী, প্রমত্ত, বিনয়সম্পন্ন, বলিষ্ঠ ও হৃষ্টপুষ্ট[১৯]। ইঁহাকে দেখিলে চক্ষু ও মন পরিতুষ্ট য়, ভয়ের সঞ্চারও হয়। মুখমণ্ডল প্রসন্নগম্ভীর, অব্যাকুল ও তেজঃপূর্ণ। সে তজের প্রভায় সম্মুখস্থ পদার্থ মাত্রেই রঞ্জিত হইতেছে। তাঁহার পরমায়ু অতি-র্ঘ, ব্রাহ্মণ্য স্থির, হস্তে চিরপরিগৃহীত কমণ্ডলু, চিত্ত স্নিগ্ধ ও সুপ্রসন্ন[২০।২১]। াহার হৃদয় করুণাপরিপূর্ণ; সেই হেতু তাঁহার সম্ভাষণাদিও সুমিষ্ট এবং াহার বীক্ষণও অমৃততুল্য। তিনি যে দিকে নেত্র পরিচালন করেন তদ্দিকস্থ াজাপুঞ্জ যেন অমৃত রসে সিক্ত হয়[২২]। তাঁহার স্কন্ধে উপযুক্ত যজ্ঞোপবীত, যুগল উন্নত ও দেহযষ্টি ধবললোমশোভী। দর্শকগণ ইঁহাকে দেখিবা মাত্র বস্ময়াবিষ্ট হন[২৩]।

ভূপাল দশরথ পূর্ব্বেই বিনয়াবনত হইয়াছিলেন, এক্ষণে দূর হইতে এবম্বিধ হর্ষিকে সন্দর্শন করিয়া বিবিধমণিবিরাজিত কিরীটপরিশোভিত মস্তক ভূতলে বনত করিয়া প্রণাম করিলেন[২৪] এবং মহর্ষিও সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী ও মহেন্দ্র-দৃশ মহারাজ দশরথকে সুমধুর সম্ভাষণ ও আশীর্ব্বাদ করিলেন[২৫]। পরে মাদর প্রাপ্ত বশিষ্ঠপ্রমুখ দ্বিজাতিগণ তাঁহাকে স্বাগত প্রশ্ন, তৎপরে তাঁহার থাবিধি সপর্য্যা করিলেন[২৬]। এই অবসরে রাজা দশরথ বলিলেন, "হে সাধো! যরূপ কমলিনীনায়ক স্বীয় প্রভা বিস্তার দ্বারা কমলবন সমুদ্ভাসিত করেন, সইরূপ, আমরা আজ আপনার অসম্ভাবনীয় আগমনে ও উজ্জ্বল মূর্ত্তি দর্শনে রম প্রফুল্ল ও সাতিশয় অনুগৃহীত হইয়াছি[২৭]। হে মুনে! অদ্য আমরা বদীয়দর্শনলাভে হ্রাস, বৃদ্ধি ও বিনাশ রহিত অক্ষয় পরমানন্দ প্রাপ্ত ইলাম[২৮]। হে মুনিবর! আজ যখন আমি আপনার আগমনের লক্ষ্যভূত ইয়াছি; তখন নিশ্চয়ই আমি ইহ জগতে ধন্য ও ধার্ম্মিক মধ্যে গণনীয়[২৯]।" এইরূপ প্রীতিসম্ভাষণ ও কথোপকথন সমাপ্ত হইলে রাজা দশরথ, অন্যান্য াজগণ ও মহর্ষিগণ সভাপ্রবেশপূর্ব্বক স্ব স্ব আসন সমীপে গমন করিলেন[৩০]। াজা দশরথ মহর্ষিকে সাতিশয় তপঃশোভাসম্পন্ন দেখিয়া ভয় ও হর্ষের সহিত র্ঘ্য প্রদান করিলেন[৩১]। মহর্ষিও রাজদত্ত অর্ঘ্য প্রতিগ্রহ করিয়া প্রদক্ষিণ-চারী রাজার সমাদর ও প্রশংসা করিলেন[৩২]। মহর্ষি মহারাজ দশরথ কর্ত্তৃক কথিত প্রকারে সংকৃত হইয়া সুপ্রসন্ন চিত্তে তাঁহাকে শারীরিক ও বৈষয়িক র্ব্বপ্রকার কুশল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন[৩৩]।

অনন্তর মুনিপুঙ্গব বিশ্বামিত্র মহর্ষি বশিষ্ঠের সহিত সমবেত হইয়া তাঁহার যথাযোগ্য সমাদর ও কুশল জিজ্ঞাসাদি করিলেন[৩৪]। তাঁহারা কথিত প্রকারে কিঞ্চিৎকাল মিলিত হইয়া সম্ভাষণাদি করিলেন, অনন্তর তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট হইলেন[৩৫]। ক্রমে সভাস্থ সকল ব্যক্তিই মহর্ষিকে পরম সমাদর পূর্ব্বক কুশল প্রশ্নাদি করিতে লাগিলেন[৩৬]। ধীমান্ বিশ্বামিত্র উপবিষ্ট ও সভ্যজন কর্ত্তৃক পূজিত হইলে মহারাজ দশরথ পুনর্ব্বার তাঁহাকে অর্ঘ্য, বস্ত্র, অলঙ্কার ও গো প্রদান করিলেন[৩৭]। এবং অর্চ্চনান্তে প্রীতমনে ও কৃতাঞ্জলিপুটে সমাগত মহর্ষিকে বলিতে লাগিলেন[৩৮]। মহর্ষে! মরণধর্ম্মা জীবের অমৃত লাভ, পরলোকগত বন্ধুর দর্শন লাভ, দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টির পরে বারিবর্ষণ ও অন্ধের দৃষ্টি লাভ যদ্রূপ, আমাদের সম্বন্ধে আপনার আগমন তদ্রূপ অথবা তদপেক্ষা অধিক আনন্দপ্রদ[৩৯]। হে তপোধন! পুত্রবিহীন ব্যক্তির ধর্ম্মপত্নীতে পুত্রোৎপত্তি ও দরিদ্র ব্যক্তির স্বপ্নে ধন লাভ যদ্রূপ, আপনার আগমন আমাদের নিকট তদ্রূপ[৪০]। মানবগণ প্রিয়সমাগমে ও প্রণষ্ট বস্তু লাভে যে প্রকার অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করে আপনার আগমনে আমরা তদপেক্ষা অধিক আনন্দ লাভ করিয়াছি[৪১]। স্থলচর মনুষ্যের খেচরত্ব লাভ হইলে যেরূপ হর্ষোদয় হয় এবং মৃত ব্যক্তি ফিরিয়া আসিলে তদীয় বান্ধবের যেরূপ আনন্দ হয়, আপনার আগমনে আমি সেইরূপ আনন্দিত হইয়াছি। এক্ষণে আমরা জানিতে চাহি, আপনার আগমন ত সুখে হইয়াছে[৪২]? ব্রহ্মলোকে বাস কাহার না প্রীতিপ্রদ হয়? হে মুনে! আমি সত্য বলিতেছি, আপনার আগমন আমাদের ব্রহ্মলোকবাস সদৃশ সুখপ্রদ[৪৩] হে বিপ্র! আপনার অভিলাষ কি ও আমাকে আপনার কোন কার্য্য করিতে হইবে তাহা আদেশ করুন। আপনি পরম ধার্ম্মিক, সুতরাং সৎপাত্র, বিশেষতঃ অতিথি[৪৪]।

হে ব্রহ্মন্! আপনি পূর্ব্বে রাজর্ষি শব্দে অভিহিত হইতেন। এক্ষণে তপোবলে ব্রহ্মর্ষিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। সে কারণেও আপনি আমার পরম পূজনীয়[৪৫]। যদ্রূপ গঙ্গাজলাভিষেকে সকল সন্তাপ দূরীভূত ও শরীর শীতল হয়, তদ্রূপ, ভবদীয় দর্শন আজ আমাদের সকল সন্তাপ দূরীকৃত ও শরীর মন সুশীতল করিয়াছে[৪৬]। মহর্ষে! আপনার ইচ্ছা, ভয়, ক্রোধ, রাগ অর্থাৎ বিষয়বাসনা নাই, এবং রোগাদি বিপদও নাই। অথচ আপনি আমার নিকট আগমন করিয়াছেন, ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়[৪৭]। হে বেদবিৎশ্রেষ্ঠ! আপনি

সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ; সুতরাং আপনার আগমনে আমি নিষ্পাপ হইয়াছি এবং আমার গৃহও পবিত্র হইয়াছে। অধিক কি বলিব, আমি আজ যেন অমৃতময় চন্দ্রমণ্ডলে নিমগ্ন হইয়াছি[৪৮]। হে মুনে! হে সাধো! আমার জ্ঞান হইতেছে, আপনার আগমন সাক্ষাৎ ব্রহ্মের আগমন। সুতরাং ব্রহ্ম ভাব প্রাপ্ত আপনার আগমনে আমি নিতান্ত অনুগৃহীত ও পবিত্র হইয়াছি[৪৯]। আজ আমি আপনার আগমনজনিত পুণ্যে সাতিশয় অনুরঞ্জিত হইলাম এবং বুঝিলাম, আমার জন্ম ও জীবন সার্থক। আপনি আগমন করিয়াছেন ভাবিয়া, আপনাকে দেখিয়া ও আপনার পূজাদি করিয়া আমি এত আনন্দিত হইয়াছি যে, সে আনন্দ আমার অন্তরে পর্য্যাপ্ত হইতেছে না। অধিকন্তু তাহা উচ্ছ্বলিত হইতেছে। অর্থাৎ জলনিধি চন্দ্রকিরণ দর্শনে যদ্রূপ উচ্ছ্বলিত হয় আমি তদ্রূপ উচ্ছ্বলিত হইতেছি[৫০]।[৫১]।

হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনি যে জন্য আসিয়াছেন, এবং আমাকে যে কার্য্য করিতে হইবে, আপনি মনে করুন, তাহা সিদ্ধ বা করা হইয়াছে। আপনি আমার চিরমাননীয়[৫২]। হে কুশিকনন্দন! কার্য্য সিদ্ধ হইবেক না, এরূপ বিবেচনা করিবেন না। কারণ, আপনাকে আমার অদেয় কিছুই নাই। অতএব, বিচার বা বিমর্শ (সন্দেহ) না করিয়া অনুমতি করুন, আপনার কোন্ কার্য্য সম্পাদন করিব। আমি ধর্ম্মতঃ কহিতেছি, আপনি আমার পরম দেব এবং আমিই আপনার সকল কার্য্য সম্পাদন করিব[৫৩]।[৫৪]।

তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন মহর্ষি বিশ্বামিত্র মহারাজ দশরথের এইরূপ শ্রুতিসুখাবহ বিনয়গর্ভ বচনপরম্পরা শ্রবণগোচর করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন[৫৫]।

ষষ্ঠ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তম সর্গ।
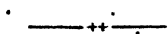
বাল্মীকি বলিলেন, ভরদ্বাজ! মহাতেজা বিশ্বামিত্র সেই রাজসিংহ দশরথের অনেকবিধ অদ্ভুত বাক্য শ্রবণে পুলকিত হইয়া বলিতে লাগিলেন[১]। হে রাজশার্দ্দূল! এই পৃথিবীতে তুমি মহাবংশপ্রসূত ও বশিষ্ঠবশবর্ত্তী; সুতরাং তোমার ঐরূপ বাক্যপ্রয়োগ সংগত ও উপযুক্ত[২]। রাজন্! যাহা আমার মনোগত তাহা বলিতেছি, শ্রবণ পূর্ব্বক তদনুযায়ী কার্য্যের অনুষ্ঠান ও ধর্ম্মপরিপালন কর[৩]। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আমি সিদ্ধি লাভের উদ্দেশে যজ্ঞারম্ভ করিলে রাত্রিঞ্চর গণ আসিয়া তাহার বিঘ্ন করে[৪]। যখন যখনই যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা দেবতা দিগকে পরিতুষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হই তখন তখনই নিশাচরেরা যজ্ঞক্ষেত্রে আসিয়া বিঘ্নানুষ্ঠান করে[৫]। আমি যতবার যজ্ঞের উদ্যোগ করিয়াছি, প্রত্যেক উদ্যোগেই সেই সেই পরাক্রান্ত রাক্ষসেরা আসিয়া আমার যজ্ঞভূমি রক্তমাংসাদি বর্ষণ দ্বারা দূষিত করিয়াছে[৬]। অনেকবার অনেক দ্রব্য বিনষ্ট হওয়ায় তৎপরে আর যজ্ঞানুষ্ঠানে উৎসাহ করি নাই, সেজন্য পরিশ্রমও করি নাই। সম্প্রতি আবার যজ্ঞারম্ভ করিয়া আপনার নিকট তৎপ্রতিকারার্থ আগমন করিয়াছি[৭]। রাজন্! ক্রোধ ত্যাগ দ্বারা অর্থাৎ শাপ প্রদান দ্বারা তাহার প্রতিকার করিতে ইচ্ছা হয় না। কারণ, ক্রোধত্যাগী হইয়াই যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে হয়। অথচ ক্রুদ্ধ না হইলে শাপ প্রদান করা ঘটে না[৮]। রাজন্! আমি আপনার প্রসাদে নির্ব্বিঘ্নে যজ্ঞ সমাপন পূর্ব্বক মহাফল লাভ করিব, এই প্রত্যাশায় যজ্ঞভূমি পরিত্যাগ করতঃ আপনার নিকট আগমন করিয়াছি[৯]। আমি নিতান্ত আর্ত্ত অর্থাৎ কাতর ও শরণপ্রার্থী, আমাকে রক্ষা কর। আমি জানি; অর্থী ব্যক্তির নিরাশ সাধুদিগের নিতান্ত গ্লানিকর[১০]। রাজন্! তোমার পুত্র রাম নিতান্ত শ্রীসম্পন্ন, মত্তসিংহের ন্যায় বিক্রান্ত, মহেন্দ্রসদৃশবীর্য্যশালী ও রাক্ষস বিনাশে দক্ষ[১১]। তোমার সেই বীর, কাকপক্ষধর, * সত্যপরাক্রম, জ্যেষ্ঠ পুত্র রামকে প্রদান কর[১২]। রাম মদীয় দিব্যতেজঃপ্রভাবে পরিরক্ষিত হইয়া

অনায়াসেই বিঘ্নকারী রাক্ষসগণের মস্তক ছেদনে সমর্থ হইবেন[১৩]। আমিও বহুপ্রভাবান্বিত বহুঅস্ত্র ও বহুবিদ্যা প্রদান করিয়া রামের পরম শ্রেয়ঃ সাধন করিব এবং তাহাতে তুমি ত্রিলোকমধ্যে পূজ্য হইবে[১৪]। যেরূপ ক্রুদ্ধকেশরীর সম্মুখে মৃগগণ অবস্থিতি করিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ, নিশাচরেরা রণস্থলে রামের সম্মুখে অবস্থিতি করিতে সমর্থ হইবে না[১৫]। রাম ব্যতীত অন্য কেহ তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে উৎসাহী হইবে না। ক্রুদ্ধ কেশরী ব্যতীত অন্য পশু কি প্রমত্ত কুঞ্জর নিগ্রহ করিতে পারে[১৬]? একে ত তাহারা বলগর্ব্বিত, পাপিষ্ঠ, যুদ্ধকালে কালকূট অপেক্ষাও তীব্র, ক্রুদ্ধকৃতান্তের ন্যায় নিতান্ত দারুণ, তাহাতে আবার তাহারা খরদূষণের ভৃত্য[১৭]। রাজন্! তাদৃশ হইলেও তাহারা রামের তীক্ষ্ণ বাণ সহ্য করিতে পারিবে না। যদ্রূপ ধূলিরাশি অবিশ্রান্তধারাবর্ষী মেঘের বর্ষণে দ্রবিত হয়, তদ্রূপ, নিশাচরেরাও রামবাণবর্ষণে দ্রবিত অর্থাৎ নিবারিত হইবে। হে নরনাথ! পুত্রস্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া মদীয় প্রার্থনার প্রতিরোধ করিও না। কারণ এইযে, এই জগতে মহাত্মাদিগের অদেয় কিছুই নাই[১৮।১৯]। মহারাজ! আমি জানিয়াছি এবং আপনিও জানুন, বিঘ্নকারী সমস্ত রাক্ষস রাম হস্তে নিহত হইয়াছে। আপনি ইহাও জানিবেন যে, মাদৃশ প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা কখন সন্দিগ্ধ বিষয়ে প্রবৃত্ত হন না[২০]। আমি জানি, মহাতেজা বশিষ্ঠ জানেন, ও অন্যান্য দূরদর্শী মহাত্মারাও জানেন যে, কমললোচন রাম মহাত্মা। তিনি সামান্য মানুষ নহেন[২১]। দেখুন, শিবি অলর্ক প্রভৃতি মহাত্মা নরপতিগণ পরোপকারার্থে স্বীয় দেহস্থ মাংস ও চক্ষুরাদি প্রদান করিয়াছিলেন। যদি তোমার ধর্ম্ম, মহত্ত্ব ও যশঃ লাভের বাসনা থাকে, তবে, আমার অভিপ্রেতসিদ্ধির নিমিত্ত আত্মজ রামচন্দ্রকে আমায় প্রদান কর[২২]। রামচন্দ্র যে যজ্ঞে আমার যজ্ঞ-শত্রু ও সর্ব্ববিঘ্নকারী রাক্ষস দিগকে নিধন করিবেন, আমার সেই যজ্ঞ দশ দিন সাধ্য[২৩]। অতএব, হে কাকুৎস্থ! তোমার বশিষ্ঠ প্রমুখ মন্ত্রী অনুমতি প্রদান করুন, অনন্তর তুমি রামকে আমার হস্তে অর্পণ কর[২৪]। রাঘব! তুমি কালজ্ঞ। সেই নিমিত্ত বলিতেছি, তোমার মঙ্গল হউক, তোমার বৃথা শোকে যেন আমার যজ্ঞ কাল বৃথা অতীত না হয়[২৫]। উপযুক্ত কালে অল্পমাত্র উপকার করিলেও তাহা মহোপকার বলিয়া গণ্য হয়, পরন্তু অকালে মহৎ কার্য্য করিলেও তাহা নিষ্ফল হয়[২৬]।

ধর্ম্মপরায়ণ মহাতেজা বিশ্বামিত্র মুনি এই সকল ধর্ম্মার্থ সম্মত বাক্য বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলে ... মহর্ষির সেই সেই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক

উপযুক্ত প্রত্যুত্তর প্রদানের নিমিত্ত কিঞ্চিৎকাল তুষ্ণীম্ভাব ধারণ করিলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, যুক্তিযুক্ত বাক্য ব্যতিরেকে ধীমান ব্যক্তির সন্তোষ ও স্বীয় মনের প্রাশস্ত্য উৎপন্ন হয় না২৭।২৮।

সপ্তম সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টম সর্গ

বাল্মীকি বলিলেন, ভরদ্বাজ! রাজসত্তম দশরথ বিশ্বামিত্রের উক্তপ্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া মুহূর্ত্তকাল নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন। অনন্তর অতি দীন বাক্যে কহিতে লাগিলেন[১]। মহর্ষে! রাজীবলোচন রাম ঊনষোড়শবর্ষ বয়স্ক। অদ্যাপি তাহার রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ করিবার ক্ষমতা উপস্থিত হয় নাই[২]। প্রভো! আমার পূর্ণ এক অক্ষৌহিণী সেনা আছে, আমি তাহার অধীশ্বর, তাহা লইয়া আমিই রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধ করিব[৩]। আমার সেই সকল সৈন্য সকলেই বিক্রান্ত ও মন্ত্রণাপটু। আমি রণাঙ্গনে ধনুর্ব্বাণ ধারণ পূর্ব্বক সেই সমস্ত সেনা পরিরক্ষণ করিয়া থাকি[৪]। যদ্রূপ সিংহ মত্তহস্তীর সহিত যুদ্ধ করে, সেইরূপ, আমিও সেই সমস্ত বীরসেনায় সমন্বিত হইয়া দেবগণ পরিবৃত মহেন্দ্রকেও পরাভূত করিতে পারি[৫]। রাম বালক, যুদ্ধে নিতান্ত অনভিজ্ঞ, সৈন্যবলাবল বুঝে না, অদ্যাপি সে অন্তঃপুরস্থ ক্রীড়াকল্পিত সংগ্রাম ব্যতীত প্রকৃত সংগ্রাম অবলোকন করে নাই[৬]। রাম অদ্যাপি পরমাস্ত্রবিৎ হয় নাই, যুদ্ধনিপুণও হয় নাই এবং রণক্ষেত্রে যে কিরূপে অসংখ্য বীরের সহিত যুগপৎ অস্ত্রযুদ্ধ করিতে হয় তাহাও সে জ্ঞাত নহে[৭]। অদ্যাপি পুষ্পাদিপরিশোভিত নগরোপবনে, উদ্যানকুঞ্জে ও বিবিধ কুসুমশোভিত চত্বর ভূমিতে রাজকুমারগণের সহিত পর্য্যটন ও ক্রীড়া করে[৮।৯]। হে ব্রহ্মন্! সম্প্রতি আবার আমার ভাগ্যবিপর্য্যয় বশতঃ রাম হিমকণাসিক্ত পদ্মের ন্যায় দিন দিন পাণ্ডুবর্ণ ও কৃশ হইতেছে[১০]। রাম যথাযোগ্য অন্ন ভোজন করিতে অক্ষম হইয়াছে ও ভ্রমণে বিরত আছে। জানি না, সে কি এক অন্তঃস্থ খেদে পরিতপ্ত হইয়া সর্ব্বদাই চিন্তারত ও মৌনী হইয়া থাকে[১১]। হে মুনিনাথ! আমি ভৃত্য, দারা ও পরিজন বর্গের সহিত রামের নিমিত্ত সাতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়াছি ও অনবরত চিন্তায় শরমেঘের ন্যায় অন্তঃসারশূন্য হইয়াছি। মহাত্মন্! রাম একে বালক, তাহাতে আবার তাদৃশী পীড়া। এ অবস্থায় কিরূপে আমি তাহাকে সমরবিশারদ কূটযোদ্ধা নিশাচরগণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য ভবদীয় হস্তে সমর্পণ করিতে পারি[১২]।[১৩]? হে সাধো! হে বুদ্ধিমন্! বালাঙ্গনার অঙ্গসঙ্গ, সুধারস সেবন

ও রাজ্যের আধিপত্য প্রভৃতি যত প্রকার সুখ আছে, সর্ব্বাপেক্ষা আমি পুত্র-স্নেহজনিত সুখকে সমধিক গুরুতর জ্ঞান করিয়া থাকি[১৪]। ধার্ম্মিক লোকেরাও পুত্রস্নেহে আবৃত হইয়া বহুপরিশ্রমসাধ্য দীর্ঘকালব্যাপী ক্লেশকর দুরন্ত তপস্যাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন[১৫]। হে মহামুনে! জীব দিগের স্বভাব বা ধর্ম্ম এই যে, তাহারা ধন, দারা ও প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পারে, তথাপি পুত্র পরিত্যাগ করিতে পারে না[১৬]। রাক্ষসেরা নিতান্ত ক্রুর, ক্রুর-কর্ম্মকারী ও কূটযুদ্ধবিশারদ। অনভিজ্ঞ ও শিশু রাম তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করুক, এ উক্তিও আমার অসহনীয়। অর্থাৎ উহা মনে হলেও ক্লেশ জন্মে[১৭]। মুনিরাজ! আমি রামবিরহে এক মুহূর্ত্তও জীবনধারণ করিতে ক্ষমবান্ নহি; সেজন্যও বলিতেছি, আপনি রামকে লইয়া যাইবেন না[১৮]। আমি পুত্রকামনায় পুত্রেষ্টি যাগ ও অশ্বমেধ প্রভৃতি কষ্টসাধ্য বহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া নব-সহস্রবর্ষ অতিক্রম করিয়া চারিটী সন্তান লাভ করিয়াছি[১৯]। যেরূপ শরীরের মধ্যে প্রাণ শ্রেষ্ঠ; সেইরূপ, আমার চারিটী সন্তানের মধ্যে কমললোচন রাম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। রাম ব্যতিরেকে অন্য তিনটীও জীবনধারণে সমর্থ হইবে না[২০]। এ অবস্থায় যদি আপনি রামকে রাক্ষস হস্তে সমর্পণ করেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই জানিবেন, আমি পুত্রহীন ও গতাসু হইয়াছি[২১]। চারিটী পুত্রের মধ্যে রাম সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, ধর্ম্মপরায়ণ এবং সকল গুণের আধার। সেই কারণে রামের প্রতি আমার ঐকান্তিকী প্রীতি। সেজন্য আমার অনুরোধ—আপনি রামকে লইয়া যাইবেন না[২২]। মুনিবর! যদি নিশাচরবধ সাধন করাই আপনার অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি, এই চতুরঙ্গ বল ও তৎসমন্বিত আমাকে লইয়া যাউন[২৩]। আপনি বলুন, যে সকল রাক্ষসেরা আপনার যজ্ঞে বিঘ্নোৎপাদন করে তাহারা কিরূপ বলবীর্যশালী ও কাহার পুত্র। তাহাদিগের নাম কি ও তাহাদের আকৃতিই বা কিরূপ[২৪]? আমি, রাম, অথবা আমার অন্যান্য বালক, সেই সকল কূটযোধী নিশাচরদিগের প্রতিবিধান করিতে সমর্থ কি না তাহাও বলুন[২৫]। সেই সকল বলদৃপ্ত নিশাচরের যুদ্ধে কিপ্রকারে অবস্থিতি করিতে হয় তাহাও উপদেশ করুন[২৬]। শুনিয়াছি, বিশ্রবা মুনির পুত্র যক্ষরাজ কুবেরের ভ্রাতা মহাবলপরাক্রান্ত রাবণ নামে এক রাক্ষস আছে[২৭]। যদি সেই দুরাত্মা আপনার যজ্ঞের বিঘ্নকারী হইয়া থাকে, তাহা হইলে, তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে আমরা কেহই সমর্থ নহি[২৮]। হে ব্রহ্মন্! কালবিশেষে প্রভূতবলশালী ও সমৃদ্ধিক ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট ভিন্ন ভিন্ন জীব জন্মগ্রহণ করে, আবার কালক্রমে

তজ্জাতীয় জীব দিগের বলবীর্য্যাদি হ্রাস হইয়া থাকে[২৯]। এখন যে কাল, এ কালে আমরা রাবণাদি শত্রুর সম্মুখে (যুদ্ধার্থ) দণ্ডায়মান হইতে ক্ষমবান্ নহি। ইহা বিধাতারই নির্ব্বন্ধ; সন্দেহ নাই[৩০]। হে ধর্ম্মজ্ঞ! আমি নিতান্ত মন্দভাগ্য ও আপনি আমার পরম দেবতা। সেইজন্য বলি, অনুগ্রহ করিয়া আমার এবং আমার পুত্রের প্রতি প্রসন্ন হউন[৩১]। হে তপোধন! অল্পবীর্য্য মানবের কথা দূরে থাকুক; দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ও পন্নগেরাও রাবণের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ নহে[৩২]। রাক্ষসরাজ রাবণ রণস্থলে ভূরিবীর্য্য বীরেরও তেজ হরণ করিয়া থাকে। তাহার সহিত যুদ্ধ করা কেবল বালকের নহে; আমাদের পক্ষেও অসমঞ্জস[৩৩]। যে কালে মান্ধাতা প্রভৃতি রাজগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এ সে কাল নহে। এ কালে সজ্জনেরাও হীনবল। এই কালে এই রঘুসন্তানও বার্দ্ধক্যজীর্ণ ও দুর্ব্বল হইয়াছে[৩৪]। হে ব্রহ্মন্! যদি মধু-দৈত্যের পুত্র লবণ নামক রাক্ষস আপনার যজ্ঞের বিঘ্নকারী হইয়া থাকে, তাহা হইলেও আমি রামকে তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে পাঠাইব না[৩৫]। বলুন, সুন্দোপসুন্দের পুত্র মারীচ এবং সুবাহু কি আপনার যজ্ঞের বিঘ্নকারী হইয়াছে? যদি তাহারা আপনার যজ্ঞনাশক হইয়া থাকে, তাহা হইলেও আমি আপনাকে পুত্র দিব না। ব্রহ্মন্! যদি আপনি বলপূর্ব্বক লইয়া যান, তাহা হইলে জানিবেন, আমি নিশ্চয়ই হত হইয়াছি। অর্থাৎ প্রাণ পরিত্যাগ ব্যতীত সে পক্ষে আমার উপায়ান্তর নাই[৩৬,৩৭]।

রঘুদ্বহ মহারাজ দশরথ মৃদুবিনয়ে এই সকল কথা বলিয়া অনন্তর মহর্ষির অভিপ্রেতসিদ্ধিবিষয়ে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কিয়ৎক্ষণ অপার চিন্তাসাগরে নিমগ্ন থাকিলেন[৩৮]।

অষ্টম সর্গ সমাপ্ত।

নবম সর্গ।

বাল্মীকি কহিলেন, ভরদ্বাজ! মহীপতি দশরথ সবিনয়ে সাশ্রুনয়নে বিশ্বামিত্র ঋষিকে ঐরূপ কহিলে তাঁহার ক্রোধোদয় হইল। তিনি কোপব্যঞ্জক স্বরে রাজাকে বলিতে লাগিলেন[১]। রাজন্! তুমি আমার প্রার্থনা পূরণ করিবে, কার্য্যসাধন করিবে, এইরূপ অঙ্গীকার করিয়া এক্ষণে তাহার অন্যথা করিতেছ। তুমি সিংহ হইয়াও শৃগাল হইবার বাঞ্ছা করিতেছ[২]। অহে মহীপাল! এরূপ করা রঘুবংশীয় দিগের নিতান্ত অনুপযুক্ত। তুমি যে কার্য্য করিতে উদ্যত, এ কার্য্য রঘুকুলের বিপরীত অর্থাৎ রঘুবংশীয় দিগের স্বভাববহির্ভূত। আমি জানিতাম, শীতাংশু শীতরশ্মি ব্যতীত কখন উষ্ণরশ্মি উৎপাদন করেন না[৩]। মহারাজ! যদি তুমি প্রতিজ্ঞাপালনে অসমর্থ হও তাহা হইলে আমি যেস্থান হইতে আসিয়াছি পুনরায় সেই স্থানে গমন করি। তুমি হতপ্রতিজ্ঞ হইয়া বন্ধুবান্ধবের সহিত সুখে বাস কর[৪]।

বাল্মীকি বলিলেন, মহানুভাব বিশ্বামিত্র কোপাসক্ত হইলে বসুমতী কাঁপিতে লাগিলেন এবং ভয়ে দেবগণও কম্পিত হইলেন[৫]। অনন্তর সুব্রতপরায়ণ ধীর ও বুদ্ধিমান্ বশিষ্ঠ মহামুনি বিশ্বামিত্রের ক্রোধাবির্ভাব হইয়াছে জানিয়া রাজা দশরথকে বলিতে লাগিলেন[৬]। রাজন্! আপনি ইক্ষ্বাকুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং মূর্ত্তিমান্ দ্বিতীয় ধর্ম্মের সদৃশ। আপনার লোকপ্রসিদ্ধ সমস্ত সদ্গুণ আছে। ধীরতা, সত্যবাদিতা, যশস্বিতা, সমস্তই আপনাতে বিদ্যমান। আপনি স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, এই তিন লোকে ধর্ম্মে ও যশে বিখ্যাত, বিশেষ বিখ্যাত। বিশেষতঃ আপনি ধৃতিমান্ ও ব্রতপরায়ণ[৭]। সুতরাং আপনি ধর্ম্মপরিত্যাগের যোগ্যপাত্র নহেন[৮]। প্রতিজ্ঞা পালন করা ক্ষত্রিয়ের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, তাহা প্রতিপালন করুন, ত্যাগ করিবেন না। ত্রিভুবনেশ্বর মুনির আদেশ প্রতিপালন করুন[৯]। মহারাজ! "আপনার আদেশ প্রতিপালন করিব" এইরূপ অঙ্গীকার করিয়া এখন যদি তাহা প্রতিপালন না করেন তাহা হইলে আপনি এ যাবৎ ব্রত নিয়ম যাগ যজ্ঞ, যে কিছু ধর্ম্ম করিয়াছেন সে সমস্তই নষ্ট হইবে। সুতরাং সম্প্রতি রামকে প্রদান করিয়া ধর্ম্ম রক্ষা করা আপনার নিতান্ত কর্ত্তব্য[১০]। আপনি ইক্ষ্বাকুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া এবং দশরথ নামে সুপ্রসিদ্ধ ভূপতি হইয়া যদি সত্য প্রতিপালন না করেন তাহা হইলে আর কোন্

ব্যক্তি তাহা করিবে[১১]? মহীপাল! আপনাদের ন্যায় মহাপুরুষ বর্গের ব্যবহার দেখিয়া অন্যান্য অজ্ঞ মানব ধর্ম্মমর্য্যাদায় স্থিতি করিবেক, সেজন্যও আপনার ধর্ম্মমর্য্যাদা প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য[১২]। হে মহারাজ! দেবলোকে হুতাশন যেরূপ অমৃত রক্ষা করিয়া থাকেন, রামচন্দ্র কৃতাস্ত্রই হউন, আর অকৃতাস্ত্রই হউন, পুরুষসিংহ মহাতেজা বিশ্বামিত্র রামকে সর্ব্বদা সেইরূপ রক্ষা করিবেন। রাক্ষসেরা ইঁহাকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হইবে না। হে নরনাথ! এই বিশ্বামিত্র ধর্ম্মের দ্বিতীয় মূর্ত্তি, বীর্য্যশালিগণের শ্রেষ্ঠ, লোক মধ্যে অধিক বুদ্ধিমান্ ও তপস্যার আশ্রয় স্বরূপ[১৩।১৪]। চরাচর ত্রিজগতের মধ্যে ইনিই বিবিধ দৈব, মানুষ ও আসুরাদি অস্ত্র অবগত আছেন। অন্য কেহ ইঁহার সমান অস্ত্রবিৎ নাই এবং হইবেও না[১৫]। দেবতা, ঋষি, অসুর, রাক্ষস, নাগ, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, সকলে সমবেত হইলেও প্রভাবে বিশ্বামিত্রের সদৃশ হইতে পারিবেন না[১৬]। কুশিকবংশসম্ভূত এই বিশ্বামিত্র পূর্ব্বে যখন রাজ্য শাসন করিতেন, তখন শত্রুজয়ার্থ ভগবান্ মহাদেবের আরাধনা করিলে তিনি পরিতুষ্ট হইয়া ইঁহাকে অন্যের অসংহার্য্য মহাস্ত্র সকল প্রদান করিয়াছিলেন[১৭]। সেই সকল দিব্যাস্ত্র কৃশাশ্বসম্ভূত, প্রজাপতিপুত্রসমতেজস্বী, মহাবীর ও সাতিশয় দীপ্তিমান্। তাহারা ইঁহার তপোবলে বশীভূত হইয়া অনুচরের ন্যায় ইঁহার পরিচর্য্যা করিত[১৮]। দক্ষ প্রজাপতির জয়া ও সুপ্রভা নাম্নী দুই কন্যা ছিল, তাহাদের গর্ভে পরমদুর্জ্জয় এক শত পুত্র উৎপন্ন হয় ও উভয়ের মধ্যে লব্ধবরা জয়া অসুর বধার্থ পঞ্চাশৎ অপত্য উৎপাদন করেন। তাহারা সকলেই দেবতুল্যকামচারী (দেবতারা যেমন যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারেন ইহারাও সেইরূপ যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারেন[১৯।২০]।) সুপ্রভাও পঞ্চাশৎ অপত্য উৎপাদন করেন, এবং তাহারাও অস্ত্ররূপী, নিতান্ত দুর্দ্দর্ষ, ভীষ্মাকৃতি ও বলশালী[২১]। মহারাজ! মহর্ষি বিশ্বামিত্র এবম্প্রভাবান্বিত ও মহাতেজস্বী। ইনি মুনি ও বিশ্বমান্য। সুতরাং ইনি রামকে লইয়া যাইবেন, তাহাতে ভাবনার বিষয় কি? ভাবিয়া বুদ্ধি বিপ্লব করিবেন না ও ভীত হইবেন না[২২]। হে মহীপাল! মুনিশ্রেষ্ঠ মহাসত্ত্ব সাধু মহর্ষি বিশ্বামিত্রের প্রভাবে যখন আসন্নমৃত্যু জীবেরও মৃত্যুভয় তিরোহিত ও অমরত্ব লাভ হয়; তখন মহাপ্রভাবশালী রামচন্দ্রের জন্য ভয় কি! আপনি মহর্ষির সহিত রামকে প্রেরণ করিতে মূঢ়চেতার ন্যায় বিষণ্ন হইবেন না[২৩]।

নবম সর্গ সমাপ্ত।

দশম সর্গ।

বাল্মীকি বলিলেন, ভরদ্বাজ! মহারাজ দশরথ বশিষ্ঠবাক্যশ্রবণে বিষাদ-পরিহার পূর্ব্বক রাম ও লক্ষ্মণকে স্বীয় সন্নিধানে আনয়ন করিবার নিমিত্ত দ্বারপালকে আদেশ করিলেন[১]। "দ্বারপাল! লক্ষ্মণের সহিত সত্যপরাক্রম মহাবাহু রামচন্দ্রকে শীঘ্র আমার নিকট আনয়ন কর[২]।" দ্বারপাল মহারাজের আদেশে রাম লক্ষ্মণকে আহ্বান করিবার নিমিত্ত অন্তঃপুরগৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক মুহূর্ত্ত মধ্যে পুনরায় মহীপতি সন্নিধানে আগমন করিল ও কহিল, হে দোর্দ্দণ্ডদলিত শত্রুপক্ষ! হে দেব! যদ্রূপ ভ্রমর রাত্রিকালে পদ্মিনী বিষয়ে উন্মনা থাকে, সেইরূপ, শত্রুদলনকারী রামচন্দ্র বিমনা হইয়া স্বীয় গৃহে অবস্থিতি করি-তেছেন[৩।৪]। রাজন্! আমি তাঁহাকে আহ্বান করিলে তিনি "যাইতেছি" এইমাত্র বলিয়া পুনর্ব্বার ধ্যানপরায়ণ হইলেন। তিনি খেদযুক্ত ও একাকী থাকিতে সচেষ্ট, কাহার নিকট অবস্থিতি করিতে ইচ্ছুক নহেন[৫]। দ্বারপাল এইরূপ কহিলে রাজা নিকটবর্ত্তী রামানুচরকে আশ্বাস প্রদান করত যথাযথ তথ্য জিজ্ঞাসা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন[৬]। কহিলেন, বৎস! রাম কি নিমিত্ত এরূপ অবস্থাপন্ন? রাজবাক্য শ্রবণে রামানুচর সাতিশয় বিবর্ণচিত্তে কহি-লেন[৭]। মহারাজ! আপনার পুত্র রাম যে কি নিমিত্ত তদ্রূপ অবস্থাপন্ন তাহা আমরা বলিতে পারি না। আমরা এই মাত্র বুঝিতেছি ও দেখিতেছি, প্রগাঢ়চিন্তানিবন্ধন বয়স্য রাম দিন দিন কৃশতা প্রাপ্ত হইতেছেন, তদ্দর্শনে আমরাও সাতিশয় চিন্তানিরত ও কৃশ হইতেছি[৮]। রাজীবলোচন রাম ব্রাহ্মণ-গণ সহ তীর্থযাত্রা হইতে প্রত্যাগত হওয়া অবধি দিন দিন ঐরূপ দুর্ম্মনা ও দিন দিন কৃশ হইতেছেন[৯]। তাঁহার কোনও কার্য্যে ইচ্ছা নাই, কেবল আমরা যত্ন সহকারে প্রার্থনা করায় মাত্র সন্ধ্যাবন্দনাদি করেন, অন্যান্য দৈবসিক কার্য্য ম্লান মুখে কখন করেন, কখন বা নাও করেন[১০]। স্নান, দেবপূজা, দান, প্রতিগ্রহ ও ভোজন, সকল কার্য্যেই তাঁহাকে অন্যমনস্ক দেখি এবং আমরা অনুরোধ করিলেও তিনি তৃপ্তিশেষ ভোজন করেন না[১১]। রাম ইতি পূর্ব্বে পুরনারীগণের সহিত অঙ্গনমধ্যে বারিধারাপানপরিতৃপ্ত চাতকের ন্যায় ক্রীড়া করিতেন, কিন্তু এক্ষণে আর সেরূপ করেন না[১২]। স্বর্গ যদ্রূপ পতনো-

সুখ স্বর্গীকে আনন্দিত করে না, সেইরূপ, মাণিক্যখচিত কেয়ূরাদি বিবিধ আভরণ তাঁহাকে আর সেরূপ আনন্দিত করে না। হে রাজন্! রাম এখন পরিমলবাহী মৃদুগন্ধবহনিষেবিত লতানিকুঞ্জমধ্যবর্ত্তিনী ক্রীড়াপরায়ণা রমণী-বৃন্দ দেখিয়া পরিতুষ্ট হন না, প্রত্যুত বিষণ্ণ হন[১৩।১৪]। রাজভোগ্য মনোহর সুস্বাদু খাদ্য প্রদান করিলেও তিনি তাহা গ্রহণ করেন না অধিকন্তু সে সমুদয় দেখিয়া তিনি অশ্রুপূর্ণনয়নে খেদ প্রকাশ করিতে থাকেন[১৫]। হাবভাব-লাবণ্যবতী শোভমানা পুরনারীগণের নৃত্য দর্শন করিয়া তাঁহার মন প্রফুল্ল হয় না, অধিকন্তু তিনি ঐ সমস্ত রমণীগণকে অশেষক্লেশদায়িনী বলিয়া নিন্দা করেন[১৬]। অনিন্দিত পান, ভোজন, শয্যা, যান, ক্রীড়াদ্রব্য, স্নান ও আস-নাদি বিষয়ে উন্মাদচেষ্টিতের ন্যায় ব্যবহার করেন[১৭]। বলেন—সম্পদ, বিপদ, গৃহ, মনোরথ, সকলই অসার। "অসার" এই মাত্র বলিয়া আর কিছু বলেন না, মৌন হন[১৮]। তিনি হাস পরিহাস ত্যাগ করিয়াছেন, ভোগে নিস্পৃহ হই-য়াছেন, কার্য্য করিতে অনিচ্ছুক, কেবল মাত্র মৌনই তাঁহার প্রিয় হই-য়াছে[১৯]। রাজন্! যদ্রূপ লতা-মঞ্জরী-শোভিতা চঞ্চলনয়না মৃগী হাবভাবাদি শৃঙ্গার চেষ্টার দ্বারা বৃক্ষ দিগকে কামাবিষ্ট করিতে পারে না, সেইরূপ, বিবিধকুসুম-সুশোভিতা অলকাবলিভূষিতা শৃঙ্গারভাবচেষ্টিতা চঞ্চলনয়না ললনারাও আজ্ কাল রামচন্দ্রকে সাত্ত্বিকোল্লাসে পাতিত করিতে সমর্থ হইতেছে না[২০]। যেমন কোন উচ্চবংশীয় মনুষ্য নীচ জাতির ক্রীতদাস হইলে সে একান্তে, দিগন্তে, নদীতীরে ও অরণ্যে বাস করিতে ভাল বাসে, সেইরূপ, রামও বিষণ্ণচিত্তে জনশূন্য অরণ্যাদিতে কালযাপন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন[২১]। মহারাজ! রাম অশন, বসন, ভূষণ ও যানাদি গ্রহণ বিষয়ে বিমুখ হইয়া সন্ন্যাস ধর্ম্মের অনু-গমন করিতেছেন[২২]। হে জননাথ! রাম সর্ব্বদাই একাকী বিজন প্রদেশে উপবিষ্ট থাকেন। হাস্য, গান, রোদন, কিছুই করেন না[২৩]। বদ্ধপদ্মাসন নামক যোগাসনে উপবেশন পূর্ব্বক বাম করে কপোলবিন্যাস করতঃ সর্ব্বক্ষণ শূন্যমনে অবস্থান করেন[২৪]। তাঁহার অভিমান নাই এবং তিনি রাজ্যের অভিলাষ করেন না। তাঁহার সুখে অনুরাগ ও দুঃখে বিষাদ হয় না[২৫]। বলিতে কি, তদীয় হৃদয়ে সুখ, দুঃখ, হর্ষ, বিষাদ, কিছুই নাই। তিনি যে কি করেন, কোথায় যান, কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, ধ্যান করেন কি আর কি করেন, তাহা আমরা জানি না, বুঝিতেও পারি না[২৬]। মহারাজ! যদ্রূপ হিমাগমে তরুগণ দিন দিন কৃশ ও বিবর্ণ হইতে থাকে, আমাদের রাম সেইরূপ

দিন দিন কৃশ ও বিবর্ণ হইতেছেন[২৭]। তাঁহার অনুগামী লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন, তাঁহারাও তাঁহার প্রতিবিম্বের সদৃশ অর্থাৎ কৃশ ও বিবর্ণ হইতেছেন[২৮]। ভৃত্যগণ, অন্যান্য রাজগণ ও জননী সকল তাঁহাকে বারম্বার বিষাদের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি "কিছু না" এইমাত্র বলিয়া মৌন ও নিশ্চেষ্ট হন[২৯]। পার্শ্ববর্ত্তী সুহৃদ্গণকে নিয়তই উপদেশ দেন যে, "হে সুহৃদ্গণ! তোমরা আপাতমধুর ভোগে ঐকান্তিক নিমগ্ন হইও না[৩০]।" হে রাজন্! রামচন্দ্র বিপুলবিভবপূর্ণ বিলাসগৃহে বিবিধভূষণভূষিতা বিলাসবতী রমণীগণকে দেখিয়া কিছু মাত্র স্নেহ প্রকাশ করেন না; অধিকন্তু তাহাদিগকে বিনাশকারিণী বলিয়া মনে করেন[৩১]। তিনি পুনঃ পুনঃ ক্ষোভক্ষুভিত স্বরে বলেন, হায়! যে চেষ্টায় অনায়াসে পরমপদ প্রাপ্ত হওয়া যায় লোক সকল সে চেষ্টা ত্যাগ করিয়া বৃথা আয়ুঃক্ষয় করিতেছে[৩২]। তাঁহাকে "সম্রাট হও" বলিলে তিনি পার্শ্বস্থ অনুজীবী দিগকে উন্মাদ মনে করেন ও অন্যমনা হইয়া উপহাস্য করেন[৩৩]। কাহার কথায় কর্ণপাত করেন না, তাঁহার সম্মুখে গেলে তিনি প্রসন্ন দৃষ্টিতে দেখেন না, অন্যমনস্কের ন্যায় দৃষ্টি পরিচালন করেন এবং মনোহর বস্তু উপস্থাপিত করিলে তিনি তৎপ্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে ক্ষান্ত হন না[৩৪]। আকাশরূপ সরোবরে আকাশ-নলিনীর উৎপত্তি যদ্রূপ বিস্ময়াবহ ও অসম্ভব, সেইরূপ, মনও অসম্ভব ও বিস্ময়াবহ। এই বিশ্বাসে তিনি এই সকল মনঃকল্পিত বাহ্যবস্তু দর্শনে বিস্ময়বিহীন হইয়াছেন[৩৫]। কামবাণ নারীমধ্যগত রামের হৃদয় ভেদে অসমর্থ। যদ্রূপ জলধারা দুর্ভেদ্য বৃহৎ প্রস্তর ভেদ করিতে অসমর্থ, সেইরূপ, কামবাণও দুর্ভেদ্য রামহৃদয় ভেদে অশক্ত[৩৬]। তিনি ধন সমুদয়কে আপদের আকর মনে করেন, করিয়া অর্থী দিগকে বিতরণ করেন। তদুপলক্ষে সর্ব্বদাই বলেন, ধন আপদের অদ্বিতীয় বাসস্থান। তোমরা কেন তাহা প্রার্থনা কর[৩৭]? একটী শ্লোক গান করেন, তাহা এইরূপ—"ইহা আপদ, ইহা সম্পদ, এ সকল কেবল কল্পনা, মোহের মহিমা ও মনের খেলা[৩৮]।" তিনি প্রায়ই বলেন, লোক সকল "আমি হত হইলাম, অনাথ হইলাম," এইরূপে বিলাপ করে অথচ বৈরাগ্য গ্রহণ করে না। ইহা অতীব আশ্চর্য্য[৩৯]। মহারাজ! রঘুবংশকাননের শালবৃক্ষস্বরূপ শত্রুহন্তা রামের এইরূপ নির্ব্বেদ দর্শনে আমরা সাতিশয় খিদ্যমান হইয়াছি পরন্তু তাহার প্রতিবিধানার্থ কোনরূপ উপায় অবলম্বন করিতে পারিতেছি না। হে জলজলোচন! হে বহুশত্রুনাশন! আপনিই আমাদিগের একমাত্র গতি, অতএব আপনিই ইহার উপায় বিধান

করুন[৪০]।[৪১]। কোন রাজা কি ব্রাহ্মণ তাঁহাকে উপদেশ প্রদান করিলে তিনি তাঁহাদিগকে অজ্ঞের ন্যায় জ্ঞান করিয়া অবজ্ঞা প্রদর্শন পূর্ব্বক উপহাস করিয়া থাকেন[৪২]। ইহা অমুক, তাহা অমুক, তাঁহা এই, ইত্যাদি আকারের যে জগৎ নামক পদার্থ উপস্থিত হইয়াছে, এ সমস্তই নশ্বর সুতরাং মিথ্যা অর্থাৎ অবস্তু। এ সকল কিছুই নহে এবং আমিও কিছু নহি। রাম এইরূপ নিশ্চয় করিয়া নিশ্চেষ্ট আছেন। নাথ! শত্রু, মিত্র, আত্মা, রাজ্য, মাতা, সম্পত্তি, এ সকলের প্রতি তাঁহার আস্থা নাই এবং কোনও বিষয়ে যত্ন, চেষ্টা, আশা বা আশয় নাই[৪৩]।[৪৪]। যেরূপ দেখিতেছি তাহাতে রামকে মূঢ় ও মুক্ত দুএর কিছুই বলিতে পারি না। কোন বিষয়ে আস্থা নাই, চেষ্টা নাই, স্পৃহা নাই, অথচ তাঁহার আত্মবিশ্রান্তি লাভ হয় নাই। আত্মবিশ্রান্তি অর্থাৎ শান্তি লাভ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। রামের ঈদৃক অবস্থা দর্শনে আমরা সাতিশয় সন্তপ্ত হইতেছি[৪৫]। ধন, পিতা, মাতা, রাজ্য, কার্য্যচেষ্টা, এ সমুদায়ে কি হইবে? প্রয়োজন নাই। এইরূপ নিশ্চয় করিয়া তিনি প্রাণত্যাগসঙ্কল্পে কালকর্ত্তন করিতেছেন[৪৬]। যেমন চাতক পক্ষী অনাবৃষ্টি দর্শনে উদ্বিগ্নচিত্ত হয়, সেইরূপ, রামচন্দ্রও পিতা, মাতা, বন্ধু, বান্ধব ও রাজ্যাদি বিষয়ে সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। তিনি বলেন, ঐ সকল মোক্ষের প্রতিবন্ধক। মহারাজ! আপদরূপ লতা আপনার পুত্র রামকে আশ্রয় করিয়া শাখা প্রশাখা বিস্তার পূর্ব্বক দিন দিন বদ্ধমূল হইতেছে; দয়া করিয়া এই সময়ে তাহার উন্মূলন চেষ্টা করুন[৪৭]।[৪৮]। হে প্রভো! তাদৃক্‌স্বভাবান্বিত রাম এই সমস্ত বিভবের অধিপতি হইয়াও ঐশ্বর্য্যপূর্ণ সংসারকে বিষতুল্য জ্ঞান করিতেছেন[৪৯]। এই অবনীমণ্ডলে আপনি ভিন্ন এমন কোন মহাজ্ঞানী নাই যিনি রামচন্দ্রকে প্রকৃতিস্থ করিতে সমর্থ[৫০]। যেরূপ দিনকর কিরণজাল বিস্তার দ্বারা অন্ধকার নষ্ট করিয়া স্বীয় সমুজ্জ্বল জ্যোতির সফলতা সাধন করেন, সেইরূপ, সদুপদেশদ্বারা রামচন্দ্রের হৃদয়স্থিত সন্তাপরাশি তিরোহিত করিয়া স্বীয় সাধুতার সফলতা সাধন করিতে পারে, এমন ব্যক্তি আপনি ব্যতীত আর কে আছে[৫১]।

দশম সর্গ সমাপ্ত।

একাদশ সর্গ।

রামবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্র বলিলেন, ওহে প্রাজ্ঞগণ! রামচন্দ্র যদি সত্য সত্যই তদ্রূপ অবস্থাপন্ন হইয়া থাকেন, তবে, হরিণগণ যেমন তাহাদের যূথগতিকে আনয়ন করে, সেইরূপ, তোমরাও তাঁহাকে শীঘ্র আমার নিকট আনয়ন কর[১]। তাঁহার ঐ মোহ কোন বিপত্তি বা রাগবশতঃ হয় নাই। অনুমান হয়, তাহা বিবেক ও বৈরাগ্য প্রযুক্তই হইয়াছে। যাহারা বিবেকবৈরাগ্যে আক্রান্ত হয়, আমি জানি, তাহাদেরই ঐ প্রকার মহাফলবোধ (তত্ত্বজ্ঞানের পূর্ব্বলক্ষণ) উপস্থিত হইয়া থাকে[২]। রাম এখনই এখানে আসুন, এখনই আমরা তাঁহার সকল মোহ (সংশয়) বায়ুর পর্ব্বতাগ্রবর্ত্তী মেঘ অপনয়ন করার ন্যায় অপনয়ন করিব[৩]। যুক্ত্যাদির দ্বারা মোহ অপনীত হইলে তিনি আমাদের ন্যায় বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হইবেন[৪]। মহারাজ! যদ্রূপ অমৃত পান করিলে সত্য, মুদিতা, (পরসুখে সুখী), প্রজ্ঞা (নির্ম্মল জ্ঞান), শান্তি, তাপশূন্যতা, পুষ্টি ও রূপলাবণ্যাদি লাভ করা যায়, সেইরূপ, রামচন্দ্রও ঐ সকল প্রাপ্ত হইবেন[৫] এবং সুখদুঃখাতীত, লোষ্ট্রকাঞ্চনে সমবুদ্ধি, পরাবর জ্ঞানী ও মহাসত্ত্ব হইবেন[৬]।[৭]

হে ভরদ্বাজ! মুনিনাথ বিশ্বামিত্র এই সকল কথা কহিলে নরনাথ দশরথ আহ্লাদিত হইয়া রামকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত পুনরায় অন্য দূত প্রেরণ করিলেন[৮]। ওদিকে রাম পিতৃসন্নিধানে আগমন করিবার জন্য প্রফুল্লচিত্তে স্বগৃহাবস্থিত আসন হইতে সূর্য্যের ন্যায় উত্থিত হইলেন[৯]। অনন্তর লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন ও কতিপয় ভৃত্য সমভিব্যাহারে পিতৃসমীপে আগমন করিতে লাগিলেন। যেমন সুরপতি স্বর্গভূমে আগমন করেন, তেমনি, রামও পিতৃসমীপে আগমন করিতে লাগিলেন[১০]। অনতিবিলম্বে রাম দূর হইতে অবলোকন করিলেন, মহারাজ দশরথ দেবগণপরিবৃত সুররাজের ন্যায় রাজন্যগণে পরিবেষ্টিত রহিয়াছেন[১১]। তাঁহার উভয় পার্শ্বে সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ মন্ত্রিগণ, মহর্ষি বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র উপবিষ্ট আছেন[১২]। আরও দেখিলেন, চারুচামরধারিণী ললনাগণ উপযুক্ত স্থানে দণ্ডায়মান থাকিয়া চামর সঞ্চালন দ্বারা তাঁহার উপাসনা করিতেছে। তাঁহাদিগকে দেখিলে মূর্ত্তিমতী দিগঙ্গনা বলিয়া ভ্রম হয়[১৩]।

এ দিকে মহর্ষি বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ, মহারাজ দশরথ ও অন্যান্য নৃপতিগণ দেখিলেন, সাক্ষাৎ কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় রূপবান্ রাম আগমন করিতেছেন[১৪]। তাঁহারা দেখিলেন, সর্ব্বজনসেব্য সত্ত্বগুণাবলম্বী রাম স্বীয় গাম্ভীর্য্যাদি গুণে তাপনাশন ও শৈত্যগুণযোগী ভূধরের সদৃশ[১৫] ও নিতান্ত প্রিয়দর্শন। তাঁহার অঙ্গ সকল সমবিভক্ত, সুব্যবস্থিত সুতরাং সুসৌষ্ঠব ও সর্ব্বমনোহর। তাঁহার মূর্ত্তি অনুগ্রহ ও পুরুষার্থ লাভের (ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ) একান্ত যোগ্য[১৬]। যৌবনের আরম্ভ হইলেও তাঁহার মূর্ত্তিতে যৌবনোচিত চাপল্য নাই, অধিকন্তু বৃদ্ধোচিত গাম্ভীর্য্য পরিলক্ষিত হয়। অবিবেকের অবসান হওয়ায় তাঁহার চিত্ত উদ্বেগপরিশূন্য অথচ পরমানন্দ (মোক্ষ) অপ্রাপ্তে অল্লানন্দবিশিষ্ট। দেখিলেই প্রতীত হয়, তাঁহার অভীষ্ট নিকটবর্ত্তী হইয়াছে[১৭]। তিনি বিচারশীল, পবিত্রগুণগণের আশ্রয়, সত্ত্বগুণের আধার, উদারস্বভাব, আর্য্য, অক্ষোভ ও দর্শনীয়তম[১৮।১৯]। কথিতপ্রকার গুণগণে ভূষিত, নির্ম্মলবস্ত্রাভরণশোভিত কমললোচন রাম পিতৃসমীপে আগমন করতঃ মনোহর মণিভূষিত মস্তক নমন পূর্ব্বক পিতৃচরণে প্রণাম করিলেন[২০।২১]

মুনীন্দ্র বিশ্বামিত্র "রামকে আনয়ন কর" এইরূপ বলিতেছিলেন, এই অবসরে রাম পিতৃপদ বন্দনার্থ তথায় আগমন করিলেন। প্রথমে পিতার, পরে মাননীয়তম বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠের, তৎপরে সভাস্থ বিপ্রবৃন্দের, বন্ধুবৃন্দের, অন্যান্য গুরুজনের ও সুহৃদ্বর্গের যথাযথ বন্দন অভিবাদন ও নমস্কারাদি করিলেন[২২।২৩]। সামন্ত (অধীন রাজা) রাজগণ নমস্কার করিলে অল্প শিরোনমন করতঃ বিনয়গর্ভবাক্যে তাহাদিগের পরিতোষ উৎপাদন করতঃ মুনিদ্বয়ের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ পূর্ব্বক পিতার পুণ্যময় সমীপে উপনীত হইলে রাজা তাঁহার পুনঃ পুনঃ মস্তকাঘ্রাণ, আলিঙ্গন ও মুখচুম্বন করিলেন[২৪।২৫]। পরে সস্নেহে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন উভয়কে পুনঃ পুনঃ রাজহংস যেমন পদ্মকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করে, সেইরূপ আলিঙ্গন ও চুম্বন করিলেন[২৭]। অনন্তর রাজা "পুত্র! ক্রোড়ে উপবেশন কর" এইরূপ বলিলে ও তাঁহারা সাস্তরণ বিচিত্রাংশুকযুক্ত ভূপ্রদেশে উপবেশন করিলেন[২৮]। রাজা কহিলেন, পুত্র! তুমি বিবেক প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বপ্রকার কল্যাণভাজন হইয়াছ সত্য; পরন্তু জড়সমান জীর্ণ-বুদ্ধির দ্বারা আত্মাকে খেদযুক্ত করা উচিত নহে[২৯]। বৎস! যাহারা বৃদ্ধদিগের, ব্রাহ্মণগণের ও গুরুজনের আজ্ঞা বাক্য রক্ষা করে, তাহারাই পবিত্র পথ প্রাপ্ত হয়, কিন্তু যাহারা মোহের অনুগামী—তাহারা তাহা প্রাপ্ত হয় না[৩০]। হে পুত্র!

মানব যাবৎ না মোহবশবর্ত্তী হয় আপদ সকল তাবৎ তাহাদিগের অতিদূরে অবস্থান করে[৩১]।

বশিষ্ঠ কহিলেন, মহাবাহো! তুমি যখন দুর্জ্জয় বিষয়বাসনারূপ রিপু জয় করিয়াছ তখন তোমাকে অবশ্যই শূর বলিতে হইবে[৩২]। কেন তুমি অজ্ঞানীর ন্যায় তরঙ্গবহুল মলিন মোহসাগরে মগ্ন হইতেছ[৩৩]?

বিশ্বামিত্র বলিলেন, রাম! তুমি বিলোলনীলোৎপলসদৃশ নেত্রের চিত্তচাপল্যকৃত চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করিয়াছ, তবে কেন মোহগ্রস্ত হইতেছ[৩৪]? কোন্ কারণে, কি অভিলাষে, কোন্ মনঃপীড়ারূপ মূষিক তোমার চিত্তরূপ গৃহ খনন করিতেছে[৩৫]? আমার বিবেচনায় তুমি মনঃপীড়া পাইবার অনুপযুক্ত। দরিদ্র ব্যক্তিরাই আপদের ভাজন হইয়া থাকে[৩৬]। হে অনঘ! তোমার অভিপ্রায় কি তাহা শীঘ্র বল। যাহাতে কোন প্রকার মানসিক সন্তাপ তোমাকে আক্রমণ করিতে না পারে আমি তাহার উপায় বিধান করিব[৩৭]। মহর্ষি শোভনমতি বিশ্বামিত্র ঐরূপ কহিলে রঘুবংশতিলক রামচন্দ্র সেই স্বাভিলষিতার্থদ্যোতী উত্তম কথা শ্রবণ করিয়া খেদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ময়ূর যদ্রূপ মেঘাগমে আনন্দিত হয় তদ্রূপ আনন্দিত হইলেন[৩৮]।

একাদশ সর্গ সমাপ্ত।

দ্বাদশ সর্গ।

বাল্মীকি বলিলেন, হে ভরদ্বাজ! রামচন্দ্র বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক কথিত প্রকারে জিজ্ঞাসিত ও আশ্বাসিত হইয়া শ্রবণমধুর ও অর্থসংযুক্ত বাক্যে বলিতে লাগিলেন। বলিলেন, ভগবন্! যদিও আমি অজ্ঞ, তথাপি, আপনি যখন বলিতে আদেশ করিলেন তখন অবশ্যই আমি সমুদায় যথাযথ কথা বলিব, সন্দেহ নাই। কোন্ মূঢ় সজ্জনের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারে[১।২]?

আমি জন্ম গ্রহণ করিয়া অবধি এই পিতৃগৃহে অবস্থিতি করতঃ ক্রমশ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছি ও গুরুসকাশে বিদ্যা লাভ করিয়াছি[৩]। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! সদাচার রত হইয়া তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে সমুদ্রমেখলা মেদিনী পরিভ্রমণ করিয়াছি[৪]। মহর্ষে! এত কাল পরে সম্প্রতি আমার মন সংসারের প্রতি আস্থা পরিত্যাগ করিয়াছে এবং আমার মনে এইরূপ বিচারণা জন্মিয়াছে[৫]। আমি নিতান্ত বিবেকাক্রান্ত হইয়াছি ও ভোগের পরিণাম বিরস ফলও বিষয়াসক্তি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছি। সম্প্রতি মনোমধ্যে এইরূপ বিচারণা উপস্থিত হইতেছে যে, এই যে সুখ, ইহা কি! এই যে সংসার, ইহাই বা কি! দেখিতেছি, লোক সকল কেবল নিরন্তরই মরিবার নিমিত্ত জন্মিতেছে ও জন্মিবার নিমিত্ত মরিতেছে[৬।৭]। কি চর কি অচর সমুদায় সংসারের চেষ্টা স্বপ্নমায়াদিসদৃশ মিথ্যা ও নশ্বর। কেবল নশ্বর ও মিথ্যা নহে, বিপদের আলয়, পাপের মূল ও অভিভবের ভূমি[৮]। প্রত্যেক সাংসারিক ভাব লৌহশলাকার সদৃশ পরস্পর অসংলগ্ন। এ সকল ভাব (পদার্থ) কেবল নিজেরই মনঃসঙ্কল্পনা প্রাদুর্ভূত[৯]। দেখা যায়, এই জগতের সমুদায় সুখ মনের অধীন। শূন্য মন নিতান্ত অসৎ (মিথ্যা)। সুখের মূল মন, তাহা যখন তুচ্ছ, তখন আর কেন বৃথা মুগ্ধ হইব[১০]? যদ্রূপ পিপাসাকাতর হরিণগণ মরীচিকায় জলভ্রান্ত হইয়া বৃথা ধাবমান হয়, সেইরূপ, মূঢ়চেতা আমরা সুখপ্রত্যাশায় আকৃষ্ট হইয়া বৃথা সংসারগহনে পরিভ্রমণ-কষ্ট স্বীকার করিতেছি[১১]। এই সংসারে কেহ আমাদিগকে বিক্রয় করে নাই অথচ আমরা সংসারের নিকট বিক্রীতের ন্যায় (কৃতদাসের ন্যায়) কালযাপন করিতেছি। কি খেদ! আমরা কি মূঢ়! এ সমস্তই শাম্বরী মায়ার সদৃশ (ইন্দ্রজাল তুল্য মিথ্যা,) ইহা জানিয়াও জানিতেছি না[১২]। আমরা সকলেই

বৃথা সুখভোগের আশায় কেবল মাত্র ভ্রান্তিজালে আচ্ছন্ন হইতেছি। বন-মধ্যে মৃগগণ যেরূপ গর্ত্তে নিপতিত হইয়া মুগ্ধপ্রায় হইয়া থাকে, আমরাও সেইরূপ এই সংসারকূপে নিমগ্ন আছি। প্রপঞ্চ অর্থাৎ সংসার জগৎ কি? বিষয়ভোগই বা কি? এ সকল কিছুই নহে। বিষয়ভোগ কেবল নিরন্তর দুঃখ-প্রদ দুর্ভাগ্য বিশেষ[১৩]। বহুকাল পরে জানিতে পারিয়াছি যে, আমরা বৃথা মোহে মুগ্ধ হইয়া বৃথা সংসার-গর্ত্তে ভ্রমান্ধ পশুর ন্যায় নিপতিত আছি[১৪]। আমার রাজ্যে প্রয়োজন নাই, সুখভোগেও অভিলাষ নাই। আমি কে! এ সকল কোথা হইতে আসিল! ইহাই আমার বিচার্য্য। আমি স্পষ্টই দেখিতেছি, সমস্তই মিথ্যা সুতরাং ইহার আলোচনা করাও মিথ্যা। যাহা মিথ্যা তাহা মিথ্যাই থাকুক, তাহাতে আমার ক্ষতি কি[১৫]? ব্রহ্মন্! এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া মরুভূমিগত পথিকের ন্যায় এই সংসারের প্রতি আমার নিতান্ত বিতৃষ্ণা উপস্থিত হইয়াছে[১৬]। হে ভগবন্! আপনি বলুন, আমায় উপদেশ করুন, দৃশ্য সকল যে নষ্ট হইতেছে ও নাশানন্তর পুনরুৎপন্ন ও বর্দ্ধিত হইতেছে, ইহা কিরূপে সামঞ্জস্য হইতে পারে[১৭]? এ সকল নিতান্ত অসার, অনর্থ ও অপ্রয়ো-জনীয়। সম্পদও অনর্থ মধ্যে গণনীয়। এই দেহও জন্ম মরণ জরা প্রভৃতি অনর্থ পরম্পরায় আবদ্ধ। জীবের জন্ম ও মরণ আবির্ভাব তিরোভাব ব্যতীত অন্য কিছু নহে এবং তাহারই অনুরূপ পুনঃ পুনঃ বৃথা পরিবর্দ্ধিত হয়। ঈদৃশ জীব-জন্মের ফল কি? প্রয়োজন কি? ইহাতে অনর্থপরম্পরা ব্যতীত অন্য কিছু সারভূত ফল দেখা যায় না[১৮]। আপনি দেখুন, পর্ব্বতস্থ বৃক্ষ যেমন বায়ুর দ্বারা আহত হইয়া জীর্ণ শীর্ণ হয়, সেইরূপ, আমরাও পুনঃ পুনঃ সেই সেই নিতান্ত তুচ্ছ ও অসার ভোগে অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জরামরণাদির দ্বারা জর্জ্জরিত হইতেছি। যেমন বায়ুপূর্ণ কীচক বেণু * বৃথা শব্দ করে, সেইরূপ, এই সকল অচেতনপ্রায় অর্থাৎ পুরুষার্থযোগবিহীন জনগণ নাসারন্ধ্র দ্বারা দেহ মধ্যে প্রাণ-নামক বায়ু প্রবেশিত করিয়া বৃথা বাক্যোচ্চারণরূপ অনর্থ শব্দ করিতেছে[১৯।২০]। ঋষে! কিরূপে এই সংসারদুঃখের অবসান হইবে, সেই চিন্তায় আমি নিরন্তর দগ্ধ হইতেছি। কোন শুষ্ক বৃক্ষের অন্তরস্থ কোটরে বহ্নি থাকিলে তাহা যেমন অন্তরে অন্তরে দগ্ধ হইতে থাকে, ঐ চিন্তায় আমিও

---

* বেণু=বাঁশ। বাঁশের ছিদ্র থাকিলে তন্মধ্যে বায়ু প্রবেশ করে ও তাহাতে বংশীনিনাদ তুল্য শব্দ হয়। বায়ুর তাড়নায় বাঁশে বাঁশে ঘর্ষণ হইলেও এক প্রকার শব্দ উৎপন্ন হয়। তাদৃশ শব্দায়মান বাঁশ সংস্কৃত ভাষায় "কীচক" নামে প্রসিদ্ধ। কীচকের শব্দ অর্থ শূন্য।

সেইরূপ অন্তরে অন্তরে দগ্ধ হইতেছি[২১]। সংসারদুঃখরূপ দুর্ব্বহ প্রস্তর, তদ্দ্বারা আমার হৃদয়রন্ধ্র একবারেই অবরুদ্ধ হইয়াছে, তথাপি আমি লোকভয়ে ও পরিজন গণের ভয়ে বাষ্পবারি বিসর্জ্জন ও শব্দোচ্চারণপূর্ব্বক রোদন করি না[২২]। আমার হৃদয়স্থ বিবেক ব্যতীত অন্যে আমার রোদন বুঝিতে পারে না। আমার মুখের বৃত্তি সকল অর্থাৎ হাস্য-বাক্য-সংলাপ প্রভৃতি নিরন্তরিত নিরশ্রু নীরব রোদনে নীরসতা প্রাপ্ত হইয়াছে। পাছে আমার স্বজনগণ দুঃখিত হন, সেই ভয়ে আমি কৃত্রিম হাস্যাদি করিয়া থাকি[২৩]। যেমন সৌভাগ্যশালী ব্যক্তি সহসা দারিদ্র্য দশা প্রাপ্ত হইলে পূর্ব্বাবস্থা স্মরণ করিয়া পরিতাপিত হয়, আমিও সেইরূপ ভাবাভাবময় সংসারের চেষ্টা ও অবস্থা স্মরণ করিয়া অতিশয়িত মোহ প্রাপ্ত হইতেছি[২৪]। ঐশ্বর্য্য সমুদয় মানব-গণের মনোবৃত্তি মোহিত করে, গুণরাশি বিনাশ করে, পরে অশেষবিধ যাতনা প্রদান করে[২৫]। যদ্রূপ পুত্রকলত্রপরিবৃত গৃহ বিপন্ন ব্যক্তির আনন্দ প্রদ হয় না; তদ্রূপ, আমার এই ঐশ্বর্য্যও চিন্তানিচয় সমাক্রান্ত হওয়ায় প্রীতিপ্রদ হইতেছে না[২৬]। হে মুনে! যেরূপ বন্যহস্তী লৌহশৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া সুখলাভ করিতে সমর্থ হয় না; সেইরূপ, আমিও এই ক্ষণভঙ্গুর দেহ ধারণ করিয়া চিন্তাজনিত মহামোহরূপ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া অল্পমাত্রও সুখলাভে সমর্থ হইতেছি না[২৭]। লোক সকল অজ্ঞানরূপ রজনীতে জ্ঞানালোকবিহীন হওয়ায় দৃক্‌শক্তিশূন্য হইয়াছে, তাহা দেখিয়া বিষয়রূপ শত শত মহাখল চৌর সমাগত হইয়া তাহাদের বিবেকরূপ মহারত্ন অপহরণে সমুদ্যত হইয়াছে। এ সময়ে তত্ত্বজ্ঞানরূপ যোদ্ধা ব্যতীত অন্য কেহ সেই সকল সুচতুর চোর গণকে রণে পরাজিত করিয়া বিবেকরত্ন রক্ষা করিতে সমর্থ নহে[২৮]।

দ্বাদশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রয়োদশ সর্গ।

রামচন্দ্র বলিলেন, মুনিবর! মূঢ় ব্যক্তিরাই এই সংসারে শ্রীকে স্থিরা ও উৎকৃষ্টা মনে করে। বস্তুতঃ তাহা স্থিরা নহে; উৎকৃষ্টাও নহে। তাহা নিতান্ত অনর্থদায়িনী ও মোহের হেতু[১]। যদ্রূপ বর্ষাকালের তরঙ্গিণী অন্যান্য কল্লোলিনীর সহিত সঙ্গতা হইয়া তরঙ্গ সহকারে প্রবল বেগে প্রবাহিতা হয়, সেইরূপ, বিষয়শ্রীও জ্ঞানজড় জনগণের উল্লাস দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইয়া তাহাদিগকে মহাবিপদ্রূপ প্রবল তরঙ্গে নিক্ষিপ্ত করে[২]। হে মুনে! চিন্তা বিষয়শ্রীর দুহিতা। যেমন নদী হইতে অসংখ্য তরঙ্গ উৎপন্ন হয়, পরে বায়ুসহকারে বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ, বিষয়শ্রী হইতেও অসংখ্য চিন্তা দুহিতার উৎপত্তি হয়, পরে তাহারা বহুবিধ দুশ্চেষ্টার দ্বারা বর্দ্ধিতা হয়[৩]। যেমন কোন দুর্ভগা নারী দগ্ধপদা হইয়া জ্বালায় ইতস্ততঃ ধাবমানা হয়, নিয়ত চেষ্টা করিলেও কোন স্থানে পদস্থাপন করিয়া সুস্থির থাকিতে পারে না, সেইরূপ, বিষয়শ্রীও ভ্রষ্টাচার পুরুষের হস্তগতা হইয়া স্থির থাকিতে পারে না, সর্ব্বদাই ইতস্ততঃ ধাবমানা হয়[৪]। যেমন দীপশিখা কোন এক স্থানে সংলগ্ন হইয়া সে স্থানকে উত্তাপিত ও কজ্জলের ন্যায় মলিন করে, সেইরূপ, ঐশ্বর্য্যশ্রীও আশ্রিত পুরুষ দিগকে সন্তাপিত ও তাহাদের চিত্তকে মলিন করিয়া থাকে[৫]। রাজারা গুণাগুণ বিচার না করিয়াই পার্শ্বচর পুরুষকে গ্রহণ করেন। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, মূঢ় ব্যক্তিরাও গুণাগুণ বিচার না কবিয়া সন্নিহিত দুরাচার দিগকেই অবলম্বন করে[৬]। যদ্রূপ দুগ্ধ পানে সর্পের বিষ পরিবর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ, অধার্ম্মিক দিগের শ্রীও তাহাদের দুর্ব্ব্যবহার সহ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ তাহাদের শ্রী কেবল যুদ্ধ বিগ্রহাদি কার্য্যেই পর্য্যবসিত হয়। স্পষ্টই দেখা যায়, অধার্ম্মিক দিগের শ্রী লোভ, হিংসা ও পরস্বাপহরণ, ইত্যাদি আশয়েই প্রথিতা হইয়া থাকে[৭]। সমীরণ যাবৎ না হিমসংলগ্ন হয়, তাবৎ সুখস্পর্শ থাকে। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি; মনুষ্যও যাবৎ না ঐশ্বর্য্যশ্রীসমাকৃষ্ট হইয়া কর্কশভাবাপন্ন হয়, তাবৎ তাহারা কি স্বজন, কি অপর ব্যক্তি, সকলের প্রতি সুখস্পর্শ থাকে। অর্থাৎ দয়াদাক্ষিণ্যাদি গুণে বিদ্যমান থাকে[৮]। যেরূপ মণি ভস্মাচ্ছাদিত হইলে

মলিনতা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ, সুপণ্ডিত, শূর, কৃতজ্ঞ ও নম্র ব্যক্তিরাও ঐশ্বর্য্যাচ্ছন্ন হইলে স্ব স্ব স্বভাব পরিহার পূর্ব্বক মলিনভাব ধারণ করিয়া থাকেন[৯]। ভগবন্! বিষলতা যেরূপ কেবল মাত্র মৃত্যুরই কারণ, সেইরূপ, বিষয়শ্রীও সুখের কারণ না হইয়া দুঃখেরই কারণ হইয়া থাকে। বিষবৃক্ষ রক্ষণাবেক্ষণ করিতে গেলেও নিধন লাভের সম্ভাবনা এবং সম্পত্তি রক্ষা করিতে গেলেও আত্মবিনাশের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা[১০]। মহর্ষে! এই সংসারে শ্রীমান্ অথচ লোকের নিকট নিন্দনীয় নহে, শূর অথচ আত্মশ্লাঘাকারী নহে, প্রভু অর্থাৎ নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ অথচ সমদর্শী, এরূপ লোক অতি দুর্ল্লভ[১১]। হে মুনিবর! অজ্ঞ লোক যাহাকে শ্রী বলিয়া জানে, প্রকৃতপক্ষে তাহাই দুঃখরূপ ভুজঙ্গের দুর্গম আবাস ভবন (গর্ত্ত) এবং মোহরূপ হস্তীর বিন্ধ্যাচলস্থ মহাতট[১২]। এই শ্রীই সাধুজনের সৎকার্য্যরূপ পদ্মের যামিনী, দুঃখরূপ কুমুদের চন্দ্রিকা, সুদৃষ্টিরূপ (আস্তিকতা) দীপের নির্ব্বাণকারিণী প্রবল বাত্যা, ভবসাগরপারেচ্ছুগণের ভীষণ উত্তাল তরঙ্গ[১৩]। উহা ভয়ভ্রান্তিরূপ মেঘের আদি পদবী অর্থাৎ পূর্ব্ব লক্ষণ, বিষাদ বিষের পরিবর্দ্ধক, সংশয় ও বিক্ষোভ প্রভৃতির ক্ষেত্র। ভয়রূপ বিষধর অবশেষে বিষাদ বিষ উদ্গীরণ করতঃ সেই সকল লোকদিগকে খেদান্বিত করিয়া থাকে[১৪]। অধিক কি বলিব, এই সংসারশ্রী বৈরাগ্যবল্লীর হিমানী, বিকাররূপ পেচকের যামিনী, বিবেকরূপ চন্দ্রের রাহুদংষ্ট্রা ও মোহরূপ কৈরবের জ্যোৎস্না[১৫]। যদ্রূপ নানারাগরঞ্জিত পরম মনোহর ইন্দ্রধনু অনতিবিলম্বেই বিলীন হয়, চপলা যদ্রূপ উৎপন্নমাত্রেই বিনষ্ট হয়, মূর্খদিগের আশ্রিত আপাতরমণীয়া বিষয়শ্রীও সেইরূপ অচিরস্থায়িনী, পরন্তু তাহা তাহারা জানিয়াও জানে না[১৬]। বিষয়শ্রী বন-নকুলী অপেক্ষাও চঞ্চলা ও মৃগতৃষ্ণিকা অপেক্ষাও তীক্ষ্ণা। যদ্রূপ দুষ্কুলজাতা রমণী প্রতারণা সহকারে প্রার্থী পুরুষের চিত্ত মোহিত করিয়া রাখে, সেইরূপ, এই দুষ্কুলীনা বিষয়শ্রীও প্রলোভন দ্বারা অজ্ঞ জীবের চিত্ত বিমোহিত করিয়া রাখিয়াছে। ইহা জললহরী ও দীপশিখা অপেক্ষাও ভঙ্গুর ও ইহার গতিও দুর্ব্বিজ্ঞেয়[১৭।১৮]। বিষয়শ্রী বিগ্রহাপ্রিয়ব্যক্তিরূপ করীন্দ্রকুলের বিনাশকারিণী সিংহীর সদৃশী এবং খড়্গ-ধারার ন্যায় তীক্ষ্ণা। তীক্ষ্ণতমা বিষয়শ্রীকে নিয়ত খলস্বভাবদিগকে আশ্রয় করিতে দেখা যায়[১৯]। হে মহর্ষে! আমি দেখিতেছি, পরধনাপহরণাদি নানা পাপ দ্বারা পরিবর্দ্ধিতা ও মনঃপীড়ার একমাত্র আশ্রয় অভব্যা লক্ষ্মীতে দুঃখ ব্যতীত অণুমাত্রও সুখের সম্ভাবনা নাই। মহাত্মন্! আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অলক্ষ্মী

বলপূর্ব্বক লক্ষ্মীমান্ পুরুষের লক্ষ্মীকে দূরীকৃত করিয়া উপভোগ করিতেছে অথচ সপত্নীতাড়িতা সেই দুঃশীলা লক্ষ্মী পুনর্ব্বার সেই সপত্নীভুক্ত পুরুষকে আলিঙ্গন করিতে মানবতী হইতেছে না, লজ্জাবোধও করিতেছে না[২০।২১]। এই নির্লজ্জা লক্ষ্মী যথাযথ কুকর্ম্ম ও পতনমরণাদি সাহসিককর্ম্মলভ্যা, অচির-স্থায়িনী, আশীবিষবেষ্টিতা, গর্ত্ত সমুত্থিতা অথচ পুষ্পলতিকার ন্যায় মনোরমা হইয়া নিরন্তর লোকের চিত্তবৃত্তি আকর্ষণ করিতেছে[২২]।

সাহস ব্যতীত লক্ষ্মীকে পাওয়া যায় না। পাইলেও তিনি অধিক কাল থাকেন না। যে পর্য্যন্ত থাকেন সে পর্য্যন্ত ক্ষয়াদিজনিত বিষতুল্য দুঃখ প্রদান করেন। কিছু ক্ষতি হইলেই লোকে অসহ্যযন্ত্রণা অনুভব করে। ইনি পাপ গর্ত্তে বাস করেন ও তথা হইতে আইসেন। এত দোষ আছে তথাপি ইনি অজ্ঞ লোকের প্রিয়া ও লোভনীয়া।

ত্রয়োদশ সর্গ সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশ সর্গ।

রাম পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন। বলিলেন, মুনিবর! শ্রীর ন্যায় আয়ুও অশুভাবহ। আমি সুস্পষ্ট দেখিতেছি, জীবের পরমায়ু পত্রাগ্রস্থিত শিশিরবিন্দুর ন্যায় চঞ্চল অর্থাৎ অল্পকালস্থায়ী। তথাপি অজ্ঞ জীব তাহা উন্মত্তের ন্যায় বৃথা কার্য্যে ক্ষয়িত করিয়া চলিয়া যায়। অর্থাৎ এই কুৎসিত শরীর পরিত্যাগ করে অথচ স্বার্থসাধন করিয়া যাইতে পারেনা[১]। যে মানবের মন নিরন্তর বিষয় বিষধরের সংসর্গে জর্জ্জরীভূত, যাহাদের মনে বিবেক ক্ষণকালের নিমিত্তও আরোহণ করে না, তাহাদিগের আয়ু (বেঁচে থাকা) বৃথা ও ক্লেশের হেতু[২]। কিন্তু যাঁহারা পরম জ্ঞেয় জানিয়াছেন, অসীম ও অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মে বিশ্রাম লাভ করিয়াছেন, যাঁহারা লাভালাভে ও সুখ দুঃখে সমজ্ঞান হইয়াছেন, সেই সকল মহাপুরুষ দিগের আয়ুই সুখপ্রদ[৩]। আমরা শরীরী, আমাদের এই শরীর সুখের আধার, এইরূপ নিশ্চয় থাকাতেই আমরা সংসার মেঘের অন্তরাবস্থিত ক্ষণপ্রভার ন্যায় অচিরস্থায়ী পরমায়ুকে বিশ্বাস করি ও নিবৃত্তি বা নির্ব্বাণ লাভে সমর্থ হই না[৪]। ঋষে! বায়ুর বন্ধন, আকাশের খণ্ডন, তরঙ্গমালার গ্রন্থন, এ সকল বিষয়ে বিশ্বাস বা আস্থা স্থাপন করিতে পারি; তথাপি, আয়ুর প্রতি বিশ্বাস করিতে পারি না[৫]। আয়ুঃ শরৎকালের মেঘের ন্যায়, তৈলশূন্য দীপের ন্যায় ও নদীতরঙ্গের ন্যায় লোল অর্থাৎ চপল; সুতরাং গতপ্রায় বলিলেও বলা যায়[৬]। তরঙ্গপ্রতিবিম্বিত চন্দ্র, তড়িৎপুঞ্জ, আকাশপদ্ম, এ সকলের গ্রহণ বিশ্বাস করিতে পারি, তথাপি অস্থির পরমায়ুর প্রতি বিশ্বাস করিতে পারি না[৭]। মূঢ়চেতা জনগণ অবিশ্রান্ত অলীক পরমায়ু বিস্তারের চেষ্টা করে, করিয়া অবশেষে গৃহীতগর্ভা অশ্বতরীর ন্যায় মহাদুঃখে পতিত হয়[৮]। ব্রহ্মন্! সংসারভ্রমণের বল্লীর স্বরূপ এই দেহ সৃষ্টিসমুদ্রের ফেন। সেই কারণে ইহাতে জীবিত থাকার বাসনা করি না[৯]। যাঁহার দ্বারা পরমপ্রাপ্য পুরুষার্থ পাওয়া যায়, যাহা পাইলে আর শোক করিতে হয় না, যাহা পরমা নির্বৃতির আস্পদ, ঋষি দিগের মতে তাহাই প্রকৃত জীবন[১০]। বৃক্ষগণ ও পশুপক্ষী জীবিত থাকে সত্য; পরন্তু মনন-ফল তত্ত্বজ্ঞানে যাহার মন মৃতকল্প হইয়াছে অর্থাৎ যাহার চিত্ত বা মন বাসনাবর্জ্জনপূর্ব্বক পরমাত্মায় রত হইয়াছে; সেই ব্যক্তিই যথার্থ জীবিত[১১]। যাহারা ইহ জগতে জন্ম গ্রহণ করিয়া পুনর্জ্জন্ম পরিহার

করিতে পারে, তাঁহাদিগের জন্মই জন্ম এবং তাহাদের জীবনই সার্থক জীবন। অবশিষ্ট গর্দ্দভতুল্য।. (গর্দ্দভেরা বৃথা ভার বহন করে; মূঢ় লোকেরাও বৃথা দেহ ভার বহন করে[১২] ।) ভগবন! শাস্ত্র অবিবেকীর নিকট, তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ানুরাগীর নিকট, এবং মন অসাধুচিত্ত পুরুষের নিকট মহাভার বলিয়া গণ্য হয়। কিন্তু আধ্যাত্মবিদ্ দিগের নিকট এই স্থূল দেহও ভার নহে[১৩]। আয়ু, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চেষ্টা, এ সমস্তই নির্ব্বোধ ও বৃথা আত্মাভিমানী দিগের ভারস্বরূপ সুতরাং দুঃখপ্রদ। যেমন লৌকিক ভারবাহীরা শ্রান্ত ক্লান্ত হয়, পদে পদে দুঃখ অনুভব করে, তেমনি, মূঢ় লোকেরাও ঐ সকল লইয়া পদে পদে দুঃখ প্রাপ্ত হয়[১৪]। অশান্ত পুরুষের কামনা আপদের আস্পদ, শরীর রোগের আশ্রয় এবং পরমায়ু ক্লেশের আকর[১৫]। যদ্রূপ মূষিক শ্রান্তি ত্যাগ করিয়া অনারত (নিরন্তর) ধীরে ধীরে গৃহক্ষেত্রাদি খনন করিতে থাকে এবং তাহাতে গৃহাদি ও ক্ষেত্রাদি অল্পে অল্পে জীর্ণ হইয়া পড়ে; সেইরূপ, কালও অনবরত দেহীর দেহ জীর্ণ ও পরমায়ু ক্ষীণ করিতেছে[১৬]। রোগরূপ ভীষণ ভুজঙ্গ শরীররূপ গর্ত্তে বাস করতঃ বিষতুল্য দাহ প্রদান পূর্ব্বক প্রতিমুহূর্ত্তেই আয়ুরূপ অনিল ভক্ষণ করিতেছে[১৭]। যেমন কাষ্ঠকীট (ঘুণ) জীর্ণ শীর্ণ অসার বৃক্ষের অন্তরে থাকিয়া তাহার ক্ষয় সাধন করে, তেমনি, কালও নিতান্ত তুচ্ছ অসার দেহের অন্তরে আশ্রয় লাভ করিয়া ইহাকে জীর্ণ শীর্ণ ও জর্জ্জরিত করিতেছে[১৮]। যদ্রূপ বুভুক্ষু বিড়াল ভক্ষণাভিলাষে আখুর প্রতি এক দৃষ্টে তাকাইয়া থাকে, তদ্রূপ; মৃত্যুও গ্রাস করিবার অভিপ্রায়ে আমাদিগের প্রতি অনবরত দৃষ্টিপাত করিতেছে[১৯]। যদ্রূপ বহুভুক্ পুরুষ ভক্ষিত কুৎসিতান্ন জীর্ণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ, নিতান্ত তুচ্ছা গুণগর্ব্বিণী জরানাম্নী অশক্তি বেশ্যাও পুরুষদিগকে ও তাহার আয়ুষ্কালকে জীর্ণ করিতেছে[২০]। যেমন সুজন ব্যক্তি দুর্জ্জনসংসর্গে বাস করিয়া কতিপয় দিনের মধ্যেই তাহার স্বভাব পরিজ্ঞাত হইয়া তাহাকে পরিত্যাগ করে, সেইরূপ, যৌবনও এতদ্দেহে কিঞ্চিৎ কাল বাস করিয়া পুনরপি ইহাকে ত্যাগ করিয়া থাকে[২১]। বিট অর্থাৎ লম্পট গণ যেমন সৌন্দর্য্যের অভিলাষী, তেমনি, বিনাশের সুহৃদ ও জরামরণের সহায় কৃতান্তও পুরুষের ও পুরুষায়ুর সতত অভিলাষী[২২]। মুনিবর! অধিক কি বলিব, জীবন্মুক্তপুরুষপ্রসিদ্ধ নিত্য সুখ যাহাকে সর্ব্বকালের নিমিত্ত পরিত্যাগ করিয়াছে, সেই মরণভাজন অর্থাৎ ভঙ্গুরস্বভাব আয়ু যদ্রূপ গুণবর্জ্জিত, অকিঞ্চিৎকর ও তুচ্ছ, এরূপ তুচ্ছ ও হেয় এ জগতে আর নাই[২৩]।

চতুর্দ্দশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চদশ সর্গ।

রামচন্দ্র বলিলেন, বৃথা মোহ অর্থাৎ অজ্ঞান হইতে বৃথা "অহং—আমি" এতদাত্মক অহঙ্কারের উৎপত্তি হইয়াছে এবং তাহা বৃথা পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। আমি সেই মিথ্যাময় দুরহঙ্কার শত্রু হইতে অতিশয় ভীত হইয়াছি[১]। সংসার একাকৃতি নহে, ইহার আকার অনেকবিধ। সাধ্য, সাধন, ফল, প্রবৃত্তি, এ সমস্তই সংসারের অঙ্গ। এই বহুরূপ সংসার যে দীন অপেক্ষাও দীন বিষয়-লম্পট (লোলুপ) দিগকে নিরন্তর রাগদ্বেষাদি দোষে নিক্ষিপ্ত ও লাঞ্ছনাক্রান্ত করিতে সমর্থ হইতেছে তাহা কেবল অহঙ্কারের প্রসাদাৎ[২]। অহঙ্কার হইতেই আপদের জন্ম, শারীরিক ও মানসিক বিবিধ পীড়ার ও বিবিধ দুশ্চেষ্টার উদয় হয়। অহঙ্কার স্বয়ং রোগ। আমি উহাকে রোগ বলিয়া গণ্য করি[৩]। মুনিবর! চিরকালের পরম শত্রু অহঙ্কার আশ্রয় করায় আমি ঐশ্বর্য্য উপভোগ দূরে থাকুক; পান ভোজন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছি[৪]। ব্যাধেরা যেমন বাগুরা (মৃগ ধরিবার ফাঁদ অর্থাৎ জাল) বিস্তার করতঃ মৃগ দিগকে বদ্ধ করে, সেইরূপ, অহঙ্কারদোষও এই সংসাররূপ দীর্ঘ রাত্রিতে মনোমোহন মায়াজাল বিস্তার করিয়া জীব দিগকে বদ্ধ করিতেছে[৫]। যেমন পর্ব্বত হইতে কণ্টকখচিত সুতরাং ক্লেশপ্রদ খদির বৃক্ষের উৎপত্তি হয়, তেমনি, অহঙ্কার হইতে ভয়ঙ্কর দুঃখ-পরম্পরা উৎপন্ন হইতেছে[৬]। যে অহঙ্কার শান্তিরূপ চন্দ্রের রাহু, গুণরূপ পদ্মের হিমানী ও সাম্য মেঘের শরৎকাল, আমি সেই অহঙ্কার পরিত্যাগ করিতে নিতান্ত ইচ্ছুক[৭]। আমি রাম নহি, কোন বিষয়ে আমার ইচ্ছা নাই, প্রবৃত্তিও নাই। আমি বুদ্ধের ন্যায় অথবা ইন্দ্রিয়জয়ীর ন্যায় আপনিই আপনাতে শান্ত গুণে (অচঞ্চল যোগে) অবস্থান করিতে বাসনা করি[৮]। ইতিপূর্ব্বে অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া ভোজন, হোম, দান, যে কিছু করিয়াছি সে সমস্তই অবস্তু এবং এখন দেখিতেছি, অহঙ্কারশূন্যতাই বস্তু[৯]। হে ব্রহ্মন্! যে পর্য্যন্ত "অহং=আমি" এই জ্ঞান থাকিবে সে পর্য্যন্ত আমি আপদ উপস্থিত হইলে দুঃখিত হইব। কিন্তু যখন ঐ জ্ঞান তিরোহিত হইবে তখন আমি মহাবিপদেও সুখী থাকিব। সুতরাং, অহঙ্কার অপেক্ষা অনহঙ্কারই আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর[১০]। মুনিবর! সম্প্রতি আমি তাদৃশ অহঙ্কার পরিত্যাগ করতঃ শান্ত ও উদ্বেগশূন্য

হইব, এরূপ ইচ্ছা করিয়েছি। তন্মূরস্বভাব বিষয় ভোগে নিরুদ্বেগ হইবার আশা নাই[১১]। হে ব্রহ্মন্! যে পর্য্যন্ত হৃদয়াকাশে অহঙ্কার মেঘ উদিত থাকিবে, বিষয়তৃষ্ণারূপ কুটজমঞ্জরী সেই পর্য্যন্ত বিকসিত হইতে থাকিবে[১২]। যখনই হৃদয়াকাশস্থ অহঙ্কার মেঘ তিরোহিত হইবে তখন তৃষ্ণাবিদ্যুৎ দীপশিখার ন্যায় যেই মুহূর্ত্তেই নির্ব্বাপিত হইবে। এমন নির্ব্বাপিত হইবে যে তাহার নিদর্শনও থাকিবে না[১৩]। মেঘ যেমন আস্ফালন সহকারে গভীর গর্জ্জন করে, অহঙ্কাররূপ বিন্ধ্যশৈলে মনোরূপ মত্ত মহাগজ সেইরূপ গর্জ্জন করিয়া থাকে[১৪]। এই যে দেহরূপ মহারণ্যে অহঙ্কাররূপ মত্তকেশরী নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে, এই মত্তসিংহই এই সমুদায় জগৎ বিস্তৃত করিয়াছে। (এবং পুণ্যপাপের বীজ বপন করিয়া বিশেষরূপে বৃদ্ধি করিতেছে[১৫]।) যেমন লম্পট পুরুষেরা মুক্তামালা গ্রথিত করিয়া কণ্ঠদেশে ধারণ করে সেইরূপ অহঙ্কারও আশাসূত্রে জন্মপরম্পরারূপ মুক্তামালা গ্রথিত করিয়া গলদেশে ধারণ করিতেছে[১৬]। হে মুনে! এই অহঙ্কাররূপ পরম শত্রুর দ্বারাই পুত্রমিত্রাদিরূপ অভিচারদেবতা * সৃষ্ট হইয়াছে, এবং তাহারাই বিনা তন্ত্র মন্ত্রে মনুষ্যগণকে অশেষ প্রকার ক্লেশ প্রদান করিতেছে[১৭]। আমি স্পষ্টই বুঝিতেছি, প্রবল শত্রু অহঙ্কারের মূলোচ্ছেদ হইলেই সমুদায় দুর্ব্ব্যাধি দূরীভূত হইতে পারে। অল্পে অল্পে হউক আর তীব্রবেগে হউক, হৃদয়াকাশস্থ অহঙ্কার মেঘ উপশান্ত হইলে শান্তিনাশিনী মহামোহ মিহিকা (কুজ্ঝটিকা) অন্তর্হিত হইবে। আর তাহা লক্ষ্যও হইবে না[১৮।১৯]। হে ব্রহ্মন্! আমি নিরহঙ্কার হইয়াও মূর্খতা বশতঃ শোকে অবসন্ন হইতেছি, এজন্য প্রার্থনা, আমার পক্ষে যাহা বিহিত ও হিত, আমাকে তাহাই বলুন, উপদেশ করুন[২০]। হে মহাত্মন্! সর্ব্বপ্রকার আপদের আস্পদ শান্ত্যাদিগুণবিবর্জ্জিত অহঙ্কারকে আমি আশ্রয় প্রদান করিতে ইচ্ছা করি না; অধিকন্তু ইহাকে যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করা শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিয়াছি। অতএব, যাহাতে আমি সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারি, সম্প্রতি আমাকে সেইরূপ উপদেশ করুন[২১]।

* অভিচার—তন্ত্রোক্ত ও অথর্ব্ব বেদোক্ত মারণ-কার্য্য। হোম পূজাদির দ্বারা লোকের অনিষ্ট করার নাম অভিচার।

পঞ্চদশ সর্গ সমাপ্ত।

ষোড়শ সর্গ।

রাম বলিলেন, সাধুসঙ্গ ও সৎকার্য্য এই দুই বিষয়ে নিবিষ্টচিত্ত না হইলেই চিত্ত কামাদি দোষে জর্জ্জরিত ও বায়ুপ্রবাহপ্রেরিত ময়ূরপুচ্ছের অগ্রভাগের ন্যায় প্রচলিত হইতে থাকে[১]। প্রভো! যেমন কুক্কুরগণ উদরপূরণার্থ ব্যগ্রচিত্তে দূর হইতেও দূরতর প্রদেশে ধাববান হয়, সেইরূপ, দোষদুষ্টচিত্ত ব্যক্তি বৃথা ইতস্ততঃ ধাবমান হইয়া থাকে[২]। হয়-ত তাহারা কোথাও কিছু পায়না এবং প্রচুর পাইলেও না পাওয়ার ন্যায় অতৃপ্ত থাকে। করণ্ডক * যেমন বারির দ্বারা পূর্ণ হয় না, তেমনি, তাহাদের অন্তঃকরণও পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না[৩]। হে মুনে! মন সর্ব্বপ্রকারে রিক্তস্বভাব, বিশেষতঃ দুরাশা-রজ্জুবেষ্টিত থাকায় যূথভ্রষ্ট মৃগের ন্যায় সুখলাভে বঞ্চিত থাকে[৪]। মহর্ষে! আমার মন তরঙ্গের ন্যায় তরলভাব ধারণ করিয়াছে এবং ক্ষণকালের নিমিত্তও শীর্ণতা ব্যতীত পুষ্ট ও অন্যত্র স্থির হইতেছে না[৫]। যদ্রূপ মন্থনকালে মন্দরভূধরে আহত হওয়াতে ক্ষীরসমুদ্রসলিল উচ্ছলিত হইয়া দশদিকে ধাবমান হইয়াছিল সেইরূপ আমার মনও বিষয়ানুসন্ধানদ্বারা আহত হইয়া দশ দিকে ধাবমান হইতেছে[৬]। ভোগ, লাভ ও উৎসাহ যাহার কল্লোল, যাহাতে মায়া অর্থাৎ পর বঞ্চনাদি মকররূপে বাস করিতেছে, সেই মনোময় অর্থাৎ মনোরথ নামক মহাসমুদ্রকে আমি কিছুতেই নিরোধ করিতে সমর্থ হইতেছি না[৭]। হে ব্রহ্মন্! মৃগগণ যেমন গর্ত্তপতন চিন্তা না করিয়া দূর্ব্বাঙ্কুরলোভে দ্রুতবেগে বহুদূর ধাবমান হয় সেইরূপ আমার মন নরকপাত ভয় ত্যাগ করিয়া ভোগলাভপ্রত্যাশায় বহুদূর ধাবমান হইতেছে[৮]। মহার্ণব যেমন স্বীয় চঞ্চলস্বভাব পরিত্যাগ করিতে পারে না, তেমনি, মদীয় চিন্তাসক্ত ও চঞ্চলস্বভাব মনও বিষয়চাঞ্চল্য পরিহার পূর্ব্বক প্রাপ্য পদে স্থিতি লাভ করিতেছে না। যদ্রূপ পিঞ্জরাবদ্ধ কেশরী অধীর হয় সেইরূপ অতিচপল মদীয় চিত্ত চিন্তাচঞ্চলা বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া এক স্থানে স্থিতি লাভ করিতেছে না[৯।১০]। যদ্রূপ হংস নীরমিশ্রিত ক্ষীর হইতে

---

* বাঁশের শলায় অথবা বেতের ছালে রচিত পেটেরা নামক পাত্র করণ্ডক। তাহা জল পূর্ণ করিতে গেলে পূর্ণ হয় না, ছিদ্র দিয়া পড়িয়া যায়। কিছুতেই তাহা পূর্ণ হয় না।

ক্ষীরভাগই গ্রহণ করে, সেইরূপ, আমাদের মোহাক্রান্ত মনও এই শরীর হইতে উদ্বেগশূন্য সাম্য সুখ পরিত্যাগ করিয়া কামক্রোধাদি দোষরূপ দুঃখকেই গ্রহণ করিতেছে[১১]।* হে মুনিনায়ক! মনের প্রত্যক্‌প্রবণা † বৃত্তি আছে সত্য; কিন্তু তাহা অসংখ্য দ্বৈতকল্পনা শয্যায় সুপ্তপ্রায়। তাহার তাদৃশী মোহ-নিদ্রা যে ভাঙ্গিতেছে না, তাহাতেও আমি সাতিশয় পরিতাপিত ও সমাকুল হইয়াছি[১২]। হে ব্রহ্মন্! যেমন বিহঙ্গমগণ আহারলোভে ব্যাধজালে জড়িত হয়, বদ্ধ হয়, সেইরূপ, আমিও আমার তৃষ্ণাসূত্রে রচিত চিত্তরূপ জালে জড়িত ও বদ্ধ হইয়া ক্লেশ পাইতেছি[১৩]। আমি ক্রোধরূপ ধূম ও চিন্তারূপ-শিখা বিশিষ্ট মনোরূপ হুতাশন দ্বারা নিরন্তর শুষ্ক তৃণের ন্যায় দগ্ধ হইতেছি[১৪]। হে ব্রহ্মন্! যদ্রূপ মৃত শরীর ভার্য্যানুগামী কুকুর কর্ত্তৃক ভক্ষিত হয়, তদ্রূপ, আমিও নিষ্ঠুর তৃষ্ণাভার্য্যার অনুগামী চিত্ত কর্ত্তৃক নিরন্তর জড়তা প্রাপ্ত ও ভুক্ত হইতেছি[১৫]। ব্রহ্মন্! নদীতীরস্থ বৃক্ষ যেমন তরঙ্গবেগদ্বারা বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তেমনি, আমিও তরঙ্গতুল্য চঞ্চল জড়রূপী চিত্তের দ্বারা বিনষ্ট হই-তেছি[১৬]। যদ্রূপ তৃণরাশি প্রচণ্ডবায়ুবশে দূরে নিক্ষিপ্ত ও শূন্যে প্রক্ষিপ্ত হয়, সেইরূপ, আমিও বেগবান্ অন্তঃকরণ দ্বারা তত্ত্বপথ হইতে দূরে ও নিস্তত্ত্বরূপ শূন্যে পরিক্ষিপ্ত হইতেছি[১৭]। আমি যে প্রকৃতসুখশূন্য নিকৃষ্ট যোনিতে পতিত হইব, অথবা আমার মোক্ষলাভ যে দুষ্কর হইবে, তাহাতে আর সংশয় নাই। মনু-ষ্যেরা যেমন সেতু (বাঁধ) বাঁধিয়া ক্ষুদ্র নদীর জল রুদ্ধ করিয়া রাখে, সেইরূপ, আমি প্রতিনিয়ত এই সংসারজলধি উত্তীর্ণ হইবার চেষ্টায় রত থাকিলেও কুচিত্ত আমাকে রুদ্ধ রাখিয়াছে, নিঃসৃত হইতে দিতেছে না[১৮]। যেমন রজ্জু-বদ্ধ কূপকাষ্ঠ [কূপ হইতে জল তুলিবার যন্ত্র। ইহার এক দিকে রজ্জুর দ্বারা জলকুম্ভ ও অন্য দিকে ভারার্থ একখণ্ড কাষ্ঠ বাঁধা থাকে] একবার ঊর্দ্ধে ও অন্য বার অধঃ উৎপতিত ও পতিত হয়, সেইরূপ, আমিও অসৎচিত্তরূপ রজ্জুর দ্বারা আবদ্ধ হইয়া ঊর্দ্ধাধঃ ভ্রমণ করিতেছি[১৯]। যেমন বালকবিভীষিকার্থে পরিকল্পিত বেতাল (বিকৃতাকৃতি ছবি) বালকের জ্ঞানে সত্য বলিয়া প্রতি-ভাত হয়, সেইরূপ, আমিও অজ্ঞান বশতঃ দুশ্চিত্তকে নিতান্ত দুর্জ্জয় মনে করিয়া

---

* একাত্মবিজ্ঞানই অভয় পূর্ণ ও সাম্য সুখ। সাম্য সুখই নিত্য ও নিরতিশয়। তদ্ভিন্ন যে কিছু—সমস্তই অসার ও দুঃখপ্রদ। দেহাত্মবিজ্ঞান অধিক অসার। এই শরীরে সার অসার উভয়ই বিদ্যমান আছে, পরন্তু মোহগ্রস্ত মন অসার ব্যতীত সার গ্রহণে সমর্থ হয় না।

† প্রত্যক্‌প্রবণা—আত্মাভিমুখী। বৃত্তি—ধর্ম্ম বা স্বভাব।

ব্যাকুল হইতেছি[২০]। বাল্য অপগত হইলে সে বিভীষিকা থাকে না, তাহার মিথ্যাত্ব প্রকাশ পায়, সেইরূপ, বিবেক উপস্থিত হইলেও চিত্তের মিথ্যাত্ব প্রকট হইয়া থাকে। মন বহ্নি হইতেও উষ্ণ, পর্ব্বত হইতেও দুরতিক্রমণীয় ও বজ্র হইতেও দৃঢ়। সুতরাং মনকে নিগ্রহ করা অর্থাৎ বশীভূত করা যার পর নাই দুঃসাধ্য[২১]। যদ্রূপ মাংসাশী পক্ষী মাংস দেখিবা মাত্র তত্তক্ষণার্থ ধাবিত হয়, হিতাহিত বিবেচনা করে না, সেইরূপ, মনও ইন্দ্রিয়দৃষ্ট বিষয়ে নিপতিত হয়, হিতাহিত বিচার করে না। মন বালকের বাল্যক্রীড়ার ন্যায় এ মুহূর্ত্তে এক প্রকার ও অন্য মুহূর্ত্তে অন্য প্রকার হইতেছে এবং বৃথা অবলম্বন করতঃ বৃথা কাল কর্ত্তন করিতেছে[২২]। সমুদ্র যেমন জড়স্বভাব, চঞ্চল, বিস্তীর্ণ, জন্তু-সমাকীর্ণ ও আবর্ত্তবিশিষ্ট ; তেমনি, মনও জড়, চঞ্চল, বিস্তীর্ণ, বৃত্তিরূপ জন্তু পরিপূর্ণ ও আবর্ত্তবিশিষ্ট। সমুদ্রও জনগণকে দূরে নিক্ষিপ্ত করে ; মনও আমাকে দূরে নিক্ষিপ্ত করিতেছে[২৩]। হে সাধো! বহ্নিভক্ষণ, সমুদ্রপান ও সুমেরু উন্মূলন যেরূপ দুঃসাধ্য, মনকে নিগ্রহ করা তদপেক্ষা অধিক দুঃসাধ্য[২৪]। চিত্তই দৃশ্য দর্শনের হেতু, চিত্ত থাকাতেই তদ্দৃশ্য জগত্রয় আছে। তাদৃশ চিত্ত ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে দৃশ্য জগতের দর্শন তিরোহিত হয়। হে মুনে! সেই কারণে সাধুগণ বলেন, চিত্তের চিকিৎসা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। অর্থাৎ চিত্ত ও রোগের ন্যায় অবশ্য পরিহরণীয়[২৫]। যেমন পর্ব্বত থাকিলেই তাহাতে নানাবিধ তরু উৎপন্ন হয় তেমনি চিত্ত থাকাতেই তদাশ্রয়ে নানাবিধ ও শত শত সুখ দুঃখ হইতেছে। আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছি যে, চিত্তকে বিবেকাভ্যাস দ্বারা ক্ষীণ করিতে পারিলে তখন আর সুখ দুঃখ থাকিবে না[২৬]। মুমুক্ষুগণ যাহাকে জয় করিয়া শান্ত্যাদিগুণ বশীভূত করিয়া থাকেন, আমিও সেই চিত্তরূপ প্রবল শত্রু জয় করিতে উদ্যত হইয়াছি। আমার চিত্ত এক্ষণে বিষয়শ্রীতে আসক্ত নহে। সেই কারণে আমি জড়মলিনা বিলাসিনী রাজ্যলক্ষ্মীর প্রতি আনন্দিত নহি[২৭]।

ষোড়শ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তদশ সর্গ।

রাম কহিলেন, পরমপ্রেমাস্পদ আত্মতত্ত্ব ও তৎসহচর বিবেক তৃষ্ণারূপ দুরন্ত অমা-নিশায় আবৃত হওয়ায় জীবরূপ আকাশে কেবল দোষরূপ উলুক স্ফূর্ত্তি সহকারে বিচরণ করে[১]। পঙ্ক যেমন প্রখর রবিকিরণে শুষ্কতা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ, অন্তর্দ্দাহপ্রদায়িনী চিন্তার দ্বারা আমি দিন দিন শুষ্ক হইতেছি[২]। ব্যামোহতিমিরে সমাচ্ছন্ন আমার চিত্তরূপ অরণ্যে আশারূপিনী পিশাচী নিরন্তর নৃত্য করিতেছে[৩]। বিলাপজনিত অশ্রুবারি নীহারে তৃষ্ণারূপ ক্ষেত্র স্থিত চিন্তারূপ চণক অনবরতঃ অঙ্কুরিত হইতেছে[৪]। যদ্রূপ উর্ম্মি অন্তঃপ্রচলন দ্বারা অম্বুনিধিস্থিত জলচরগণের উল্লাস উৎপাদন করে; সেইরূপ, বিষয়তৃষ্ণাও অন্তর্ভ্রমির কারণ হইয়া আমাকে কষ্টজনক বিষয়ে উল্লাসিত করিতেছে[৫]। যেমন পর্ব্বত হইতে প্রচণ্ডকল্লোলরবা তরঙ্গিণী প্রবল বেগে প্রবাহিতা হয় তেমনি বিষয়তৃষ্ণাও অসত্য বিষয়ে প্রবৃত্তি জন্মাইয়া প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছে[৬]। যেমন প্রবল বায়ু ধূলি ও তৃণরাশি উড়াইয়া স্থানান্তরে নিক্ষিপ্ত করে, যেমন তৃষ্ণা জলাভিলাষীচাতককে নানা স্থানে বৃথা ভ্রমণ করায়, তেমনি বিষয়তৃষ্ণাও আমাকে দূরে নিক্ষিপ্ত ও ইতস্ততঃ ভ্রমণ করাইতেছে[৭]। আমি যখন যখন গুণতন্ত্রী অর্থাৎ বৈরাগ্যবিবেকাদি গুণ (আলম্বন রজ্জু) আশ্রয় করি; তখন তখনই বিষয়তৃষ্ণা সেই সেই গুণকে মূষিকের ন্যায় ছেদন করিয়া দেয়[৮]। যদ্রূপ সলিলপ্রবাহমধ্যে জীর্ণ পত্র, বায়ুপ্রবাহমধ্যে শুষ্ক তৃণ ও শরৎকালের আকাশে মেঘমালা স্থৈর্য্য প্রাপ্ত হয় না, ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতে থাকে, সেইরূপ, আমিও কুতৃষ্ণা কর্ত্তৃক চিন্তাচক্রে নিপতিত হইয়া নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছি, স্থির থাকিতে পারিতেছি না[৯]। জালবদ্ধ পক্ষিগণ যেমন স্বীয় বাসস্থান গমনে অসমর্থ হয়; সেইরূপ, আমরাও নির্বুদ্ধিতা বিধায় বিষয়তৃষ্ণার দ্বারা বদ্ধ হইয়া আত্মপদে (ব্রহ্মপদে) গমন করিতে পারিতেছি না[১০]। হে তাত! আমি বিষয়বাসনারূপ অগ্নিশিখায় এরূপ প্রজ্বলিত হইতেছি যে দাহোপশমনকারী অমৃত লেপন করিলেও তাহার শান্তি হয় কি না সন্দেহ[১১]। মহর্ষে! বিষয়তৃষ্ণারূপ উন্মত্ত তুরঙ্গমী জীবগণকে লইয়া পুনঃ পুনঃ বহুদূরে ও দিগ্‌দিগন্তে বৃথা ধাবমানা হইতেছে[১২]। কূপ

হইতে জলোত্তোলনকারী ঘট যেমন রজ্জুর দ্বারা আবদ্ধ থাকিয়া নিয়তই ঊর্দ্ধাধঃ গমন করিতে থাকে, রজ্জুপরিচ্যুত বা বন্ধনবিমুক্ত হইয়া স্থিতি লাভ করিতে পারে না, সেইরূপ, জীবও তৃষ্ণা রজ্জুতে আবদ্ধ হইয়া নিয়তঃই ঊর্দ্ধাধঃ ভ্রমণ করিতেছে অর্থাৎ স্বর্গ নরকাদি স্থানে গমনাগমন করিতেছে; তাহা হইতে পরিমুক্ত হইতে পারিতেছে না[১৩]। মানব দুশ্ছেদ্য বিষয়তৃষ্ণায় আবদ্ধ হইয়া রজ্জুবদ্ধ বহনশীল বলীবর্দ্দের ন্যায় অনবরত বা অবিশ্রান্ত বৃথা ভার বহন করিতেছে[১৪]। যথা কিরাতপত্নী পক্ষিগণকে আবদ্ধ করিবার নিমিত্ত জাল বিস্তার করিয়া রাখে, তথা বিষয়াশাও জীবগণকে বদ্ধ করিবার আশয়ে পুত্র কলত্রাদি রূপ মহাজাল বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে[১৫]। হে মুনিশার্দ্দূল! যদিও আমি ধীর তথাপি তৃষ্ণাস্বরূপ কৃষ্ণপক্ষীয় তামসী রজনী আমাকে ভীত করিয়াছে। যদিও আমি চক্ষুষ্মান্ তথাপি তৃষ্ণা আমাকে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। যদিও আমি আনন্দময়, তথাপি তৃষ্ণা আমাকে সর্ব্বদাই খেদযুক্ত করিতেছে[১৬]। কালভুজঙ্গিনী যেমন কুটিলা, স্পর্শকোমলা, এবং দংশন দ্বারা প্রাণবিনাশকারিণী; বিষয়তৃষ্ণা ঠিক্ সেইরূপ। তৃষ্ণার গতি অত্যন্ত কুটিলা ও ঐশ্বর্য্যসুখনিবন্ধন স্পর্শকোমলা; কিন্তু পরিণামে বিষজ্বালাপ্রদায়িনী। ইহাকে স্পর্শ করিলে অব্যাহতি নাই; স্পর্শমাত্রেই এ স্প্রষ্টার প্রাণবিনাশকারিণী হয়[১৭]। বিষয়তৃষ্ণা জীবের মায়ারূপ রোগের উৎপত্তিস্থান, দুর্ভাগ্যরূপ দীনতার আকর ও পুরুষগণের হৃদয়ভেদকারিণী। যেমন ভগ্নতুম্বী বীণার তন্ত্রী হইতে মনোহর ধ্বনি উৎপন্ন হয় না; তেমনি, সুষুম্নাদি-তার-ত্রয়-সংযুক্ত জীবরূপ বীণাও আনন্দলাভে সমর্থ হয় না[১৮।১৯]। পর্ব্বতগুহা হইতে উৎপন্না সুদীর্ঘা ঘনরসযুক্তা রবিকিরণস্পর্শমলিনা উন্মাদদায়িনী বিষলতা যেমন পরিণামে দুঃখদায়িনী, বিষয়তৃষ্ণাও সেইরূপ দুঃখদায়িনী[২০]। তৃষ্ণাবৃক্ষের অগ্রভাগস্থিত পুষ্পফলশূন্য ব্যর্থ সমুন্নত ক্ষীণ মঞ্জরী অমঙ্গলকারিণী লতার অনুরূপা। ইহার দ্বারা কষ্ট ব্যতীত সুখ নাই, অপকার ব্যতীত উপকার নাই[২১]। যথা অবশীকৃতচিত্তা বৃদ্ধা বারবনিতা পুরুষবশীকরণার্থ ধাবমানা হয় কিন্তু ফল প্রাপ্ত হয় না; তথা, বিষয়তৃষ্ণাও জীবকে অনর্থ ভ্রমণ করায়, পুরুষার্থ ফল প্রদান করে না[২২]। যথা রঙ্গভূমিস্থা বৃদ্ধা গণিকা শৃঙ্গার, বীর ও করুণাদি রস উদ্ভাবন পূর্ব্বক নৃত্য করে, তথা বিষয়তৃষ্ণাও শোকমোহাদি নানাপ্রকার রস উদ্ভাবন করতঃ বিষয়রস সমাকুল সংসার মধ্যে নৃত্য করিতেছে[২৩]। মহর্ষে! এই সংসার বিস্তীর্ণ কাননের অনুরূপ। এক মাত্র তৃষ্ণাই এই কাননের সুদীর্ঘ বিষলতা,

জরা মরণাদি তাহার প্রস্ফুটিত কুসুম, এবং বিবিধ উৎপাতপরম্পরা তাহার ফল[২৪]। যেমন বর্ষীয়সী জীর্ণা নর্ত্তকী অসমর্থা হইলেও জনগণের মনোরঞ্জনার্থ নর্ত্তন কার্য্যে প্রবৃত্তা হয়, দুর্ব্বলা সুতরাং অন্তরানন্দশূন্যা বিষয়তৃষ্ণাও সেইরূপ জনবিমোহনার্থ সংসাররূপ রঙ্গভূমে নৃত্য করিতেছে[২৫]। অতি চপলা চিন্তা ময়ূরী বর্ষাকালীন মেঘাচ্ছন্ন দিবসের ন্যায় মোহাবরণ কালে হর্ষোৎফুল্লা হইয়া নৃত্য করে। মোহকালে নৃত্য করে সত্য; কিন্তু বৈরাগ্যরূপ শরৎ আগত হইলে সে আর নৃত্য করে না, উৎসাহবিহীনা হইয়া নর্ত্তন কার্য্যে নিরস্তা হয়[২৬]। যে প্রকার চিরশুষ্কা নদী বর্ষাকালে কতিপয় দিবসের জন্য উল্লসিতা হয় অর্থাৎ অসার তরঙ্গকল্লোলপরম্পরা বিস্তার করে, সেই প্রকার, চিরকাল শূন্যগর্ত্ত অসার বিষয়তৃষ্ণাও স্বল্পকালের নিমিত্ত বিফল আনন্দকোলাহলে প্রস্ফুরিত হইয়া থাকে[২৭]। যদ্রূপ পক্ষী ফলহীন বৃক্ষ পরিত্যাগ করিয়া ফলশালী বৃক্ষান্তর আশ্রয় করে, তদ্রূপ, বিষয়তৃষ্ণাও দ্রব্যবিহীন পুরুষ পরিত্যাগ করিয়া পুরুষান্তর আশ্রয় করিয়া থাকে[২৮]। তৃষ্ণা বানরী অপেক্ষাও চঞ্চলা। সে ফলপ্রত্যাশায় দুর্লঙ্ঘ্য স্থানেও পদসঞ্চালন করে এবং তৃপ্ত থাকিলেও স্বভাব বশতঃ পুনঃ পুনঃ ফলান্তরের আকাঙ্ক্ষা করে। অপিচ সে কোনও প্রকারে দীর্ঘকাল এক স্থানে থাকিতে পারে না। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, তৃষ্ণাও ভোগ বাসনায় অগম্য গমনে কুণ্ঠিত নহে, পুনঃ পুনঃ বিষয়ান্তরের আকাঙ্ক্ষা করিতেও লজ্জিতা নহে এবং এক লইয়া স্থির থাকিতে পারে না[২৯]। "এই কর্ম্ম শুভজনক" এইরূপ নিশ্চয় করিয়া মানবগণ তাহার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয় এবং পরে অশুভ বলিয়া বোধ হইলেও দুর্দ্দৈব বশতঃ তাহা পরিত্যাগ করিতে পারে না। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, বিষয়তৃষ্ণাও অসৎকর্ম্মে সৎকর্ম্ম জ্ঞান আরোপ করিয়া পরিধাবিতা হয়। অনন্তর তাহা অসৎ বলিয়া প্রতীত হইলেও তদনুষ্ঠানে নিবৃত্তা হয় না। প্রত্যুত তাহাতেই যত্নাতিশয় প্রকাশ করে[৩০]। ঋষে! তৃষ্ণা হৃদয়রূপ পদ্মের ভ্রমরী। তৃষ্ণারূপিণী ভ্রমরী কখন পাতালে কখন নভঃস্থলে, কখন বা দিক্‌কুঞ্জে অবিশ্রান্ত ভ্রমণ করিতেছে[৩১]। সংসারে যত প্রকার দোষ আছে সে সকলের মধ্যে তৃষ্ণা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুঃখদায়িনী। তৃষ্ণা অন্তঃপুরস্থ ব্যক্তিদিগকেও বড়িশবৎ সবেগে আকর্ষণ করে, করিয়া মহাসঙ্কটে নিপাতিত করে[৩২]। মেঘোদয়ে বারিবর্ষণ ও দুর্দ্দিন হয়; সূর্য্যের আলোক অবরুদ্ধ হয়, শরীর ও মন জড়ভাবাপন্ন হয়। বিষয়বাসনারূপ তৃষ্ণার উদয় হইলেও ঐ সকল হইয়া থাকে। হৃদয়াকাশে

তৃষ্ণার উদয় হইলে জ্ঞানালোক অবরুদ্ধ, বুদ্ধি জড়ীভূতা, ও মোহ-দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়া থাকে[৩৩]। উহা বিচিত্র মনোবৃত্তিগ্রথিত মালার স্বরূপ অথচ উহাই সংসারব্যবহারী জীবের বন্ধন-রজ্জু। পশু যদ্রূপ রজ্জু বদ্ধ হইয়া স্বেচ্ছা-পূর্ব্বক বিচরণ করিতে অপারক হয়, সেইরূপ, মনুষ্যেরাও আশাপাশে বদ্ধ হইয়া স্বাধীনতা বিহীন হইয়া আছে[৩৪]। যদ্রূপ ইন্দ্রধনু * দেখিতে বিচিত্রবর্ণ, কিন্তু গুণবিহীন, (গুণ=জ্যা) দীর্ঘ ও শূন্যগর্ত্ত, সেইরূপ, বিষয়তৃষ্ণাও বিষয়-স্পর্শে বিচিত্রবর্ণ, নানারূপে রঞ্জিত, অসদ্‌গুণ, পুরুষমেঘে অবস্থিত, শূন্যগর্ত্ত অর্থাৎ অবস্তু। ইহার উদয় স্থান হৃদয়াকাশ, অথচ ইহা অলীক কল্পনা মাত্র[৩৫]। এবম্বিধা বিষয়বাসনা সদ্‌গুণ শস্যের অশনি, আপদ তৃণের শরৎকাল, জ্ঞান সরোজের হিমানী, তমোবৃদ্ধিবিষয়ে হেমন্ত কালের দীর্ঘা রজনী[৩৬], সংসার নাটকের নটী, কার্য্যপ্রবৃত্তিরূপ নীড়ের পক্ষিণী, মনোরথরূপ অরণ্যের হরিণী, কামরূপ সঙ্গীতের বীণা[৩৭], ব্যবহাররূপ সমুদ্রের লহরী, মোহ মাতঙ্গের শৃঙ্খল, সৃষ্টিরূপ বটবৃক্ষের প্ররোহ (নামূনা) ও দুঃখরূপ কৈরবের চন্দ্রিকা[৩৮]। এই নিত্যোন্মাদপরায়ণা বিলাসশালিনী বিষয়তৃষ্ণা মানবের আধি, ব্যাধি, জরা এবং মরণ প্রভৃতির পেটিকা (পেটরা)[৩৯]। ঈদৃশী তৃষ্ণা ব্যোমবীথির † সহিত তুলিতা হইতে পারে। কেননা ইহা কখন প্রকাশ, কখন অন্ধকারময় অর্থাৎ কখন নির্ম্মল কখন মেঘাচ্ছন্নের ন্যায় এবং কখন বা নীহারগুণ্ঠিতের ‡ ন্যায় প্রতীয়মানা হয়[৪০]। যেমন কৃষ্ণ পক্ষীয় মেঘাচ্ছন্ন রজনী ক্ষীণা হইলে রাত্রিঞ্চর দিগের সঞ্চার নিবৃত্ত হয়, সেরূপ, জীবের বিষয়তৃষ্ণার শান্তি হইলে সকল প্রকার দুঃখের শান্তি হয়[৪১]। যখন এই সকল লোক চিন্তা অর্থাৎ বিষয়-বাসনা পরিত্যাগ করিতে পারিবে তখনই ইহারা সর্ব্বদুঃখ পরিহারে সমর্থ হইবে। চিন্তা ত্যাগ ব্যতীত তৃষ্ণাবিসূচিকা রোগের অন্য ঔষধ নাই[৪২]।[৪৩] যাবৎ বিষ-বিসূচিকা-সদৃশী তৃষ্ণার পরিত্যাগ বা পরিক্ষয় না হয় তাবৎ এই সমুদয় লোক মুগ্ধ, মুক ও ব্যাকুল অবস্থায় অবস্থান করে। যেরূপ জলাশয়স্থ মৎস্য অন্তিম কাল উপস্থিত হইলে উপাদেয় ভক্ষ্য জ্ঞানে আমিষাবৃত বড়িশ আহার করিয়া ক্ষণকালের নিমিত্ত আনন্দিত হয়, সেইরূপ, তৃষ্ণাক্রান্ত মনুষ্যে-রাও তৃণ পাষাণ কাষ্ঠাদি দ্রব্য লাভ করিয়া ক্ষণকালের নিমিত্ত আশাস্ফূর্ত্তি অনুভব করে[৪৪]। যদ্রূপ সূর্য্যকিরণ জলমগ্ন পদ্মকে উর্দ্ধে নীত, বিকসিত

---

* ইন্দ্রধনু=শক্রধনু। ইহার ভাষা নাম রামধনু। † ব্যোমবীথি=আকাশপ্রসর।
‡ নীহারগুণ্ঠিত=কোয়াষায় ঢাকা।

ও সকলের নিকট প্রকাশিত করে, সেইরূপ, পীড়াময়ী অঙ্গনারূপা বিষয়তৃষ্ণাও গম্ভীর পুরুষকেও গাম্ভীর্য্যশূন্য করিয়া সকলের নিকট লঘুচেতারূপে প্রকাশিত করিয়া থাকে[৪৫]। তৃষ্ণা বেণুলতার ন্যায় অন্তঃসারশূন্যা, গ্রন্থিযুক্তা, দীর্ঘা, অঙ্কুরকণ্টকময়ী অথচ মণিমুক্তালাভের প্রত্যাশা স্থান[৪৬]। কিন্তু মহর্ষে! আশ্চর্য্য এই যে, ঈদৃশী দুশ্ছেদ্যা বিষয়তৃষ্ণাকে ধীসম্পন্ন মহানুভব ব্যক্তিরা বিবেক খড়্গের দ্বারা অনায়াসে ছেদন করিয়া থাকেন[৪৭]। হে ব্রহ্মন্! জীবের হৃদয়স্থিত বিষয়তৃষ্ণা যদ্রূপ সুতীক্ষ্ণা, শাণিত অসির ধার, বজ্রাগ্নি বা প্রতপ্ত অয়ঃকণ (অস্ত্রবিশেষ) * সেরূপ সুতীক্ষ্ণ নহে[৪৮]। যেমন দীপশিখা দেখিতে উজ্জ্বল, অসিতবর্ণতীক্ষ্ণাগ্র, স্নেহবিশিষ্ট, দীর্ঘদশাযুক্ত, প্রকাশমান ও দুস্পর্শ; বিষয়তৃষ্ণা ঠিক্ সেইরূপ[৪৯]। হে মহর্ষে! একমাত্র বিষয়তৃষ্ণাই সুমেরুসদৃশ গাম্ভীর্য্যশালী প্রাজ্ঞ, শূর ও স্থিরপ্রতিজ্ঞ নরোত্তমকে ক্ষণমধ্যে তৃণের ন্যায় লঘু করিয়া থাকে[৫০]। বিষয়পিপাসারূপিণী তৃষ্ণা রজোগুণপ্রচুরা আশা-রজ্জুর দ্বারা নির্ম্মিতা ও ধুলিপটলসঙ্কুলা অন্ধকারময়ী বিন্ধ্যাটবীর ন্যায় যার পর নাই বিস্তীর্ণা, গহনা ও ভয়ঙ্করী[৫১]। এই তৃষ্ণা অদ্বিতীয় হইয়াও সকল ভুবনের অন্তরালে লক্ষিত হইতেছে; এবং শরীরে থাকিলেও সহজে দর্শনের বিষয়ীভূত হইতেছে না। ফলতঃ চঞ্চলতরঙ্গসঙ্কুল ক্ষীরোদসলিলে যেরূপ মাধুর্য্যশক্তি সর্ব্বদা বিরাজমান থাকে, এই তৃষ্ণাও সেইরূপ সমুদায় জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে[৫২]।

* অয়ঃকণপ এক্ষণে বন্দুখ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। অয়ঃকণ গুলি নামে প্রসিদ্ধ। শুক্র-নীতি ও মহাভারত গ্রন্থের বর্ণনা দেখিলে অয়ঃকণ গুলি ও অয়ঃকণপ বন্দুখ ব্যতীত অন্য কিছু হয় না।

সপ্তদশ সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টাদশ সর্গ।

রামচন্দ্র পুনর্ব্বার বলিলেন, মহর্ষে! এই যে জীবদেহ প্রকাশ পাইতেছে ইহা কেবল কতকগুলি আর্দ্রনাড়ীর দ্বারা বিরচিত। অর্থাৎ মল, মূত্র, রেত ও রক্তাদি রক্ষিত শিরাসমূহে পরিব্যাপ্ত। বিবিধ বিকারবিশিষ্ট ও পতনশীল এই জীবদেহ কেবল দুঃখ ভোগেরই কারণ বলিয়া প্রকাশ পাইতেছে[১]। যুক্তিপথ অবলম্বন করিলে স্পষ্টই বুঝা যায়, এই জীবদেহ দ্বিরূপী। ইহা অজ্ঞ হইয়াও অভিজ্ঞের ন্যায়, অভব্য হইয়াও ভব্যের ন্যায়। ইহা জড় নহে ও চেতনও নহে[২]। * সুতরাং যাহারা সাধু তাহারা ইহার সাহায্যে মুক্তিলাভ করেন এবং অসাধুগণ নিরয়গামী হন। ইহার দ্বারা যে আপনার চিদ্রূপতা পরিজ্ঞাত হওয়া যায় তাহাই ইহার অজ্ঞতার বৈপরীত্য[৩]। † দেখুন, এই দেহে অল্পেই আনন্দ ও অল্পেই খেদ উপস্থিত হয়। সুতরাং ইহার সদৃশ গুণহীন, নিকৃষ্ট ও শোকস্থান আর কি আছে[৪]? এই দেহ বৃক্ষের অনুরূপ। ভুজদ্বয় ইহার শাখা, অংসদেশ স্কন্ধ, চক্ষুর্দ্বয় কোটর, মস্তক বৃহৎফল, হস্তপদ পল্লব, রোগাদি লতাস্থানীয় এবং ইহা কর্ণরূপ দন্তরস ‡ পক্ষীর চঞ্চুপ্রহারে জর্জ্জরিত। ইহাতে বুদ্ধি ও জীব এই দুই পক্ষী নিয়ত বাস করিতেছে। ইহা গুল্মবান্ ও কার্য্য-সংঘাত (দেহপক্ষে গুল্ম রোগবিশেষ, তদ্বিশিষ্ট।) বৃক্ষকে যেমন ছিন্নভিন্ন করিতে পারা যায়, তেমনি, শাস্ত্ররূপ কুঠারে ইহাকেও ছিন্নভিন্ন করা যায়। ইহা দন্তরূপ কেশরশালী ও হাস্যরূপ কুসুমে পরিশোভিত। এ বৃক্ষের শোভা

---

* এই চিজ্জড় সংযুক্ত দেহের দেহ ভাগ অজ্ঞ অর্থাৎ জড়। ইহার জ্ঞাতা আত্মা। তিনি অভিজ্ঞ। অভিজ্ঞের সংযোগে এই অনভিজ্ঞ অভিজ্ঞের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে। ইহারই সাহায্যে মুক্তিপদ পাওয়া যায়; সুতরাং ইহা অভব্য অর্থাৎ অমঙ্গলময় হইলেও ভব্য। সেই কারণে ইহা অন্যান্য জড় হইতে বিলক্ষণ এবং শুদ্ধ চেতন আত্মার অন্যথাভাব।

† যাহারা ইহার তথ্য নির্ণয়ে অসমর্থ তাহারাই অসাধু। অসাধু, অবিবেকী ও মূঢ়, সমান কথা। মূঢ়েরাই এই দেহে আত্মভাব স্থাপন করিয়া মোহ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ সংসার গতি প্রাপ্ত হয়। পরন্ত যাঁহারা আত্মায় আত্মদর্শী তাঁহারাই ইহার সাহায্যে মুক্তি লাভ করেন।

‡ দন্তরস = কাঠঠোকরা নামক পক্ষী। কাঠঠোকরারা চঞ্চু প্রহারে বৃক্ষের গাত্র ছিদ্রিত ও কুট্টিত করে। কর্ণদ্বয়ও নিরন্তর কটূক্ত্যাদি বাক্য শ্রবণে ইহাকে জর্জ্জরিত করিতেছে।

অতি অল্পকালস্থায়ী। এই দেহবৃক্ষ কান্তিরূপছায়াবিশিষ্ট এবং ইহা জীবরূপ পথিকের বিশ্রামস্থান। ইহার সহিত জীবের কোনরূপ বাস্তব সম্বন্ধ নাই। সুতরাং ইহা কাহার আত্মীয় নহে। ইহার প্রতি আস্থাই বা কি! অনাস্থাই বা কি।৮। হে তাত! সংসাররূপ মহাসমুদ্রে সন্তরণ করিবার জন্য এই দেহলতা বা দেহনৌকা পুনঃ পুনঃ আশ্রয় করা যাইতেছে অথচ ইহাতে কাহার আত্মবুদ্ধি হইতেছে না। (আত্মতত্ত্ব জ্ঞান ব্যতীত সংসার সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়া যায় না; পরন্তু তাহা হইতেছে না৯।) হে মুনিবর! বহুগর্ত্তসমাকুল তনুরুহ রূপ অসংখ্য তরুরাজি বিরাজিত দেহরূপ বিজন বনে বাস করিতে কাহার বিশ্বাস হয়? কে নিঃশঙ্কে বাস করিতে পারে১০? এই অসার সচ্ছিদ্র মাংসাদিনির্ম্মিত বাদ্যবিহীন পটহের (পটহ=ঢাক) অভ্যন্তরে আমি বিড়ালের ন্যায় বাস করিতেছি১১। সংসাররূপ নিবিড় অরণ্যে চিন্তামঞ্জরী-বিশিষ্ট ও দুঃখঘুণক্ষত এই দেহ নামক জীর্ণ বৃক্ষে চিত্তরূপ চপল মর্কট আরূঢ় আছে১২। মহর্ষে! এই দেহপ্লক্ষ (প্লক্ষ=পাকুড় গাছ) আমাকে ক্ষণ-কালের নিমিত্তও সুখী করিতেছে না। ইহাতে তৃষ্ণাবিষধরী নিয়ত বাস করি-তেছে ও ইহা ক্রোধরূপ বায়সের নিত্য আলয়। ইহা কেবল হাস্যরূপ প্রস্ফুটিত কুসুমে শোভমান। ইহাতে শুভ অশুভ এই দুইটি ফল অনবরত উৎপন্ন হইতেছে। স্কন্ধশাখাসমন্বিত এই দেহবৃক্ষ প্রাণবায়ু কর্তৃক নিরন্তর আলোড়িত হইতেছে। উন্নতজানুদ্বয় ইহার স্তম্ভ, ইন্দ্রিয় বিহঙ্গমগণ ইহাতে বসতি করে, ও ইহার যৌবনরূপ শীতল ছায়ায় কন্দর্পনামক পথিক বিশ্রাম করিয়া থাকে। এই বৃক্ষের উপরিভাগে শিরোরুহরূপ তৃণরাশি উৎপন্ন হইয়াছে এবং ইহাতে অহঙ্কাররূপ গৃধ্র কুলায় নির্ম্মাণ করতঃ বসতি ও কঠোরধ্বনি করিতেছে। ইহার অভ্যন্তরভাগ ছিদ্রযুক্ত (ধোঁড় বা খোঁড় পড়া*।) অথচ ইহা দুরুচ্ছেদ্য। বাসনা এই বৃক্ষের মূল ও ইহা সর্ব্বতোভাবে ব্যায়ামবিরস। অর্থাৎ শ্রমরূপ কাণ্ড পত্রাদির দীর্ঘতায় রুক্ষ ও সুখবিহীন। সেইজন্য আমি এই দেহ বৃক্ষে কিছুমাত্র সুখ অনুভব করিতে পারিতেছি না১৩।১৭। হে মুনি-সত্তম! এই কলেবর অহঙ্কার গৃহস্থের মহাগৃহ। ইহা ভূমি পতিত হউক বা না হউক, ভগ্ন হউক অথবা স্থির থাকুক, আমার কিছুমাত্র ক্ষতি নাই১৮। অহঙ্কারস্বামিক এই গৃহে ইন্দ্রিয়রূপ পশু সকল নিরুদ্ধ রহিয়াছে। বিষয়-বাসনা ইহার গৃহিণী এবং ইহা কামাদিরাগরঞ্জিত হওয়ায় শোভমান। সেজন্য এ

* গাছের মাইজ পচিয়া গেলে ধোঁড় বা খোঁড় বলে।

গৃহ আমার ইষ্ট নহে[১৯]। এই গৃহের পৃষ্ঠাস্থিরূপ কাষ্ঠ শূন্যগর্ত্ত সুতরাং অসার। এই গৃহ নাড়ীরূপ রজ্জুতে আবদ্ধ ও রসরক্তাদিরূপসলিলকৃত কর্দ্দমে প্রলিপ্ত। এ গৃহ আমার অনিষ্ট বৈ ইষ্ট নহে[২০]। অস্থি সকল ইহার স্তম্ভ এবং ইহাতে বাহুরূপ দীর্ঘকাষ্ঠ দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ আছে। ইহা পরিণামে শুক্লবর্ণ (কেশ লোমাদি পক্ক শাদা) হয়। চিত্ত ইহার ভৃত্য, বিবিধ কার্য্যচেষ্টা ইহার অবলম্বন, মিথ্যা ও মোহ ইহার স্থূলতা এবং মূর্খতা ইহার মনোহর শয্যা। তাহাতে দুঃখ-রূপ বালক সমূহ নিরন্তর রোদন করিতেছে ও দুশ্চেষ্টারূপ দগ্ধাস্যদাসী (পোড়ামুখী) ইহাতে সর্ব্বদা অবস্থান করিতেছে। সুতরাং এই অকিঞ্চিৎকর তুচ্ছ গৃহ আমার নহে ও আমার ইষ্টও নহে[২১।২৩]। আরও দেখুন, এই দেহ-গৃহটী নিরবচ্ছিন্ন বিষয়মলে পরিপূর্ণ ও ইহা অজ্ঞানাদি ক্ষারে জর্জ্জরিত। এ গৃহ কিরূপে আমার অভীপ্সিত হইতে পারে[২৪] যাহাকে গুল্‌ফ বলে তাহাই এই গৃহের জঙ্ঘারূপ স্তম্ভের আধার কাষ্ঠ। জানু তদুপরি প্রতিষ্ঠিত। মস্তকও স্বীয় আধারে অবস্থিত। দীর্ঘাকার দুই বাহু ও উরু এই গৃহের সংযোজক কাষ্ঠ (আড়া)। মূল শিথিল হইলে ইহার সমুদায়ই শিথিল হয়[২৫]। এ গৃহে ইন্দ্রিয়-রূপ পুত্র ও চিন্তারূপিণী দুহিতা ক্রীড়া করিতেছে। এ ক্রীড়া গৃহ আমার ইষ্ট নহে[২৬]। মস্তক যাহার শিরোগৃহ (চিলের ঘর), যে শিরোগৃহ কেশরূপ ছাদে আচ্ছাদিত, কুণ্ডল পরিশোভিত কর্ণশোভায় শোভিত ও অঙ্গুলিশ্রেণী যে গৃহের কাষ্ঠচিত্রিকা, সে গৃহ কি প্রকারে ইষ্ট হইতে পারে[২৭]? দেহগৃহের সর্ব্বাবয়ব লোমরাজিরূপ যবাঙ্কুরে আচ্ছাদিত এবং এ গৃহের অভ্যন্তর ছিদ্র উদর। ইহাতে নখ লূতাতন্তুসদৃশ। এতদ্‌গৃহপালিতা ক্ষুধাসরমা (শূনী, কুক্কুরী) ইহাতে অনবরত চীৎকার করিতেছে। ইন্দ্রিয়দ্বার সকল এই গৃহের গবাক্ষ। শ্বাস প্রশ্বাস বায়ু এই গৃহে অনবরত প্রবিষ্ট হইতেছে। মুখ এই গৃহের প্রধান দ্বার, দন্ত ঐ দ্বারের কপাট, জিহ্বা তাহার কিল (খিল বা হুড়কা।) সুচিকণ চর্ম্ম এ গৃহের সুধালেপ; তদ্দ্বারা ইহা মসৃণ। সন্ধি সকল এই গৃহের যন্ত্র। মনো-রূপ মূষিক এই গৃহের ভিত্তি খনন ও ছিদ্রিত করিতেছে। কি কারণে আমি এই অভব্য গৃহ ইচ্ছা করিতে পারি[২৮।৩২]? কখন ইহা হাস্যরূপ দীপালোকে উদ্ভাসিত কখন বা অজ্ঞানতারূপ গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইতেছে। ইহা সর্ব্ব-প্রকার রোগের ও বিবিধ মনঃপীড়ার আধার ও জরার আবাসস্থলী। হে মহাত্মন্! এ প্রকার দেহ গৃহে আমার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই[৩৩।৩৪]। মহর্ষে! ঘোরতমসাচ্ছন্ন অন্তঃসারশূন্য কোটরবিশিষ্ট দিকস্বরূপ লতাবিতানে অবরুদ্ধ

এই দেহমহাটবী, ইহাতে ইন্দ্রিয়রূপ ভয়ঙ্কর ভল্লুক বিভীষিকা প্রদর্শন করতঃ বিচরণ করিতেছে। এ অটবীতে আমার কিছুমাত্র ইষ্ট নাই[৩৫]। মুনিবর! যেমন পঙ্কনিমগ্ন হস্তীকে বলহীন অন্য হস্তী উদ্ধার করিতে সমর্থ হয় না, তেমনি, আমিও এই দেহালয়কে ধারণ করিতে সমর্থ হইতেছি না[৩৬]। কি শ্রী, কি রাজ্য, কি দেহ, কি শারীরিক বা মানসিক চেষ্টা, আমার কিছুতেই প্রয়োজন নাই। কারণ, ভয়ঙ্কর সর্ব্বঙ্কষ কাল (যে সব গ্রাস করে) কতিপয় দিনের পরে এ সমস্তই গ্রাস করিবে[৩৭]। হে মুনীশ্বর! এই মাংস-শোণিতময় দেহের বাহ্য ও অভ্যন্তর ভাবিয়া দেখুন, মরণধর্ম্ম ব্যতীত অন্য কিছু ইহাতে নাই এবং ভ্রম ব্যতীত প্রকৃত রমণীয়তা নাই[৩৮]। এই দেহ জীব-কর্ত্তৃক পরিপালিত ও পরিবর্দ্ধিত কিন্তু মৃত্যুকালে ইহা জীবের অনুগামী হয় না। অতএব হে তাত! কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এই কৃতঘ্ন দেহের প্রতি আস্থা রাখিতে পারে[৩৯]? এই দেহ মত্ত হস্তীর কর্ণাগ্রভাগের ন্যায় নিতান্ত অস্থির ও লম্বমান জলকণার ন্যায় পতনশীল। সুতরাং ইহা আমাকে পরিত্যাগ করিবেই করিবে। পরন্তু এ আমাকে পরিত্যাগ করিতে না করিতে আমি ইহাকে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিতেছি[৪০]। বায়ুবেগসঞ্চালিত পল্লবের ন্যায় চলন-শীল এই দেহ দিন দিন আধিব্যাধির দ্বারা জর্জ্জরিত হইতেছে। এই কটু-নীরস দেহে আমার কিছুমাত্র উপকার নাই[৪১]। চিরকাল পানভোজন করি-লেও ইহা নব পল্লবের ন্যায় কোমলা ও অবশেষে কৃশতা প্রাপ্ত হইয়া বিনা-শের অনুগামী হয়[৪২]। এই দেহে বার বার কতবার সুখ দুঃখ অনুভব করা হইয়াছে তথাপি এ অধমের লজ্জা নাই[৪৩]। এ যখন চিরকাল প্রভুত্বসহকারে বিপুল ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়াও উৎকর্ষ বা স্থিরতা লাভ করিতে সমর্থ হইল না, তখন ইহার পরিপালনে বা পরিরক্ষণে ফল কি[৪৪]? ইহা জরাকালে জরাপ্রাপ্ত ও মৃত্যুকালে মৃত্যুগ্রস্ত হইবেই হইবে। এ নিয়ম ভোগীর ও দরিদ্রের সমান। তাহাতে কোনরূপ ইতর বিশেষ নাই। কিন্তু তাহা এ অধম (এই অজ্ঞ দেহ) জ্ঞাত নহে[৪৫]। এই দেহ মূক কচ্ছপের ন্যায় সংসাররূপ সমুদ্রের কুক্ষিমধ্যে তৃষ্ণারূপ গহ্বরে চিরপ্রসুপ্ত রহিয়াছে অথচ এ আপনার উদ্ধারসাধনের চেষ্টা করিতেছে না[৪৬]। এই তরঙ্গায়মান সংসার সমুদ্রে শত শত দহনযোগ্য দেহকাষ্ঠ ভাসমান হইতেছে সত্য; পরন্তু ধীমান্ ব্যক্তি সে সকলের মধ্যে কোন কোন দেহকে "নর" বলিয়া জানেন। (যে দেহ জ্ঞানাগ্নির দ্বারা দগ্ধ করিতে পারা যায় সেই দেহই নরদেহ[৪৭]।) চিরদুরাত্মতা যাহার বেষ্টন

(লতায় জড়ান), অধোগতি যাহার পতনশীল ফল, তাহাতে বিবেকীর প্রয়োজন কি[৬]? ইহা পঙ্কনিমগ্ন ভেকের ন্যায় ঐশ্বর্য্যভোগে একান্ত নিমগ্ন হইয়া জরাগ্রস্ত হইতেছে কিন্তু এ অচিরাৎ কোথায় যাইবে ও কি প্রকার দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইবে তাহা জানিতেছে না[৯]। যেমন প্রবল বাত্যাকালে ধূলিপটল-সমাচ্ছন্ন পথে গমন করিলে নেত্র রুদ্ধ হয়, কিছুই দেখা যায় না, দৃষ্টিহীন হইতে হয়, এই দেহের সমুদায় আরম্ভ তাহারই অনুরূপ। অর্থাৎ ইহার চেষ্টা অনর্থপ্রদা, দৃক্‌শক্তিনাশিনী ও নীরসা। এই শরীরটাই ঝঞ্ঝাবায়ুর মূল। ইহাই রাজসী প্রবৃত্তি উৎপাদন করিয়া আত্মদর্শনের বাধা জন্মাইতেছে[৫০]। বায়ুর, প্রদীপের ও মনের গতি, উৎপত্তি ও বিনাশ যদ্রূপ; এই শরীরের উৎপত্তি বিনাশাদিও তদ্রূপ। ইহা যে কেন, কি প্রকারে ও কোথা হইতে আসিতেছে ও কোথায়ই বা যাইতেছে তাহা কেহই জানিতেছে না[৫১]। যাহারা অনিত্য শরীরের অস্থায়ী কার্য্যে আবদ্ধ হইয়া সংসারে আসক্ত হয়, সেই মোহমদিরোন্মত্ত ব্যক্তিদিগকে ধিক্[৫১]। মহর্ষে! আমি দেহের নহি ও দেহও আমার নহে। দেহ আমি নহি ও দেহও দেহ নহে। * এইরূপ চিন্তা করিয়া যাহাদের চিত্ত বিশ্রান্তি লাভ করিয়াছে তাহারাই উত্তম পুরুষ[৫২]। যাহারা বহুল পরিমাণে মানাপমানের প্রতি দৃষ্টিপাত করে এবং যাহারা বহুলাভাকাঙ্ক্ষী হয়, তাদৃশ শরীরম্মন্য ব্যক্তিরা অবদ্ধ হইয়াও বদ্ধ ও মৃত্যুর বশীভূত হয়[৫৩।৫৪]। মহর্ষে! কষ্টের বিষয় এই যে, শরীরমধ্যস্থ হৃদয়শ্বভ্র-শায়িনী তৃষ্ণাপিশাচী আমাদিগকে নিরন্তর প্রতারিত করিতেছে এবং অজ্ঞানরূপা রাক্ষসী সহায়হীনা প্রজ্ঞাকে সতত ছলনা করিতেছে[৫৫।৫৬]।

মহর্ষে! দৃশ্যমান বস্তুর কিছুই সত্য নহে। সুতরাং এই দগ্ধপ্রায় শরীর নিতান্ত অসত্য। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! আমি দেখিতেছি, প্রায় সমুদায় লোকই দগ্ধ দেহ কর্ত্তৃক নিয়ত প্রতারিত হইতেছে[৫৭]। পর্ব্বতভূমি যেমন নির্ঝরবারি সেচনে কিঞ্চিৎকাল আর্দ্র থাকে, তেমনি, এই দেহও কিছু কালের নিমিত্ত কোমল থাকে, পরে কর্কশতা প্রাপ্ত হয়[৫৮]। ইহা সামুদ্রিক জল-বিম্বের ন্যায় অচিরাৎ বিনাশ প্রাপ্ত ও আপাততঃ বৃথা সাংসারিক ধাব-নাদি (দৌড়াদৌড়ি) রূপ আবর্ত্তে আবর্ত্তিত হইতেছে[৫৯]। হে দ্বিজবর! ইহা মিথ্যাজ্ঞানের বিকার, স্বপ্নভ্রান্তির নিলয় ও মরণের প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

* দেহ জড় মাত্র; বস্তুতঃ ইহা পঞ্চভূতের বিকার। ভূত বিকারে অহংজ্ঞানও ভ্রম; দেহ জ্ঞানও ভ্রম।

ঈদৃশ দেহের প্রতি আমার ক্ষণকালের নিমিত্ত অল্পমাত্রও আস্থা নাই[৩০]। যাহারা তড়িৎ, শরৎকালের মেঘ ও ঐন্দ্রজালিক বিদ্যা, এ সকলকে চিরস্থায়ী মনে করে ও বিশ্বাস করে; তাঁহারাই এই ক্ষণভঙ্গুর দেহকে চিরস্থায়ী বলিয়া বিশ্বাস করুক[৩১]। মুনিনাথ! এই দেহ সমুদায় ভঙ্গুর পদার্থের মধ্যে বিজয়ী। এ বিদ্যুৎ প্রভৃতিকেও জয় করিয়াছে। আমি তাহা জানিতে পারিয়া অশেষ দোষাকর এই শরীরকে তৃণ অপেক্ষাও তুচ্ছ মনে করিয়াছি ও ইহার অভিমান পরিত্যাগ করিয়া পরম সুখী হইয়াছি[৩২]।

অষ্টাদশ সর্গ সমাপ্ত।

ঊনবিংশ সর্গ।

রাম কহিলেন, মহর্ষে! যাহাতে নিতান্ত অস্থির চতুর্ব্বিধ দেহ * বিভক্ত হয় এবং নানাবিধ কার্য্য ভার যাহার তরঙ্গ, জীব সেই এই সংসারসাগরে মানুষ্য জন্ম গ্রহণ করিয়া আপনার মরণ পর্য্যন্ত কেবল দুঃখেই অতিবাহন করে। দেখুন, প্রথমতঃ বাল্য; তাহাতে কত প্রকার কষ্ট[১]। অশক্তি বা অক্ষমতা, আপদ, তৃষ্ণা, (ভক্ষণাদি বিষয়ে অনিবার্য্য অভিলাষ) মূকতা (কথা কহিতে না পারা,) মূঢ়বুদ্ধিতা (বুঝিতে না পারা,) ক্রীড়া কৌতুকে অভিলাষিত্ব, চাঞ্চল্য ও দৈন্য (ঈপ্সিত অপ্রাপ্তে দুঃখিত হওয়া ও রোদনাদি করা) সমুদায় দোষই প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে[২]। জীব বাল্যাবস্থায় অকারণে ক্রোধ-রোদনাদির বশবর্ত্তী হইয়া নিগড়বদ্ধ হস্তীর ন্যায় অনন্ত দুর্দ্দশা প্রাপ্ত হয় ও দুঃখে শৈশব কাল জীর্ণ করিতে থাকে[৩]। জীব এই কালে পরাধীনতাপ্রযুক্ত যেরূপ চিন্তাজর্জ্জরিত হয়; মরণকালে, জরাকালে, রোগে, আপদে ও যৌবনে সেরূপ জর্জ্জরিত হয় না[৪]। বাল্যকালে পশুপক্ষ্যাদির সহিত পশুপক্ষ্যাদির সমান হইয়া ক্রীড়া কৌতুক করিতে প্রবৃত্তি হয় ও তাহাতে গুরুজনের নিকট সতত তিরস্কৃত ও উপহসিত হইতে হয় সুতরাং চাঞ্চল্যপ্রধান বাল্য মরণ অপেক্ষাও দুঃখপ্রদ[৫]। বাল্যকালে মন ঘোর অজ্ঞানে আচ্ছন্ন থাকে এবং সেই কালে নিতান্ত তুচ্ছ নানাপ্রকার কল্পনা সমুদিত হইতে থাকে। সে সকল প্রায়ই সিদ্ধ হয় না, না হওয়ায় মন সর্ব্বদা দুঃখিত থাকে। মহর্ষে! সেরূপ বাল্য কিরূপে ও কাহার সুখপ্রদ হইতে পারে[৬]? শৈশবকালে অজ্ঞানতা নিবন্ধন জল, বহ্নি ও অনিলাদির দ্বারা পদে পদে যেরূপ ভীত হইতে হয়, জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে মহাবিপদ হইতেও সেরূপ ভয় হয় না[৭]। বালকগণ নিরন্তর বিবিধ দুশ্চেষ্টায়, দুরাশায়, দুর্লীলায়, দুরভিসন্ধানে ও দুর্ব্বিলাসে প্রধাবিত হয়, হইয়া মহাভ্রমে পতিত হইয়া থাকে। তাহারা সর্ব্বদাই মোহ বশতঃ সারে অসার ও অসারে সার বোধ করিয়া থাকে[৮]। অতএব, নিষ্ফল কার্য্যপ্রবৃত্তির ও অশেষ দুষ্ক্রিয়ার আবাস স্বরূপ বাল্যকাল কোনও

---

* যাহা স্থায়ী নহে তাহা অস্থির। নশ্বর ও অস্থির সমান কথা। দেহ জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ। এই চারি প্রকার।

প্রকারে শান্তিপ্রদ নহে। ঐ কালে প্রায় সর্ব্বক্ষণই গুরুজনের নিকট দণ্ডিত সুতরাং দুঃখিত হইতে হয়[৯]। যেমন পেচককুল দিবসে অন্ধকারময় গর্ত্তে লুক্কায়িত হইয়া থাকে সেইরূপ যে কিছু দোষ, যে কিছু দুরাচার, যে কিছু অকার্য্য, যে কিছু দুরাধি (মনঃকষ্ট,) সমস্তই বাল্যকালে জীবের হৃদয়ে লুক্কায়িত হইয়া থাকে[১০]। ব্রহ্মন্! যে সকল লোক বাল্য কালকে রমণীয় বলিয়া কল্পনা করে সেই সকল হতচেতা মূঢ়বুদ্ধি দিগকে ধিক্[১১]। যেকালে সর্ব্বপ্রকার অমঙ্গলের সম্ভাবনা, যে অবস্থায় কিছুমাত্র হিতাহিত জ্ঞান থাকে না, যে কালে অভিনব বিষয় দর্শন বা শ্রবণ মাত্রেই তদ্বিষয়ে মনের চাঞ্চল্য জন্মে, সেই বাল্য কাল কি প্রকারে সন্তোষকর হইতে পারে[১২]? অন্যান্য অবস্থায় প্রাণিমাত্রেরই বিষয় বিশেষে মনশ্চাঞ্চল্য জন্মিয়া থাকে সত্য; পরন্তু বাল্যাবস্থায় তদপেক্ষা দশগুণ অধিক চাঞ্চল্য বিদ্যমান থাকে। মন যত চঞ্চল হয় ততই দুঃখ বাড়ে ইহা সুপ্রসিদ্ধ[১৩]। মনুষ্যের মন স্বভাবতঃই চঞ্চল, তাহাতে আবার ঐ কালে বালচাপল্য মিশ্রিত হয়; সুতরাং ঐ কালে তৎপ্রযুক্ত শত অনর্থ হইতে রক্ষা পাওয়া নিতান্ত কঠিন[১৪]। হে ব্রহ্মন্! কামিনীর নেত্র, (অপাঙ্গ = কটাক্ষ) বিদ্যুৎ ও অগ্নিশিখা, ইহারা যেন শিশুচাপল্যের নিকট হইতেই চঞ্চলতা শিক্ষা করিয়াছে[১৫]। শৈশব ও মন উভয়ই চঞ্চল,—সকল কার্য্যেই চঞ্চল। সমান স্বভাব বলিয়া উভয়কে সহোদর ভ্রাতা বলিতে পারা যায় এবং উক্ত উভয়ের স্থিতিও ক্ষণিক[১৬]। মানবগণ যেমন অর্থাভিলাষে ধনী ব্যক্তির অনুগামী হয়, তেমনি, সর্ব্বপ্রকার আধি ব্যাধি বালকের অনুগমন করিয়া থাকে[১৭]। বালকেরা যদি প্রত্যহ অভিনব প্রীতিকর বস্তু প্রাপ্ত না হয় তাহা হইলে অত্যন্ত ম্লানচিত্ত হইয়া থাকে[১৮]। বালকের স্বভাব কুক্কুরের সদৃশ। তাহারা অল্পেই সন্তুষ্ট ও অল্পেই অসন্তুষ্ট হয়। কুক্কুরেরা ঘৃণ্য পদার্থে রমমান হয়; বালকেরাও ঘৃণ্য পদার্থে রমমান হইয়া থাকে[১৯]। বালকেরা বর্ষাজলসিক্ত রবিকিরণসন্তপ্ত ভূমির সদৃশ। কেননা তাহারা অন্তরোষ্মাবৃক্ত, অজস্র অশ্রুধারায় অবষিক্ত ও সর্ব্বদাই কর্দ্দমাক্তকলেবর অবস্থায় থাকে[২০]। বালকেরা কেবল আহারের, নিদ্রার ও ভয়ের অধীন। তাহারা দূরস্থ বস্তুতেও নিকটস্থের ন্যায় অভিলাষী হয় (চাঁদ ধরিবার অভিলাষও করে।) ইহাদিগের বুদ্ধি যেরূপ চঞ্চল, শরীরও সেইরূপ চপল। সুতরাং তাদৃশ বাল্যে দুঃখ ব্যতীত সুখের লেশও নাই[২১]। স্বীয় অভিলষিত বস্তু প্রাপ্ত না হইলে বালক দিগের আশা লতা এক কালে ছিন্ন হইয়া যায়, তাহাতে তাহারা বিশেষরূপে ম্লান ও

দুঃখিত হয়, দুর্ব্বলত্ব প্রযুক্ত উপায় বিধানে অসমর্থ হইয়া তাহারা রোদন করিতে থাকে ও অপার দুঃখ অনুভব করে[২২]। মুনিবর! বালকেরা দুশ্চেষ্টায় ও দুষ্টমনোরথের দ্বারা স্বীয় অভিলাষ পূর্ণ করিতে গিয়া যেরূপ ক্রূর অক্রূর উপায় অবলম্বন করে ও তদুপলক্ষ্যে তাহারা যে সকল দুঃখ প্রাপ্ত হয় সে সকল দুঃখ অন্য কাহার নাই[২৩]। গ্রীষ্মকালীনপ্রচণ্ডমার্ত্তণ্ডতাপে পরি-তাপিত বনস্থল যেরূপ সন্তপ্ত, স্বেচ্ছাচারী বালক গণের অভিলাষ পূর্ণ না হইলে তাহারা সেইরূপ সন্তপ্ত হইয়া থাকে[২৪]। আলাননিবদ্ধ (আলান= বন্ধন স্তম্ভ অথবা শৃঙ্খল) ও অঙ্কুশাহত ভীষণ করীন্দ্র যদ্রূপ যন্ত্রণা অনুভব করে, বালকগণ বিদ্যালয়ে অবরুদ্ধ থাকিয়া শিক্ষকের বেত্রাঘাতাদির দ্বারা সেইরূপ ঘোর যন্ত্রণা অনুভব করিয়া থাকে[২৫]। বাল্যকালে কালস্বভাব বশতঃ যে প্রকার বিবিধ বাসনা উপস্থিত হয়, মিথ্যা বস্তুর প্রতি চিত্তের যে প্রকার অভিনিবেশ জন্মে, ভাবিয়া দেখুন, সে সকল দুঃখপ্রদ ব্যতীত কদাচ সুখপ্রদ নহে। মিথ্যা বস্তুতে সত্যতা বুদ্ধি হওয়াও নিতান্ত কোমল স্বভাব বাল্যের স্বভাব ব্যতীত অন্য কিছু নহে। তাদৃশ বাল্য অবশ্যই দীর্ঘ দুঃখের কারণ, সেপক্ষে সংশয় নাই[২৬]। লোকে রোরুদ্যমান বালক দিগকে কহিয়া থাকে "তোমাকে এই জগতের সমস্ত দ্রব্য ভক্ষণ করিতে দিব"। তাহারাও ঐ প্রতারণা বাক্যে সাতিশয় হৃষ্টচিত্ত হয়। তাহারা কখন ভুবন খাইব বলিয়া রোদন করে এবং কখন বা আকাশ হইতে চন্দ্রগ্রহণের অভিলাষ করে। এরূপ অজ্ঞানাচ্ছন্ন বাল্যাবস্থা কিরূপে সুখদায়ক হইতে পারে[২৭]? বালকের সহিত মহীরুহের প্রভেদ নাই বলিলেও বলা যায়। দেখুন, বৃক্ষের অন্তরে চেতনা আছে এবং বালকের অন্তরেও চেতনা আছে। কিন্তু উভয়েই শীতাতপ নিবারণে একান্ত অশক্ত। সে সম্বন্ধে বালকের ও মহীরুহের প্রভেদ কি[২৮]? যেমন ক্ষুধার্ত্ত পক্ষিগণ নভোমণ্ডলের অত্যুচ্চ প্রদেশে উড্ডয়ন করিতে অভিলাষ করে কিন্তু রৌদ্রাদির জন্য কৃতকার্য্য হইতে পারে না, সেইরূপ, নিতান্ত শিশু বালকেরাও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক আহার গ্রহণের অভিলাষ করে; কিন্তু শরীরে বশ্যতা না থাকায় কৃতকার্য্য হইতে পারে না। পক্ষী ও বালক উভয়েই ভয়ের ও আহারের বশবর্ত্তী; সে বিষয়ে বালকেরা পক্ষীর সমান[২৯]। শিশুকালে পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনের ও অন্যান্য বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদিগের নিকট সতত ভীত থাকিতে হয়, সেজন্য শিশুকাল কেবল ভয়েরই মন্দির[৩০]। বাল্যকাল সমুদায়

দোষের আস্পদ। অন্তঃকরণ এই কালে সর্ব্বদাই দূষিত থাকে। সুতরাং তাহা কেবল মাত্র অবিবেকের আলয়। হে মুনিনাথ! প্রদর্শিত কারণে ইহ জগতে বাল্যাবস্থা কাহারও পক্ষে তুষ্টিকর নহে; অধিকন্তু তাহা দুঃখেরই পুষ্কল (বিস্পষ্ট) কারণ৩১।

উনবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

বিংশ সর্গ।

রামচন্দ্র বলিলেন, মুনিবর! পুরুষ শত অনর্থের আস্পদ বাল্য অতিক্রম করিয়া অচিরাৎ ভোগবিলাসের উৎসাহে কামাদি কর্তৃক দূষিতান্তঃকরণ হয় ও নরক গমনের জন্যই যৌবনে আরোহণ করে[১]। * অজ্ঞ জীব যৌবন কালে বিবিধ বিলাস ও রাগদ্বেষাদি অনুভব করতঃ এক দুঃখ হইতে অন্য দুঃখে নিপতিত হয়[২]। এই কালেই চিত্তবিলস্থিত (বিল = গর্ত্ত) কাম পিশাচ বিবেককে বলপূর্ব্বক পরাভূত করিয়া আত্মবশে আনয়ন করে[৩]। এই কালে চিত্ত যুবতীচিত্ত অপেক্ষাও চঞ্চল হয় এবং তাহা (চিত্ত) বালকনেত্রার্পিত সিদ্ধাঞ্জনের ন্যায় ভোগ্যবস্তুপ্রদর্শী হইয়া থাকে। অপিচ, চিত্ত এইকালে অণুমাত্রও বশ্য থাকে না[৪]। † মুনিবর! কাম, ক্রোধ, লোভ ও দ্যূতাসক্তি প্রভৃতি যে সকল দোষ নিতান্ত দুঃখদায়ক, যৌবন কালে সে সমস্তই উপস্থিত হইয়া থাকে, অবশেষে সে সকল তদাসক্ত পুরুষকে বিনষ্ট (অধঃপাতিত) করিয়া থাকে[৫]। সতত ভ্রমপ্রদায়ক মহানরকের বীজস্বরূপ যৌবন যৎপরোনাস্তি ভীষণ। যে পুরুষ যৌবনে বিনষ্ট না হয়, সে পুরুষ অন্য কিছুতে বিনষ্ট হয় না[৬]। ক্রোধ, লোভ ও হিংসা প্রভৃতি হিংস্র জন্তুতে পরিপূর্ণ ও শৃঙ্গারাদি রসে বিচিত্রিত যৌবনারণ্য যার পর নাই ভয়ানক। যিনি তাহা অনায়াসে জয় করিতে পারেন তিনিই যথার্থ বীর[৭]। বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী, নিমেষপরিমিতকাল দীপ্তিশালী ও অভিমানোক্তি

---

* বাল্য বরং ভাল, তথাপি যৌবন ভাল নহে। যৌবন বিশেষরূপে অধঃপতনের মূল। কারণ, বাল্যানুষ্ঠিত দুষ্কার্য্যে প্রাপ ও পাপফল নরক হয় না। মাণ্ডব্য মুনি ত্রয়োদশ অথবা চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়সের পর হইতে পাপ পুণ্য হওয়ার বিধান করিয়া গিয়াছেন। সেজন্য, বাল্য অপেক্ষা যৌবন অধিক নিন্দনীয় ও দোষের আলয়।

† সিদ্ধ পুরুষেরা এক প্রকার অঞ্জন (কাজল) প্রস্তুত করিতে পারেন, যদ্দ্বারা নিধি দর্শন হয়। ভূমির ও প্রস্তরাদির মধ্যে যে গুপ্তধন থাকে তাহা নিধি নামে খ্যাত। নেত্রে সিদ্ধাঞ্জন ম্রক্ষণ করিলে বালকেরাও কোথায় কি লুক্কায়িত নিধি আছে তাহা জানিতে পারে। যৌবনও ভোগবিলাসরূপ নিধির সিদ্ধাঞ্জন। অর্থাৎ যৌবনের উদয়ে যুবকগণ গুপ্ত ভোগ অনুসন্ধান করিয়া লয়।

চঞ্চল সুতরাং অমঙ্গলদায়ক যৌবনের প্রতি আমি অনুরক্ত নাই[৮]। যৌবন আপাতমধুর সত্য, পরন্তু পরিণামে অত্যন্ত তিক্ত। যৌবন সুরার ন্যায় মত্ততাজনক ও সকল দোষের আকর। তাদৃশ দূষণীয় যৌবনে আমার কিছু-মাত্র অনুরাগ নাই[৯]। যৌবন কাল নিতান্ত অসত্য হইলেও অজ্ঞের নিকট ক্ষণকাল সত্যবৎ প্রতীয়মান হয়। তাদৃশ বঞ্চক ও স্বপ্নাঙ্গনাসঙ্গমসদৃশ নিতান্ত-তুচ্ছ যৌবনের প্রতি আমার অনুরাগ রাখা কি সঙ্গত[১০]? যত প্রকার আপাত মনোরম বস্তু আছে, যৌবন সে সমুদয়ের শ্রেষ্ঠ। যৌবন স্বপ্ন, ইন্দ্রজাল ও গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী ও মিথ্যা। সেই জন্য যৌবনের প্রতি আমার অল্পমাত্রও অনুরাগ নাই[১১]। যদ্রূপ লক্ষ্যে শরনিপতিত হইলে কিঞ্চিৎকাল সুখানুভব হয়, কিন্তু পরে প্রাণিহত্যানিবন্ধন অনুতাপ আসিয়া আশ্রয় করে, সেইরূপ, যৌবনকালও ক্ষণকাল সুখপ্রদ পরন্তু পরিণামে দুঃখপ্রদ। অন্তর্দ্দাহজনক তাদৃশ যৌবন আমার রুচির বিষয় নহে[১২]। যৌবন বেশ্যাসংসর্গের ন্যায় আপাতরমণীয় ও বেশ্যার ন্যায় সদ্ভাব-শূন্য অর্থাৎ শুদ্ধভাবরহিত। যে যৌবন তাদৃশ, সে যৌবন আমার রুচির বিষয় নহে[১৩]। জগতে যে কোন কার্য্যোদ্যোগ—সমস্তই দুঃখদায়ক। যৌবন আগত হইলে সমুদায় দুঃখদায়ক আরম্ভ (কার্য্য) উপস্থিত হইয়া থাকে। যেমন প্রলয়কাল আগত হইলে অনিবার্য্যরূপে উৎপাত সকল উপস্থিত হয় সেইরূপ যৌবন আগত হইলেও উৎপাতসদৃশী কার্য্যপ্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে[১৪]। ভগবান্ ঈশ্বরও (ঈশ্বর=শিব) হৃদয়ান্ধকারকারিণী যৌবনাজ্ঞানযামিনীকে ভয় করেন[১৫]। যৌবনের সম্ভ্রম (মোহ) সদাচার নষ্ট করে, বুদ্ধিবিপর্য্যয় জন্মায়, ও যার পর নাই অধিক মোহ উৎপাদন করতঃ প্রমাদে লিপ্ত করে[১৬]। যেরূপ বনস্থ শুষ্ক বৃক্ষ দাবদহনে দগ্ধ হয়, সেইরূপ, মানবগণ যৌবন কালে অসহ্য কান্তাবিয়োগহুতাশনে দগ্ধ হইতে থাকে[১৭]। যেরূপ অতিবিস্তীর্ণা নির্ম্মলসলিলা তরঙ্গিণী (নদী) বর্ষাকালে মালিন্যপ্রাপ্তা হয়, সেইরূপ, যৌবন কালে প্রভূতগুণশালী উদারস্বভাব মানব দিগেরও চিত্ত কালুষ্য ধারণ করে[১৮]। প্রবলতরঙ্গা অতিভীষণা নদী পার হওয়া যাইতে পারে তঁ তৃষ্ণাতরলি-তান্তর ও তীক্ষ্ণ্যচঞ্চল যৌবন উল্লঙ্ঘন করা অত্যন্ত কঠিন[১৯]। "আহা! আমার সেই কান্তা, সেই মনোহর পীনস্তন, সেই চিত্তবিমোহন বিলাস, সেই নির্ম্মলশশধরপ্রখ্য সুন্দর আনন" যৌবন কালে যুবকগণ এই সকল চিন্তায় জর্জ্জরিত হইতে থাকে[২০]। সাধুগণ চঞ্চলচিত্ত বাসনাপ্রপীড়িত

যুবক দিগকে তৃণ অপেক্ষাও লঘু বোধ করিয়া থাকেন[২১]। আলান যেরূপ মৌক্তিকধারী মত্ত করিবরের দর্প চূর্ণ করে; সেইরূপ, যৌবনও অভিমানমত্ত বহুদোষধারী পুরুষ দিগকে বিনাশ করিয়া থাকে[২২]। মহর্ষে! মনুষ্যের যৌবন কাননস্বরূপ। দারাপুত্রবিয়োগজনিত রোদন তাহার শুষ্ক বৃক্ষ, মন তাহার মূল, অসংখ্য দোষরূপ আশীবিষ (সর্প) সেসকলকে বেষ্টন করিয়া আছে। এই যৌবন কাননে দুঃখ ব্যতীত সুখ নাই[২৩]। যৌবন পদ্মস্বরূপ। অনিত্য সুখ ইহার মধু, অনুরাগ কেশর, বিষয়চিন্তা ভ্রমরী, ইন্দ্রিয়গণ তাহার দল[২৪]। এই পদ্ম হৃদয়সরোবরবিহারী ধর্ম্মাধর্ম্মপক্ষদ্বয়বিশিষ্ট আধিব্যাধিরূপ বিহঙ্গম কুলের নীড়স্বরূপ[২৫]। নব যৌবন অপার মহাসাগরের অনুরূপ। ইহাতে অসংখ্য কল্লোল ও কল্পনাতরঙ্গ বিরাজ করে[২৬]। যৌবন প্রবল বাত্যার অনুরূপ। যৌবনরূপিণী বাত্যা সমুদায় সদ্গুণ ও স্থৈর্য্য অপনয়ন করিতে (উড়াইতে) সক্ষম[২৭]। যৌবন এক প্রকার পাংশু (ছাই অথবা ধুলা।) এই পাংশু যৎপরোনাস্তি রুক্ষ। রুক্ষ যৌবনপাংশু যুবকের মুখ পাণ্ডুবর্ণ করায়। অবশেষে তাহা দোষের উর্দ্ধদেশ আক্রমণ করেও উৎকরতুল্য (উৎকর=ঝেটেলা, অশুচি তৃণপর্ণাদিযুক্ত ধূলি) দুস্পর্শ হয়[২৮]। মানব দিগের যৌবনোল্লাস (যৌবনোৎসাহ) কেবল দোষের উদ্বোধন, গুণের উচ্ছেদ ও দুষ্কার্য্যলক্ষ্মীর (দুষ্কর্ম্মের সৌষ্ঠব) অর্থাৎ পাপসম্পদের বিলাস উৎপাদন করিয়া থাকে[২৯]।

হে মুনে! মনুষ্যের নবযৌবন চন্দ্রমাপ্রায়। ইহলোকে সেই নবযৌবনরূপ চন্দ্র মানব দিগের শরীররূপ পঙ্কজে রজোরূপ পরাগের দ্বারা প্রাপ্তচাপল্য বুদ্ধিরূপ ষট্পদকে অবরুদ্ধ ও মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে[৩০]। মহর্ষে! দেহরূপ উপবনে সমুদ্ভূত যৌবনরূপ পুষ্পমঞ্জরী মনোরূপ মধুকরকে নিয়তই মুগ্ধ ও উন্মত্ত করিতেছে[৩১]। যদ্রূপ মরুভূমিগত প্রচণ্ডমার্ত্তণ্ডতাপতাপিত পিপাসাকাতর হরিণগণ জলপান আশায় সবেগে ধাবমান হইয়া গর্ত্তে নিপতিত হয়, সেইরূপ, মনুষ্যের মনও সুখলাভবাসনায় যৌবনের প্রতি ধাবমান হইয়া বিষয়বিষপূর্ণ গহ্বরে নিপতিত হইয়া থাকে। সুতরাং যৌবন মৃগতৃষ্ণিকা অপেক্ষাও প্রতারক[৩২]। যৌবন শরীররূপ রজনীর জ্যোৎস্না, চিত্তরূপ কেশরীর জটা, এবং জীবনরূপ অম্বুনিধির লহরী। ঈদৃশ যৌবন আমার অসন্তোষকর বৈ সন্তোষকর নহে[৩৩]। এই যে যৌবন, ইহা মানবগণের দেহকাননে ক-দিন ফলবান্ থাকে? ইহার ফলকাল অতিসংক্ষিপ্ত। কতিপয় দিবস পরেই

ইহাতে শরতের আগমন হয়। (যৌবন শুকাইয়া যায়।) যাহা কতিপয় দিন পরেই শুকাইয়া যাইবে তাহার প্রতি সমাশ্বাস কি[৩৪]? চিন্তামণি (রত্ন-বিশেষ) যেমন অল্পভাগ্য নরের হস্ত হইতে শীঘ্রই অন্তর্ধান করে, সেইরূপ, যৌবনপক্ষীও দেহপিঞ্জর হইতে সত্বর পলায়ন করিয়া থাকে[৩৫]। যে পরিমাণে যৌবনের বৃদ্ধি হইতে থাকে, সেই পরিমাণে মনুষ্যের কামক্রোধাদি রিপুগণ তাহার বিনাশের নিমিত্ত উৎসাহিত হইতে থাকে[৩৬]। যাবৎ না এই যৌবনযামিনী প্রভাতা হয়, তাবৎ অসংখ্য রাগদ্বেষাদি পিশাচ দেহমধ্যে বিচরণ করিতে থাকে[৩৭]। হে মুনিশার্দ্দূল! জনগণ মৃতপ্রায় পুত্রের প্রতি যেরূপ করুণা প্রদর্শন করিয়া থাকেন, বিকারগ্রস্ত ও বিবেকবিহীন নশ্বর যুবক লোকের প্রতি সেইরূপ করুণা বিতরণ করুন[৩৮]। যে মানব এই ক্ষণভঙ্গুর যৌবন কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া মোহবশতঃ আনন্দিত হয় সে মানব পশুমধ্যে গণনীয়[৩৯]। যে মানব অভিমানের মোহে উন্মত্ত হইয়া যৌবনের অভিলাষ করে, সেই মূঢ়চেতা মানব শীঘ্রই অনুতাপের উদরে দগ্ধ হইবে[৪০]। হে সাধো! যে সকল মহাপুরুষ যৌবনসঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, এই ভূমণ্ডলে তাঁহারাই পূজনীয় এবং তাঁহারাই মহাত্মা[৪১]। মহর্ষে! মকরাকর ভীষণ সমুদ্রও সন্তরণদ্বারা পার হওয়া যায়, তথাপি, অশেষদোষাকর দুর্যৌবন অতিক্রম করা যায় না[৪২]। নির্দ্দোষে যৌবনার্ণব অতিক্রম করা যার পর নাই দুঃসাধ্য। মনুষ্যের পক্ষে বিচিত্রশোভাসম্পন্ন দেবোদ্যান যদ্রূপ দুর্লভ, বিনয়বিভূষিত আর্য্যজনসেবিত শমদমাদিগুণবিশিষ্ট সুযৌবন মনুষ্যের পক্ষে ততোধিক দুর্লভ[৪৩]।

বিংশ সর্গ সমাপ্ত।

একবিংশ সর্গ।

রাম পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন[১]। বলিলেন, মহর্ষে! স্ত্রীমূর্ত্তি কি! স্ত্রীমূর্ত্তি কেবল মাংসাদির পুত্তলিকা। উহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল যন্ত্রের (যন্ত্র = কল) ন্যায় চপল এবং কতকগুলি অস্থির দ্বারা নির্ম্মিত। এই ত পদার্থ! ইহাতে শোভাই বা কি! রমণীয়তাই বা কি[১]! হে বন্ধুগণ! ত্বক, মাংস, রক্ত, বাষ্প ও জল প্রভৃতি পৃথক করিয়া দেখ, বিবেক চক্ষে অবলোকন কর, যদি সত্য সত্যই রম্য হয় তবে উহাতে আসক্ত হইতে নিষেধ করি না। নচেৎ বৃথা মুগ্ধ হইবার প্রয়োজন কি[২]? প্রমদাতনু কি? তাহার কতক অংশ কেশ, কতক অংশ রক্ত, এবং কতক অংশ মাংসাদি। ঐ সকলের রম্যতা কোথায়? ঐ সকল নিতান্ত ঘৃণ্য ও হেয়। সেই কারণে বিবেকসম্পন্ন প্রাজ্ঞ লোকেরা প্রমদাগণের কেশ, রক্ত, শরীর, সকলই নিন্দনীয় বলিয়া জানেন[৩]। ললনাগণ বিবিধ বস্ত্রালঙ্কারাদি ভূষণে ও সুগন্ধি অনুলেপনে যে-শরীরের সৌষ্ঠব সাধন করে, সে শরীর শ্মশানে শৃগাল ও কুক্কুরগণ ভক্ষণ করিবে। তাহাই তাহার শেষ ফল বা চরম পরিণাম[৪]। যে মেরুশিখরাকার উত্তুঙ্গ স্তনে গঙ্গালহরীর ন্যায় লাবণ্যময়ী মুক্তামালার শোভা দেখিয়াছি ও দেখিতেছি, সেই স্তন অচিরাৎ শ্মশানে ও দিগন্ত ভূমিতে শৃগাল কুক্কুরের অত্যুত্তম অন্নপিণ্ড তুল্য ভক্ষ্য হইবে[৫।৬]। বনচারী করভাদি জন্তুগণের শরীর যেরূপ রক্তমাংসাদিময়, কামিনী-শরীরও সেইরূপ রক্তমাংসাদিময়। তাহার নিমিত্ত এত আগ্রহ কেন[৭]? মুনিবর! রমণীশরীর অবিচার কালে রমণীয় বলিয়া কল্পনা করা যায় বটে; পরন্তু উহা মোহের উপকরণ ব্যতীত অন্য কিছু নহে[৮]। বিপুলোল্লাসদায়িনী চিত্তবিকারকারিণী কামসন্তাপজননী রমণী হইতে মদ্যের কিছু মাত্র প্রভেদ নাই[৯]। ললনারূপ আলানে নিবদ্ধ পুরুষরূপ হস্তী সদুপদেশরূপ দৃঢ়তর অঙ্কুশে আহত হইলেও প্রবোধিত হয় না[১০]। কেশকজ্জলধারিণী রূপলাবণ্যবতী লোচনপ্রিয়া রমণীরা অগ্নিশিখার ন্যায় দুস্পর্শা। ইহারা নরগণকে তৃণের ন্যায় দগ্ধ করিয়া থাকে[১১]। কামিনীগণ দূরে থাকিয়াও গাত্রদাহ উপস্থিত করে এবং বস্তুতঃ নীরসা হইলেও সরসার ন্যায় প্রতীতা হয়। রমণীরা আপাতদর্শনে রসপূর্ণা বলিয়া প্রতীতা হইলেও পরিণামে অত্যন্ত

নীবসা হয়। অধিক কি বলিব, ইহারা নরকাগ্নির উত্তম কাষ্ঠ[১২]। কৃষ্ণবর্ণকবরীবিশিষ্টা, তরলতারকনয়না পূর্ণেন্দুবিম্ববদনা বিকসিতকুসুম-সম-সুহাসিনী শৃঙ্গারলীলাদির দ্বারা চিত্তচঞ্চলকারিণী ও পুরুষগণের কার্য্য-সংহারিণী কামিনীরা দীর্ঘযামিনীর অনুরূপা। ইহারা মানবগণের বুদ্ধিকে মোহান্ধকারে নিমগ্ন করিয়া রাখে। পুষ্পসদৃশমনোহরা পল্লবশালিনী ভ্রমর-নয়না বিবিধবিলাসিনী সুস্তনী পুষ্পকেশরগৌরাঙ্গী চিত্তোন্মাদকারিণী রমণীরা বিষলতার ন্যায় মনুষ্যের প্রাণ সংহার করিয়া থাকে[১৩।১৬]। যদ্রূপ ভুজঙ্গদলন-কারী জন্তুগণ নিশ্বাসাদির দ্বারা গর্ত্ত হইতে ভুজঙ্গগণকে আকর্ষণপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া থাকে; সেইরূপ, কামিনীরাও বিবিধপ্রলোভন ও আশ্বাস প্রদান দ্বারা পুরুষগণের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া আত্মবশীভূত করে[১৭]। হে ব্রহ্মন্! কাম-নামক কিরাত মুগ্ধচিত্ত নররূপ বিহঙ্গম দিগকে রুদ্ধ করিবার নিমিত্ত নারী-রূপিণী বাগুরা বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে[১৮]। মনোরূপ মত্তমাতঙ্গ রমণীরূপ আলানে রতিরূপ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া মূকবৎ অবস্থিতি করিতেছে[১৯]। লোকে যাহাদিগকে রমণী বলে, আমি দেখিতেছি, তাহারা কেবল ভবপঙ্ক-বিহারী মৎস্যরূপ পুরুষের দুর্ব্বাসনাসূত্রস্থ পিষ্টপিণ্ডিকাবৃত বড়িশ ব্যতীত অন্য কিছু নহে[২০]। বামলোচনাগণ তুরঙ্গমগণের মন্দুরা, দন্তিগণের আলান, এবং ভুজঙ্গমগণের বশীকরণ মন্ত্র ও ঔষধ। ইহাদের দ্বারাই পুরুষরূপ আশী-বিষ গণ ধৃত ও বদ্ধ হয়[২১]। হে মুনে! নানারসবতী বিচিত্রভোগভূমি এই পৃথিবী স্ত্রীগণকে আশ্রয় করিয়া স্থিতিলাভ করিয়াছে[২২]। অশেষদোষাঙ্কুর দুঃখশৃঙ্খলরূপিণী কামিনীতে আমার অল্পমাত্রও প্রয়োজন নাই[২৩]। উহা-দিগের স্তনমণ্ডলে আমার কি হইবে? বিশাল নেত্রে ও ভ্রূযুগলেই বা আমার কি হইবে? ঐ সকল কেবল মাংসসার সুতরাং হেয়[২৪]। হে ব্রহ্মন্! মাংস-শোণিতময়ী অস্থিসারা রমণীগণের লাবণ্য কতিপয় দিবসেই বিশীর্ণতা প্রাপ্ত হয়। ঐ সকল মাংস, রক্ত ও অস্থি যে কোথায় বিপ্রকীর্ণ হইয়া যায় তাহার নিদর্শনও থাকে না[২৫]। হে তাততুল্য! অদূরদর্শী পুরুষেরা যে সকল রমণীকে প্রণয়িনী বোধে লালন করিয়া থাকে সেই সকল অঙ্গনাগণের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অচিরাৎ শ্মশানভূমে নিপতিত হইবে[২৬]। পুরুষগণ আজ অত্যন্ত স্নেহের সহিত কামিনীগণের যে-মুখমণ্ডল অলকাদির দ্বারা সুশোভিত করিতেছে, কাল তাহা শ্মশানে নিক্ষেপ পূর্ব্বক প্রজ্বলিত হুতাশনে দগ্ধ করিবে। কামিনীগণের শরীর শ্মশানে ভস্মীভূত অথবা নিক্ষিপ্ত হয়। নিক্ষিপ্ত হইলে

তাহাদিগের সেই সুদীর্ঘ কেশপাশ তত্রস্থ বৃক্ষশাখায় সংলগ্ন ও চামরবৎ উদ্বেল্লিত এবং তাহা দিগের অস্থি সকল ভূমিতলে নক্ষত্রপুঞ্জের ন্যায় শোভমান হইতে থাকে। তাহাদিগের রক্ত তখন ধূলিসংলগ্ন হয়, তাহাদিগের মাংস ক্রব্যাদগণ ভক্ষণ ও শিবাগণ তাহাদিগের চর্ম্ম চর্ব্বণ করে, এবং তাহাদিগের প্রাণবায়ু আকাশে গমন করে। হে মুনিবর! স্ত্রী লোকের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিষয় বা পরিণামপ্রকার কথিত হইল। এক্ষণে তাহাতে যে ভ্রান্তি আছে তাহা বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। হে সংসারস্থ লোকবৃন্দ! কি জন্য তোমরা ভ্রান্তির অনুগামী হইতেছ তাহা আমায় বল[২৭]।[৩০]

নারীদেহ পঞ্চ ভূতের দ্বারা সৃষ্ট। পঞ্চভূতনির্ম্মিত নিতান্ত অসার বস্তুর প্রতি বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা কি নিমিত্ত অনুরাগ প্রকাশ করে তাহা বলিতে পারি না![৩১] মনুষ্যের কান্তানুসারিণী চিন্তা সুতাল লতার ন্যায় (সুতাল=এক প্রকার বন্য লতা) কটুম্লফলশালিনী, মূর্দ্ধবিস্তীর্ণা ও অত্যন্ত দুর্গম শাখা প্রশাখার দ্বারা জটিল[৩২]।* যেমন যূথভ্রষ্ট মৃগ কোন্ দিকে যাইবে তাহা স্থির করিতে পারে না, না পারিয়া ব্যাকুল হয়, তেমনি, পুরুষগণও স্ত্রীর ভরণ পোষণার্থ ধনলোভে আকুল হইয়া কোন্ দিকে গমন করিবে তাহা স্থির করিতে পারে না, না পারিয়া ব্যাকুল হয়[৩৩]। পর্ব্বতখাতে (গহ্বরে) নিপতিত করিণীর জন্য অনুরক্ত মহাগজ যদ্রূপ অনুতাপ ভোগ করে, প্রমদানুরক্ত যুবক ব্যক্তিরা সেইরূপ শোকগ্রস্ত হইয়া থাকে[৩৪]। যাহার স্ত্রী আছে তাহারই ভোগাভিলাষ জন্মে। যাহার স্ত্রী নাই তাহার আবার ভোগাভিলাষ কি? স্ত্রী পরিত্যাগ করিতে পারিলেই জগৎ পরিত্যাগ করা হয়, এবং জগৎ পরিত্যাগ করিলেই পরম পবিত্র অখণ্ডসুখভোগে (ব্রহ্মানন্দানুভবে) সমর্থ হওয়া যায়[৩৫]। হে ব্রহ্মন্! এই চঞ্চল ক্ষণভঙ্গুর সুদুস্তর বিষয়ভোগে আমার অণুমাত্রও ইচ্ছা নাই। আমি কিরূপে জরামরণাদি ভয় হইতে উত্তীর্ণ হইব, পরাৎপর পরমাত্মার পরম পদ লাভ করিব, শান্ত ও স্থির পদ প্রাপ্ত হইব, প্রযত্ন সহকারে নিরন্তর কেবল তাহারই চিন্তা করিতেছি[৩৬]।

একবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

* মূর্দ্ধবিস্তীর্ণা=অগ্রভাগ বিস্তৃত। জটিল=জড়ান বা বায়ু প্রবেশ শূন্য। ভাবার্থ—স্ত্রী-চিন্তার পরিণাম অপরিহার্য্য দুঃখে পরিব্যাপ্ত।

দ্বাবিংশ সর্গ।

রামচন্দ্র বলিলেন, মহর্ষে! ক্রীড়া কৌতুকাদির অভিলাষ পূর্ণ হইতে না হইতেই যৌবন আসিয়া বাল্য কাল গ্রাস করে। আবার স্ত্রীসম্ভোগাদির অভিলাষ পূর্ণ না হইতেই বার্দ্ধক্য আসিয়া যৌবনকে গ্রাস করে। বিবেচনা করিয়া দেখুন, বাল্য ও যৌবন কিরূপ কর্কশ (অসুখাবহ[১]।) হিম যেমন পদ্মকে, প্রবলবাত্যা যেমন শারদীয় (শরৎকালের) তৃণাদির অগ্রভাগস্থিত শিশির বিন্দুকে, নদী যেমন তীরতরুকে বিনষ্ট করে, তেমনি, জরা এই ভৌতিক দেহকে বিনাশ করিয়া থাকে[২]। মুনিবর! বিষ কণামাত্র ভক্ষিত হইলেও তাহা যেমন অচিরাৎ দেহবৈরূপ্য আনয়ন করে, তেমনি, জরঠরূপিণী জরা শীঘ্রই এই দেহস্থ-অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জর্জ্জরীকৃত করিয়া অত্যন্ত বিরূপ করিয়া তুলিবে[৩]। কামিনীগণ শিথিল জরাজীর্ণ পুরুষকে বলীবর্দ্দের বা উষ্ট্রের সমান জ্ঞান করে[৪]। যেমন সপত্নীতাড়িতা স্ত্রী বাধ্য হইয়া স্থানান্তরে ও গৃহান্তরে প্রস্থান করে, সেইরূপ, মনুষ্যও ক্লেশদায়িনী জরায় আক্রান্ত হইলে প্রজ্ঞা তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যায়[৫]। স্ত্রী, পুত্র, সুহৃদ, বান্ধব, দাস, দাসী, সকলেই জরাগ্রস্ত মানবকে উন্মত্ততুল্য (পাগল) জ্ঞান অবজ্ঞা করিয়া থাকে[৬]। গৃধ্র যেমন উচ্চ বৃক্ষের আশ্রয়ে গমন করে, তেমনি, দুরাশা আসিয়া কুদৃশ্য, দৈন্যগ্রস্ত, গুণহীন ও পরাক্রমবিহীন বৃদ্ধ পুরুষকে আশ্রয় করিয়া থাকে। (বৃদ্ধ হইলে আশা ও অভিলাষ বাড়ে[৭]।) দৈন্যদোষময়ী অন্তর্দাহপ্রদায়িনী সুদীর্ঘা বিষয়বাসনা বালসখীর ন্যায় বৃদ্ধকালেও বর্দ্ধিতা হইতে থাকে[৮]। বার্দ্ধক্যে "হায়! এখন আমার কর্ত্তব্য কি! পরেই বা না জানি কি কষ্ট হইবে!" এইরূপ অপ্রতিবিধেয় ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে[৯]। মহর্ষে! বৃদ্ধ হইলে "আমি দুঃখী, আমি অকর্ম্মণ্য, আমি নিতান্ত হেয় বা তুচ্ছ, আমি কি করিব, ক্ষমতাই বা কি; কি প্রকারেই বা জীবন ধারণ করি, আমার কথায় কি প্রয়োজন, আমি মৌন হইয়াই থাকি।" ইত্যাদি প্রকার দৈন্য উদিত হইতে থাকে[১০]। অধিকন্তু বৃদ্ধকালে "আমি কখন্ কি প্রকারে কাহার নিকট হইতে সুস্বাদু ভক্ষ্য পাইব" এইরূপ চিন্তা অগ্নিসম বর্দ্ধিত হইয়া নিরন্তর দগ্ধ করিতে থাকে[১১]। বস্তুতঃই বৃদ্ধকালে সকল বিষয়েই অভিলাষ বৃদ্ধি পায় কিন্তু কোনও বিষয় উপভোগ করিবার সামর্থ্য থাকে না। সুতরাং

সামর্থ্যহীনতাপ্রযুক্ত বৃদ্ধদিগের হৃদয় নিরন্তর দগ্ধ হইতে থাকে[১২]। হে মুনিবর! এই দেহরূপ বৃক্ষে অঙ্গীভূনকারিণী সুতরাং অপকারকারিণী জরা-রূপা বকী রোগরূপ কাল-সর্পে আক্রান্ত হইয়া রোদন করিতে থাকে। সেই সময় আবার দীর্ঘমূর্চ্ছারূপ অন্ধকারের প্রত্যাশায় মৃত্যুরূপ উলূক (কাল-প্যাঁচা) আসিয়া দেখা দেয়[১৩।১৪]। যেমন সায়ংকাল আগতে তিমিরবিহারী পেচকগণ অন্ধকারের অনুগামী হয়, তেমনি, এই নশ্বর দেহে জরার আবির্ভাব দেখিলে মৃত্যু আহ্লাদ সহকারে তাহার অনুগমন করে[১৫]। হে মুনিনাথ! দেহবৃক্ষে জরাকুসুম প্রস্ফুটিত হইয়াছে দেখিলেই তন্মুহূর্ত্তে মৃত্যু-রূপ বানর আসিয়া তাহাতে আরোহণ করে[১৬]। জনশূন্য নগরের লতাহীন তরুর ও অনাবৃষ্টিযুক্ত দেশের কিছু না কিছু শোভা থাকে, কিন্তু জরাজর্জ্জরিত দেহের অণুমাত্রও শোভা থাকে না[১৭]। জরা আমিষভোজিনী গৃধ্রীর সমান। গৃধ্রী যেমন মাংস খণ্ড গিলিবার জন্য কর্কশধ্বনি ও বেগ সহকারে মাংসখণ্ড গ্রহণ করে, সেইরূপ, জরাও কুৎসিত কাসধ্বনি সহকারে মানবগণকে গ্রাস করিবার অভিপ্রায়ে সমাগত হয়[১৮]। কুমারীগণ যেমন দর্শনমাত্রে সমুৎসুক চিত্তে কুমুদপুষ্পের শিরশ্ছেদন করে ও গ্রহণ করে, তেমনি, জরাও দেহস্থ সুশোভন যৌবন পুষ্প অবলোকন করিবামাত্র তাহার সংহারার্থ তাহাকে গ্রহণ করিয়া থাকে[১৯]। যেমন প্রবলবাত্যা তরুসমূহকে ধূলিধূসরিত ও তাহার শাখাপল্লবাদি বিশীর্ণ করিয়া থাকে, তেমনি, জরাও বহুবিধ রোগদ্বারা শরীরকে পাংশুবর্ণবিশিষ্ট ও জর্জ্জরিত করিয়া থাকে[২০]। যেমন তুষার পাতে পদ্মের ম্লানদশা জন্মে, সেইরূপ, জরার দ্বারাও দেহ জীর্ণ ও বিশীর্ণ হয়[২১]। জরারূপা কৌমুদী মস্তকরূপ গিরিপৃষ্ঠে উদিত হইয়া শীঘ্রই বাত ও কাসরূপ কুমুদ্বতীকে বিকসিত করিয়া থাকে[২২]। মানবগণের মস্তক জরারূপ লবণে ধূসরিত হইলে পক্বকুষ্মাণ্ডাকার হয়। অনন্তর কাল তাহা অবলোকন করিয়া ভক্ষণ করিতে অগ্রসর হয়[২৩]। জহ্নুসুতা গঙ্গা তীরস্থিত বৃক্ষকে সমূলে উন্মূলিত করেন, জরারূপিণী গঙ্গাও আয়ুঃপ্রবাহের চলনে শরীররূপ তীরবৃক্ষের মূল উন্মূলিত করিয়া থাকে[২৪]। জরারূপিণী মার্জ্জারী বলপূর্ব্বক যৌবনরূপ মূষিককে গ্রাস করে, করিয়া উল্লাসিতা হয়[২৫]। দেহজঙ্গলবাসিনী জরাজম্বুকী যেরূপ কর্কশ ও অমঙ্গল রব করে, সেরূপ রব অন্য কুত্রাপি শ্রুত হয় না[২৬]। জরা এক প্রকার অগ্নির প্রজ্বলন। দুঃখ তাহার মালিন্যকারক ধূম, শ্বাস ও কাস প্রভৃতি রোগ তাহার শীৎকার এবং এই জীবদেহ তাহার দাহন

(কাষ্ঠ)[২৭]। এই দেহ জরাবস্থায় পুষ্পফলভারাবনত লতার ন্যায় বাঁকিয়া যায় ও শ্বেতবর্ণ হয়[২৮]। এই দেহরূপ কদলীবৃক্ষ যখন জরাপ্রভাবে ধবলিত হয়, তখন, মৃত্যুরূপ মাতঙ্গ আসিয়া তাহা উৎপাটিত করিয়া থাকে[২৯]। মুনিবর! মৃত্যুরাজ আগমন করিবেন, সেই সূচনায় আধিব্যাধিরূপ তদীয় বহু সৈন্য জরারূপ শ্বেত চামর ধারণ করিয়া অগ্রে আগমন করিতে থাকে[৩০]। হে মুনিনায়ক! আপনি দেখুন, যাহারা গিরিগুহায় প্রবেশ পূর্ব্বক পলায়ন করে, শত্রুরা তাহা দিগকে জয় করিতে অসমর্থ হয়। তাহারা শত্রুহস্তে রক্ষা পাইলেও জরারূপিণী রাক্ষসীর হস্তে পরিত্রাণ পায় না[৩১]। বালকগণ যেমন তুষারাচ্ছন্ন গৃহে অবস্থিতি করিয়া শরীরের অবশতাপ্রযুক্ত অঙ্গসঞ্চালন করিতে অসমর্থ হয়, সেইরূপ, ইন্দ্রিয়গণ এই জরাক্রান্ত শরীরে অবসাদ প্রাপ্তে স্ব স্ব কার্য্যে অসমর্থ হয়[৩২]। যদ্রূপ নর্ত্তকী যষ্টি ধারণ পূর্ব্বক মুরজবাদ্যতালে নৃত্য করে, তদ্রূপ, দেহ যষ্টি অবলম্বনে কাসবায়ুনিঃসরণরূপ মুরজবাদ্যতালে অতিবৃদ্ধা জরাযোষিৎ অনবরতঃ স্খলিত পদে নৃত্য করিয়া থাকে[৩৩]। যদ্রূপ গন্ধকুটিতে অর্থাৎ সুগন্ধিদ্রব্য নির্ম্মিত আধারে রাজব্যবহারযোগ্য শ্বেত-চামরাদি আন্দোলিত হয়, তদ্রূপ, জরাকালে মনুষ্যের দেহদণ্ডের উপরিভাগে পরিপক্ব কেশ সকল সংসার নামক রাজার ব্যবহার্য্য শ্বেত চামর দোলায়িত হইতে থাকে। * মহর্ষে! কুমুদ যেমন চন্দ্রোদয় হইলে বিকসিত হয়, তেমনি, জরা উপস্থিত হইলেও মৃত্যু অতীব প্রফুল্ল হয়[৩৪।৩৫]। এই শরীররূপ অন্তঃপুর যখন জরারূপ সুধায় (সুধা=চূর্ণ) ধবলিত হয়, তখন, এতন্মধ্যে অশক্তি, আর্ত্তি (ব্যাধি পীড়া) ও আপদ, এই তিন অঙ্গনা পরম সুখে বসতি করিতে থাকে[৩৬]। মহর্ষে! যাহাতে মৃত্যুর আগমন অবশ্যম্ভাবী এবং যাহা জরাজিত, তাহাতে আমার আস্থা কি? আমি বশিষ্ঠাদির ন্যায় তত্ত্বজ্ঞ নহি; সুতরাং আমি জরামৃত্যুগ্রস্ত শরীরের প্রতি কিরূপে বিশ্বাস করিতে পারি[৩৭]। এই জরাক্রান্ত দুঃখময় শরীর ধারণ করিয়া দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইবার ফল কি? সংসার-বিজয়িনী জরা সকলকেই জয় করিয়া হতোদ্যম করিবে; পরন্তু ইহাকে জয় করিতে কেহই সমর্থ হইবে না[৩৮]।

দ্বাবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

* গন্ধকুটী। গন্ধ=কস্তুরী প্রভৃতি দ্রব্য। কুটী=আধার। শরীর পক্ষে—গন্ধ=বিষয়ভোগ। তাহার কুটী অর্থাৎ আশ্রয় স্থূল দেহ। ইহা লম্বমান বা দীর্ঘ বলিয়া যষ্টি।

ত্রয়োবিংশ সর্গ।

রাম বলিলেন, মুনিবর! সংসাররূপ গর্ত্তে নিপতিত মূঢ়বুদ্ধি মানবগণ নানাপ্রকার অলীক কল্পনাজাল বিস্তার করতঃ তন্নিবন্ধন রাগদ্বেষাদির বশীভূত হইয়া পুনঃ পুনঃ মহাভ্রমে পতিত হইয়া থাকে[১]। কিন্তু যাঁহারা সাধু তাঁহারা এই মাংসাস্থিময় দেহের বা সংসারের প্রতি অল্পমাত্রও আস্থা প্রকাশ করেন না। যাহারা বালক তাহারাই মুকুরপ্রতিবিম্বিত ফল ভক্ষণ করিবার জন্য ব্যগ্র ও লোলুপ হয়, অন্যে নহে[২]। যাহাদের ইহাতে অর্থাৎ এই সংসারে সুখবাসনা আছে, কালরূপ মূষিক তাহাদের সেই সেই বাসনা-রজ্জুর ছেদনকর্ত্তা। তাহারা যতই বাসনা রজ্জু নির্ম্মাণ করুক, কাল মূষিক সে সমস্তই অল্পে অল্পে ও অলক্ষ্যে ছেদন করিবে[৩]। যদ্রূপ বাড়বানল উচ্ছলিত সমুদ্রের সলিলরাশি গ্রাস করে, সেইরূপ, সর্ব্বভক্ষক কালও সংসারের সকল বস্তু গ্রাস করিয়া থাকে। এমন কিছুই নাই যাহা সর্ব্বভক্ষক কালের ভীষণ গ্রাসে পতিত না হয়[৪]। কাল সমুদায় পদার্থের অতিভীষণ সংহার রুদ্র। যে কিছু দৃশ্য দেখিতেছেন সমস্তই কালকর্ত্তৃক ভক্ষিত হইবে[৫]। যিনি যতই বড় হউন, বল বুদ্ধি বৈভব যাঁহার যতই থাকুক, দ্যোতমান কাল সমস্তই বিনাশ করিবেন, কিছুমাত্র বিলম্ব ও কাহারও প্রতিক্ষা করিবেন না। লোক সকল জন্মিয়াই কালবদনে নিপতিত হয়[৬]। কালের কোনপ্রকার দৃশ্য রূপ নাই। কাল কেবল যুগ, বৎসর ও কল্পাদির দ্বারা অল্পমাত্র প্রকাশ পাইতেছে ও জগতীস্থ সমুদায় বস্তু আক্রম করিয়া আছে[৭]। গরুড় যেমন নাগ দিগকে নিগীরণ করে (নিগীরণ=গলাধঃকরণ), সেইরূপ, কালও পরমরূপবান সৎকর্ম্মশালী সুমেরুসদৃশগৌরবান্বিত ব্যক্তি দিগকেও নিগীরণ ও জীর্ণ করেন[৮]। কি নির্দ্দয়, কি কঠিন, কি ক্রূর, কি কর্কশ, কি কৃপণ, কি উত্তম, কি অধম, সকল ব্যক্তিই কালের উদরস্থ। এমন কেহই নাই যিনি কালের গ্রাসে অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন[৯]। কাল মহা অম্মর। মহা অম্মর (অম্মর=পেটুক) কালের মতি গতি কেবল ভক্ষণেই পর্য্যবসিত। কাল প্রত্যহই অসংখ্য লোক (জগৎ সংসার) ভক্ষণ করিতেছে তথাপি সে মহাশন (বহুভোজী) তৃপ্ত হইতেছে না[১০]। নট যেমন নাট্যশালায় নানারূপ ধারণ

ও ক্রীড়া করে, তেমনি, কালও এই সংসারে হরণ, নাশ, ভক্ষণ প্রভৃতি নানা আকারে নৃত্য করিতেছে[১১]। যেমন শুক পক্ষী দাড়িম্ব ফল বিদীর্ণ করিয়া তাহার বীজ সমুদয় ভক্ষণ করে, সেইরূপ, কালও এই অসৎ জগৎ ভেদ করিয়া তদন্তর্গত জীব সমুদয়কে অনবরত ভক্ষণ করিতেছে[১২]। যেমন বন্য হস্তী শুণ্ডাগ্র দ্বারা আকর্ষণ করতঃ তরুরাজি উৎপাটিত করে, সেইরূপ, কালও এই জগৎ নিরন্তর আলোড়িত ও উন্মূলিত করিতেছে[১৩]। এই অপার ব্রহ্মাণ্ড অপঞ্চীকৃত ভূতাত্মা ব্রহ্মার উদ্যান। দেবগণ তাহার ফল। সর্ব্বব্যাপী কাল সে সমস্তই আক্রমণ করিয়া আছে। এই কালরূপ পুরুষ অবিশ্রান্ত যামিনীরূপ-ভ্রমরীপরিপূর্ণ ও দিনরূপমঞ্জরীবিশিষ্ট বৎসর, কল্প, যুগ ও কলা কাষ্ঠা প্রভৃতি লতা রচনা করিতেছে, তাহাতে তাহার অল্প মাত্রও শ্রান্তি হইতেছে না[১৪।১৫]। হে মহর্ষে! ধূর্ত্তচূড়ামণি কাল কোনও প্রকারে ছিন্ন, ভিন্ন, ভগ্ন, দগ্ধ ও দৃশ্য-যোগ্য হয় না অথচ কাল ব্যতীত অন্য কিছু ছিন্ন ভিন্ন ভগ্ন দগ্ধ ও দৃক্‌গোচরে উপস্থিত হয় না[১৬]। কাল মনোরাজ্যের অনুরূপ। কালের ও মনোরাজ্যের প্রভেদ নাই। কাল মনোরাজ্যের ন্যায় বিস্তৃত ও নিমেষমধ্যে বহুবস্তুসমন্বিত জগতের উৎপাদন ও নিধন কর্ত্তা[১৭]। আত্মম্ভরি কাল দৃঢ়ব্রতা বিবিধক্লেশ-দায়িনী ও দুর্ব্বিলাসশালিনী চেষ্টার সহিত মিলিত আছে। কালের সেই সেই চেষ্টায় এই ভৌতিক দেহ উৎপন্ন হইয়াছে এবং তাহারই চেষ্টায় তদুৎপাদিত দেহে আত্মাধ্যাস। এই কালই জীবদিগকে স্বর্গ নরক ভোগ করাইতেছে এবং এই আত্মম্ভরি কাল তৃণ পর্ণ হইতে মহেন্দ্র ও সুমেরু পর্য্যন্ত বস্তু গ্রাস করিতে উদ্যত আছে[১৮।১৯]। ক্রূরতা, ক্ষোভ, দুশ্চাঞ্চল্য ও দুর্ভাগ্য, সমুদায়ই কালে অবস্থিত[২০]। যেমন বালকেরা আপন আপন প্রাঙ্গণে কন্দুক নিক্ষেপ পূর্ব্বক ক্রীড়া করে, সেইরূপ, কালও গগন চত্বরে পুনঃ পুনঃ চন্দ্রসূর্য্য নামক কন্দুক-দ্বয় আস্ফালন (উদয় ও অস্ত) করতঃ ক্রীড়া করিতেছে[২১]। এই কাল কল্পান্তে সমুদায় প্রাণিবিভাগ বিনাশ ও তাহাদের ভূতপঞ্চকময় অস্থি-মালায় আপনার সর্ব্বাঙ্গ বিভূষিত করতঃ (আপাদ মস্তক শোভমান করিয়া) ক্রীড়া করিতে সঙ্কুচিত হয় না[২২]। কালের চরিত্র (কার্য্য) নিরঙ্কুশ, নিতান্ত বিচিত্র, ও স্বাধীন। কল্পান্তকালে ইহারই অঙ্গনির্গত বায়ু সুমেরু পর্ব্বতকেও, ভূর্জ্জত্বকের ন্যায় শীর্ণ বিশীর্ণ করিয়া উড়াইয়া দেয়[২৩]।* এই কাল কখন রুদ্র,

* কল্পান্ত=মহাপ্রলয়। বায়ু অর্থাৎ প্রলয়-বায়ু। ভূর্জ্জত্বক্‌=ভূর্জ্জপত্র। প্রবল বায়ুর আঘাত পাইলে ভূর্জ্জপত্রের গাছ বিশীর্ণ হইয়া যায়। টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া যায়।

কখন মহেন্দ্র, কখন ইন্দ্র, কখন কুবের, আবার কখন কিছুই নহে। অর্থাৎ তাহার কোনও প্রকার রূপ থাকে না[২৪]। যদ্রূপ সরিৎপতি স্বীয় অঙ্গে অজস্র তরঙ্গমালা উৎপাদন, ধারণ ও সংহার করে, তদ্রূপ কালও আপনাতে অজস্র সৃষ্টিপ্রবাহ ধারণ ও অজস্র সে সকলের সংহার করিতেছে[২৫]। কাল মহাকল্প নামক বৃক্ষ হইতে দেবতা ও অসুর নামক পক্ব ফল পাতিত করিতেছে[২৬]। ঋষে! কাল একটী বৃহৎ উড়ুম্বর বৃক্ষ (এক প্রকার ডুমুর গাঁছ।) তাহার ফল অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড, প্রাণী সকল তন্মধ্যগত মশক, তাহারা কিছুকাল বৃথা ঘুংঘুং করে, করিয়া মরিয়া যায়[২৭]। মুনিবর! কাল চৈতন্যরূপ জ্যোৎস্নার সন্নিধান বশতঃ প্রফুল্লিতা অর্থাৎ ব্যক্তভাবপ্রাপ্তা জগৎসত্তাসামান্যরূপিণী প্রিয়তমা ক্রিয়া কুমুদিনীর সহিত মিলিত বা এক শরীর হইয়া হর্ষানুভব করিতেছে[২৮]। † কাল অনন্ত অপার অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রতিষ্ঠিত নিজ বপু অবলম্বন করিয়া অপূর্ব্ব মহাশৈলের ন্যায় অবস্থান করিতেছে[২৯]। মহর্ষে! কাল কোথাও বা গাঢ়শ্যামবর্ণ, কোথাও বা উজ্জ্বল কমনীয় বর্ণ, কোথাও বা তদ্বিবর্জ্জিত কার্য্য উৎপাদন করতঃ অবস্থিতি করিতেছে[৩০]। ‡ কাল অসংখ্যপ্রাণিবিভাগ লীন করিয়াছে, তাহার অবশিষ্ট সারের (স্থিরাংশের) ন্যায় প্রতিষ্ঠিত আছে। কালের সে রূপ পৃথিবীর ন্যায় আত্মসত্তায় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। (অভিপ্রায় এই যে, কাল সর্ব্বাধার ও স্থির, আর সব অসার ও অস্থির)[৩১] শতকল্প অতীত হইলেও কাল খেদান্বিত হয় না, আদর প্রাপ্তও হয় না। কালের গতি, স্থিতি, উদয় ও অস্ত, কিছুই নাই[৩২]। কাল জগৎসৃষ্টিরূপ

---

* সমুদ্রে তরঙ্গ বা ঢেউ নিরন্তর উৎপন্ন হইতেছে ও বিলীন হইতেছে। এই ক্ষণধ্বংসী বিশ্ব সমুদ্রলহরীর অনুরূপ। কালরূপ মহাসমুদ্রে ব্রহ্মাণ্ডরূপ তরঙ্গ অজস্র উঠিতেছে ও লীন হইতেছে।

† চৈতন্য=ব্রহ্ম। তাঁহারই সন্নিকর্ষ বিশেষে রজ্জুতে সর্পের ন্যায় ব্রহ্মে জগতের আবির্ভাব হয়। সেইজন্য জগতের পৃথক্ অস্তিত্ব নাই ও সেইজন্যই জগৎবিকাশের কারণ চিৎ অর্থাৎ ব্রহ্মচৈতন্য। এস্থলে জগতের অস্তিতা কুমুদ্বতী, তৎসম্বন্ধীয় জ্যোৎস্না ব্রহ্মচৈতন্য। কাল ঐ দুই লইয়া শুভাশুভ কর্ম্মরূপ ভার্য্যার সহিত একশরীর হইয়া আপনি আপনার ইচ্ছাশরীরে আনন্দ অনুভব করিতেছে। স্থূল কথা এই যে, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়, শুভাশুভ কর্ম্ম, তদনুসারে স্বর্গ নরকাদি ভোগ, সমস্তই কালের প্রভাব বা মহিমা।

‡ নিশায় ও অঞ্জন প্রভৃতিতে কৃষ্ণবর্ণ কার্য্য। দিবসে, পূর্ণিমার রাত্রে ও মণি প্রভৃতিতে কমনীয় উজ্জ্বল বর্ণ কার্য্য। গৃহভিত্তি প্রভৃতিতে উভয়বর্জ্জিত কার্য্য।

ক্রীড়ায় আস্থাপরিশূন্য ও অভিমানত্যাগী হইয়া আপনিই আপনাকে বিবর্ণ করিতেছে ও পার্লন বা পরিক্ষণ করিতেছে[৩৩]। কাল সরোবরের অনুরূপ। রাত্রি তাহার পঙ্ক, দিন তাহার ফুল্ল কোকনদ, মেঘাদি তাহার ভ্রমর[৩৪]। যদ্রূপ কৃপণ অর্থাৎ লোভী ব্যক্তি মার্জ্জনীর দ্বারা কনকাচলের চতুর্দ্দিক হইতে সুবর্ণ সংগ্রহ করিবার বাঞ্ছা করে, সেইরূপ, কালও রজনীরূপ সম্মার্জ্জনীর দ্বারা জগতের প্রাণিনিবহ অজস্র সংগ্রহ করিতেছে[৩৫]। যেমন মনুষ্যেরা অঙ্গুলির দ্বারা দীপবর্ত্তিকা সঞ্চালন করিয়া গৃহকোণস্থ বস্তুসমুদয় দর্শন করে; সেইরূপ, কালও ক্রিয়ারূপ অঙ্গুলির দ্বারা (ক্রিয়া=সূর্য্যাদির গতি। দিন বা তিথি)। সূর্য্যরূপ দীপ উজ্জ্বলিত করিয়া জগতের কোথায় কি আছে তাহা নিরন্তর নিরীক্ষণ করিতেছে[৩৬]। কাল অনবরত নিমেষরহিত সূর্য্যরূপ নেত্রে অবলোকন করতঃ জগৎরূপ জীর্ণারণ্য হইতে লোকপালরূপ পক্ক ফল চয়ন করতঃ ভক্ষণ করিতেছে[৩৭]।

মহর্ষে! কাল জীর্ণকুটীরস্থ মণির ন্যায় জগতের গুণশালী লোকদিগকে যত্ন সহকারে মৃত্যুরূপ পেটিকা মধ্যে সংস্থাপিত করিয়া রাখে, এবং লোক সমুদায়কে রত্নমালার ন্যায় গ্রন্থন করতঃ ভূষণার্থ অঙ্গে ধারণ করিয়া পুনর্ব্বার ছিন্ন ভিন্ন করিয়া থাকে[৩৮।৩৯]। নিতান্ত চপল (চঞ্চল) কাল দিনরূপ হংসানুগত তারারূপ কেশরযুক্ত নিশারূপ ইন্দীবর মালা বলয়িত করিয়া ধারণ করিতেছে ও শৈল, সিন্ধু, স্বর্গ ও পৃথিবী, এই শৃঙ্গচতুষ্টয়শালী জগদ্রূপ মেষের নক্ষত্রপুঞ্জরূপ শোণিতকণা প্রত্যহ ভক্ষণ করিতেছে[৪০।৪১]। * অধিক কি বলিব, হিংসাপরায়ণ কাল যৌবনরূপ নলিনীর চন্দ্রমা ও আয়ুরূপ মাতঙ্গের কেশরী। জগতে কি ক্ষুদ্র কি বৃহৎ এমন কোন বস্তু নাই, কাল যাহার তস্কর নহে[৪২]। জীবগণ যেমন সুষুপ্তিকালে সর্ব্ব দুঃখ সংহার করিয়া অজ্ঞান

---

* ইন্দীবর=নীলপদ্ম। রাত্রিগুলি যেন সূত্রগ্রথিত নীলপদ্মের মালা। অন্তরালে বা মধ্যে মধ্যে যে দিন আছে, সেই গুলি শ্বেত হংস। পদ্মবনে—হংসের বিচরণ প্রসিদ্ধ। রাত্রে যে নক্ষত্র প্রকাশ পায়, সে গুলি যেন কেশর অর্থাৎ রাত্রিরূপ নীলপদ্মের কিঞ্জল্ক (পদ্মের ঝুরি) এই মালা কালের গলদেশে বলয়িত হইয়া আছে (ঝুলিতেছে)। মালা যেমন দুই তিন ফের বা পেঁচ দিয়া ধারণ করে, এ মালাও সেইরূপ অনন্ত ফেরে বা পেঁচে ধৃত হইয়াছে। জগৎ যেন একটী মেষ (ভেড়া), শৈলাদি তাহার শৃঙ্গ। নক্ষত্রগণ তাহার শোণিত বিন্দু, এবং কাল তাহার ভক্ষক। অর্থাৎ প্রতি কল্পেই জগৎ মেষের নক্ষত্ররূপ রক্ত কালের উদরস্থ হয়। এক এক কল্প কালের এক এক দিন।

মাত্র অবলম্বনে স্থিতি করে, তেমনি, কালও কল্পান্তক্রীড়াবিলাসচ্ছলে সমুদায় জন্তু সংহার করিয়া ব্রহ্মমাত্র অবলম্বনে অবস্থিতি করে। কালই বিশ্বের কর্ত্তা, ভোক্তা, সংহর্ত্তা ও স্মর্ত্তা এবং কালই সুভগদুর্ভগরূপে সর্ব্বত্র বিরাজমান। কেহই সামান্য বুদ্ধির দ্বারা কালের মহিমা অবগত হইতে সমর্থ নহে এবং সমুদায় জীবলোকের মধ্যে একমাত্র কালই সমধিক বলবান্[৪৩।৪৫]।

ত্রয়োবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

চতুর্ব্বিংশতিতম সর্গ।

রামচন্দ্র পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন, মহর্ষে! কালের লীলা অদ্ভুত ও পরাক্রম অচিন্ত্য। এই সংসারে রাজপুত্ররূপ * কালের চরিত্র বর্ণন করি, শ্রবণ করুন[১]। রাজপুত্র কাল এই অত্যন্ত জীর্ণ জগৎ অরণ্যে অজস্র অস্তুজীবরূপ মৃগের প্রতি মৃগয়া অর্থাৎ তাহাদিগের বিনাশ করিতেছে, তথাপি তাহার তৃপ্তি নাই। মহর্ষে! জগৎ জঙ্গলের প্রান্তে অবস্থিত কল্পান্তকালের মহার্ণব কাল নামক মৃগয়াচারী রাজপুত্রের ক্রীড়া পুষ্করিণী। সে পুষ্করিণীর পঙ্কজ বাড়বানল[২।৩]। এই সকল প্রাণিবিভাগ অথবা ভূতবিভাগ কটু, তিক্ত ও অম্লাদি স্থানীয়। এ সকল দধিসমুদ্র ও ক্ষীরসমুদ্র প্রভৃতিতে মিশিয়া উত্তম পানক হয় †। তাহা জগৎ রাজ্যের যুবরাজ কালের প্রাতরাশ (প্রাতর্ভক্ষ্য) নির্ব্বাহ করে[৪]। কালের প্রণয়িনী চণ্ডী অর্থাৎ প্রলয়রাত্রি। সর্ব্বভূতবিনাশিনী কালপ্রিয়া প্রলয়রাত্রি মাতৃগণপরিবৃতা (জরা ও মৃত্যু প্রভৃতিতে পরিবেষ্টিতা) হইয়া নিরন্তর এই সংসারারণ্যে ভ্রমণ করিতেছে[৫]। সর্ব্বরসসমন্বিতা কমল-কুমুদ-কহ্লার প্রভৃতি সুগন্ধি-কুসুমগন্ধ-মোদিতা এই বিস্তৃতা পৃথিবী কালের করতলস্থিত পানপাত্ররূপে বিরাজমানা আছে[৬]। মহর্ষে! যাহার ভুজাস্ফালন নিতান্ত দুঃসহ, যাহার কেশর নিতান্ত দুর্দ্দর্শ ও স্কন্ধদেশ পীবর, সেই নৃসিংহদেব (হিরণ্যকশিপুবধার্থ বিষ্ণুর অবতার) কালের স্বভুজবিরচিত পিঞ্জরের দৈত্যরূপ ক্ষুদ্রপক্ষিবধের ক্রীড়াশকুন্ত অর্থাৎ বাজপক্ষী (বাজ এক প্রকার পক্ষী। ব্যাধেরা ক্ষুদ্র পক্ষী মারিবার জন্য বাজ পুষিয়া রাখে।

* রাজা অর্থাৎ পরব্রহ্ম। তদীয় তেজে মায়া নাম্নী মহিষীর গর্ভে (মায়ায় চিৎপ্রতিবিম্বের আবেশ হওয়ায়) কালের জন্ম হইয়াছে। সুতরাং কাল রাজপুত্র। এই জগৎ রাজ্যের রাজা ব্রহ্ম ও যুবরাজ কাল।

† পানক=পানা। সরবত। পশ্চিম দেশে দধি প্রভৃতি অম্ল পদার্থের সহিত চিনি ও মরিচ প্রভৃতি অর্থাৎ মিষ্ট ও ঝাল প্রভৃতি মিশাইয়া সরবত প্রস্তুত করার প্রথা আছে। ভূতবিভাগ অর্থাৎ ইহা মানুষ, ইহা পশু, ইত্যাদি। কাল সমুদায় ভূতবিভাগ সমুদ্রে মিশাইয়া সরবত করিয়া পান করিয়া থাকে। কালের এক এক বার পানক-পান অর্থাৎ সরবত খাওয়া এক একটা কল্প বলিয়া উৎপ্রেক্ষিত হইয়াছে।

আবশ্যক হইলে তাহাকে ছাড়িয়া দেয়, দিলে তৎক্ষণাৎ সে প্রদর্শিত পক্ষী মারিয়া ফেলে[৭])। যাঁহার ধ্বনি বহু অলাবু ঘটিত বীণার ন্যায় গভীর ও মধুর, এবং যাঁহার ছবি শরন্মেঘের সদৃশ, সেই সংহারভৈরব নামধেয় মহাকালও এই কাল নামক যুবরাজের ক্রীড়াকোকিল[৮]। কালাভিধান রাজপুত্রের অভাব (সংহার) নামা কোদণ্ড (ধনুঃ) সর্ব্বত্রই বিরাজিত আছে। সে ধনুর টঙ্কার অনবরত শ্রবণগোচর হইতেছে এবং তাহা হইতে অজস্র দুঃখবাণ নিঃসৃত হইতেছে[৯]। ব্রহ্মন্! যার পর নাই বিলাসচতুর রাজপুত্র কাল নিজেও দৌড়িতেছে এবং তাহার লক্ষ্যও নিরন্তর দৌড়িতেছে। অথচ সে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতেছে না। সে সকলকেই দুঃখ বাণে বিদীর্ণ করিতেছে। মহর্ষে! আমি সেই জন্যই মনে করি, রাজপুত্র কালই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ লক্ষ্যবেধী এবং ইহার বাণও অব্যর্থ। এই কাল নামক রাজপুত্রই এই জীর্ণ জগতে বিষয়লোলুপ দিগকে মর্কট অপেক্ষা অধিক চঞ্চল করিয়াছে এবং সে স্বয়ং ইহ জগতে উক্তপ্রকারে বিরাজমান থাকিয়া কথিত প্রকারের মৃগয়াবিহার অনুভব করিতেছে[১০]।

চতুর্ব্বিংশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশতিতম সর্গ।

রাম বলিলেন, হে মহর্ষে! আমার বিবেচনায় কাল দুর্ব্বিলাসী দিগের চূড়ামণি অর্থাৎ দুষ্টাশয়গণের বরিষ্ঠ। ইনি পূর্ব্বোক্ত মহাকাল নহেন। ইনি অন্য কাল। অন্য কাল হইলেও ইনি পূর্ব্বোক্ত মহাকালের অন্তর্গত (অবস্থান্তর)। এই কালই ইহলোকে পদার্থ নিচয় সৃজন করে, আবার সংহারও করে। এই কালের অপর নাম দৈব[১]। * একমাত্র ক্রিয়াই ইহার রূপ বা স্বরূপ। অন্য কোন রূপ বা স্বরূপ দৃষ্ট হয় না এবং ইহার কর্ম্মফল নিষ্পাদন করা ব্যতীত অন্য কোন কার্য্য বা চেষ্টা নাই[২]। যেমন প্রখর তাপ দ্বারা হিমরাশি বিনষ্ট হয়, তেমনি, কর্ম্মের বা কালের দ্বারা এই নিখিল প্রাণী বিনষ্ট হইতেছে। (ভাবার্থ এই যে, যে কিছু অর্থ ও অনর্থ—সমস্তই দৈব নামক কালের কার্য্য[৩])। এই যে পরিদৃশ্যমান জগন্মণ্ডল, ইহা উক্ত কালের নর্ত্তনাগার এবং ইহাতে সে নিরন্তর নৃত্য করিতেছে[৪]। এই কাল পূর্ব্বোক্ত মহাকাল অপেক্ষা তৃতীয়। লোকে যাহাকে মহাকাল বলে, তাহাই দৈব ও কৃতান্ত নাম ধারণ পূর্ব্বক ভীষণ নরাস্থিধারীর বেশে নৃত্য করিতেছে[৫]। মহর্ষে! এই নর্ত্তনশীল কৃতান্ত স্বীয় ভার্য্যা নিয়তির প্রতি সাতিশয় অনুরক্ত[৬]। তাহার সংসাররূপ বক্ষে শশিকলার ন্যায় শুভ্র ত্রিধাবিভক্তগঙ্গাপ্রবাহ নিবীত, উপবীত ও অবীতরূপে † বিদ্যমান আছে[৭]। হে ব্রহ্মন্! চন্দ্র ও সূর্য্য কালের করভূষণ, ব্রহ্মাণ্ড তাহার কর্ণিকা (কর্ণাভরণ), এবং সুমেরু তাহার ক্রীড়াসরোজ[৮]। বিচিত্রনক্ষত্রবিন্দুশোভী প্রলয়মেঘদশান্বিত (দশা=বস্ত্রের ছিলা। ফুঁপি)। এই অসীম নভোমণ্ডল কালের বস্ত্র। ইহা একার্ণব জলে

---

* পূর্ব্বোক্ত মহাকালের অবান্তর ভেদ দৈব ও কাল। যে কাল বা কালের যে অবস্থা জীব গণের স্বকৃত কর্ম্মের ফলোৎপত্তির কারণভাব প্রাপ্ত হয় তাহা দৈব। "দীব্যতি ব্যবহরতি প্রাণিনাং কর্ম্মফলদানেন" ইতি দৈবম্। এই দৈবই কৃতান্ত ও ফলাবস্থ কাল। "কলয়তি ফলং সম্পাদয়তি ইতি কালঃ।" অতএব, কাল স্বরূপতঃ এক হইলেও পূর্ব্বাবস্থা ও উত্তরাবস্থা ভেদে দ্বিভেদবিশিষ্ট হয়। পূর্ব্বাবস্থা দৈব ও উত্তরাবস্থা কাল, মৃত্যু ও কৃতান্ত।

† গঙ্গার ৩ ধারা। এক ধারা স্বর্গে, এক ধারা পাতালে, এক ধারা পৃথিবীতে। এই তিনটী কালের গলদেশে উপবীত. নিবীত ও অবীত যজ্ঞসূত্রের ন্যায় ঝুলিতেছে। উপবীত—বামস্কন্ধা-

ধৌত হইয়া থাকে[৯]। এবম্বিধ কালের পুরোভাগে নিয়তিনাম্নী তদীয় কামিনী আলস্যপরিশূন্যা ও প্রাণিভোগানুকূল কার্য্যে ব্যাপৃতা থাকিয়া অনবরত নৃত্য করিতেছে[১০]। প্রাণিগণও সেই চঞ্চলা অমোঘক্রিয়া-শক্তিবিশিষ্টা কৃতান্তকামিনীর নৃত্যদর্শনার্থ জগৎরূপ নর্ত্তনাগারে নিরন্তর যাতায়াত করিতেছে[১১]। দেবলোকাদি সমুদয় লোক উক্তকালকামিনী নিয়তির মনোহর অঙ্গভূষণ এবং পাতালাদি নভস্তল পর্য্যন্ত লম্বমান তাহার কেশ-কবরী[১২]। নিয়তির পাতালরূপ চরণে নরলোক স্থিত জীবমালা নূপুরের ন্যায় শোভমান আছে। সে নূপুর সুকৃত-দুষ্কৃত-সূত্রে গ্রথিত, হাস্য-রোদনাদিরূপ শব্দকারী, ও স্বর্গনরকাদিরূপ উজ্জ্বলতায় ও মালিন্যে ব্যাপ্ত। চিত্রগুপ্ত শুভক্রিয়ারূপা তদীয় সখীর উপকল্পিত প্রাণিকর্ম্মসৌরভ্যরূপ কস্তূরি-তিলকদ্বারা উক্তকালকামিনী নিয়তির যমরূপ (যম=মৃত্যু বা কৃতান্ত। নিয়তি মৃত্যুর দ্বারা এ সমুদায় ভক্ষণ করে; সেইজন্য মৃত্যু তাহার মুখ)। মুখমণ্ডল উত্তমরূপে চিত্রিত করিয়াছে ও করিতেছে[১৩।১৪]। এই কালকামিনী নিয়তি কল্পান্ত সময়ে স্বীয় স্বামীর ইঙ্গিতযুক্তমুখভাব অবগত হইয়া অতিশয় চাঞ্চল্যসহকারে নৃত্য করিয়া থাকে। তখন পর্ব্বতস্ফোটাদিজনিত ভয়ঙ্কর শব্দ তাহার নর্ত্তনশীল চরণের ধ্বনিরূপে প্রতীয়মান হয়[১৫]। নিয়তির পশ্চাদ্ভাগে প্রলয়সমুদ্ভূত ভীষণ বহ্নিরূপ কুমার, ময়ূরের ন্যায় নৃত্য করিয়া থাকে। তৎকালে সংহারদেব মহাদেবের নয়নত্রয়মধ্যবর্ত্তী বৃহৎ রন্ধ্র হইতে ভয়ঙ্কর শব্দ বহির্গত হয়। মহর্ষে! মহাদেবের জটাজূটমণ্ডিত চন্দ্রলাঞ্ছিত বদনপরম্পরা ইহার মুখ এবং ভগবতীর বিকসিতমন্দারমণ্ডিত কবরীভার ইহার চামর[১৬।১৭]। নৃত্য সময়ে তৎসমস্তই পুনঃ পুনঃ বিচলিত বা আন্দোলিত হয়। সংহারভৈরবের উদররূপ বৃহৎ অলাবু তদীয় সহস্রছিদ্রান্বিত ইন্দ্রদেহ-ভিক্ষার কপাল (ভিক্ষাপাত্র)। এই কপাল তখন তদীয় হস্তে বিকটধ্বনি সহকারে অবস্থান করে[১৮]। তখন সর্ব্বসংহারকারিণী নিয়তি কঙ্কাল মালায় নভোমণ্ডল পরিপূর্ণ করতঃ আপনা আপনি ভীত হইতে থাকেন[১৯]। বিবিধাকারসম্পন্ন জীবের মস্তক, সকল পুষ্করমালার ন্যায় নিয়তির কণ্ঠদেশে

সক্ত যজ্ঞসূত্র। অবীত=দক্ষিণস্কন্ধাসক্ত যজ্ঞসূত্র। নিবীত=কণ্ঠলম্বিত মালাকার যজ্ঞ সূত্র। বিন্দু=ফুট ফুট। আকাশ যেন ছিট্ কাপড়, নক্ষত্রবৃন্দ তাহার চিত্রবিন্দু, প্রলয়কালের মেঘ যাহার ছিলা বা ঝুঁপি, কাল ঈদৃশ ছিট্-কাপড় পরিধান করিয়া আছে।

দেদীপ্যমান হয়। কালের কল্পান্ততাণ্ডববিলাসে * তাহা নিরন্তর বিচলিত হইতে থাকে[২০]। মহর্ষে! প্রলয়কালে কালের ও কালবনিতার নৃত্যধ্বনি (পদশব্দ) শ্যামবর্ণ পুষ্কর ও আবর্ত্তকাদি † মেঘের গর্জ্জন এবং সে গর্জ্জনে দেবগণীয়ক গন্ধর্ব্বেরাও পলায়ন করিয়া থাকেন[২১]।

মহর্ষে! চন্দ্রমণ্ডল এই নৃত্যকারী কৃতান্তের কুণ্ডল, এবং তারকা ও চন্দ্রিকা সমন্বিত ব্যোম (নভোমণ্ডল) কেশভূষণ[২২]। তাহার এক কর্ণে হিমালয় ও অপর কর্ণে কাঞ্চনগিরি সুমেরু শোভা পাইয়া থাকে[২৩]। চন্দ্রও কালকৃতান্তের কর্ণাভরণ অর্থাৎ শোভমান কুণ্ডল এবং লোকালোক পর্ব্বত তদীয় কটিতটের মেখলা (কটীভূষণ অর্থাৎ গোট্[২৪])। ঋষে! বিদ্যুৎ এই কালের বলয়াকৃতি কঙ্কণ (হস্তভূষা)। এ কঙ্কণ ইতস্ততঃ আন্দোলিত হইয়া থাকে। অপিচ, জলদজাল ইহার বিচিত্র অংশুপট্টিকা (গায়ের কাপড়। দোলাই)। এ অংশুপট্টিকা বায়ুভরে সঞ্চালিত হইয়া শোভা বিতরণ করিয়া থাকে[২৫]। অপক্ষীয়মান (যাহা দিন দিন ক্ষয় হয় তাহা অপক্ষীয়মান) জগৎ হইতে বিনির্গত অথবা পূর্ব্ব সৃষ্টি হইতে কৃতান্ত কর্ত্তৃক সংগৃহীত মুষল, পট্টিশ, প্রাস, শূল, তোমর ও মুদগর প্রভৃতি তীক্ষ্ণ অস্ত্র সমূহে বিরচিত শোভাময় মালা ইহার গলদেশে নিক্ষিপ্ত আছে[২৬]। এই মালা সংসরণশীল জীবমৃগ-বন্ধনার্থ দীর্ঘীকৃত, অনন্ত মহাসূত্রে গ্রথিত এবং এই মালা উক্ত মহাকালের করচ্যুত হইয়া কৃতান্ত নামা কালের কণ্ঠে শোভা বিস্তার করিতেছে[২৭]। বিবিধরত্নসমুজ্জ্বল জীবরূপমকরলাঞ্ছিত সপ্তসাগররূপ কঙ্কণশ্রেণী তদীয় কর-দ্বয়ের আভরণ[২৮]। অপিচ, লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহাররূপ আবর্ত্তযুক্ত, সুখদুঃখসংশ্রববিশিষ্ট, এবং শ্যামবর্ণ প্রকৃতিগুণ তদীয় রোমাবলিরূপে বিরাজ করিতেছে[২৯]। ‡

এবংরূপবিশিষ্ট বা এবম্প্রকার কৃতান্তরূপী কাল কল্পশেষে তাণ্ডবোদ্ভব নৃত্য-চেষ্টা উপসংহার করতঃ অবস্থান করেন। অর্থাৎ তাদৃশ নৃত্যচেষ্টা হইতে বিরত হইয়া কিছু কাল বিশ্রাম করেন। পরে পুনর্ব্বার ব্রহ্মাদির সহিত

---

* পুরুষের উৎকট নৃত্য তাণ্ডব এবং স্ত্রীলোকের কোমল নৃত্য লাস্য।

† মহাপ্রলয় সময়ে জগৎ বিনাশার্থ যে মেঘ সমূহের উদয় হয় সেই সকল মেঘের নাম পুষ্কর, আবর্ত্তক, সম্বর্ত্তক, প্রভৃতি এবং সে সকল প্রগাঢ় নীলবর্ণ।

‡ পক্ষান্তরে আবর্ত্ত=জলের ভ্রমণ। জলস্রোতের পাক। শ্যামবর্ণ প্রকৃতিগুণ অর্থাৎ তমোগুণ।

মহেশ্বর প্রভৃতি স্বজন পূর্ব্বক এই জরা মরণ শোক, দুঃখ ও অকিঞ্চন বিভূষিতা সৃষ্টিরূপিণী স্বীয় নাট্যলীলা বিস্তার করিয়া থাকেন[৩০।৩১]। বালক যেমন কর্দ্দম লইয়া নানাপ্রকার পুত্তলিকা প্রভৃতি নির্ম্মাণ করে, এবং পর ক্ষণেই আবার তাহা সংহার করে, তেমনি, কালও চতুর্দ্দশ ভুবন, বিবিধ দেশ, বন, নানাবিধ শৈল, অসংখ্য ও বিবিধ জীব ও তাহাদের আচারপরম্পরা সৃষ্টি করিয়া পুনর্ব্বার তাহা সংহার করিতেছে[৩২]।

পঞ্চবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ষড়বিংশতিতম সর্গ।
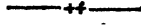
শ্রীরাম কহিলেন, মহর্ষে! কাল এই সংসারে উল্লিখিত সমুদায়ের সৃজন ও সংহার করিতেছে করুক—তাহাতে আমার কি? কিন্তু মাদৃশ ব্যক্তি কিরূপে তাহাতে আস্থাবান্ হইতে পারে?[১] হে মুনিবর! দুঃখের বিষয় এই যে, উক্ত দৈব প্রভৃতির দ্বারা আমরা বিমোহিত হইয়া বিক্রীতের ন্যায় ও আরণ্য মৃগের ন্যায় অবস্থান করিতেছি[২]। বলিতে কি, অনার্য্যচরিত সংহারসমুদ্যত কাল লোক সকলকে নিরন্তর আপদ সাগরে নিমগ্ন করিতেছে। অগ্নি যেমন উচ্চ প্রকাশ শিখার দ্বারা দগ্ধ করে, সেইরূপ, কালও দুরাশা ও দুশ্চেষ্টা উদ্দীপিত করিয়া লোকদিগকে দগ্ধ করিতেছে[৩।৪]। নিয়তি এই কালমর্য্যাদারূপ কৃতান্তের প্রিয়া ভার্য্যা। সে স্ত্রীস্বভাবসুলভ চাপল্য বশতঃ সমাধিপরায়ণ যোগীদিগকেও ধৈর্য্যচ্যুত করিতেছে[৫]। সর্প যেমন বায়ু ভক্ষণ করে, তেমনি, ক্রূরহৃদয় কৃতান্ত অবিশ্রান্ত প্রাণী দিগকে আক্রমণ ও তাহাদিগের তরুণ শরীরে জরা উপস্থিত করিয়া গ্রাস করিতেছে[৬]। আর্ত্ত ব্যক্তিও এই নৃশংসচূড়ামণি কালের করুণাপাত্র নহে। ইহার উদারতা এরূপ অসীম যে এতৎ সংসারে তাহার কাহারও প্রতি পক্ষপাত নাই। অর্থাৎ সে সকলকেই সমভাবে ভক্ষণ করে[৭]। মুনিবর! অজ্ঞ লোক যাহাকে ভোগস্থান বলিয়া জানে, সে সমস্তই দারুণ দুঃখের আধার এবং তৃণাদি ব্রহ্মা পর্য্যন্ত লোকশ্রেণীও দুঃখের আবাস ভূমি। তাহাদের ঐশ্বর্য্য বিরক্ত দশায় নিতান্ত তুচ্ছ[৮]। জীবন নিতান্ত চঞ্চল, যৌবন অচিরস্থায়ী, বাল্যকাল অজ্ঞানাচ্ছন্ন,[৯] লোক সকল বিষয়ানুসন্ধানে কলঙ্কিত অর্থাৎ মলিনচিত্ত, বন্ধুবান্ধব ভববন্ধনের রজ্জু, ভোগ সকল মূর্ত্তিমান্ মহারোগ, এবং সুখ মৃগতৃষ্ণিকার অনুরূপ[১০]। ইন্দ্রিয়গণই পরম শত্রু। সে সত্যে অসত্য দেখাইতেছে। আত্মার পরম রিপু মন, আত্মা তৎসহবাসে আপনিই আপনাকে ক্লেশ দিতেছেন[১১] অহঙ্কার আত্মকলঙ্কের কারণ, বুদ্ধি নিতান্ত মৃদু, অর্থাৎ আত্মনিষ্ঠায় অদৃঢ়, ক্রিয়া অর্থাৎ শারীরিক প্রবৃত্তি ক্লেশপ্রসবিনী, লীলা অর্থাৎ মানসী চেষ্টা স্ত্রীপ্রসঙ্গে পর্য্যাপ্ত,[১২] বাসনা বিষয়ের প্রতিই ধাবমানা, আত্মস্ফূর্ত্তি দুর্লভ, স্ত্রী সকল দোষের পতাকা ও

অনুরাগ নীরস (রস=ব্রহ্মানন্দ, তৎপরিশূন্য) হইয়াছে[১৩]। অধিক কি বলিব, বস্তু অবস্তু বলিয়া প্রতীত হইতেছে অহঙ্কারপরায়ণ জীব তাহাতেই অন্তঃকরণ সমাহিত করিয়াছে, এবং ভাব সকল অভাবে পূর্ণ হইয়াছে[১৪]। মহর্ষে! কাহারও অন্তঃকরণ সুস্থির নহে, সকলেই নিরন্তর দহ্যমান; এবং সকলেরই রাগরূপ রোগ নিতান্ত প্রবল। সুতরাং বৈরাগ্য নিতান্ত দুর্লভ[১৫]। লোকের দৃষ্টি অর্থাৎ জ্ঞান রজোগুণে কলুষিত। তমোগুণ অনবরত বর্দ্ধিত হইতেছে ও সত্ত্বগুণ দূরে পলায়ন করিয়াছে। কাযেই তত্ত্বজ্ঞান দূরপরাহত[১৬]। জীবন অস্থির অর্থাৎ ক্ষণধ্বংসী, মৃত্যু আগমনোন্মুখ, ধৈর্য্য নাই বলিলেও বলা যায়। অনুরাগ কেবল অসার বিষয় সুখের অনুসরণে নিরন্তর ধাবমান[১৭]। বুদ্ধি মূর্খতাদোষে নিতান্ত মলিনা, শরীর বিনাশের বশীভূত, জরা এই শরীরে অগ্নির ন্যায় জ্বলিতেছে ও পাপ অনবরত স্ফূর্ত্তি পাইতেছে[১৮]। যৌবন যত্ন করিলেও থাকে না, সৎসঙ্গ দূরপরাহত, স্বর্গাদি গতি স্বপ্নতুল্য ও সত্যের উদয় কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না[১৯]। অন্তঃকরণ মোহজালে অত্যন্ত আচ্ছন্ন, সন্তোষ দূরে পলায়ন করিয়াছে, উজ্জ্বল দয়া উদিত হয় না, কেবল নীচতারই (নীচতা=অসূয়াদি) প্রাদুর্ভাব দেখা যায়[২০]। ধীরতা অধীরতায় পরিণত, লোক সকল মাত্র জন্মমৃত্যুস্বর্গনরকপরিভ্রমণকারী, দুর্জ্জনসঙ্গই সর্ব্বত্র সুলভ ও সাধুসঙ্গ নিতান্ত দুর্লভ[২১]। দৃশ্যমাত্রেই জন্ম মৃত্যুর বশীভূত ও বিষয়বাসনা বন্ধনের হেতু। মৃত্যু এই প্রাণিনিকায় (জীব সংঘ) হরণ করিয়া নিত্য কোথায় লইয়া যাইতেছে তাহা বোধগম্য হয় না[২২]। ঋষে! যাহাতে কালভয় নাই, মৃত্যু ভয় নিবারিত আছে, তাহা এ সংসারে দৃষ্টিগোচর হয় না। যাহা সদুপদেশ, তাহাও এ সংসারে অপদেশতা প্রাপ্ত অর্থাৎ স্থানপ্রাপ্ত হইতেছে না। (দিক্ সকল কালে অদৃশ্য হইবে, দেশ সকল নামান্তর প্রাপ্ত হইবে ও পর্ব্বত সকল বিশীর্ণ হইবে)। এ অবস্থায় মাদৃশ ব্যক্তি কিরূপে এই ক্ষণভঙ্গুর সংসারে আস্থাবান্ হইতে পারে?[২৩] সন্মাত্রস্বভাব ঈশ্বর এই আকাশকেও ভক্ষণ করিবেন, পৃথিবীর সহিত সমুদায় ভুবন প্রলয় কবলে নিপতিত হইবে, সাগর সকল শুষ্ক হইবে, তারকাস্তবক বিশীর্ণ হইবে, সিদ্ধগণও বিনষ্ট হইবেন, অসুরগণও বিদীর্ণ হইবেন, ধ্রুব অধ্রুব হইবেন, অমরগণও মৃত্যুর বশীভূত হইবেন, কিছুই থাকিবে না। সমস্তই ফেণতুল্য। ঋষিবর! মাদৃশ ব্যক্তি কি রূপে এই ফেণতুল্য সংসারে আস্থাবান্ হইতে পারে?[২৪।২৫] দেবরাজ ইন্দ্র কালবদনে চর্ব্বিত হন, যমও নিয়ন্ত্রিত হন,

বায়ু অবায়ু হন, সোম ব্যোম হন, মার্ত্তণ্ডও খণ্ডিত হন, ভগবান্ অগ্নিও চিরকালের নিমিত্ত নির্ব্বাপিত হন। কাহারও স্থায়িত্ব দেখিনা। এ দুর্দ্দশা বুঝিতে পারিয়া কোন্ জ্ঞানী এই সারশূন্য সংসারে আস্থা স্থাপন করিতে পারে?[২৭।২৮] ব্রহ্মাও থাকিবেন না, হরিও সংহার দশা প্রাপ্ত হইবেন, সর্ব্বহর হরও অভাব প্রাপ্ত হইবেন। ইহা মনে হইলে কি প্রকারে মাদৃশ ব্যক্তি সংসারে আশ্বাস পাইতে পারে?[২৯] যেহেতু কালের কাল, নিয়তির বিলয় ও শূন্যের (ভূতাত্মক বাহ্যাকাশের) বিনাশ সুস্থির; সেই হেতু এই মিথ্যা সংসারের প্রতি মাদৃশ ব্যক্তির আস্থা স্থাপন নিতান্ত অসম্ভব[৩০]।

ব্রহ্মন্! শ্রবণেন্দ্রিয়ের অবিষয়, বাগিন্দ্রিয়ের অপ্রাপ্য, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অগোচর ও অজ্ঞাতমূর্ত্তি, এমন এক তত্ত্ব আপনিই আপনাতে আপনার ভ্রমদায়িনী মায়াশক্তির দ্বারা বিশ্বভুবন দেখাইতেছেন। যাহা তত্ত্ব, যাহা স্বরূপ, তাহা প্রচ্ছন্ন। তাহাতেই এই ভুবনরূপ বিড়ম্বনা উপস্থিত হইয়াছে[৩১]। পরমাত্মার মূর্ত্তি শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত নহে, বাক্যের ও চক্ষুর অধিগম্যও নহে। আমরা তাঁহারে না জানিতে পারিয়াই পদে পদে ভ্রান্ত হইতেছি। সেই অচিন্ত্যরূপ পরমপুরুষ মায়াযোগে আত্মপ্রতিবিম্বে বিরাজমান থাকিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি সর্ব্বান্তর্যামী। ত্রিলোক মধ্যে এমন কিছুই নাই—যাহা তাঁহার বাধ্য বা নিয়ম্য নহে। তিনিই অহঙ্কারাবিষ্ট ও অভিমানধারী হইয়া সর্ব্বত্র বিরাজমান[৩২]। যদ্রূপ প্রস্তরখণ্ড প্রস্রবণবেগে অবশ হইয়া পর্ব্বত হইতে নিপতিত হয়, তদ্রূপ, রথ ও অশ্ব সহিত দিবাকর সেই তত্ত্ব (পরমাত্মা) কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া শিলা, শৈল, বপ্র, প্রভৃতি প্রদেশ আলোকিত করতঃ বিচরণ করিতেছেন[৩৩]। যেমন পক্ক আক্ষোট ফল (আখ্‌রোট) ত্বকবেষ্টিত, তেমনি, তাহারই প্রভাবে এই সুরাসুরগণের আশ্রয় ভূগোল ধিষ্ণ্যচক্রে (জ্যোতিশ্চক্রে) বেষ্টিত[৩৪]। * স্বর্গে দেবগণ, পৃথিবীতে মনুষ্যগণ, পাতালে ভুজঙ্গমগণ, তাঁহারই সঙ্কল্পমাত্রে সমুৎপন্ন হইয়াছেন এবং তাঁহারই ইচ্ছাপ্রভাবে বিনষ্ট হইবেন[৩৫]। দুরাচার কন্দর্প তাঁহারই প্রভাবে লব্ধপরাক্রম হইয়া নিতান্ত বিশদৃশরূপে লোক সকলকে আক্রমণ পূর্ব্বক স্বীয় প্রভাব প্রদর্শন করিতেছে[৩৬]। যেমন মত্তমাতঙ্গগণ মদবর্ষণ করতঃ সমস্তাৎ

---

* ভূ=পৃথিবী। গোল=বর্ত্তুল। পৃথিবী কদম্বফুলের মত গোল। ধিষ্ণ্যচক্র=খ গোলস্থিত চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ ও উপগ্রহ প্রভৃতির সংস্থান। ধিষ্ণ্যচক্রের অন্য নাম জ্যোতিশ্চক্র। চক্রতুল ভ্রমণ করে বলিয়া চক্র। জ্যোতিশ্চক্র পৃথিবী বেষ্টন করিতেছে।

সুরভিত করে, তেমনি, ঋতুরাজ বসন্তও তাঁহার মহিমায় বিকসিত কুসুমের গন্ধে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত করিয়া লোকের অন্তঃকরণ বিচলিত করিয়া থাকেন[৩৭]। কামিনীরা যে অনুরাগ ভরে চঞ্চলনয়নে কটাক্ষ নিক্ষেপ করে, যে কটাক্ষে দৃঢ় হৃদয় ভেদ ও অতিবিবেকীর চিত্ত ধৈর্য্যচ্যুত হয়, সে কটাক্ষেও তাঁহার (পরমাত্মার) প্রভাব অনুস্যূত আছে[৩৮]।

মহর্ষে! যাঁহারা পরোপকারকারিণী ও পরসন্তাপতাপিতা স্নিগ্ধা বুদ্ধির সাহায্যে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছে, আমি বিবেচনা করি, তাহারাই সুখী[৩৯]। এই সংসাররূপ সাগরে কালরূপ বাড়বানল নিরন্তর প্রজ্জলিত। ইহার কল্লোলপরম্পরা প্রতিনিয়ত সমুত্থিত ও বিলীন হইতেছে[৪০]। মৃগ যেমন অরণ্যমধ্যে লতাজালে বদ্ধ হইয়া অবসন্ন হয়, সেইরূপ, মানবগণও মোহবশতঃ জীবনরূপ অরণ্যে দুরাশাপাশে বদ্ধ হইয়া ক্লেশরাশি ভোগ করতঃ অবসন্ন হইতেছে[৪১]। হে ব্রহ্মন্! লোক সকল পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক কুকর্ম্মের অনুষ্ঠানে রত থাকিয়া স্ব স্ব আয়ু বৃথা নষ্ট করিতেছে। তাহারা যে ফলকামনায় ঐরূপ জুগুপ্সিত ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয়, সে সকল আকাশজাত বৃক্ষের লতার ফলের সদৃশ। সে সকল যে কিরূপ সত্য তাহা বিখ্যাত বিচারবিৎ পণ্ডিতগণও বিশেষরূপে অবগত নহেন[৪২]। ঋষিপ্রবর! লোক সকল আজ্ উৎসব, আজ্ এই সুখ, আজ্ এই ভোগ, এই আমার বন্ধু, ইত্যাদি মিথ্যা ভাবে ভাবিত হইয়া এবং সুখময়ী কল্পনায় মোহিত হইয়া দিবারাত্র বিগলিত হইতেছে[৪৩]।

ষড়বিংশ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তবিংশতিতম সর্গ।

রামচন্দ্র বলিলেন, হে তাত! আরও বলি, শ্রবণ করুন। জগতের স্বরূপ আপাত-রমণীয় সত্য; পরন্তু ইহা অতীব অরমণীয়। অত্রস্থ সমুদায় বস্তুই পরিণাম-বিরস। ইহাতে অবস্থান করিলে এমন কোন পদার্থ পাওয়া যায় না যাহা পাইলে চিত্ত বিশ্রান্তিপদে প্রতিষ্ঠিত হয়[১]। ভাবিয়া দেখুন, বাল্যকাল কেবল নানাপ্রকার কল্পিত ক্রীড়াকৌতুকে অতিবাহিত হয় এবং অন্তঃকরণ তখন নিতান্ত চঞ্চল থাকে। পরে যৌবন, তাহাও দোষদুষ্ট। যৌবনকালে মনোরূপ হরিণ কেবল নারীরূপ গিরিগুহার অন্বেষণে কালহরণ করে; সুতরাং সে কালেও শান্তির অভাব। অনন্তর বার্দ্ধক্য আগত হইলে শরীর জীর্ণ হয়, সুতরাং তখন ক্লেশ ব্যতীত অন্য কিছু থাকে না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। হে ঋষিপ্রবর! লোক সকল কথিত প্রকার অবস্থায় নিপতিত থাকিয়া কেবল দগ্ধই হইতেছে, শান্তিলাভে সমর্থ হইতেছে না[২]। জরারূপ তুষার-সম্পাতে শরীররূপ সরোজিনী বিগলিত হইলে, প্রাণরূপ মধুকর তৎক্ষণাৎ তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্থানান্তরিত হয়, তখন এই সংসাররূপ সরোবর শুষ্ক হইয়া যায়[৩]। লতা যেমন যেমন পুষ্পভরে অবনত ও পরিপাক প্রাপ্ত হইতে থাকে তেমনি তেমনি দর্শকের মনঃপ্রীতি হইতে থাকে। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, এই দেহবল্লীও জরার আবির্ভাবে যেমন যেমন পাক প্রাপ্ত হইতে থাকে, তেমনি তেমনি কৃতান্ত তৎপ্রতি পরিতুষ্ট হইতে থাকে। (জরাজীর্ণ দেহ দেখিলে কৃতান্তের আনন্দ হয়)[৪]। দেখা যায়; তৃষ্ণা ইহলোকে কেবল বৃথা তরঙ্গিণীর ন্যায় প্রবলপ্রবাহে অখিল ও অনন্ত পদার্থ কবলিত ও সন্তোষ-তরুর মূল উৎখাতিত করিয়া নিরন্তর প্রবাহিত হইতেছে[৫]। আর এই চর্ম্মনিবদ্ধা দেহ-তরণী ভবসাগরোপরি প্রতিমুহূর্ত্তেই লোলিত, ভ্রমিগ্রস্ত ও আলোড়িত হইতেছে। ইন্দ্রিয়রূপ মকর আক্রম করিলে ইহা আর ক্ষণকালও থাকিবেক না, নীচে নিমগ্ন হইবে[৬]। ঋষে! কাম প্রকাণ্ড মহীরুহের সদৃশ। তাহা তৃষ্ণা-লতায় সমাচ্ছন্ন। তাহার শাখা ও প্রশাখা অসংখ্য। মনোরূপ শাখামৃগ ফল-কামনায় তাহাতে নিরন্তর পর্য্যটন করিতেছে অথচ অভিলষিত সাধনে সমর্থ হইতেছে না[৭]। আমি স্পষ্টই দেখিতেছি, সম্প্রতি বিপদে বিষণ্ণ,

মোহে অভিভূত, স্বার্থলাভে গর্ব্বিত ও সুন্দরীগণের কটাক্ষে বিচলিত হন না, এরূপ নর নিতান্ত দুর্লভ[৮]। যাঁহারা মাতঙ্গতরঙ্গসঙ্কুল দুস্তর সংগ্রাম-সাগর অনায়াসে অতিক্রম করেন তাঁহারা আমার নিকট শূর বলিয়া পরিগণিত নহেন কিন্তু যাঁহারা ইন্দ্রিয়রূপ জলনিধির মনোবৃত্তিরূপ তরঙ্গ উত্তীর্ণ হইয়াছেন আমার মতে তাঁহারাই যথার্থ বা উৎকৃষ্ট শূর[৯]। লোক ক্রিয়ানুষ্ঠান করিতেছে সত্য; পরন্তু যাহা পরিণামে সুখ ফল প্রসব করে, যাহাতে সংসার-ক্লেশের অবসান হয়, যাহা আশ্রয় করিলে বিশ্রামসুখ অর্থাৎ পরমা শান্তি লাভ করা যায়, যাহার অনুষ্ঠানে চিত্তবৃত্তি দুরাশাপিশাচী কর্ত্তৃক অভিহত হয় না, এরূপ ক্রিয়া কাহার কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইতে দেখা যায় না[১০]। যাঁহার ধৈর্য্য নিতান্ত দুশ্ছেদ্য, কীর্ত্তি ত্রিভুবনসঞ্চারিণী, বিক্রম সর্ব্বদিগ্‌ব্যাপী, সম্পত্তি অর্থিগণের গৃহপরিপূরণে নিয়োজিত ও লক্ষ্মী বিনয়াদিগুণপরম্পরায় শোভমানা এরূপ মহাপুরুষ দুর্লভ[১১]। ঋষে! সংসারের সর্ব্বত্রই বিপদজাল বিস্তৃত আছে। পর্ব্বতের অভেদ্য প্রস্তরময় ভিত্তির অভ্যন্তরে বজ্রের ন্যায় দুর্ভেদ্য গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে লুক্কায়িত থাকিলেও বিপদ তন্মধ্যে মহাবেগে প্রবেশ করিয়া থাকে। আবার ইহাও দেখা যায়, বিপদের ন্যায় সম্পদও অণিমাদি সিদ্ধির সহিত ভাগ্যবন্ত পুরুষকে আশ্রয় করিয়া থাকে[১২]। হে তাত! ভ্রান্তি বশতঃ পুত্র ও কলত্র প্রভৃতি যে সকল বস্তু সুখসাধন বলিয়া পরিগৃহীত হয়, চরম সময়ে তদ্দ্বারা কিছুমাত্র উপকার হয় না; প্রত্যুত বিষমূর্চ্ছনার ন্যায় যার-পর নাই দুঃখপ্রদ হইয়া থাকে[১৩]। বয়সের ও শরীরের অবসান সময়ে বিষাদময়ী বিষমাবস্থা আগমন করে। অনন্তর সেই জরাকবলিত মনুষ্য তখন আপনার ধর্ম্মসম্পর্কশূন্য অতীত কর্ম্মপরম্পরা স্মরণ করতঃ দুর্ব্বিষহ অন্তর্দ্দাহে দগ্ধ হইতে থাকে[১৪]। মনুষ্য আগে ধনার্জ্জনের ও ভোগতৃষ্ণার প্রাবল্যে মোক্ষ-পথ পরিহার পূর্ব্বক কেবল কাম ও অর্থ চিন্তায় নিবিষ্ট হয়, হইয়া তদনুযায়ী কার্য্য করণ দ্বারা সময় অতিবাহিত করে; কিন্তু যখন চরম সময় আইসে তখন তদীয় অন্তঃকরণ বাতকম্পিত ময়ূরপুচ্ছের ন্যায় নিতান্ত চঞ্চল হইতে থাকে, তখন সে কোনও প্রকারে শান্তি লাভে সমর্থ হয় না[১৫]। পরমার্থচিন্তা বর্জ্জন পূর্ব্বক স্বর্গাদি ফল কামনায় কার্য্যানুষ্ঠান করিলে পদে পদে বিড়ম্বিত হইতে হয়। ভাবিয়া দেখুন, স্বর্গ সুখই বলুন, আর পার্থিব সুখই বলুন, সমস্তই স্বকৃত কর্ম্মের ফল ব্যতীত অন্য কিছু নহে। কিন্তু ক্রিয়াফল মাত্রেই জললহরীর ন্যায় ভঙ্গুর। সুতরাং তাহা পাওয়া না পাওয়া সমান; অথবা তাহা দৈবাৎ

প্রাপ্য। লোক সকল ভিন্নরুচি ও তাঁহারা দৈবাৎ প্রাপ্য বৃথা সেই সেই কর্ম্ম-ফলে বিড়ম্বিত হইয়াছে[১৬]। * মানুষ আজ এই করিব, কাল অমুক করিব, অনবরত সেই সেই চিন্তায় রত আছে। কিন্তু এ সমস্তই শেষে বৈরস্য প্রাপ্ত হয়। কথিত প্রকার পরিণামবিরস চিন্তায় নিবিষ্ট ও দিবানিশি পুত্রকলত্র প্রভৃতি পরিজনবর্গের সন্তোষসম্পাদনে রত থাকিয়া কালযাপন করিতে করিতে জরার কবলে নিপতিত হইয়া বিবেকবিহীন হইয়া পড়ে[১৭]। যেমন বৃক্ষের পত্র পুনঃ পুনঃ সমুৎপন্ন ও পুনঃ পুনঃ জীর্ণ, শীর্ণ ও বিলয় প্রাপ্ত হয়, তেমনি, এই সকল বিবেকবিধুর লোক কতিপয় দিনের মধ্যে বার বার জন্মগ্রহণ করে ও বার বার মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়[১৮]। ব্রহ্মন্! আমি জিজ্ঞাসা করি, মূঢ় ব্যক্তি ব্যতীত কোন্ জ্ঞানী, বিবেকী লোকের অনুসরণ ও সৎকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বৃথা ইতস্ততঃ পর্য্যটনে সমস্ত দিবা অতিবাহিত করিয়া সন্ধ্যাসময়ে গৃহে প্রবিষ্ট হয়? হইয়া সুখময়ী সুপ্তি লাভ করিতে পারে?[১৯] মনে করুন, যেন সমুদায় শত্রু বিদ্রাবিত হইয়াছে, লক্ষ্মীও অভিমুখী হইয়াছেন, সুখভোগও আরব্ধ হইয়াছে; কিন্তু হইলে কি হইবে, মনুষ্য যেমন কষ্ট কল্পনার পর সুখভোগে প্রবৃত্ত হয়, অমনি মৃত্যু অলক্ষিতরূপে আগমন করিয়া তাহাকে কবলিত করে[২০]। জানিনা, কিজন্য যে লোক সকল কি এক অদ্ভুত অনির্দ্দেশ্য কারণে পরিবর্দ্ধিত, নিতান্ত অসার, তুচ্ছ ও ক্ষণধ্বংসী সাংসারিক ভাবে নিরন্তর বিমোহিত ও ঘূর্ণমান হইতেছে তাহা বোধগম্য করা নিতান্ত কঠিন। ঐ সকল লোক মৃত্যুকে দেখিতে পায় না এবং আপনার আগমন ও গমন কিছুর কিছুই জ্ঞাত নহে[২১]। যদ্রূপ যজমান যজ্ঞকার্য্যসাধনার্থ যূপনিবদ্ধ মেষ দিগকে সংহার করে, সেইরূপ, লোক সকল বিষয়ভোগে ও দেহপোষণাদির দ্বারা যাহার পুষ্টি সাধন করে এবং যাহার নিমিত্ত কুৎসিত কর্ম্মপাশে বদ্ধ হয়, সেই প্রিয়তম প্রাণও তাহাদিগকে কালমুখে নিপাতিত করিয়া শরীরাবসানে অন্তর্হিত হয়[২২]। † মহর্ষে! তরঙ্গমালার ন্যায় ভঙ্গুর এই লোকপ্রবাহ যে কোথা

* কর্ম্মফল, স্বর্গাদি ক্ষণিক। সেই হেতু তাহা পাওয়া না পাওয়া তুল্য। তাহা বিড়ম্বনা ব্যতীত অন্য কিছু নহে। অল্পায়ু পুত্র লাভ ও মৎস্যের বড়িশবিদ্ধ আমিষ লাভ যদ্রূপ, কাম্য-ফললাভও তদ্রূপ। অথবা ভিন্নরুচি অর্থাৎ বিবিধ বিষয় লাভ তদ্রূপ। ইহা শাস্ত্র, যুক্তি, অনুভব, ত্রিবিধ প্রমাণে প্রমিত হয়।

† অন্য প্রকার অর্থও হয়। যথা—যাঁহারা কেবল মাত্র বিষয়সেবা ও দেহপোষণে তৎপর হইয়া বৃথা পীবর অবস্থায় অবস্থান করে, এক দিনের জন্যও বিবেকবৈরাগ্যাদি

হইতে নিরন্তর আগমন করিতেছে ও কোন স্থলেই বা নিরন্তর গমন করিতেছে তাহা কেহই বিদিত নহে[২৩]। যদ্রূপ চঞ্চলষট্পদসেবিত লোহিতপর্ণা বিষলতা অগ্রে মনোহারিণী, পরে প্রাণনাশিনী হয়, সেইরূপ, তরলায়তলোচনা বিম্বোষ্ঠী রমণীরাও অগ্রে সৌন্দর্য্যচাতুর্য্যে মনোহরণ ও তৎপরে প্রাণ বিনাশ করিয়া থাকে[২৪]। যেমন যাত্রায় বা মহোৎসবে লোক সকল নানা স্থান হইতে আগমন পূর্ব্বক পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট সঙ্কেত ও অভিপ্রায় অনুসারে একত্র সমবেত হয়, তেমনি, জীবগণও পরস্পর পুত্র, মিত্র ও কলত্রাদি সহ একত্র মিশ্রিত হইয়া থাকে। এ ভাব বা এ সংযোগ মায়া ব্যতীত অন্য কিছু নহে[২৫]। প্রদীপ যেমন রাত্রিকালে রাশি রাশি তৈল ও ভূরি ভূরি বর্ত্তি গ্রাস করিয়া অবশেষে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়, তখন আর তাহার অস্তিত্বপ্রতীতি হয় না, এই দশা(অবস্থা)-শতসমন্বিত ও স্নেহপরিপূর্ণ ক্ষণস্থায়ী সংসারও সেইরূপ। অর্থাৎ ইহার প্রকৃত তত্ত্ব প্রতীত হয় না[২৬]। এই সংসার কুলালচক্রের সদৃশ। কুলালচক্র যদ্রূপ অস্থির, ইহাও তদ্রূপ অস্থির। সংসার ও কুলালচক্র বর্ষাকালসমুদ্ভূত জলবিম্বের ন্যায় ভঙ্গুরস্বভাব ও ভ্রমিশীল। পরন্তু উক্ত উভয়ই বিদ্যুতের ন্যায় অস্থায়ী হইলেও অসাবধানবুদ্ধি পুরুষের স্থায়িত্ব ভ্রম উৎপাদন করিয়া থাকে। (কুলালচক্র যখন অত্যন্ত বেগে ঘুরে, তখন বোধ হয়, তাহা ঘুরিতেছে না, স্থির হইয়াই আছে)[২৭]। যেমন শিশির কাল আগত হইলে সুশোভন সরোরুহের সমুজ্জ্বল শোভা ও সৌগন্ধ্য বিনষ্ট হয়, তেমনি, জরার আবির্ভাবেও মনুষ্যের সৌকুমার্য্য ও সৌন্দর্য্য প্রভৃতি দূরে পলায়ন করে[২৮]। আপনি দেখুন, ইহ সংসারে পাদপগণ দৈব (ভূমি, জল ও অনল প্রভৃতি) হইতেই জন্ম, বৃদ্ধি, পত্র, পুষ্প, ফল ও ছায়া প্রভৃতি লাভ করে, করিয়া পুনঃ পুনঃ লোকের উপকার সাধন করে; কিন্তু দুরাচার লোক কঠোর কুঠারের আঘাতে অনায়াসেই তাহাদিগকে ছেদন করিয়া থাকে। এরূপ দুর্ব্বৃত্ত সংসারে আশ্বাস লাভের সম্ভাবনা কি? (মৃত্যু উপকারী অপকারী গণনা করেন না, সকলকেই

অভ্যাস করে না, তাহারা নর-মেষ। এই সকল নর-মেষ নিতান্ত কুৎসিত কর্ম্মযূপে বাঁধা থাকে এবং প্রাণরূপ যজমান—যে যজমান তাহাদিগকে পীবর করিয়াছিল সেই যজমান—প্রথমতঃ তাহাদের মুখ দোষ-কজ্জলে কৃষ্ণবর্ণ করিয়া সংস্কার সাধন করে, অনন্তর রোগরূপ পুরোহিত আসিয়া তাহাদিগের সংজ্ঞপন ও বিশসন কার্য্য (বধ ও খণ্ড খণ্ড করা) সমাধা করিয়া থাকে। তখন তাহারা অভাবগ্রস্ত হয় এবং যে সুখের আশায় ছিল, বা সেই সকল কার্য্য করিয়াছিল, সে সুখে বঞ্চিত হয়।

হনন করিয়া থাকেন)[২৯]। স্বজনসংসর্গ বিষবৃক্ষের অনুরূপ। বিষবৃক্ষ দেখিতে সুন্দর, স্বজনসংসর্গও আপাত রমণীয়। বিষবৃক্ষ সংসর্গী নরের দাহ ও কাশ্মল্যাদি (মূর্চ্ছা প্রভৃতি) জন্মায়, স্বজনসংসর্গও সংসর্গীর দাহমোহাদি উৎপাদন করে। বিষবৃক্ষ অন্তর্ব্বিঘাতের অর্থাৎ জীবন বিনাশের কারণ, স্বজনগণও অন্তস্তত্ত্ব (আত্মজ্ঞান) বিঘাতের হেতু। মহর্ষে! এতাদৃশ দোষাস্পদ স্বজনসংসর্গে অবস্থান করিলে যে পদে পদে মোহাভিভব সঙ্ঘটিত হইবে সে বিষয়ে সংশয় নাই[৩০]। সংসারে এরূপ দৃষ্টি কি আছে—যাহাতে দোষসম্পর্ক নাই? এরূপ বিষয় কি আছে—যাহাতে দুঃখদাহ উপস্থিত হয় না? এমন প্রজা (উৎপন্ন বস্তু) কি আছে—যাহার বিনাশ নাই? এমন ক্রিয়াই বা কি আছে—যাহা মায়াসম্পৃক্ত নহে?[৩১] হে মহর্ষে! যে ব্যক্তি কল্পান্তজীবী সে বহুকল্পজীবীর নিকট অল্পায়ুঃ। আবার বহুকল্পজীবী তদপেক্ষা বহুকল্পজীবী ব্রহ্মার নিকট অল্পজীবী। অতএব, অবয়বশালী কালসমূহের অল্পত্ব বহুত্ব অসত্য বৈ সত্য নহে। অর্থাৎ কালের অল্পত্ব ও বহুত্ব ঔপাধিক ও কাল্পনিক; সুতরাং মিথ্যা[৩২]। যেমন পর্ব্বত সকল সর্ব্বত্রই পাষাণময়, পাদপ সকল দারুময়, পৃথিবী মৃত্তিকাময়, তেমনি, মানবগণ সর্ব্বত্রই মাংসাদিময়। সুতরাং সে সকল জড়বিকার ব্যতীত অন্য কিছু নহে। পুরুষপরম্পরাপ্রচলিত ব্যবহার অনুসারে বস্তু সকলের ভিন্ন ভিন্ন নাম ও আকৃতি প্রভৃতি কল্পিত হইয়াছে মাত্র; বস্তু কল্পে সমস্তই অসত্য[৩৩]। পর্ব্বত বলুন, আর পাদপ বলুন, সমস্তই মহাভূতের বিকার। দুঃখের বিষয় এই যে, অবিবেকী নর মোহ বশতঃ ভূতবিকারে সত্য জগৎ দর্শন করিতেছে। যাঁহারা বিবেকী অর্থাৎ জ্ঞানবান্ তাঁহারা এই ব্রহ্মাণ্ডকে পঞ্চভূতের সমবায় ব্যতীত কোন বাস্তব পদার্থ মনে করেন না[৩৪]। * হে সাধো! মানুষ যখন স্বপ্নে অলীক বিষয় সম্ভোগ করিয়াও বিস্মিত হয়, তখন, এই মিথ্যাবিজৃম্ভিত জগতে সাধুদিগের বিস্ময়াবেশ আশ্চর্য্যের বিষয় নহে[৩৫]। পূর্ব্ব বয়স হইতে এ পর্য্যন্ত যে আকাশলতার ফলতুল্য

---

* মূল শ্লোকটীতে অনুবিৎ প্রভৃতি কএকটী শব্দের দ্বারা পঞ্চভূতাত্মকতা বুঝান আছে। আমরা তাহার ভাবার্থের অনুবাদ দিলাম। যদি কেহ শব্দার্থ বুঝিতে চাহেন, তাহা হইলে টীকা দেখিবেন। যথা—পরস্পরং অনুবিধ্যত ইতি অনুবিৎ। অর্থাৎ পঞ্চভূতই পরস্পর মিলিত হইয়া পর্ব্বতাদি আকারে প্রতিভাত হইতেছে। পয়ঃ অর্থাৎ জলভূত। তদনুবদ্ধভূত অগ্নি অর্থাৎ তেজোভূত। অন্তময় অর্থাৎ বায়ুভূত। নভঃ অর্থাৎ আকাশ। স্থা অর্থাৎ পৃথিবী পদার্থলক্ষ্মী চেতনা অর্থাৎ বুদ্ধি—অবিবেকীর বুদ্ধি।

মিথ্যা ভোগের প্রতি লোকের অত্যাসক্তি জন্মিয়াছে, আমার বিশ্বাস—তাহাতেই আত্মতত্ত্বের কথা উদিত হইতেছে না[৩৬]। যেমন ছাগাদি পশু ফলভক্ষণ-বাসনায় অশঙ্কিত হৃদয়ে ধাবমান হইয়া উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ হইতে ধরাতলে নিপতিত হয়, তেমনি, জড়বুদ্ধি লোকেরাও অবিচারিতচিত্তে উচ্চ পদের অভিলাষী হইয়া যার পর নাই অভিভব প্রাপ্ত হইয়া থাকে[৩৭]। দুর্গম-গহ্বরস্থ বৃক্ষাদি ও অদ্যতনীন লোক প্রায় তুল্যানুতুল্য। দুর্গম গিরি-গহ্বরস্থ বৃক্ষের অথবা লতার ফল, পুষ্প, পত্র, ছায়া, কিছুই লোকের উপকারে আইসে না। সুতরাং তাহার উৎপত্তি ও বিনাশ উভয়ই ব্যর্থ। সেইরূপ সংসারী লোকও বৃথা শরীর পীবর করে, এবং তদর্থে বিদ্যা, বিনয়, ধন, সম্পদ, সমস্তই বিনাশ করিয়া থাকে[৩৮]। যেরূপ কৃষ্ণসার মৃগ গহন কাননে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করে, সেইরূপ, মানবগণও কখন দয়াদাক্ষিণ্যাদি-ভূষিত সজ্জনসমাজে এবং কখন বা ক্রোধলোভাদিপরিপূর্ণ ও পাপাসক্ত দুরাচারগণের সন্নিধানে বিহরণ করিয়া থাকে[৩৯]। মহর্ষে! দুরাচার বিধাতা এই সংসারে প্রতিদিন যে সকল নূতন নূতন আপাতমনোহর ও পরিণাম-দুঃখ ভয়ঙ্কর কাণ্ড সংঘটিত করেন, তদ্দর্শনে কোন্ বিবেকসম্পন্ন পুরুষের অন্তঃকরণ বিস্ময়াবিষ্ট না হয়?[৪০] হায়! ব্যক্তিমাত্রেই কামনা, চাতুর্য্য ও প্রতারণা প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তির বশীভূত, ক্রিয়ামাত্রেই নিষ্ফল ও ক্লেশদায়িনী, সাধুসহবাস স্বপ্নেও সুলভ নহে; না জানি, এই ভয়াবহ সংসারে আমার জীবিতসময় কিরূপে অতিবাহিত হইবে![৪১]

সপ্তবিংশতিতম সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টাবিংশ সর্গ।

রামচন্দ্র বলিলেন, ব্রহ্মন্! এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক দৃশ্য জগৎ স্বপ্ন-সন্দর্শনের ন্যায় (ক্ষণিক বা ভ্রম প্রতীতির ন্যায়) অলিক বা অস্থির[১]। আজ্ যেখানে শুষ্কসাগরসংকাশ গভীর খাত দেখা যায়, কাল হয় ত সেই স্থানে মেঘমালা মণ্ডিত পর্ব্বতশ্রেণী দৃষ্ট হইবে[২]। আজ্ যেখানে অব্রভ্র-ভেদী উচ্চবৃক্ষের নিবিড় বন, কাল হয় ত সেই স্থানে সমতল পৃথিবী অথবা গভীর কূপ বিদ্যমান দেখিতে পাইবেন[৩]। আজ্ যে শরীর কৌশেয় বস্ত্রে, মাল্যে ও বিলেপনে ভূষিত; কাল হয় ত দেখিবেন, সেই দেহ বিবস্ত্র অবস্থায় দূরবর্ত্তী গর্ত্তে নিপতিত থাকিয়া পচিতেছে[৪]। এই দেখি, যে নগর ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহারসম্পন্ন মানবগণে পরিপূর্ণ; কতিপয় দিবস পরেই দেখি, সেই নগর জনশূন্য অরণ্যে পরিণত হইয়াছে[৫]। আজ্ এই যে তেজস্বী পুরুষ নৃপতিপদ অলঙ্কৃত করিতেছেন, ইনিই কিছুদিন পরে ভস্মস্তূপে পরিণত হইবেন[৬]। বিস্তীর্ণতায় ও নীলিমায় আকাশের সহিত তুলিত হইতে পারে এরূপ ভীষণ অরণ্যানীও পতাকা-পরিশোভিত নগরী হইতে পারে[৭]। আজ্ যে ঐ লতাচ্ছন্ন ভীষণদর্শন অরণ্য দৃষ্ট হইতেছে, ঐ অরণ্য এক দিবসেই নির্জ্জীব ও নিষ্পাদপ মরুভূমি হইতে পারে[৮]। অধিক কি বলিব, জল স্থল হইতেছে, স্থল জল হই-তেছে ও সমুদ্রও মরু হইতেছে। অধিক কি বলিব, জল, কাষ্ঠ ও তৃণা-দির সহিত সমুদায় জগৎ বার বার বিপরীত ভাব ধারণ করে ও করি-তেছে[৯]। ঋষে! কি বাল্য, কি যৌবন, কি শরীর, কি দ্রব্য, সমুদায় বস্তু অনিত্য ও তরঙ্গের ন্যায় পরিবর্ত্তনশীল[১০]। এ জগতের জীবন বাতায়নসন্নিহিত দীপশিখার ন্যায় চঞ্চল এবং লোকত্রয়বিরাজিত পদার্থশ্রী (বস্তুর শোভা) ক্ষণপ্রভার (বিদ্যুতের) প্রভার ন্যায় ক্ষণিক অর্থাৎ অচির-স্থায়ী[১১]। যেমন কুশূলপূর্ণ (কুশূল=ধান্যাধার, ধানের গোলা) ধান্যরাশি পুনঃ পুনঃ ব্যয় নিবন্ধন ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, এবং তাহা ক্ষেত্রে বপন করিলে বিপরীত অবস্থা (অঙ্কুর) ধারণ করে; তেমনি, এই বহুভূত-পরম্পরাও (প্রাণী অপ্রাণীও) ক্রমানুযায়ী ক্ষয় ও বিপরিত পরিণাম

প্রাপ্ত হইতেছে[১২]। বলিতে কি/ এই আড়ম্বরাতিশয়শালিনী সংসার-রচনা কৌশলাতিশয়শালিনী নর্ত্তকীর ন্যায় অবস্থান করিতেছে। ইহা নর্ত্তনাবিষ্টা নর্ত্তকীর ন্যায় অতি কৌশলে অঙ্গবেশাদি পরিবর্ত্তন দ্বারা পদে পদে ভ্রম জন্মাইতেছে। মনোরূপ পবন যে জীবরূপ ধূলি উদ্ধৃত করিতেছে, তাহাই সংসাররচনা নর্ত্তকীর বস্ত্র এবং প্রাণিগণ যে একবার স্বর্গে অন্যবার নরকে ও আরবার মধ্য লোকে উৎপতিত ও আপতিত হইতেছে, তাহাই তাহার অভিনয়[১৩।১৪]। লোকপ্রসিদ্ধ ক্ষণভঙ্গুর ব্যবহারপরম্পরা তাহার মনোহর চঞ্চল কটাক্ষ। এ নর্ত্তকী অদ্ভুত গন্ধর্ব্ব-নগরতুল্যভ্রমবিধায়িনী। যদ্রূপ ঐন্দ্রজালিক-বনিতা তন্ত্র মন্ত্রবিশেষ বিস্তার করিয়া লোকের নেত্ররশ্মি প্রচ্ছাদন ও অবস্তুতে বস্তু জ্ঞান সমুৎপাদন করে, এই সংসাররচনানর্ত্তকী সেইরূপ ভ্রান্তি অর্থাৎ বস্তুতে অবস্তু ও অবস্তুতে বস্তু দর্শন করাইতেছে। ইহার দৃষ্টি বিদ্যুৎ অপেক্ষাও চঞ্চল। সুতরাং তাহা নৃত্যাসক্তা সংসাররচনা নর্ত্তকীর অনুরূপা[১৫।১৬]। ঋষে! আপনি ভাবিয়া দেখুন,—সেই দিবস, সেই সম্পদ, সেই ক্রিয়া, সেই মহাপুরুষগণ, সকলেই নয়নপথবহির্ভূত ও স্মর্ত্তব্যশেষ হইয়াছেন এবং আমরাও ক্ষণকাল পরে তাঁহাদেরই অনুরূপ রূপ হইব[১৭]। সংসার প্রতিদিন ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে ও প্রতিদিনই উৎপন্ন হইতেছে। কত কাল অতীত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই অথচ আজ্ পর্য্যন্ত পোড়া সংসারের অন্ত অর্থাৎ শেষ হইল না[১৮]। মনুষ্য পশু ও পশু মনুষ্য হইয়া জন্মিতেছে। দেব অদেব ও অদেব দেব রূপে উৎপন্ন হইতেছে। প্রভো! সংসারে স্থির বস্তু কি![১৯] কালরূপী সহস্রকিরণ (সূর্য্য) পুনঃ পুনঃ ভূতরূপ কিরণ জাল সৃষ্টি করতঃ পুনঃ পুনঃ দিবা ও রাত্রি অতিবাহিত করিয়া জীবগণের সংহার বিধান করিতেছেন[২০]। অন্যের কথা কি বলিব,—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব প্রভৃতি বিশ্বস্রষ্টৃগণও স্ব স্ব সৃষ্ট বস্তুর সহিত বাড়বানলকবলিত সলিলরাশির ন্যায় নিয়তই বিনষ্ট হইয়া থাকেন[২১]। কি আকাশ, কি পৃথিবী, কি স্বর্গ, কি বায়ু, কি পর্ব্বত, কি নদী, কি দিক্, সমুদায় বস্তুই সংহাররূপ বাড়বানলের পরিশুষ্ক ইন্ধন (কাষ্ঠ)[২২]। মৃত্যুভীত নরের নিকট ভৃত্য, মিত্র, বান্ধব, বিত্ত, সমস্তই নীরস[২৩]। ভগবন্! যতক্ষণ না মৃত্যুরূপ কুরাক্ষস স্মৃতিপথাগত হয় ততক্ষণ এই জগতের ভাব (বিষয়) সকল রুচিকর অর্থাৎ প্রীতিপ্রদ হইতে থাকে[২৪]। লোক সকল ক্ষণমধ্যে

ধনশালী হয়, আবার ক্ষণমধ্যে দরিদ্র হয়। সেইরূপ, ক্ষণমধ্যে নীরোগ হয়, আবার ক্ষণমধ্যে রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে[২৫]। হে ব্রহ্মন্! এই দগ্ধ সংসার সর্ব্বথা ভ্রমময় ও প্রতিক্ষণেই নানাপ্রকার বিপর্য্যাস সংঘটিত করিতেছে। অথচ ইহাতে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিও বিমোহিত হইতেছেন[২৬]। আর এক আশ্চর্য্য নিদর্শন দেখুন। এই আকাশ কখন নিবিড়নীলমেঘমালায় আচ্ছন্ন হইতেছে, কখন বা স্থবর্ণদ্রবসন্নিভ সমুজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হইতেছে, কখন নীরদপটলরূপ নীলোৎপলমালায় পরিবৃত হইতেছে, কখন বা গভীরঘনগর্জ্জনে পরিপূর্ণ হইতেছে, কখন বা তারকাস্তবকে রঞ্জিত, কখন বা সূর্য্যকিরণে বিদ্যোতিত, কখন বা চন্দ্রিকাভূষণে বিভূষিত হইতেছে। এ ঘটনা কি আকাশের স্বরূপে সন্নিবিষ্ট? তাহা নহে। বর্ণাদিবিহীন আকাশ এই মাত্র ঐরূপ ঐরূপ আকার ধারণ করিল; পরক্ষণেই আবার সে সকল রহিত হইয়া গেল। আকাশ সেই সেই আকারে দর্শকের সন্তোষ অসন্তোষ উভয়ই উৎপাদন করে এবং উভয়বহির্ভূতও করে। এই দৃষ্টান্ত সংসারে আনয়ন করুন, দেখিবেন, সংসার ঘোর মায়াময় অর্থাৎ ভ্রান্তিময়। সংসারের স্বরূপ আকাশেরই অনুরূপ। মহর্ষে! পরিদৃশ্যমান বিশ্ব কেবল আগমের ও অপায়ের (উৎপত্তির ও বিনাশের) বশীভূত সুতরাং আকাশস্বভাবের অনতিরিক্ত। ঋষিবর! ধীর হইলেও কোন্ পুরুষ সংসারের উক্তপ্রকার ক্ষণভঙ্গুরতায় ভয়ব্যাকুল না হয়?[২৭।৩০]

মুনিবর! আপদ ক্ষণকালের মধ্যেই হয় এবং সম্পদও ক্ষণকালের মধ্যে হয়। কেবল বিপদ সম্পদ নহে, জন্ম ও মৃত্যু এ উভয়ও ক্ষণে ক্ষণে হইতেছে। অধিক কি বলিব, সংসারের সমস্তই ক্ষণিক[৩১]। ভগবন্! সংসারের প্রত্যেক পদার্থ পূর্ব্বে একরূপ থাকে, পরে (জন্মকালে) আর এক রূপ হয়। কতিপয় দিবস পরে আবার অন্যপ্রকার হয়। মনুষ্যও জন্মের পূর্ব্বে একরূপ থাকে, জন্মকালে অন্যরূপ হয়, আবার কতিপয় দিবস পরে অন্যবিধ হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, এ সংসারে সদা একরূপ ও সুস্থির, এরূপ কিছুই বা কোনও বস্তু নাই[৩২]। ঘট বস্ত্র হইতেছে এবং বস্ত্রও ঘট হইতেছে। * সংসারে এমন

* ঘট চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া কার্পাস ক্ষেত্রে পতিত হইতেছে, ক্রমে মৃদ্ভাব প্রাপ্ত হইতেছে, তাহা

কোন পদার্থ দৃষ্ট হয় না—যাহা বৈপরীত্য প্রাপ্ত না হয়[৩৩]। যদ্রূপ দিবা ও রাত্রি, উৎপত্তি স্থিতি বৃদ্ধি হ্রাস ও বিনাশ পর্য্যায়ক্রমে প্রাপ্ত হইতেছে এবং সে সকল পুনঃ পুনঃ ক্রমপরিবর্ত্তিত হইতেছে; সেইরূপ, মনুষ্যও জন্ম, বৃদ্ধি, হ্রাস, বিনাশ ও পুনর্জ্জন্ম পাইতেছে ও সে সকল পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া পুনরাগমন করিতেছে[৩৪]। আরও দেখা যায় যে, বলবান্ দুর্ব্বল হস্তে বিনষ্ট হইতেছে, এক ব্যক্তিও শত শত ব্যক্তির প্রাণ সংহার করিতেছে এবং সামান্য ব্যক্তিও উচ্চপদে অধিরূঢ় হইতেছে। অধিক কি বলিব, সমুদায় জগৎ পরিবর্ত্তন-শীল[৩৫]। সত্য সত্যই প্রাণিগণ নিরন্তর প্রাণাদির পরিস্পন্দে বায়ুপরি-স্পন্দিত জলতরঙ্গের ন্যায় আন্দোলিত ও পরিবর্ত্তিত হইতেছে[৩৬]। অল্প দিনেই বাল্যের পরিবর্ত্তন হয়, আবার সেইরূপ অল্প দিনে যৌবনের বিনিময়ে জরা আগমন করে। হে মুনিবর! যখন এই শরীর এক-ভাবে থাকে না, তখন আর বাহ্য বিষয়ে কিরূপে আস্থা স্থাপন করা যাইতে পারে[৩৭]। অন্তঃকরণ কখন আনন্দিত, কখন বিষণ্ণ, কখন বা সমভাবে অধিষ্ঠিত হয়। এইরূপ মনও সকল বিষয়ে নটের অনুকরণ করিয়া থাকে[৩৮]। বিধাতাও ক্রীড়াপরায়ণ বালকের ন্যায় বস্তু সকলকে একবার একরূপ, আরবার অন্যরূপ, পুনর্ব্বার অন্যরূপে সৃজন করেন। অসংখ্য রচনা প্রণালী সৃজন করিতে তাঁহার শ্রান্তি নাই এবং আল-স্যও নাই[৩৯]। অধিকন্তু তিনি তাহাদিগকে পর্য্যায়ক্রমে উপচিত, উৎ-পাদিত, ভুক্ষিত, নিহত ও সৃষ্ট করিয়া দিবসের ও রাত্রের পরিবর্ত্ত-নের ন্যায় পুনঃ পুনঃ হর্ষে ও বিষাদে পরিবর্ত্তিত ও পরিযোজিত করিতেছেন[৪০]। হে ব্রহ্মন্! কি বিপদ, কি সম্পদ, সমুদায়ই পর্য্যায়ক্রমে আবির্ভূত ও তিরোহিত হইয়া থাকে, স্থিরভাবে বা একরূপে থাকে না[৪১]। সর্ব্বসংহারক কাল প্রোক্ত প্রকারে অবলীলাক্রমে সমুদায় জগৎ বিচলিত ও বিপৎপাতে অভিভূত করিয়া ক্রীড়া করিতেছেন[৪২]। এই সংসার অতি বিস্তৃত ও বহু শাখাপ্রশাখান্বিত বৃহৎ বৃক্ষের অনুরূপ। ত্রিভুবনস্থ প্রাণি পরম্পরা ইহার ফল; সে সকল প্রতিদিনই সমবিষম

হইতে ক্রমে কার্পাস বৃক্ষ, তৎপরে তাহা হইতে কার্পাস ও বস্ত্র। এবং ক্রমে ঘটের বস্ত্র ভাব প্রাপ্তি।

অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন বিপাকে পক্ক হইতেছে; অনন্তর সময় পবনে আহত হইয়া নিপতিত হইতেছে*৩।

অষ্টাবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

---

* বিপাক = শুভাশুভ জ্ঞানকর্ম্মের পরিপাক—ফলাবস্থার আগমন। পতন = স্বর্গে, নরকে ও মধ্য লোকে জন্মগ্রহণ।

একোনত্রিংশ সর্গ।

রামচন্দ্র কহিলেন, ভগবন্! কথিতপ্রকার দোষদর্শনরূপ দাবাগ্নি আমার চিত্তকে দগ্ধ প্রায় করিয়াছে, সেই কারণে আমার চিত্তে ভোগ লালসা প্রসর (স্থান) প্রাপ্ত হইতেছে না। মৃগতৃষ্ণিকা (সূর্য্যকিরণে জলভ্রম) মরুভূমিতেই স্ফুরিত হয়, সরোবরে নহে। (অভিপ্রায় এই যে, চিত্তে বিবেকমূল বৈরাগ্য আরূঢ় হইলে ভোগাভিলাষ থাকে না)[১]। বলিতে কি, এই সংসার আমার নিকট প্রতিদিন কটু, কটুতর ও কটুতম হইতেছে। নিম্ব (তিক্ত) যদ্রূপ কাল প্রকর্ষে অর্থাৎ উত্তরোত্তর অধিক তিক্ত হয়, তদ্রূপ, এই সংসারও যতই দিন যাইতেছে ততই আমার নিকট তিক্তপ্রায় হইতেছে[২]। মনুষ্যের অন্তঃকরণ করঞ্জফলের ন্যায় কর্কশ। সেই জন্যই তাহাতে অনবরত দুর্জ্জনতা পরিবর্দ্ধিত ও সৌজন্য ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে[৩]। দেখিতেছি, প্রতিদিন পার্থিব মর্য্যাদা (পৃথিবীর সুখ সৌভাগ্যাদি) শুষ্ক মাষশিম্বীর ন্যায় শীঘ্র শীঘ্র ভাঙ্গিয়া যায়, অধিকন্তু তাহা কখন্ ও কি প্রকারে ভাঙ্গে তাহা লক্ষ্য হয় না। (মাষশিম্বী= মাষ কলাই নামক ডাইলের শিমী। এই শিমি বা শিম্বী পাকিয়া শুকাইলে চট্ চট্ শব্দে ফাটিতে থাকে)[৪]। হে মুনীশ্বর! রাজ্য ও ভোগ, উভয়ই চিন্তার আধার। সুতরাং উভয় (রাজ্য ও ভোগ) অপেক্ষা চিন্তাপরিহীন একান্তশীলতা (নির্জ্জনে নিশ্চিন্ত থাকা) উৎকৃষ্ট[৫]। উদ্যান আমার প্রীতিপ্রদ নহে। স্ত্রীগণও আমার সুখের উপকরণ নহে, এবং অর্থতৃষ্ণাও আমার হর্ষোদ্রেকের কারণ নহে। আমি মনের সহিত উপশান্ত হইব, ইহাই আমার ঐকান্তিক ইচ্ছা[৬]। হে পিতঃ! সংসারের সুখ যেরূপ অনিত্য, অর্থপিপাসা যেরূপ দুরুদ্বহ, অন্তঃকরণ যেরূপ চপল, তাহাতে শান্তিলাভের আশা দুরাশা। কিসে নিবৃত্তি লাভ করিব তাহাই ভাবিতেছি[৭]। অধিক কি বলিব, মরণেও আমার নিরানন্দ নাই এবং জীবনেও আমার প্রীতি নাই। যে অবস্থায় থাকিলে শোকতাপের অতীত হওয়া যায়, আমি সেই অবস্থাই অবলম্বন করিব। তাহা জীবিত কালে অথবা মরণের পরং যখন হয় হউক, সেজন্য ব্যগ্র

নহি[৮]। আমার রাজ্যে প্রয়োজন নাই, ভোগে প্রয়োজন নাই, অর্থে প্রয়োজন নাই, কোন প্রকার চেষ্টাতেও প্রয়োজন নাই। ঐ সকল কেবল অহঙ্কারপ্রভব; পরন্তু তাহা আমার বিদ্রাবিত হইয়াছে[৯]। যাহারা জন্মরূপ চর্ম্মবজ্জুর ইন্দ্রিয়রূপ গ্রন্থিতে বাঁধা পড়িয়াছে, তাহাদের মধ্যে যাহারা বন্ধনবিমোচনার্থ যত্নবান্ হয় তাহারাই প্রাকৃতপক্ষে উত্তম পুরুষ[১০]। যদ্রূপ হস্তী চরণপ্রহারে সুকোমল কমল নিস্পেষিত করে, তদ্রূপ, মকরকেতু স্ত্রীজনসহায়ে ব্যক্তিমাত্রেরই অন্তঃকরণ মথিত ও নিস্পেষিত করিয়া থাকে[১১]। হে মুনীন্দ্র! আজি যদি নির্ম্মল বুদ্ধি সহকারে বিকৃত অন্তঃকরণ সুস্থির না করি, তবে, কাল্ তাহার অবসর কোথায়? প্রসিদ্ধ বিষ বিষ নহে; বিষয়বৈষম্যই শ্রেষ্ঠ বিষ। কারণ, প্রসিদ্ধ বিষ একবারমাত্র জন্ম হরণ করে; কিন্তু বিষয় বিষ বহুজন্ম বিনাশ করে[১২।১৩]। সুখ, দুঃখ, মিত্র, বান্ধব, জীবন, মরণ, এ সকল বন্ধনের হেতু হইলেও জ্ঞানিচিত্তের বন্ধনকারণ নহে। কারণ এই যে, জ্ঞানী ঐ সকলের বশ্য হন না[১৪]। হে ব্রহ্মন্! হে পূর্ব্বাপরতত্ত্ববিৎ! যাহার দ্বারা আমার শোক, ভয় ও আয়াস তিরোহিত হয়, যাহাতে আমার তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়, এক্ষণে সত্বর তাহা আমাকে উপদেশ করুন[১৫]। অজ্ঞতা ভীমরূপা অরণ্যানীর সদৃশী। অরণ্যানী কণ্টকপরিব্যাপ্তা, অজ্ঞতাও দুঃখকণ্টকে পরিপূর্ণা। অরণ্যানী লতাজালে সমাচ্ছন্না, অজ্ঞতাও বাসনাজালে বেষ্টিতা। অরণ্যানী সমবিষম অর্থাৎ উচ্চনীচপ্রদেশ বিশিষ্টা, অজ্ঞতাও স্বর্গনরকভোগপ্রদা[১৬]। হে মুনিবর! বরং ক্রকচ সংঘর্ষ (করাতের দ্বারা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছেদন) সহ্য করা যায়, তথাপি, সংসারব্যবহারসমুত্থিত দুর্ব্বহ আশার ও বিষয়ের প্রহার সহ্য করা যায় না[১৭]। এই ইষ্ট, এই অনিষ্ট, এই কর্ত্তব্য, এই অকর্ত্তব্য, আজ ইহা আছে, কাল তাহা নাই, এইরূপ ভ্রান্ত ব্যবহার আমার অন্তঃকরণকে বায়ুবেগবিতাড়িত রজোরাশির ন্যায় পুনঃ পুনঃ প্রচালিত ও কম্পিত করিতেছে[১৮]। সিংহ যেমন বাগুরা ছিন্ন করে, তেমনি, আমিও বিষয়বিরতির সহায়তায় সংসাররূপ হার ছিন্ন করিব (ছিঁড়িয়া ফেলিব)। ভোগ তৃষ্ণা তাহার তন্তু (সুতা), জীব সমূহ তাঁহার মুক্তা, চৈতন্যব্যাপ্তি তাহার স্বচ্ছতা এবং চিত্ত তাহার উজ্জ্বল মধ্যমণি। ঐ হার কৃতান্ত নামক কালের কণ্ঠভূষণ[১৯।২০]। হে তত্ত্ববিৎসমূহেরশ্রেষ্ঠ! আপনি

শীঘ্র আমার হৃদয়াটবীস্থ মিহিকা/সদৃশ মনস্তিমির, সুখকর ও প্রধান বিজ্ঞান (উপদেশ) প্রদীপ প্রজ্বালিত করিয়া অপসারিত করুন[২১]। হে মহাত্মন্! যেরূপ চন্দ্রোদয়ে নিশার অন্ধকার বিনষ্ট হয়, সেইরূপ, সাধু-সংসর্গে সমুদায় মনঃপীড়া বিদূরিত হইয়া থাকে। আয়ু বায়ুবিঘট্টিত অব্‌ভ্রপটল (মেঘবৃন্দ) বিনিঃসৃত জলকণার ন্যায় ভঙ্গুর, ভোগমেঘপরম্পরা-পরিশোভিনী সৌদামিনীর ন্যায় চঞ্চল ও যৌবনসেবা জলপ্রবাহের ন্যায় অচিরস্থায়িনী। (কিছুদিন প্রবাহিত হইয়া লয় প্রাপ্ত হয়)। এই সকল দেখিয়া, মনে মনে পর্য্যালোচনা করিয়া, আমি শান্তিকেই হৃদয়রাজ্য অর্পণ করিয়াছি[২২।২৩]।

একোনত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিংশত্তম সর্গ।

রাম কহিলেন, মহর্ষে! জীব সকল সঙ্কটাবহ শত অনর্থে পরিপূর্ণ সংসাররূপ মহাগর্ত্তে নিপাতিত ও আত্মোদ্ধারে অসমর্থ আছে, ইহা দেখিয়া আমার মন চিন্তারূপ কর্দ্দমে নিমগ্ন হইয়াছে[১]। আমার মন ভ্রান্ত হইতেছে, পদে পদে ভয় হইতেছে এবং এই শরীর জীর্ণ বৃক্ষের পত্রের ন্যায় কম্পিত হইতেছে[২]। যেমন অরণ্যাদি স্থানে দুর্ব্বল পতীর বালিকা পত্নী সর্ব্বদা শঙ্কিতা ও ভীতা হয়, তেমনি, শিশু স্থানীয় মদীয় মতি উৎকৃষ্ট সন্তোষ ও ধৈর্য্যরূপ মাতার ক্রোড় প্রাপ্ত না হওয়ায় পদে পদে শঙ্কিত ও ভীত হইতেছে[৩]। যেমন সারঙ্গগণ তুচ্ছ তৃণের লোভে তৃণাচ্ছাদিত গর্ত্তে নিপতিত হয়, তেমনি, আমার অন্তঃকরণের বৃত্তি সকল বিষয়ের লোভে বিড়ম্বিত হইয়া কেবল দুঃখ পাইবার নিমিত্তই দুঃখের কূপে (সংসার নামক গর্ত্তে) নিপতিত হইতেছে[৪]। অবিবেকী পুরুষের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়, ক্লেশময় সংসারে চিরপরিচিতের ন্যায় পরিভ্রমণ করে, সৎপদে অর্থাৎ পরমতত্ত্বে একবারও গমন করে না। সুতরাং তাহারা অন্ধকূপস্থিত জীব অপেক্ষাও বদ্ধ, আত্মোদ্ধারে অক্ষম, সুতরাং দুঃখী[৫]। চিন্তা জীবরূপ পতির কান্তা বা প্রণয়িনী। কান্তা পতির অধীনে ও পতির গৃহেই অবস্থিতি করে, অন্যত্র যাইতে পারে না, এবং পতিগৃহ পরিত্যাগ করিতেও পারে না; সেইরূপ, চিন্তাও জীবরূপ পতি পরিত্যাগ করিতে ও স্বেচ্ছাগত বিষয়ে গমন করিতে পারিতেছে না[৬]। যদ্রূপ লতা সকল হিমপাতে পত্রপরিত্যাগিনী হয়, রস সংযোগে পুনর্ব্বার অভিনব পত্র ধারণ করে, সেইরূপ, জীবের ধীরতাও কখন বৈরাগ্যের উদয়ে বিষয়পরিত্যাগিনী ও রসের (রস=ব্রহ্মরস) আবেশে অদ্বিতীয় বস্তুবলম্বিনী হইতেছে এবং পুনর্ব্বার তাহা হইতে বিচ্যুত হইতেছে[৭]। মহর্ষে! ঈদৃশ অন্তরালাবস্থা অত্যন্ত ক্লেশাবহ। আমি দেখিতেছি, এখন আমার সংসারস্থিতি একবার আত্মাকে অবলম্বন করিতেছে আবার তাহা পরিত্যাগ করিতেছে। (অভিপ্রায় এই যে, আত্মবিবেকের প্রভাবে তত্ত্বজ্ঞানের পূর্ব্বার্দ্ধ প্রতিষ্ঠিত ও শেষার্দ্ধ অনভিব্যক্ত রহিয়াছে।

সেই কারণে আমি পূর্ণতৃপ্ত হইতে পারিতেছি না)। সুতরাং এ অবস্থায় আমি উভয়ভ্রষ্ট অর্থাৎ সংশয়ান্বিত হইয়া ক্লেশ পাইতেছি[৮]। যেরূপ শাখাপল্লবহীন দণ্ডায়মান মহীরুহ দর্শনে কখন কখন দৃষ্টিবিভ্রমপ্রযুক্ত বস্ত্বন্তর বলিয়া বোধ হয়, আত্মতত্ত্বের স্বরূপাবস্থা জানিতে না পারিয়া আমার মতিও সেইরূপ সংশয়াপন্ন হইয়াছে[৯]। যেমন অমরগণ নিজ নিজ বিমান পরিত্যাগ করে না, অথবা ইন্দ্রিয়গণ যেমন আপন আপন গোলক (আশ্রয়স্থান) পরিত্যাগ করে না, তেমনি, বিবিধ ভোগবাসনা বিস্তীর্ণ ভুবনবিহারী মদীয় চিত্তও চঞ্চলস্বভাব পরিত্যাগ করিতেছে না[১০]। হে সাধো! যে স্থান একমাত্র সত্যের আশ্রয়, দেহাদি উপাধি বিহীন, ও সর্ব্বপ্রকার অশান্তিশূন্য এবং যে স্থানে গমন করিলে জীব শোকমোহাদির বশবর্ত্তী হয় না, সেই পরমসুখজনক বিশ্রামস্থান কোথায় তাহা আমাকে বলুন[১১]। জনক রাজা প্রভৃতি অনেকানেক সাধুজনেরা সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মযোগ সহকারে কি প্রকারে উত্তমতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা উপদেশ করুন[১২]। এই সংসারে কি প্রকারে অবস্থিতি করিলে সংসার পঙ্কে অর্থাৎ পুণ্য পাপে ও শোকে মোহে লিপ্ত হইতে না হয় তাহা আমাকে বলুন[১৩]। আপনারা কিরূপ জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া এই দোষাকর সংসারে নির্দ্দোষ, নিষ্পাপ, মহানুভাব ও জীবন্মুক্ত হইয়াছেন ও নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছেন, তাহাও আমাকে বলুন[১৪]। আমি দেখিতেছি, সাংসারিক বিষয় বিষধর সদৃশ। ভোগ তাহাদের ফণা, বিভব তাহাদের বিষ, এবং ক্ষণভঙ্গ আকার তাহাদের কৌটিল্য। ঈদৃশ ভোগ-ফণ বিষয়-ফণী কি প্রকারে মঙ্গলদায়ক হইতে পারে?[১৫] হে মহর্ষে! জীবের বুদ্ধিরূপ সরোবর মোহরূপ মাতঙ্গ কর্ত্তৃক অনবরত আলোড়িত হইতেছে। আমি জানিতে চাহি, কি প্রকারে তাহার আবিলতা বিদূরিত হইবে? কি প্রকারেইবা বুদ্ধিসরোবর মলশূন্য হইবে?[১৬]। জনগণ সংসারব্যবহারে নিযুক্ত থাকিয়াও নলিনীদলগত সলিলের ন্যায় কিরূপে তাহাতে অসংলগ্ন থাকিবে, তাহাও আমাকে বলুন[১৭]। পরদুঃখকে আত্মদুঃখবৎ ও স্বীয় দুঃখকে তৃণবৎ জ্ঞান করিয়া এবং মন্মথকে স্পর্শ না করিয়া জনগণ কিরূপে উত্তমতা লাভ করিতে পারে, তাহাও উপদেশ করুন[১৮]। অজ্ঞানরূপ মহাসমুদ্রের পারগামী মহাপুরুষের আচার ব্যবহার স্মরণ করতঃ কোন্ আচারভ্রষ্ট ব্যক্তি আত্মবিড়ম্বনাজনিত দুঃখে

দুঃখিত না হয়?[১৯] এই অসমঞ্জসীভূত সংসারে কিরূপ কর্ম্ম করিলে শ্রেয়ঃসাধন হয়, কি প্রকারেই বা সমুচিত ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং ইহাতে থাকিয়া কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য? এই সমস্ত বিষয় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন[২০]। হে জগৎপ্রভো! সম্প্রতি আমাকে এরূপ তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ করুন—যাহাতে আমি অস্থির ধাতৃ-চেষ্টার (বিধির-বিধানের) পূর্ব্বাপর অবগত হইতে পারি[২১]। হে ব্রহ্মন্! যে প্রকারে আমার হৃদয়রূপ আকাশে অবস্থিত মনোরূপ চন্দ্রমা নির্ম্মলীকৃত হইতে পারে তাহা বর্ণন করুন[২২]। জগতের মধ্যে উপাদেয় কি, হেয় কি; এবং চঞ্চল অচলসদৃশ চিত্তকে কি প্রকারেই বা সুস্থির করিতে পারা যায়, তাহাও বলুন[২৩]। হে মুনিবর! কোন্ পবিত্রকারক মন্ত্রের দ্বারা অশেষ-যন্ত্রণাদায়িনী সংসারনাম্নী বিসূচিকা পীড়ার শান্তি হইতে পারে তাহাও আমাকে উপদেশ করুন[২৪]। মহর্ষে! আমি কি প্রকারে পূর্ণচন্দ্রসদৃশ সুশীতল ও পরিপূর্ণ আনন্দ লাভ করিতে পারি তাহা বলুন, আমি তাহা আহরণ করিব[২৫]। আপনারা তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন ও সাধু; সম্প্রতি যাহাতে আমি অন্তঃকরণের পরিপূর্ণতা লাভ করিতে পারি, যাহাতে আর শোক দুঃখে পতিত না হই, আমায় সেই সমস্ত বিষয়ের সদুপদেশ প্রদান করুন[২৬]। মহাত্মন্! যেরূপ অরণ্যমধ্যে কুক্কুর সকল ক্ষুদ্রপ্রাণী দিগকে ক্লেশ প্রদান করে, সেইরূপ, সংসারের বিকল্পকল্পনা সকল আমার চিত্তকে বিশ্রান্তিসুখশূন্য করিয়া অশেষবিধ যন্ত্রণা প্রদান করিতেছে[২৭]।

ত্রিংশত্তম সর্গ সমাপ্ত।

একত্রিংশত্তম সর্গ।

রাম কহিলেন, মহর্ষে! সংসারী জীবের জীবন বর্ষা মেঘের সদৃশ। (কখন আছে, কখন নাই)। ভাবিয়া দেখুন, এই কুৎসিত দেহ ও পরমায়ু উচ্চ বৃক্ষের চঞ্চল পত্রাগ্রস্থ লম্বমান জলকণার ন্যায় ভঙ্গুর এবং কলামাত্রাবশেষিত হিমাংশুর (কৃষ্ণচতুর্দ্দশী তিথির চন্দ্রের) ন্যায় দুর্লক্ষ্য। (অস্তিত্ব নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না)[১]। অপিচ, উক্ত উভয় (দেহ ও পরমায়ু) শালীক্ষেত্রবিহারী শব্দায়মান ভেকের স্ফীত কণ্ঠকন্দকের ন্যায় অচিরস্থায়ী ও সুহৃদ স্বজনগণের সম্মেলন বাগুরাকার্য্য-কারী লতা। (বাগুরা=পশু বন্ধনের রজ্জু)[২]। জীবের যে বিষয়বাসনা—তাহাই প্রবল বর্ষাবায়ু, মোহ মেঘ, কুপ্রবৃত্তি প্রভৃতি তত্রস্থ তড়িৎ, লোভ তাহাতে নৃত্যকারী ময়ূর[৩]। জীবনরূপ বর্ষামেঘের উদয়ে লোভ ময়ূর নৃত্য করে ও সেই সময় শত শত অনর্থরূপ কুটজ বৃক্ষের কলহরূপ কলিকা প্রস্ফুটিত হয়[৪]। প্রাণিরূপ আখুর (ইন্দুরের) ভক্ষক অতিক্রূর কৃতান্ত মার্জ্জার (যমরূপ বিড়াল) অনবরত সঞ্চরণ করিতেছে ও কোন এক অতর্কিত স্থান হইতে কর্ম্মরূপ জলপ্রবাহ প্রবাহিত হইতেছে[৫]।

মহর্ষে! এবম্বিধ সংসারসঙ্কটে নিপতিত ব্যক্তির উপায় কি? গতিই বা কি? কিরূপ চিন্তা ও কোন্ আশ্রয় গ্রহণ করিলে এই অশুভ সংসারারণ্যে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিতে না হয় তাহা আমাকে বলুন[৬]। হে মহর্ষে! সুধীজনেরা অতিতুচ্ছ বস্তুকেও রমণীয় করিতে পারেন। কি পৃথিবীতে, কি স্বর্গে, কি দেবলোকে, এমন পদার্থ কিছুই নাই যাহা সুধীজনের রমণীয় নহে[৭]। এই নিরন্তর ক্লেশদায়ক দগ্ধ সংসারের কিছু-মাত্র স্বাদ বা রস নাই। তবে যে, কিছু সুস্বাদ ও সরস বলিয়া বোধ হয়, একমাত্র মূঢ়তাই তাহার কারণ[৮]। বসন্তসমাগমে কুসুমসমূহ প্রস্ফুটিত হইলে বসুন্ধরা তাহার শুভ্রতায় ও রমণীয়তায় রমণীয় হয়। সেইরূপ, সর্ব্বদুঃখের মূলীভূত আশা পরিত্যাগ করিতে পারিলেই[৯] পূর্ণকামতারূপ ক্ষীরোদার্ণবে অবগাহন করিতে পারা যায়। সুতরাং তখন এই অশেষ দোষাকর সংসার রমণীয় হয়। তাহার অন্যথা হইলে কদাচ ইহা রমণীয়

হয় না[৯]। হে মহর্ষে! আপনি বলুন অথবা আমায় উপদেশ করুন, কিরূপে বা কি উপায়ে কামকলঙ্কে কলঙ্কিত মদীয় মনশ্চন্দ্রমা নিষ্কলঙ্ক ও শোভাযুক্ত হইবে এবং কিরূপ ব্যবহার করিলেই বা তৎকলঙ্ক প্রক্ষালিত হইয়া নির্ম্মলদ্যুতি পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শোভমান হইবে[১০]। এই সংসার ফল-শূন্য নিবিড় অরণ্য। ইহাতে ঐহিক পারত্রিক কোনও ফলের প্রত্যাশা নাই। ঈদৃক সংসারারণ্যে কিরূপে মহাত্মাগণের সহিত ব্যবহার করা কর্ত্তব্য তাহা আমাকে উপদেশ করুন[১১]। কি করিলে সংসারসমুদ্রবিহারী রাগ-দ্বেষাদি মহারোগ সকল ও দুঃখপ্রদ বিভূতি সকল জীব দিগকে বাধ্য করিতে না পারে তাহা আমাকে বলুন[১২]। হে ধীরশ্রেষ্ঠ! পারদ যেমন অনলে পতিত হইলেও দগ্ধ হয় না, তেমনি, কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে জ্ঞানামৃত তৃপ্ত ধীর পুরুষ এই অগ্নিতুল্য দাহক সংসারে পতিত ও দগ্ধ না হন তাহা আমাকে বিশেষ করিয়া বলুন[১৩]। হে ঋষিবর! যেমন জলচর জন্তু জলাশয় ব্যতীত অবস্থিতি করিতে পারে না; তেমনি, এই সংসারে বিনা ব্যবহারক্রিয়ায় কেহই অবস্থিতি করিতে সমর্থ হন না[১৪]। যদ্রূপ অগ্নির দাহিকা শক্তি রহিত হইলে তৎকালে তাহার শিখাও অদৃশ্যা হয, সেইরূপ, রাগদ্বেষবিনির্ম্মুক্ত ও সুখদুঃখবর্জ্জিত হইতে পারিলে তখন সৎ ও অসৎ সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়ার অভাব হইয়া থাকে[১৫]। বিষয়াবলম্বন (বিষয়ের সহিত মনের সংযোগ) অবস্থাই মনের সত্তা (অস্তিত্ব), তাহার পরিক্ষয় (বিষয়ের সহিত মনের অসংযোগ) তাহার অসত্তা (অনস্তিত্ব বা না থাকা)। মনের অসক্ততা সম্পাদন করাই মহাযোগ এবং তাহাই তত্ত্বজ্ঞানের সাক্ষাৎ কারণ। যাবৎ না আমার তত্ত্ব জ্ঞান হয় তাবৎ আপনি আমাকে সেই মহাযোগ উপদেশ করুন। উক্ত মহা-যোগ ব্যতীত মননশীল মনের পরিক্ষয় সম্ভাবনা নাই[১৬]। যে যুক্তি অর্থাৎ যে যোগ অবলম্বন বা ব্যবহার করিলে আমি দুঃখের হস্ত হইতে রক্ষা পাইব অথবা যে ব্যবহার পরিত্যাগ করিলে আমি দুঃখভাগী হইব না, সেই উত্তম যোগ শীঘ্র উপদেশ করুন[১৭]। পূর্ব্বকালে কোনও মহাত্মা কোন সুচেতা কি প্রকার সদ্যুক্তি অবলম্বন অনুপম শান্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন শীঘ্র তাহা বর্ণন করুন[১৮]। হে ভগবন্! যাহাতে আমার সমুদায় মোহ বিনষ্ট হয়, সমুদায় দুঃখ দূরীকৃত হয়, তাহা প্রদান করুন[১৯]। যদি তাদৃশী যুক্তি না থাকে অথবা থাকিলেও যদি আপনি

আমার নিকট তাহা প্রকাশ না করেন, তাহা হইলে আমি নিশ্চিত শান্তি লাভে বঞ্চিত হইব। কারণ, সে উপায় আমি স্বয়ং উদ্ধার বা আহরণ করিতে সমর্থ হইব না। এক্ষণে আমি অহঙ্কারপরিহারপূর্ব্বক সর্ব্বপ্রকারচেষ্টাশূন্য হইয়াছি এবং উৎকণ্ঠাবশতঃ আমি সময়ে পান ভোজন, বসনভূষণপরিধান ও স্নানাদি করি না[২০।২২]। মুনিবর! আমি কি সম্পদ্, কি বিপদ, কি বিষয়কার্য্য, কিছুতেই অবস্থিতি করি না। একমাত্র দেহত্যাগেই কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি[২৩]। আমি নির্ম্মল, নিঃশঙ্ক, নিশ্চেষ্ট, নষ্টমৎসর ও মৌনী হইয়া চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় অবস্থিতি করিতেছি[২৪]। অতঃপর আমি নিশ্বাস প্রশ্বাস ও বাহ্যজ্ঞান পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বপ্রকার অনর্থের আশ্রয় এই দেহ নামক সন্নিবেশ (অবয়ব বা মূর্ত্তি) পরিত্যাগ করিব[২৫]। হে মহর্ষে! আমি এই দেহের নহি এবং এ দেহও আমার নহে। যে কিছু দেহের বহির্বর্ত্তী তাহাও আমার নহে। এইরূপ বিবেচনা করিয়া আমি তৈলহীন দীপের ন্যায় প্রশান্তভাব অবলম্বন করিতে উদ্যুক্ত হইয়াছি এবং এই দেহ কি প্রকারে পরিত্যাগ করিব অনবরত সেই চিন্তায় কালযাপন করিতেছি[২৬]।

বাল্মীকি বলিলেন, ভরদ্বাজ! যেরূপ মহামেঘোদয়ে ময়ূর কেকারব করিয়া অবশেষে তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করে, সেইরূপ, নির্ম্মল শশধর সদৃশ মনোহরমূর্ত্তি বিশুদ্ধচেতা রামচন্দ্র বশিষ্ঠাদি মহর্ষিগণ সমক্ষে কথিত প্রকার বাক্য বিন্যাস করিয়া অবশেষে মৌনাবলম্বন করিলেন[২৭]।

একত্রিংশত্তম সর্গ সমাপ্ত।

দ্বাত্রিংশত্তম সর্গ।

বাল্মীকি বলিলেন, রাজীবলোচন রাম সভামধ্যে মোহনিবৃত্তিকর ঐ সমস্ত কথা কহিলে তত্রস্থ জনগণ সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিল এবং তৎকালে তাঁহাদের শরীরের রোম সমুদায় যেন রামবাক্য শ্রবণ করিবার অভিলাষে বস্ত্রভেদ করিয়া উৎস্থিত হইয়াছিল১।২। কিঞ্চিৎকালের নিমিত্ত তাঁহাদের মনে বৈরাগ্য উপস্থিত হওয়ায় সমুদায় সংসারবাসনা অস্তমিত হইয়াছিল এবং তন্নিমিত্ত তাঁহারা সেই মুহূর্ত্তে যেন অমৃতসাগরের তরঙ্গে নিমগ্ন হইয়াছিলেন৩।

বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র প্রভৃতি মহর্ষিগণ, জয়ন্ত ও ধৃষ্টি প্রভৃতি মন্ত্রণা-কুশল মন্ত্রিগণ, মহারাজ দশরথ ও তৎসদৃশ অন্যান্য ভূপালগণ, সামন্তবর্গ ও অন্যান্য রাজকুমারগণ, পিঞ্জরস্থিত পক্ষিগণ, ক্রীড়ামৃগ সকল, স্ব স্ব-প্রকোষ্ঠের বাতায়নপ্রদেশে উপবিষ্টা সর্ব্বাভরণবিভূষিতা কৌশল্যা প্রভৃতি রাজমহিষী, উদ্যানস্থিত লতা সকল, আকাশবিহারী সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব ও কিন্নর-গণ, দেবর্ষি নারদ, মহর্ষি ব্যাস ও পুলহ প্রভৃতি মুনিপুঙ্গব, তদ্ভিন্ন অন্যান্য দেব, দেবেশ্বর, বিদ্যাধর ও মহোরগগণ, সকলেই চিত্রার্পিতপ্রায় নিস্পন্দ-ভাবে রামচন্দ্রের সেই সমস্ত শ্রবণযোগ্য মহোদার বচনপরম্পরা শ্রবণ করিয়াছিলেন৭।১১।

রঘুবংশরূপ আকাশের পরমসুন্দর শশাঙ্ক রাজীবলোচন রাম পূর্ব্বোক্ত-প্রকার বাক্‌বিন্যাস সমাপ্ত করিয়া মৌনী হইলে মুমুক্ষু ব্যক্তিরা সাধুবাদ প্রদান ও আকাশে সিদ্ধবিদ্যাধরাদিগণ পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিলেন১২।১৩। দেবগণ কর্ত্তৃক পরিবৃষ্ট পুষ্পসমূহের মধ্যে পারিজাত নামক পুষ্প নিতান্ত সুন্দর। তাহার কান্তি দেবাঙ্গনাগণের মৃদুমধুর হাস্যকান্তির অনুরূপ। সেই সকল পুষ্প তৎকালে বায়ুপ্রেরিত নক্ষত্রমালার ন্যায় ভূতলে পতিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে ভ্রমরমিথুন কর্ণশীতলকারী গুণ গুণ ধ্বনি করিতেছিল এবং তাহার সৌরভ্য তত্রস্থ জনগণকে উন্মত্তপ্রায় করিয়াছিল। স্বর্গপরিচ্যুত সেই সকল কুসুম বিদ্যুদ্দীপ্ত গর্জ্জনহীন মেঘকণার, মুক্তাহারের, তুষার কণার, ক্ষীরসাগরের লহরীস্থ চন্দ্রপ্রতিবিম্বের, অথবা ক্ষীরপিণ্ডের ন্যায় নিতান্ত

নির্ম্মল, অম্লান ও শুভ্রবর্ণ। তদ্ভিন্ন ভ্রমরকূজিত সুখস্পর্শসমীরণসঞ্চালিতদল কমল, কেতকী, কুমুদ, কুন্দ ও অচলজাত কুবলয় সকল প্রচ্যুত হইয়া তত্রত্য ভূতল নিতান্ত পরিশোভিত করিয়াছিল। রাজবাটীর প্রাঙ্গণ ভূমি তাদৃশ নানাপুষ্পবর্ষণে পরিপূর্ণ হইল। এই অলৌকিক অদ্ভুত ব্যাপার পুরবাসী নরনারীগণ উদ্‌গ্রীব হইয়া আকাশপথে নয়ন স্থাপন করতঃ অবলোকন করিতে লাগিল[১৪।২০]। পূর্ব্বে আর কখন এরূপ বিস্ময়কর পুষ্পবৃষ্টি হয় নাই এবং এরূপ প্রণালীর পুষ্পবর্ষণ কস্মিন্ কালে কেহ অবলোকন করিয়াছে, এরূপ মনে করিতে পারিল না[২১]। দেবগণ ও সিদ্ধগণ কর্ত্তৃক আকাশ হইতে অদৃশ্যভাবে এক মুহূর্ত্তের চতুর্থ ভাগ পর্য্যন্ত বর্ণিত প্রকারের পুষ্পবৃষ্টি হইয়াছিল[২২]।

অনন্তর কুসুমবর্ষণ নিবৃত্ত হইলে সভাগত সমস্ত লোক বিমানচারী সিদ্ধগণের এইরূপ বাক্যালাপ শুনিতে পাইল[২৩]। "আমরা সেই কল্পারম্ভ কাল হইতে সিদ্ধসেনা মধ্যে আকাশের সকল স্থানেই পরিভ্রমণ করিয়া আসিতেছি কিন্তু রঘুকুলচন্দ্র রাম বীতরাগহেতু যেরূপ যেরূপ কথা বলিলেন, এরূপ শ্রুতিরসায়ন মনোহর কথা আর কখন এবং কোনও স্থানে শ্রবণ করি নাই[২৪।২৫] আমরা আজ্ রামমুখবিনির্গত মহাহ্লাদকর বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া পূর্ব্বকৃত পুণ্যের সার্থকতা সম্পাদন করিলাম। রঘুনন্দন রামচন্দ্রের শান্তিগুণবিশিষ্ট অমৃততুল্য বাক্য সমুদায় শ্রবণ গোচর করিয়া আজ্ আমরা উত্তম জ্ঞান লাভ করিলাম[২৬।২৭]।"

দ্বাত্রিংশত্তম সর্গ সমাপ্ত।

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ।

অনন্তর সিদ্ধগণ পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন যে, মহর্ষিগণ রঘুকুলচূড়ামণি রামচন্দ্রের প্রশ্ন সমুদায়ের কিরূপ সদুত্তর প্রদান করেন তাহা শ্রবণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য[১]। মহর্ষি নারদ, ব্যাস ও পুলহ প্রভৃতি মুনিপুঙ্গবগণ ও অন্যান্য মহর্ষিগণ শীঘ্রই এই সভায় তত্ত্বকথা শ্রবণার্থ আগমন করুন এবং চল—আমরাও ঐ সর্ব্বসম্পত্তিপূর্ণ কনকদ্যোতী (সমুজ্জ্বল) পবিত্র দাশরথি সভায় গমন করি[২]।[৩]।

বাল্মীকি বলিলেন, মহারাজ! সিদ্ধগণ ও দেবর্ষিগণ পরস্পর ঐরূপ বলাবলি করিয়া, যে সভায় রামচন্দ্রাদি বিরাজ করিতেছেন সেই মহতী সভায় সমাগত হইলেন[৪]। তাঁহারা দেখিলেন, সভার অগ্রভাগে বীণাবাদন নিরত মুনীশ্বর নারদ ও জলধরশ্যাম ব্যাস উপবিষ্ট আছেন। উভয়ের অন্তরালে ও পশ্চাদ্ভাগে ভৃগু, অঙ্গিরা ও পুলস্ত্য প্রভৃতি বিরাজ করিতেছেন। রাজা দশরথের এই মহতী সভা ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণে মণ্ডিত; চ্যবন উদ্দালক উশীর ও শরলোমাদি মুনিবৃন্দে বিভূষিত[৫]।[৬] জনসম্বাধ বিধায় (বহুলোকের আগমনে স্থানের অভাব হওয়ায়) ইঁহাদের অজিনাসন অপ্রশস্তভাবে বিস্তৃত এবং তাঁহারা সংশ্লিষ্ট ভাবে উপবিষ্ট। সকলেরই হস্তে অক্ষমালা ও সম্মুখে কমণ্ডলু[৭]। যদ্রূপ আকাশে তারকা-শ্রেণী, তদ্রূপ, এই সভায় ঋষিবৃন্দের শ্রেণী। ইঁহাদের মুখমণ্ডলে ব্রহ্ম-তেজ বিরাজ করিতেছে এবং তাহাতে তাঁহাদের শ্বেতরক্ত মুখমণ্ডল সূর্য্য-শ্রেণীর অনুকারী হইয়াছে[৮]। ঋষিবৃন্দের গাত্রবর্ণ বিভিন্ন; তদনুসারে সেই সভা বিচিত্র রত্নরাজীর অনুকারী হইয়াছে। যদ্রূপ মুক্তাশ্রেণী পরস্পর পরস্পরের শোভা বৃদ্ধি করে, সেইরূপ, এই সভাস্থ ঋষিবৃন্দও পরস্পর পরস্পরের শোভা বৃদ্ধি করিতেছেন[৯]। দেখিলেই বোধ হয়, যেন শত শত সূর্য্যমণ্ডলের একত্র সমাবেশ হইয়াছে অথবা শত শত পূর্ণচন্দ্র উদিত হইয়া জ্যোৎস্নারাশি বর্ষণ করিতেছে। এই নয়নমনোহারিণী সভা দীর্ঘকাল চেষ্টার মহৎ ফল[১০]। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এই সভায় নক্ষত্রমালামণ্ডিত নবজলধরের ন্যায় ব্যাসদেব বিরাজ করিতেছেন এবং

তারকাপরিবেষ্টিত হিমাংশুর ন্যায় নারদ মহর্ষিও অবস্থান করিতেছেন। অপরভাগে দেবগণ পরিবেষ্টিত ইন্দ্রের ন্যায় পুলস্ত্য মুনি এবং ত্রিদশগণ বেষ্টিত আদিত্যের ন্যায় অঙ্গিরা মুনি অনির্ব্বাচ্য শোভা বিস্তার করতঃ এই সভায় উপবিষ্ট আছেন[১১।১২]। স্বর্গবাসী সিদ্ধগণ, দেবগণ ও দেবর্ষিগণ নভোমণ্ডল হইতে অবতরণ করিলে, বর্ণিতপ্রকারের দাশরথী সভা তাঁহাদের সম্মানার্থ উত্থিত হইল[১৩]। এই সময়ে সমাগত বিমানবাসী ও সভাস্থিত মর্ত্ত্যবাসী মিশ্রিত হইয়া অদ্ভুত শোভা বিস্তৃত করিল এবং তাঁহাদের অঙ্গ-কান্তিতে দশ দিক্ উদ্ভাসিত হইল[১৪]। তাঁহাদের মধ্যে কাহার হস্তে বেণুদণ্ড, কাহার হস্তে লীলাপদ্ম, (শোভার্থ পরিগৃহীত পদ্ম পুষ্প), কাহার শিখাগ্রে দূর্ব্বাঙ্কুর এবং কাহার বা মস্তককেশে মণি বন্ধ পরিশোভিত রহিয়াছে[১৫]। কেহ স্ফটিকমালা, কেহ রুদ্রাক্ষমালা এবং কেহ বা হস্তে বলয়ীকৃত করিয়া মল্লিকামালা ধারণ করিয়াছেন। কেহ পিঙ্গলবর্ণজটাজুটমণ্ডিত;[১৬] কেহ বা ক্ষীরধবলকেশে পরিশোভিত। কোন ঋষি চীর বসন, কোন মুনি বল্কল বসন, কেহ বা কৌষেয় বসন পরিধান করিয়া রহিয়াছেন। কাহার কটিতটে চঞ্চল মেখলা, কাহার বা মুক্তামালা লম্বিত রহিয়াছে[১৭]। বিমানচর সিদ্ধগণ ও দেবগণ এবম্প্রকারে সভা প্রবেশ করিলে, মহর্ষি বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র তাঁহাদের ক্রমানুসারে পূজা করিলেন। অর্ঘ্য, পাদ্য, বিনয়বাক্য ও সাদর সম্ভাষণ প্রভৃতি যথা-যোগ্য উপচারে সম্মানিত করিলেন[১৮]। অনন্তর তাঁহারাও বশিষ্ঠকে ও বিশ্বামিত্রকে আদর পূর্ব্বক পাদ্য, অর্ঘ্য, বিনয়বাক্য প্রভৃতি প্রদান দ্বারা সম্মানিত করিলেন[১৯]। রাজা দশরথ সমাগত দেবগণকে, দেবর্ষিগণকে ও সিদ্ধগণকে সর্ব্বপ্রকার উপচারে সমাদর পূর্ব্বক পূজা করিলেন এবং কুশলপ্রশ্নাদির দ্বারা তাহাদিগকে সমাদৃত করিলেন[২০]। ভূতলবিহারী ও ব্যোমবিহারী মহাত্মগণ উক্তপ্রকার সম্ভাষণাদির দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে সম্মানিত করিয়া যথাযথ আসনে উপবিষ্ট হইলেন[২১]। অনন্তর সাধুবাদ ও পুষ্পবর্ষণ দ্বারা পুরোবর্ত্তী প্রণত রামচন্দ্রের অর্চনা অনুষ্ঠিত হইল[২২]। প্রথমতঃ বাক্‌লক্ষ্মীবিভূষিত কমললোচন রাম সভা মধ্যে উপবিষ্ট হইলেন, অনন্তর বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ, বামদেব, দেবর্ষি নারদ, মুনিপুঙ্গব ব্যাস, মরীচি, দুর্ব্বাসা, অঙ্গিরা, ক্রতু, পুলস্ত্য, পুলহ, শরলোমা, বাৎস্যায়ন, ভরদ্বাজ, বাল্মীকি, উদ্দালক, ঋচীক, শর্য্যাতি ও চ্যবন প্রভৃতি বেদ-

বেদাঙ্গপারগ জ্ঞাতজ্ঞেয় মহাত্মা মহর্ষিগণ সেই সভার অধিনায়ক স্বরূপে অধিষ্ঠিত হইলেন[২৬।২৭]। অনন্তর বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র সহ নারদাদি ঋষিগণ বিনয়নম্র রামচন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন[২৮]—আহা! কুমার রামচন্দ্র কি মনোহর, কল্যাণকর, বৈরাগ্যগর্ভ ও শান্তপ্রসাদগুণবিশিষ্ট বাক্য বলিয়াছেন![২৯] রামচন্দ্রের বিচারনিষ্পন্নার্থব্যঞ্জক, জ্ঞানগর্ভ, আর্য্যজনোচিত, সুস্পষ্ট, উদার অর্থাৎ ভাবগম্ভীর, হৃদয়ানন্দকর, নির্দ্দোষ, স্পষ্টাক্ষর, হিতজনক ও সন্তোষজনক বাক্য কোন্ ব্যক্তির বিস্ময় উৎপাদন না করিবে?[৩০।৩১] শত শত ব্যক্তির মধ্যে দৈবাৎ কোন কোন ব্যক্তি এরূপ উৎকৃষ্ট চিত্তোন্নতিকারক ও বাঞ্ছিতার্থবোধনে সমর্থ বাক্য বলিতে সমর্থ হয়[৩২]। বস্তুতঃই রামসদৃশ সূক্ষ্মদর্শী ও প্রজ্ঞাশালী ব্যক্তি এ জগতে আর নাই। হে কুমার রাম! তোমা ব্যতীত অন্য কাহার বিবেকফলশালিনী প্রজ্ঞা বিকসিত হইতে দেখা যায় না। রামচন্দ্রের হৃদয়ে যেরূপ প্রজ্ঞারূপিনী দীপশিখা জাজ্বল্যমানা, এরূপ প্রজ্ঞাদীপ অন্য কোন পুরুষের হৃদয়ে প্রজ্বলিত হইলে তিনিও অপ্রাকৃত পুরুষ বলিয়া গণনীয় হন[৩৩।৩৪]। এই সংসারে অসংখ্য রক্তমাংসময় ও অস্থিময় যন্ত্র (মানব দেহ) জন্মিয়াছে পরন্তু সে সকলে যথার্থ সচেতনতার অভাব দেখা যায়। অর্থাৎ তাহারা সচেতন হইয়াও প্রকৃতপক্ষে অচেতন, অজ্ঞ, বা জড়তুল্য অবোধ। তাহারা কেবল বৃথা শব্দ স্পর্শাদি বিষয় উপভোগ করিয়া বিনষ্ট হয়[৩৫]। যাহারা এই সংসারে সদসদ্বিবেচনাশূন্য ও মুগ্ধপ্রায় হইয়া থাকে, যাহারা কেবল জন্ম, মরণ ও জরা প্রভৃতি দুঃখের অনুগামী হইয়া কাল যাপন করে, তত্ত্ববিচার করে না, তাহারা মানব হইয়াও পশু[৩৬]। অরিমর্দ্দন রাম যেরূপ পূর্ব্বাপরবিচারপরায়ণ ও সকলের অভিষ্টফলপ্রদ, এরূপ দ্বিতীয় ব্যক্তি অন্য কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না[৩৭]। যেমন সহকার তরু সর্ব্বত্র সুলভ নহে, তেমনি, সর্ব্বোৎকৃষ্ট মাধুর্য্যরসবিশিষ্ট সুফলপ্রদ সৌম্যদর্শন লোকও সুলভ নহে[৩৮]। রাম এই বাল্যাবস্থাতেই সংসারযাত্রার ফল সম্যক্ প্রকারে পরিজ্ঞাত হইয়াছেন ইহা অল্প আশ্চর্য্যের বিষয় নহে[৩৯]। ফলপত্রপুষ্পশালী সুখারোহ ও সুদৃশ্য বৃক্ষ অনেক দেশে অনেক প্রকার দেখা যায় সত্য; পরন্তু চন্দনবৃক্ষ অন্য কুত্রাপি জন্মিতে দেখা যায় না[৪০]। অনেক ফলপল্লবাদিযুক্ত বৃক্ষ আছে (প্রত্যেক বনে) বটে; কিন্তু অপূর্ব্ব চমৎকার লবঙ্গ সর্ব্বত্র সুলভ নহে[৪১]। যেমন শারদীয় শশী হইতে সুশীতল জ্যোৎস্না

ও সুবৃক্ষ হইতে সৌন্দর্য্যগুণবিশিষ্ট মঞ্জুরী ও সুপুষ্প হইতে পরিমল-স্রোত পাওয়া যায়, তেমনি, এই রাম হইতে আমরা চিত্তচমৎকারকারিণী বাণী পাইতেছি[৪২]। অহে দ্বিজেন্দ্রগণ! এই অশেষ দোষাকর সংসারে সার পদার্থ অতি দুর্লভ। এই সংসারে যে সমস্ত ধীসম্পন্ন যশোনিধি ব্যক্তি সার পদার্থের নিমিত্ত যত্ন প্রকাশ করেন তাঁহারাই ধন্য ও তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ পুরুষ। এই পৃথিবীতে রামচন্দ্রের সদৃশ বিবেকশালী উদারস্বভাব পুরুষ দৃষ্টিগোচর হয় না। বোধ হয়, পরেও আর কেহ হইবে না। ওহে মহর্ষিগণ! যদি আমরা রামচন্দ্রের লোক চমৎকার জনক এই প্রশ্ন সমুদায়ের অভিলষিত উত্তর প্রদান করিতে না পারি তাহা হইলে জানিলাম, আমরা সকলেই নির্ব্বোধ[৪৩।৪৩]।

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

বৈরাগ্যপ্রকরণ সম্পূর্ণ।

বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণ।

মুমুক্ষু-ব্যবহার-প্রকরণ।

প্রথম সর্গ।

বাল্মীকি বলিলেন, সভাসদগণ উচ্চৈঃস্বরে এই কথা কহিলে মহর্ষি বিশ্বামিত্র প্রফুল্ল হৃদয়ে পুরোবর্ত্তী রামচন্দ্রকে কহিতে লাগিলেন[১]। হে জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ রাঘব! তোমার কিছুই জানিতে অবশেষ নাই। যাহা কিছু জ্ঞাতব্য তাহা তুমি স্বীয় সূক্ষ্ম বুদ্ধির দ্বারা অবগত হইয়াছ[২]। তোমার চিত্ত স্বচ্ছমুকুরতুল্য নির্ম্মল। মুকুর যেমন অল্প পরিমার্জ্জন অপেক্ষা করে, তেমনি, তোমার স্বচ্ছদর্পণসম বুদ্ধিও মার্জ্জন মাত্র অপেক্ষিণী হইয়া আছে। (ভাবার্থ এই যে, তুমি যে অভিজ্ঞ হইয়াও প্রশ্ন করিতেছ তাহা কেবল বুদ্ধির মার্জ্জনা ব্যতীত অন্য কিছুর জন্য নহে। বস্তুতঃ প্রমাণ ও গুরূপদেশ ব্যতীত বিশ্বাস দৃঢ় হয় না)[৩]। আমি বুঝিয়াছি, তোমার মতি ভগবান্ মহর্ষি বেদব্যাসের পুত্র শুকদেবের সদৃশী। তোমার বুদ্ধি অন্তরে অন্তরে সমুদায় জ্ঞাতব্য জানিয়াছে; কেবল বাহিরে বিশ্রান্তি মাত্র (পরিতোষরূপা শান্তি) অপেক্ষা করিতেছে[৪]।

রাম কহিলেন, ভগবন্! ব্যাসপুত্র শুকদেব তত্ত্বজ্ঞ হইয়াও কি নিমিত্ত অগ্রে শান্তিসুখ লাভ করিতে সমর্থ হন নাই এবং কেনইবা তিনি গুরূপদেশের অনন্তর শান্তিসুখ লাভ করিয়াছিলেন?[৫]

বিশ্বামিত্র বলিলেন, রাম! ব্যাসপুত্র শুকদেবের বৃত্তান্ত, তব বৃত্তান্তের অনুরূপ। যে ক্রমে তাঁহার মোক্ষ হইয়াছিল সে ক্রম ও বৃত্তান্ত বলিতেছি শ্রবণ কর[৬]। এই যে অঞ্জনশৈলসন্নিভ ভাস্করসদৃশ দ্যুতিমান্ মহাপুরুষ তোমার পিতার পার্শ্বদেশে সুবর্ণময় সিংহাসনে উপবিষ্ট

আছেন, ইহার নাম ব্যাস[৭]। ইহার শুক নামে এক সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ও মহাপ্রাজ্ঞ পুত্র হইয়াছিল; তিনি সাক্ষাৎ বজ্জমূর্ত্তির ন্যায় (মূর্ত্তিমান্ বিষ্ণুর ন্যায়) ছিলেন[৮]। মহামনা শুক মনে মনে লোকযাত্রার বিষয় সর্ব্বদাই বিচার (পর্য্যালোচনা) করিতেন, তাহাতে তাঁহার তোমার ন্যায় বিবেক জ্ঞান উদিত হইয়াছিল[৯]। অতিমনস্বী শুক নিজ বুদ্ধি বলে দীর্ঘকাল আত্মা কি অনাত্মা কি তাহা বিচার করিয়া যাহা সত্য অর্থাৎ আত্মা তাহা পরমার্থরূপে বিদিত হইয়া ছিলেন[১০]। তিনি নিজ উৎপ্রেক্ষিত জ্ঞানে পরম বস্তু পাইলেন বটে; কিন্তু তাহাতে তাঁহার বিশ্রান্তি লাভ (শান্তি বা মোক্ষ) হইল না। "ইহাই বস্তু" এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস আরোহণ না করায় পরমাত্মতত্ত্বে তাঁহার অপরোক্ষ জ্ঞান দূরে অবস্থিত রহিল[১১]। এই পর্য্যন্ত লাভ হইল যে, যেমন চাতক ধারাধর-ধারা ভিন্ন অন্য জলে বিরত থাকে, ভোগ বিমুখ হয়, তেমনি, তিনিও এই সকল ক্ষণভঙ্গুর ভোগে বিরত ও সুস্থিরচিত্ত হইয়া থাকিলেন[১২]। একদা এই নির্ম্মল চিত্ত শুক সুমেরু পর্ব্বতের নির্জ্জন প্রদেশে অবস্থিত মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে ভক্তি সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন[১৩]। পিতঃ! কি প্রকারে এই সংসারাড়ম্বর উৎপন্ন হইয়াছে? * এবং কোন্ সময়ে ইহা উপশম প্রাপ্ত হইবে? ইহার পরিমাণ কি ও ইহা কাহার? † (এই সমস্ত আমার নিকট কীর্ত্তন করুন)[১৪]। অনন্তর সেই মহর্ষি আত্মজ কর্ত্তৃক ঐরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহাকে সমুদায় বক্তব্য যথাযথ রূপে বলিলেন[১৫]; কিন্তু শুক পিতার সেই সকল বাক্য পর্য্যাপ্ত মনে করিলেন না। তিনি ভাবিলেন, আমি স্বীয় বুদ্ধি বলে এ সমস্তই অবগত হইয়াছি; পিতা তদপেক্ষা কিছু বিশেষ বলিলেন না অথবা বলিতে পারিলেন না[১৬]। পরে ভগবান্ ব্যাস পুত্রের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন, পুত্র! আমি সম্যক্ প্রকারে তত্ত্ব অবগত নহি[১৭]। এই পৃথিবীতে জনক নামে এক প্রসিদ্ধ মহীপতি আছেন, তিনি সমস্ত বেদ্য বিদিত আছেন। তুমি তাঁহার নিকট গমন কর।

---

* আড়ম্বর—পরবঞ্চনার্থ কৃত্রিম চেষ্টা বিশেষ। জীব সংসারের নিকট আত্মজ্ঞানে বঞ্চিত থাকায় সংসারকে আড়ম্বর বলা হইয়াছে।

† কাহার? এই প্রশ্নের বিবরণ এই যে, দেহের সংসার? কি ইন্দ্রিয়ের সংসার? কি প্রাণ, মন ও বুদ্ধির সংসার? কি আত্মার সংসার? অথবা মিলিত সমুদায়ের সংসার?

করিলে সমুদায় তত্ত্ব জ্ঞাত হইতে পারিবে[১৮]। পিতা ব্যাস এই কথা কহিলে পুত্র শুক সুমেরু হইতে পৃথিবীতলে অবতীর্ণ হইলেন এবং যে স্থানে জনকপালিতা বিদেহনগরী, সেই স্থানে গমন করিলেন[১৯]। শুক বিদেহপুরী মিথিলা প্রাপ্ত হইলে দৌবারিক গণ মহারাজা জনক'কে এই বলিয়া বিজ্ঞাপিত করিল। "মহারাজ! ব্যাসপুত্র শুক দ্বার দেশে দণ্ডায়মান আছেন।" অনন্তর মহারাজ জনক শুক দেবের জ্ঞান পরিক্ষার্থ প্রথমতঃ অবজ্ঞাপ্রদর্শনপূর্ব্বক "থাকুক" এই মাত্র বলিয়া সাত দিন মৌন থাকিলেন, কোন কিছু বলিয়া পাঠাইলেন না[২০]। এ দিকে শুক উন্মনা হইয়া সেই স্থানে সাত দিন সাত রাত্র অতিবাহিত করিলেন। সপ্তাহ অতীত হইলে পর মহারাজ জনক তাঁহাকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করাই-লেন। প্রবেশ করাইলেন বটে; কিন্তু আরও সাত দিবস অদৃশ্য থাকি-লেন। শুক পুনঃ পুনঃ "রাজা কোথায়?" এরূপ জিজ্ঞাসা করিলেও কেহই সে কথার প্রত্যুত্তর দিল না। এদিকে শুকদেব জনকের দর্শন না পাইয়া দিন দিন অধিক দুর্ম্মনায়মান হইতে লাগিলেন। সেই রাজ-অন্তঃপুরমধ্যে বিবিধ বিলাসশালিনী রূপলাবণ্যবতী কামিনী গণ কর্ত্তৃক নানাপ্রকার ভোজ্য ভোগ্য সামগ্রী দ্বারা তাঁহার সপর্য্যা (সেবা) হইতে লাগিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যেমন মৃদুসমীরণ বদ্ধমূল অচল সঞ্চালিত করিতে পারে না, তেমনি, সেই সমস্ত ভোগসুখ মহাযোগী শুকদেবের মন কিছুমাত্র বিচলিত করিতে পারিল না[২১।২৫]। সেই সপ্তাহ কাল তিনি ধ্যানী মৌনী আত্মনিষ্ঠ ও স্বস্থ অর্থাৎ বিকার পরিহীন সুতরাং অচঞ্চল ও পূর্ণচন্দ্রসদৃশপ্রসন্নবদনে অতিবাহিত করিলেন[২৬]। মহারাজ জনক এবম্প্রকার পরীক্ষার দ্বারা প্রমুদিতাত্মা শুকদেবের স্বভাব সর্ব্বতোভাবে বিদিত হইলেন, অনন্তর তাঁহাকে স্বসমীপে আনয়ন পূর্ব্বক প্রণাম করিলেন[২৭]। প্রণামান্তে স্বাগত প্রশ্ন, অনন্তর আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। জনক কহিলেন, হে শুক! তুমি এই জগতের সমুদায় কার্য্য নিঃশেষিতরূপে অবগত হইয়াছ এবং সকল মনোরথ প্রাপ্ত হইয়াছ। এক্ষণে তোমার অভিলাষ কি তাহা আমায় বল। তোমার আগমন শুভ হউক[২৮]।

শুকদেব বলিলেন, গুরো! এই সংসার আড়ম্বর কি প্রকারে উৎপন্ন হইয়াছে এবং কিরূপেই বা ইহার শান্তি হয়, তাহা আমাকে

শীঘ্র বলুন[২৯]। (আমি বিজ্ঞাত হইবার জন্য নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছি।)

বিশ্বামিত্র বলিলেন, হে রাম; জনক ঐরূপে জিজ্ঞাসিত হইলে, ইতি পূর্ব্বে ব্যাস যেরূপ কহিয়াছিলেন, এক্ষণে জনকও অবিকল সেইরূপ বলিলেন[৩০]।

শুনিয়া শুকদেব বলিলেন, আমি বিবেকের (তত্ত্ববিচারের) দ্বারা আপনা আপনি এই সমস্ত বিদিত হইয়াছি এবং পিতাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনিও আমাকে, আপনি যাহা বলিলেন তাহাই বলিয়াছিলেন। হে বাগ্মিশ্রেষ্ঠ! আপনি যাহা বা যে তত্ত্ব বলিলেন, এ তত্ত্ব শাস্ত্রেও দৃষ্ট হয়[৩১।৩২]। আমি নিশ্চয় করিয়াছি যে, এই দগ্ধ সংসার কেবল মাত্র স্বকীয় কল্পনায় সমুত্থিত হইয়াছে এবং কল্পনার ক্ষয় হইলে ইহাও ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। সুতরাং ইহা নিতান্ত নিঃসার[৩৩]। হে মহাবাহো! আমি বিবেক প্রভব উৎপ্রেক্ষায় অর্থাৎ বিচার দ্বারা যাহা স্থির করিয়াছি তাহা আপনার নিকট ব্যক্ত করিলাম। ইহা তথ্যভূত কি না তাহা আপনি আমাকে শীঘ্র বলুন। যদিও বিচারপ্রভব উক্ত তথ্য সত্য; তথাপি উহা যাহাতে অচল হয়, স্থিরতা প্রাপ্ত হয়, সম্প্রতি আপনি তাহাই করুন। আমার চিত্ত সংশয়াক্রান্ত হইয়া ত্রিজগৎ ভ্রমণ করিতেছে অর্থাৎ ইহা আত্মতত্ত্ব কি ইহা আত্মতত্ত্ব এবম্প্রকারে দোদুল্যমান হইতেছে ও তজ্জনিত ভ্রান্তি আমাকে অবসন্ন করিয়াছে। এক্ষণে আপনি আমার পরিত্রাতা। আমার বিশ্বাস এই যে, আমি আপনার নিকটেই বিশ্রান্তি লাভ করিতে পারিব[৩৪]।

জনক বলিলেন, হে মননশীল! তুমি স্বয়ং যাহা জ্ঞাত হইয়াছ ও গুরুমুখে যাহা শ্রবণ করিয়াছ তাহাই অবধারিত। অতঃপর আর কোন অবধারণ অর্থাৎ নিশ্চয় নাই। হে শুক! অবিচ্ছিন্ন চিন্ময় এক মাত্র পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কিছু নাই। সেই একাদ্বয় পরমাত্মা স্বীয় সঙ্কল্পের বশ্য হইয়া সংসারী ও জীবভাবে বদ্ধ হইয়াছেন, এবং ইনি যখন নিঃসঙ্কল্প হইবেন তখন ইনি এই সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইবেন[৩৫]। তুমি অবশ্যজ্ঞেয় বিষয় সুব্যক্ত রূপে পরিজ্ঞাত হইয়াছ, ঐশ্বর্য্য ভোগে ও দৃশ্য বস্তুতে তোমার বৈরাগ্য জন্মিয়াছে, সুতরাং তুমি মহাত্মা[৩৬।৩৭]। হে শিশুমহাবীর! ভোগ এক প্রকার রোগ বিশেষ এবং তাহা অতিশয়িত দীর্ঘ। যখন তুমি এই বাল্যকালেই তাহাতে বিরত হইয়াছ, তখন

তোমাকে মহাবীর বৈ আর কি বলিতে পারি? তুমি যাহা জানিবার জন্য ব্যগ্র, তোমার সেই জিজ্ঞাসিত বিষয় বলিলাম, এক্ষণে অন্য কি শুনিতে ইচ্ছুক তাহা বল[৩৮]। তোমার পিতা ব্যাস সমুদায় জ্ঞানের আকর। তুমি যদ্রূপ পূর্ণজ্ঞানী হইয়াছ, তিনি দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়াও এরূপ পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই[৩৯]। আমি মহর্ষি বশিষ্ঠের ও ব্যাসের শিষ্য এবং তুমি তাঁহার (ব্যাসের) পুত্র ও শিষ্য। বিশেষতঃ তোমার ভোগবাসনা যার পর নাই তনুতা প্রাপ্ত অর্থাৎ দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। সে নিমিত্ত তুমি আমা অপেক্ষা অত্যধিক শ্রেষ্ঠ[৪০]। হে ব্রহ্মন্! তুমি যাহা পাইবার তাহা পাইয়াছ। তোমার চিত্ত এক্ষণে পূর্ণ। তুমি আর দৃশ্য বস্তুতে নিমগ্ন নহ; সুতরাং তুমি মুক্ত হইয়াছ। এক্ষণে সংশয় পরিত্যাগ কর[৪১]।

অনন্তর শুকদেব মহাত্মা জনকের নিকট এইরূপ এইরূপ উপদেশ লাভ করিয়া ছিন্নসংশয় হইলেন। তখন তিনি নিতান্ত নির্ম্মল পরমাত্মায় চিত্ত সমাধান পূর্ব্বক মৌনভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন[৪২]। অনন্তর শোক, ভয়, আয়াস ও সর্ব্বপ্রকারচেষ্টাপরিশূন্য ও ছিন্নসংশয় হইয়া সমাধিসিদ্ধির নিমিত্ত অনিন্দিত সুমেরু শৈলে গমন করিলেন[৪৩]। অনন্তর তত্রত্য সিদ্ধাশ্রমে গমন করতঃ গিরিকল্পসমাধিযোগে (যে যোগে পাহাড়ের ন্যায় নিস্পন্দ হওয়া যায় সেই যোগে) দশ সহস্র বর্ষ অতিবাহিত করিয়া তৈলহীন দীপের ন্যায় অল্পে অল্পে পরমাত্মাতে নির্ব্বাপিত হইলেন অর্থাৎ একীভূত হইলেন।

হে রামচন্দ্র! যেমন সলিলকণা বিলীন হইয়া যায়, তাহার ন্যায় শুকদেবও উক্তপ্রকারে সকল কলঙ্ক (অবিবেক ও অবিবেকের কার্য্য দৃশ্য দর্শন) পরিহার পূর্ব্বক বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া পরাৎপর পরমাত্মার পরম পবিত্র পদে একীভূত হইয়াছিলেন[৪৪]।

প্রথম সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিতীয় সর্গ

বিশ্বামিত্র বলিলেন, হে রামচন্দ্র! যেমন সেই ব্যাসপুত্র শুক দেবের মাত্র মনোমালিন্য মার্জ্জনের প্রয়োজন ছিল এবং সেই নিমিত্তই তাঁহার জনক রাজার নিকট উপদেশ গ্রহণ আবশ্যক হইয়াছিল, তেমনি, তোমারও মাত্র মনোমল দূরীকরণ প্রয়োজনীয় ও তদর্থ উপদেশ গ্রহণ আবশ্যক[১]। মহামুনি বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে এইরূপ বলিয়া সমাগত মুনিগণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বলিতে লাগিলেন। ওহে মুনীশ্বরগণ! রামচন্দ্র জ্ঞেয় বিষয় সমস্ত উত্তম রূপে পরিজ্ঞাত হইয়াছেন। এই রাম নিতান্ত সদ্বুদ্ধিশালী। যেমন রোগ ভোগে কাহারও রুচি (ইচ্ছা) হয় না, তেমনি, সদ্বুদ্ধিশালী রামের বিষয় ভোগে অরুচি দৃষ্ট হইতেছে[২]। যাহাদের চিত্ত পরম জ্ঞেয় ব্রহ্ম জানিয়াছে ও বুঝিয়াছে, বিষয় ভোগে রুচি না হওয়াই তাহাদের বাহ্যিক লক্ষণ। বস্তুতঃই তত্ত্বজ্ঞান হইলে তখন তাহার বিষয় ভোগে প্রবৃত্তি থাকে না[৩]। থাকিলে তদ্‌ভোগবাসনার দ্বারা সংসারে দৃঢ় বদ্ধ হইতে হয় পরন্তু ভোগবাসনা ক্ষীণ হইলে সংসারবন্ধন শিথিল হইয়া যায়[৪]। অনন্তর রামচন্দ্রের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিলেন। অহে রামচন্দ্র! পণ্ডিতেরা বিষয়বাসনাকে বন্ধন এবং বিষয়বাসনার বিনাশকে মোক্ষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। মনুষ্য দিগের মধ্যে আত্মবিষয়ক আপাত (পরোক্ষ) জ্ঞান প্রায়ই হইতে দেখা যায়; কিন্তু বৈরাগ্যপ্রভব তাহার (আত্মতত্ত্বের) সাক্ষাৎকার কাহার কাহার অতি কষ্টে হইয়া থাকে[৫।৬]। যে ব্যক্তি সম্যক্ প্রকারে আত্মদর্শী হয় সেই ব্যক্তিই যথার্থ আত্মজ্ঞ, যথার্থ জ্ঞাতজ্ঞেয় (জ্ঞাতব্য জ্ঞানে কৃতার্থ), এবং পণ্ডিত। ভোগ সকল তাদৃশ মহাপুরুষকে কদাচ আকর্ষণ করিতে পারে না[৭]। (যাহারা আপাতদর্শী তাহারা কদাচ পরবৈরাগ্য লাভে সমর্থ হয় না)। যাহাদের ঐশ্বর্য্য, যশঃ, পুণ্য, ঐশ্বর্য্যলাভ ও কল্যাণপ্রাপ্তি প্রভৃতি বিষয়ে কোনপ্রকার অভিসন্ধি বা উদ্দেশ্য নাই, অথচ ভোগবিমুখ; ইহসংসারে তাদৃশ মহাপুরুষেরাই জীবন্মুক্ত নামে প্রখ্যাত[৮]।

যেমন মরুভূমিতে লতার উৎপত্তি হয় না, তেমনি, যাবৎ না তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয় তাবৎ বিষয়বৈরাগ্যও জন্মে না[৯]। হে মুনিগণ! আমি সেই জন্যই বলিতেছি যে, আমাদের এই রঘুচূড়ামণি রাম পরম তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন; সেই কারণে পরম রমণীয় ভোগ্য বস্তু সকল ইঁহার মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইতেছে না[১০]। অহে মুনিগণ! রাম অন্তরে যাহা জানিয়াছেন তাহা যথার্থ অর্থাৎ অসংশয়িত আত্মতত্ত্ব হইলেও পরোপকার কারণে বশিষ্ঠ প্রভৃতি সদ্গুরুর মুখে তাহা পুনঃ শ্রবণ করিবেন এবং তাহাতেই ইঁহার চিত্তবিশ্রান্তি হইবে[১১]। * রামের বুদ্ধি শরৎকালের শোভার ন্যায় নিতান্ত নির্ম্মল হইয়াছে, কেবল মাত্র কেবলীভাব অর্থাৎ অদ্বয়চিন্মাত্রাবশেষ হওয়া অবরুদ্ধ আছে[১২]। তদর্থ অর্থাৎ মহাত্মা রামচন্দ্রের চিত্তবিশ্রান্তির নিমিত্ত রঘুকুলগুরু সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বসাক্ষী কালত্রয়দর্শী নির্ম্মলজ্ঞানসম্পন্ন শ্রীমান্ বশিষ্ঠদেব যুক্তিসহকারে ইঁহাকে তত্ত্বোপদেশ প্রদান করুন[১৩।১৪]। হে ভগবন্ বশিষ্ঠদেব! পূর্ব্বে তোমার সহিত আমার বিরোধ উপস্থিত হইলে আমাদিগের বৈরশান্তির নিমিত্ত ও ধীমান্ মুনিগণের পরম মঙ্গলার্থ বৃক্ষলতাসমাকীর্ণ নিষধ-ভূধরের (নিষধ নামে এক পর্ব্বত আছে) প্রস্থদেশে ভগবান্ কমলযোনি যে সমস্ত উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন সে সকল কি তোমার স্মরণ হয়?[১৫।১৬] সেই সময়ে ভগবান্ কমলযোনি যে সকল শ্রেয়ঃসাধন উৎকৃষ্ট জ্ঞান উপদেশ করিয়াছিলেন, তন্মধ্য হইতে যে জ্ঞান যুক্তিযুক্ত, যে জ্ঞানে জীবের সাংসারিক বাসনা বিনষ্ট হয়, যেমন প্রভাকরের উদয়ে অন্ধকার দূরীভূত হয় তেমনি যে জ্ঞানের উদয়ে আত্মবিষয়ক অজ্ঞান-তিমির বিনষ্ট হয়, সেই যুক্তিযুক্ত জ্ঞান আপনার এই শিষ্য রামচন্দ্রকে উপদেশ করুন, তৎশ্রবণে ইনিও বিশ্রান্ত হউন। অর্থাৎ মোক্ষনামক পরমশান্তি প্রাপ্ত হউন[১৭।১৮]। রামকে উপদেশ করায় আপনার অল্প-

* অভিপ্রায় এই যে, রাম পরমজ্ঞানী হইলেও লোকহিতার্থে গুরূপদেশের প্রার্থী হইয়াছেন। তাঁহার মনোভাব এই যে, এই উপলক্ষ্যে অন্যান্য অধিকারী পুরুষেরাও উপদেশ শুনিয়া আমার ন্যায় চিত্তবিশ্রান্তি লাভ করুক। অথবা তিনি পরমতত্ত্ব কি, তাহা মনে মনে বুঝিয়াও দৃঢ় বিশ্বাসের অভাবে অতত্ত্বজ্ঞের ন্যায় অসুখী আছেন, তাই তিনি বিশ্বাস আনয়নার্থ উপদেশ আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন। উপদেশের প্রভাবে অবিশ্বাস দূরীভূত হইবে, অনন্তর শান্তিলাভ করিবেন।

মাত্রও কদর্থনা নাই অর্থাৎ বহু ক্লেশ হইবেক না। * যেমন নির্ম্মল মুকুরে রক্তাদি বর্ণ অনায়াসে প্রতিফলিত হয়, সেইরূপ, গতকল্মষ রামচন্দ্রকে উপদেশ করিলে সে উপদেশ ইঁহার চিত্তে সহজে প্রতিরঞ্জিত হইবে। রামকে উপদেশ করা আপনার বহ্বায়াসসাধ্য হইবে না[১৯]। হে ব্রহ্মন্! সাধুদিগের তাহাই জ্ঞান, তাহাই শাস্ত্রার্থবোধ এবং তাহাই প্রশংসনীয় পাণ্ডিত্য, যাহা বিরক্ত সংশিষ্যের প্রতি উপদেশ প্রদান করা যায়[২০]। বিষয়বৈরাগ্যবিহীন অপাত্রে উপদেশ প্রদান করিলে তাহা কেবল কুক্কুর-চর্ম্মস্থিত দুগ্ধের ন্যায় অপবিত্রতা প্রাপ্ত হয় মাত্র, অন্য কিছু হয় না[২১]। হে প্রভো! বীতরাগী, ভয়ক্রোধবিবর্জ্জিত অভিমানশূন্য ও পাপরহিত ভবাদৃশ ব্যক্তিরা যাহাদিগকে উপদেশ প্রদান করেন তাহাদিগের অল্প-মাত্রও বুদ্ধিমালিন্য থাকে না[২২]।

বাল্মীকি কহিলেন, গাধিতনয় বিশ্বামিত্র এই কথা কহিলে, ব্যাস ও নারদপ্রমুখ মহর্ষিগণ সাধুবাদ প্রদান পূর্ব্বক তদীয় বাক্যের বিস্তর প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহারাজ দশরথের পার্শ্ববর্ত্তী, ব্রহ্মার পুত্র ও সাক্ষাৎ ব্রহ্মার সদৃশ মহাতেজা মহর্ষি বশিষ্ঠদেব বলিতে লাগিলেন[২৩,২৪]। বলিলেন, হে মুনে! আপনি যাহা আদেশ করিতেছেন তাহা আমি নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন করিব। কোন্ সমর্থ ব্যক্তি সাধুবাক্য লঙ্ঘন করিতে পারে?[২৫] হে সাধো! যদ্রূপ সমুজ্জ্বল দীপালোক দ্বারা রাত্রিকালীন অন্ধকার বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ, আমি জ্ঞানোপদেশ প্রদান দ্বারা মহারাজ দশরথের পুত্রদিগের সমুদয় মনোমালিন্য দূরীভূত করিব[২৬]। পূর্ব্বে নিষধপর্ব্বতসানুতে ভগবান্ পদ্মযোনি সংসারশান্তির নিমিত্ত আমাদিগকে যে সমস্ত উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় আমার অন্তঃকরণে অদ্যাপি জাগরূক রহিয়াছে[২৭]।

বাল্মীকি বলিলেন, মহারাজ! † রঘুবংশগুরু মহাত্মা মহর্ষি বশিষ্ঠ ঐ কথা বলিয়া মহোৎসাহ সহকারে লোকবৃন্দের অজ্ঞতাশান্তির নিমিত্ত পরম পদ মোক্ষলাভের নিদানভূত বাক্য সকল বলিতে লাগিলেন[২৮]।

দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত।

---

* বৃথা বহুক্লেশজনক কার্য্য করিতে হইলে তাহাকে কদর্থনা বলে।

† ইহা অরিষ্টনেমির সম্বোধন। প্রথমে বাল্মীকি মুনি অরিষ্টনেমি কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া পর পর বশিষ্ঠ রাম সংবাদাত্মক সন্দর্ভ বলিয়া আসিতেছেন।

তৃতীয় সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রামচন্দ্র! ভগবান্ কমলযোনি সৃষ্টির আদিতে লোকে সমুদায়ের দুঃখশান্তির নিমিত্ত যে জ্ঞানশাস্ত্র বলিয়াছিলেন, আমি তোমার নিকট সেই জ্ঞানশাস্ত্র কীর্ত্তন করি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর[১]।

রাম কহিলেন, ভগবন্! আপনি আমাকে মোক্ষশাস্ত্র বলিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, পরন্তু তাহা আমি পরে শ্রবণ করিব, সম্প্রতি আমার যে মহান সংশয় উপস্থিত হইয়াছে অগ্রে তাহা বিদূরিত করুন[২]। হে মুনে! ভগবান্ শুকদেবের পিতা ব্যাস সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বগুরু ও মহাত্মা। তিনি বিদেহমুক্ত হইলেন না কিন্তু তাহার পুত্র শুক মুক্ত হইলেন। ইহার কারণ কি তাহা আমায় অগ্রে বলুন[৩]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রামচন্দ্র! শ্রবণ কর। পরম সূর্য্যের প্রকাশের মধ্যে যে সকল ত্রিজগৎ রূপ ত্রসরেণু প্রবাহক্রমে সমুৎপন্ন হইতেছে ও তাহাতে বিলীন হইতেছে, সেই সমস্ত ত্রসরেণুর সংখ্যা অর্থাৎ ইয়ত্তা নাই[৪]। * এই বিদ্যমান কালেও যে কত কোটী ব্রহ্মাণ্ড আছে তাহাই বা কে গণনা করিয়া বলিতে পারে?[৫] ভবিষ্যতে অর্থাৎ আগামী কালে সেই পরমাত্ম সমুদ্রে যে সকল জগৎসৃষ্টিরূপ তরঙ্গ উঠিবে, তাহার কথা পর্য্যন্ত বলিতে কেহ সাহসী হয় না[৬]।

রাম কহিলেন, মহর্ষে! যে সকল জগৎ সৃষ্ট হইয়া গিয়াছে ও হইবেক, তাহার সংখ্যা করিতে যে কাহার শক্তি নাই আমি তাহা বিদিত আছি। সে সকল কথা দূরে থাকুক, এক্ষণে বর্ত্তমান অনন্ত সৃষ্টির

* সূর্য্য প্রকাশরূপী ও জগতের প্রকাশক। যিনি তাদৃশ সূর্য্যের প্রকাশক তিনি পরম সূর্য্য। ইঁহারই নাম পরমাত্মা। পূর্ব্বে এই পরমাত্মায় অসংখ্য অনন্ত জগৎ উৎপন্ন ও বিলীন হইয়া গিয়াছে। প্রত্যেক সৃষ্টিকালে পরিমিত ত্রিজগৎ ছাড়া অপরিমিত ত্রিজগৎ কোন আকাশ প্রদেশে সৃষ্ট হইয়াছিল তাহা কে বলিতে পারে। সুতরাং এই পরিমিত ত্রিজগৎ সে ভাবে একটী ত্রসরেণু। এক এক জগৎ এক একটা পরমাণু—তাহার সমাহারে ত্রসরেণু। সুতরাং কোথায় কত ব্যাস ও কোথায় কত শুক আছে, ছিল বা হইবে, তাহা কে বলিতে পারে?

বিষয় কিরূপে অবগত হইতে পারা যায় তাহার উপায় উপদেশ করুন[৭]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাঘব! পশু, পক্ষী, মনুষ্য, দেবতা, ইত্যাদি ইত্যাদি প্রধান প্রাণীর মধ্যে যখন যে প্রাণী যে প্রদেশে বিনাশ প্রাপ্ত হয়, মৃত্যুগ্রাসে নিপতিত হয়, সে প্রাণী সেই প্রদেশে তখনই ব্রহ্মাণ্ডত্রয় (স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল,) দেখিতে পায়[৮]। যাহার অন্য নাম চিত্তশরীর ও সূক্ষ্মশরীর, সেই আতিবাহিক (জীব মরণের অব্যবহিত পরে যে শরীরে অবস্থান করে সেই শরীর আতিবাহিক) শরীরে বুদ্ধ্যুপলক্ষিত আকাশে অর্থাৎ (হৃদয়াকাশে) বিভ্রান্তি বশতঃ বাসনাময় সূক্ষ্ম জগত্রয় অনুভব করে। অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত ক্রমে সেই সেই বাসনাময় শরীর প্রাপ্ত হয়। বাস্তবপক্ষে, ব্যোমাত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা নামক চিদাকাশ জন্মাদিবিকার বিবর্জ্জিত[৯]। কোটী কোটী প্রাণী ঐ প্রকার মৃত্যু অনুভব করিয়াছে, করিতেছে ও করিবে। তাহারা মৃত্যুর পূর্ব্বে জীবদ্দশায় যে সকল জগৎ দর্শন করে অর্থাৎ দৃশ্য দেখে; তন্মধ্যে, যে জগতে বা যে দৃশ্যে যাহার আশা বা বাসনা (সংস্কার) বদ্ধমূলা হয়, মৃত্যু সময়ে তাহাদের হৃদয়াকাশে সেই দৃশ্যই উদিত অর্থাৎ স্ফুরিত হয় ও মরণান্তর সে সেই দৃশ্য অর্থাৎ সেই জগৎ প্রাপ্ত হয়। ফলিতার্থ—সেই সমুদায় জগৎ বাসনা বিশেষের বিলাস ব্যতীত—অন্য কিছু নহে[১০]। যে কিছু জগৎ, যে কিছু দৃশ্য, সমস্তই সংকল্পনির্ম্মিত। যেমন মনোরাজ্য, যেমন ইন্দ্রজাল, যেমন কথার অর্থের প্রতিভাস, যেমন বায়ুরোগীর ভূভ্রমণ-ভ্রম, যেমন বালবিভীষিকার্থ প্রস্তুত পিশাচ, যেমন আকাশে মুক্তাবলী, যেমন নৌকারোহীর দৃষ্টিতে তীরতরুর প্রচলন, যেমন স্বপ্নসন্দর্শন, যেমন স্মৃতিজাত খপুষ্প,—জগদ্দর্শন বা সংসারদর্শন ঠিক সেইরূপ। মৃত্যুপ্রাপ্ত ও জন্মপ্রাপ্ত জীব আপনার অন্তর মধ্যেই ঐরূপ অবভাসময় জগৎ সংসার দর্শন বা অনুভব করে, অন্য কোথাও গমন করিয়া দেখে না[১১।১৩]। ইহ শরীরে যে জগৎ দেখে, মৃত্যুর পর তাহাই পুনঃ তাহার স্মৃতিপথে উপস্থিত হয় এবং জন্মের পরেও আবার তাহাই অনুভব করে। জগৎ অলীক হইলেও মরণোত্তর জীবগণ অতিপরিচয়ের প্রভাবে তাহার জ্ঞান প্রাপ্ত হয় ও পশ্চাৎকালের নিয়মে স্থূলতা প্রাপ্ত হয়। স্থূলতা প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার তাহা চৈতন্যাকাশে প্রকাশমান হইতে থাকে। ইহাকেই ইহলোক ও পরলোক বলে[১৪]। জীব জন্ম গ্রহণ

অবধি মরণ পর্য্যন্ত যে সচেষ্ট থাকে, তাহাই তাহার ইহলোক এবং মরণ বা মরণোত্তর যে পুনর্জ্জন্ম (অন্যদেহপ্রাপ্তি) হয়, সংক্ষেপতঃ, তাহাই তাহার পরলোক[১৫]।

এই সংসারে জীবগণ গৃহীত স্থূল দেহ পরিত্যাগ করিলেও তন্মধ্যে যে বাসনাময় অন্য দেহ বিদ্যমান থাকে, তাহাও সংসারের অন্তর্গত। সংসারী জীব তাহারই অনুরোধে দেহাবসানে পুনর্ব্বার দেহান্তর প্রাপ্ত হয়। এই স্থূল দেহের ন্যায় অন্য সূক্ষ্ম দেহও কদলীবৃক্ষের অনুরূপে পরম পুরুষকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে[১৬]। পৃথিব্যাদি পঞ্চ মহাভূত, জগৎ ও জগতের ক্রম (সৃষ্টির ক্রম অর্থাৎ পৌর্ব্বাপর্য্য ঘটনা বা কারণ কার্য্য ভাব) সমস্তই অলীক। তথাপি ইহাতে জীবের জগদ্ভ্রম বিদ্যমান আছে[১৭]। অনাদি অবিদ্যা তাহার মূল। অনাদি অবিদ্যা সৃষ্টিরূপ চঞ্চল তরঙ্গশালিনী সুদীর্ঘা নদীর অনুরূপা। হে রাম! আদি অন্তশূন্য মহাসমুদ্রস্থানীয় পরমাত্মার সৃষ্টিরূপ উত্তাল তরঙ্গ পুনঃ পুনঃ উত্থিত ও লয় প্রাপ্ত হইতেছে[১৮।১৯]। সেই সমস্ত তরঙ্গের মধ্যে কতকগুলি পুরাতন ও কতকগুলি নূতন। তন্মধ্যে কতকগুলি নামে ও গুণে সর্ব্বতোভাবে সমান, কতকগুলি অর্দ্ধসমান, এবং কতকগুলি সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট[২০]। সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ এই মহর্ষি বেদব্যাস সৃষ্টিতরঙ্গের দ্বাত্রিংশ তরঙ্গ ইহা আমি স্মরণ করিতে পারিতেছি। সেই সেই তরঙ্গের মধ্যে দ্বাদশ তরঙ্গ কুল, আচার, জীবন, চেষ্টা, আয়ুঃ, সর্ব্বাংশে সমান এবং অন্য দশ তরঙ্গও জ্ঞানাদি বিষয়ে সমান। অবশিষ্ট তরঙ্গ কুলবিলক্ষণ অর্থাৎ বংশে ভিন্ন। * এখনও সেইরূপ ও অন্যরূপ অন্যান্য ব্যাস, বাল্মীকি, ভৃগু, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য প্রভৃতি মহর্ষি জন্মিতে অবশেষ আছে[২১,২২]। মনুষ্য দেবতা ও দেবর্ষি পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন ও বিলীন হইয়াছেন, হইতেছেন ও হইবেন। ইঁহার পূর্ব্বে ইঁহারা যেরূপ আকারসম্পন্ন ছিলেন, এক্ষণেও সেইরূপ আছেন এবং পরেও ইহা অপেক্ষা পৃথক্ পৃথক্ আকারে (দেহে) জন্মগ্রহণ করিবেন[২৩]। হে রাম! এই

* তাৎপর্য্য এই যে, আমরা যে কাল্পনিক জগৎ, এ কালের (সৃষ্টির) প্রারম্ভাবধি রামের সময় পর্য্যন্ত অনেকবার অনেক ব্যাস জন্মিয়াছেন। তন্মধ্যে [illegible] ব্যাস হন নি। সকল ব্যাস দ্বৈপায়ন ও ভারতাদি গ্রন্থকর্ত্তা নহেন। সেই কারণে বলা হইয়াছে কেহ কেহ বংশে ও কার্য্যে সমান, কেহ কেহ অর্দ্ধ সমান ইত্যাদি। ভারতাদিগ্রন্থকর্ত্তা দ্বৈপায়ন ব্যাস প্রত্যেক দ্বাপরে অবতীর্ণ হন। পূর্ব্ব মন্বন্তরের সন্ধি সমেত বর্ত্তমান বৈবস্বত মন্বন্তরের প্রারম্ভাবধি ২৮শ দ্বাপর অতীত হওয়ায় ২৮ বার ব্যাসাবতার হইয়াছে। তন্মধ্যে ইঁহার কলিক দশ অবতার আমার প্রত্যক্ষ ও অন্যান্য অবতারের স্মৃতিগম্য আছে।

যে ব্রহ্মকল্পীয় ত্রেতা যুগ, এ যুগ পূর্ব্বে অনেক বার হইয়া গিয়াছে এবং ভবিষ্যেতেও হইবে। যেমন এই যুগে তুমি রামরূপ ধারণ করিয়াছ; এইরূপ পূর্ব্বেও কত বার রামরূপ ধারণ করিয়াছিলে, এবং পরেও যে কত-বার রামরূপে অবতীর্ণ হইবে তাহার ইয়ত্তা নাই। আমিও কত বার বশিষ্ঠমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছি, এক্ষণেও বশিষ্ঠরূপে বিদ্যমান আছি, এবং পরেও যে কত বার বশিষ্ঠরূপে অবতীর্ণ হইব, তাহারইবা নিশ্চয় কি[২৫]। আমি এই দীর্ঘদর্শী অদ্ভুতকর্ম্মা ব্যাসের পর পর দশ অবতার দর্শন করিলাম (দশবার জন্মিতে দেখিলাম)[২৬]। রামচন্দ্র! আমি যে কতবার ব্যাস বাল্মীকির সহিত একত্রিত হইয়াছি ও কত বার পৃথক্ রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তাহা বলিবার নহে[২৭]। আমরা কখন সদৃশ কখন বা বিসদৃশ রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আমরাই আরও কতবার বিভিন্না-কারে ও সমান অভিপ্রায়ে জন্মগ্রহণ করিব। কখন বিজ্ঞ হইয়া জন্মিয়াছি কখন বা অবিজ্ঞ হইয়া জন্মিয়াছি। এই ব্যাস ইহ জগতে আরও আট বার জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক মহাভারত নামক ইতিহাস প্রচার, বেদবিভাগ, কুলপ্রথাপালন, ব্রহ্মত্বখ্যাপন (ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের বিস্তার) করিয়া বিদেহমুক্তি লাভ করিবেন[২৮।৩০]। এখনও ইনি শোক, ভয় ও সর্ব্বপ্রকার কল্পনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রশান্তচিত্ত বা নির্ব্বাণপ্রাপ্ত ও মনোজয়ী হইয়া আছেন। সুতরাং ইনি এখনও জীবন্মুক্ত[৩১]। অহে রাম! জীবন্মুক্ত পুরুষদিগের বিত্ত, বন্ধু, বয়স, কর্ম্ম, বিদ্যা, বিজ্ঞান ও চেষ্টা, এ সকল কখন বা সমান থাকে, কখন বা অসমান থাকে। তাঁহারা কখন শত শত বার জন্মগ্রহণ করিতেছেন; কখন বা বহুকল্পেও একবার জন্মগ্রহণ করেন না।

এই যে ভূতপরম্পরা অর্থাৎ প্রাণিপ্রবাহ, ইহা বা এ সংসার মায়া ব্যতীত অন্য কিছু নহে। সেই জন্য ইহা অনাদি ও অনন্ত[৩২।৩৩]। জীবগণ ঈদৃশ সংসারে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিতেছে। এ মায়ার অন্ত বা বিরাম নাই। যেরূপ মহাসমুদ্রের তরঙ্গপরম্পরা ভিন্ন ভিন্ন রূপে উৎপন্ন হয়, সেইরূপ, এই জীবপ্রবাহও বর্ণিতপ্রকারে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রাদুর্ভূত হইতেছে। কেবল তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন মহাপুরুষেরাই প্রশান্তচিত্তে সর্ব্বপ্রকার কল্পনা পরিহার পূর্ব্বক পরমা শান্তি অবলম্বনে ও অনাবরণে অবস্থান করেন[৩৪।৩৫]।

তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত।

চতুর্থ সর্গ।

হে সৌম্য! জল ও তরঙ্গ প্রথম দর্শনে ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হইলেও বস্তু কল্পে সমান অর্থাৎ ভিন্ন নহে। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, মুনি-দিগের সদেহ মুক্তি ও বিদেহ মুক্তি আপাত দর্শনে বিভিন্ন বোধের গোচর হইলেও মুক্তিকল্পে সমান জানিবে[১]।

দেহ থাক্ আর নাই থাক, মুক্তির সহিত তাহার (দেহের) সম্পর্ক নাই। মুক্তি দেহঘটিত নহে। বন্ধন ও মুক্তি, বিষয়ের (জ্ঞেয় জ্ঞানের) দ্বারা ব্যবস্থিত হয়। যে ব্যক্তি ভোগের আস্বাদ গ্রহণ করে না, ভোগ্যজ্ঞান তাহাকে কিরূপে বন্ধন করিবে? আত্মা অসঙ্গ উদাসীন, ইহা জানিলেও ভোগাভিমান ত্যাগ ব্যতীত মোক্ষ হয় না[২]। সম্মুখে এই যে মুনিশ্রেষ্ঠ ব্যাস, ইনি জীবন্মুক্ত। আমরা ইঁহাকে কল্পনায় সদেহের ন্যায় দেখিতেছি; কিন্তু ইঁহার অন্তরাশয় নির্ব্বিঘ্ন—ভেদবিবর্জ্জিত। অর্থাৎ ইনি দেখিতে সদেহ হইলেও অন্তরে বিদেহ। ইঁহার অন্তর দেহাভিমানশূন্য[৩]। প্রত্যেক জ্ঞানীই ইঁহার ন্যায় অজ্ঞান বিনাশের পর বোধরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। যাঁহারা বোধরূপী, তাঁহাদের আবার প্রভেদ কি? দেহ থাকা না থাকা প্রভেদের কারণ নহে, বোধ থাকা না থাকাই প্রভেদের কারণ। যেমন জলে ও তরঙ্গে প্রভেদ নাই, তেমনি, মোক্ষ হইলে দেহে ও অদেহে প্রভেদ নাই[৪]। মোক্ষ একরূপ, সুতরাং জীবন্মুক্তির সহিত বিদেহ মুক্তির অল্পমাত্রও প্রভেদ নাই। বায়ু প্রবাহিত হউক বা না হউক, যাহা বায়ু তাহা বায়ুই, অন্য কিছু নহে[৫]। যাহা মুক্তি, তাহা পরমার্থ দৃষ্টিতে সদেহ অদেহ-ঘটিত[৬] নহে। ভেদবর্জ্জিত একীভাবই মুক্তি নামের নামী, তাহা আমাদের ও এই ব্যাসের হইয়াছে। ফলিতার্থ—দ্বৈতত্যাগ পূর্ব্বক অদ্বয়াত্মসাক্ষাৎকার হইলে তখন তাহার দেহ থাকা না থাকা সমান হয়[৬]। অতএব, তুমি এক্ষণে সংশয় পরিত্যাগ করিয়া মৎকর্ত্তৃক উপদিশ্যমান পূর্ব্বপ্রস্তাবিত অজ্ঞানীর অজ্ঞাননাশন শ্রবণরঞ্জন জ্ঞানগর্ভ উপদেশ সকল শ্রবণ কর[৭]।

হে রঘুনন্দন! এই সংসারে সম্যকরূপে পুরুষকার প্রয়োগ করিতে

পারিলে, সকলেই সকল লাভ করিতে পারে[৮]। শাস্ত্রবিহিত পরিস্পন্দের অর্থাৎ কর্ম্মের প্রধান ফল চিত্তশুদ্ধি। তাহা লাভ করার পর হৃদয়াকাশে যে চন্দ্রের ন্যায় সুশীতল নিবিড়ানন্দ (নিশ্চল নিবিড় নির্ব্বিকার ভেদ পরিশূন্য পরম সুখ) উদিত হয়, তাহাও পুরুষকারের প্রভাব। তাহা পুরুষকার ব্যতীত অন্য কিছুতে লব্ধ হয় না[৯]। যে পুরুষকারে গমন ভোজনাদি কার্য্যের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় অথচ প্রত্যক্ষ হয় না, যে স্থলে কার্য্যসিদ্ধির বা ফল লাভের মূল কারণ পুরুষকার অপ্রত্যক্ষ থাকে, বুঝিতে পারা যায় না, সেই স্থলে সেই পুরুষকারকেই মূঢ়লোকেরা দৈব বলে। বস্তুতঃ দৈব নামে স্বতন্ত্র পদার্থ নাই[১০]। সাধুগণের উপদিষ্ট পথ অবলম্বন করিয়া কায়মনোবাক্যে যে সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করা যায়, সেই সৎকার্য্যই সফল এবং তাহাই প্রকৃত পৌরুষ বা পুরুষকার। তদ্ভিন্ন কার্য্য উন্মত্তচেষ্টার ন্যায় বিফল ও পুরুষকার বলিয়া গণ্য নহে[১১]। যে, যে বিষয়ের অভিলাষ করে, সে তাহা পাইবার জন্য শাস্ত্রোক্ত ক্রমে যত্নও করে। উচিত নিয়মে চেষ্টা করিলে ফলপ্রাপ্তির অবশ্যম্ভাব অর্থাৎ নিশ্চয়তা আছে। যদি বিঘ্ন বশতঃ সম্পূর্ণ ফল না হয়, তবে, অন্ততঃ অর্দ্ধফলভাগী হইতেও দেখা যায়[১২]। কোন জীব পৌরুষ নামক প্রযত্নের দ্বারা ইন্দ্রত্ব পদ উপার্জ্জন ও ত্রিলোকের আধিপত্য লাভ করিয়াছে[১৩]। * কোন চিদুল্লাস † প্রাণী পুরুষকারনামা প্রযত্নের দ্বারা কমলাসনের পদ (ব্রহ্মত্ব) অধিকার করিয়াছে[১৪], এবং কেহ বা শ্রেষ্ঠতম পুরুষকারের দ্বারা গরুড়ধ্বজের (বিষ্ণুর) পদ পুরুষোত্তমত্ব লাভ করিয়া সুখী হইয়াছে। অন্য এক জীব স্বীয় পুরুষকারে চন্দ্রার্দ্ধচূড়াধারী শিবের পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন[১৫।১৬]।

রাম! তুমি ইহা বিদিত হও যে, পুরুষকার দুই প্রকার। প্রাক্তন ও ঐহিক। তন্মধ্যে ইহজন্মকৃত প্রবল পুরুষকার প্রাক্তন পুরুষকারকে অভিভূত করিতে সমর্থ[১৭]। অধিক কি বলিব, অত্যন্ত যত্নশীল, দৃঢ়াভ্যাসতৎপর ও উৎসাহসমন্বিত পুরুষ ইহজন্মকৃত পুরুষকার দ্বারা সুমেরু

* জন্মান্তরীয় তপস্যার ফলে এই জীবলোকস্থ জীবই কল্পান্তরে ইন্দ্র হয়; সুতরাং ইন্দ্রত্ব পদ তপস্যা নামক পুরুষকারের ফল।

† চিদুল্লাস—চৈতন্যের উৎকর্ষে উৎকৃষ্ট। সত্ত্বগুণের উৎকর্ষে চৈতন্যের উৎকর্ষ। ব্রহ্মার সত্ত্বগুণ সর্ব্বাধিক উৎকৃষ্ট; সেইজন্য তদাধারে চৈতন্যও অধিক স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত। ব্রহ্মাও পূর্ব্বকল্পে সামান্য জীব ছিলেন, তপোবলে বর্ত্তমান কল্পে ব্রহ্মা হইয়াছেন।

পর্ব্বত প্রভৃতিকেও বিদীর্ণ করিতে পারে। * প্রাক্তন পুরুষকারের ত কথাই নাই[১৮]। যে পুরুষকার শাস্ত্রানুসারে অর্জ্জন ও প্রয়োগ করা যায়, তাহাই পুরুষকার এবং তাহাই সফল হয়। অন্যথা অশাস্ত্রীয় পুরুষকারের সুফল দূরে থাকুক, অধিকন্তু তাহাতে অনর্থফলভাগী হইতে হয়[১৯]। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, কোন পুরুষ শাস্ত্রীয় প্রযত্ন শিথিল করিয়া স্বাভাবিক রাগদ্বেষাদির বশবর্ত্তী হয়, হইয়া আপনাকে এরূপ দুর্দ্দশায় পাতিত করে যে, স্বীয় হস্তাদি অঙ্গের উপরেও তাহার আধিপত্য রহিত হয় এবং এক বিন্দু জলও অঙ্গুল্যগ্রে উত্তোলন ও পান করিতে সমর্থ হয় না। আবার ইহাও দেখা যাইতেছে যে, কোন কোন পুরুষ শাস্ত্রীয় নিয়ম দৃঢ়তর রূপে পরিপালন করিয়া অবশেষে সসাগরা সদ্বীপা ও সশৈলা বসুন্ধরার আধিপত্যলাভকেও কিছুমাত্র আয়াস সাধ্য বলিয়া বোধ করে না। কাহার বা এক বিন্দু জলও দুর্লভ এবং কাহার বা সমুদয় পৃথিবীও দুর্লভা নহে। এ সকল পুরুষকার বিশেষের ফল ব্যতীত অন্য কিছু নহে[২০]।

চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত।

---

* অগস্ত্য ঋষির সমুদ্রপান প্রভৃতি তাহার দৃষ্টান্ত। সে সকল ক্ষমতা তপস্যানামক পুরুষকার দ্বারা লব্ধ হইয়া থাকে।

পঞ্চম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, যেমন প্রভা (সূর্য্যকিরণ) নীল পীতাদি বর্ণভেদের কারণ, তেমনি, পুরুষের পুরুষার্থসাধনের প্রতি শাস্ত্রানুসারিণী প্রবৃত্তিই প্রথম কারণ[১]। যে ব্যক্তি শাস্ত্রনির্দিষ্ট বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া স্বকীয় অভিলাষ অনুসারে অর্থাৎ স্বেচ্ছাচার দ্বারা পুরুষার্থ সাধনে প্রবৃত্ত হয়, সে ব্যক্তির তদ্দ্বারা সিদ্ধিলাভ হওয়া দূরে থাকুক, অধিকন্তু তাহা তাহার উন্মত্তচেষ্টিতের ন্যায় মোহের ও অনর্থের কারণ হইয়া উঠে[২]। যে, যে বিষয়ের অভিলাষী হইয়া যে প্রকার যত্ন করে, সে, সেই প্রকার ফলই প্রাপ্ত হয় তাহার অন্যথা হয় না। সুতরাং আপন আপন কর্ম্মই উপযুক্ত কালে দৈব হইয়া দাঁড়ায়; তদ্ব্যতীত অন্য প্রকার দৈব নাই। ভাবার্থ এই যে, ফলদানোন্মুখ প্রাক্তন কর্ম্মই অজ্ঞ লোকের নিকট দৈব-নামে বিদিত[৩]।

পৌরুষ বা পুরুষকার দুই প্রকার। শাস্ত্রীয় ও অশাস্ত্রীয়। শাস্ত্রোক্ত পৌরুষ শ্রেয়োলাভের ও অশাস্ত্রীয় পৌরুষ অনর্থলাভের কারণ হইয়া থাকে[৪]। (অতএব, জ্ঞান কর্ম্ম উপাসনা নামক শাস্ত্রীয় পৌরুষ অবলম্বন করা বুদ্ধিজীবী নরের অবশ্য কর্ত্তব্য)। এমন মনে করা উচিত নহে যে, মনুষ্য কেবল প্রাক্তন পুরুষকারেরই অনুবর্ত্তী। অভিজ্ঞ লোক মাত্রেই জানেন, ও দেখিতে পান, যে, এই শরীরে প্রাক্তন ও ঐহিক উভয়বিধ পুরুষকারই নিরন্তর মেষদ্বয়ের ন্যায় উদামসহকারে সম-বিষম-ভাবে যুদ্ধ করিতেছে। এই যুদ্ধে, যে অর্থাৎ যে পুরুষকার অধিকতর বলবান্ হয়, সেই পুরুষকারই জয় লাভ করে, এবং যে হীনবল হয় সে অভিভূত হয়[৫]। সেই জন্যই বলিলাম, মনুষ্য যত্নপূর্ব্বক নিরালস্য হইয়া শাস্ত্রোক্ত পুরুষকারই অবলম্বন করিবেন। যে, কার্য্য কল্য করিতে হইবে, অদ্যই তাহা সম্পন্ন করিব, এইরূপ উদ্যোগ বা উৎসাহ সহকারে উদ্যত চিত্তে কার্য্য করিলে অবশ্যই সে বিষয়ে জয়লাভ করা যায়[৬]। সম-বিষম-ভাবে উক্ত উভয় পুরুষকারই মেষদ্বয়ের ন্যায় যুদ্ধ করিবে, পরন্তু তন্মধ্যে যে দুর্ব্বল হইবে সে-ই পরাজিত হইবে সন্দেহ নাই[৭]। অপিচ,

শাস্ত্রোক্ত নিয়মে কর্ম্মকারী শাস্ত্রোক্ত ফল পায় এবং বিরুদ্ধকর্ম্মকারী তাহার বিপরীত ফলই পায়। যে স্থলে শাস্ত্রানুযায়ী পুরুষকার আশ্রয় করিলেও অনর্থাগম দৃষ্ট হয়, সে স্থলে, এই বিবেচনা করিতে হইবে যে, সে পুরুষকার প্রাগ্‌ভবীয় বলবৎ অনর্থের দ্বারা (অসৎ পুরুষকারের দ্বারা) নিরুদ্ধ বা দুর্ব্বল হইয়া আছে[৮]। তাদৃশ স্থলে হতাশ্বাস না হইয়া, পুনঃ পুনঃ প্রবলতর পুরুষকার অবলম্বন করতঃ দন্তে দন্ত বিচূর্ণিত করার ন্যায় ঐহিক শুভ উৎপাদনের দ্বারা প্রাক্তন অশুভ চূর্ণিত করিবেক[৯]। রামচন্দ্র! দুষ্প্রবৃত্তির উদয় দেখিলে তৎক্ষণাৎ বোধগম্য করিতে হইবেক যে, অশুভজনক প্রাক্তন পৌরুষ আমাকে অশুভ কার্য্যে প্রবৃত্তি দিতেছে ও নিযুক্ত করিতেছে। অমনি সেই মুহূর্ত্তেই ঐহিক পুরুষকারের বল বাড়াইয়া তদ্দ্বারা তাহাকে পরাহত করা অর্থাৎ দূরীকরণ করা কর্ত্তব্য। প্রাগ্‌ভবীয় পুরুষকার ঐহিক পুরুষকার অপেক্ষা বলবান নহে। যাবৎ না অশুভজনক প্রাক্তন পৌরুষ উপশম প্রাপ্ত হয়, তাবৎ প্রযত্ন সহকারে সুপৌরুষের প্রতি সতত যত্ন রাখা বিধেয়[১০।১১]। যেরূপ পূর্ব্বদিবসীয় অজীর্ণাদি দোষ এতদ্দিবসীয় লঙ্ঘনাদির দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ, ঐহিক পৌরুষ দ্বারাও প্রাক্তন পৌরুষ (দৈব দোষ) নষ্ট হইতে পারে[১২]। অতএব, নিত্য উদ্যোগশালিতা অবলম্বনে ঐহিক পুরুষকার (ঐহিক পুরুষকার=এতজ্জন্মকৃত পুণ্য কর্ম্ম।) দ্বারা পূর্ব্বজন্মকৃত কুপুরুষকারকে অর্থাৎ সেই সেই দুরদৃষ্টকে অধঃকৃত করতঃ আপনাতে সংসারতারক সম্পদ সম্পাদনার্থ যত্ন করিবে। (সংসারতারক সম্পদ=শমদমাদি সাধন)[১৩]। হে রামচন্দ্র! উদ্যোগবিহীন পুরুষ গর্দ্দভ অপেক্ষাও নিকৃষ্ট। উদ্যোগবিহীন হইয়া, গর্দ্দভতুল্য না হইয়া, শাস্ত্রানুসারে স্বর্গ ও অপবর্গ লাভার্থে উদ্যোগ করা নিতান্ত বিধেয়[১৪]। সিংহ যেমন শত্রু কর্ত্তৃক পিঞ্জররুদ্ধ হইয়াও স্বীয় উদ্যোগবলে তাহা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে, অথবা ভগবান্ বিষ্ণু যেমন আসুরী মায়ায় (শম্বরাসুরের সহিত যুদ্ধ কালে) অবরুদ্ধ হইয়াও স্বীয় তেজে তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, তেমনি, আমরাও পৌরুষবলে অনায়াসে এই সংসারকুহর হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারি[১৫]। প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত্তে প্রতিক্ষণে আপনার দেহের নশ্বরত্ব পর্য্যবেক্ষণ করিতে হয় এবং পশুভাব পরিত্যাগ করিয়া পুরুষোচিত কার্য্য করিতে হয়। (পশুভাব অর্থাৎ উদ্যোগবিমুখ গর্দ্দভের ভাব বা অবস্থা) পুরুষো-

চিত কার্য্য কি? পুরুষোচিত কার্য্য সাধুসঙ্গ ও সৎশাস্ত্রাদি অবলম্বন[১৬]। এই যে বয়স্ অর্থাৎ যৌবন, ইহা দ্রবপিচ্ছিল (শ্লেষ্মাদিপরিপূর্ণ ও রক্তাদি দ্রব পদার্থে পরিব্যাপ্ত) ও কিঞ্চিৎ কাল স্ত্রীসম্ভোগ ও অন্নপানাদির দ্বারা পরিপালিত। আপাততঃ ইহা সুখকর কোমল বলিয়া প্রতীয়মান হয় বটে; পরন্তু অন্ন (অল্পে সুখ) কীটের ব্রণাস্বাদনের ন্যায় নিতান্ত বৃথা ও নিষ্ফল[১৭]। তথাপি ইহার গুণ এই যে, ইহার দ্বারা শুভ পৌরুষ অর্জ্জন করা যায়। শুভ পৌরুষ অর্জ্জন করিতে পারিলে শীঘ্রই শুভ ফল পাওয়া যায় এবং অশুভ পৌরুষ উপার্জ্জন করিলে অশুভ ফল উৎপাদন করা হয়। অতএব, ইহাতে দ্বিবিধ পুরুষকার ব্যতীত দৈব নামে কোন পৃথক্ পদার্থ নাই[১৮]। যে ব্যক্তি প্রত্যক্ষপ্রমাণলভ্য উপরি উক্ত তত্ত্ব (দৈবতত্ত্ব) পরিত্যাগ করিয়া অনুমানের আশ্রয় লয়, অর্থাৎ পাছে দৈব আমার বিঘ্নাচরণ করে, এইরূপ অনুমানের তাড়নায় পুরুষকার প্রয়োগে ভীত হয়, সে ব্যক্তি, ভ্রম বশতঃ স্বীয় ভুজদ্বয়কে সর্প বিবেচনা করিয়া পলায়ন করিতে কুণ্ঠিত হয় না[১৯]। "অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহাই হইবে" এইরূপ নিশ্চয় করিয়া যে মূঢ় স্বীয় পুরুষকারের প্রতি আস্থা পরিত্যাগ করে, করিয়া নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্যোগ থাকে, লক্ষ্মী সেই অদৃষ্টবাদী পুরুষের নিশ্চিন্ততা দেখিয়া তাহার নিকট হইতে অন্তর্হিতা হন[২০]। অতএব, পুরুষ প্রথমতঃ পুরুষকার অবলম্বনে বিবেকাশ্রয় করিবেন, পরে পরমার্থ প্রতিপাদক অধ্যাত্মশাস্ত্রের আশ্রয় লইবেন। অনন্তর মোক্ষ মহারত্ন অন্বেষণ করিবেন। রত্ন, বিনা উৎকট যত্নে ও পরিশ্রমে লব্ধ হইবার নহে[২১।২৩]। যেমন ঘট ও পট পরিমিত বা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে অবস্থিত, তেমনি, পুরুষার্থও অর্থাৎ পুরুষকারও পরিমিত অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে অবস্থিত। অর্থাৎ তাহার অবধি বা সীমা তত্ত্বসাক্ষাৎকার[২৪]। (যাবৎ না আত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ হয় তাবৎ পুরুষকার প্রয়োগ করা অতীব কর্ত্তব্য। আত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ হইলে পুরুষকার নিবৃত্ত বা সমাপ্ত হয়; সুতরাং পুরুষকার অসীম নহে; সসীম।) পুরুষার্থ বা পুরুষকার নিয়মিতরূপে সৎশাস্ত্রের আলোচনা, সৎসংসর্গ ও সদাচারপরায়ণতার দ্বারা ফলপ্রদ হয়। তাহাই পুরুষার্থের স্বভাব। তাহার অন্যথাচরণ করিলে তদ্দ্বারা মহান্ অনর্থের আগমন হইয়া থাকে[২৫]। পৌরুষের স্বরূপ বা স্বভাব এইযে, কখন কোন লোক উচিতরূপ পৌরুষ অবলম্বন করিয়া বিফলপ্রযত্ন হন নাই[২৬]।

অনেক মহাপুরুষ প্রথমে দৈবদুর্ব্বিপাক বা দুর্দ্দৈব বশতঃ দারিদ্র্যদশা প্রাপ্ত হইয়া ও অত্যন্ত দুঃখ ভোগ করিয়া অবশেষে পুরুষকার দ্বারা মহেন্দ্রতুল্য হইয়াছেন[২৭]। বাল্যকাল হইতে নিয়মিতরূপে সৎশাস্ত্র অধ্যয়ন, সৎসংসর্গে বাস, সদ্গুরুসেবা ও সদ্গুণাদি অবলম্বন পূর্ব্বক পৌরুষ-প্রযত্ন স্থায়ী করিতে পারিলেই তদ্দ্বারা অভিলষিত-ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়[২৮]। যাহা বলিলাম, গল্প কথা নহে। ইহা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, এবং গুরুপরম্পরা শ্রুত হইয়াছি। অপিচ, অনুভবও করিয়াছি। যাহারা মনে করে, সেই, সেই ফল দৈবাৎ হইয়াছে ও দৈবাৎ এরূপ হয়, তাহারা নিতান্ত নির্ব্বোধ বা কুবুদ্ধিশালী। এই কুবুদ্ধিশালী লোকেরা আত্মঘাতীর ন্যায় পাপী ও বৃথা বিনষ্ট হয়[২৯]। যদিও পুরুষকারের ঐরূপ সামর্থ্য আছে, তথাপি, আলস্য তাহার পরিপন্থী (শত্রু বা বাধাদায়ক)। মানুষ যদি আলস্য না করে, তাহা হইলে জগৎ কি এত অনর্থসঙ্কুল হয়? পুরুষকারে আলস্যপরিহীন হইলে, সকল ব্যক্তিই, পণ্ডিত, ধনী, মানী ও জ্ঞানী হইতে পারে। আলস্যের দ্বারাই এই সসাগরা সদ্বীপা ধরণী নর-পশুতে ও নির্ধন জীবে পরিপূর্ণা হইয়াছে[৩০]। অতএব, বাল্যকাল হইতেই আলস্যপরিহীন হইয়া সৎসঙ্গাদিনিষ্ঠ হওয়া উচিত। যদিও বাল্যে না হয়, তবে, অন্ততঃ যৌবন প্রারম্ভ হইতে পারে। আদর, নৈরন্তর্য্য ও প্রযত্নাদি সহকারে সাধুসঙ্গ, পদার্থতত্ত্বানুসন্ধান, আপনার ও জগতের গুণদোষ বিচার, এই সকল বিষয়ে যত্ন করা বিধেয়[৩১]।

বাল্মীকি বলিলেন, হে রাজন্ অরিষ্টনেমি! ভগবান্ বশিষ্ঠ এইরূপ কহিতেছেন এমন সময়ে ভগবান্ মরীচিমালী অস্তাচলচূড়া অবলম্বন করিলেন। সায়ংকাল উপস্থিত দেখিয়া সভাস্থ লোক পরস্পর পরস্পরকে অভিবাদন করিয়া স্নান ও সন্ধ্যাবন্দনাদি কার্য্য সমাধা করিবার নিমিত্ত স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর রজনী অতিবাহিতা ও দিবাকর সমুদিত হইলে পুনর্ব্বার তাঁহারা সভাস্থানে আগমন করিলেন এবং স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন[৩২]।

পঞ্চম সর্গ সমাপ্ত।

ষষ্ঠ সর্গ।
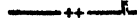
বশিষ্ঠ কহিলেন, রামচন্দ্র! পুরুষের প্রাগুক্তপ্রকার জন্মান্তরীণ কর্ম্মকেই দৈব বলা যায়, তদ্ভিন্ন দৈব নাই। অতএব, দৈষ্টিকতা পরিত্যাগ করিয়া সাধুসমাগম ও সৎশাস্ত্র পর্য্যালোচনাদি শাস্ত্রীয় পুরুষকার দ্বারা আপনাকে উদ্ধার করা কর্ত্তব্য। পুরুষকারই জীবকে বলপূর্ব্বক উদ্ধার করিয়া থাকে[১]। যেমন যেমন যত্নাধিক্য হইবে তেমনি তেমনি তাহা ফল প্রদান করিবে। সেই ফলদানসামর্থ্যবিশিষ্ট যত্নোৎকর্ষাদি পুরুষকারের ও দৈবের নামান্তর মাত্র[২]। যেমন দুঃখের সময় দুঃখ হয়, হইলে লোক সকল "আঃ কি কষ্ট!" এইরূপ বলিয়া থাকে, সেইরূপ, প্রাক্তন কর্ম্মের অনুসরণ করিয়াই "হা অদৃষ্ট!" এইরূপ বলিয়াও থাকে। এস্থলে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, তাহারা দুঃখরূপে পরিণত প্রাক্তন কর্ম্মকেই দৈব বলিয়াছে[৩]। কর্ম্ম ভিন্ন দৈব নামে আকারবিশিষ্ট কোন বস্তু নাই। অতএব, বলবান্ পুরুষ যেমন অনায়াসে বালককে পরাজয় করিতে পারে, সেইরূপ, বলবান্ ঐহিক পুরুষকারও দৈবকে পরাভূত করিতে পারিবে[৪]। যদ্রূপ অদ্যতনীয় প্রায়শ্চিত্তাদি সদাচার পূর্ব্বতন অসদাচারের খণ্ডন করিয়া জীবকে পবিত্র করে, তদ্রূপ, বর্ত্তমান পুরুষকারও প্রাক্তন অশুভ পুরুষকারকে বিনষ্ট করিয়া শুভফল উৎপাদন করিয়া থাকে[৫]। যে সকল লোক লোভের বা সুখের বশ্য হইয়া প্রাক্তন অশুভ বিনাশে উদাসীন থাকে, উপস্থিত সুখের প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে পারে না, না পারিয়া অলস হয়, তাহারাই প্রকৃত দীন, প্রকৃত মূঢ় ও প্রকৃত দৈব-পরায়ণ[৬]; যখন পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম পুরুষকার দ্বারা বিনষ্ট হয় তখন অবশ্যই বুঝিতে হইবে যে, দৈব অপেক্ষা ঐহিক পুরুষকার অত্যধিক বলবান্[৭]। একবৃন্তস্থিত ফলদ্বয়ের মধ্যে একটী ফলকে রসশূন্য ও শুষ্ক হইতে দেখা যায়। সে স্থলে বুঝিতে হইবে যে, রস ভোক্তার প্রাক্তন কর্ম্মই সেই ফলরস বিঘাতের জন্য স্ফূর্ত্তি পাইয়াছিল[৮]। যেহেতু দেখা যায়, জগতের প্রসিদ্ধ ও সিদ্ধ পদার্থও ক্ষয়কারকের প্রযত্নে ক্ষয় হইয়া থাকে, সেই হেতু নিশ্চয় হয় যে, প্রযত্নের বল বড়ই প্রবল[৯]। প্রাক্তন ও ঐহিক

দুই পুরুষকার মেষদ্বয়ের ন্যায় যুদ্ধ করে বটে; বল প্রকাশ করে বটে. পরন্তু যে বলবান্ তাহারই জয় হইতে দেখা যায়[১০]।

রাজবংশের অভাব হইলে অমাত্যগণ কর্তৃক মঙ্গলহস্তী প্রেরিত হইয়া যদি কোন ভিক্ষুক পুত্রকে আনয়ন করিয়া রাজাসনে বসায়, তাহা হইলে সেস্থলে ভিক্ষুক পুত্রের পূর্ব্বসুকৃতি থাকিলেও অমাত্যগণের পুরুষকারকেও তাহার অন্যতর কারণ বলা যাইতে পারে[১১]। * প্রবলগণ যেমন পৌরুষ-প্রকাশ দ্বারা অন্ন গ্রহণ করিয়া তাহা দন্তের দ্বারা নিষ্পিষ্ট করে, সেইরূপ, পৌরুষবলে বলবান্ পুরুষ দুর্ব্বল পুরুষকে নিষ্পিষ্ট করিয়া থাকে[১২]। পৌরুষবিহীন লঘুচেতা লোকেরাই গুরুশালী বলিষ্ঠ লোকের ভোগ্য হয়। তাহারা তাহাদিগকে ইচ্ছানুসারে লোষ্ট্রের ন্যায় ইতস্ততঃ ও সে সে কার্য্যে নিয়োগ করিয়া থাকে[১৩]। অশক্ত অক্ষম লোকেরা শক্ত সক্ষম লোকের পৌরুষকে অর্থাৎ সেই সেই পুরুষকারকে বা দৃশ্য ও অদৃশ্য ক্ষমতাকে নির্ব্বুদ্ধিতা বশতঃ "দৈব" বা "অদৃষ্ট" বলিয়া অবধারণ করে[১৪]। পূর্ব্বোক্ত শক্ত সমর্থ পুরুষ অপেক্ষা অধিক শক্ত সমর্থ অন্যপুরুষও আছে, তাহারা আবার তাহাদের উপর আধিপত্য করিয়া থাকে। অতএব, বিদ্যমান প্রাণীর মধ্যে ঐ প্রকারের পুরুষকারই দৃষ্ট হয় অন্য কিছু দৃষ্ট হয় না। সুতরাং বুঝা উচিত, তদতিরিক্ত দৈব নাই। ফলিতার্থ—শক্তিশালী ব্যক্তিগণের পৌরুষকে নিরুদ্যম ব্যক্তিরা দৈব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে[১৫]। শাস্ত্র, অমাত্য, হস্তী ও পুরবাসী প্রজা, ইহাদের যে ঐক্য, স্বাভাবিকী একতা, তাহাই সেই ভিক্ষুক পুত্রের রাজ্যের কর্ত্রী ও ধারয়ত্রী[১৬]। মঙ্গল হস্তী যে কখন কখন ভিক্ষুককেও রাজা করে; তাহার কারণ—তাহারই বলবৎ প্রাক্তন পৌরুষ[১৭]। কখন ঐহিক কর্ম্ম প্রবল হইয়া পূর্ব্বকৃত কর্ম্মকে কখন বা প্রাক্তন কর্ম্ম প্রবল হইয়া ঐহিক পুরুষকারকে অভিভূত করে। সেই কারণেই বলি, সর্ব্বদা পৌরুষ বা অভিলষিত বিষয়ে যত্নাতিশয় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। যে পুরুষ যত্ন প্রকাশে অনলস, সেই পুরুষই জয়লাভ করিতে সমর্থ হয়[১৮]।

---

* অমাত্যগণের চেষ্টা ও হস্তি প্রেরণাদি বিষয়ে উদ্যোগ না থাকিলে ভিক্ষুকপুত্র রাজা হইতে পারিত না। সুতরাং অমাত্যগণের পুরুষকার অর্থাৎ যত্ন ও উদ্যোগ ভিক্ষুক পুত্রের রাজ্য লাভের সহকারী কারণ, এবং ভিক্ষুকপুত্রের বলবৎ সুকৃত মুখ্য কারণ। ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। পুরুষকার এমনি জিনিশ যে তাহা এক জনকে রাজা করিতে পারে।

যুবা যেমন বালককে অনায়াসে জয় করিতে পারে, তেমনি, বলবত্তর যত্নও দৈবকে জয় করিতে পারে। পূর্ব্বতন ও অদ্যতন দুএর মধ্যে অদ্যতনের বলবত্তা প্রত্যক্ষসিদ্ধ[১৯]। কৃষক এক বৎসর যত্ন করিয়া শস্য প্রস্তুত করে, কিন্তু মেঘাভিমানী পুরুষের প্রবল পৌরুষে তাহা এক দিনেই বিনষ্ট হইয়া যায়[২০]। অতএব, কৃষকের দৃষ্টান্তে, ক্রমোপার্জ্জিত অর্থ বিনষ্ট হইলে তাহাতে খেদ করা উচিত নহে। যখন তাহা রক্ষা করিবার ক্ষমতা নাই, তখন আর তাহা পরিদেবনার বিষয় নহে[২১]। যাহা আমরা করিতে পারি না, যাহা আমাদের শক্তিবহির্ভূত, সাধ্যাতীত, তাহার জন্য দুঃখ করিতে হইলে মৃত্যুকে মারিতে পারিলাম না বলিয়া আমাদের প্রত্যহই দুঃখ ও রোদন করা উচিত[২২]। এ বিষয়ে অধিক কি বলিব, যে, যে বিষয়ে অধিক যত্নবান্ হয়, সে, সেই বিষয়ে জয় লাভ করিতে পারে। জগতের সমুদায় পদার্থই দেশ, কাল, ক্রিয়া ও দ্রব্য অনুসারে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়[২৩]। * অহে রাম! আমি সেই কারণেই বলিতেছি, পুরুষ সৎশাস্ত্র ও সাধুসঙ্গ দ্বারা বুদ্ধির নির্ম্মলতা সাধন পূর্ব্বক সংসারসমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হউক[২৪]। পুরুষরূপ অরণ্যে পুরুষার্থরূপ-ফলের প্রাক্তন ও ঐহিক এই দুইটি বৃক্ষ বিদ্যমান আছে। তন্মধ্যে যেটীর অধিক পরিচর্য্যা করিবে, অধিক যত্ন করিবে, সেইটীই পরিবর্দ্ধিত হইবে[২৫]। যে ব্যক্তি ঐহিক শুভ কর্ম্মের দ্বারা অতি তুচ্ছ প্রাক্তন কর্ম্ম বিনষ্ট করিতে পারে না, রামচন্দ্র! সে নিতান্ত অজ্ঞ ও পশুতুল্য। এই পশুতুল্য অজ্ঞ লোক আপনিই আপনার সুখ দুঃখের অনীশ্বর। অর্থাৎ ঈদৃশ লোক নিতান্তই আপনার দুঃখ পরিহারে ও সুখোৎপাদনে নিশ্চেষ্ট[২৬]। যে মনুষ্য, মানুষ ঈশ্বর প্রেরিত হইয়াই স্বর্গে অথবা নরকে গমন করে, এই বিবেচনার উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকে, সেই মনুষ্য প্রকৃত পশু। অর্থাৎ পশুতুল্য পরাধীন[২৭]। কিন্তু যে উদারস্বভাব যত্নশীল সদাচাররত ও উদ্যমশীল, সেই মানব, সিংহ যেমন স্বীয় উদ্যমে পিঞ্জর হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়, সেইরূপ, এই জগন্মোহ হইতে অনায়াসে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া থাকে[২৮]। যে পুরুষ পুরুষকারের প্রভাব প্রত্যক্ষ

* যে দেশে যে কালে যে ক্রিয়ায় ও যে দ্রব্যে বিফলপ্রযত্ন হওয়া যায় সে দেশ সে কাল সে ক্রিয়া ও সে দ্রব্য ত্যাগ করিয়া দেশান্তরাদি অবলম্বন কর্ত্তব্য। তাহারই নাম যত্নাধিক্য। বিশ্বামিত্র মুনি পূর্ব্বদিকে তপস্যার বিঘ্ন দেখিয়া উত্তরপ্রদেশে গিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

করিয়াও "দৈব আমাদিগকে সকল কার্য্যে নিয়োগ করিতেছে, আমরা দৈব-বলেই সকল কার্য্য সম্পন্ন করি" এইরূপ বিবেচনা করিয়া নিশ্চেষ্ট ও নিরুৎসাহ থাকে, সেই অধম পুরুষ দূরে পরিত্যাজ্য[২৯]। শত শত ও সহস্র সহস্র ব্যবহার আমাদিগের নিকট আসিতেছে ও যাইতেছে। তন্তাবতে নিজ বুদ্ধি পরিচালন না করিয়া শাস্ত্রানুসারে ব্যবহার করাই কর্ত্তব্য[৩০]। যাহারা শাস্ত্রমর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন না করিয়া প্রযত্নতৎপর ও ব্যবহারশীল হয়, তাহাদের সমুদায় অভিলষিত স্বতঃই তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া থাকে। রত্ন রত্নাকরে স্বতঃই উৎপন্ন হয়, তাহার অন্যথা হয় না[৩১]। পণ্ডিতগণ শাস্ত্রবিহিত সুখদুঃখনিবৃত্তিজনক অবশ্য-কর্ত্তব্য কর্ম্মের প্রতি যত্ন প্রকাশ করাকেই পুরুষকার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন[৩২]। বুদ্ধিমান্ মনুষ্য অগ্রে সৎশাস্ত্র আলোচনা ও সৎসঙ্গ অবলম্বন দ্বারা বুদ্ধি নির্ম্মল করিয়া লন, পরে তদ্দ্বারা সমুদয় দোষ নিরাকৃত করিয়া আত্মোন্নতি লাভ করিয়া থাকেন[৩৩]। হে মহাবাহু রাম! পণ্ডিতেরা অবগত আছেন যে, অজ্ঞানকৃত বৈষম্যনিবৃত্তির দ্বারা যে অপরিসীম আনন্দ লাভ হয়, প্রকৃত পক্ষে তাহাই পরমার্থ এবং যদ্দ্বারা তাদৃশ পরমার্থ লাভ করা যায় তাহাই যথার্থ সৎশাস্ত্র। সেই সৎশাস্ত্র সাধুগণের অবশ্য-সেব্য[৩৪]। জীবগণ দেবলোক হইতে ইহলোকে আগমন করিয়া দেবলোক-ভুক্তাবশিষ্ট সুকৃতের ফল ভোগ করে, লোক সকল তাহাকেই দৈব শব্দে নির্দ্দিষ্ট করিয়া থাকে। সুতরাং দৈব, প্রাক্তন পুরুষকার ব্যতীত অন্য কিছু নহে[৩৫]। মূর্খেরা যে অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত দৈবকে নিন্দা করে, তজ্জন্য তাহাদিগকে নিন্দা করা যায় না। যাহারা পুরুষকারকে অমান্য করিয়া কেবল দৈবকে মান্য করে, আমাদের মতে তাহারাই নিন্দনীয় এবং তাহারাই অচিরাৎ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়[৩৬]। ইহা অবধারিত জানিবে যে, মনুষ্যজীব স্বীয় পুরুষকারের দ্বারাই লোকদ্বয়ের (ইহলোকের ও পরলোকের) হিত উৎপাদন করিয়া থাকে। পুরুষ যে পূর্ব্বে দেবলোক পাইয়াছিল, তাহাও তদীয় পুরুষকারের ফল। সেজন্যও বুঝা উচিত যে, যেমন পূর্ব্বদিবসীয় দুষ্ক্রিয়া এতদ্দিবসীয় সৎক্রিয়ায় (প্রায়শ্চিত্তে) বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তেমনি, ঐহিক সৎক্রিয়াও পৌর্ব্বকালিক দুষ্ক্রিয়ার অবসাদ করিতে পারে[৩৭]।

অহে মহাবাহু রাম! যে পুরুষ স্বীয় পৌরুষে সৎকার্য্যে রত হয়, সে

পুরুষ সেই সেই ঐহিক কর্ম্মের দ্বারা প্রাক্তন কর্ম্ম জয় করিয়া অবশেষে তাহার ফল করামলকবৎ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। কিন্তু মূঢ়েরা সেই প্রত্যক্ষ ফল পরিত্যাগ করিয়া দৈবরূপ মোহে নিমগ্ন হয়[৩৮]। অতএব হে রাঘব! তুমি কারণ কার্য্য-পরিশূন্য অর্থাৎ প্রয়োজনরহিত ও অজ্ঞানকল্পিত মিথ্যা দৈব পরিত্যাগ করিয়া আপন শুভাশয়জনক পুরুষকারের আশ্রয় লও[৩৯]। বেদাদি শাস্ত্র ও সদাচার দ্বারা বিস্তৃত ও তত্তদ্দেশবিনির্দ্দিষ্ট সদনুষ্ঠান ও নিয়মাদির দ্বারা যে চিত্তশুদ্ধি ও জ্ঞান উৎপন্ন হয়, হৃদয়ে তাহার প্রস্ফুরণ হইলে প্রথমতঃ তৎসাধনেচ্ছা, তৎপরে তল্লাভের মানস, তৎপরে তদনুযায়িনী শারীর চেষ্টা (অনুষ্ঠান নির্ব্বাহক অঙ্গ পরিচালনা, যাহাকে কর্ম্ম বলে, তাহা) উৎপন্ন হয়। সাধুগণ এইরূপ চেষ্টাকেই পৌরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন[৪০]। যত্নতৎপর হইয়া স্বীয় বুদ্ধির দ্বারা ঐরূপ পুরুষার্থের ফল বোধগম্য করাই পুরুষত্ব এবং বিচার সহকারে সৎশাস্ত্রের অনুশীলন, সাধুসঙ্গ অবলম্বন ও পণ্ডিতজনের সেবা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। সৎশাস্ত্র অনুশীলনাদির দ্বারাই পুরুষকার সফল হইতে দেখা যায় এবং তাহারই দ্বারা পরমার্থলাভে সমর্থ হওয়া যায়[৪১]। দৈব ও পৌরুষের উক্তরূপ বিচার দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, সরল ও সদাচারপরায়ণ ব্যক্তিরা স্বীয় পুরুষকার দ্বারা অনায়াসে দৈবকে জয় করিতে পারেন। পুরুষকারের ঐরূপ প্রভাব বিদিত হইয়া শমদমাদিসাধনপটু ও তত্ত্বজ্ঞানাধিকারী হইবার জন্য সাধুসঙ্গ অবলম্বন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়[৪২]।

জীবগণ এই সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া ঐহিক পৌরুষকেই অর্থসিদ্ধির উপায় বিবেচনা করিয়া সাধুসেবারূপ মহৌষধ সেবন পূর্ব্বক জন্মমরণপ্রবন্ধরূপ মহারোগের শান্তি করুক[৪৩]।

ষষ্ঠ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! নর অল্পমনঃকষ্টবিশিষ্ট-নির্ব্ব্যাধি দেহ লাভ করিয়া এরূপ চিত্তসমাধান করুক, যেন আর তাহার পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিতে না হয়[১]। * যিনি পুরুষকার দ্বারা দৈবকে জয় করিতে ইচ্ছা করেন তিনি ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকেই বাঞ্ছিত লাভ করিতে সমর্থ[২]। যাহারা পুরুষকারে যত্ন প্রকাশ না করিয়া কেবল মাত্র দৈবাবলম্বী হয় তাহারা আপনার ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, সমস্তই নষ্ট করে, করিয়া আত্মঘাত পাপে লিপ্ত হয়[৩]। পুরুষার্থ লাভের উপায় স্ফূর্ত্তি হওয়ার নাম. সম্বিৎস্পন্দ (তত্ত্ব জ্ঞানের বিকাস)। পরে সাধনেচ্ছা বলবতী হওয়ার নাম মনঃস্পন্দ (দৃঢ় সংকল্প), তৎপরে কর্ম্মেন্দ্রিয়ের প্রচলন হওয়ার নাম ইন্দ্রিয়স্পন্দ। (কার্য্যপ্রবৃত্তি বা অনুষ্ঠান রত হওয়া)এতন্নিতয়ই পূর্ব্বোক্ত পুরুষকারের রূপ এবং এতদ্বিধ পুরুষকার হইতেই সংকল্পিত ফল উদয় প্রাপ্ত হয়[৪]। যেমন যেমন সম্বেদন (জ্ঞান বা বিষয় স্ফূর্ত্তি) হয়, মনঃও তেমনি তেমনি স্পন্দিত হয় এবং কর্ম্মেন্দ্রিয়গণও তদনুবর্ত্তী হইয়া সেই সেই কার্য্য করে। অনন্তর সে সকলের ফলও তদনুরূপ এবং তাহার ভোগও তদনুবর্ত্তী[৫]। বাল্যকালাবধি যত্নপূর্ব্বক যে বিষয়ের অনুষ্ঠান করা যায়, সময়ে সেই বিষয়েরই ফল হইতে দেখা যায়। দৈব কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। অতএব ইহ জন্মে পৌরুষই প্রত্যক্ষ সুতরাং শ্রেষ্ঠ[৬]।

মহাত্মা বৃহস্পতি পুরুষকার দ্বারা দেবগণের গুরু হইয়াছেন এবং শুক্রাচার্য্যও দৈত্যদিগের আচার্য্য পদ লাভ করিয়াছেন[৭]। হে সাধু রামচন্দ্র! এ পর্য্যন্ত কত শত দীন দরিদ্র দুঃখী লোক পুরুষকার নামক প্রযত্নে (চেষ্টায়) ইন্দ্রতুল্য হইয়াছে এবং নীচ মনুষ্যেরাও নরোত্তম হইয়াছে[৮]। আবার নহুষ প্রভৃতি মহাপুরুষেরা বিপুল বিভবের অধি-

* সমাধি অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে যে যমনিয়মাদি যোগাঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে হয় তাহারই মাহাত্ম্যে দেহনির্ব্ব্যাধি ও মনোবিকারের হ্রাস হইয়া থাকে। পরন্তু মন দেহাভিমান ত্যাগ না হওয়া পর্য্যন্ত ক্লেশ যুক্ত থাকে। সে ক্লেশ সমূলে উন্মূলিত হয় না। সেইজন্ত "অল্পমনঃ কষ্ট" এইরূপ বলা হইয়াছে।

পতি হইয়াও স্বীয় পৌরুষ দোষে উৎকৃষ্ট পদ হইতে পরিভ্রষ্ট ও নরক-গামী হইয়াছিলেন[৯]। এই সংসারে অনেক শত বিভবশালী পুরুষ নিজ পৌরুষ দোষে দরিদ্র হইয়াছেন এবং অনেক শত দরিদ্রও উত্তম বিত্তবশালী হইয়াছেন[১০]।

অহে রাম! শাস্ত্রানুশীলন, গুরূপদেশ এবং স্বকীয় পরিশ্রম, এই তিনের দ্বারাই পুরুষার্থ সিদ্ধ হইতে দেখা যায়। কিন্তু দৈবের দ্বারা কোথাও কিছু সিদ্ধ হইতে দেখা যায় নাই[১১]। চিত্ত যদি অশুভমগ্ন হয়, তবে তাহাকে সেই সেই অশুভ হইতে বল পূর্ব্বক শুভ পথে নিয়োগ করিবেক। তৎক্ষণাৎ তথা হইতে তাহাকে আকর্ষণ করিবেক। ঐরূপ করাই যথার্থ পুরুষকার এবং তাহাই সমুদায় শাস্ত্রের তাৎপর্য্য[১২]। বৎস! যাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট যাহা অপায়বর্জ্জিত যাহা পরম সত্য, প্রযত্ন সহকারে তাহারই আহরণ কর, এইরূপ উপদেশ গুরুজন কর্ত্তৃক সর্ব্বদাই প্রদত্ত হইয়া থাকে[১৩]। বৎস রাম! আমি, যেরূপ যত্ন করিব, শীঘ্রই আমি সেইরূপ ফলই পাইব। এইরূপ নিশ্চয় করিয়াই আমি পৌরুষ প্রকাশের অনুরূপ ফল পাইয়াছি। দৈব হইতে আমার কিছুমাত্র লাভ হয় নাই[১৪]। পৌরুষ হইতেই পুরুষের অভীষ্ট সিদ্ধি হইতে ও পৌরুষপ্রভাবেই বুদ্ধির পরাক্রম বৃদ্ধি হইতে দেখা-গিয়াছে। দৈব কেবল দুঃখনিপতিত দুর্ব্বলচিত্ত দিগের আশ্বাসন কথা; অন্য কিছু নহে (দুঃখিত লোকদিগকে প্রবোধ দিবার জন্য বা সান্ত্বনা করিবার জন্যই লোক সকল দৈব দৈব করিয়া থাকে)[১৫]। মানবগণ প্রত্যহই পুরুষকারের ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করিতেছে। লোক যে ইচ্ছা মত দেশান্তরগমনাদি ফল প্রাপ্ত হয়, তাহা পুরুষকারের প্রত্যক্ষ ফল[১৬]। যে ভোজন করে, সেই তৃপ্ত হয়। যে ভোজন না করে, সে তৃপ্ত হয় না। যে যায়, সে-ই গন্তব্য পায়। যে যায় না, সে পায় না। যে বক্তা, সে-ই বলে, এবং যে অবক্তা, সে বলে না। সুতরাং পুরুষকারই সফল[১৭]। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা স্বীয় পৌরুষের বলে অনায়াসে দুস্তর সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন। কিন্তু দৈবের ভরসায় নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিলে কদাচ সঙ্কটত্রাণ হয় না[১৮]। যে, যে পরিমাণে যত্ন করে, সে সেই পরিমাণে তাহার ফলভাগী হয়। পরন্তু নিশ্চেষ্ট (চুপ করিয়া) থাকিয়া যে কেহ কখন কোন কিছু পাইয়াছে, তাহা দৃষ্ট হয় না। নিশ্চেষ্ট থাকায় অল্পমাত্রও ফলোদয় হয় না[১৯]। বৎস রাম! শুদ্ধ পুরুষ-

কারের শুভ ফল ও অশুভ পুরুষকারের অশুভ ফল হয়, ইহা বিবেচনা করিয়া তুমি যাহা ইচ্ছা তাহা করিবে[২০]। মনীষিগণ (মনীষিগণ=মননশীল বা মুনিগণ) দেশ ও কাল অনুসারে পুরুষকার প্রয়োগ করিয়া কেহবা শীঘ্র কেহবা কিছু বিলম্বে যে ফল লাভ করেন, অজ্ঞ লোকেরা তাহাকেই দৈব বলে[২১]। কি ইহলোকে কি পরলোকে দৈবের প্রত্যক্ষতা কুত্রাপি নাই। স্বর্গলোকে যে স্বকৃত পুরুষকারের (কর্ম্মের) ফল ভোগ হয়, পণ্ডিতগণ তাহাকেই দৈব আখ্যা প্রদান করেন[২২]। পুরুষ ইহলোকে জন্ম গ্রহণ করিতেছে, বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, এবং জীর্ণও হইতেছে। তাহাতে যেমন জরা, যৌবন ও বাল্য, দৃষ্টিগোচর হয়, দৈব সেরূপ দৃষ্টিগোচর হয় না[২৩]। অর্থপ্রাপক কার্য্য যে প্রযত্নে উত্তম্ভিত থাকে, যে উদ্যমে কার্য্যসাধক অনুষ্ঠান নির্ব্বাহিত হয়, পণ্ডিতেরা তাহাকেই পুরুষকার বলেন এবং তাদৃশ পুরুষকার দ্বারা ইহ পরলোকে সমুদায় অভীষ্টই সিদ্ধ করিতে পারা যায়[২৪]। এক স্থান ত্যাগ করিয়া অন্য স্থান গ্রহণ, হস্তে দ্রব্য ধারণ, অঙ্গের পরিচালন, সমস্তই পুরুষকারের ফল; দৈবের নহে[২৫]। যদ্দ্বারা অনর্থাগম হয়, সেরূপ কার্য্যের প্রতি যে প্রযত্ন, সে প্রযত্ন পুরুষকার নহে। তাহা উন্মত্তচেষ্টা এবং তাহার দ্বারা কিছুমাত্র সুফল লাভ হয় না[২৬]। স্পন্দন বা পরিচলনঘটিত শারীরিক মানসিক ক্রিয়া যে আপন স্বার্থসাধন করে, অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ ফল উৎপাদন করে, তাহা তাহার স্বভাব। পরন্তু বুদ্ধিমান নর সাধুসঙ্গ ও সৎশাস্ত্র আলোচনার দ্বারা স্বীয় বুদ্ধি পরিমার্জ্জন করিয়া ক্রিয়া ও ক্রিয়াফল উন্নত করিয়া থাকেন। যাহা আলোচনা করিলে, অজ্ঞানকৃত বৈষম্য প্রতিনিবৃত্ত হইয়া অপরিসীম সুখ লাভ করা যায়, পণ্ডিতগণ তাহাকেই সৎশাস্ত্র বলেন এবং সাধুগণ প্রযত্ন সহকারে তাহারই সেবা করিয়া থাকেন[২৭।২৮]।

যেমন সরোবর ও সরোজ যথাকালে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তেমনি, মতিমান্ লোক দিগেরও সাধুসঙ্গ ও সৎশাস্ত্র অভ্যাস থাকায় যোগ্য সময়ে জ্ঞানের বৃদ্ধি হইয়া থাকে[২৯]। বাল্যকাল হইতে নিরালস্য হইয়া যত্নসহকারে সৎশাস্ত্র ও সাধুসঙ্গাদি অভ্যাস করিলে অনায়াসে হিতকর স্বার্থসাধন হইতে পারে[৩০]। পরাৎপর ভগবান্ বিষ্ণু একমাত্র পুরুষকার দ্বারা দৈত্য দিগকে জয় করিয়াছিলেন, এবং এই অসীম জগৎ-

কার্য্য সংস্থাপন ও এই অনন্ত বিশ্ব সৃজন করিয়াছেন[৩১]।

হে রঘুনাথ! তুমি চিরকাল এই পুরুষকারের প্রতি এরূপ যত্ন করিবে যে তরুতলগামী হইলে তত্রত্য সরীসৃপগণও যেন তোমাকে দংশন করিতে না পারে[৩২]। *

সপ্তম সর্গ সমাপ্ত।

* সে পুরুষকার এক প্রকার যোগ এবং তাহা অহিংসা জয় হইতে উৎপন্ন হয়। পাতঞ্জল যোগ শাস্ত্রে এই যোগের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। মুদ্রিত পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রের ১০৮ পৃষ্ঠায় "অহিংসা প্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ" সূত্র আছে, তাহার ব্যাখ্যা অবলোকন করুন।

অষ্টম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! দৈব যে কি, তাহা কেহ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে না। অথচ অজ্ঞ লোক দৈব দৈব করিয়া তটস্থের ন্যায় সশঙ্কিত হয়। * দৈবের কোন আকৃতি নাই, কর্ম্ম নাই, স্পন্দ নাই, পরাক্রমও নাই। তাহা কেবল মিথ্যা জ্ঞানের ন্যায় রূঢ়। অর্থাৎ কেবল মাত্র লোকব্যবহারে প্রসিদ্ধ[১]। বস্তুতঃ লোক সকল কর্ম্ম করিয়া ফল প্রাপ্ত হইলে পর, এই প্রকারে এই কার্য্য করিলে এই ফল হয়, এই যে পরীক্ষাসিদ্ধ জ্ঞান ও তদ্ঘটিত স্বকর্ম্মফলপ্রাপ্তিবিষয়ক বাক্য, পণ্ডিতগণ তাহাকেই দৈব বলেন। তদ্ভিন্ন দৈব নাই। কিন্তু মূঢ়বুদ্ধি লোক অজ্ঞতানিবন্ধন দৈবতত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া, স্বতন্ত্র দৈব আছে বলিয়া বোধ করে। পরন্তু সে বোধ ভ্রান্তিগৃহীত রজ্জুসর্পের সমান[২,৩]। যেমন পূর্ব্ব দিনের দুষ্ক্রিয়া বিদ্যমান দিবসীয় শাস্ত্রীয় সৎকার্য্যে আবৃত হইয়া যায়, ঢাকিয়া যায়, তেমনি, প্রাক্তন কর্ম্মও ঐহিক পুরুষকারে অভিভূত হইবেই হইবে, ইহা নিশ্চয় করিয়া তুমি যত্ন সহকারে সৎকার্য্যে রত হইবে[৪]। যে দুর্ম্মতি নর, মূঢ় দিগের অনুমান সিদ্ধ দৈবের বশীভূত হয়, সে দুর্ম্মতির "দৈব হয়-ত আমাকে অগ্নিদাহ হইতে রক্ষা করিবেন" এইরূপ ভাবিয়া অগ্নিপ্রবেশ করা কর্ত্তব্য[৫]। দৈব যদি কর্ত্তাই হয়, তাহা হইলে পুরুষকারের (পুরুষীয় চেষ্টার) প্রয়োজন কি? দৈব তাহাদের স্নান, দান, ভোজন, মন্ত্রোচ্চারণ, সমস্তই করুক, সে নিশ্চেষ্ট থাকুক। কিন্তু কাহাকেও নিশ্চেষ্ট থাকিতে দেখা যায় না[৬]। শাস্ত্রই বা কেন? উপদেশ গ্রহণই বা কেন? দৈব তাহাদিগের জ্ঞান সঞ্চার করিবে, তাহারা নিরুদ্বেগে মূক হইয়া থাকুক[৭]। ইহলোকে এমন কি কেহ দেখিয়াছে যে, মৃত শরীর ব্যতীত জীবৎশরীর স্পন্দহীন হইয়া আছে? এ পর্য্যন্ত কেহই নিশ্চেষ্ট জীবৎশরীর দেখেন নাই। যেহেতু দেখেন নাই, সেইহেতু তাঁহাদের বুঝা উচিত যে, চেষ্টাই জীবের ফলদাতা এবং দৈব কাহারও কিছু করে না[৮]। দৈবের কোন

---

* ভিতরে কি, মূলে কি, তাহা দেখেনা, না দেখিয়া একে আর ভাবে ও একে আর বলে।

মূর্ত্তি নাই। সে যে মূর্ত্তিবিশেষের সাহায্য করিবে, তাহা করিবে না। এ পর্য্যন্ত কোনও নর মিথ্যা পদার্থের সাহায্যকারিতা দৃষ্ট করেন নাই। সুতরাং দৈব কথাটাই বৃথা বা "অর্থশূন্য"। প্রণিধান সহকারে অনুসন্ধান কর, দেখিতে পাইবে, কার্য্যের কারণ সমুদায় বিদ্যমান থাকিলেও হস্তপদাদি-সঞ্চালন ব্যতিরেকে কার্য্য সমাধা হয় না। আরও দেখ, পুরুষ বিদ্যমান থাকিলেও বিনা অধ্যয়নে বিদ্বান্ ও লেখনী বিদ্যমান থাকিলেও হস্তের ব্যাপার ব্যতিরেকে লিপিকার্য্য সম্পন্ন হয় না। কেবল দৈবের উপর নির্ভর করিয়া কি কেহ কখন কোনও কিছু করিতে পারিয়াছে? তাহা পারে নাই[১০]। মন, বুদ্ধি, চিত্ত, এ সকল যেমন অদৃশ্য হইলেও অনুভূতির গোচর হয়, দৈব সেরূপ অনুভূতির গোচর হয় না। কি গোপাল (রাখাল=যাহারা গরু চরায়) কি প্রাজ্ঞ কেহই দৈবকে বোধগম্য করিতে পারেন নাই। সেই জন্যই বলিতেছি, দৈব নিতান্ত অসৎ অর্থাৎ নাই[১১]। যদি কল্পনার দ্বারাই দৈবের কর্ত্তৃত্ব প্রমাণিত করিতে হয় তাহা হইলে পুরুষকারের অপরাধ কি? পুরুষকারকেই কর্ত্তা বলিয়া কল্পনা করিলে হানি কি?[১২] যেমন অমূর্ত্ত আকাশ মূর্ত্ত শরীরে অলিপ্ত, তেমনি, অমূর্ত্ত দৈবও অলিপ্ত জানিবে। মূর্ত্ত পদার্থ মাত্রেই পরস্পর সংলগ্ন থাকে ও তাহা দৃষ্ট হয়। অমূর্ত্ত কোন কিছুতে সংলগ্ন থাকে না, এবং দৃষ্টও হয় না। এ অনুসারেও অমূর্ত্ত দৈব কল্পিত বাক্য ব্যতীত অন্য কিছু নহে[১৩]। দৈবই যদি জগত্রয়স্থ জীবগণের নিয়োগকর্ত্তা হয়, তাহা হইলে জীবগণ "দৈবই সমুদায় করিবে" এই ভাবিয়া, নিশ্চিন্ত থাকুক এবং নিরন্তর শয়ন করিয়া থাকুক[১৪]। "আমি দৈব কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতেছি" এ কথা কেবল মনকে আশ্বস্ত রাখিবার জন্য; তদ্ভিন্ন উহার অন্য কোন অর্থ নাই[১৫]। যাহারা যাহারা মূঢ়কল্পিত দৈবের একান্ত অনুরক্ত হইয়াছে তাহারা তাহারাই বঞ্চিত হইয়াছে ও বিনষ্ট হইয়াছে। কিন্তু প্রাজ্ঞ লোকেরা পুরুষকারের প্রতি নির্ভর করিয়া উত্তম পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন[১৬]। হে রামচন্দ্র! যাহারা শূর, বিক্রমশালী, যাহারা প্রজ্ঞাশালী, যাহারা পণ্ডিত, তাহাদের মধ্যে কে কবে দৈবের প্রতীক্ষা করিয়াছে?[১৭] যাঁহারা কাল গণনা করেন, ভাগ্য গণনা করেন, অর্থাৎ যাঁহারা গণক ও দৈবজ্ঞ নামে প্রসিদ্ধ,

তাঁহারা যাঁহাকে গণনার দ্বারা চিরজীবী বলিয়া স্থির করিয়াছেন, মস্তক ছেদন করিলেও যদি তিনি চিরজীবী থাকেন, তাহা হইলে বলিব ও মানিব যে, দৈব পরম সৎ ও শ্রেষ্ঠ পদার্থ। দৈবজ্ঞগণ বলিলেন বটে, এই ব্যক্তি পণ্ডিত হইবে, কিন্তু সে যদি অধ্যয়ন না করিয়া পণ্ডিত হয়, তাহা হইলে অবশ্যই মানিব ও বিশ্বাস করিব, দৈব আছে ও দৈব সমধিক শক্তিমান্[১৮।১৯]। রাঘব! ক্ষত্রিয়কুলসম্ভূত মহর্ষি বিশ্বামিত্র দৈবচিন্তা পরিত্যাগ পূর্ব্বক একমাত্র পৌরুষ বলে ব্রহ্মত্ব লাভ করিয়াছেন এবং আমরাও পৌরুষ প্রভাবে মহর্ষিত্ব ও আকাশগামিত্বাদি সিদ্ধি লাভ করিয়াছি[২০।২১]। এইরূপ, দানবেরাও দৈবচিন্তাকে দূরীভূত করিয়া পুরুষকারের দ্বারা লোকত্রয়ে সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল এবং দেবতারাও পুনঃ পৌরুষ বলে সেই সকল দানব দিগকে পরাভূত করিয়া সে সকল আত্মসাৎ করিয়াছিলেন[২২।২৩]। রাম! করণ্ডক (চুপড়ি) যে সলিল ধারণ করে, দৈব তাহার কারণ নহে। একমাত্র পুরুষকারই তাহার কারণ। পুরুষেরাই তাহা প্রস্তুত করে এবং মোম প্রভৃতির দ্বারা ছিদ্র রুদ্ধ করিয়া তাহাকে জলধারণ যোগ্য করে[২৪]। পোষ্যবর্গের ভরণ, ধনোপার্জ্জন, পরপীড়ন প্রভৃতি কোনও বিষয়ে দৈবের ক্ষমতা নাই। রঘুপতে! তুমি মনঃকল্পিত দৈবকে উপেক্ষা করিয়া পরম-শ্রেয়োজনক পুরুষকার অবলম্বন কর, করিলে অভিলষিত লাভে সমর্থ হইবে[২৫]।

অষ্টম সর্গ সমাপ্ত।

নবম সর্গ।

রামচন্দ্র কহিলেন, ভগবন্! আপনি সর্ব্বজ্ঞ; এ নিমিত্ত আপনার নিকট আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, যদি দৈব নিরর্থকই হয়, তবে লোকে দৈব দৈব করে কেন? লোকে যাহাকে দৈব বলে তাহা কি প্রকার?[১]

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাঘব! শ্রবণ কর। একমাত্র পুরুষকারই সমুদায় কার্য্যের কারণ এবং তাহারই প্রভাবে জীবগণ সর্ব্বপ্রকার ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। দৈব কোন কিছুর দাতা নহে, ভোক্তা নহে, কর্ত্তাও নহে। বিজ্ঞগণ দৈবকে ফলদাতা বলেন না এবং তাহা দেখাও যায় না। জ্ঞানিগণ দৈবের আদর করেন না এবং তাঁহারা জানেন, দৈব এক প্রকার কল্পনা; অন্য কিছু নহে[২।৩]। ফলপ্রদ পুরুষকারের সুপ্রয়োগে ও কুপ্রয়োগে যে শুভাশুভ ফলের উৎপত্তি হয়, অজ্ঞ লোকেরা তাহাকেই দৈব বলে[৪]। ইষ্টই হউক, আর অনিষ্টই হউক, সমস্তই পুরুষকারপ্রাপিত ও পুরুষকারপরিহাপিত (প্রাপিত=পাওয়া। পরিহাপিত=না পাওয়া); পরন্তু লোক সকল বুদ্ধি মোহবশতঃ উক্ত উভয় স্থলেই দৈবপ্রাপিত বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে। (প্রথম ইষ্ট লাভ, পরে অনিষ্ট প্রাপ্তি অথবা প্রথম অনিষ্টাগম, পরে ইষ্ট প্রাপ্তি। এরূপ হইলেও লোকে সে ঘটনাকে দৈবমূলক বলে। বস্তুতঃ তাহাও দৈবমূলক নহে। তাহা পুরুষকারের অপরাধ অনপরাধ মূলক)[৫]। পুরুষকার প্রয়োগে যে অবশ্যম্ভাবী ঘটনা প্রসূত হয় এবং অভাবনীয় ঘটনা বিঘটিত হয়, লোক মধ্যে তাহাই দৈব নামে প্রখ্যাত[৬]। হে রাঘব! দৈব আকাশরূপী; সেজন্য তাহা "কোনও লোকের কোনও কিছু করে না"। পুরুষকার সিদ্ধ হইলে যে শুভাশুভ ফল ভোগ করিতে হয়, মূঢ় ব্যক্তিরা তাহাকে প্রাক্তন ফলভোগ বলিয়া জানে এবং তাহাই তাহাদের দৈব[৮]। আমিও বিবেচনার দ্বারা নিশ্চয় করিয়াছি যে, ঐরূপ স্বকৃত কর্ম্মের ফলভোগকেই লোকে দৈব বলিয়া মান্য করে[৯]। যাহা ইষ্ট অনিষ্ট ফল লাভের পুরুষকারাত্মক অদৃশ্যকারণ, "দৈব" শব্দ তাঁহারই বাচক। সুতরাং "দৈব" কথাটী আশ্বাসন বাক্য ব্যতীত অন্য কিছু নহে[১০]।

রাম বলিলেন, ভগবন্! আপনি সর্ব্বধর্ম্মবিৎ। আপনি এইমাত্র বলিলেন, প্রাক্তন কর্ম্মই দৈব; সুতরাং তাহা আছে। আবার বলিলেন, তাহা নাই। তাহা মিথ্যা বা বিভ্রমমাত্র। এরূপ বলিবার কারণ কি, অভিপ্রায় কি, তাহা আমাকে বলুন[১১]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! তুমি যথার্থই সাধু। যাহা জিজ্ঞাসা করিলে তাহা আমি সবিস্তরে বলি, শ্রবণ কর। তাহা শুনিলে, দৈব যে নাই, তাহা তুমি নিশ্চয়রূপে জানিতে বা বুঝিতে পারিবে[১২]। মনুষ্যের মনোমধ্যে যখন যেরূপ বাসনা সমুদিত হয়, মানুষ তখনই তাহারই অনুরূপ কর্ম্ম করিয়া থাকে। মনোভাব এক প্রকার, কর্ম্ম করে অন্য প্রকাব, এরূপ হয় না। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, মনুষ্যের অন্তঃস্থ বাসনাই বাহিরে কর্ম্মরূপে পরিণত হয়[১৩।১৪]। যে গ্রাম গমনে ইচ্ছুক সে গ্রামে গমন করে এবং নগর গমনে ইচ্ছুক সে নগরে গমন করে। অধিক কি বলিব, যে যেরূপ বাসনাবিশিষ্ট সে সেইরূপ চেষ্টা করে, পরে তদনুরূপ ফলও পায়[১৫]। এই স্থলে বুঝিতে হইবে যে, বাসনা কি? কেনই বা বাসনার আবেশ হয়? অপিচ, কেনই বা বিনা বাসনায় কার্য্য প্রবৃত্তি হয় না? এই বিষয়টী এইরূপে দিব্যজ্ঞানের গোচর হইয়া থাকে যে, পূর্ব্ব দেহে অত্যন্ত মনোবেগের সহিত যে সমস্ত শুভাশুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হইয়াছে, সেই সমস্তের দুর্লক্ষ্য সংস্কারই এতদ্দেহে বাসনা ও দৈব নামে প্রখ্যাত হইয়াছে[১৬]। কর্ম্মকর্ত্তার সমুদায় কর্ম্মই উক্ত প্রণালীতে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। আবার সেই সকল কর্ম্ম উপচিত (পরিপুষ্ট) হইয়া অবসানে বাসনাবশেষিত অর্থাৎ বাসনায় পরিণত হয়। এই বাসনা স্বীয় আধার মনের সহিত অভিন্ন সুতরাং তন্নিকটস্থ পুরুষের (আত্মার) সহিতও অভিন্ন। এখন বিবেচনা কর, ভাবিয়া দেখ, লোকে যাহাকে দৈব বলে, তাহা কর্ম্ম ভিন্ন অন্য কিছু নহে, একথা সত্য কি না। মন পূর্ব্বোপার্জ্জিত সংস্কারীভূত কর্ম্মের (যে সকল কর্ম্ম সংস্কার ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে তাহার) আধার; সেজন্য তাহা মন ভিন্ন অন্য কিছু নহে। অপিচ, যে মন, সে-ই পুরুষ, সুতরাং পুরুষ ও পুরুষকার (কর্ম্ম), এই দুই ব্যতীত অন্য দৈব নাই[১৭।১৮]। জীবগণের তাদৃশ মন (বাসনাবিশিষ্ট মন) সেই সেই প্রাপ্য বিষয়ে (যে যে বিষয়ে বাসনা জন্মে সেই সেই বিষয় প্রাপ্য) প্রধাবিত হয়, অনন্তর তৎপ্রাপ্তির

জন্ত যত্ন করে, অঙ্গ পরিচালনাদি করে, পরে আবার সেই সেই ফল পায়। সুতরাং জীব কর্ম্মের দ্বারাই ফল পায়, তদ্বিষয়ে মিথ্যা দৈবের কর্তৃত্ব নাই[১৯]। সাধুগণ দুর্নিরূপ্য (কষ্টে যাহার স্বরূপ বুঝিতে হয় তাদৃশ) মনের চিত্ত, বাসনা, কর্ম্ম, দৈব, এই কয়েকটী সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন[২০]। পুরুষগণ দৃঢ় ভাবনার প্রেরণায় প্রযত্ন সহকারে যেরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন সেইরূপ ফলই পাইয়া থাকেন। হে রাঘব! তোমার মঙ্গল হউক। জীবগণ কথিত প্রকারেই কেবল মাত্র পুরুকার দ্বারা সর্ব্বপ্রকার ফল লাভ করিয়া থাকে, এবং তাহাতে অন্য কোন প্রকার পদার্থের কর্তৃত্ব বিদ্যমান নাই[২১।২২]।

রামচন্দ্র বলিলেন, মহর্ষে! আমার প্রাক্তন বাসনাজাল আমাকে যে ভাবে নিযুক্ত করিতেছে, নিয়োগ করিতেছে, আমাকে সেই ভাবেই নিয়োজিত থাকিতে হইবে। তজ্জন্য বৃথা দুঃখ করার ফল নাই?[২৩]

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! তুমি প্রযত্ন সহকারে পুরুষকার অবলম্বন কর। করিলে পরম শ্রেয়োলাভ হইবে, সন্দেহ নাই[২৪]। রঘুনাথ! জীবের বাসনা দুই প্রকার। শুভ ও অশুভ। তাহাও দুই প্রকার। এক প্রকারকে প্রাক্তন বলে, অন্য প্রকারকে অদ্যতন বলে[২৫]। যাহা এতজ্জন্মকৃত তাহা অদ্যতন নামে প্রসিদ্ধ। তুমি ইহজন্মকৃত বিশুদ্ধ শুভদায়িনী বাসনা উৎপাদনের চেষ্টা কর, তাহা হইলে তুমি অচিরাৎ শুভ ফল লাভ করিতে পারিবে[২৬]। যদি কোন প্রাক্তন অশুভ ভাব (বাসনা) তোমাকে মহাসঙ্কটে নিপাতিত করিতে উদ্যত হয়, তাহা হইলে তাহাকে বলপূর্ব্বক জয় করিবে[২৭]। রাম! তুমি প্রাজ্ঞ ও কেবল চৈতন্য। এই জড়াত্মক দেহ তুমি নহ। যদি তোমা ভিন্ন অন্য কোন চেতন থাকে, তাহা হইলে সে চেতনা কাহার?[২৮] যদি অন্য কোন চেতন তোমাকে চেতিত করিতেছে বল, তাহা হইলে তাহার চেতয়িতা কে? তাহাও বলা আবশ্যক হইবে। তাহারও চেতয়িতা অন্য চেতন, এরূপ বলিলে তদুপরি আমরা বলিতে বা জিজ্ঞাসা করিতে পারিব যে, সে চেতয়িতার চেতয়িতা কে? দেখিবে, ঐরূপ ক্রমপরম্পরা অনবস্থা দোষগ্রস্থ; সুতরাং ঐরূপ ক্রমপ্রশ্ন পরিত্যাজ্য। সিদ্ধান্ত—তুমিই চেতন, অন্য চেতন নাই[২৯]। রাঘব! জীবের বাসনা একপ্রকার স্রোতস্বিনীর অনুরূপা। তাহা সৎ অসৎ উভয় পথেই প্রবাহিতা হইতেছে। পরন্তু তুমি তাহাকে পুরুষ-

কার দ্বারা সৎপথে প্রবাহিতা করাও[৩০]। হে রঘুবীর! যখনই দেখিবে, বাসনা নদী অশুভ পথে যাইবার উপক্রম করিয়াছে, তখনই তাহাকে পুরুষকার দ্বারা বলপূর্ব্বক শুভ পথে ফিরাইয়া আনিবে। অশুভ পথ হইতে ফিরাইতে পারিলেই সে আপনা হইতে শুভ পথে প্রবাহিতা হইবে। প্রত্যেক পুরুষেরই চিত্ত শিশুর সমান। যে দিকে ফিরাইবে সেই দিকেই ফিরিবে। সহজে না ফেরে ত বলপূর্ব্বক ফিরাইবে[৩১।৩২]। যেমন বালককে হঠাৎ অবরুদ্ধ করা সঙ্গত নহে, তেমনি, চিত্ত বালককেও সহসা রুদ্ধ করা ন্যায্য নহে। তাহাকে ক্রমে ক্রমে, অল্পে অল্পে, সান্ত্ববাদ ও পুরুষকার প্রয়োগে সৎপথগামী করিবে। যদিও তুমি পূর্ব্ব দেহে শুভ ও অশুভ বাসনা অধিক সঞ্চয় করিয়া থাক, তথাপি তাহা লক্ষ্য করিবে না, না করিয়া বর্ত্তমানে যাহাতে শুভ বাসনা নিবিড় ও প্রবল হয়, তাহার চেষ্টা করিবে। (যোগাভ্যাসাদির দ্বারা সমুদায় বাসনা জয় করিয়া শুভ বাসনা প্রবল করিবার চেষ্টা করিবে)[৩৩।৩৪]। হে শত্রুনাশন রাম! বাসনাভ্যাস বিফল হইবার নহে। মনে কর, পূর্ব্বে যে বাসনা উৎপাদন করিয়াছিলে এখন তাহা প্রবল বেগে দেখা দিতেছে। সেইরূপ, শুভ বাসনা বিষয়ক ঐহিক অভ্যাসের ফলও অচিরাৎ দেখিতে পাইবে[৩৫]। বিষাদ কি? বিষাদ কর্ত্তব্য নহে। এখনও অভ্যাস করিলে নিবিড় শুভ বাসনা উৎপাদিত হইতে পারে এবং তদ্দ্বারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সমুদায় দুর্ব্বাসনা অভিভূত হইতে পারে। হে অনঘ! হে নিষ্পাপ রাম! তোমার শুভ হউক, তুমি শুভ বাসনা আকর্ষণ কর[৩৬]। যদি এমন সন্দেহ হয় যে, আমার পূর্ব্বকৃত দুর্ব্বাসনা বলবতী আছে; তথাপি, তজ্জন্য বিষণ্ণ হওয়া উচিত নহে। এখনও অভ্যাস ও যত্ন করিলে তাহা আর বৃদ্ধি পাইবে না; অধিকন্তু তাহা অল্পে অল্পে ক্ষীণা হইয়া আসিবে[৩৭]। সন্দেহ থাকিলেও শুভ বাসনা উৎপাদনার্থ যত্নবান্ হইবে এবং শুভ বাসনা প্রবৃদ্ধ করিয়া অশুভ বাসনা দূরীভূত করিবে[৩৮]। যে, যে বিষয় উত্তমরূপে অভ্যস্ত করে সে তন্ময়ীভাব প্রাপ্ত হয়, সন্দেহ নাই। এ নিয়ম বা এ তথ্য এই জীবলোকে বালক বৃদ্ধ যুবা সকলেই অবগত আছেন[৩৯]।

হে রঘুনাথ! তুমি শুভবাসনাসম্ভূত পরম সুখ সংসাধনার্থ (পাইবার জন্য) ইন্দ্রিয়গণকে জয় কর, যৎপরোনাস্তি পুরুষকার আশ্রয় কর; ও

উৎকৃষ্ট উদ্যম অবলম্বন কর। যাবৎ না তোমার মন পরম জ্ঞান লাভে সমর্থ হয়, তাবৎ তুমি গুরুশুশ্রূষা, সাধুসঙ্গ ও সৎশাস্ত্র অভ্যাসে তৎপর থাকিও৪০।৪১। যখন দেখিবে, রাগদ্বেষাদি চিত্তমল পরিমার্জ্জিত হইয়াছে, আত্মবস্তু বিখ্যাত (জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত) হইয়াছে, তখন তুমি বিগত-মনোজ্বর অর্থাৎ উদ্বেগশূন্য হইয়া শুভ বাসনা পরিত্যাগ করিবে৪২। হে সৌম্য! যাহা যৎপরোনাস্তি সুন্দর, প্রিয়, আর্য্যজনসেবিত ও বিশুদ্ধ, তুমি শুভবাসনাসমুদ্ভূত বুদ্ধির দ্বারা তাহারই অনুসরণ কর এবং তাহারই দ্বারা শোকবর্জ্জিত পরম পদ প্রাপ্ত হও। আগে মদুক্ত জ্ঞান পথ জয় কর, পরে তুমি শুভবাসনা পরিত্যাগ করিয়া স্বরূপ অবলম্বন করিও৪৩।

নবম সর্গ সমাপ্ত।

দশম সর্গ।

বশিষ্ঠদেব বলিলেন, রামচন্দ্র! ব্রহ্মতত্ত্ব স্বপ্রকাশ ও তাহা সচ্চিদানন্দরূপে সর্ব্বত্র বিদ্যমান। তাঁহার সেই অব্যভিচারিণী সত্তা সমুদায় পদার্থে অবভাসমানা। সেই সত্তা ভবিষ্যৎকাল সম্বন্ধীয় উল্লেখে নিয়তি আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। লোকে যাহাকে ভবিতব্য বলে, তাহারই অন্য নাম নিয়তি। এই নিয়তিই কারণের কারণত্ব এবং কার্য্যেরও কার্য্যত্ব[১]। * অতএব, তুমি শ্রেয়ঃসাধনের নিমিত্ত পুরুষকার আশ্রয় কর। যাবৎ না মুক্তি হয় তাবৎ তুমি নিত্য বান্ধব চিত্তকে সুস্থির কর, করিয়া আমি যাহা বলি তাহা সাবধানে শ্রবণ কর[২]। নিতান্ত নিপতনশীল ইন্দ্রিয় সকল মনোরথে আরোহণ করিয়া প্রবল বেগে নিরন্তর ধাবমান হইতেছে। † প্রথম প্রযত্নে তুমি তাহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে সংযত কর[৩]। হে রামচন্দ্র! আমি তোমার ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল কামনায় পুরুষার্থফলপ্রদায়িনী মোক্ষোপায়ময়ী বেদ সার-সংহিতা কীর্ত্তন করি, তুমি তাহা স্থিরচিত্ত হইয়া শ্রবণ কর[৪]। ইহা শ্রবণ করিলে তুমি সুখ দুঃখ দূরীভূত করিয়া পরলোকে পরমানন্দ লাভ করিতে পারিবে। উদারবুদ্ধি লোক পুনর্জ্জন্ম-নিবারণের নিমিত্ত এই পরম সংহিতা শ্রবণ করতঃ সংসারবাসনা দূরীকৃত করিয়া সম্পূর্ণ শান্তি ও সন্তোষ লাভ করিয়া থাকেন[৫]। সেই কারণেই বলিতেছি, তুমিও বেদের পূর্ব্বাপর বাক্য সকল (পূর্ব্ব বাক্য কর্ম্মকাণ্ডীয় কথা। অপর বাক্য উপাসনাকাণ্ডীয় শ্রুতি। যে সকলের

* অস্তি অর্থাৎ আছে, এই ভাব সত্তা নামে প্রথিত। ইহাকে ভূতকাল ঘটিত করিয়া বুঝাইতে হইলে "ছিল" এবং ভবিষ্যৎ কাল ঘটিত করিয়া বলিতে হইলে "হইবে" এইরূপ বলিতে হয়। যাহা ভবিষ্যৎকালপ্রথিত সত্তা তাহারই নিয়তি ও ভবিতব্য এই দুই নাম প্রসিদ্ধ; পরন্তু কারণত্ব ও কার্য্যত্ব এই দুই নামও তৎপর্য্যবসায়ী। পূর্ব্বকাল উল্লেখিনী সত্তা কারণ এবং বর্ত্তমানাদি উল্লেখনী সত্তা কার্য্য। ফল কথা—সমস্ত সত্যই ব্রহ্মসত্তার অধীন। তদতিরিক্ত সত্তা নাই। সুতরাং যাহা নিয়তি বা ভবিতব্য, তাহাও তোমার অধীন।

† প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ই আপন আপন বিষয়ে তৃষ্ণাপূর্ব্বক প্রধাবিত হয়, হইয়া জীবকে ঐহিক সুখে ও স্বর্গাদি সুখে পাতিত বা নিমজ্জিত করে। সেইজন্য, মুক্তিলাভের পূর্ব্বে ইন্দ্রিয়গণ যাহাতে মনোরথারূঢ় না হয় তাহা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। সেইরূপ করা বা সেইরূপ প্রযত্ন বেদান্তাদি শাস্ত্রে শম দমাদি নামে প্রসিদ্ধ।

তাৎপর্য্য অনুসন্ধান কর)। বিচার কর এবং চিত্তকে সমরস অর্থাৎ অদ্বয়ব্রহ্মরত করিয়া আত্মতত্ত্বানুসন্ধান কর[৮]। বিবেকিগণ যে মোক্ষকথা শ্রবণ করিয়া সকল দুঃখ হইতে শান্তি লাভ করেন, আমি তোমাকে সেই মোক্ষকথা বলিতেছি, তুমি তাহা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা এই সর্ব্বদুঃখবিনাশকারিণী ও বুদ্ধিসমাশ্বাসদায়িনী মোক্ষকথা বলিয়াছিলেন[৭।৯]।

রামচন্দ্র কহিলেন, ব্রহ্মন্! পূর্ব্বকালে ভগবান্ স্বয়ম্ভু কি কারণে এই তত্ত্বজ্ঞানকথা কহিয়াছিলেন এবং আপনিই বা কি প্রকারে তাহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এই সমস্ত বিষয় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন[১০]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! শ্রবণ কর। সমুদায় মায়িক পদার্থের (জগতের) আধার সর্ব্বগামী, সর্ব্বান্তর্যামী, অবিনশ্বর, চিদাকাশরূপী, একাদ্বয় আত্মা আছেন। তিনিই বিদ্যমান জীবনিবহে আত্মা-আখ্যায় প্রদীপের ন্যায় বিরাজ করিতেছেন[১১]। সেই আত্মা কি স্থির কি অস্থির (কি স্থাবর কি জঙ্গম) সর্ব্বত্রই সমান অর্থাৎ বিকারশূন্য, একরূপ একরস। এই চিন্ময় বা চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মা হইতে সর্ব্বাগ্রে সাগর হইতে তরঙ্গের উৎপত্তি ন্যায় সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণুর অর্থাৎ সূক্ষ্মব্রহ্মাণ্ডরূপী বিরাট্ পুরুষের উৎপত্তি হইয়াছিল[১২]। এই বিরাট পুরুষের হৃদ্‌পদ্ম হইতে, মতান্তরে নাভিপদ্ম হইতে পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার (চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার) জন্ম হয়। কনকাচল সুমেরু সেই পদ্মের কর্ণিকা, দিক্ সকল তাহার দল এবং গ্রহ নক্ষত্র তারকাদি তাহার কেশর[১৩]। হে রঘুবীর! বেদবেদাঙ্গবিৎ ও দেবমুনিপূজিত বিষ্ণুর হৃদ্‌কমলোৎপন্ন সেই পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা মনের মনোরথ সৃজনের ন্যায় এই সমুদায় ভূত সৃজন করিয়াছেন[১৪]। এই জম্বুদ্বীপ তদীয় সৃষ্টির এক পার্শ্বস্থ এবং জম্বুদ্বীপের এক কোণে এই বিস্তীর্ণ ভারতবর্ষ। তিনিই এই ভারতবর্ষে আধি ব্যাধি জরা পরিপ্লুত প্রাণীসমূহ সৃজন করিয়াছেন[১৫]। অনন্তর তিনি দেখিলেন, স্বসৃষ্ট জীবসমূহের মন ভাবে ও অভাবে অর্থাৎ লাভে ও অলাভে বিষণ্ণ, নানা প্রকার উৎপাতে প্রপীড়িত, তাহারা জন্মমরণগ্রস্ত, অল্পায়ু, ভোগবাসনাজনিত ব্যসনে (বৃথা চেষ্টায়) সমাসক্ত ও তজ্জনিত দুঃখে অতীব কাতর[১৬]।

অনন্তর প্রাণিনিকরের তাদৃশ দুর্দ্দশা ও কাতরতা দেখিয়া, পিতা যেরূপ পুত্রের দুঃখ দর্শনে কাতর হন, সেইরূপ, তিনিও জনসংঘের

দুঃখ দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত, কাতর ও করুণাপরবশ হইলেন[১৭]। অনন্তর ভাবিতে লাগিলেন, আমার এই অজ্ঞান উপায়বিহীন দুঃখপরিপ্লুত সন্তানগণের দুঃখমোচনের উপায় কি?[১৮]

ক্ষণকাল ঐরূপ চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া ভগবান্ বিধাতা লোকসকলের হিতার্থে তাহাদের দুঃখবিমোচনার্থ তপস্যা, ধর্ম্ম (যজ্ঞ যাগ), দান, সত্য ও তীর্থ, এই কয়েকটীর সৃষ্টি করিলেন[১৯]। তৎপরে সেই সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা পুনর্ব্বার চিন্তা করিলেন। ভাবিলেন, কেবল ঐ কএকটীর দ্বারা স্বসৃষ্ট জীবের সম্পূর্ণরূপে দুঃখবিমোচন হইবার সম্ভাবনা নাই[২০]। জীব যাহাতে নির্ব্বাণ-নামধেয় পরম সুখ প্রাপ্তি হইবে, যাহা পাইলে আর জন্ম মরণ ভোগ হইবে না, তাহা আত্মতত্ত্ব জ্ঞান ব্যতীত অন্য উপায়ের লভ্য নহে[২১]। একমাত্র আত্মতত্ত্বজ্ঞানই সংসারদুঃখসন্তপ্ত জীবের উদ্ধারের উপায়। আত্মতত্ত্বজ্ঞান যেরূপ উপায়, তপোদান তীর্থ প্রভৃতি সেরূপ উপায় নহে[২২]। অতএব, এই সকল নষ্টচেতন মন্দাত্মা জনগণের সমুদায় দুঃখের বিমোচনার্থ বা সংসারক্লেশের নিবারণার্থ শীঘ্রই আমি এক অভিনব দৃঢ় উপায় প্রকট করিব[২৩]। ভগবান্ পুণ্যযোনি ব্রহ্মা মনে মনে এইরূপ আলোচনা করিয়া অবশেষে আমাকে সৃষ্টি করিলেন[২৪]। হে অনঘ! যেমন এক জলতরঙ্গ হইতে অন্য জলতরঙ্গ উৎপন্ন হয়, তেমনি, আমিও তদীয় অনির্ব্বচনীয় মায়ার প্রভাবে উৎপন্ন হইলাম এবং সেই মুহূর্ত্তেই পিতার সমীপবর্ত্তী হইলাম। আমিও পিতার ন্যায় কমণ্ডলু ও অক্ষমালা ধারণ ও মৃগচর্ম্ম পরিধান পূর্ব্বক কমণ্ডলু-কর অক্ষমালাধারী ও মৃগচর্ম্মপরিধায়ী পিতার চরণপ্রান্তে গমন করিয়া অবনত শিরে তদীয় চরণে অভিবাদন করিলাম[২৫।২৬]। তিনিও মৎকর্ত্তৃক অভিবাদিত হইয়া আমাকে পুত্র! আগমন কর; এইরূপ সস্নেহ ও সাদর বাক্যে আহ্বান করিলেন এবং স্বীয় হস্তে মদীয় হস্ত ধারণ করিয়া স্বকীয় সত্যাখ্য * পদ্মের উত্তর দলে শুভ্রমেঘে শীতাংশুর ন্যায় আমাকে উপবেশন করাইলেন[২৭]। অনন্তর মৃগচর্ম্মপরিধায়ী পিতা মৃগচর্ম্ম-পরিধায়ী আমাকে রাজহংস যেমন সারস পক্ষীকে সম্বোধন সহকারে কোন কিছু বলে, তেমনি বলিতে লাগিলেন[২৮]। বলিলেন, পুত্র! শশধর যেরূপ

* সত্যাখ্য দল। ব্রহ্মা যে পদ্মে উপবিষ্ট ছিলেন সেই পদ্মের প্রধান দল (পাবড়ি) সত্য নামে প্রসিদ্ধ।

শশলাঞ্ছন্ দ্বারা কলঙ্কিত, সেইরূপ, তোমার চপলস্বভাব চিত্ত অজ্ঞানতায় দ্বারা কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্ত কলঙ্কিত হউক[২৯]।

আমি পিতা কর্তৃক ঐরূপে অভিশপ্ত হইয়া সেই মুহূর্ত্তেই আত্ম-বিস্মৃত হইলাম অর্থাৎ যাহা আমার পূর্ব্বরূপ, প্রকৃতরূপ, তাহা ভুলিয়া গেলাম। সুতরাং সংসারভ্রান্তি আসিয়া আমাকে আশ্রয় করিল[৩০]। * তদবধি আমি বর্ণিতপ্রকারে তত্ত্বজ্ঞানবিহীন ও তন্নিবন্ধন ক্ষীণধন জনগণের ন্যায় দুঃখশোকে সমাক্রান্ত হইয়া দিন দিন শীর্ণ হইতে লাগিলাম[৩১]। ভাবিতে লাগিলাম, এই কঠোরতর সংসারযন্ত্রণা কোথা হইতে ও কি প্রকারে আসিয়া আমাকে আক্রমণ করিল! আমি নিরন্তর ঐরূপ চিন্তা করি ও সর্ব্বদা মৌন হইয়াই থাকি, পরন্তু সে অবস্থা অধিক কাল থাকিল না[৩২]। পিতা আমাকে সাতিশয় দুঃখিত ও বিষণ্ণচিত্ত দেখিয়া এক দিন বলিলেন, পুত্র! তুমি কি নিমিত্ত দুঃখিত হইতেছ? দুঃখশান্তির উপায় আমাকে জিজ্ঞাসা কর, † করিলে তোমার সমুদায় দুঃখ দূরীভূত হইবে, তখন তুমি অতুল সুখের পাত্র হইবে[৩৩]।

রামচন্দ্র! অনন্তর আমি তদীয় পদ্মাসনে উপবিষ্ট থাকিয়াই বিশ্ব-স্রষ্টা ভগবান্ পিতাকে সংসাররূপ মহাব্যাধির ঔষধ জিজ্ঞাসা করিলাম। বলিলাম, নাথ! জীবের ঈদৃশ দুঃসহ সংসার যন্ত্রণা কোথা হইতে আগত হইয়াছে, এবং কি প্রকারেই বা তাহার শান্তি হইতে পারে, তাহা আমাকে শীঘ্র বলুন[৩৪।৩৫]।

অনন্তর পিতা কমলযোনি মৎকর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া পরমপাবন মহৎ জ্ঞান বহুপ্রকার করিয়া আমাকে বলিলেন, অনন্তর আমি তত্ত্বজ্ঞান লাভে পিতা অপেক্ষাও অধিক নির্ম্মল বোধরূপে অবস্থিতি করিতে লাগিলাম[৩৬]। অনন্তর আমার উপদেষ্টা ও জগৎকর্ত্তা পিতা আমাকে বিদিতবেদ্য দেখিয়া বলিলেন, পুত্র! আমি তোমারই মঙ্গলার্থ তোমাকে শাপ প্রদান দ্বারা অজ্ঞানগ্রস্ত করিয়া জিজ্ঞাসু করিয়াছিলাম্। তোমাকে কথিত প্রকারে

---

* ইহাতে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, আত্মভ্রান্তি হইলে সংসার দর্শন ও আত্মভ্রান্তি বিদূরিত হইলে সংসার ত্যাগ নামক মোক্ষ হইয়া থাকে। অপিচ, উপদেশ সকল অজ্ঞানীর জন্য, জ্ঞানীর জন্য নহে।

† জিজ্ঞাসু না হইলে তাহাকে উপদেশ দিতে নাই। দিলে উপদেশ ব্যর্থ হয়। যে জিজ্ঞাসু, সেই শিষ্যই উপদেশের পাত্র বা অধিকারী। এই তথ্য প্রচারার্থ "জিজ্ঞাসা কর" এই অংশ কথিত হইয়াছে।

জিজ্ঞাসু করিবার অভিপ্রায় এই যে, তুমি জিজ্ঞাসু হইলে সমুদায় লোক তোমার ন্যায় জিজ্ঞাসু হইবে ও জ্ঞানসার উপদেশ নিচয় শুনিবার অধিকারী হইবে। এখন তুমি শাপ মুক্ত হইয়াছ ও বোধ প্রাপ্ত হইয়াছ। মালিন্যপ্রাপ্ত কনক যেমন মালিন্য পরিহারে যে কনক সেই কনকই হয়, তেমনি, তুমিও অজ্ঞানমালিন্য পরিহারে আমার ন্যায় একাত্মমাত্র হইয়াছ[৩৭।৩৯]। হে সাধো! এখন তুমি লোকহিতার্থে মহীপৃষ্ঠস্থ ভারতবর্ষে গমন কর[৪০]। পুত্র! ভারতবর্ষস্থ জনগণ স্বকুশল কামনায় ক্রিয়াকাণ্ডপর হইয়া আছে। তাহারা ক্রমেই বুদ্ধিনৈর্ম্মল্য লাভ করিতেছে। তুমি সেই সকল অধিকারী জীব দিগকে ক্রিয়াকাণ্ডক্রমে, ক্রমশালী আত্মজ্ঞান * উপদেশ করিবে[৪১]। যাহারা সংসারবিরক্ত, মহাপ্রাজ্ঞ ও বিচারপরায়ণ, তাহারাই উপদেশের যথার্থ পাত্র। অতএব, তাহাদিগকেই তুমি আনন্দবিধায়ক পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞান প্রদান কর[৪২]।

রামচন্দ্র! আমি সেই ভগবান্ কমলযোনি পিতৃদেবের আজ্ঞায় তদবধি জ্ঞানোপদেশ প্রদানার্থ উপস্থিত আছি এবং ভবিষ্যতেও থাকিব। এই সংসারে যত কাল উপদেশ যোগ্য লোক থাকিবে তত কালই আমাকে থাকিতে হইবে[৪৩]।

রামচন্দ্র! এই পৃথিবীতে আমার নিজের কিছুমাত্র কর্ত্তব্য নাই; পরন্তু প্রোক্তকারণে থাকিতে হইয়াছে। যদিও প্রোক্তকারণে আমি পৃথিবীতে আছি সত্য; পরন্তু মন অতিক্রম করিয়া আছি। যদ্রূপ সুষুপ্তিকালের বুদ্ধি বিষয়াভিমান শূন্যা হইয়া থাকে, সেইরূপ, আমিও নিরভিমান চিন্তায় উপস্থিত কার্য্যের অনুগামী হই। অজ্ঞ লোকের দৃষ্টিতে আমার কর্ম্ম প্রতীত হইলেও বস্তুতঃ আমি কিছুই করিতেছি না। ঈশ্বরাজ্ঞা প্রতিপালন জন্য আমি প্রশান্ত বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা অবশ্যকর্ত্তব্য বোধে অনাসক্তচিত্তে কর্ম্ম সমুদায়ের অনুষ্ঠান করিয়া থাকি। ফলতঃ আমি কিছুই করি না। কারণ—আমি নিষ্কাম[৪৪]।

দশম সর্গ সমাপ্ত।

---

* সাধন বল না থাকিলে শত উপদেশ শুনিলেও আত্মজ্ঞান জন্মে না। সেই কারণে বলা হইল, ক্রমশালী। অর্থাৎ আত্মজ্ঞান ক্রমানুসারেই উৎপন্ন হয়। আগে ক্রিয়ানুষ্ঠানে রত থাকিয়া বুদ্ধিদোষ মার্জ্জন করিতে হয়, পরে উপদেশ শ্রবণে তত্ত্বজ্ঞান জন্মাইতে হয়।

একাদশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রামচন্দ্র! ভগবান্ কমলোদ্ভবের চেষ্টা, আমার জন্ম-বৃত্তান্ত ও যে প্রকারে পৃথিবীতে জ্ঞানের অবতরণ হইয়াছে, তাহা সমস্তই তোমাকে বলিলাম; তুমিও শ্রবণ করিলে। হে নিষ্পাপ রামচন্দ্র! আজ যে তোমার সেই ব্রহ্মপ্রোক্ত পরম জ্ঞান শ্রবণের জন্য উৎকণ্ঠা হইয়াছে নিশ্চয়ই তাহা তোমার মহাসুকৃতের ফল। বিশেষ সুকৃত (পুণ্য) না থাকিলে এরূপ জ্ঞানশ্রবণস্পৃহা হয় না[২]।

রামচন্দ্র পুনর্ব্বার কহিলেন, ব্রহ্মন্! লোকসৃষ্টির পরে লোকপিতা-মহ পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার বুদ্ধি বা মতি কি নিমিত্ত জ্ঞানাবতরণে প্রবৃত্তা হইয়াছিল? তাহা আমাকে পুনর্ব্বার বলুন[৩]।

বশিষ্ঠ বলিতে লাগিলেন। সেই ক্রিয়াশক্তিপ্রচুর মদীয় পিতা ব্রহ্মা স্বভাবের বশে অর্থাৎ প্রাক্তন জ্ঞান কর্ম্মের প্রভাবে স্বয়ম্ভূরূপে সমুদ্রে তরঙ্গোৎপত্তির ন্যায় পরব্রহ্মেই সমুৎপন্ন হইয়াছিলেন[৪]। তিনি ভুবন ও ভুবনবাসী জীব সৃষ্টি করার পর দেখিলেন, স্বসৃষ্ট জীব নিবহ আত্ম-জ্ঞানাভাবে আতুর অর্থাৎ জন্ম জরা মরণ ও নরকগতি প্রভৃতিতে নিতান্ত কাতর। এমন কি, সেই পরাৎপর পুরুষ তাহাদের ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এই কালত্রয়বর্ত্তিনী সুগতি ও দুর্গতি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেন[৫]। দেখিলেন, ক্রিয়াক্রমের অর্থাৎ স্বর্গ অপবর্গের উপায় অনুষ্ঠানের যোগ্য কাল সত্যাদি যুগ ক্ষয় হইলে লোক সমূহের মোহ বৃদ্ধি হইবে ও তজ্জ-নিত নরকপাত অনিবার্য্য হইবে। এই পর্য্যালোচনার পর তিনি যার পর নাই করুণাযুক্ত হইলেন[৬]। অনন্তর সেই প্রভু আমাকে সৃজন ও বার বার উপদেশ করিয়া জ্ঞানযুক্ত করিলেন। পরে অজ্ঞানগ্রস্ত জীবগণের অজ্ঞান বিনাশের নিমিত্ত আমাকে এই ভূমণ্ডলে প্রেরণ করিলেন[৭]। আমি যেমন লোকের অজ্ঞান নিবারণার্থ তৎকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছি, এইরূপ, সনৎকুমার ও নারদ প্রভৃতি মহর্ষিগণকেও তিনি জনগণের মোহশান্তির নিমিত্ত এই ধরণীতলে প্রেরণ করিয়াছেন[৮]। আমরা সকলেই কর্ম্মের ও উপাসনাদির ক্রম, নিয়ম ও প্রণালী উপদেশ করিয়া মোহরোগাক্রান্ত

জনগণের উদ্ধারার্থ পরমেশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছি[৯]। ইতিপূর্ব্বে সত্য-যুগ ক্ষয় প্রাপ্ত হওয়ায় বিশুদ্ধ ক্রিয়াক্রম অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্মসমূহ ও রাগ লোভাদির দ্বারা কলুষিত নহে, এরূপ অভ্রান্ত বেদোক্ত ক্রিয়াকলাপ অল্পে অল্পে ক্ষয় প্রাপ্ত অর্থাৎ লুপ্ত প্রায় হওয়ায় ভগবৎপ্রেরিত সেই সেই মহর্ষিরা সে সকলের পুনঃপ্রবর্ত্তনার্থ ও ধর্ম্মমর্য্যাদাস্থাপনার্থ পৃথক্ পৃথক্ দেশে পৃথক্ পৃথক্ রাজা কল্পনা (স্থাপনা) করেন এবং তাঁহাদের ও তাঁহাদের শাসনাধীন প্রজার ধর্ম্মনিয়ম সংস্থাপনার্থ অনেকানেক বেদমূলক ধর্ম্মসংহিতাও প্রচার করেন[১০।১১]। এইরূপ ক্রমেই এই পৃথিবীতে ধর্ম্ম অর্থ কাম, এই ত্রিবর্গ প্রাপ্তির উপায়ীভূত সেই সেই ঋষি কর্ত্তৃক উচিতরূপে প্রণীত নানা প্রকার স্মৃতিশাস্ত্র ও শ্রৌতকর্ম্মের শাস্ত্র প্রচারিত হইয়াছে[১২]। হে রামচন্দ্র! অনিবার্য্য কালচক্রের পরিবর্ত্তনে বিশুদ্ধ ক্রিয়াকলাপ লুপ্ত-প্রায় হইলে লোক সকল ভোগাভিলাষে ও ভোগনির্ব্বাহক ধনাদি উপার্জ্জনে ব্যগ্র হওয়ায় রাজগণের মধ্যে ধনাদির নিমিত্ত নানাপ্রকার বাদ বিসম্বাদ ও তন্নিবন্ধন শত্রুতা হইতে লাগিল। এই সময় প্রজা-বর্গের মধ্যেও নানাপ্রকার রাজপীড়া ঘটিতে লাগিল[১৩।১৪]। অপিচ, এই দুর্ঘটনার সময় ভূপালগণ বিনা যুদ্ধে পৃথিবী পরিপালনে সমর্থ হন নাই। সুতরাং প্রজাগণের সহিত তাঁহারা সকলেই দৈন্যদশাগ্রস্ত ও অধিকতর দুঃখাভিভূত হইয়াছিলেন[১৫]। এ দিকে আমরাও তাহাদের সেই সেই অজ্ঞতানিবন্ধন সংসার দুঃখের অবসানার্থ ও জ্ঞাননিয়ম প্রচারার্থ অশেষবিধ জ্ঞান-শাস্ত্র প্রকটন করিলাম[১৬]। হে রাঘব! অধ্যাত্মবিদ্যা পূর্ব্বে রাজা-দিগের নিমিত্ত বর্ণিত হইয়াছিল বলিয়া রাজবিদ্যা নামে প্রথিত হই-য়াছে[১৭]। রাজবিদ্যা রাজাদিগের গোপনীয় বস্তু। পূর্ব্বে রাজারা উক্ত রাজগুহ্য উত্তমোত্তম অধ্যাত্মবিজ্ঞান জ্ঞাত হইয়া সংসার দুঃখ হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছিলেন[১৮]। রাম! সেই সকল অতুলকীর্ত্তি রাজন্য-গণ এক্ষণে নাই। অনেক দিন হইল, তাঁহারা ইহলোক ত্যাগ করিয়া-ছেন। তৎপরে তুমি এই পৃথিবীতে মহারাজ দশরথ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ[১৯]। হে শত্রুতাপন! তোমারও চিত্তনির্ম্মল হইয়াছে এবং তাহাতেই তোমার পরম পবিত্র অহেতুক বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছে[২০]। হে সাধু রাম! পৃথিবীতে প্রায় সকলেরই কারণ বশতঃ রাজস বৈরাগ্য হইয়া থাকে; কিন্তু তোমার আত্মার ও অনাত্মার বিচার জনিত অর্থাৎ বিবেকমূলক,

সাধুগণের চমৎকারজনক, উত্তম ও জ্ঞাননিমিত্তজ বৈরাগ্য জন্মিয়াছে। সুতরাং তোমার এ বৈরাগ্য সাত্ত্বিক[২১।২২]। বিরস বীভৎস বস্তু দেখিলে কাহার না তদ্বস্তুতে বিরাগ জন্মে? তাদৃশ বিষয়ে অনেকেরই বৈরাগ্য জন্মে বটে; কিন্তু সাধুদিগের বৈরাগ্য বিবেক হইতেই উৎপন্ন হয়। সুতরাং তাঁহাদের বৈরাগ্যই উত্তম[২৩]। যাহাদের বিনা নিমিত্তে অর্থাৎ কেবল মাত্র দুই একটী দুঃখ ও বিদ্বেষ বশতঃ বৈরাগ্যোদয় না হয়, কেবলমাত্র সত্ত্বগুণ-পরিণামজ আত্মানাত্মবিবেক বশতঃ সংসার বৈরাগ্য জন্মে, এ জগতে তাঁহারাই যথার্থ বিবেকী, তাঁহারাই মহাত্মা, তাঁহারাই প্রাজ্ঞ এবং তাহাদেরই অন্তঃকরণ যথার্থ নির্ম্মল[২৪]। তত্ত্বজ্ঞানের উদ্দেশে যিনি বিবেক বশতঃ বুদ্ধিপূর্ব্বক বিষয়বিরক্ত হন, তিনিই উৎকৃষ্টহারপরিশোভী যুবরাজের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হন[২৫]। যাঁহারা স্বীয় বিবেক বুদ্ধির দ্বারা সংসাররচনা বিচার করিয়া তৎপ্রভাবে পবিত্র ও বৈরাগ্যভাবাপন্ন হন, প্রকৃতপক্ষে তাঁহারাই মহাপুরুষ[২৬]। রাঘব! কি অন্তঃপ্রপঞ্চ, কি বাহ্য-প্রপঞ্চ, * সমুদায় বিশ্ব আত্মবিবেক দ্বারা বিচার করিয়া ইন্দ্রজালবৎ মিথ্যা বিবেচনা করা উচিত ও বলপূর্ব্বক পরিত্যাগ করা বিধেয়[২৭]। মরণ, ব্যাধিবিপ্লব, বিপদ, দৈন্য, জরা, এ সকল দেখিলে অর্থাৎ নিপুণ হইয়া পর্য্যালোচনা করিলে কোন ব্যক্তি না বিরক্ত হয়? তাহাকেই বৈরাগ্য বলা যায়—যাহা স্বতঃ ও স্ববিবেক বশতঃ উৎপন্ন হয়[২৮]। তুমি অকৃত্রিম বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছ, মহত্ত্ব লাভ করিয়াছ; সেই কারণে তুমি বীজবপনের ফালকৃষ্ট † উত্তম কোমল ক্ষেত্রের ন্যায় জ্ঞানসার তত্ত্বজ্ঞান-রূপ বীজবপনের উৎকৃষ্ট আধার অর্থাৎ পাত্র[২৯]। পরমেশ্বরের প্রসাদে তোমার ন্যায় ব্যক্তির শুভা বুদ্ধি (সুবুদ্ধি) বৈরাগ্যেরই অনুগামিনী হইয়া থাকে[৩০]। বহুকাল ব্যাপিয়া যাগ, যজ্ঞ, দান, তপস্যা, শাস্ত্রোক্ত নিয়ম পরিপালন ও তীর্থসেবা প্রভৃতি করিয়া তদ্দ্বারা জন্মজন্মান্তরীণ দুষ্কৃতি ক্ষয় করিতে পারিলে তখন তাহারা পরমার্থ বিচারে প্রবৃত্ত হইতে পারে। পারে বটে, কিন্তু তাহাতেও সকলের বৈরাগ্যোদয় হয় না। কাকতালীয় ন্যায়ে কাহার কাহার বৈরাগ্যোদয় হইয়া থাকে[৩১।৩২]।

---

* শরীর, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহংকার, এ সকল অন্তঃপ্রপঞ্চ। শরীরের বাহিরে সমস্তই বাহ্য প্রপঞ্চ। প্রপঞ্চ শব্দের অর্থ জগৎ।

† ফালকৃষ্ট অর্থাৎ লাঙ্গল দ্বারা চষা ভূমি।

জীব যাবৎ না পরম পদ দেখিতে পায় তাবৎ তাহারা পুনঃ পুনঃ লৌকিক বৈদিক কর্ম্মে রত ও পুনঃ পুনঃ সংসার চক্রে ভ্রাম্যমান হইতে থাকে৩৩। যেমন আলাননিবন্ধ হস্তী বন্ধন ছেদন করিয়া পলায়ন করে, তেমনি, সাধুগণ এই সংসারের গতি অত্যন্ত কুটিল ও অসৎ বিবেচনা করিয়া ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া তন্ময়ী বুদ্ধির দ্বারা পরব্রহ্মে গমন করেন৩৪। রাম! এই সংসারগতি (সংসারাবস্থা) বড়ই বিষম ও ইহার অন্ত অর্থাৎ শেষ নাই। ইহার প্রবল দোষ এই যে, জীব যাবৎ ইহাতে অবস্থান করে, তাবৎ দেহযুক্ততা অর্থাৎ দেহাভিমান ত্যাগ হয় না। দেহাভিমান ত্যাগ না হইলেও আত্মবিষয়ক তত্ত্বজ্ঞান হয় না। আত্মবিষয়ক তত্ত্বজ্ঞান না হইলেও আপনার মহত্ত্ব অনুভূত হয় না৩৫। রঘুনাথ! মহাবুদ্ধি পুরুষেরা অর্থাৎ বিবেকী পুরুষেরা জ্ঞানযোগরূপ ভেলার দ্বারা সুদুস্তর সংসাররূপ মহাসমুদ্র পার হইয়া থাকেন৩৬। সেইজন্যই বলিতেছি, তুমিও বিচারাভ্যাসতৎপরা ও বিবেক-বৈরাগ্য-নির্ম্মলা সদ্বুদ্ধি অবলম্বন পূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে সংসারসমুদ্রতারক জ্ঞানযোগ শ্রবণ কর৩৭।

সংসার অনন্ত আপদের ও দুঃখভয়ের আস্পদ (স্থান)। ইহাতে যে বিক্ষেপ জনিত ভয়দুঃখাদির বেগ আছে, তাহা নিতান্ত প্রবল, দুঃসহ ও দীর্ঘস্থায়ী। তাহা উত্তম আত্মতত্ত্ব জ্ঞান ব্যতিরেকে চিরকাল অন্তর্দ্দাহ জন্মাইয়া থাকে৩৮। রাঘব! জ্ঞানযোগ না থাকিলে শীত, বাত, এবং আতপ, এ সকলের ক্লেশ কোন্ সাধু সহ্য করিতে সমর্থ হইত৩৯? অনল যেমন তৃণরাশি দগ্ধ করে, তেমনি, অশেষদোষাকর দুরন্ত বিষয়চিন্তাও অজ্ঞান দিগকে দগ্ধ করিয়া থাকে৪০। যেমন অগ্নিশিখা বর্ষাসিক্ত বনরাজি দগ্ধ করিতে সমর্থ হয় না, তেমনি, সংসারযন্ত্রণাও তত্ত্বদর্শী জ্ঞাতজ্ঞেয় প্রাজ্ঞ ব্যক্তির অনিষ্ট করিতে সমর্থ হয় না৪১। এই সংসার মরুভূমিসমুত্থিত প্রসিদ্ধ ও প্রবল বাত্যাকাণ্ডের অনুরূপ। এই বাত্যাকাণ্ডে যতই আধিব্যাধিরূপ ঘূর্ণ বায়ু উঠুক, তাহাতে অত্রস্থ তত্ত্বজ্ঞানী নামক কল্পপাদপের কিছুই হয় না। তত্ত্বজ্ঞরূপ কল্পবৃক্ষ তাহাতে ভগ্নাবভগ্ন (ভাঙ্গিয়া পড়া বা বিশীর্ণ হওয়া) অথবা আলোড়িত কিছুই হয় না৪২।

রাম! সেইজন্যই বলি, তুমি বুদ্ধিমান্, প্রমাণকুশল অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদি

প্রমাণ নিচয় পরিজ্ঞাত আছ এবং আত্মজিজ্ঞাসু হইয়াছ; সুতরাং তুমি অতঃপর আত্মতত্ত্ব বিজ্ঞাত হইবার নিমিত্ত যত্নবান্ হও। গুরুসেবাতৎপর হইয়া জ্ঞানোপায় কথা সকল জিজ্ঞাসা কর[৪৩]। প্রমাণকুশল অর্থাৎ শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন উদারচেতা গুরু যাহা বলেন, উপদেশ করেন, তাহা তুমি যত্নপূর্ব্বক শ্রবণ ও ধারণ কর। যেমন রঞ্জনের নিমিত্ত কুঙ্কুম দ্রবে বস্ত্র নিমগ্ন করিলে বস্ত্র যেমন কুঙ্কুমরাগ গ্রহণ করে, তেমনি, তুমিও গুরূক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য গ্রহণ কর[৪৪]। হে বাগ্মিপ্রবর রাম! যে নর অতত্ত্বজ্ঞ ও বিফলভাষী পুরুষকে প্রশ্ন করে, কোন কিছু জিজ্ঞাসা করে, সে নর নিতান্ত নিকৃষ্ট ও মূঢ়তম[৪৫]। প্রমাণবিৎ ও তত্ত্বজ্ঞানী গুরু জিজ্ঞাসিত হইয়া যত্নপূর্ব্বক যাহা বলেন, উপদেশ করেন, যে নর তাহা না শুনে, সে নরও নিতান্ত অধম[৪৬]। যে নর পূর্ব্বে গুরুর অজ্ঞতা ও তজ্জ্ঞতা পরীক্ষা করে, করিয়া প্রশ্ন করে, সেই নর বুদ্ধিমান ও উত্তমপুরুষ[৪৭]। আর যে মূর্খ বক্তার স্বভাবাদি পরিজ্ঞাত না হইয়া তত্ত্বজিজ্ঞাসায় প্রবৃত্ত হয় অর্থাৎ উপদেশ গ্রহণের ইচ্ছা করে, সে মূর্খ যার পর নাই অধম এবং সে কোনও কালে পরমার্থভাজন হইতে পারে না[৪৮]। যে শিষ্য গুরূক্ত বাক্যের পূর্ব্বাপর সমাধান করিতে সক্ষম, উক্ত অনুক্ত ও অন্তর্ভূত তত্ত্ব বিচার দ্বারা গ্রহণ ও ধারণ করিতে পটু, গুরু সেই শিষ্যেরই প্রশ্নের প্রত্যুত্তর করেন, পশুতুল্য অজ্ঞ অধমের প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদান করেন না। অপিচ, যে গুরু প্রশ্নকর্ত্তার বোধসামর্থ্য আছে কি নাই তাহা পর্য্যালোচনার দ্বারা না বুঝিয়া সহসা অপাত্রে বক্তব্য বলেন, উপদেশ করেন, সে গুরুও বিজ্ঞ সমাজে মূর্খ বলিয়া পরিগণিত[৪৯।৫০]।

হে রাঘব! তুমি সেরূপ শিষ্য ও আমি সেরূপ গুরু নহি। তুমি সদ্‌গুণশালী ও উত্তম প্রশ্নকর্ত্তা এবং আমিও তত্ত্বকথনে সম্যক্ সক্ষম। সুতরাং আমাদিগের এই যোগ (গুরুশিষ্যের ভাব মেলন) অবশ্যই ফলজনক হইবে[৫১]। রাঘব! তুমি শব্দে ও শব্দার্থে পণ্ডিত। তোমাকে আমি যে সকল সদুপদেশ প্রদান করিতেছি, তুমি তাহা যত্নপূর্ব্বক হৃদয়ে গ্রহণ করিবে ও "ইহাই অখণ্ডিত তত্ত্ব" এইরূপ অবধারণ বা নির্ণয় করিবে[৫২]। তুমি মহান্ হইয়াছ, বিরক্ত হইয়াছ, সংসারের ও জীবের গতি বুঝিতে পারিয়াছ, তোমাকে উপদেশ করিলে উপদেশজনিত জ্ঞান

যন্ত্রে কুঙ্কুমাম্বুসংলগ্নের ন্যায় লগ্ন হইবে[৫৩]। যেমন প্রভাকরের প্রভা জল মধ্যেই প্রতিফলিত হয়, তেমনি, উপদেশ গ্রহণে ও তত্ত্ববিবেকে সক্ষমা ত্বদীয় বুদ্ধি মদীয় উপদেশের মধ্যে অবশ্যই প্রবিষ্ট হইবে[৫৪]। হে রাম! আমি যাহা যাহা বলিব তাহা তাহাই তুমি যত্ন পূর্ব্বক হৃদয়ে গ্রহণ করিবে। যদি না পার, তবে, আমাকে বৃথা প্রশ্ন করিও না[৫৫]। রাম! মন এই সংসার অরণ্যের চপল মর্কট। সেই কারণেই বলিতেছি, তাহাকে শোধন করিয়া অর্থাৎ স্থির করিয়া পশ্চাৎ পরমার্থ বাক্য শ্রবণ করিবে[৫৬]। অবিবেকী, অজ্ঞান ও অসজ্জনসংসর্গী লোক দিগকে দূরীকৃত-করিয়া সাধু সজ্জন দিগকে পূজা করিবে[৫৭]। সতত সজ্জনসংসর্গ করিলে বিবেক জ্ঞান জন্মে। ভোগ ও মোক্ষ এই দুইটী সেই বিবেক বৃক্ষের ফল[৫৮]। অভিজ্ঞগণ বলিয়া থাকেন যে, মোক্ষনামক পুরের দ্বারদেশে শম (জিতেন্দ্রিয়তা), নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, সন্তোষ ও সাধুসঙ্গ, এই চার দ্বারপাল বিদ্যমান আছে[৫৯]। প্রযত্ন সহকারে এই চার দ্বারপালের সেবা করা কর্ত্তব্য। অশক্ত হইলে তিন্ অথবা দুই, একান্ত অশক্ত পক্ষে অন্ততঃ এক দ্বারপালের সেবায় অনুরক্ত হইবে। তাহা হইলে তাহারা মোক্ষ-নামক রাজবাটীর দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া অর্থাৎ খুলিয়া দিবেক[৬০]। উহাদের এক জনকে বশীভূত করিতে যদি প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে হয় তথাপি তাহা স্বীকার করিবে। করিয়া অন্যতম দ্বারপাল বশ্য করি-বার চেষ্টা করিবে। কারণ, উহাদিগের এক জনকে বশীভূত করিতে পারিলে অপর তিন জন সহজে বশ্য হইবে[৬১]। ভাস্কর যেমন জ্যোতিষ্ক গণের ভূষণ ও শ্রেষ্ঠ, তেমনি, বিবেকসম্পন্ন পুরুষই শাস্ত্র শ্রবণের, তপস্যার, অর্থাৎ শাস্ত্রার্থ বিচারের পাত্র ও শ্রেষ্ঠভূষণস্বরূপ[৬২]। যেমন তরলস্বভাব অম্বু (জল) জাড্যের (অতিশৈত্যের) দ্বারা পাষাণের ন্যায় কঠিন হইয়া যায়, তেমনি, অল্পচৈতন্য জীবেরাও (অল্পবুদ্ধিলোকেরাও) নিজ মূর্খতার দোষে জড়বৎ হইয়া যায়[৬৩]। কিন্তু রাম! তুমি সেরূপ নহ। তোমার অন্তঃকরণ সৌজন্য গুণে ও শাস্ত্রার্থ দর্শনে সূর্য্যোদয়ে পদ্মের ন্যায় প্রফুল্ল হইয়াছে[৬৪]। যেমন মৃগাদি পশু বীণানিস্বন শুনি-বার জন্য উৎকর্ণ হয়, তেমনি, তুমিও জ্ঞানোপদেশ শুনিতে ও বুঝিতে উৎকর্ণ হইয়াছ। সেইজন্যই বলিয়াছি, তুমি উপদেশের পরম পবিত্র ও যোগ্য পাত্র[৬৫]। হে রামচন্দ্র! এক্ষণে তুমি বৈরাগ্য ও অভ্যাস এই

দ্বয়ের দ্বারা শান্তি ও সৌজন্যরূপ মহাসম্পত্তি উপার্জ্জন কর। করিলে আত্মাসম্ভাবনা থাকিবে না৬৬। অগ্রে সৎশাস্ত্রের আলোচনা, সাধুসঙ্গ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও তপোনুষ্ঠান দ্বারা স্বীয় প্রজ্ঞা বর্দ্ধিত করিবে৬৭। কারণ, প্রজ্ঞাই মূর্খতা নাশের পরম কারণ। যে কিছু জ্ঞানদর্শনের শাস্ত্র আছে অর্থাৎ অধ্যাত্ম শাস্ত্র আছে, সমস্তই মূর্খতা বিনাশের উপায়৬৮। এই যে সংসারবৃক্ষ, ইহা আপদের এক মাত্র আস্পদ এবং ইহাই অজ্ঞ দিগকে নিত্য মুগ্ধ করিতেছে। সুতরাং যত্নপূর্ব্বক অজ্ঞতা বা মূর্খতা বিনাশের চেষ্টা করা অবশ্য কর্ত্তব্য৬৯। চর্ম্ম (ভস্ত্রা, কামারের জাঁতা) যেমন অগ্নিসংযোগে ক্রমনিয়মে সঙ্কুচিত হইতে থাকে, তেমনি, চিত্তও দুরাশার দ্বারা নিত্যই সর্পের ন্যায় কুটিলগতি প্রাপ্ত ও বুদ্ধিপ্রদেশে শত শত বিক্ষেপ জন্মায়। জন্মাইয়া মূর্খতা আনয়ন করে, পরে তৎক্রমে দিন দিন সঙ্কুচিত হইতে থাকে। অর্থাৎ মালিন্য প্রাপ্ত হইতে থাকে৭০। দৃষ্টি (চক্ষুঃ) যেমন নির্ম্মল নভোমণ্ডলস্থ পূর্ণ শশধর দর্শনে প্রসন্ন বা পরিতৃপ্ত হয়, তেমনি, মদুক্ত বস্তুদৃষ্টি (তত্ত্বজ্ঞান) প্রাজ্ঞ ব্যক্তিতেই স্বার্থসম্পাদিনী হয়। (অথবা বস্তুদৃষ্টি অর্থাৎ চিদাত্মা প্রাজ্ঞ শিষ্যের চিত্তে প্রাজ্ঞ উপদেষ্টার প্রভাবে স্ফুরিত হইয়া থাকেন)৭১। যাহার মতি পূর্ব্বাপর বিচারের দ্বারা সূক্ষ্মার্থ গ্রহণেক্ষমবতী হইয়াছে, নিরতিশয় নৈপুণ্যলাভ করিয়াছে, তাদৃশী মতি সবিকাশা নামে খ্যাত। যাহার মতি তাদৃক প্রকারে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহসংসারে সেই পুরুষই পুরুষ৭২। হে রঘুবর! যেমন মেঘাবরণবিনির্ম্মুক্ত তিমিরবিনাশী পূর্ণ শশধরের কিরণে আকাশমণ্ডল শোভমান হয়, তেমনি, তুমিও নির্ম্মলাবুদ্ধিতে ও শান্ত্যাদি গুণে শোভমান হইয়াছ৭৩।

একাদশ সর্গ সমাপ্ত।

দ্বাদশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! তোমার মন পূর্ব্বোক্ত গুণসমূহে পূর্ণ হইয়াছে। কিরূপে প্রশ্ন করিতে হয় তাহাও তুমি অবগত আছ। অপিচ, সংক্ষিপ্ত (সূত্র) কথা বলিলেও তাহা বুঝিতে পার। এই সকল কারণে আমি তোমাকে যত্নপূর্ব্বক বলিতে অর্থাৎ উপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি[১]। এক্ষণে তুমি তোমার রজস্তমোবর্জ্জিতা সত্ত্বসারা মতি (সাত্ত্বিকী বুদ্ধি) পরমাত্মায় স্থাপিত কর, করিয়া জ্ঞানোপদেশ শুনিবার জন্য অগ্রসর হও[২]। জিজ্ঞাসু জনের যে যে সদ্‌গুণ থাকা আবশ্যক সে সমস্তই তোমাতে বিরাজ করিতেছে এবং বক্তার বা উপদেষ্টার যে যে গুণ থাকা উচিত, সে সমুদায়ও আমাতে বিরাজ করিতেছে। যেমন, জলধিতে রত্নশ্রী, তেমনি, আমাতে ও তোমাতে গুণশ্রী[৪]। পুত্র! চন্দ্রকিরণসংযোগে চন্দ্রকান্ত মণির ন্যায় বিবেক ও বৈরাগ্য সংযোগে তোমার চিত্ত আর্দ্র হইয়াছে ও তুমি অশেষ সদ্‌গুণ লাভ করিয়াছ[৫]। তুমি বাল্যকাল হইতে সদ্‌গুণে অভ্যস্ত, সুতরাং শুদ্ধস্বভাব। সেইজন্য এখন তুমি তত্ত্বকথা শ্রবণের উপযুক্ত। যেহেতু উপযুক্ত, সেই হেতু আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমি জানি, চন্দ্রমা ব্যতীত কুমুদিনী বিকশিতা হয় না[৬]। (অর্থাৎ অধিকারী ব্যক্তি ব্যতীত অনধিকারী ব্যক্তি কদাচ তত্ত্ব কথা শুনিতে সমর্থ হয় না)। যে সকল সমারম্ভ অর্থাৎ প্রামাণিক উপদেশ, সে সকল পরম পদ (ব্রহ্মতত্ত্ব) দৃষ্টে উপশম প্রাপ্ত হইবে। অর্থাৎ প্রাপ্য ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইলে তখন আর উপদেশ শুনিতে হইবে না। তাহাই উপদেশ শ্রবণের অবধি বা সীমা[৭]। যদি জ্ঞানোপদেশ শ্রবণে উত্তমাধিকারী গণের চিত্তবিশ্রান্তি না হইত, তাহা হইলে কোন্ বিবেকী ব্যক্তি এই সংসারযাতনা সহ্য করিতে সমর্থ হইত? (তাৎপর্য্য এই যে, তাঁহারাও তোমার ন্যায় অসহ্য যন্ত্রণায় দেহত্যাগে কৃতসংকল্প হইতেন)[৮]। যেমন কল্পান্তকালোদিত আদিত্যগণের (দ্বাদশ সূর্য্যের) তেজঃ মেরু প্রভৃতি পর্ব্বতকেও ভস্মীভূত করিয়া থাকে, তেমনি, পরমপদ (ব্রহ্ম) প্রাপ্তি

মাত্রে সমুদায় মনোবৃত্তি বিলয় প্রাপ্ত হইয়া যায়[৯]। রাম! সংসার এক প্রকার বিষম বিষ। ইহার আবেগে যে বিসূচিকা (রোগ) জন্মে, অশেষ বিশেষ যন্ত্রণা ভোগ হয়, তাহা নিতান্ত দুঃসহ। পরন্তু যোগ তাহার পবিত্র অর্থাৎ তদ্বিষনাশন গারুড় মন্ত্রের স্বরূপ[১০]। পরমার্থ জ্ঞানরূপ সে যোগ সজ্জনগণের সহিত সৎশাস্ত্রের আলোচনায় পাওয়া যাইতে পারে[১১]।

তুমি "এই মানবজন্ম জ্ঞানোপার্জ্জনের জন্যই হইয়াছে। এবং এই জন্মে বিচারপরায়ণ হইলে অবশ্যই দুঃখক্ষয় হইবে।" এইরূপ স্থির করিবে ও নিশ্চয় সহকারে বিচার করিবে। বিচার দৃষ্টিকে কদাচ তুচ্ছ করিবে না এবং তাহাকে অবহেলাও করিবে না[১২]। যেমন ভুজঙ্গমগণ জীর্ণত্বক পরিত্যাগ করিতে দুঃখিত হয় না, তেমনি, তত্ত্বদর্শী বিচারপরায়ণ পুরুষেরা এই ব্যাধিমন্দির অশেষ দুঃখাকর কলেবর পরিত্যাগে কিছুমাত্র দুঃখিত হন না। অধিকন্তু তাঁহারা এই ক্ষণভঙ্গুর দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অর্থাৎ দেহের প্রতি যে অহং মম অভিমান রূঢ় আছে, তাহা পরিত্যাগপূর্ব্বক শীতলান্তঃকরণ হইয়া এই মায়াময় বিস্তীর্ণ জগৎকে ইন্দ্রজালবৎ জ্ঞান করিয়া থাকেন। যাঁহারা অসম্যগ্‌দর্শী, তাহারাই দুঃখে কাতর হয়, অভিভূত হয়, কিন্তু সম্যগ্‌দর্শীরা এতদ্বিয়োগে অল্পমাত্রও দুঃখিত হন না[১৩]। দুঃখিত না হইবার কারণ এই যে, তাঁহারা জানিতে পারিয়াছেন, এই সংসার এক ভয়ঙ্কর রোগ। ভীষণতম ভবরোগ নর দিগকে কখন বিষধরের ন্যায় দংশন করিতেছে, কখন তীক্ষ্ণধার অসির ন্যায় ছেদন করিতেছে, কখন কুন্তের (কুন্ত= বড়শা অস্ত্র) ন্যায় বিদ্ধ করিতেছে, কখন রজ্জুর ন্যায় বন্ধন করিতেছে, কখন প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখার ন্যায় দগ্ধ করিতেছে, কখন বা অন্ধকার-ময়ী রজনীর ন্যায় মোহান্ধকারে নিক্ষিপ্ত করিতেছে এবং কখন বা অশঙ্কিত চিত্তে বিষয়ানুসন্ধানে রত পুরুষ দিগকে পাষাণের পেষণ ও অবসন্ন করিতেছে (পাথর চাপা করিতেছে)। এই যে সংসার নামক দীর্ঘ রোগ, এই রোগই নরগণের প্রজ্ঞা অর্থাৎ বিবেকবুদ্ধি বিনাশ করিতেছে, মর্য্যাদা ভঙ্গ করিতেছে, ঘোর অন্ধকূপে অর্থাৎ নরকে নিপাতিত করিতেছে এবং তৃষ্ণায় জর্জ্জরিত করিতেছে। অধিক কি বলিব, এই সংসারে এমন কোন দুঃখ নাই যাহা সংসারী জনগণকে ভোগ করিতে না হয়[১৪]। বিষয়-বিসূচিকা অতি ভয়ানক রোগ।

নরক-নগরোপম স্ব-পর-দেহের * প্রতি মমতাদি বুদ্ধি উৎপন্ন করা এ রোগের প্রধান উপদ্রব। শীঘ্র ইহার চিকিৎসা না করিলে, এ নিশ্চয়ই সেই সেই নরকদুর্দ্দশায় নিপাতিত করিয়া থাকে[১৫]। সে সকল নরক নিতান্ত ভীষণ। সে সকল নরকে এই সকল দুরবস্থা দৃষ্ট হয়। যথা—প্রস্তরতাড়ন, শিলাভক্ষণ, জ্বলদঙ্গারনিগীরণ, অগ্নির দ্বারা অঙ্গ দাহ, চক্ষুর্নাশ, হিমাবসেক, অঙ্গচূর্ণন ও অঙ্গকর্ত্তন, চন্দনকাষ্ঠ ঘর্ষণের ন্যায় শরীরঘর্ষণ, পর্ব্বতনিপাতন, অসিপত্র বৃক্ষের বনে দ্রুতধাবন, কীট কর্ত্তৃক অঙ্গভক্ষণ, বস্ত্রনিষ্পীড়নবৎ কাষ্ঠযন্ত্রে প্রপীড়ন, কণ্টকময় লৌহ শৃঙ্খলে অঙ্গ বেষ্টন, কণ্টকমার্জ্জনীর দ্বারা অঙ্গপরিমার্জ্জন। সে মার্জ্জনে ত্বক্ ছিঁড়িয়া যায়। লৌহোদ্গারকারী সমরনারাচাদি নিপাত, প্রচণ্ড নিদাঘ কালে ভয়ঙ্কর মরুভূমিতে পর্য্যটন, শিশিরকালে ধারাগৃহে বাস, পুনঃ পুনঃ শিরশ্ছেদ, সুখনিদ্রার অভাব, বদনাবরোধজন্য বাক্যরোধ। † সেই সকল নরকে এবম্বিধ আরও অনেক মহানিষ্ট ও সহস্র সহস্র নিদারুণ কষ্ট অনবরত ভোগ করিতে হয়[১৬]।

রাম! সংসার ঐরূপ ঐরূপ নিদারুণ অসংখ্য দুর্দ্দশার ও কষ্টের উৎপাদক। সেজন্য ইহা হইতে নিষ্কৃতি লাভে আলস্য বা অবহেলা করা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে। আমি যেরূপ যেরূপ বিচার প্রণালী বলিতেছি ও বলিব, সেই সকল প্রণালী অবলম্বনে প্রযত্ন সহকারে পরমাত্ম-পরায়ণ হওয়া ও তত্ত্বানুশীলনে রত থাকা অবশ্য কর্ত্তব্য। অধিকারী নর শাস্ত্রীয় বিচারের দ্বারাই শ্রেয়োলাভ করিয়া থাকেন। যে প্রকার বিচারে শ্রেয়ো লাভ হইতে পারে সে প্রকার বা সে প্রণালী বলিতেছি,

* শরীরটা নরকের নগর।—এ নগরে কেবল মলমূত্রাদি থাকে। শরীর নরকের আগার; তথাপি জীব ইহাকে "আমার" "শুচি" "সুন্দর" ইত্যাদি প্রকার মনে করে। যাহা আমার নহে, শুচি নহে, সুন্দরও নহে, তাহাকে আমার, শুচি ও সুন্দর মনে করা বিকার ব্যতীত অন্য কিছু নহে। পণ্ডিতেরা ঐ সকল বিকারকে ভ্রান্তি বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

† নরক ভোগ এ দেহে হয় না। মৃত্যুর পর যমালয়ে গিয়া সূক্ষ্ম দেহে নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। প্রস্তরতাড়ন অর্থাৎ পাথরে আছড়ান। যেমন রজকেরা কাপড় আছড়ায় তেমনি। শিলাভক্ষণ অর্থাৎ সে নরকে প্রস্তর খাইতে দেয়, অন্য কিছু খাইতে দেয় না। জ্বলদঙ্গারনিগীরণ অর্থাৎ যমদূতেরা অগ্নিতপ্ত কয়লা খাওয়ায়। চক্ষুর্নাশ অর্থাৎ চোখ্ ছেঁদা করিয়া দেয়। হিমাবসেক অর্থাৎ শীতকালে বরফে স্নান করায়। পর্ব্বতনিপাতন অর্থাৎ পর্ব্বতের শিখর হইতে ফেলিয়া দেয়। ছুরি ও খাঁড়া যাহার পাতা, তাদৃশ কৃত্রিম বৃক্ষের বনে দৌড় করায়। যমদূতেরা যুদ্ধকালের ন্যায় অস্ত্রবর্ষণ করে, সে সকল অস্ত্র আবার ক্ষুদ্রাস্ত্র বমন করে। (এখন যেমন কামানের মধ্যে ছুরি প্রভৃতি ক্ষুদ্রাস্ত্র দেয় তেমনি)। এই সকল ক্লেশ মরণের পর পুনর্জন্মের পূর্ব্বে যমালয়ে ভোগ করিতে হয়।

অবহিত হইয়া শ্রবণ কর[১৭]। হে রঘুকুলেন্দো! যদি এমন মনে কর যে, জ্ঞান কবচে আবৃত মুনিগণ, মহর্ষিগণ, দ্বিজগণ ও রাজন্যগণ তবে কি জন্য সেই সেই দুঃখকরী অবস্থা ও নানাপ্রকার সংসারক্লেশ স্বীকার করিয়াছিলেন ও করিতেছেন? তোমার সে ভাব পরিবর্ত্তনার্থ এই মাত্র বলিলে পর্য্যাপ্ত হইবে যে, সেই সকল মহাত্মগণ সতত হৃষ্টচিত্ত অর্থাৎ আনন্দব্রহ্ম রসে পরিপূর্ণ[১৮]। * রাম! যেমন হরি হর প্রভৃতি দেবতারা এই সংসারে কৌতুক ও বিক্ষেপ বর্জ্জিত সুতরাং নির্লিপ্ত আছেন, তেমনি, বিশুদ্ধচিত্ত মানবগণও সংসারে অবস্থিতি করতঃ সংসারধর্ম্মে নির্লিপ্ত ও পূর্ণানন্দরসে নিমগ্ন থাকেন[১৯]। পরম তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইলে তখন সমুদায় মোহ পরিক্ষীণ ও ভ্রান্তিজ্ঞানরূপ নিবিড় মেঘ অন্তর্হিত হয়। তখন তাদৃশ জীবের জগদ্ভ্রমণ সুখেরই কারণ হইয়া থাকে[২০]। রাম! আরও বলি, আত্মা প্রসন্ন হইলেই জীব সন্দেহপরিহীন হয় ও শান্তি লাভে সমর্থ হয়। মনের শান্তি হইলেই উৎকৃষ্ট ব্রহ্মরসাস্বাদনে সমর্থ হওয়া যায়। সেই সময়ে এই জগতের প্রতি আত্মসমান ভাব বা সমদৃষ্টি নিপতিত হয়। সেই সমদৃষ্টি তত্ত্বজ্ঞানী দিগের জগদ্ভ্রমণ যে পরম সুখদায়ক, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই[২১]। আর এক কথা বলি, তাহাও শ্রবণ কর। এই অচেতন দেহ ছিন্ন কাষ্ঠ রচিত রথের অনুরূপ। দেহই রথ, ইন্দ্রিয়গণ তাহার অশ্ব অর্থাৎ বাহক। ইন্দ্রিয়ের যে বেগ, তাহাই সেই ইন্দ্রিয় অশ্বের গতি। এই রথ প্রাণবায়ু কর্তৃক পরিচালিত হইতেছে। মন ইহার রশ্মি (লাগাম), আত্মা সারথি, পরমাত্মা ইহার পরম রথী। এই রথ আরোহণের ফল আনন্দ। এই রথ যদি আনন্দধামের অভি-মুখে বাহিত হয়, তবেই পরমানন্দ লাভ, নচেৎ দুর্গতি। এই দেহরথের আরোহী দেহী (জীব) দেহপরিচ্ছেদে ক্ষুদ্র হইলেও সমাধিকালে মহান্। তত্ত্বদর্শনের পর তাদৃশী বুদ্ধি অবলম্বনে এই রথে জগৎ ভ্রমণ করা সুখের বৈ অসুখের নহে[২২]।

দ্বাদশ সর্গ সমাপ্ত।

---

* শাস্ত্রীয় বিচার দ্বারা তত্ত্বসমুদ্বোধ হইলে অবশ্যই শ্রেয়োলাভ হয়, তাহার অন্যথা হয় না। মাণ্ডব্যাদি ঋষি, ও জনকাদি রাজা ও নারদাদি মুনি, লোকদৃষ্টিতে সংসারী; বস্তুতঃ তাঁহাদের সংসার ক্লেশ নাই বা ছিল না। তাঁহারা অনহংবুদ্ধি ও অসঙ্গভাবে অবস্থিত থাকিয়া প্রারব্ধ পরিক্ষয়ার্থ যথাপ্রাপ্ত আহারবিহারাদি করিতেন। অর্থাৎ সেই সেই ব্যবহার কার্য্যে তাঁহাদের লিপ্ততা ছিল না। সেই জন্যই তাঁহারা সুখী ও পুনঃসংসারের অযোগ্য।

ত্রয়োদশ সর্গ।

বশিষ্ঠদেব কহিলেন, হে রামচন্দ্র! 'যেমন ক্ষত্রিয়েরা রাজ্যাধিকার লাভ করিয়া এবং অন্য লোকে ধনসমৃদ্ধিশালিতা প্রাপ্ত হইয়া তৃপ্তির সহিত কালযাপন করে, তেমনি, বুদ্ধিমান্ মহান্ ব্যক্তিরা বর্ণিতপ্রকারের তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া এই সংসারে পরম সুখে ও নির্ব্বিঘ্নে বিচরণ করিয়া থাকেন[১]। এই সকল জীবন্মুক্ত ব্যক্তি শোক করেন না, কোন কিছু কামনা করেন না, কোন প্রার্থনা করেন না, শুভ অশুভ—ভাল মন্দ—কিছুই করেন না অথচ সমস্তই করেন ও কিছুই করেন না[২]*। তাঁহারা বিশুদ্ধ ভাবে অবস্থিতি করতঃ বিশুদ্ধ কর্ম্ম সমুদায়ের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। তাঁহারা পরমাত্মায় অবস্থিত; সেজন্য তাঁহারা ইহা হেয়, তাহা উপাদেয়, এতৎপ্রকার বুদ্ধি বিবর্জ্জিত। যাহা কিছু করেন সে সকল নির্ম্মল অর্থাৎ নির্লেপ ও শাস্ত্রীয়। † নির্লেপ ও শাস্ত্রীয় কর্ম্ম করায় তাঁহারা শুদ্ধাত্মা থাকেন ও লৌকিক সৎপথে গমনাগমন করেন[৩]। এই সকল মহাপুরুষেরা আগমন করেন সত্য; পরন্তু অন্যের মত আগমন করেন না। গমন করেন বটে; কিন্তু অন্যের মত গমন করেন না। কর্ম্মও করেন পরন্তু পূর্ব্বোক্ত প্রকারে করায় তাহা না করা বলিয়া গণ্য। তাঁহাদের করা ও বলা না করা ও না বলার সম্মান[৪]। পরমপ্রাপ্য ব্রহ্মপদ অধিগত (প্রাপ্ত) হইলে তখন সর্ব্বপ্রকার সমারম্ভ ও সর্ব্বপ্রকার দর্শন হেয় ও উপাদেয় এই ভাবদ্বয়বিবর্জ্জিত হয় সুতরাং সে সকল কর্ম্মও তাঁহাদের সম্বন্ধে জ্ঞান ফল প্রসব না করিয়াই ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া যায়[৫]। মন তখন বিকারবর্জ্জিত হয় ও আনন্দপ্রবাহে ভাসিতে থাকে। সুতরাং চন্দ্রবিম্বে অবস্থিত স্বর্গপ্রাপ্ত জীবের ন্যায় উৎকৃষ্ট সুখ অনুভব করিতে থাকে[৬]।

---

* "সমস্তই করেন ও কিছুই করেন না" এ কথার অর্থ এই যে, প্রারব্ধ অপরিহার্য্য জানিয় যথাপ্রাপ্ত কার্য্য করেন সুতরাং লোকদৃষ্টিতে সমস্তই করেন। কোনও কার্য্য ইচ্ছা বা কামনা পূর্ব্বক করেন না। তাহা না করায় পরমার্থ দৃষ্টিতে কিছুই করেন না।

† নির্লেপ—ফলপ্রদান সামর্থশূন্য। অভিসন্ধি থাকিলে, কর্ম্ম সকল যথাকালে ফল প্রসব করে, অভিসন্ধিরহিত হইয়া কর্ম্ম করিলে সে কর্ম্ম ফল দিতে পারে না। নিঃশক্তি হইয়া ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।

যেমন পূর্ণশশিস্থিত সুধা রসের পরিমাণ করা যায় না; সেইরূপ, পরিত্যক্ত বিষয়াভিলাষ ও পরিত্যক্ত কৌতুক আত্মসুখপ্রবিষ্ট চিত্তেরও সুখের পরিমাণ (ইয়ত্তা) করা যায় না। অর্থাৎ সে সুখ অসীম[৭]। যে একবার মাত্র আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হয়, সে আর ঐ ইন্দ্রজাল দেখে না, বাসনার অনুগামীও হয় না। সে বালচাপল্য পরিত্যাগ করিয়া প্রসিদ্ধ পরমাত্মসুখে বিরাজ করে[৮]। হে রামচন্দ্র! এবম্বিধা বৃত্তি (জীবন্মুক্তি-রূপিণী অবস্থা) আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার দ্বারাই লাভ করা যায়; অন্য কোন উপায়ে নহে। যেহেতু আত্মদর্শনের অব্যবহিত পরেই কথিত-প্রকার জীবন্মুক্ততা জন্মে, সেই হেতু, অধিকারী পুরুষ মরণ পর্য্যন্ত অথবা তত্ত্ব দর্শন না হওয়া পর্য্যন্ত মনন ও নিদিধ্যাসন অবলম্বন করিয়া আত্মতত্ত্বানুসন্ধানে যত্নবান্ থাকিবেন। অন্য কিছু করিবেন না[৯।১০]। যাঁহারা অনুভবশালী, শাস্ত্রানুশীলনে তৎপর ও গুরূপদেশ গ্রহণে পরায়ণ, তাঁহারাই আত্মাবলোকনে সমর্থ[১১]। যে ব্যক্তি শাস্ত্র শ্রবণ করে, শাস্ত্রার্থ বিচার করে, সাধু সেবায় রত থাকে, সে ব্যক্তি গুরু-শাস্ত্রাদি অমান্য-কারী মূর্খের ন্যায় কষ্টদায়িনী দুরবস্থায় পতিত হয় না[১২]। মনুষ্যের মূর্খত্ব যাদৃশ খেদের কারণ হয়; আধি, ব্যাধি, বিষয় ও আপদ সেরূপ খেদের কারণ নহে[১৩]। যে অল্পমাত্র ব্যুৎপন্ন, অর্থাৎ যাহার বুদ্ধি অল্পমাত্রও সংস্কৃত হইয়াছে, যাহার অল্পমাত্র বোধসামর্থ্য আছে, মদুক্ত এই অধ্যাত্মশাস্ত্র তাহার মূর্খতা বিনাশ করিতে সমর্থ। অল্পজ্ঞ দিগের পক্ষে এরূপ মূর্খতা নাশক শাস্ত্র আর নাই[১৪]। শাস্ত্রীয় মহাবাক্যের পরম প্রতিপাদ্য পরমাত্মা যাহার বন্ধু অর্থাৎ নিতান্ত প্রিয়, সেই পুরুষই এই অধ্যাত্ম-শাস্ত্র শ্রবণ করুক। ইহা সুশ্রাব্য, সুখবোধ্য, দৃষ্টান্তভূষিত ও সমুদায় অধ্যাত্মশাস্ত্রের অবিরোধী হৃদয় (সারস্বরূপ)[১৫]। যেমন খদির বৃক্ষের গাত্রে কণ্টকের জন্ম হয়, তেমনি, দুর্নিবার্য্য আপদ ও অত্যন্ত অধম কুযোনিজন্ম কেবল মূর্খতা হইতেই হইয়া থাকে[১৬]। রাম! বরং শরাব হস্তে চণ্ডালদ্বারে ভিক্ষা করা শ্রেয়স্কর, তথাপি, মৌর্খ্যাপহত জীবন শ্রেয়-স্কর নহে। ভীষণ অন্ধকূপে ও মহীরুহকোটরে ভেক কীটাদি হইয়া কাল-ক্ষেপ করাও সুখের; তথাপি মৌর্খ্যাপহত জীবন সুখের নহে। মূর্খতা যার পর নাই দুঃখপ্রদ[১৭।১৮]। মনুষ্য এই মোক্ষোপায়ময় আলোক (জ্ঞান) প্রাপ্ত হইলে পুনর্ব্বার আর মোহান্ধকারে নিপতিত হয় না[১৯]। যাবৎ

না বিবেক সূর্য্যের নির্ম্মল প্রভা সমুদিত হয়, তাবৎ এই সকল মানব-রূপ অম্বুজ (পদ্ম) তৃষ্ণা কর্তৃক সঙ্কুচিত হইয়া থাকে[২০]। রাম! আমি সেইজন্যই বলিতেছি, তুমি সংসারের ক্লেশ বিনাশার্থ গুরু ও শাস্ত্র প্রমাণ অবলম্বনে আপনার অনারোপিতরূপ (আত্মতত্ত্ব) অবগত হও, হইয়া সুখে বিচরণ কর[২১]। হে রাঘব! মুনিগণ, ব্রহ্মর্ষিগণ, অন্যান্য জীবন্মুক্ত মহাত্মগণ ও হরি-হর-ব্রহ্মাদি দেবতারা যেরূপে ইহ সংসারে বিচরণ করেন, তুমিও সেইরূপে বিচরণ কর[২২]। এই সংসারে দুঃখই অনন্ত, সুখ তৃণ-কণার ন্যায় অল্প। তাহা অতিসামান্য ও অকিঞ্চিৎকর এবং তাহাই আবার অশেষ দুঃখের কারণ হইয়া থাকে। সেই কারণে অকিঞ্চিৎকর তুচ্ছ দুঃখানুবিদ্ধ ক্ষণিক সাংসারিক সুখের প্রতি আস্থা স্থাপন করা কর্ত্তব্য নহে[২৩]। যে পদ অনন্ত বা অসীম, যে পদ আয়াস (ক্লেশ) পরিমুক্ত, যাহা পরম সার অর্থাৎ পরমপুরুষার্থ, সেই পদ সিদ্ধির নিমিত্ত বিচক্ষণ পুরুষ যত্নপূর্ব্বক সাধনে রত হইবেন[২৪]। রাম! ইহা নিশ্চিত জানিবে যে, যাঁহাদের মন গতজ্বর (বিক্ষেপশূন্য বা চাঞ্চল্যবর্জ্জিত) হইয়াছে, এ সংসারে তাঁহারাই মোক্ষ লাভের পাত্র। তাঁহারাই পরমপদ অবলম্বন করিয়াছেন এবং তাঁহারাই উত্তম পুরুষ[২৫]। আর যাঁহারা কেবল রাজ্যাদি পার্থিব সুখে নিবিষ্টচিত্ত এবং বিষয়সম্ভোগেই পরিতুষ্ট; সেই সকল দুষ্টাশয় মানব দিগকে তুমি অন্ধভেকতুল্য (অন্ধভেক=কূপমণ্ডুক অথবা কাণা বেঙ্) জানিবে[২৬]। যাঁহারা বঞ্চনা বিষয়ে, প্রবল দুষ্কর্ম্মে, দুরনুষ্ঠানে, মিত্ররূপী শত্রুতে (অর্থাৎ স্ত্রী পুত্র প্রভৃতিতে) ও সর্পরূপী ভোগে (বিষয় ভোগ সর্প তুল্য, ইহার দংশনে নরক জ্বালায় জ্বলিতে হয়) সমাসক্ত, সেই সকল মন্থরবুদ্ধি মূঢ় লোকেরা এক দুর্গম হইতে অন্য দুর্গমে (দুর্গতিতে), এক দুঃখ হইতে অন্য দুঃখে, এক ভয় হইতে অন্য ভয়ে ও এক নরক হইতে অন্য নরকে নিপতিত হয়[২৭।২৮]। রাম! সুখের ও দুঃখের দশা বিদ্যুৎ অপে-ক্ষাও অল্পকালস্থায়ী। পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, সুখ দুঃখের রীতি এই যে, সুখ দুঃখকে বিনাশ করে এবং দুঃখও সুখকে বিনাশ করে। "সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ।" সেই কারণেই সুখান্বেষী লোক কোনও কালে শ্রেয়ঃ অর্থাৎ বিশ্রান্তি লাভ করিতে পারে না। অসীম অনন্ত কাল ব্যাপিয়া তাহারা সুখদুঃখের স্রোতে ভাসমান থাকে, থাকিয়া শ্রান্ত

ও ক্লান্ত হইতে থাকে২৯। যাহারা বৈরাগ্যসম্পন্ন, তাদৃশ সুখ দুঃখের প্রতি বিরক্ত ও বিবেকপরায়ণ, সেই সকল ভবৎসদৃশ মহাত্মারাই প্রকৃত প্রকৃত সুখের ও মোক্ষের ভাজন হইয়া থাকেন৩০। বিবেক অবলম্বন পূর্ব্বক বৈরাগ্যের অভ্যাস অর্থাৎ পরম বৈরাগ্য আয়ত্ত করিতে পারিলেই এই আপদস্বরূপ সংসারসমুদ্র অনায়াসে উত্তীর্ণ হওয়া যায়৩১। যাঁহারা বিবেকী, যাঁহারা একবার সংসারের রহস্য জানিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা কদাচ এই বিষের ন্যায় মোহকারিণী সংসার মায়ায় অবস্থান করেন না৩২। যাহারা এই সংসার প্রাপ্ত হইয়া ইহাতে অবহেলা পূর্ব্বক অবস্থিতি করে অর্থাৎ ইহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার চেষ্টা করে না, নিশ্চয়ই তাহারা প্রজ্জলিত গৃহমধ্যস্থ রাশীকৃত তৃণশয্যায় শয়ন করিয়া থাকে৩৩। হে রামচন্দ্র! যাহা প্রাপ্ত হইলে আর প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয় না, যাহা পাইলে সমুদায় শোক মোহ দূরীভূত হয়, তাদৃশ পরম পদ অবশ্যই আছে এবং তাহা বিশুদ্ধ বিজ্ঞান লভ্য। এ বিষয়ে তোমার যেন সংশয় না হয়। এ বিষয়ে যাঁহাদের সংশয় আছে, আমি তাঁহাদিগকেও বলি, যদি তাহা নাও থাকে, তথাপি, তাহার বিচার করিতে দোষ কি। তাহাতে তোমাদের কি ক্ষতি হইবে। ভাবিয়া দেখ, যদি থাকে তবে তদ্দ্বারা অনায়াসে ভবসমুদ্র পার হইতে পারিবে৩৪।৩৫। এই সংসারস্থ পুরুষগণের মধ্যে যখন যে পুরুষের মোক্ষসাধক বিচারে প্রবৃত্তি জন্মে তখন সেই পুরুষকে মোক্ষভাগী বলিয়া গণ্য করা যায়৩৬। রামচন্দ্র! তুমি ভুবনত্রয় অনুসন্ধান কর, দেখিতে পাইবে, অপায় (নাশ) বর্জ্জিত, আশঙ্কা রহিত, ও যার পর নাই স্বাস্থ্যবিশিষ্ট নিরাপদ পদ কেবলীভাব ব্যতীত অন্য কিছুই নহে৩৭। * সে পদ পাইলে, তখন মোক্ষ উপার্জ্জনের জন্য অল্পমাত্রও ক্লেশ করিতে হইবে না। ধন, মিত্র, বান্ধব, এ সকল সে পদ লাভের সহায়তা করে না, করিতে পারেও না। হস্তপদসঞ্চালন, দেশান্তরগমন, শারীরিক ক্লেশ, এ সকলের দ্বারাও সে বিষয়ের কোন উপকার হয় না। তাহা পাইবার জন্য বল ও উৎসাহ প্রভৃতি অবলম্বন করিতে হয় না। তীর্থ, আয়তন, ও পুণ্যস্থান আশ্রয় করিতেও হয়

---

* স্বর্গাদি পদের অপায় অর্থাৎ ক্ষয় আছে, তাহা হইতে পতনাশঙ্কা আছে, সুতরাং তাহাতেও শান্তি নাই। কেবলীভাব অর্থাৎ অদ্বয়ব্রহ্মভাবে লয় হওয়া ব্যতীত অন্য কিছু অপায়াদি বর্জ্জিত নহে।

না। অধিক কি বলিব, কিছুই করিতে হয় না, কেবলমাত্র মনোজয় দ্বারাই সেই পরম পদ লাভ করিতে পারা যায়[৮।৯]। তাহা বিবেক-সাধ্য, * বিচার ও একাগ্রতার দ্বারা নিশ্চেয় ও বিষয়পরিত্যাগীর প্রাপ্য[১১]। বিষয়বাসনাপরাঙ্মুখ বিচারপরায়ণ ও সুখসেব্য আসনস্থ পুরুষ সে পদ প্রাপ্ত হইয়া শোক হইতে উত্তীর্ণ হন ও জন্ম মৃত্যুর বশ্যতা ত্যাগ করেন[১২]। সাধুগণ ঐ অনুত্তম নিশ্চল পরম পদকে, সুখের উচ্চ সীমা ও পরম রসায়ন বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন[১৩]। যেহেতু সমস্ত দৃশ্য নশ্বর, সেইহেতু মনুষ্যলোকের ও স্বর্গলোকের ভঙ্গপ্রবণ (নশ্বর) সুখ সুখ নহে। যেমন মৃগতৃষ্ণিকায় সলিল, তেমনি, দিব্য (স্বর্গীয়) ও মানুষ (মনুষ্য-লোকের) বিষয়ে সুখ। অর্থাৎ তাহা ভ্রান্তি ব্যতীত অন্য কিছু নহে[১৪]। হে রামচন্দ্র! আমি সেই জন্যই বলিতেছি, তুমি অগ্রে মনকে জয় করিবার চেষ্টা কর। মনোজয় হইলে অর্থাৎ মন বশ্য হইলে সমতায় ও সন্তোষে অবস্থান করিতে পারিবে। তখন সেই অদ্বয়ব্রহ্মসংযোগে একরস হইবে ও তদানন্দে আনন্দিত হইবে[১৫]। চেষ্টা করিলে কি জঙ্গম, কি পর্য্যটক, (ভ্রমণকারী) কি পতনশীল, (খেচর) কি রাক্ষস, কি দানব, কি দেব, কি মানুষ, সকলেই সেই শান্তিসন্তোষসমুদ্ভূত বিবেকরূপ উচ্চ মহীরুহের শান্তিরূপ বিকশিত কুসুমের পরমানন্দ রূপ সুখফল লাভ করিতে পারে[১৬।১৭]। যেমন সূর্য্যদেব আকাশে থাকিয়াও আকাশের আকাঙ্ক্ষা করেন না, নির্লিপ্ত থাকেন, তেমনি, পরমপদপ্রাপ্ত ব্যক্তিরাও ব্যবহারে বর্ত্তমান থাকেন, অথচ তাঁহারা তাহার ফল আকাঙ্ক্ষা করেন না। অর্থাৎ তাঁহাদের ব্যবহার হেয়-উপাদেয়-জ্ঞান-পূর্ব্বক অথবা ফলাভিসন্ধান-পূর্ব্বক নির্ব্বাহিত হয় না[১৮]। তাঁহাদের মন প্রশান্ত ও নির্ম্মল হয়, বিশ্রান্তিতে অবস্থান করে, অর্থাৎ চেষ্টাশূন্য হয়, ভ্রমবিহীন ও কামনাশূন্য হয়। অপিচ, একরসাসক্ত হওয়ায় (ব্রহ্মপ্রবিষ্ট হওয়ায়) লৌকিক বিষয়ের গ্রহণ ও পরিবর্জ্জন উভয়বিবর্জ্জিত হয় অর্থাৎ উদাসীন হয়[১৯]।

রাম! মোক্ষদ্বারে যে চারিটী দ্বারপাল † আছে, যথাক্রমে তাহাদের

---

* বিবেক—আত্মাকে দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, ও অহঙ্কার হইতে পৃথক করিয়া জানা। বিচার—শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন। একাগ্র—নিরন্তর প্রণিধান অর্থাৎ চিন্তাপ্রবাহ। বিচার দ্বারা স্থির করিয়া শ্রবণ মননাদির দ্বারা সংশয়াদি দূরীকৃত করিয়া প্রণিধান প্রবাহ উপস্থিত করিয়া সে পদ প্রত্যক্ষ করিতে হয়।

† শম, বিচার, অর্থাৎ নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, সন্তোষ ও তত্ত্বপ্রণিধান বা সৎসঙ্গ।

বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর! তাহাদের একটীকে বশীভূত করিতে পারিলেই মোক্ষদ্বারে প্রবেশ করা যায়[১০]। প্রথমে শম নামক দ্বার-পালের বিষয় বলি, শ্রবণ কর। এই সংসার এক প্রকার মরুভূমি। জীব ইহাতে সুখের আশায় পরিভ্রমণ করিতেছে। (সুখ নাই অথচ সুখের আশা করিতেছে)। তাহাদের যে সুখতৃষ্ণাজনিত তাপ; তাহাই তাহা-দের দোষের অবস্থা। কফাদি ধাতু দূষিত হইয়া দোষজ্বর উৎপাদন করিলে প্রত্যেক জীবই জল পিপাসায় ও তাপে কাতর ও অভিভূত হয়, এবং শীতল হইবার জন্য যেখানে সেখানে জল অন্বেষণ করে। সেইরূপ, অবিদ্যা দোষে অহংমমাভিমান রূপ দোষজ্বর উপস্থিত হও-য়ায় জীব সকল সুখতৃষ্ণায় ও তজ্জনিত তাপে অভিভূত হইয়া সুখ-তৃষ্ণা ও তাপ নিবারণার্থ সংসাররূপ মরুভূমে সুখের অন্বেষণ করিতেছে, অথচ তাহা পাইতেছে না। সুতরাং তাহাদের তাপশান্তিও হইতেছে না। এই দুরতিক্রমণীয় দীর্ঘ তাপ শম সেবায় অপগত হইয়া থাকে। অর্থাৎ শম-নামক দ্বারপালের সেবা করিলে জীব সুখ পায়, তখন তাহার দাহ নিবারিত হইয়া শরীর মন শীতল হয়[১১]। জীব শম সেবার দ্বারাই শ্রেয়োলাভ করে সুতরাং শমই পরম পদ, শমই পরম মঙ্গল ও শমই পরমা-শান্তি। শমের দ্বারাই জীবের ভ্রান্তি বিদূরিত হয়[১২]। যে পুরুষ শমলাভে তৃপ্ত, যাহার আত্মা (বুদ্ধি) শমের দ্বারা শীতল ও নির্ম্মল, সেই শম-বিভূ-ষিতচিত্তের শত্রুও মিত্র হইয়া থাকে[১৩]। শমরূপ চন্দ্রচন্দ্রিকার (জ্যোৎস্নার) দ্বারা যাহার আশয় (অভিপ্রায়) সমলঙ্কৃত হইয়াছে, তাহার বিশুদ্ধতা ক্ষীরোদ সমুদ্রের ন্যায় যার পর নাই উৎকৃষ্ট[১৪]। যাহাদের হৃদয়রূপ পদ্মাকরে শমরূপ পদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়াছে তাহাদিগকে দ্বিহৃৎপদ্ম কহে। এই দ্বিহৃদ্‌পদ্ম পুরুষেরা হরির তুল্য[১৫]। যাহাদিগের অকলঙ্ক মুখচন্দ্রে শমশ্রী শোভা পায়, তাহাদিগের সে শোভায় অন্যের সমুদায় ইন্দ্রিয় বশীভূত হইয়া থাকে। কুলীনেন্দ্রগণের (কুলীনেন্দ্র=সাধুশ্রেষ্ঠ) অর্থাৎ সৎ পুরুষ দিগের শমরূপ ঐশ্বর্য্য যেরূপ আনন্দদায়ক, এই ত্রৈলোক্যোদরবর্ত্তী সাম্রাজ্যসম্পত্তি তাদৃশ আনন্দদায়ক নহে[১৬।১৭]। যেমন সূর্য্যোদয়ে অন্ধকাররাশি বিনষ্ট হয়, তেমনি, শান্তিগুণ দ্বারা সমুদয় দুঃখ, সমুদায় দুঃসহ তৃষ্ণা ও সমস্ত মানসিক ব্যথা দূরীভূত হইয়া থাকে[১৮]। মনই ভূতগণকে প্রসন্নতা প্রদান করিয়া থাকে। মন শান্তশীতল মনুষ্য দর্শনে যেরূপ প্রসন্ন হয়, পূর্ণচন্দ্র দর্শনেও

সেরূপ প্রসন্ন হয় না৫৯। যিনি সর্ব্বভূতে সৌহার্দ্দবান্, সেই শমশালী সাধু-পুরুষে পরম তত্ত্ব আপনা আপনি প্রস্ফুরিত হইতে থাকে৬০। কি কোমলচিত্ত, কি ক্রূরকুটিলাশয়, সকলেই মাতাকে (স্নেহময়ী জননীকে) বিশ্বাস করে। সেইরূপ, যে শান্ত ও সর্ব্বত্র সমদর্শী, তাহাকেও দুষ্টাদুষ্ট সমুদায় লোকই বিশ্বাস করে৬১। শমগুণের উদয়ে অন্তরে যেরূপ আনন্দোদয় হয়; অমৃতপানে ও ঐশ্বর্য্যের আলিঙ্গনে সেরূপ আনন্দোদয় হয় না৬২। হে রাঘব! তুমি আধি ব্যাধি দ্বারা বিচলিত (অনুতপ্ত) ও তৃষ্ণারজ্জুর দ্বারা ইতস্তত আকৃষ্ট অন্তঃকরণকে শমামৃতে অভিষিক্ত করিয়া সমাশ্বাসিত কর৬৩। বৎস! তুমি শমশীতল বুদ্ধি অবলম্বনে যাহা করিবে তাহাই তোমার ভাল লাগিবে অর্থাৎ পরম রুচিকর হইবে। কিন্তু যতদিন তোমার মন প্রশান্ত না হইবে তত দিন তোমার কিছুই উত্তম বলিয়া বোধ হইবে না৬৪। মন শম-নামধেয় অমৃতরসে আপ্লুত হইলে যেরূপ নির্ব্বিঘ্ন হয়, যে অনির্ব্বাচ্য সুখ প্রাপ্ত হয়, সে সুখ ও সে নির্ব্বেদ অন্য কিছুতে হয় না। আমি বিবেচনা করি, অঙ্গ কাটিয়া ফেলিলেও পুনর্ব্বার তাহা সেই সুখের (শম-সুখের) প্রভাবে যোড়া লাগিতে পারে৬৫। অধিক কি বলিব—পিশাচ, রাক্ষস, দৈত্য, সিংহ, ব্যাঘ্র, ভুজঙ্গম, কেহই শমশালী ব্যক্তিকে দ্বেষ করে না৬৬। যেমন ধনুর্ম্মুক্ত বাণ বজ্রশিলাভেদ করিতে পারে না, তেমনি, সর্ব্বপ্রকার দুঃখও (ত্রিতাপ) শমামৃত বর্ম্ম-ধারীর অঙ্গ (মন) বিদ্ধ করিতে পারে না৬৭। অকিঞ্চন নর, সাধনের দ্বারা শীতলতা প্রাপ্ত সরল স্বচ্ছ বুদ্ধির দ্বারা যেরূপ শোভান্বিত হয়, একজন রাজা রাজপুরবাসে সেরূপ শোভা প্রাপ্ত হন না৬৮। প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়বস্তু দর্শনে যে পরিতোষ না হয় তদপেক্ষা অধিক পরিতোষ শান্তাশয় লোক দর্শনে হইয়া থাকে৬৯। যে ব্যক্তি ইহলোকে জগদানন্দদায়িনী শমময়ী বৃত্তি অবলম্বনে জীবিত থাকে, সেই ব্যক্তির জীবনই জীবন, অন্যের জীবন-জীবন (বেঁচে থাকা) বলিয়া গণ্য নহে৭০। যে যথার্থ সাধু ও সৎপুরুষ, যে অনুদ্ধতমনা ও শান্ত, সে, শান্তি অবলম্বনে যে কিছু কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তৎক্ষণাৎ নিখিল জীব তাহার সেই কার্য্যের অভিনন্দনঅনুমোদনকারী হয়৭১। (এক্ষণে শান্তশীল সৎপুরুষের লক্ষণ শ্রবণ কর)।

যে পুরুষ শুভাশুভ দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, আঘ্রাণ বা ভক্ষণ করিয়া হর্ষের বা গ্লানির বশীভূত হন না, তুমি তাহাকেই শান্ত বলিয়া অবধারণ

করিবে৭২। যিনি সর্ব্বভূতে সমদর্শী, ইন্দ্রিয়জয়ী ও ভবিষ্যৎ সুখের আশয়ে প্রতারিত হন না অথচ প্রারব্ধানীত সুখ পরিত্যাগ করেন না, তাঁহাকেও তুমি শান্ত বলিয়া জানিবে৭৩। যাঁহাকে দেখিবে, পরকৌটিল্যাদি জানিয়াও অন্তরে ও বাহিরে নির্ম্মল বুদ্ধির কার্য্য করিতেছেন, শম-মহিমজ্ঞ-গণ তাঁহাকেও শান্ত বলিয়া থাকেন (অর্থাৎ সারল্যও শান্তের অন্যতম লক্ষণ)৭৪। যাহার মন মরণে, উৎসবে ও যুদ্ধাদিতে সমান থাকে, তুষারকরবিম্বের ন্যায় নির্ম্মল ও নিরাকুল থাকে, তাঁহাকেও শান্ত বলিয়া অবধারণ করিবে৭৫। যে মহাত্মা হর্ষশোকাদিজনক স্থানে অবস্থিত থাকিয়াও থাকেন না, অর্থাৎ তত্রস্থ গুণদোষে লিপ্ত হন না, হর্ষ বা কোপ করেন না, নিরন্তর সুষুপ্তের ন্যায় স্বচ্ছন্দে কালযাপন করেন, তিনিও অস্মদাদির মতে শান্ত৭৬। যাঁহার দৃষ্টি সকলের প্রতি প্রীতিময়ী ও অমৃতপ্রবাহের ন্যায় সুখদায়িনী, শান্তিতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা তাঁহাকেও শান্ত বলিয়া থাকেন৭৭। যাঁহার অন্তর শীতল অর্থাৎ ত্রিতাপ পরিশূন্য বা বিকার শূন্য হইয়াছে, যিনি বিষয় ব্যবহারে নিমগ্ন নহেন, অথচ লোক ব্যবহারে অসমূঢ়, তুমি তাঁহাকেও শান্ত বলিয়া জানিবে৭৮। চিরকালস্থায়ী দুরুচ্ছেদ্য দুরন্ত আপদ উপস্থিত হইলেও যাঁহার মন তুচ্ছ দেহাদিতে অহং মম অভিমান উৎপাদন করে না, তাহাকেও আমরা শান্ত বলিবা থাকি৭৯। যাঁহার মতি লোকব্যবহারে ব্যাপৃতা থাকিয়াও আকাশের * ন্যায় কলঙ্কপরিশূন্যা, তিনি অস্মদাদির মতে পরম শান্ত৮০। যিনি শমবান্ অর্থাৎ শান্ত, তিনি কি তপস্বী, কি বহুদর্শী, কি যাজক, কি রাজা, কি বলবান্, কি গুণশালী, কি নির্গুণ, সকলেরই মধ্যে বা সকলেরই নিকট শোভা প্রাপ্ত হন৮১। যেমন শশাঙ্কের উদয়ে জ্যোৎস্নার প্রকাশ, তেমনি, শান্তিপরায়ণ গুণশালী মহৎ ব্যক্তিদিগেরও নিবৃত্তি (বিশ্রান্তি সুখ) উদিত হইয়া থাকে৮২। যতই গুণ থাকুক, সে সকলের উচ্চ সীমা শান্তি; সেজন্য শান্তিই পুরুষের মুখ্য ভূষণ। কি সঙ্কট, কি ভয় স্থান, সর্ব্বত্রই শ্রীমান্ শম বিরাজ করিয়া থাকেন৮৩। রঘুনাথ! যেমন মহানুভব যোগী শমরূপ অমূল্য বস্তু প্রাপ্ত হইয়া তদ্দ্বারা পরম পদ লাভ করিয়া থাকেন সেইরূপ তুমিও মোক্ষসিদ্ধির নিমিত্ত শমগুণান্বিত হও৮৪।

ত্রয়োদশ সর্গ সমাপ্ত।

---

* আকাশ—ব্রহ্ম অথবা প্রসিদ্ধ ভূতাকাশ। ব্রহ্মের ন্যায় একরস অথবা ভূতাকাশের ন্যায় নির্লিপ্ত বা নির্ব্বিকার।

চতুর্দ্দশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, বিধান আছে—কারণতত্ত্বজ্ঞগণ্ শাস্ত্রার্থ বোধ দ্বারা পরিমার্জ্জিত ও নিতান্ত পবিত্র বুদ্ধিতে নিরন্তর আত্মবিচার করিবেন[১]। বিচার (মোক্ষদ্বারের দ্বিতীয় দ্বারপাল) করিতে করিতে বুদ্ধি তীক্ষ্ণা হয়, অর্থাৎ সূক্ষ্মতত্ত্ব অবগাহনে ক্ষমবতী হয়, অনন্তর তদ্দ্বারা পরমপদ লাভ হয়। বিচারই সংসার রূপ মহারোগের অদ্বিতীয় ঔষধ[২]। কামনাদির দ্বারা পল্লবিত আপদরূপ বনের সীমা নাই, পরন্ত একবার বিচাররূপ খড়্গ দ্বারা এই বনের মূলোচ্ছেদ করিতে পারিলে আর তাহা হইতে পুনঃপ্ররোহ (প্ররোহ=অঙ্কুর) হয় না[৩]। হে মহাপ্রাজ্ঞ রাম! স্বজনবিয়োগ ও অন্যান্য সঙ্কটপরম্পরা সমস্তই মোহ পরিব্যাপ্ত। সুতরাং সেই সকল স্থানে সাধু দিগের পক্ষে বিচার ব্যতীত অন্য গতি নাই[৪]। * পণ্ডিতগণ বিচার ব্যতীত অন্য কোন উপায় (অশুভ নিবারণের) অবলম্বন করেন না। তাঁহারা বিচারবলে সমস্ত অশুভ পরিহার পূর্ব্বক শুভ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন[৫]। বল, বুদ্ধি, তেজ, প্রতিপত্তি ও ক্রিয়াফল, এই সমস্তই বুদ্ধিমান্ দিগের বিচারের ফল[৬]। এক মাত্র বিচারই হেয়োপাদেয় কার্য্য সমুদয়ের দীপ ও অভীষ্টফলসাধক। সাধুগণ তাদৃশ বিচার অবলম্বন করিয়া সংসার-জলধি উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন[৭]। বিশুদ্ধবিচারনামক উদ্দাম কেশরী হৃদয়াম্ভোজদলনকারী মোহনামক মাতঙ্গ দিগকে বিদীর্ণ করিয়া থাকে[৮]। অত্যন্ত মূঢ়েরাও যে কালে পরম পদ প্রাপ্ত হয়, অত্যুত্তম বিচারই তাহার কারণ[৯]। বিশাল সাম্রাজ্য, অতুল ঐশ্বর্য্য এবং সনাতন মোক্ষ, সমস্তই বিচার নামক কল্পবৃক্ষের ফল[১০]। তুম্ব (শুষ্ক অলাবু) যেমন সলিল মধ্যে নিমগ্ন হয় না, সেইরূপ, মহাত্মা দিগের বিচারোদয়কারিণী বিবেকবিকাশিনী বুদ্ধিও বিপদে অবসন্না হয় না[১১]। যাঁহারা ইহ সংসারে বিচারোদয় কারক

---

* বন্ধুবিনাশাদি দুঃখ ও অন্যান্য বিপদ উপস্থিত হইলে কোন্ উপায়ে সে সকল হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারা যায় এবং কিরূপে স্থৈর্য্য লাভ করা যায়, তাহা মোহ থাকিলে স্থির করা যায় না। বিচারে মোহ পলায়ন করে। তখন বুঝিতে পারা যায়, অমুক উপায়ে দুঃখ দূর ও চিত্ত স্থির হইতে পারে।

ব্যবহারের অনুবর্ত্তী হন, তাঁহারাই যার পর নাই উদার ফলের যোগ্যপাত্র হন[১২]। দুঃখপদ্ধতি (দুঃখপরম্পরা) কি! দুঃখপদ্ধতি কেবল মূর্খ দিগের হৃদয়কাননস্থ মোক্ষসারবিরোধিনী করঞ্জ বৃক্ষের মঞ্জরী[১৩]। হে রাঘব! তোমার কজ্জলসদৃশী মলিনা ও মদিরামদধর্ম্মিণী অর্থাৎ আত্মভ্রান্তিদায়িনী অবিচারময়ী নিদ্রা শীঘ্র ক্ষয়প্রাপ্ত হউক[১৪]।

যেমন তেজোরাশি সূর্য্য কস্মিন্ কালেও তমোমধ্যে নিমগ্ন হন না, তেমনি, সদ্বিচারপরায়ণ নরগণও কদাচ মহাবিপদে নিপতিত হন না[১৫]। যাঁহার স্বচ্ছ মানস সরোবরে বিচার কমল প্রস্ফুটিত হয়, তিনিই ইহ জগতে হিমাচলের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হন। (হিমালয়ের নিতম্ব দেশে মানস সরোবর আছে) অর্থাৎ তিনিই শৈত্য, ঔন্নত্য ও স্থৈর্য্য প্রভৃতি সদ্‌গুণে বিভূষিত হন[১৬]। যাহার মতি বিবেকবিহীন ও মূর্খতায় অভিভূত, মোহ তাহার সম্বন্ধে চন্দ্র হইতেও অশনির (বজ্রের) উৎপত্তি করে। যক্ষ (ভূত) যেমন শিশুর নিকটেই উদয় প্রাপ্ত হয়, তেমনি মোহাভিভূত মন হইতেই সংসার ক্লেশ জন্মে[১৭]। * রাম! বিবেকবিহীন নরাধম দিগকে পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। তাহারা দুঃখবীজের অতিস্থূল কুশূল (কুশূল=ধানের গোলা বা মড়াই) ও বিপদরূপ লতার বসন্ত কাল[১৮]। যেমন অন্ধকার কালেই ভূত প্রেতের প্রচার, তেমনি, যে কিছু দুরাবস্তু, যে কিছু দুরাচার, যে কিছু মানসী পীড়া, সমস্তই অবিচার কালে প্রকাশিত হইয়া থাকে[১৯]। হে রঘুনাথ! বিচারবিমুখ লোক নির্জ্জন বনদ্রুমের সমান। তাহাদের দ্বারা কাহার কোনরূপ সৎকার্য্য হয় না। তাদৃশ অজ্ঞ অক্ষম লোক দূরে পরিহৃত হয়[২০]। জীবের মন যখন বিচারে রত হয়, দুরাশার আধিপত্য অতিক্রম করে, তখনই তাহাদের চিত্তে পূর্ণচন্দ্রে জ্যোৎস্নার আবেশের (উদয়ের) ন্যায় উৎকৃষ্ট বিশ্রান্তিসুখের আবেশ বা আবির্ভাব হইয়া থাকে[২১]। যেমন জ্যোৎস্নার উদয়ে ভুবনের শোভা, তেমনি, বিবেকের উদয়ে দেহের শোভা হইতে

---

* তার ব্যাখ্যা এই যে, চন্দ্র মনের পিতা ও অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। সে বিধায় তাহা বিবেক প্রকাশেরই যোগ্য। অর্থাৎ তাহাতে জ্যোৎস্নার ন্যায় জ্ঞানের ও সুখের আবির্ভাব হওয়া উচিত। তাহা না হইয়া তাহা হইতে যে বজ্রসমান শোক দুঃখাদির আবির্ভাব হয়, তাহা মূর্খতার বা মোহের প্রভাব ব্যতীত অন্য কিছু নহে। বালক যেমন বুঝে না বলিয়াই ভূতের ভয়ে কম্পিতকলেবর হয়, তেমনি, মনুষ্যও না বুঝিয়া বৃথা শোক দুঃখে অভিভূত হয়।

দেখা যায়। বিবেক জ্যোৎস্না অপেক্ষাও শীতল বস্তু[২২]। অধিক কি বলিব, বিচার পুরুষার্থ লাভের অধিকারী জীবের পরমার্থ পতাকান্বিত শুদ্ধ বুদ্ধির শ্বেতচামর স্বরূপ। রাত্রিকালে চন্দ্রমার যেরূপ শোভা, জীবদেহে বিচারের সেইরূপ শোভা[২৩]। * যেমন ভাস্কর দেব দশ দিক্ উদ্ভাসিত করেন, ও তমো বিনাশ করেন, তেমনি, বিচারশীল মানব আপনার ও জনগণের ভবভয় বিনাশ করিয়া থাকেন[২৪]। বিচার, মূঢ়দিগের রজনীসময়সমুদ্ভূত মোহকল্পিত প্রাণান্তিক (প্রাণ নাশক) বেতালভয়সদৃশ অজ্ঞান সমুদ্ভূত ভয় দূরীকৃত করিতে সমর্থ এবং তাহারই (বিচারের) অভাবে ক্ষণভঙ্গুর জগতের অসার পদার্থ নিচয়ে রমণীয়তা ভ্রম জন্মিতেছে[২৫।২৬]। মোহবশতঃ নিজ মনের কল্পিত অর্থাৎ ভ্রান্তিবিজৃম্ভিত অতিশয়িত দুঃখপ্রদ সংসার নামক বেতাল (সংসার ভয় ভূতের ভয়ের সমান) কেবল বিচার দ্বারা তিরোহিত হয়, অন্য কোন উপায়ে নহে[২৭]। যাহা বৈষম্যবর্জ্জিত বা সমসুখ, যাহা কোন কিছুর অধীন নহে, যাহা বাধিত নহে, অর্থাৎ যাহা কস্মিন্ কালেও বিনষ্ট, বিকৃত বা তিরোহিত হয় না, শাস্ত্রে যাহাকে কৈবল্য বলে, সেই মোক্ষ নামক পরম সুখ বিচার নামক উচ্চ তরুর ফল[২৮]। চন্দ্রের উদয়ে শৈত্যের উদয়ের ন্যায় মোক্ষের উদয়ে অত্যুত্তম নিষ্কামতা উদিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। সে নিষ্কামতা নিশ্চল ও উদার। অর্থাৎ তাহা পূর্ণ আনন্দরস[২৯]। পুরুষ আত্মবিচার মহৌষধির দ্বারা সিদ্ধ হইলে কৃতকৃত্য হয়, সুতরাং তখন সে কোন কিছু বাঞ্ছা করে না, এবং কোন কিছু ত্যাগও করে না[৩০]। পুরুষের চিত্ত যখন সেই পরম পদ অবলম্বন করে, তখন তাহার সমুদয় বাসনা দূরীকৃত হয় সুতরাং তখন তাহার উদয় বা অস্ত উভয়ের কিছুই থাকে না[৩১]। তখন তিনি এই সকল দৃশ্য বস্তুর প্রতি অনুরাগপরতন্ত্র হইয়া মনঃ-প্রয়োগ করেন না, দান ও আদান বর্জ্জন করেন, কোন কিছুতে উৎ-সাহিত হন না এবং অবসন্নও হন না। কেবল সাক্ষীর ন্যায় উদাসীন ভাবে অবস্থিতি করেন[৩২]। তাঁহারা কি অন্তরে কি বাহ্যে কোথাও অবস্থিতি করেন না, কিছুতেই বিষণ্ণ হন না, কোন প্রকার কর্ম্মেও অনুরক্ত হন না এবং নৈষ্কর্ম্ম্য লাভার্থও যত্ন করেন না[৩৩]। গত বস্তুর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন ও সম্প্রাপ্ত বস্তুর অনুবর্ত্তন করতঃ পরিপূর্ণ মহার্ণ-

* পতাকা ও চামর রাজাদিগের চিহ্ন। ভাবার্থ এই যে, বিচারবান্ পুরুষ রাজার সদৃশ।

বের ন্যায় অবস্থিতি করেন৩৪। সেরূপ পূর্ণচিত্ত মহাত্মা মহাযশা জীবন্মুক্ত মহাপুরুষেরা ইহলোকে বর্ণিতপ্রকারে বিচরণ করেন৩৫। এবং সেই সকল ধীর মহাপুরুষেরা এই জগতে স্বেচ্ছানুসারে দীর্ঘ কাল অবস্থিতি করতঃ পশ্চাৎ তদ্দেহ বিসর্জ্জনান্তে পরম কৈবল্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন৩৬। কুটুম্বপোষণে ব্যাপৃত ও বিপদে নিপতিত থাকিলেও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি যত্নপূর্ব্বক শ্রবণমননাদি সহকারে "আমি কে? সংসার কাহার?" ইত্যাদি-বিধ চিন্তা অর্থাৎ বিচার করিবেন৩৭। রাঘব! রাজারাও কোন্ কার্য্য সঙ্কট, কোন্ কার্য্য অসঙ্কট, কোন্ কার্য্য সন্দিগ্ধ, কোন্ কার্য্য অসন্দিগ্ধ, কিরূপ কার্য্য সফল, কিরূপ কার্য্য নিষ্ফল, তাহা বিচার দ্বারা অবধারণ করিয়া থাকেন৩৮। যেমন রাত্রিকালে দীপালোক দ্বারা পৃথিবীর অন্ধকার নষ্ট হয়, কোথায় কি আছে তাহা জানা যায়, তেমনি, বেদবেদান্ত পাঠ ও তাহার বিচার দ্বারা ধর্ম্ম-ব্রহ্ম-তত্ত্বের অবধারণ হইয়া থাকে৩৯। বিচার এমনি আশ্চর্য্যচক্ষু যে, তাহা অন্ধকারেও লুপ্তশক্তি হয় না, প্রখর সূর্য্য তেজেও অভিভূত হয় না, দূরস্থ ও ব্যবহিত বস্তুও দেখিতে পায়৪০। বিবেকান্ধ ব্যক্তিরা জাত্যন্ধের তুল্য এবং তাদৃশ দুর্ম্মতিরা সকল বিষয়ে শোকগ্রস্ত হইয়া থাকে। পরন্তু যাঁহারা বিবেকী তাঁহারা বিবেকরূপ (বিচাররূপ) দিব্য চক্ষুর প্রভাবে অখিল বস্তুতে জয় লাভ (মনোরথ সফল) করিয়া থাকেন৪১। বস্তুতঃই বিচার যার পর নাই আশ্চর্য্য বস্তু। বিচার পরমাত্মার ন্যায় মান্য ও মহানন্দের আধার। সেইজন্য সাধু পুরুষেরা ক্ষণকালের নিমিত্তও বিচারবিহীন হওয়া কর্ত্তব্য বোধ করেন না৪২। যেমন পক্ক সহকার (সুগন্ধ আম্র) ফল সকলেরই রুচিকর, তেমনি, চারুবিচারজ্ঞ পুরুষেরা বিদিতাত্মা পুরুষ দিগের রুচিকর (প্রিয়পাত্র)৪৩। যেমন জ্ঞাতপথ ব্যক্তি গমনাগমন কালে শ্বভ্রে (গর্ত্তে) পতিত হয় না, তেমনি, বিচারপরায়ণ নরগণও দুঃখে নিপতিত হন না৪৪। বিচার-বিহীন পুরুষ যেরূপ রোদন করে, রোগাক্রান্ত, বিষপ্রদীপ্ত (বিষের জ্বালায় জ্বলিত) ও অস্ত্রছিন্ন (অস্ত্রের দ্বারা ছেদিত) পুরুষ সেরূপ রোদন করে না৪৫। রাম! কর্দ্দমের ভেক হওয়াও ভাল, মলের কীট হওয়াও ভাল এবং পর্ব্বতগুহার সর্প হওয়াও শ্রেয়ঃ, তথাপি, বিচার-বিহীন হওয়া ভাল নহে অর্থাৎ শ্রেয়স্কর নহে৪৬। সর্ব্বপ্রকার অনর্থের আকর ও সাধুজননিন্দিত অবিচার পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য৪৭।

মোহান্ধ দিগের উচিত যে, তাঁহারা যেন সর্ব্বদাই বিচারযোগে অবস্থিতি করেন। কারণ এই যে, অজ্ঞানরূপ অন্ধকূপে নিপতিত ব্যক্তির বিচার ব্যতীত অন্য অবলম্বন নাই। বিচার দ্বারা আপনিই আপনাকে জ্ঞাত হইয়া, অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব স্থির করিয়া, মনোরূপ মৃগকে এই সংসার সমুদ্র হইতে উত্তারিত করিবেক। "আমি কে? কেন সংসার নামক দোষ উৎপন্ন হইয়াছে? এবং এ দোষ কোথা হইতেই বা আসিল?" ন্যায়ানুসারে এইরূপ পরামর্শের (অনুসন্ধানের বা ঐ সকল চিন্তার গোচর করার) নাম বিচার[৪৮।৫০]। বিচারবিহীন দুর্ম্মতি দিগের হৃদয় পাষাণের অনুরূপ এবং তাহারা অন্ধ হইতেও অন্ধ। তাহারা মোহের বশীভূত হইয়া কেবল দুঃখপরম্পরাই ভোগ করিতে থাকে[৫১]। রাম! যাহারা সত্য ও অসত্য দেখিয়া, নির্ণয় করিয়া, সত্যের গ্রহণ ও অসত্যের পরিহার করিতে ইচ্ছুক, তাদৃশ তত্ত্বান্বেষী দিগের সেই সেই তত্ত্বের জ্ঞান বিচার ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে হইতে দেখা যায় নাই[৫২]। বিচার হইতে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়, তত্ত্বজ্ঞান হইতে আত্মবিশ্রান্তির আবির্ভাব হয়, ও আত্মবিশ্রান্তি হইতে সর্ব্বদুঃখক্ষয়কারক পরমা শান্তি হইয়া থাকে[৫৩]। লোক সকল বিচারদৃষ্টির দ্বারাই লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্ম সমুদয় নিষ্পাদন করিয়া অবশেষে উত্তমতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে রাঘব! তুমি শমাদিসর্ব্বসাধনসম্পন্ন; সেইজন্যই বলিতেছি, তোমারও বিচারপরায়ণ হওয়া কর্ত্তব্য[৫৪]।

চতুর্দ্দশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চদশ সর্গ

বশিষ্ঠ কহিলেন, হে শত্রুনিসূদন! (মোক্ষ দ্বারের তৃতীয় দ্বারপাল সন্তোষ। সন্তোষ আয়ত্ত করিতে পারিলেও মোক্ষরূপ গৃহে প্রবেশ করা যায়।) সন্তোষ পরম শ্রেয়ের (মঙ্গলের) উপায় ও পরম সুখের দাতা। সন্তোষসেবী পুরুষ পরমা বিশ্রান্তি লাভ করিয়া থাকেন[১]। যাঁহারা সন্তোষ-রূপ ঐশ্বর্য্যে সুখী ও চিরবিশ্রান্তচেতা, তাঁহাদের নিকট এই পার্থিব সাম্রাজ্য জীর্ণ তৃণাংশের ন্যায় হেয় অর্থাৎ তুচ্ছ[২]। রামচন্দ্র! সংসার পথের পথিক্‌দিগের প্রায়ই বিষমাবস্থা (রোগ, শোক, দুঃখ, দারিদ্র্য প্রভৃতি দুরবস্থা) ঘটিয়া থাকে; পরন্তু যাঁহাদের বুদ্ধি সন্তোষশালিনী, তাঁহারা তাদৃশ সঙ্কটেও উদ্বিগ্ন বা সুখহীন হন না[৩]। যাহারা শান্ত ও সন্তোষা-মৃত পানে পরিতৃপ্ত, এই ঐশ্বর্য্যশ্রী তাহাদের নিকট হলাহল বিষ[৪]। সর্ব্ব-দোষনাশন সন্তোষ যেমন মধুর, অমৃত সেরূপ মধুর নহে[৫]। যে ব্যক্তি অপ্রাপ্ত বিষয়ের অভিলাষ (পাইবার আশা বা ইচ্ছা) করে না এবং প্রাপ্ত বিষয়েও রাগদ্বেষাদি বিহীন হয়, তুমি তাহাকেই সন্তুষ্ট বলিয়া জানিবে[৬]। আত্মাতে যাবৎ না সন্তোষের উদয় হয়, তাবৎ তাহাতে (আত্মার নিকট উপাধি অন্তঃকরণে) বিপদ সকল গর্ত্তে লতার উৎপত্তির ন্যায় উৎপন্ন হইয়া থাকে[৭]। কমল যেমন সূর্য্যকিরণ স্পর্শে বিকসিত হয়, তেমনি, সন্তোষশীতল চিত্তও, বিজ্ঞানদৃষ্টির সংযোগে বিকসিত হইয়া থাকে[৮]। মুখ যেমন মলিন দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয় না, সেইরূপ, জ্ঞানও আশাবশীভূত ও সন্তোষবর্জ্জিত সুতরাং মলিনতম চিত্তে প্রতি-বিম্বিত হয় না[৯]। যে মানব পঙ্কজের বিকাশার্থ পূর্ব্বোক্তলক্ষণান্বিত সন্তোষ ভাস্কর উদিত হয়, সে মানব পঙ্কজ কদাপি অজ্ঞানলক্ষণ অন্ধকার রজনীর দ্বারা সঙ্কোচ প্রাপ্ত হয় না[১০]। যাহার চিত্ত সন্তোষ অবলম্বন করে, সে দরিদ্র হইলেও রাজার ন্যায় আধিব্যাধিবিনির্ম্মুক্ত হইয়া সাম্রাজ্য সুখ অনুভব করিতে সমর্থ[১১]। যে ভবিষ্যৎ ভোগের আশা করে না, উপস্থিত ভোগ (সুখ দুঃখ) প্রাক্তন নাশার্থ স্বীকার করে, এবং যাহার আচার ব্যবহার সর্ব্বমনোহর, সেই ব্যক্তিই সন্তুষ্ট বলিয়া

পরিগণিত[১২]। যে মহাত্মা সন্তোষ দ্বারা পরমা তৃপ্তি লাভ করিয়াছেন; ক্ষীরসমুদ্রের ন্যায় তাঁহার মুখে লক্ষ্মী (শোভা) সতত বিরাজমানা থাকেন[১৩]। বুদ্ধিমান্ নর প্রযত্ন সহকারে আপনা আপনি আপনার পূর্ণতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সর্ব্বত্রই তৃষ্ণাপরিত্যাগী হইবেন[১৪]। সন্তোষামৃতপূর্ণ, শান্ত ও সুশীল পুরুষের মন শীতাংশুর (চন্দ্রের) ন্যায় স্থির ও শীতল[১৫]। ভৃত্যেরা যেমন রাজার উপাসনা করে, তেমনি, মহা মহা ঐশ্বর্য্য সকল সন্তোষ-পুষ্টমনা পুরুষের ভৃত্য হইয়া উপাসনা করিতে থাকে[১৬]। যেরূপ বর্ষা-কালে ধূলিপটল তিরোহিত হয়, সেইরূপ, যিনি সন্তোষ অবলম্বন করিয়া আত্মার স্বাস্থ্য সম্পাদন করিতে পারেন তাঁহার আধি-ব্যাধি সকল তিরোভূত হইয়া থাকে[১৭]। বলা বাহুল্য যে, শীলসম্পন্ন কলঙ্ক-পরিশূন্য বিশুদ্ধচিত্তবৃত্তির দ্বারা পুরুষগণ পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় দীপ্তি পাইয়া থাকেন[১৮]। হে রাঘব! শান্তিগুণযুক্ত পুরুষের সুন্দর বদন অবলোকন করিলে লোকে যেরূপ সন্তোষ লাভ করে, লোক সকল ধনসঞ্চয় দ্বারা সেরূপ সন্তোষ লাভ করিতে পারে না[১৯]। হে রঘুনন্দন! গুণশালিগণের মধ্যে যাঁহারা অনুত্তম শমগুণে পুরুষরাজের ন্যায় সমলঙ্কৃত, সেই সকল দোষপরিশূন্য নরোত্তমেরা দেবগণের ও মহর্ষিগণের নমস্য[২০]।

পঞ্চদশ সর্গ সমাপ্ত।

ষোড়শ সর্গ ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে মহাবুদ্ধি রাম! (সৎসঙ্গনামা চতুর্থ দ্বারপালের সেবা করিলেও জীব মোক্ষ দ্বারে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারে)। একমাত্র সাধুসঙ্গই নরগণের সংসারজলধি উত্তরণের প্রবল সহায়[১]। যে সকল মহাত্মা সাধুসঙ্গরূপ মহীরুহের বিবেকরূপ শুভ্র পুষ্প যত্ন সহকারে রক্ষা করিতে পারে, সেই সকল মহাত্মারাই তাহার ফলভাগী হইতে পারেন[২]। সাধুসংসর্গে শূন্য স্থান জনাকীর্ণপ্রায়, মৃত্যু উৎসবময় ও আপদ সম্পদ সদৃশ হইয়া থাকে[৩]। হে রামচন্দ্র! এই জগতে উত্তম সৎসঙ্গকে আপদরূপ সরোজিনীর বিনাশকারী হিমের ও মোহরূপ মেঘের বায়ু বলিয়া জানিবে। তাদৃশ সৎসমাগম এই ভূমণ্ডলের সর্ব্বত্রই জয়যুক্ত[৪]। রাম! তুমি নিশ্চয় জানিবে যে, সাধুসমাগম দ্বারা বুদ্ধির বৃদ্ধি, অজ্ঞান তরুর বিনাশ ও সর্ব্বপ্রকার মনঃপীড়ার উৎসারণ হইয়া থাকে[৫]। যদ্রূপ উদ্যানে জলসেক করিলে তাহা হইতে উজ্জ্বল ও মনোহর পত্র-পুষ্পাদির গুচ্ছ উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ, সাধুসঙ্গ হইতে উজ্জ্বল ও মনোহর (নির্ম্মল) বিবেক নামক উৎকৃষ্ট দীপ উদ্ভূত হইয়া থাকে[৬]। সৎসঙ্গরূপ ঐশ্বর্য্য অপায় ও ব্যাঘাত রহিত, নিত্য বর্দ্ধমান, অনুত্তম ও পরমানির্ব্বৃতির (বিশ্রান্তি সুখের) উৎপাদক[৭]। নিতান্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইলেও, অধিকতর পরবশ হইলেও, মনুষ্যের সাধুসঙ্গ ত্যাগ করা বিধেয় নহে[৮]। সাধুসঙ্গতি সদাচারের দীপ ও হৃদয়ান্ধকারনাশন জ্ঞান-সূর্য্য[৯]। যে পুরুষ সর্ব্বদা সাধুসঙ্গরূপ নির্ম্মল ও শীতল জলে স্নান করে, তাহার আর দান, তীর্থদর্শন, তপস্যা ও যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রয়োজন কি?[১০] যাহাদের অন্তঃকরণ সাধুসঙ্গের দ্বারা দুর্ব্বাসনাদিদোষপরিশূন্য হইয়াছে, সংশয়চ্ছেদী ও বীতরাগ হইয়াছে, সেই সাধুপুরুষেরা সন্নিধানে থাকিলে তপস্যাদি ব্যাপারের প্রয়োজন হয় না[১১]। যাহারা বিশ্রান্তচিত্ত, তাহারাই ধন্য এবং তাহারাই দর্শনীয়। দরিদ্রগণ যেমন আগ্রহ ও যত্ন সহকারে মণিরত্ন অবলোকন করে, লোক সকল শান্তচিত্ত সাধু দিগকে সেইরূপ আগ্রহে দর্শন করিয়া থাকে[১২]। কমলা অর্থাৎ লক্ষ্মী যেমন অপ্সরোগণ মধ্যে বিরাজ করেন ও শোভা প্রাপ্ত হন, সৎসমাগম-

জনিত সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট ধীমান্ গণের মতিও সেইরূপ শোভা ধারণ করে[১৩]। রাম! সেই জন্যই বলিতেছি, যে ধন্য বা পুণ্যবান্ পুরুষ সাধুসঙ্গ পরিত্যাগ না করে, সেই ধন্য বা পুণ্যবান্ পুরুষই বহু লোকের মধ্যে বিচার লভ্য পদকে (ব্রহ্মকে) অগ্রে শিরোভূষণ, তৎপরে তাহা প্রখ্যাপিত (প্রথমে তত্ত্ববিষয়ে পরোক্ষ জ্ঞান, পরে তত্ত্বসাক্ষাৎকার) করিয়া কৃতার্থ হয়[১৪]। যে সকল সাধু পুরুষের চিত্তগ্রন্থি (চিত্তগ্রন্থি = চিত্তের ভ্রম। আত্মতত্ত্বে মোহ। আমি কি তাহা না জানা) ছিন্ন হইয়াছে, যাঁহারা আত্মতত্ত্ব জানেন অর্থাৎ যাঁহারা ব্রহ্মবিৎ, প্রযত্ন সহকারে তাঁহাদিগেরই সেবা করা কর্ত্তব্য। কারণ, তাঁহারাই ভবসমুদ্র পারের উপায়[১৫]। যাহারা নরকানলের নীরদ (নীরদ = বৃষ্টিকারী মেঘ) স্বরূপ সাধু দিগের সন্দর্শন লাভ করে নাই, তাহারাই নরকাগ্নির শুষ্ক কাষ্ঠ[১৬]। সৎসঙ্গ নামক ঔষধে দারিদ্র্য, দুঃখ, মরণ, এতদ্রূপ সান্নিপাতিক রোগ সমূহ সমূলে বিনষ্ট হইয়া থাকে[১৭]। সন্তোষ, সাধুসঙ্গ, তত্ত্ববিচার ও শম (ইন্দ্রিয়নিগ্রহ), এইগুলি মানবগণের ভবসমুদ্র পারের উপায়[১৮]। সন্তোষই পরম লাভ, সাধুসঙ্গতিই পরম গতি, তত্ত্ববিচারই পরম জ্ঞান, এবং শান্তিই পরম সুখ[১৯]। অপিচ, ঐ চারিটী ভবভেদনের (জন্মপ্রবাহ বিনাশের) প্রকৃত উপায়। যাঁহারা উহা অভ্যস্ত করিয়াছেন তাঁহারাই ভবসমুদ্রের মোহবারি উত্তীর্ণ হইতে পারেন[২০]। এমন কি, ঐ চারিটীর একটী আয়ত্ত করিতে পারিলে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির চারিটীই অভ্যস্ত বা আয়ত্ত হইতে পারে[২১]। যেহেতু ঐ চারিটীর এক একটী অন্য তিন তিনটীর উৎপত্তির স্থান, সেইহেতু উক্ত সমুদায় অধীন করিবার নিমিত্ত যত্নপূর্ব্বক কোন একটীর আশ্রয় গ্রহণ করিবে[২২]। যেমন সমুদ্রে বণিকগণ কর্ত্তৃক পণ্যবাহী পোত (পণ্য = বিক্রেয় দ্রব্য। পোত = বৃহৎ জলযান। জাহাজ)। সকল সাবধানে চালিত হয়, সেইরূপ, শম, সৎসমাগম, সন্তোষ, বিচার, এ গুলিও সুধীগণ কর্ত্তৃক অতি সতর্কতার সহিত পরিপালিত হইয়া থাকে[২৩]। শ্রী যেমন কল্পবৃক্ষের নিত্যাশ্রিত, তেমনি বিচার, সন্তোষ, শম, সৎসঙ্গ, এতচ্চতুষ্টয়শালী ব্যক্তিরও নিত্যাশ্রিত। (কল্পবৃক্ষের শ্রী ঐশ্বর্য্য। বিচারশীলের শ্রী জ্ঞান)[২৪]। যেমন পূর্ণচন্দ্রে সৌন্দর্য্যাদি গুণ লক্ষিত হয়, তেমনি তাহা বিচার, শম, সৎসঙ্গ ও সন্তোষশীল মানবেও দৃষ্ট হয়। (বিচারশীল মানবে প্রসন্নতা ও বিনয় প্রভৃতি সদ্‌গুণ সতত বিরাজ করিতে থাকে)[২৫]। রাজা সমন্ত্রীর সাহায্যে

জয়শ্রী লাভ করেন, অধিকারী মানবেরাও বিচার, সৎসঙ্গ, সন্তোষ ও শমের সাহায্যে সুমতি প্রাপ্ত হন২৬। হে রঘুকুলনন্দন রাম! আমি সেই কারণে বলিতেছি, তোমায় উপদেশ করিতেছি, তুমি পৌরুষ প্রকাশ দ্বারা মনোজয় করিয়া ঐ সমস্ত গুণের অথবা ঐ সকলের অন্ততম গুণের আশ্রয় গ্রহণ কর২৭। পুরুষ যাবৎ না পৌরুষ (পুরুষকার) দ্বারা চিত্তরূপ মত্ত হস্তীকে জয় করিয়া অন্ততঃ উক্ত গুণের একতর গুণ আশ্রয় করিতে পারে, তাবৎ তাহার উত্তমা গতি লাভের আশা নাই২৮। অহে রাম! তোমার মন যত দিন না উৎকট উদ্যোগের সহিত ঐ সকল গুণ উপার্জ্জনে অভিনিবিষ্ট হইবে, তাবৎ তুমি দন্ত দ্বারা দন্ত বিচূর্ণন করিবে অর্থাৎ উত্তরোত্তর অধিক উদ্যোগী হইবে২৯। হে মহাবাহো! যত দিন না তুমি উক্ত গুণ অর্জ্জনে সমর্থ হইবে, তত দিন তুমি দেবতা হও, যক্ষ হও, পুরুষ বা পাদপ হও, নিস্তারের উপায় প্রাপ্ত হইবে না৩০। বলবান্ ও ফলপ্রদ একটিমাত্র গুণের দ্বারা দোষযুক্ত বিরসচেতা ব্যক্তির সমুদয় দোষ অচিরাৎ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে৩১। একটিমাত্র গুণ বর্দ্ধিত হইলে অনেকদোষজয়কারী সমস্ত গুণ বর্দ্ধিত ও একটিমাত্র দোষ বর্দ্ধিত হইলে গুণরাশিনাশী সমস্ত দোষ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে৩২। জীবগণের মধ্যে মনোমোহরূপ কাননে শুভ ও অশুভরূপিণী কূলদ্বয়শালিনী বাসনা নদী নিরন্তর প্রবাহিতা হইতেছে৩৩। এই তরঙ্গিণীকে (বাসনা নদীকে) তুমি প্রযত্নের দ্বারা যে দিকে নিপাতিত অর্থাৎ প্রবাহিত করিবে, উক্ত নদী সেই দিকেই প্রবাহিতা হইবে, ইহা বিবেচনা করিয়া যে দিকে ইচ্ছা সেই দিকে উহার গতি প্রবর্ত্তিত করিবে৩৪। হে মহামতে! হৃদয়কাননপ্রবাহিণী মহানদী যাহাতে পুরুষকারের বেগপ্রভাবে শুভবাসনার দিকে প্রবাহিতা হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হও। তাহা হইলে অশুভ প্রবাহ তোমাকে কখনই বিচলিত করিতে পারিবে না৩৫।

ষোড়শ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তদশ সর্গ।

বশিষ্ঠদেব বলিলেন, রাঘব! যে কথিতপ্রকারে অন্তর্বিবেকী হয়, ইহ জগতে সেই ব্যক্তিই মহান্। রাজা যেমন নীতি শাস্ত্র শ্রবণের অধিকারী, তেমনি, সেই মহাপুরুষই জ্ঞান শাস্ত্র শ্রবণের যোগ্য[১]। নির্ম্মেঘ আকাশ যেমন শরৎশশধরের উপযুক্ত স্থান; তেমনি, জড়সঙ্গবর্জ্জিত নির্ম্মল-স্বভাব উন্নতাশয় পুরুষই তত্ত্বপ্রকাশক বিচারের যোগ্য আধার (পাত্র)[২]। তুমি সেই সেই অখণ্ডিত গুণলক্ষ্মীর (সন্তোষাদি গুণ সম্পদের) আশ্রয়, সেই কারণে আমি তোমাকে মনোমোহ নাশক উপদেশ বাক্য বলিব, তুমি তাহা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিবে[৩]। যাহার পুণ্যরূপ কল্পপাদপ ফলভরে অবনত হইয়াছে সেই ব্যক্তিই মুক্তির নিমিত্ত মদুক্ত বাক্যনিচয় শুনিতে সমুৎসুক হইবে[৪]। যাহারা ভব্য অর্থাৎ সদ্গুণসম্পন্ন, তাহারাই এই সকল পবিত্র, উদার ও পরম জ্ঞানদায়ক মহাবাক্য শ্রবণের অধিকারী; অধম দিগের ইহাতে অধিকার নাই[৫]। সর্ব্বসংহিতার সার এই সংহিতা ৩২০০০ শ্লোকে রচিত, * ইহা অধিকারী পুরুষকে নির্ব্বাণ পদ দান করে, সেই নিমিত্ত এই সংহিতা মোক্ষোপায় ও শ্রোতা কর্তৃক শ্রুত হয় বলিয়া শ্রুতি নামে অভিহিত হয়[৬]। যেমন রাত্রিকালে জাগরিত ব্যক্তির সম্মুখে দীপ প্রজ্বালিত করিলে তাহার আলোক তৎসম্বন্ধে প্রাদুর্ভূত হই-

* বত্রিশ হাজার শ্লোকে সংহিতা সমাপ্ত, অথচ শ্লোকের অঙ্ক গণনা করিলে ২৮০০০ হাজার বৈ হয় না। ইহাতে অনেকেই ভাবিতে পারেন, তবে বুঝি ৪০০০ হাজার শ্লোক নাই অথবা ত্যাগ করা হইয়াছে। বস্তুতঃ তাহা নহে। শ্লোক গণনা দুই প্রকার রীতিতে হইয়া থাকে। এক বাক্য অনুসারে, অপর ৩২ অক্ষরে এক শ্লোক, সেই শ্লোক অনুসারে। যেখানে বাক্য অনুসারে গণনা, সেখানে অর্দ্ধ শ্লোকেও সংখ্যা দেওয়া হয়। যেখানে অক্ষর গণনা, সেখানে পদ্যশেষে অঙ্ক দেওয়া হয়। চণ্ডীতে ৭০০ শ্লোক থাকায় তাহা সপ্তশতী নামে খ্যাত। পরন্তু, পদ্য গণনা করিলে ৭০০ পূরে না। শাস্ত্রে লেখা আছে, মার্কণ্ডেয় উবাচ, এই টুকু এক শ্লোক। এ শ্লোক মন্ত্রাত্মক। মহাভারতের লক্ষ শ্লোক গণনা পদ্যানুসারে নহে, বাক্য অনুসারে। সেইজন্য তাহাতে, কোথাও অর্দ্ধ পদ্যে কোথাও এক পদ্যে, কোথাও দেড় পদ্যে অঙ্ক দেওয়া হয়। এই গ্রন্থের শ্লোক গণন ৩২ অক্ষরে এক শ্লোক, সেই শ্লোক অনুসারে। কিন্তু ইহাতে অনেক বড় বড় পদ্য আছে। এবং পদ্য শেষে পদ্য সংখ্যা অনুসারে অঙ্ক দেওয়া আছে। পরন্তু শাস্ত্রীয় গণনা ৩২০০০ অক্ষর অনুসারে গণনায় হয়।

বেই হইবে। অর্থাৎ সে ইচ্ছা না করিলেও তদ্দীপালোক যেমন তাহাকে পদার্থ দর্শন করাইয়া থাকে, সেইরূপ, একান্তচিত্তে শ্রবণ করিলে এই সংহিতাও শ্রবণকারী অধিকারীর মোক্ষসাধন জ্ঞান প্রাদুর্ভূত করাইয়া থাকে[৭]। বৎস রাম! এই সংহিতা নিজে অনুশীলন অথবা অন্যের নিকট শ্রবণ দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করিলে ভাগীরথী যেমন পাপ তাপ নিবারণ পূর্ব্বক সুখ প্রদান করেন সেইরূপ ইহাও সংসারভ্রম নিবারণ ও পরম সুখ প্রদান করিয়া থাকে[৮]। যেমন অবধান সহকৃত পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা রজ্জুতে সর্পভ্রম তিরোহিত হয়, সেইরূপ, অবধান সহকারে এই সংহিতা পুনঃ পুনঃ অনুশীলন করিলে সংসারদুঃখ শান্তিসুখে পরিণত হইতে পারে[৯]। হে অনঘ! এই সংহিতার পৃথক্ ছয় প্রকরণ আছে এবং সে সকল প্রকরণ যুক্তিযুক্ত অর্থের বোধক ও দৃষ্টান্তসার আখ্যায়িকা যোগে অভিহিত হইয়াছে[১০]। তন্মধ্যে প্রথম বৈরাগ্য-প্রকরণ। জলসেক করিলে যেমন মরুভূমিস্থ বৃক্ষও বর্দ্ধিত হয়, তেমনি, বৈরাগ্য প্রকরণ অনুশীলন করিলে বৈরাগ্য পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে[১১]। এই বৈরাগ্য প্রকরণের শ্লোকসংখ্যা সার্দ্ধসহস্র। সার্দ্ধসহস্র অর্থাৎ দেড় হাজার শ্লোকের তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিলে মনের শুদ্ধতা জন্মে অর্থাৎ মালিন্যনিবৃত্তি হয়। যেমন পরিমার্জ্জনে মণির শুদ্ধতা জন্মে; তেমনি, বিচারে মনের শুদ্ধতা জন্মে[১২]। তার পর মুমুক্ষুব্যবহার নামক দ্বিতীয় প্রকরণ। ইহার শ্লোকসংখ্যা সহস্র এবং তাহা নানাযুক্তিবাদে শোভমান[১৩]। ইহাতে মুমুক্ষুদিগের স্বভাব ও চরিত্রাদি বর্ণিত হইয়াছে। অনন্তর উৎপত্তিনামক তৃতীয় প্রকরণ। এই প্রকরণে বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্ত ও তত্ত্ববোধার্থ নানাপ্রকার আখ্যায়িকা কথিত হইয়াছে[১৪]। এই প্রকরণ জ্ঞানপ্রতিপাদক ও সপ্তসহস্রশ্লোকে সমাপ্ত। ইহাতে "আমি" "তুমি" ইত্যাদিবিধ লৌকিক দ্রষ্টৃদৃশ্যভেদ ও তাহার কারণ বর্ণিত হইয়াছে[১৫]। ইহা শ্রবণ করিলে আমি, তুমি, ব্রহ্মাণ্ডবিস্তৃতি, যাবতীয় লোক এবং আকাশ ও পর্ব্বত প্রভৃতি স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমুদায় সংসার অবাস্তবিক, অমূলক, অপর্ব্বত ও অভৌতিক বলিয়া শ্রোতার হৃদয়ে প্রতিভাত হয়। উৎপত্তি প্রকরণ শুনিলেই শ্রোতার সুস্পষ্ট প্রতীতি হইয়া থাকে যে, এই সংসার সঙ্কল্পরচিত রাজ্যের অনুরূপ অর্থাৎ মনোরথ মাত্র। অপিচ, স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর ন্যায় অলীক, মনোরাজ্যের ন্যায় নাম মাত্রে বিস্তৃত অর্থাৎ বস্তুশূন্য, মৃগতৃষ্ণিকার

ন্যায় ভ্রমবিজৃম্ভিত, গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায় তুচ্ছ (গন্ধর্ব্ব নগর=ভ্রমবশতঃ মেঘাক্রান্ত আকাশে দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাহা মেঘের সন্নিবেশ ব্যতীত অন্য কিছু নহে), দ্বিচন্দ্রের ন্যায় ভ্রমময় ও পিশাচের ন্যায় মোহকল্পিত। বিশদ কথা—সত্য ও পুরুষার্থ শূন্য[১৬।১৯]। যেমন নৌকারোহী ব্যক্তি পর্ব্বত প্রভৃতি চলিতেছে বলিয়া বোধ করে, অথবা অজ্ঞগণ যেমন ভ্রম বশতঃ আকাশে মুক্তা মালা, সুবর্ণে কটক (অলঙ্কারবিশেষ) জলে তরঙ্গ ও গগনে নীলিমা অনুভব করে, তেমনি, অজ্ঞ সংসারী জীব এই জগৎ বস্তুতঃ না থাকিলেও মোহপ্রযুক্ত আছে বলিয়া বিবেচনা করে। অধিক কি বলিব, যেমন রঙ্গশূন্য (রঙ্গ=রং), ভিত্তিশূন্য ও কর্ত্তৃশূন্য চিত্র আকাশে ও স্বপ্নে পরিকল্পিত হয় বা দেখা যায়, তেমনি, এই সংসার বিবেকীর নিকট ঠিক্ সেইরূপ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে (অর্থাৎ মিথ্যা)। যেমন আলেখ্যাল্লিখিত বহ্নি অসত্য হইলেও বহ্নিভাবে প্রতীয়মান হইয়া থাকে, তেমনি, এই জগৎ মিথ্যা হইলেও সত্যের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। তৎকালে তাঁহার ইহাও প্রতীতি হইবে যে, এই সংসার—তরঙ্গে উৎপলমালার ন্যায়, দৃষ্টনৃত্যের স্থিতির ন্যায় ও চক্রবাক চীৎকার শ্রবণে আকাশে জলরাশি জ্ঞানের ন্যায় বস্তুশূন্য। * অপিচ, ছায়া-ফল-কুসুম-শূন্য শুষ্কপত্রপরিপূর্ণ গ্রীষ্মকালীন অরণ্যের ন্যায় নীরস, গিরিগুহার ন্যায় শূন্যগর্ভ, ভীষণ ও অন্ধকারাচ্ছন্ন। বস্তুতঃই ইহা মরণব্যগ্র পুরুষের চিত্তের বিভীষিকা দর্শনের ন্যায়, (মুমূর্ষু যে মৃত্যুকালে যমদূতাদি দর্শন করিয়া ভয় পায় তাহা তাহার মনেরই বিকার, অন্য কিছু নহে) স্তম্ভসমুৎকীর্ণ ও ভিত্তিলিখিত চিত্রের ন্যায় (ভিত্তি=ভিৎ, দেওয়াল) এবং পঙ্কাদিরচিত প্রতিমাদির ন্যায় পৃথক্ সত্তাশূন্য। পরমার্থ দর্শনে ইহা প্রশান্ত ও জ্ঞাননীহারবর্জ্জিত শরদাকাশ ব্যতীত অন্য কিছু নহে। অর্থাৎ অজ্ঞানের বিকার দূরীভূত হইলে ইহা নিত্য নির্ব্বিশেষ সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে[২০।২৮]।

* তরঙ্গ দূর হইতে দেখিলে বোধ হয়, যেন জলে পদ্মের মালা ভাসিতেছে। বস্তুতঃ তাহা জলের সন্নিবেশ ব্যতীত বাস্তব পদ্ম নহে। আমরা দেখি, নর্ত্তকী প্রহরব্যাপী নৃত্য করে পরন্তু তাহা প্রহর ব্যাপী নহে, প্রত্যুত ক্ষণব্যাপী। ক্ষণপরম্পরা একবুদ্ধি গম্য হইয়া প্রহর ভ্রান্তি জন্মায়। জগতের স্থিতি সেইরূপ ভ্রান্তিসূচক। চক্রবাক্ পক্ষীর রবে মনে হয়, সেই স্থানে জল আছে। বস্তুতঃ আকাশেই রব করে কিন্তু আকাশে জল থাকে না।

রাম! তাহার পর স্থিতি নামক চতুর্থ প্রকরণ। তাহার শ্লোক-সংখ্যা তিন সহস্র। এই স্থিতি প্রকরণ, নানাপ্রকার ব্যাখ্যানে ও আখ্যায়িকায় পরিপূর্ণ। ইহাতে দিঙ্মণ্ডলমণ্ডিত জগতের স্বরূপ, তাহার ভ্রমপ্রভবত্ব, অহঙ্কার প্রসূতত্ব ও দ্রষ্টৃদৃশ্যের ক্রম বর্ণিত হইয়াছে[২৯।৩২]। তৎপরে উপশান্তি নামক পঞ্চম প্রকরণ। এ প্রকরণটী সহস্রশ্লোকপরিমিত ও পরম পবিত্র। ইহাতে নানাপ্রকার যুক্তিজাল প্রদর্শিত হইয়াছে। এই প্রকরণ শ্রবণ করিলে জগৎ, আমি, তুমি, এইরূপ এইরূপ ভ্রম উপশান্ত হয় বলিয়া ইহার নাম উপশান্তি। উপশান্তি শ্রবণে সংসার ভ্রম উপশমিত হয় এবং শ্রোতা তখন জীবন্মুক্ত হইয়া দেখিতে থাকেন—এই সংসার আলেখ্যলিখিত সৈন্য দলের ন্যায় বিশীর্ণ ও বিপ্রকীর্ণ। জীব তখন স্পষ্টই বুঝিতে পারে, এই সংসার কেবল সঙ্কল্পবিনির্গত ও চিত্রিত নগরীর অনুরূপ। অপিচ, সঙ্কল্পকল্পিত মত্ত মাতঙ্গোপম নিরঙ্কুশ মেঘের বজ্রধ্বনির, স্বপ্নবিজৃম্ভিত বা কল্পনারচিত নগরীর, বন্ধ্যানারীর মুখে তদীয় বীরপুত্রের যুদ্ধাদিকথাপ্রসঙ্গের ও চিত্রব্যাপ্তভিত্তির ন্যায় বস্তুশূন্যকল্পনানগরীর, স্বপ্নদৃষ্ট নিরর্থক যুদ্ধের ও যোধগর্জ্জনের এবং অন্তর্লীন তরঙ্গশালিনী প্রসন্নসলিলা তরঙ্গিণীর ন্যায় নিতান্ত অলীক ও অন্তঃসারশূন্য নিরর্থক[৩৩।৪০]।

অনন্তর নির্ব্বাণ নামক ষষ্ঠ প্রকরণ। ইহার শ্লোকসংখ্যা সার্দ্ধচতুর্দ্দশ সহস্র। ইহাও সেই মহান্ অর্থের অর্থাৎ পরমপুরুষার্থের দাতা। এই প্রকরণ অবগত হইলে সমুদায় কল্পনা বিনষ্ট ও নির্ব্বাণ লাভ হইয়া থাকে। অধিক কি বলিব, ইহা যথাযথ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে বিজ্ঞানাত্মা বা জীব নিরাময়, বীতস্পৃহ ও শুদ্ধচিৎপ্রকাশ স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন জগদভ্রম ও সংসারযাতনা দূরীভূত ও কর্ত্তব্যানুষ্ঠানজনিত নির্ম্মল সম সুখ উৎপন্ন হয়। তখন তিনি বুঝিতে পারেন, মনুষ্যের অনুষ্ঠিত যে কিছু কর্ম্ম সমস্তই স্ফটিকস্তম্ভপ্রতিবিম্বিত আকাশের ন্যায় নিষ্ফল। অপিচ তখন তাহার জন্মমরণাদি ভোগের অবসান জনিত পরমা পরিতৃপ্তি, সমুদায় মনস্কামনা সুসিদ্ধ, কার্য্য-কারণ-কর্তৃত্ব ও হেয়োপাদের দৃষ্টি বিনষ্ট, দেহসত্ত্বেও অদেহ ও সংসার থাকিতেও অসংসার সংঘটন হয়[৪১।৪৫]। এই সংসার দুর্লীলা তখন অবরুদ্ধ ও আশাবিসূচিকা ও অহঙ্কাররূপ বেতাল (ভূত৭ যাহার আবেশে জীব উন্মত্তের ন্যায় আত্মবিস্মৃতঃ হইয়া আছে) তখন বিনাশ প্রাপ্ত হয় এবং পুরুষ তখন পাষাণজঠরের

ন্যায় নিবিড় ও নীরন্ধ্র হয়েন, এবং তখন তিনি পরম প্রকাশমান হইয়া চিন্ময় আদিত্যরূপে সমুদায় লোক আলোকময় বা উদ্ভাসিত করিতে থাকে। * এই সংসারলক্ষ্মী তখন তদীয় রোম কূপের কোন এক প্রদেশে মহাতরুকুসুমসংযুক্ত ভ্রমরীর ন্যায় অবস্থান করে এবং সেই সেই জীবন্মুক্ত নরের অন্তরাকাশে এরূপ অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিতি করিলেও সে সকল তাহার লক্ষ্যভূত হয় না। তদীয় হৃদয় তখন এরূপ বিস্তৃত হয় যে, শতলক্ষ হরিহরব্রহ্মা তাহার ইয়ত্তা অবধারণ করিতে সক্ষম হন না॥৩৬।৫৩।

* অর্থাৎ সে তখন অন্তরে ও বাহিরে একদৃশ্য একরস ও একভাব হইয়া যায়। এবং সে তখন সর্ব্বত্রই ব্রহ্মচৈতন্যের আলোক প্রকাশমান দেখিতে থাকে।

সপ্তদশ সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টাদশ সর্গ।

বশিষ্ঠদেব বলিলেন, যদ্রূপ, বীজবপন করিলে তাহার ফল অবশ্যম্ভাবী, তদ্রূপ, এই সংহিতার ব্যাখ্যা শ্রবণ করাইলেও শ্রোতার শ্রবণফল জ্ঞান অবশ্যম্ভাবী১। যে শাস্ত্র যুক্তিযুক্ত অর্থাৎ অবাধে তত্ত্বনিশ্চায়ক, সে শাস্ত্র পৌরুষেয় (পুরুষকৃত অর্থাৎ মনুষ্যরচিত) হইলেও গ্রাহ্য। কিন্তু যাহা যুক্তিযুক্ত নহে, তাহা বেদ হইলেও অগ্রাহ্য। যাঁহারা বুদ্ধিমান্, তাঁহাদিগের নিকট যাহা ন্যায্য, তাহাই অস্মদাদির নিকট শ্রেষ্ঠ বা মুখ্য। অথবা বুদ্ধিমান্ দিগকে "যাহা ন্যায্য তাহাই গ্রাহ্য" এই ভাবের ভাবুক হইতে দেখা যায়২। অতএব, যুক্তিযুক্ত বাক্য বালক হইতেও গ্রাহ্য; কিন্তু অযুক্ত বাক্য ব্রহ্মার বদন বিনিঃসৃত হইলেও তাহা অগ্রাহ্য৩। যে ব্যক্তি গঙ্গাসলিল পরিহার পূর্ব্বক অনুরাগ বশতঃ আমার পূর্ব্বপুরুষের এই কূপ, এইরূপ অবধারণে ও আগ্রহে কূপ জল পান করে, সেই রাগশীল পুরুষকে শাসন করা (বুঝান) কাহারও সাধ্য নাই৪। যেমন প্রাতঃকাল আসিলেই উষার আলোকের আগমন বা উদয় হয়, তেমনি, এই সংহিতাও বাচিতা (পড়িয়া শুনান বা বুঝাইয়া দেওয়া) হইলে শ্রোতার বিবেকের উদয় হয়৫। প্রাজ্ঞ ব্যক্তির নিকট এই সংহিতার আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিলে ও বিচার সহকারে ইহার তাৎপর্য্যার্থ বুঝিয়া লইলে, তাহার সংস্কার অল্পে অল্পে চিত্তে দৃঢ়নিবিষ্ট হইয়া যায়। অনন্তর তাহার বিশুদ্ধা বাক্‌বৃত্তি আগমন করে৬।৭। অর্থাৎ প্রথমতঃ শব্দব্যুৎপত্তি জন্মে; শব্দ ব্যুৎপত্তি জন্মিলে তদ্দ্বারা অনায়াসে মহত্ত্বগুণশালী তাদৃশ অর্থচাতুর্য্য (বাক্যার্থ জ্ঞান) লাভ করা যায়—যাদৃশ অর্থচাতুর্য্যে অমরসদৃশ পূজনীয় মহীপতিরাও স্নেহাকৃষ্ট হইয়া থাকেন৮। প্রদীপ যেমন রজনী সময়ে বস্তু দর্শনের সহায়তা করে, তেমনি, এই সংহিতাও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনার সাহায্য করিয়া থাকে৯। (নর এই সংহিতার দ্বারাই বুদ্ধিমান্ হয় এবং কার্য্য কারণ বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করে)৯। যেমন শরৎ সময় সমাগত হইলে মিহিকা বিদূরিত হয় (মিহিকা=কুজ্ঝটিকা অথবা জলকণাবর্ষণ), দিঙ্মণ্ডল প্রসন্ন হয়, তেমনি

এই সংহিতা শ্রবণ করিলে লোভ মোহ প্রভৃতি দোষ দূরীভূত ও বুদ্ধি মলশূন্যা হয়[১০]। রাম! তোমার বুদ্ধি মলশূন্যা হইয়াছে, প্রসন্না হইয়াছে, এখন কেবল বিবেকাভ্যাসের অপেক্ষা আছে। ক্রিয়া বিবেকাভ্যাস ব্যতীত ফলপ্রদা হয় না[১১]। সমুদ্রমন্থনের পর মন্দর পর্ব্বত যথাস্থানে স্থাপিত হইলে ক্ষীরোদ সমুদ্র যদ্রূপ অক্ষুব্ধ বা বিক্ষেপ বিরহিত (স্থির) হইয়াছিল, বিবেকাভ্যাসে মন সেইরূপ স্থির হয় ও শরৎকালের সরোবরের ন্যায় নিতান্ত স্বচ্ছ হইয়া থাকে[১২]। যেমন রত্নরূপ দীপের শিখা অন্ধকার নিরাকরণ করতঃ উদ্ভাসিত হয়, সেইরূপ, পদার্থতত্ত্বপ্রকাশিনী প্রজ্ঞাও সমুদায় ব্যামোহ কজ্জল দূরীকৃত করিয়া তত্ত্ব প্রকাশ করতঃ প্রজ্বলিত হইতে থাকে[১৩]। সায়ক যেমন বর্ম্মাচ্ছাদিত শরীর ভেদ করিতে অসমর্থ হয়, তেমনি, বিবেক বুদ্ধির দ্বারা ধনাদি বিষয়ের অসারতা প্রতীত হইলে দৈন্যদারিদ্রাদি দুর্দ্দশার দর্শন লুপ্ত হইয়া যায়। তখন আর সে সকল মর্ম্মান্তিক যাতনা প্রদান করে না[১৪]। মহোপল যেমন সায়কপাতে নির্ভিন্ন হয় না, তেমনি, এই পুরোবর্ত্তী ভয়ানক সংসার প্রাজ্ঞ পুরুষের হৃদয় বিচলিত করিতে সমর্থ হয় না[১৫]। হে সৌম্য! যেমন দিবসাগমে অন্ধকার দূরে পলায়ন করে, তেমনি, বিবেকাগমে "আগে জন্ম? কি আগে কর্ম্ম? দৈব প্রবল? কি পুরুষকার প্রবল?" ইত্যাদিবিধ সংশয় তিরোহিত হইয়া থাকে[১৬]। বৎস! প্রজ্ঞা যামিনীর অবসানে আলোকোদয়ের ন্যায় বিচারের অনন্তর বিকসিত হইয়া থাকে, তাহাতে সমুদায় রাগদ্বেষাদি দোষ অন্তর্হিত হয়[১৭]। অধিক কি বলিব, বিচারশীল ব্যক্তি সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর, মেরুর ন্যায় ধীর ও চন্দ্রের ন্যায় সুশীতল হইয়া থাকেন[১৮]।

মনুষ্য বিচারমার্গের অনুসরণ করিলে জ্ঞান প্রভাবে সমুদায় ভেদদৃষ্টি দূরীভূত করিয়া জীবন্মুক্ত হইতে পারে। তখন তাঁহার বুদ্ধি শরৎ জ্যোৎস্নার ন্যায় যার পর নাই নির্ম্মল, শীতল ও সুপ্রকাশ হয়[১৯।২০]। রাগদ্বেষ প্রভৃতি যে সকল ভয়াবহ দোষ ধূমকেতুর ন্যায় সর্ব্বদা অনর্থপরম্পরা সংঘটন করে, সে সকল দোষ বিবেকরূপ আদিত্যের শমরূপ আলোকে উদ্ভাসিত হৃদয়াকাশে লব্ধপ্রসর অর্থাৎ স্থান প্রাপ্ত হয় না[২১]। শরৎকালে জলধরপটল যেরূপ স্থিরভাবে পর্ব্বত আশ্রয় করিয়া থাকে, বিচারশীল পুরুষগণ সেইরূপ শান্ত ও পবিত্র হইয়া তৃষ্ণা পরিহার পূর্ব্বক

অবিচলিতচিত্তে আত্মপদে অধিষ্ঠান করেন[২২]। যেমন দিবসাগমে পিশাচগণের আনন ম্লানি প্রাপ্ত হয় তেমনি জ্ঞান হইলে পরনিন্দা পরবিদ্বেষ অশ্লীল বাক্য এ সকল থাকে না। সমস্তই দূরে পলায়ন করে[২৩]। তাঁহাদের বুদ্ধি আত্মভিত্তিতে এরূপ দৃঢ়সংলগ্ন ও ধৈর্য্য এরূপ দৃঢ়নিবদ্ধ হইতে দেখা যায় যে, বায়ু যেমন চিত্রলিখিত লতা বিচলিত করিতে পারে না, তেমনি তাঁহাদের বুদ্ধিকে ও ধৈর্য্যকে কোন প্রকার উৎপাত আসিয়া বিকৃত করিতে পারে না[২৪]। তত্ত্ববিৎ কখন বিষয়সঙ্গাত্মক মোহগর্ত্তে নিপতিত হন না। কবে কোন্ পথাভিজ্ঞ পুরুষ ইচ্ছা করিয়া গভীর গহ্বরে পতিত হইয়াছে?[২৫] সাধ্বী স্ত্রী যেমন অন্তঃপুরচত্বরেই রমমানা হন, থাকিতে ভাল বাসেন, তেমনি, সাধুলোকের বুদ্ধিও অবিরুদ্ধ কার্য্যে রত থাকে, তাহার অন্যথা হয় না। সৎশাস্ত্রের আলোচনার দ্বারা যাঁহাদের চিত্তচরিত্র পবিত্র হইয়াছে তাঁহারা সাধ্বী পতিব্রতা ও রমণীয়া স্ত্রীর অন্তঃপুরচত্বরে পরম পরিতোষ প্রাপ্তির ন্যায় পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অর্থাৎ সাধুরা অবিরোধী কার্য্যের অনুসরণেই পরিতোষ লাভ করেন[২৬]। সঙ্গমুক্ত পুরুষেরা লক্ষ কোটি জগতের অন্তর্গত অনন্ত পরমাণু সমসংখ্যক পৃথক্ পৃথক্ ব্রহ্মাণ্ড অবলোকন করিয়া থাকেন। * তাঁহাদের দৃষ্টিতে সমস্তই মায়ার কার্য্য সুতরাং কিছুই অসম্ভব নহে। যাঁহার অন্তঃকরণ মোক্ষোপায়পরিজ্ঞানে শান্তস্বভাব হইয়াছে, এই সকল ভোগবৃন্দ তাঁহাকে বিষণ্ণ বা আনন্দিত করিতে পারে না[২৭।২৮]। তিনি প্রত্যেক পরমাণুতে জলে তরঙ্গের ন্যায় অনবরত উৎপদ্যমান সৃষ্টিপরম্পরা দেখিতে পান, দেখিয়া বিস্মিত হন না[২৯]। কার্য্যের ও ফলের স্বরূপ জানিতে পারেন অথচ অচেতন পাদপের ন্যায় অনিষ্টাপাতে বিরক্ত ও ইষ্টলাভে হৃষ্ট হন না[৩০]। তাঁহারা প্রাকৃত জনের ন্যায় নির্ব্বিকার চিত্তে যদৃচ্ছাপ্রাপ্ত বিষয়েই পরিতোষের সহিত অবস্থান করেন[৩১]।

হে রঘুকুলচন্দ্র রাম! তুমি এই শাস্ত্র সম্যক্‌রূপে অবগত হও ও শ্লোকে শ্লোকে তাৎপর্য্য পর্য্যালোচন কর এবং যথাবথ বিচার করিয়া তত্ত্ব অবগত হও। গুরুতর লোকের অথবা দেবতাদিগের বর অথবা শাপ

* অভিপ্রায় এই যে, যেমন পরমাণু অসংখ্য, তেমনি, সৃষ্টিপরম্পরাও অসংখ্য। জ্ঞানীরা ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সমুদায় সৃষ্টি জ্ঞানগোচর করিয়া থাকেন এবং বুঝিয়া থাকেন—সমুদায় সৃষ্টিই মায়িক।

যেমন উক্তিমাত্রে অনুভূত হয় (বুঝা যায় বা ফল দেখা যায়), ইহা সেরূপ নহে। এতদুক্ত তত্ত্বের অনুভব বা ফলদর্শন বিচারসাপেক্ষ[৩২]। বৎস! এই শাস্ত্র কাব্যশাস্ত্রের ন্যায় সুখবোধ্য। ইহা নানাবিধ রসে ও অলঙ্কারে ভূষিত ও দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে[৩৩]। যিনি কিঞ্চিন্মাত্র পদপদার্থবোধবিশিষ্ট তিনি ইহা স্বয়ং অর্থাৎ আপনা আপনি বুঝিতে পারিবেন। না পারিলে যত্নসহকারে পণ্ডিত মুখে শ্রবণ করা উচিত[৩৪]। যাহা শ্রবণ, মনন ও হৃদয়ঙ্গম করিলে মনুষ্যের তপস্যা, দান, ধ্যান ও জপ প্রভৃতি সমস্তই মোক্ষপ্রাপ্তির উপযোগী হয়, সেই বস্তু এতৎসংহিতায় প্রব্যক্ততর আছে[৩৫]। সত্য সত্যই এই শাস্ত্রের পুনঃ পুনঃ অভ্যাসে ও পুনঃ পুনঃ পর্য্যবেক্ষণে জীবের চিত্তে সংস্কার সহ অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্য উদ্ভূত হইয়া থাকে[৩৬]। তখন "আমি দ্রষ্টা, জগৎ আমার দৃশ্য" এই দ্রষ্টৃ-দৃশ্য-বিভাগরূপ পিশাচ যত্ন না করিলেও সূর্য্যোদয়ে যেমন অন্ধকারের উপশম হয় তেমনি আপনা আপনি উপশম প্রাপ্ত হইবে[৩৭]। যেমন মনঃকল্পিত নগরস্থ মনুষ্যকে শোক হর্ষাদির দ্বারা নিপীড়িত হইতে দেখা যায় না, তেমনি, এই ভ্রমসমুদ্ভূত জগৎ প্রপঞ্চ পরিজ্ঞাত হইলে তখন আর ইহা পীড়াদায়ক হয় না[৩৮]। যদি জানা যায়, ইহা চিত্রলিখিত সর্প, তাহা হইলে যেমন সে সর্প ভয় সমুৎপাদন করে না, তেমনি, এই দৃশ্য জগতের তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইলে তখন আর ইহা সুখ বা দুঃখ দুএর কিছুই জন্মায় না[৩৯।৪০]। যেমন চিত্রলিখিত সর্প পরিজ্ঞাত হইলে পরিজ্ঞানপ্রভাবে তাহার সর্পত্ব অপগত হয়, তেমনি, এই সংসারের আধার পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে তখন আর ইহা থাকিতে পারে না, আধারে বিলীন হইয়া যায়[৪১]।

রাম! কোমলতর পুষ্প ও পত্র সূচীবিদ্ধ করিতে হইলে যত্নাতিশয়ের আবশ্যক হয় কিন্তু পরমার্থপদ পাইতে অল্পমাত্রও আয়াস অবলম্বন করিতে হয় না[৪২]। ভাবিয়া দেখ, অঙ্গ পরিচালন ব্যতিরেকে পুষ্পপত্রাদি ভেদ করিতে পারা যায় না; কিন্তু কোনরূপ শরীরচালনা না করিয়া কেবলমাত্র মনোবৃত্তির অবরোধ দ্বারাই পরমার্থপদ লাভ করিতে পারা যায়[৪৩]। সুখাসনে উপবেশন, যথাসম্ভব ভোজন, ভোগবাসনাবিসর্জ্জন, সদাচারবিরুদ্ধ পথের অননুসরণ, দেশ কাল ও পাত্র অনুযায়ী পথের বিচার, সাধুসঙ্গের অনুবর্ত্তন, মদুক্ত এই শাস্ত্রের ও অন্যান্য মোক্ষশাস্ত্রের

আলোচনা, এই সকল উপায়ে সংসারশান্তিজনক পরমাত্মবোধ সুসম্পন্ন হইয়া থাকে—যে পরমাত্মবোধ উৎপন্ন হইলে কস্মিন্ কালেও পুনঃসংসার-পীড়া হয় না[৪৪।৪৬]। যে সকল ভোগবিলাসী পাপাত্মারা এততেও চৈতন্ত লাভ করে না, সংসার-ভয়ে ভীত হয় না, তাঁহারা স্বীয় জননীর বিষ্ঠাকৃমি ব্যতীত অন্য কিছু নহে; তাহাদের নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ করা অবিধেয়[৪৭]।

হে রামচন্দ্র! সম্প্রতি আমি যে জ্ঞানশাস্ত্র বর্ণন করিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। ইহা অত্যন্ত পরিশুদ্ধচিত্ত মহাত্মাদিগের অন্তরঙ্গ অবলম্বন। অপিচ, যে দৃষ্টান্তের ও পরিভাষার দ্বারা শাস্ত্রার্থ পর্য্যালোচনা করা যায় তাহাও বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর[৪৮।৪৯]। যে দৃষ্ট বস্তুর সাধর্ম্ম্য গ্রহণে অদৃশ্য পদার্থের বোধ উৎপাদন করা যায়, পণ্ডিতগণ তাহাকে দৃষ্টান্ত আখ্যা প্রদান করিয়া থাকেন। অননুভূত পদার্থে অনুভূতি প্রবেশ করানই দৃষ্টান্তের ফল[৫০]। রাম! বিনা দৃষ্টান্তে অপূর্ব্ব ও অজ্ঞাত বস্তু বুঝা ও বুঝান যায় না। প্রদীপ ব্যতিরেকে কি অন্ধকার রজনীতে গৃহোপকরণ দেখিতে ও দেখাইতে পারা যায়? তাহা যায় না[৫১]। হে কাকুৎস্থ! আমি তোমাকে যে সকল দৃষ্টান্তের দ্বারা তত্ত্ববোধ প্রদান করিব, বুঝাইব, জানিবে যে সে সমস্তই সকারণ অর্থাৎ অনিত্য পদার্থ। কিন্তু যাহা সে সমুদায়ের প্রাপ্য বা বোদ্ধব্য, তাহা অকারণ অর্থাৎ কাহার কার্য্যভূত নহে (নিত্যনির্ব্বিকার)। অতএব, উপমান উপমেয়ের অর্থাৎ দৃষ্টান্তের দার্ষ্টান্তিকের মধ্যে যে যে কার্য্যকারণভাব বর্ণিত হইল, বুঝিতে হইবে যে, তাহা পরব্রহ্ম ব্যতীরেকে অন্য সমুদায় স্থানে বিদ্যমান আছে। অপিচ, ব্রহ্মোপদেশ কালে আমি তোমাকে যে সকল দৃষ্টান্ত দেখাইব; বুঝিতে হইবে যে, তাহা সর্ব্বাংশে সমান নহে। তাহা কোন এক সাধর্ম্ম্য (সাদৃশ্য) লইয়া বলা হইয়াছে। অপিচ, ব্রহ্মতত্ত্ব-নিরূপণার্থ যে যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইবে, সে সমস্তই জগদন্তর্গত; সেজন্য তাহা স্বপ্নজাত দ্রব্যের ন্যায় মিথ্যা[৫২।৫৫]। বৎস! নিরাকার পরব্রহ্মে কি প্রকারে আকারবান্ দৃষ্টান্ত সঙ্গত হইতে পারে? ইত্যাদি ইত্যাদি কথা মূর্খ-দিগের বিকল্প কল্পনা ব্যতীত অন্য কিছু নহে। একাদ্বয় ব্রহ্মতত্ত্বে কোন বিকল্প স্থান প্রাপ্ত হয় না এবং অঘটনঘটনাপটীয়সী মায়াকে কোনও পূর্ব্বপক্ষ আক্রম করিতে সমর্থ হয় না[৫৬]। তার্কিকগণ যে, হেতু

সাধ্যাদির অসঙ্গততা ও বিরুদ্ধতা প্রভৃতি দোষ উদ্ভাবন করেন, সে সকল দোষ স্বপ্নতুল্য মিথ্যা জগতে উদিত বা স্থির থাকিতে পারে না[৫৭]।

বৎস! ভাবিয়া দেখ, জাগ্রদ্ বস্তু ও স্বপ্নদৃষ্টবস্তু উভয়ের কিছুমাত্র প্রভেদ বা ইতর বিশেষ নাই। স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু যদ্রূপ মিথ্যা, জাগ্রদ্দৃষ্ট বস্তুও তদ্রূপ মিথ্যা। যাহা উৎপত্তির পূর্ব্বে ও বিনাশের পর অভাবগ্রস্ত থাকে ও হয়, বুঝিতে হইবে, তাহা বর্ত্তমানেও অভাবগ্রস্ত অর্থাৎ নাই। স্বপ্ন, সংকল্প, আধ্যান, বর, শাপ ও ঔষধাদির বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে অবশ্যই জগতের স্বপ্নতুল্যতা বোধগম্য হইবে। তখন দৃষ্টান্ত ভাবের ফলোপধায়কতা দৃষ্ট হইবে[৫৮।৫৯]। মোক্ষোপায় বিধাতা বাল্মীকি ও অন্যান্য অধ্যাত্মশাস্ত্রের প্রণেতৃগণ পূর্ব্বরামায়ণ প্রভৃতি যে সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, সে সকল গ্রন্থে বোধ্যবোধন বিষয়ে একই রীতি বা ব্যবস্থা পরিগৃহীত হইয়াছে, জানিবে[৬০]। শাস্ত্র শ্রবণ করিলে জগতের স্বপ্নতুল্যতা বুঝা যায় সত্য; পরন্তু তাহা শীঘ্র নহে। তাহার কারণ, বাক্যমাত্রেই ক্রমবর্ত্তিনী। যেহেতু ক্রমবর্ত্তিনী, সেই হেতু শীঘ্র বুঝাইতে পারে না। (জগৎ মিথ্যা নহে কিন্তু সত্য, এ সংস্কার অল্প দিনে যায় না। অল্পে অল্পে দীর্ঘকালে উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়)[৬১]। যেহেতু জগৎ বাস্তবাংশে স্বপ্ন ও মনোরাজ্য প্রভৃতির সহিত সমান, সেইহেতু এবম্বিধ অধ্যাত্মশাস্ত্রে স্বপ্নাদি ব্যতীত অন্য কোন দৃষ্টান্ত গৃহীত হয় নাই[৬২]। এতদ্বিধ অধ্যাত্মশাস্ত্রে কেবল বুঝাইবার নিমিত্তই কারণ ভাবের দৃষ্টান্ত পরিগৃহীত হইয়া থাকে। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্ম সর্ব্বাংশে দৃষ্টান্তের অনুরূপ নহেন[৬৩]। সেইজন্যই বুদ্ধিমান্ অধিকারীরা তত্ত্ববোধের নিমিত্ত উপমেয় পদার্থে উপমানের কোন এক সাধর্ম্ম্য গ্রহণ করিয়া থাকেন, সর্ব্বসাদৃশ্য গ্রহণ করেন না[৬৪]। বস্তু দেখাই প্রয়োজন, তাহাতে কেবল দীপালোকেরই উপযোগ। তৈল ও বর্ত্তি প্রভৃতির উপযোগ নাই। একমাত্র আলোকই তাহার উপায়, তৈলাদি তাহার উপায় নহে[৬৫]। বৎস! প্রদীপ যেমন প্রভার দ্বারা বস্তু জ্ঞান জন্মায়, তেমনি উপমানের একদেশসাধর্ম্ম্যও উপমেয়ের প্রতীতি জন্মায়[৬৬]। দৃষ্টান্ত স্বীয় অংশের সামর্থ্যে বোধ্য বিষয়ে বোধ উৎপাদন করিলে তখন "অহং ব্রহ্মাস্মি" ইত্যাদি মহাবাক্যের অর্থাবধারণ হইয়া থাকে[৬৭]। কুতার্কিকগণ বিদ্বান্ দিগের অনুভব অপলাপ করতঃ অপবিত্র বিকল্প কল্পনায় দ্বারা

কদাচ পরমার্থপ্রবোধযোগ্য অভিজ্ঞান নষ্ট করিতে পারে না[৬৮]। হে অনঘ! সেই সেই মহাবাক্য অবিচারশীল ও অজ্ঞানীর পক্ষে বৈরি বলিয়া পরিগণিত হইলেও * বিচারের পর তত্ত্বানুভব জন্মায় বলিয়া সে সকল আমাদের নিকট প্রমাণ। অত্যন্ত প্রেয়সী স্ত্রী (পাণিগৃহীতী) পরমার্থশূন্য বৈদিক বাক্য বলিলেও তাহা অস্মদাদির নিকট অপ্রমাণ অর্থাৎ প্রলাপ বাক্য মাত্র। যে বুদ্ধির দ্বারা তত্ত্বসাক্ষাৎকার ও জীবন্মুক্তি লাভ হয়, আমরা সেই বুদ্ধিকে অধ্যাত্মশাস্ত্রোক্ত শ্রৌত মহাবাক্যার্থের পরিণাম-বিশেষ বলিয়া অবগত আছি। সে বোধ প্রত্যক্ষ ও পরম পুরুষার্থের অদ্বিতীয় কারণ। পরমপুরুষার্থ লাভের প্রতি মহাবাক্য শ্রবণ ব্যতীত কারণানন্তর নাই, ইহা আমাদের সুস্পষ্টরূপে জানা হইয়াছে[৬৯।৭০]।

অষ্টাদশ সর্গ সমাপ্ত।

* "অহং ব্রহ্মাস্মি" ইত্যাদি মহাবাক্য সর্ব্বত্যাগী হইতে বলে, সংসারচ্যুত করিয়া মোক্ষ জন্মায়, তাহা শুনিয়া জ্ঞানহীন সংসারী লোক ঐ সকল মহাবাক্যকে নিকৃষ্ট ও শত্রু মনে করে।

ঊনবিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, বৎস রামচন্দ্র! উপমান স্থলে বিশিষ্টাংশেরই সাধর্ম্ম্য পরিগৃহীত হইয়া থাকে। অর্থাৎ যে অংশ বিবক্ষিত, সেই অংশের সহিত যাহার তুলনা দৃষ্ট হইবে, উপমানের সেই অংশই গৃহীতব্য। অন্যথা; উপমান ও উপমেয় উভয়কে সর্ব্বাংশে সুসদৃশ বা সমান করিতে গেলে প্রভেদ থাকে না। প্রভেদ না থাকিলেও উপমান উপমেয় ব্যবহার উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়[১]। অতএব, বিবক্ষিত প্রকার দৃষ্টান্তের দ্বারা অখণ্ড আত্মতত্ত্ব প্রতিপাদক শাস্ত্রের তাৎপর্য্য জ্ঞান সুস্থির হইলে "অহং ব্রহ্ম" ইত্যাদি মহাবাক্যের দ্বারা অদ্বয়ব্রহ্মবিষয়িনী মানসী বৃত্তি উদিত হইয়া অজ্ঞান ও অজ্ঞান কল্পিত ভেদ জ্ঞানের (তুমি, আমি, জগৎ, এইরূপ এইরূপ জ্ঞানের) শান্তি করে। এই শান্তি অধ্যাত্মশাস্ত্রে নির্ব্বাণ নামে প্রসিদ্ধ ও তাহা বিবক্ষিত দৃষ্টান্তের ফল[২]। দৃষ্টান্ত দার্ষ্টান্তিক লইয়া যে কুতর্ক আছে, তত্ত্বজিজ্ঞাসু সে সকল ত্যাগ করিয়া কোন এক অনুকূল যুক্তির অনুসরণ পূর্ব্বক দৃঢ়তা সহকারে, যাহা অহংব্রহ্মাস্মি প্রভৃতি মহাবাক্যের অর্থ—তাহারই আশ্রয় গ্রহণ করিবেন[৩]। রাম! শান্তিই পরম শ্রেয়, তুমি তাহারই উপার্জ্জনে যত্নবান্ হও। অন্নই ভোক্তব্য, তাহা পাইলে কেমন করিয়া অন্ন প্রস্তুত করা যাইবে, কি উপায়ে তাহার প্রাপ্তি হয় এবং তাহা কেনই বা হয়, এ সকল তর্কের প্রয়োজন কি[৪]। এই শাস্ত্রে, কেবল সেই অনির্ব্বাচ্য উদ্দেশ্য বোধগম্য করাইবার জন্যই কোন এক ঐকদেশিক সাদৃশ্য গ্রহণ পূর্ব্বক উপমান উপমেয়ের ব্যবহার করা হয়। সুতরাং উপমান কেবল প্রবৃত্তির ও বোধের কারণ হয়, আর আর অংশে অকারণ অর্থাৎ উদাসীন থাকে। "ঔষধ খাও—খাইলে তোমার ভ্রাতার মত শিখা বড় হইবে" এই উপমান বাক্য যেমন বালকের ঔষধ পান প্রবৃত্তির কারণ হয়, এবং শিখা বৃদ্ধির অকারণ অর্থাৎ ঔষধ পান শিখা বৃদ্ধির কারণ হয় না, এতৎ শাস্ত্রের উপমানকেও সেইরূপ জানিবে[৫]। প্রস্তরের মধ্যে এক প্রকার ভেক থাকে, তাহারা বিশেষ পুষ্ট (মোটা ও বড়) ও অন্ধ। এই সংসারে বিবেকবিহীন হইয়া

কেবল মাত্র ভোগসুখে সেই সকল ভেকের ন্যায় কাল্পাতিপাত করা কর্ত্তব্য নহে[৬]। দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তন করতঃ যাহাতে পরম পদ জয় করা যায় তাহার বিষয় চেষ্টা করা কর্ত্তব্য এবং তদর্থে বিচারশীল হওয়া ও শাস্তি শাস্ত্রের অনুশীলন করা অবশ্য বিধেয়[৭]। অধিকারী নর যত্ন সহকারে পরম পদ পাইবার চেষ্টা, শাস্ত্রোপদেশ গ্রহণ, সৌজন্য, প্রজ্ঞা ও সৎসঙ্গ, এই সকল অবলম্বন করতঃ যথাযথ বিধানে ধর্ম্মার্থের অর্জ্জন ও যাবৎ না বিশ্রান্তিসুখ সমুৎপন্ন হয় তাবৎ আত্মতত্ত্বের বিচার করিবেন। করিলে বিনাশবর্জ্জিত তুরীয় নামক পদ সম্পন্ন হইবেই হইবে[৮।৯]। যে ব্যক্তি তূর্য্যবিশ্রান্তি (ব্রহ্মনির্ব্বাণ) প্রাপ্ত হন, সে ব্যক্তি গৃহী হউন, যতি হউন, ভবসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইবেন এবং তাহার ঐহিক পারত্রিক সমুদায় ফলই সুসম্পন্ন হইবে[১০]। তাহার কর্ম্মে ও কর্ম্মত্যাগে, শ্রবণে ও মননে, কিছুতেই প্রয়োজন থাকেনা। যেমন মন্দরক্ষোভরহিত মহাসাগর স্থির ভাবে অবস্থান করে; তেমনি, তিনিও বিকাররহিত স্থিরতায় অবস্থিতি করিয়া থাকেন[১১]।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বোধ্যবোধের নিমিত্তই উপমানের এমন এক অংশ গ্রহণ করিতে হইবে যে যাহার সদৃশ বলিবা মাত্র উপমেয়ের স্বরূপ প্রতীতিগোচর হইতে পারে। যাহাতে বোধ্য পদার্থ হৃদয়ঙ্গম করা যায় তাহা করাই কর্ত্তব্য, বোধচঞ্চু হওয়া উচিত নহে[১২]। * (বোধচঞ্চু=মুখ-পাণ্ডিত্য) বোধচঞ্চু না হইয়া যে কোন উপায়ে বোদ্ধব্য বস্তু বুঝিয়া লওয়া উচিত। বোধচঞ্চু হইলে, খণ্ডনের জন্যই মন ব্যাকুল থাকিবে, বৈধাবৈধ নির্ণয়ে সমর্থ হইবে না[১৩]। হৃদয়ের মধ্যে জ্ঞানময় আকাশে যে নিরুপদ্রব অনুভূতির বস্তু বিদ্যমান আছে, যাহারা তাহাতে অনর্থের আরোপ করে, তাহারা একপ্রকার বোধচঞ্চু। অর্থাৎ তাহারা তত্ত্বজ্ঞানফল লইয়া বৃথা বিবাদ করে। হে সৌম্য! যে সকল অনভিজ্ঞ ব্যক্তি পাণ্ডি-ত্যাদির অভিমানে কুতর্ক উদ্ভাবন পূর্ব্বক জ্ঞান ও জ্ঞান সাধন বিষয়ের স্থৈর্য্য দর্শনে অসমর্থ হয়, তাহারাও অন্য এক প্রকার বোধচঞ্চু। এই দ্বিতীয় প্রকারের বোধচঞ্চুরা মেঘ যেমন নির্ম্মল আকাশকে মলিন ও

---

* চঞ্চু=পাখীর ঠোঁট। তাহা তাহাদের ফলবৃন্ত খণ্ডনের নিমিত্ত মুখে অবস্থিত থাকে, অন্তঃপ্রবিষ্ট হয় না। যাহাদের বোধ বা জ্ঞান হৃদয়প্রবিষ্ট হয় না, কেবল পরমত খণ্ডনের নিমিত্ত মুখেই অবস্থান করে, তাহারা বোধচঞ্চু। ইহার ভাষা কথা মুখপাণ্ডিত্য।

আচ্ছন্ন করে তেমনি নিজ জ্ঞানকে আচ্ছন্ন ও মলিন করিয়া থাকে। (জ্ঞান=বোধশক্তি বা চৈতন্যরূপী আত্মা)[১৪।১৫]। রামচন্দ্র! সমুদ্র যেমন সমুদায় জলের মুখ্য আধার, তেমনি, প্রত্যক্ষ সমুদায় প্রমাণের প্রামাণ্যের মুখ্য আশ্রয়। সেই কারণে অতঃপর আমি তাদৃশ প্রত্যক্ষের যথাযথ লক্ষণ বর্ণন করিব তাহা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর[১৬]। যেমন সমুদায় প্রমাণের সার ইন্দ্রিয় (ইন্দ্রিয় না থাকিলে কোনও প্রমাণ থাকে না সুতরাং প্রমাণের সার ইন্দ্রিয়)। তেমনি, সমুদায় ইন্দ্রিয়ের সার চেতন (চৈতন্য। চৈতন্য না থাকিলে অন্ধ ইন্দ্রিয়ে কি কার্য্য হইতে পারে?) জ্ঞানিগণ এই মূল চৈতন্যকে মুখ্য বা প্রধান প্রত্যক্ষ বলিয়া জানেন। এই চৈতন্য নামা মূল প্রত্যক্ষের অবচ্ছেদভাব, আশ্রয়ভাব ও বিষয়ভাব "আমি ঘট জানিতেছি" এই সম্মিলিত আকারে প্রকাশ পায় এবং ঐ সম্মিলিত ত্রিভাবের নাম ত্রিপুটী। * ত্রিপুটী বোধসিদ্ধ; পরন্তু ঐ ত্রিপুটীবোধও প্রত্যক্ষ বলিয়া গণ্য[১৭]। ত্রিপুটীর প্রথম প্রকাশ হওয়ার বা উদয়ের নাম অনুভূতি, অনন্তর তাহার অনুপ্রকাশ অর্থাৎ অনুভবনীয়রূপের প্রকাশ বেদন, অনন্তর যিনি জীবপদাভিধেয়, তিনিই মনোবৃত্তিরূপ উপাধির যোগে ঐ তিনের পৃথক পৃথক প্রকাশ (আমি, ঘট, জানিতেছি) নির্ব্বাহ করিতেছে। সে প্রকাশ প্রতিপত্তি নামে খ্যাত। অনুভূতি, বেদন, প্রতিপত্তি, এই তিন্ নামের অক্ষরার্থ ত্যাগ না করিয়া যে, তত্রিতয়ব্যাপী এক অবিচ্ছিন্ন স্বাধীন চৈতন্য স্ফুরিত হয়, সেই চেতনা বা চৈতন্য এই অধ্যাত্মশাস্ত্রের মুখ্য প্রত্যক্ষ এবং তাহাই এতৎশাস্ত্রোক্ত সাক্ষি-চৈতন্য। এই সাক্ষি-চৈতন্যই প্রাণধারণ কালে জীব[১৮]। এই জীবই সংবিৎ অহং ও প্রত্যয় উপস্থিত হইয়া পুরুষ অর্থাৎ প্রমাতা (প্রমাজ্ঞানের আধার)। তিনি যে সংবিৎ দ্বারা আবির্ভূত হন তাহারই অন্য নাম পদার্থ অর্থাৎ বিষয়[১৯]। জল যেমন তরঙ্গাদিরূপে প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ, সেই পরমাত্মা নামক অদ্বয় নিত্য সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বাবভাসক চৈতন্য বস্তু স্বগত সঙ্কল্প বিকল্পাদি প্রভৃতির সমষ্টির দ্বারা জগৎরূপে প্রকাশ পাইতেছেন[২০]।

সৃষ্টির পূর্ব্বে ইনি এক ও অকারণরূপে বিরাজিত ছিলেন, পরে

* জ্ঞাতা, জ্ঞান, জ্ঞেয়, এই তিন ভাব ত্রিপুটী নামে খ্যাত। আত্মা আমি, ইহা, ও দেখিতেছি, এই তিন ভাবে সর্ব্বদাই উদিত হইতেছে।

সৃষ্টির প্রারম্ভে সৃষ্টিলীলাবশতঃ আপনিই আপনাতে কারণভাব উত্থাপিত করিলেন[২১]। সেই কারণভাব অবিচার অর্থাৎ অনির্ব্বাচ্য অজ্ঞান। অনির্ব্বাচ্য অজ্ঞান বা অবিচার, মায়ার প্রভাবে সমুদিত এবং তাহা পরম প্রকৃতিতে অভিব্যক্ত। সেই অভিব্যক্তিই এক্ষণে জগৎ[২২]। এখন বুঝিতে পারিলে যে, জগৎ আত্মপ্রকৃতি অজ্ঞানের বপু অর্থাৎ শরীর এবং অজ্ঞান ও অজ্ঞান-শরীর জগৎ উভয় অভিন্ন বৈ ভিন্ন নহে। বিচার আত্মারই প্রকাশ-বিশেষ এবং তাহা আত্মাতেই আবির্ভূত হয়। হইয়া অবিচারের অর্থাৎ জগদ্বপুঃ অজ্ঞানের বিনাশ করে। সেই জন্যই তখন বিচারবান্ পুরুষ পরম মহৎ বা অপরিচ্ছিন্ন প্রত্যক্ষে অব্যবহিত হন[২৩]। এই সময় সেই বিচারবান্ পুরুষ আপনাকে জানিতে পারেন এবং তখন বিচারও নিবৃত্ত হয় অর্থাৎ বিচার তখন নিরল্লেখ্য বা শব্দাদির অবিষয়ীভূত একমাত্র পরব্রহ্মে পর্য্যবসিত হয়[২৪]। মন বৃত্তিশূন্য অর্থাৎ শান্ত হইলে তখন বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও কর্ম্ম, সমস্তই বাধিত হইয়া যায় সুতরাং তখন কার্য্য অকার্য্য ও ইচ্ছাদি কোন কিছুর প্রয়োজন থাকে না। মন ইচ্ছাদিবিহীন ও শান্ত হইলে কর্ম্মেন্দ্রিয়েরাও তখন অসঞ্চালিত যন্ত্রের ন্যায় স্থিরভাবে অবস্থিতি করে[২৫]।[২৬]। অভ্যন্তরস্থ রজ্জু যেমন কাষ্ঠপ্রণালীগত (জল চলিবার নালীর আকার খোদাই করা কাষ্ঠ) দারু নির্ম্মিত মেষদ্বয়ের পরস্পর শিরোবিঘট্টনের কারণ, তেমনি, পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ বেদন-ভাবই (বেদনভাব=বিষয়াকার জ্ঞান) মনোযন্ত্র প্রচলনের কারণ[২৭]। স্পন্দন যেমন বায়ুরই অন্তর্গত, তেমনি, রূপালোক ও মনস্কার এবং পদার্থ ও বিষয়, এ গুলিও পূর্ব্বোক্ত বেদ-নের (বিষয়স্ফূর্ত্তির) অন্তর্গত। বাহ্যেন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয় গ্রহণ রূপা-লোক এবং মনের দ্বারা বিষয়ানুসন্ধান মনস্কার। উভয়ের আশ্রয় পদার্থ বা বস্তু। জগৎ এই তিনে পরিব্যাপ্ত[২৮]। সেই বিশুদ্ধ সর্ব্বাত্মা সর্ব্বরূপী বেদন (জ্ঞান) পরতত্ত্ব প্রাণিকর্ম্মানুসারে যখন যেরূপে সমুদিত হন তখন সেইরূপেই প্রকাশিত হন। বাহিরে যে-কিছু দৃশ্য, সমস্তই সেই পরতত্ত্বের বেশ (রূপ)[২৯]। এই পরতত্ত্বই দেহাদি দৃশ্যাভাস দৃষ্টে তাহাতেই নিজরূপ ধারণ করিতেছেন অর্থাৎ জীব ভাবে প্রকাশ পাই-তেছেন[৩০]। এই সর্ব্বাত্মা পুরুষ যে দেশে, যে কালে, যে বস্তুতে, যে রূপে প্রকাশমান হন, সেই দেশে সেই কালে সেই বস্তুতে সেই রূপেই তিনি বিরাজমান ইহা বিজ্ঞাত হইতে হইবে[৩১]। রামচন্দ্র! যেমন

ভ্রমপ্রযুক্ত রজ্জুতে সর্পজ্ঞান হইয়া থাকে, সেইরূপ, জগৎ ও সেই সর্ব্বদর্শী দ্রষ্টার বৃথা দৃশ্য হইয়া প্রকাশ পাইতেছে। পরন্তু বিচারোদয়ে ভ্রম তিরোহিত হইলে তখন আর এ সকল দৃশ্য বাস্তবিক বলিয়া বোধ হইবে না। যেহেতু চিদ্রূপী দ্রষ্টা সর্ব্বাত্মক, সেই হেতু তাহার দৃশ্যতুল্য হওয়া অযুক্ত নহে; প্রত্যুত যুক্ত অর্থাৎ যুক্তিসিদ্ধ। দ্রষ্টার স্বভাবেই দৃশ্যভাব আভাসিত হয় বলিয়া দৃশ্যভাব অবাস্তব[৩২]। অতএব, সৃষ্টির পূর্ব্বে অদ্বয় অকারণ (নিত্যসিদ্ধ) চিদ্বস্তু বিদ্যমান ছিলেন, যিনি এখন নানা কল্পনায় বিরাজ করিতেছেন, তিনিই অর্থাৎ সেই পরম তত্ত্বই মুখ্য প্রত্যক্ষ। এই মুখ্য প্রত্যক্ষ হইতেই অনুমানাদির প্রবৃত্তি এবং এই মুখ্য প্রত্যক্ষেই সে সকলের পর্য্যবসান দেখা যায়। সুতরাং অনুমানাদি মুখ্য প্রত্যক্ষের অংশবিশেষ ব্যতীত অন্য কিছু নহে। সমুদায় কথার সারার্থ এই যে, আত্মাই প্রমাণ সমূহের তত্ত্ব (সার) এবং কার্য্য ও কারণ মিথ্যা[৩৩]। হে সাধো! যিনি প্রযত্ন সহকারে এই পরব্রহ্মের উপাসনা করেন, তিনি দৈব শব্দ দূরে পরিহার করিয়া স্বীয় পৌরুষ বলে সেই উত্তম পদ প্রাপ্ত হন। হে রামচন্দ্র! যাবৎ স্বীয় বুদ্ধির দ্বারা সেই অনন্তরূপ পরব্রহ্ম সাক্ষাৎকার না করিবে তাবৎ আচার্য্যপরম্পরানুসারী হইয়া বিচারপরায়ণ থাকিবে[৩৪।৩৫]।

উনবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

বিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, প্রথমে সাধুসহবাস ও যোগ চর্চ্চা এই দুয়ের দ্বারা প্রজ্ঞা বর্দ্ধিত করিবে। অনন্তর শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট মহাপুরুষলক্ষণ দ্বারা আপনাকে মহাপুরুষ রূপে পরিণামিত করিবে[১]। যদিও একাধারে সমুদায় সদ্‌গুণ না দেখিতে পাও, তবে, যে পুরুষ যে উত্তম গুণে শোভমান হন, সে পুরুষকে ইতরাপেক্ষা বিশিষ্ট বিবেচনা করিয়া সেই পুরুষের নিকট সেই গুণের অনুশীলন করিবে এবং তদ্দ্বারা বুদ্ধিকে সমুন্নত করিবে[২]। রাম! শমাদিগুণশালিনী মহাপুরুষতা সম্যক্ জ্ঞান ব্যতিরেকে উৎপন্না হয় না[৩]। যেমন নবাঙ্কুর সকল বৃষ্টিপ্রভাবেই উপচিত হয়, সেইরূপ, জ্ঞান হইতেই শমাদিগুণপরম্পরা উপস্থিত হইয়া অভীষ্ট ফল প্রসব করিয়া থাকে[৪]। যেরূপ অন্নাত্মক যজ্ঞের দ্বারা ধান্যাদি অন্নের উৎপাদক জল বর্ষণ প্রাদুর্ভূত হয়, তেমনি, শমাদি গুণ হইতেই তত্ত্বজ্ঞান সমুন্নত হইয়া থাকে[৫]। ফলতঃ সরোবর ও পদ্ম এই দুএর অনুরূপ জ্ঞান ও শমাদি গুণ পরস্পর পরস্পরের সাহায্যে পরিবর্দ্ধিত ও পরিশোভিত হয়[৬]। জ্ঞান ও সদাচার পরস্পর পরস্পরের বৃদ্ধির কারণ। সদাচার হইতে জ্ঞানের বৃদ্ধি এবং জ্ঞান হইতে সদাচারের প্রাবল্য সিদ্ধ হইয়া থাকে[৭]। বুদ্ধিমান্ পুরুষ প্রজ্ঞায় ও শমাদি গুণে নিপুণ হইয়া পুরুষার্থ প্রাপ্তির অনুরূপ জ্ঞান ও সদাচার এই দুএর অনুশীলন করিবেন[৮]। হে তাত! জ্ঞান ও সদাচার একত্র অনুশীলিত না হইলে উভয়ের মধ্যে কোনটিই সুসিদ্ধ হইবে না[৯]। অধিক কি বলিব, যেমন পরিপক্বশালিক্ষেত্ররক্ষিণী নারী গীতির (গানের) দ্বারা বিহগ সমুদয় উৎসাদিত করে ও তৎসঙ্গে গীতিজনিত আনন্দ অনুভব করে, সেইরূপ, কর্ত্তৃরূপী অকর্ত্তা ও অস্পৃহ পুরুষ জ্ঞান ও সদাচার দ্বারা সম অর্থাৎ অদ্বয় পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন[১০।১১]।

হে রঘুনন্দন! আমি তোমার নিকট সদাচার পদ্ধতি কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে জ্ঞান পদ্ধতি বর্ণন করি, শ্রবণ কর[১২]। সদ্বুদ্ধিশালী নর এই যশস্য, আয়ুষ্য ও পুরুষার্থফলপ্রদ সৎশাস্ত্র অভিজ্ঞ আপ্ত গুরুর নিকট শ্রবণ করিবেন[১৩]। জল যেমন কতক যোগে (কতক—নির্ম্মল নামক

জল) কলুষতা ত্যাগ করিয়া স্বচ্ছ হয়, তেমনি, তুমি ইহা সৎসকাশে শ্রবণ করিলে তোমার বুদ্ধি নিশ্চিত মলপরিশূন্যা হইবে এবং তুমিও পরম পদ প্রাপ্ত হইবে[১৭]। হে বৎস! ইহার অনুশীলন দ্বারা মননশীল ব্যক্তির অন্তঃকরণ বেদ্য বিষয়ে অনুধাবন করতঃ অনায়াসেই পরম পুরুষার্থ লাভ করিতে পারক হয়, এবং যাহা সর্ব্বদা জাগরূক ও অখণ্ডরূপে বিরাজিত সেই অনুত্তম পদ তাহা হইতে বিচলিত হয় না[১৮]।

বিংশ সর্গ সমাপ্ত।

মুমুক্ষু ব্যবহার প্রকরণ সম্পূর্ণ।

বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণ।

উৎপত্তিপ্রকরণ।

প্রথম সর্গ।

ব্রহ্মই মহাবাক্যের প্রভাবে ব্রহ্মবিৎ হন, এ কথার অর্থ এই যে, যিনি এক্ষণে জীব, তিনি চতুর্ব্বিধ মহাবাক্য * শ্রবণজনিত অনন্তাদ্বয়ব্রহ্মাকারা মানসী বৃত্তির (জ্ঞানের) দ্বারা উজ্জ্বলিত হইয়া জীবত্ব প্রাপক স্বাশ্রিত অজ্ঞান বিদূরিত করিয়া ব্রহ্মভাবে প্রকাশিত হন। তাদৃশ স্বাত্মপ্রকাশের নাম ব্রহ্মজ্ঞান ও স্বতত্ত্বসাক্ষাৎকার। যেমন স্বপ্নের আবির্ভাব, তেমনি, এই দেহেন্দ্রিয়াদি দৃশ্যপ্রপঞ্চের আবির্ভাব। এ আবির্ভাব প্রত্যগাত্মরূপ † পরব্রহ্মে, অন্যত্র নহে। অতএব স্বশব্দের দ্বারা অর্থাৎ "এই চরাচর সমুদায় বিশ্ব ব্রহ্ম" এইরূপ এইরূপ মহাবাক্যের দ্বারা যিনি কথিত প্রকার স্বাত্মরহস্য অবগত হন, তিনিই ব্রহ্মজ্ঞ বা ব্রহ্মবিৎ[১]। যাহা বলিলাম, তাহাই ব্রহ্ম-বিজ্ঞানের সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি। এই পদ্ধতি দ্ব্যংশ। এক অংশের নাম অধ্যা-রোপ, অপর অংশের নাম অপবাদ। অধ্যারোপ পদ্ধতিরই একাংশে অর্থাৎ অধ্যারোপ পদ্ধতিতে, ব্রহ্মরূপ আকাশে সৃষ্টি এবং অপবাদ পদ্ধতিতে তাহার ব্রহ্মাবশেষতা বুঝা যায়। ‡ এই সৃষ্টি ব্রহ্মাবশেষ বা ব্রহ্মাকাশে পরিশেষিত (লুপ্ত) হইলেই তখন ইহা কি, কাহার সৃষ্টি, এবং ইহা কিসে আছে, এ সকল

* সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম, বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম, তত্ত্বমসি, অহং ব্রহ্মাস্মি, এই ৪ মহাবাক্য ৪ বেদে প্রসিদ্ধ।

† শরীরের মধ্যে যে সর্ব্বদ্রষ্টা চৈতন্য বিরাজিত, যাহা অবলম্বন করিয়া অহং বৃত্তি অর্থাৎ আমিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহাই এতৎ শাস্ত্রের প্রত্যগাত্মা।

‡ প্রায় আকাশের অনুরূপ, তাই শাস্ত্রকারেরা ব্রহ্মকে কখন কখন আকাশ নামে উল্লেখ করেন। অধ্যারোপ শব্দে কল্পিত সৃষ্টি এবং অপবাদ শব্দে সেই সেই কল্পনার লয়। কল্পনার লয় হইলে তখন সৃষ্টি থাকে না; কল্পনাধার ব্রহ্মই থাকেন। ব্রহ্মার কল্পনায় সৃষ্টি, ব্রহ্মার লয়ে প্রলয়। সেইজন্য এক এক সৃষ্টির নাম এক এক কল্প।

পূর্ব্বপক্ষের তিরস্কার হইয়া থাকে[২]। এই বিষয়ের বিবরণ জ্ঞান, বস্তু, ক্রম ও স্বভাব অনুসারে ব্যক্ত করিব, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর[৩]। বিশ্বাস করিতে হইবে যে, আত্মা চিদাকাশবপু অর্থাৎ আত্মার স্বরূপ আকাশের ন্যায় নিরাকার এবং তাহা কেবল চৈতন্য। তদ্ব্যতীত অন্য কোন আকার নাই। তিনি জীব হইয়া জগৎ দেখিতেছেন, পরন্তু তাহা স্বপ্নদর্শনের অনুরূপ। যেমন, বস্তু না থাকিলেও স্বপ্নে তাহার দর্শন হয়, তেমনি, জগৎ না থাকিলেও তাহার দর্শন ঘটনা হইতেছে। তুমি, আমি, ইত্যাদি ভেদ না থাকিলেও তাহা স্বপ্নের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। সেইজন্য স্বপ্নের সহিত সংসারের তুলনা করা হয়[৪]।

আমি তোমার নিকট মুমুক্ষু ব্যবহারের বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছি, এক্ষণে জগতের উৎপত্তির বিষয় কীর্ত্তন করি, শ্রবণ কর[৫]।

দৃশ্য বা দৃশ্যের জ্ঞান আছে বলিয়াই বন্ধন। সুতরাং দৃশ্যের বা দৃশ্য জ্ঞানের অভাব ঘটনা হইলে তখন আর বন্ধন থাকে না। যে প্রকারে দৃশ্য বা দৃশ্যের জ্ঞান অভাবগ্রস্ত হয়, তাহা বলি, শ্রবণ কর[৬]।

এই নশ্বর জগতে যে-জন্মে, সেই বৃদ্ধি পায়, সে-ই মরে, সেই মুক্ত হয় এবং স্বর্গে অথবা নরকে গমন করে[৭]। (ইহাই বদ্ধ জীবের গতি)। যে হেতু তুমি নিজের স্বরূপ না জানায় বদ্ধ আছ, সেই হেতু আমি তোমার নিকট তোমার আত্মবোধার্থ সংসারে তোমার উৎপত্তি হওয়ার প্রকার বর্ণন করিব[৮]। এই প্রকরণের প্রতিপাদ্য—সংসারের উৎপত্তি। তাহা প্রথমতঃ সংক্ষেপে বলি, শ্রবণ কর, অনন্তর ইচ্ছানুসারে ইহার বিস্তৃতার্থ শ্রবণ করিও[৯]।

স্বপ্ন যেমন সুষুপ্তিতে বিলীন বা লয় প্রাপ্ত হয়, তেমনি, এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎও মহাপ্রলয়ে বিনষ্ট হইয়া থাকে[১০]। তৎকালে এক-মাত্র ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন, অন্য কিছু থাকে না। সমস্তই লুপ্ত হয়। তখন না তেজ, না অন্ধকার, না নাম, না রূপ, কিছুই থাকে না। কেবল মাত্র সৎ অর্থাৎ প্রলয়কারী পরব্রহ্মমাত্র অবশিষ্ট থাকেন[১১]। পণ্ডিতগণ বাগ্ব্যবহারার্থ সেই নামহীন পরমাত্মার ঋত, আত্মা, পরব্রহ্ম, সত্য, ইত্যাদি নাম কল্পনা করিয়া থাকেন[১২]। তিনি শুদ্ধচিৎস্বভাব হইলেও সৃষ্টিকালে আপনিই আপনার মায়ায় বিভিন্নরূপে বিবর্ত্তিত হইয়া বিবিধ নাম সমন্বিত জীব ভাব পরিগ্রহ করিয়া থাকেন[১৩]।

(তাঁহাকে ব্রহ্মা ও হিরণ্যগর্ভ বলে)। অনন্তর সেই জীবভাব প্রাপ্ত পরমাত্মা আপনার বিবিধরূপ প্রদর্শন বাসনায় প্রথমতঃ মন, তদনন্তর মনন, ইত্যাদি কাল্পনিক ভেদ পরিকল্পন করেন। যেমন সুস্থির সাগর হইতে অস্থির তরঙ্গের উৎপত্তি হয়, তেমনি, নির্ব্বিকার পরমাত্মা হইতে প্রথমে সবিকার মন (হিরণ্যগর্ভের মন) প্রাদুর্ভূত হয়[১৪।১৫]। সেই মন তখন স্বেচ্ছানুসারে প্রতিনিয়ত নানাপ্রকার কল্পনা করে এবং তাহা হইতেই এই জগদ্রূপ ইন্দ্রিয়জাল বিস্তৃত হইয়া থাকে[১৬]। যেমন কাঞ্চনবলয় কাঞ্চন হইতে ভিন্ন নহে; কিন্তু কাঞ্চন কাঞ্চনবলয় হইতে ভিন্ন; তেমনি, পরমাত্মা এই জগৎ হইতে ভিন্ন না হইলেও ইহা পরমাত্মা হইতে ভিন্ন। অর্থাৎ ইহা পরমাত্মায় অবস্থিত। পরমাত্মা স্বসত্তায় অবস্থিত; জগৎ তাহার অধীন। অর্থাৎ জগতের পৃথক্ সত্তা নাই। জগতে যে সত্তা (অস্তিতা) আছে, তাহা ব্রহ্মসত্তার অনতিরিক্ত[১৭।১৮]। যেমন মরু-মরীচিকায় নদীতরঙ্গের ভ্রম, তেমনি, পরমাত্মাতেই এই ইন্দ্রজালময় জগতের ভ্রম[১৯]। সেই কারণে তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ এই জগতের অবিদ্যা, সংসৃতি, বন্ধ, মোহ, তম, এই কয়েকটী নাম প্রদান করিয়া থাকেন[২০]।

বৎস চন্দ্রানন রাম! আমি প্রথমে তোমার নিকট বন্ধের স্বরূপ কীর্ত্তন করি, পরে মোক্ষের স্বরূপ বর্ণন করিব[২১]। দর্শনকর্ত্তার দৃশ্য-পদার্থের সহিত যে সম্বন্ধ, তাহাই তাহার বন্ধন। দ্রষ্টাই দৃশ্যের দ্বারা বদ্ধ এবং দৃশ্যের অভাবে মুক্ত[২২]। "তুমি, আমি" ইত্যাদিবিধ মিথ্যা বিজ্ঞানই জগৎ ও দৃশ্য নামে অভিহিত হয়। যাবৎ ঐরূপ জগৎ বা মিথ্যা জ্ঞান (ভ্রম) বিদ্যমান থাকিবে, তাবৎ মুক্তিলাভের আশা করা যায় না[২৩]। কেবল মুখে প্রলাপ বাক্যের ন্যায় "ইহা নাই তাহা নাই এ সকল মিথ্যা" ইত্যাদিবিধ বাক্য উচ্চারণ করিলে দৃশ্যবোধরূপিণী ব্যাধির শান্তি হয় না; অধিকন্তু তাহা বৃদ্ধিই পায়[২৪]। বিচারকগণ বলিয়াছেন, তর্কের কৌশলে, তীর্থের সেবায় ও নিয়মাদির অনুষ্ঠানে দৃশ্যদর্শন ব্যাধির শান্তি হয় না[২৫]। এই দৃশ্য জগৎ যদি সত্য সত্যই থাকে, তাহা হইলে কদাচ ইহার অন্যথা (না থাকা) হইবে না। কারণ, অসতের সত্তা ও সতের অসত্তা সর্ব্বথা অসম্ভব[২৬]। চিন্ময় আত্মা অচেত্য অর্থাৎ জ্ঞান-সম্পর্কবর্জ্জিত অজ্ঞার তপস্যাদির অপরিজ্ঞেয়। ইহ শরীরে যিনি আত্মদর্শনে বঞ্চিত, তিনি ধর্ম্ম কর্ম্মের বলে যেখানে যাইবেন, অবস্থিতি করিবেন;

সেই স্থানেই তাঁহার দৃশ্য দর্শন হইবে। এমন কি পরমাণু মধ্যে প্রবেশ করিলেও এরূপ দৃশ্য দর্শন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবেক না[২৭]। * সেই জন্যই আমি জগৎ থাকিলেও তাহার দৃশ্যভাব পরিমার্জ্জন অর্থাৎ পরিত্যাগ করিয়াছি। † যেমন "সুরা ভক্ষণে তৃপ্তি নাই" এতদ্রূপ দৃঢ়সম্বোধ ব্যতীত সুরাপান পরিত্যক্ত হয় না, তেমনি, "দৃশ্য জগৎ মিথ্যা" এতদ্রূপ দৃঢ় বোধ ব্যতীত কেবল তপস্যায়, কেবল দানে, কেবল ধ্যানে ও কেবল জপে জগৎ দর্শন মন হইতে উন্মার্জ্জিত হইবে না[২৮]। হে রামচন্দ্র! যাবৎ জগতের দৃশ্যতা বোধ থাকিবে, তাবৎ, পরমাণু মধ্যে বাস করিলেও ক্ষুদ্র দর্পণে বৃহৎ বস্তুর প্রতিবিম্বপাতের ন্যায় সঙ্কীর্ণতম বুদ্ধিপ্রদেশে ইহার (জগতের) প্রতিবিম্বপাত হইবেই হইবে[২৯]। চিদ্দর্পণ (জীব) যেখানেই থাকুক, সেই স্থানেই তাহাতে শরীরাদি ও পর্ব্বত, পৃথিবী, নদ, নদী, জল প্রভৃতি, সমস্তই প্রতিবিম্বিত হইবে[৩০] এবং তন্নিবন্ধন পুনঃ পুনঃ দুঃখ, জরা, মরণ, জন্ম, এবং জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি, এই তিন অবস্থা, পদার্থের স্থূল সূক্ষ্ম বিভাগ ও স্থির অস্থির বিভাগ, সে সকলের অভাব অর্থাৎ লয়, সমস্তই দৃষ্ট হইবে[৩১]। রাম! এমন মনে করিও না যে, জ্ঞান-নিরপেক্ষ সবিকল্প সমাধি আয়ত্ত করিলে দৃশ্য মার্জ্জন হইবে। কারণ এই যে, সমাধিকালেও সংসারের সংস্কার থাকে। সমাধিকালেও "আমি দৃশ্য দেখিতেছি না, তাহা মার্জ্জন করিয়া অবস্থিতি করিতেছি" এইরূপ বোধ বা বোধসংস্কার বিদ্যমান থাকে। সেইজন্য সমাধি ভঙ্গের পর তাহার স্মরণ হয়। সেই স্মরণই পুনঃ সংসারের অক্ষয়বীজ এবং সেই বীজ পুনঃ পুনঃ সংসারাঙ্কুর প্রসব করে। যদিও নির্ব্বিকল্প সমাধিকালে মানবগণ তুরীয় পদ পাইবে বলিয়া আশা করে, তথাপি, দৃশ্য জ্ঞান সম্পূর্ণরূপ লুপ্ত না হওয়ায় নির্ব্বিকল্প সমাধির সম্ভাবনা অতীব অল্প[৩২।৩৩]।০ যেমন সুষুপ্তির অবসানে সমুদায় পূর্ব্বতন জ্ঞানের

* দৃশ্য দর্শনের বীজ ভ্রান্তি, তাহা থাকিতে কুত্রাপি পরিত্রাণ নাই। ভ্রান্তি পরমাণুমধ্যেও বৃহৎ পর্ব্বৎ দেখাইতে পারে।

† এই জগৎ আছে ও দেখা যাইতেছে, সুতরাং ইহা সত্য, এ ভাব পরিত্যাগ করিতে হয়। নাই ও দেখা যাইতেছে না, যাহা আছে ও দেখা যাইতেছে, তাহা আত্মা অর্থাৎ আমি, এই ভাব অভ্যস্ত করিতে হয়। করিলে ক্রমে ক্রমে দৃশ্যমার্জ্জন হইবে, তখন আর ইহা থাকিলেও বন্ধনের কারণ হইবেক না।

উদয় হয়, তেমনি, সমাধি হইতে উত্থিত হইলেও পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ অখণ্ডিত দুঃখ পরিপূর্ণ জগৎ প্রতিভাত হইয়া থাকে[৩৪]। রামচন্দ্র! পুনর্ব্বার অনর্থ ভোগে নিপতিত হইতে হয়, এরূপ ক্ষণিক সমসুখদায়ক সমাধিতে ফল কি[৩৫]। যদি এমন হয় যে, কস্মিন্ কালেও নির্ব্বিকল্প সমাধি ভঙ্গ হইবে না, তাহা অনন্তকালে অনন্ত প্রবাহে স্থিতি করিবে, তাহা হইলে অবশ্য অনাদি অনন্ত সুষুপ্তিসম অমল ব্রহ্ম পদ লাভ হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব[৩৬]। কারণ এই যে, মনোনামক মূল দৃশ্য বিদ্যমান থাকিতে যত্নবান্ যোগীরাও দৃশ্য মার্জ্জনে অশক্ত হইয়া থাকেন। নিশ্চিত জানিবে, তাদৃশ চিত্ত যে যে বিষয়ে নিবিষ্ট হইবে সেই সেই বিষয়েই জগদভ্রম থাকিবেই থাকিবে[৩৭]। দ্রষ্টা যদি আপনাকে বলপূর্ব্বক পাষাণ ভাবনায় ভাবিত করিয়া পাষাণপরিণামে স্থাপিত করিয়া অবস্থান করেন, তাহা হইলে, সে পরিণামের অবসানে পুনর্ব্বার তাহার দৃশ্য দর্শন হইবেই হইবে[৩৮]। অপিচ, এ পর্য্যন্ত কোনও যোগীর নির্ব্বিকল্প সমাধি পাষাণতুল্য স্থিতিপ্রবাহ প্রাপ্ত হয় নাই, হইবার সম্ভাবনাও নাই, ইহা অনুভবসিদ্ধ[৩৯]।

নির্ব্বিকল্প সমাধি নিত্যপাষাণতুল্য স্থিতিপ্রবাহ (চিরস্থৈর্য্য) লাভ করে না ইহা সর্ব্ববিদিত। করিলেও তাহা (অচেতনপাষাণভাবপ্রাপক সমাধি) সচ্চিদানন্দ অজ অক্ষয় মোক্ষ নামক পরম পদের প্রাপক নহে[৪০]। হে রামচন্দ্র! তপ, জপ ও ধ্যান করিলে দৃশ্যের বিনাশ, অদর্শন বা পরিহার সাধিত হয় না। দৃশ্য কি? দৃশ্য কেবল আত্মনিষ্ঠ অজ্ঞানের বিজৃম্ভণ (কল্পনা)। সুতরাং আত্মাশ্রিত অজ্ঞানের বিনাশ ব্যতীত দৃশ্য বিনাশের সম্ভাবনা নাই[৪১]। যেমন পদ্মবীজের মধ্যে ভবিষ্যৎ পদ্মের বীজ লুক্কায়িত থাকে, তেমনি, দ্রষ্টাতে (চিদাত্মায়) দৃশ্যবুদ্ধি লুক্কায়িত অর্থাৎ সংস্কাররূপে নিহিত থাকে[৪২]। পদার্থ বিশেষের আশ্রয়ে রস, তিলে তৈল ও কুসুমে প্রমোদ (সুগন্ধ যেরূপ), দর্শনকর্ত্তাতে দৃশ্যবুদ্ধি সেই-রূপ জানিবে[৪৩]। কর্পূরাদি পদার্থ যে স্থানে থাকুক না কেন, সেই সেই স্থানে গন্ধ উদ্ভব করিবেই করিবে। সেইরূপ, জীবভাবাপন্ন চিদাত্মা যে অবস্থায় ও যেখানে থাকুন, তদীয় উদরে জগতের উদ্ভব হইবেই হইবে[৪৪]। হৃদয় প্রদেশেই অর্থাৎ স্বীয় বুদ্ধিতত্ত্ব মধ্যেই স্বপ্নের ও সঙ্কল্পাদির ন্যায় দৃশ্যের আবির্ভাব হইয়া থাকে, স্বকীয় অনুভব তাহার পুষ্কল দৃষ্টান্ত।

যেমন স্বচিত্তের কল্পনাপ্রভব পিশাচ বালক গণকে বিনাশ করে, তেমনি, এই দৃশ্যরূপিণী রূপিকা (পিশাচী) দ্রষ্টাকেই হনন করিয়া থাকে[৪৫]।[৪৬]। * যেরূপ বীজের অন্তর্গত অঙ্কুর উপযুক্ত দেশ কাল প্রাপ্তে কাণ্ড প্রকাণ্ডযুক্ত (শাখা প্রশাখান্বিত) বৃহৎ বৃক্ষ হয়; সেইরূপ, অন্তঃস্থ চিৎসংযুক্ত চিত্তে সংস্কাররূপে অবস্থিত দৃশ্যজ্ঞানও দেশ কাল ও অবস্থাদিক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়[৪৭]। যেমন বীজাদির উদরে বৃক্ষশক্তি অথবা অপূর্ব্ব কার্য্যশক্তি (অঙ্কুরোৎপাদিকা শক্তি) বিদ্যমান থাকে, সেইরূপ, চিন্মাত্রশরীর জীবের অন্তরে (জীব কি? জীব চিৎ ও অন্তঃকরণ উভয়ের একীভাব। অন্তঃকরণ মায়িক। এই মায়িক অন্তঃকরণে) মায়াময় অপ্রতর্ক্য জগৎ অবস্থিত রহিয়াছে[৪৮]।

প্রথম সর্গ সমাপ্ত।

* এক শ্রেণীর পিশাচী আছে তাহারা স্ত্রীরূপ ধারণ করিয়া পুরুষ দিগকে মুগ্ধ করতঃ বিনাশ করে। এই শ্রেণীর পিশাচীরা রূপিকা নামে অভিহিতা হয়। বোধ হয়, ইহারাই চলিত ভাষায় "পেতনী"। দৃশ্যদর্শন অর্থাৎ জগদ্দর্শন তাহারই অনুরূপ বলিয়া রূপিকা বলা হইয়াছে। বালকেরা ভূতের ভয়ে বিহ্বল হয়, অনেকে ভয় পাইয়া মরিয়া যায়, পরন্তু ভূত তাহারই অমার্জ্জিত বুদ্ধির কল্পনা ব্যতীত অন্য কিছু নহে। বালক যেমন নিজ কল্পিত ভূত দেখিয়া মরণ পর্য্যন্ত দুরবস্থা প্রাপ্ত হয়, তেমনি, জীবও স্বীয় কল্পিত দৃশ্য দেখিয়া অভিভূত হয় ও জন্মাদিযুক্ত সংসার নামক দুরবস্থাগ্রস্ত হয়।

দ্বিতীয় সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাঘব! তোমার নিকট আকাশজ ব্রাহ্মণের শ্রুতি-সুখাবহ উপাখ্যান বর্ণন করি, শ্রবণ কর। তাহা শুনিলে উচ্যমান উৎপত্তিনামক প্রকরণ সম্যকরূপে বোধগম্য করিতে পারিবে[১]।

পূর্ব্বে আকাশজ নামে * প্রজাহিতপরায়ণ ধ্যাননিষ্ঠ পরম ধার্ম্মিক এক ব্রাহ্মণ ছিলেন[২]। মৃত্যু ইঁহারে চিরজীবী দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, "আমি অবিনাশী। অপিচ, আমি একে একে সকল প্রাণীকেই উদরসাৎ করি[৩]। কিন্তু কি জন্য এই আকাশজ ব্রাহ্মণকে ভক্ষণ করিতে পারিতেছি না? যেমন শাণিত খড়্গের ধার প্রস্তরে কুণ্ঠিত বা ব্যর্থ হয়, তেমনি, এই ব্রাহ্মণে আমার সেই ভক্ষণ শক্তি ব্যর্থ হইতেছে কেন? তাহা ভাল করিয়া দেখা যাউক[৪]।" মৃত্যু এইরূপ চিন্তা করিয়া ব্রাহ্মণের সংহারার্থ তদীয় পুরে গমন করিলেন। কোনও উদ্যোগশীল পুরুষ স্বকার্য্যসাধনে উদ্যম ত্যাগ করেন না; সুতরাং মৃত্যুও স্বকার্য্যসাধনের উদ্যোগ ত্যাগ করিলেন না[৫]। বৎস রাম! মৃত্যু তদীয় পুরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র, প্রলয়াগ্নিসন্নিভ হুতাশন তাঁহারে দগ্ধ করিতে লাগিল[৬]। তথাপি তিনি সেই অগ্নি বিদারণ পূর্ব্বক গৃহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। অনন্তর ব্রাহ্মণকে দেখিয়া প্রযত্ন সহকারে তাঁহার হস্তাকর্ষণ করিবার ইচ্ছা করিলেন[৭]। মৃত্যু অতিশয় বলবান্ ছিলেন, তথাপি সবলে শত হস্ত বিস্তার করিয়াও সেই সঙ্কল্পপুরুষসদৃশ ব্রাহ্মণকে স্পর্শ করিতে পারিলেন না[৮]। তখন তিনি সকল সংশয়ের উচ্ছেদকর্ত্তা যমের নিকট গমন পূর্ব্বক কহিলেন, প্রভো! আমি কি জন্য আকাশজ ব্রাহ্মণকে ভক্ষণ করিতে পারিতেছি না?[৯] যম কহিলেন, মৃত্যো! তুমি একাকী কাহাকেও সংহার করিতে সমর্থ নহ। মারণীয় ব্যক্তির মরণোপযোগী

* মায়াশক্তিশবলিত ব্রহ্ম আকাশসদৃশ। আকাশে নীলিমা নাই, অথচ তাহা নীল বলিয়া ভ্রম জন্মে। আকাশ যেমন নীল ভ্রমের আশ্রয়, তেমনি, ব্রহ্মও মায়াসঙ্গের আশ্রয়। তদনুসারে ব্রহ্ম আকাশ সদৃশ বলিয়া আকাশ নামের নামী। যিনি তাঁহা হইতে প্রথম উৎপন্ন হন তিনি আকাশ-সদৃশ হন। এই আকাশ সদৃশ আকাশজ ব্রাহ্মণ অর্থাৎ সামান্য ব্রাহ্মণ নহেন। ইনি পুরাণ বর্ণিত ব্রহ্মা ও হিরণ্যগর্ভ।

কর্ম্ম ব্যতিরেকে কেহই মারণীয় ব্যক্তিকে সংহার করিতে সমর্থ নহে। কর্ম্মই প্রকৃত মারক, অন্যে প্রকৃত মারক নহে[১০]। তুমি এক কার্য্য কর। তুমি যত্ন সহকারে ঐ মারণীয় বিপ্রের কর্ম্ম সমুদায় অন্বেষণ কর, পরে উহার মারক কর্ম্মের সাহায্যে উহাকে সংহার করিও[১১]।

অনন্তর মৃত্যু আকাশজ দ্বিজের কর্ম্মান্বেষণে যত্নপরায়ণ হইয়া বহুকাল পর্য্যন্ত দিক্, দিগন্ত, সরিৎ, সরোবর, অরণ্য, শৈল, সমুদ্র, দ্বীপ, পুর, নগর, গ্রাম ও রাষ্ট্র প্রভৃতি নানাস্থান পর্য্যটন করিলেন। উদ্ধতস্বভাব মৃত্যু প্রোক্ত প্রকারে সমুদায় পৃথিবী পরিভ্রমণ পূর্ব্বক কোনও স্থানে আকাশজ ব্রাহ্মণের কোনও প্রকার কর্ম্ম দেখিতে পাইলেন না। যেমন কোনও বিজ্ঞ বন্ধ্যাপুত্র দেখিতে পায় না, এক পুরুষ যেমন অন্য পুরুষের মনোরাজ্যস্থ পর্ব্বত দেখিতে পায় না, সেইরূপ[১২।১৫]। তখন তিনি দুঃখিত মনে ধর্ম্মকোবিদ ধর্ম্মরাজ সমীপে পুনঃ প্রত্যাগত হইলেন। নিয়ম এই যে, প্রভুরাই অনুজীবী দিগের সংশয়চ্ছেদের অদ্বিতীয় উপায়। সুতরাং মৃত্যু প্রভু সকাশে আসিয়া বলিলেন, প্রভো! আকাশজ বিপ্রের কর্ম্ম সমুদায় কোথায়? নির্দ্দেশ করুন।

ধর্ম্মরাজ অনেক ক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, মৃত্যো! আকাশজ বিপ্রের কর্ম্ম নাই। এই ব্রাহ্মণ আকাশ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল; সে জন্য ইহার কোনও প্রকার কর্ম্ম নাই[১৬।১৮]। যে আকাশ হইতে জন্মে, সে-ও আকাশের ন্যায় নির্ম্মল হয়। সেই জন্য ইহার কোনও রূপ কর্ম্ম বা সহকারী লক্ষিত হইতেছে না[১৯]। প্রাক্তন কর্ম্মের সহিতও ইহার কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই।* ইহার কোনও প্রকার আকার উৎপন্ন হয় নাই এবং ইহার উৎপত্তিও বন্ধ্যাপুত্রের উৎপত্তির অনুরূপ[২০]। ইহার জন্মের প্রতি আকাশ ব্যতীত উপাদান না থাকায় ইহাকে আকাশ ভিন্ন অন্য কিছু বলা যায় না। ইনি কেবল আকাশ হইতে জন্মিয়াছেন সুতরাং ইনিও কেবল আকাশ। যেমন আকাশে মহাবৃক্ষ থাকে না, তেমনি, ইহাতে পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের অভাব দৃষ্ট হয়[২১]। কর্ম্ম না থাকায় ইহার চিত্তও অবশীভূত নহে। কি শরীর কি মানস সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মের অভাব

* মুক্ত হইলে পূর্ব্বের কর্ম্ম (পুণ্য পাপ) দগ্ধ হইয়া যায় এবং বর্ত্তমানে তাহার আশ্লেষ হয় না। জল যেমন পদ্মপত্রে লিপ্ত হয় না, তেমনি, মুক্তাত্মাতে পুণ্য পাপ লিপ্ত হয় না। ব্রহ্মা মুক্তাত্মা।

থাকায় ইনি নির্ম্মল আকাশরূপী ও স্বকারণ আকাশে (ব্রহ্মে) অবস্থিত[২২।২৪]। আমরা ভ্রমবশতঃই ইঁহার প্রাণস্পন্দনাদি দর্শন করিয়া থাকি; বস্তুতঃ ইঁহার কর্ম্মবুদ্ধি নাই[২৫]। কাষ্ঠপুত্তলিকাকে আপাত দৃষ্টি দ্বারা পুত্তলিকা বলিয়া বোধ হইলেও তাহা যেমন কাষ্ঠ হইতে অভিন্ন; তেমনি, এই দ্বিজও চিদাকাশে উৎপন্ন ও অবস্থিত হওয়ায় ও থাকায় চিদাকাশ হইতে অভিন্ন। যেমন জলে তরলতা, আকাশে শূন্যতা ও বায়ুতে স্পন্দতা স্বভাবতঃই অবস্থিত, তেমনি, ইনিও স্বভাবতঃ পরম পদে অবস্থিত। ইঁহার পূর্ব্বতন ও অদ্যতন কোনও প্রকার কর্ম্ম না থাকায় ইনি সংসারের অন্তর্গত (সংসারের বশ্য) নহেন। ইনি আপনিই আপনার কারণ। যে সহকারী কারণের সাহায্যে উৎপন্ন হয় না সে স্বকারণ হইতে অভিন্ন। কোন পৃথক্ কারণ বা সহকারী কারণ না থাকায় ইনি স্বয়ম্ভূ নামে বিখ্যাত। (স্বয়ম্ভূ=আপনিই হন)[২৬।৩০]। ইঁহার পূর্ব্বের ও এক্ষণকার কোন প্রকার কর্ম্ম নাই। অতএব, তুমি কি প্রকারে ইহাকে আক্রমণ করিবে তাহা বল। যে ব্যক্তি আপনাকে স্বীয় কল্পনায় পৃথিব্যাদিভূতবিশিষ্ট অর্থাৎ দেহী বলিয়া জানে; সেই পার্থিব ব্যক্তিকে তুমি গ্রহণ করিতে সমর্থ[৩১।৩২]। এই ব্রাহ্মণ আপনাকে পৃথিব্যাদিময়দেহবিশিষ্ট বলিয়া জানে না। সে প্রকার কল্পনাও কখন করে না। সেই কারণে ইনি সাকার নহেন। সেই কারণে অর্থাৎ নিরাকারতা বিধায় তুমি ইহাকে মারিতে পার না। রজ্জু দৃঢ় হইলেও কোন্ ব্যক্তি আকাশকে বন্ধন করিতে পারে?[৩৩]

মৃত্যু জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! আকাশ ও শূন্য একই কথা। শূন্য হইতে কি প্রকারে জন্ম হইল এবং কি প্রকারে তাহার অস্তিতা সিদ্ধ হয়? পৃথিব্যাদি ভূত কাহার থাকে ও কাহার না থাকে তাহাও আমাকে বলুন[৩৪]। যম বলিলেন, মৃত্যো! এই দ্বিজ কখনও জন্মগ্রহণ করেন নাই, এবং মরণগ্রস্তও হন না। (অর্থাৎ ইনি মুক্তাত্মা, জন্ম-মরণ-রহিত নিত্যসিদ্ধ অনাদি অনন্ত চিদ্বস্তু)। ইনি কেবল মাত্র বিজ্ঞানপ্রভা। সেই কারণে ইনি নিরাকাররূপে অবস্থিত[৩৫]। মহাপ্রলয় উপস্থিত হইলে তখন এই জন্মাদিরহিত সূক্ষ্ম নিরুপাধি সনাতন ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছু অবশিষ্ট থাকে না। তৎপরে অর্থাৎ সৃষ্ট্যারম্ভ কালে তাঁহার পুরোভাগে অদ্রির (অদ্রি=পর্ব্বত) ন্যায় অনিবার্য্য তেজোময়

বিরাট পুরুষ আবির্ভূত হন। এই দ্বিজ সেই বিজ্ঞানময় বিরাট পুরুষ। সেই সময়ে যে ইহার যৎ কিঞ্চিৎ স্ফূর্ত্তি উদিত হয়, সেই স্ফূর্ত্তি লক্ষ্য হওয়ায় আমরা মনে করি, ইনি আকারবান্। ফলতঃ আমাদেব সে দর্শন বা সে জ্ঞান স্বপ্নসদৃশ অসৎ; তাহা পরমার্থ সৎ নহে[৩৬।৩৮]। 'ইনি সেই ব্রাহ্মণ— যিনি সৃষ্টিপ্রারম্ভে পরমাকাশের উদরে নির্ব্বিশেষ চিদাকাশরূপে অবস্থান করেন[৩৯]। ইহার দেহ, কর্ম্ম, কর্ত্তৃত্ব বা প্রাক্তন কর্ম্ম, বা বাসনা, কিছুই নাই। ইনি বিশুদ্ধ চিদাকাশ, কেবল ও জ্ঞানঘন[৪০]। যেমন তেজের প্রভা; তেমনি ইনি বিজ্ঞানময় ব্রহ্মের প্রভা। অর্থাৎ প্রকাশ[৪১]। সেইজন্য ইনি আকাশ। ইনি সকলেরই অধিগম্য; অথচ কেহই ইহাকে দেখিতে পায় না। যিনি সর্ব্বদ্রষ্টা সাক্ষাৎ চৈতন্য, তাঁহাকে আবার কে কি দিয়া দেখিবে? যেমন চিদাকাশ, তেমনি ইনি; এবং ইহাকে যে আমরা জানি, আমাদের সে জানাও তদ্রূপ[৪২]। অতএব, কিরূপে ইহাতে পৃথিব্যাদির অবস্থান হইবে এবং কিরূপেই বা ইহাব সম্ভব (উৎপত্তি) হইবে? অতএব হে মৃত্যো! ইহার আক্রমণ বিষয়ে তুমি যত্ন পরিত্যাগ কর[৪৩]। কোন্ ব্যক্তি আকাশকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হয়? অনন্তর মৃত্যু ঐ কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন ও নিজ ভবনে গমন করিলেন।

রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! আমার বোধ হয়, আপনি সেই স্বয়ম্ভূ, অজ, একাত্মা, বিজ্ঞানস্বরূপ প্রপিতামহ ব্রহ্মারই কথা বলিলেন[৪৪।৪৫]। বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! হাঁ আমি তোমাকে সেই সনাতন ব্রহ্মার কথাই বলিয়াছি। পূর্ব্বে মৃত্যু ব্রহ্মাকে ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত উদ্যত হইলে যমের সহিত তাঁহার ঐরূপ কথোপকথন হইয়াছিল[৪৬]। মন্বন্তরকালে মৃত্যু যখন সর্ব্বভক্ষ হইয়া সমুদায় প্রজা বিনষ্ট করিতেছিলেন, সেই সময়ে বলপূর্ব্বক ব্রহ্মাকেও আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন[৪৭]। যে যাহা নিত্য করে, সে অভ্যাস বশতঃ অনুদিন তাহাই করিতে উদ্যত হয়। মৃত্যুও অভ্যাস বশতঃ অমৃত্যু ব্রহ্মার আক্রমণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। তাই ধর্ম্মরাজ মৃত্যুকে শাসন পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন যে[৪৮] এই ব্রহ্মা আকাশশরীর, ইহাকে তুমি কিরূপে আক্রমণ করিবে? ইনি সঙ্কল্পপুরুষের ন্যায় অবস্থিত ও পৃথিব্যাদিরহিত সুতরাং আকারবর্জ্জিত[৪৯]। যনি কেবল মাত্র চিদাকাশ ও অনুভবরূপী, তিনি চিদাকাশ (ব্রহ্ম)

ব্যতীত অন্য কিছু নহেন। তাঁহার কারণ (জনক) নাই এবং তিনি কাহার কার্য্যও (উৎপদ্য) নহেন[৩০]। যেমন এই ভৌতিক আকাশে পার্থিব আকার (যেন ইন্দ্রনীল নির্ম্মিত কটাহ উপুড় করা আছে বলিয়া) প্রকাশ পায়, যেমন মনোমধ্যে সঙ্কল্পরচিত মহাপুরুষ মূর্ত্তি স্ফূর্ত্তি পায়, তেমনি, ইনিও আপনিই আপন চিদাকাশে পৃথিব্যাদিবর্জ্জিত অনির্দ্দেশ্য আকারে প্রকাশমান হন। সেই কারণে ইঁহাকে স্বয়ম্ভু বলা হয়[৩১]। এই স্বয়ম্ভূ নির্ম্মল আকাশে মুক্তাশ্রেণীর অনুরূপে অথবা স্বাপ্ন ও মনোরাজ্যস্থ পুরুষের অনুরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন[৩২]। ইনি পরমাত্মাই, সেই কারণে ইঁহাতে দৃশ্য নাই, দ্রষ্টা নাই, এবং অন্য কিছু নাই; অথচ ইনি ভাসমান বা প্রকাশমান থাকেন। ইনি কেবলমাত্র সঙ্কল্পশরীর; সেইজন্য ইঁহাকে মনোব্রহ্ম বলিয়া উল্লেখ করা হয়। এই পুরুষ সেই সঙ্কল্পাকাশরূপী; সেই কারণে ইঁহাতে পরভবিক (যাহারা পরে হয় তাহারা পরভবিক) পৃথ্ব্যাদি নাই[৩৩।৩৪]।

যেমন চিত্রকরের অন্তঃকরণে দেহহীন পুত্তলিকা উদিত হইতে থাকে, তেমনি, এই ব্রহ্মাও নির্ম্মল চিদাকাশে উদিত বা রাজমান হন[৩৫]। আদি, অন্ত ও মধ্য রহিত একমাত্র চিদাকাশরূপে প্রকাশমান এই স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা স্বকীয় চিত্তের (বিষয়প্রকাশক সামর্থ্যের) দ্বারা সঙ্কল্পশরীরী হইয়া আকাশীয় পুরুষের ন্যায় প্রকাশ পাইয়া থাকেন সত্য; পরন্তু ইঁহার শরীর বন্ধ্যাসুতের ন্যায় মিথ্যা[৩৬]।

দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত।

তৃতীয় সর্গ।

রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! আপনি মন'কে, (এমন মহত্তত্ত্ব। ইন্দ্রিয়াত্মক মন নহে) শুদ্ধ অর্থাৎ পৃথ্ব্যাদি বর্জ্জিত ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। কিন্তু মহর্ষে! যেমন তোমার, আমার এবং অন্যান্য ভূতগণের প্রাক্তনী স্মৃতি (পূর্ব্বকর্ম্মসংস্কার) শরীরাদি উৎপত্তির কারণ হয়, তেমনি, ব্রহ্মার উৎপত্তিতে প্রাক্তনী স্মৃতি কারণ না হয় কেন? তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন১।২। বশিষ্ঠ কহিলেন, যাহার পূর্ব্বকর্ম্ম-সমন্বিত আদিশরীর (লিঙ্গদেহ) বিদ্যমান থাকে, তাহার পক্ষেই প্রাক্তনী স্মৃতি সংসারস্থিতির কারণ হয়৩। যখন ব্রহ্মার পূর্ব্বসঞ্চিত কোন কর্ম্মই নাই, (সমস্তই দগ্ধ হইয়া গিয়াছে), তখন তাঁহার প্রাক্তনী স্মৃতি কোথা হইতে আসিবে? অতএব, ইনি আপনিই আপনার কারণ, ইহাতে অন্য কোন কারণের অবসর নাই৪।৫। হে রামচন্দ্র! স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মার আতিবাহিক নামে একই শরীর লক্ষ্য হয়, আধিভৌতিক শরীর ইহার নাই৬।

রামচন্দ্র বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! সকল প্রাণীরই আতিবাহিক এবং আধিভৌতিক এই দুইটী শরীর আছে; কিন্তু ব্রহ্মার এক শরীর। ইহার কারণ কি তাহা বিশেষ করিয়া বলুন৭।

বশিষ্ঠ বলিলেন, সমুদায় সকারণ (পঞ্চীকৃতভূতোৎপন্নদেহাদিবিশিষ্ট) প্রাণীর আতিবাহিক ও আধিভৌতিক এই দুই শরীর আছে; পরন্তু কারণাভাব প্রযুক্ত ব্রহ্মার আধিভৌতিক শরীর নাই। তাঁহার একই শরীর৮। ইনি সকল ভূতের কারণ; অথচ ইহার কোন কারণ নাই। তাই ইনি একদেহী, দ্বিদেহী নহেন৮।৯ ইহার ভৌতিক দেহ নাই, ভৌতিক দেহ না থাকায় ইনি কেবল মাত্র আতিবাহিক শরীরে আকাশের সমানে ভাসমান আছেন১০। পৃথ্ব্যাদিরহিত চিত্তমাত্রশরীর (চিত্ত=সঙ্কল্প) প্রজাপতি যে সকল প্রজা সৃজন করিয়াছেন,১১ সেই সমস্ত প্রজাও চিদাকাশ স্বরূপ প্রজাপতি ভিন্ন অন্যকারণসম্ভূত নহে। কারণ এই যে, যে যে বস্তু হইতে উৎপন্ন হয় সে সেই বস্তুরই অনুরূপ

হয়[১২]। চিৎশরীর ও বোধস্বরূপ নির্ব্বাণ পুরুষ সমুদায় সংসারী জীবের আদি প্রস্পন্দ; এবং তাহা হইতেই প্রথম অহংভাবের উদয় হইয়া থাকে[১৩।১৪]। যেমন সূক্ষ্ম অনিল হইতে স্থূলতর প্রতিস্পন্দ উৎপন্ন হয়, তেমনি, সেই প্রাচীন বা প্রথম প্রতিস্পন্দ অর্থাৎ ব্রহ্মা হইতে এই সমস্ত প্রজা বিস্তৃত হইয়াছে[১৫]। পরিদৃশ্যমান সৃষ্টি প্রতিভাসিক আকার বিশিষ্ট ব্রহ্মা হইতে জন্ম লাভ করায় প্রতিভাসিক আকার বিশিষ্ট সত্য; পরন্তু ইহা সত্য বলিয়া জীবের গোচরে অবস্থিত আছে। অথবা চিন্ময় ব্রহ্ম হইতে জন্ম লাভ করায় চিদ্রূপী হইলেও ইহা জড়াকারে প্রকাশ পাইতেছে[১৬]। অসদ্বস্তু যে সৎ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহার দৃষ্টান্ত—স্বপ্নান্তর্গত স্বপ্নমৈথুন। যেমন স্বপ্নে স্ত্রীসঙ্গম স্বপ্ন দেখা যায়, তাহাতেও ধাতুক্ষয় ঘটনা হয়, তেমনি, ব্যবহার ও প্রয়োজন নিষ্পত্তি দৃষ্টে অসত্য পদার্থেও সত্যতুল্য ব্যবহার নিষ্পন্ন হইতে পারে। অতএব, স্বপ্নে স্ত্রীসঙ্গম-স্বপ্ন সম্পূর্ণ অলীক বা মিথ্যা হইলেও তাহা হইতে যেমন সত্যবৎ প্রয়োজন নিষ্পন্ন হয়, তেমনি, প্রতিভাসমাত্র আকৃতি ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন প্রতিভাসরূপী এই সৃষ্টিও সত্যবৎ প্রয়োজন সম্পন্ন করিতেছে[১৭]। সমুদায় ভূতের ঈশ্বর ব্যোমশরীর স্বয়ম্ভূ দেহবিহীন হইয়াও সৃষ্টিবিস্তার দ্বারা দেহীর ন্যায় প্রতিভাত হইতেছেন[১৮]। ইনি সঙ্কল্পরূপতা ও স্বীয় স্বরূপের স্বায়ত্ততা প্রযুক্ত কখন অনুদিত ও কখন সমুদিত হন[১৯]। ঈদৃশ স্বভাব পৃথ্ব্যাদিরহিত চিত্তমাত্রাকৃতি সঙ্কল্পপুরুষ ব্রহ্মাই ত্রিজগৎ-স্থিতির কারণ[২০]। প্রাণিগণের কর্ম্ম অনুসারে তাঁহার সঙ্কল্প যখন যে আকারে বিকসিত হয় তখন তিনি সেই আকারেই প্রতিভাত হন। যেমন তোমার সঙ্কল্পে (মন যখন পর্ব্বত ভাবে তখন সে পর্ব্বতরূপে প্রতিভাত হয়) তুমি প্রতিভাত হও, তেমনি[২১] সংসারস্থ জনগণ দৃঢ় অন্তর্ব্বিস্মৃতির দ্বারা স্বীয় আতিবাহিক দেহ (আপনার নিরাকারতা) ভুলিয়া গিয়া পিশাচাবিশিষ্টের ন্যায় বৃথা আধিভৌতিক দেহের বোধে বিমোহিত হইতেছে[২২]। বিরিঞ্চির উক্তপ্রকার রূপ সেই বিশুদ্ধ মহাচৈতন্যাত্মক পরব্রহ্ম স্বনিষ্ঠ মায়ার সম্বলনে (সাহায্যে) প্রথম উদ্ভূত এবং তাহা সমুদায় স্থূলপ্রপঞ্চের মূল কারণ। অপিচ, এই বিরিঞ্চি মূর্ত্তি-ই পরব্রহ্মের সত্য সঙ্কল্পপ্রধান আবির্ভাব, সেই কারণে ইনি অস্মদাদির ন্যায় আতিবাহিক বিস্মৃত নহেন[২৩]। প্রথমে আধিভৌতিক সমূহ উৎপন্ন হয় না।

সেই কারণে আধিভৌতিক সমূহের দ্বারা তাঁহাতে মৃগতৃষ্ণিকার স্থায় মিথ্যা জড়তার আবেশ অসম্ভব[২৪]। যেহেতু প্রজাবীজ ব্রহ্মা মনোমাত্র ও পৃথ্ব্যাদিময় নহেন, সেই হেতু তদুৎপন্ন এই বিশ্বও বস্তুতঃ মনোময় ভিন্ন অন্য কিছু নহে[২৫]। যেহেতু সেই বাস্তব জন্ম রহিতের কোনও কিছু সহকারী কারণ নাই, সেইহেতু তাঁহা হইতে যাহারা সমুৎপন্ন হইয়াছে তাহাদিগেরও সহকারী থাকার সম্ভাবনা নাই[২৬]। যেহেতু কার্য্য-কারণের বাস্তব ভেদ নাই; যাহা কার্য্য তাহাই কারণ; সেই হেতু এই জগৎ কার্য্য বাস্তবপক্ষে কারণাতিরিক্ত নহে (কারণ=ব্রহ্ম)। অহে রামচন্দ্র! এই জগতে যখন কার্য্য ও কারণ পদার্থের সত্য পার্থক্য নাই, তখন অবশ্যই ইহা সেই ব্রহ্মস্বরূপ হইতে অনতিরিক্ত। যেমন জলের আন্দোলনে তরঙ্গ, তেমনি, ব্রহ্মার সঙ্কল্পে বিশ্ব। যেমন মনে নগরের সৃষ্টি ও গন্ধর্ব্বপুর প্রভৃতি অলীক বিষয় উদিত হয়, সেইরূপ, ব্রহ্মার মনন দ্বারা এই জগতের উৎপত্তি হইয়াছে[২৭।৩০]। প্রবুদ্ধমতি (অজ্ঞানমুক্ত) ব্রহ্মার আধিভৌতিক দেহের কথা দূরে থাকুক, বাস্তবপক্ষে তাঁহার আতিবাহিক দেহও নাই। ব্রহ্মা কেন? যাঁহারা প্রবুদ্ধ—তাহাদের কাহার ও নাই। যেমন রজ্জুতে ভুজঙ্গের অভাব, সেইরূপ, তাঁহাদের চিতি-শক্তিতে দেহের (দেহাভিমানের) অভাব অবধারিত আছে[৩১।৩২]। এই জগৎ বিরিঞ্চ্যাকারধারী মনোনামক আদি জীবের মনোরাজ্য বা মনের বিজৃম্ভণ হইলেও ইহা অজ্ঞ দিগের দর্শনে সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে[৩৩]। যেহেতু মনঃই বিরিঞ্চি, সেইহেতু তিনি কেবল সঙ্কল্প। সঙ্কল্পবপুঃ বিরিঞ্চি সঙ্কল্প বিস্তার করিয়াই এ সকল সৃজন করিয়াছেন[৩৪]। মনই ব্রহ্মার রূপ বা বপু; সেইজন্য তাঁহাতে পৃথ্ব্যাদি ভূতের অবস্থান নাই; পরন্তু তাঁহারই দ্বারা এই সকল পৃথিব্যাদি ভূত কল্পিত হইয়াছে[৩৫]। যেমন পদ্মমধ্যে (বীজ) পদ্মান্তর, তেমনি, মনের মধ্যে দৃশ্য। মন ও দৃশ্যদ্রষ্টা একই বস্তু; বিভিন্ন বস্তু নহে[৩৬]। যেমন তোমার মনোমধ্যে সঙ্কল্প ও চৈত্ররাজ্য অবস্থান করে, এবং তোমার হৃদয় দৃশ্যের আধার, তেমনি তাঁহারও মনোমধ্যে দৃশ্যের অবস্থিতি এবং ইঁহারই হৃদয় হইতে দৃশ্যের (জগতের) উৎপত্তি[৩৭]। অতএব, যেমন বালকচিত্তকল্পনাসমুত্থ পিশাচ (ভূত) বালককে বিভীষিকা দেখায়, তেমনি, দ্রষ্টারই অন্তঃকল্পিত দৃশ্য দ্রষ্টাকে বিভীষিকা দেখাইতেছে। যেমন বীজের অন্তরস্থ অঙ্কুর দেশ-

কালপ্রাপ্তে বৃহদাকার ধারণ করে; তেমনি, স্বীয় অন্তঃস্থ দৃশ্যবোধই দেশ কাল প্রাপ্তে স্থূল হইয়া বাহিরে প্রকাশ পায়[৩৮।৩৯]।

হে রামচন্দ্র! দৃশ্য যদি সত্যসত্যই থাকে তাহা হইলে কদাচ দৃশ্য-দুঃখের শান্তি হয় না। আবার দৃশ্য দুঃখের শান্তি না হইলেও দ্রষ্টা কেবল হন না। পণ্ডিতগণ বলেন, দৃশ্য দর্শন না হইলেই বোদ্ধৃবোধ্যভাব-বিনাশ প্রাপ্ত হয়, বোদ্ধৃবোধ্যভাব অভাব গ্রস্ত হইলে দ্রষ্টা তখন এক হয়। দৃশ্য থাকে থাকুক, তাহাতে তত ক্ষতি নাই, পরন্তু তাহার জ্ঞানের উপশম আদরণীয়। কেননা দৃশ্যজ্ঞানের উপশম (বা অদৃশ্যের অদর্শন) হওয়াই মোক্ষ[৪০]।

তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত।

চতুর্থ সর্গ।

বাল্মীকি বলিলেন, বৎস ভরদ্বাজ! মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ যখন এইরূপ জ্ঞান-গর্ভ উৎকৃষ্ট বচনপরম্পরা কহিতে ছিলেন তখন তৎশ্রবণে উপস্থিত জনগণ তুষ্ণীভূত ও একতানমনা হইয়াছিলেন[১]। স্পন্দহীনতা প্রযুক্ত তাঁহাদিগের কটিতটস্থিত কিঙ্কিণীজাল শব্দরহিত হইয়াছিল। অপিচ, পিঞ্জরস্থিত হারীত (একপ্রকার পক্ষী) ও শুকপক্ষী সকল ক্রীড়াবিরত হইয়াছিল[২]। বিলাসপরায়ণ রমণীগণ বিলাস বিস্মৃত হইয়া এমন স্থির-ভাবে অবস্থিতি করিতেছিল যে যেন তাঁহারা এক একটী চিত্রনির্ম্মিত পুত্ত-লিকা। অধিক কি বলিব, রাজসদ্মসহিত যাবতীয় প্রাণী ভিত্তিন্যস্ত চিত্রের ন্যায় অবস্থিত ছিল[৩]। ক্রমে বেলা মুহূর্ত্তমাত্র অবশিষ্ট রহিল দেখিয়া রবিকিরণ ও লৌকিক ব্যবহার অস্তভাব ধারণ করিল[৪]। প্রফুল্ল-কমল-সুরভিবাহী সমীরণ যেন বশিষ্ঠদেবের বাক্য শ্রবণার্থ সমাগত হইয়া মৃদুমন্দভাবে প্রবাহিত হইতে লাগিল[৫]। সূর্য্যদেব যেন বশিষ্ঠবাক্যের অর্থাবধারণার্থ জগদ্ভ্রমণ পরিহার পূর্ব্বক নির্জ্জন প্রদেশস্থ গিরিতটে গমন করিলেন[৬]। সমভাব বা শান্তিদেবতা যেন জ্ঞানোপদেশ শ্রবণে অন্তঃশীতল হইয়া সর্ব্বত্র সমশীতল করিলেন[৭]। জনগণ মনোযোগের সহিত বশিষ্ঠবাক্য শুনিবার জন্য নিশ্চেষ্ট হওয়ায় বোধ হইল, যেন লোক সকল সত্ত্বশূন্য হইয়াছে[৮]। তৎকালে সকল বস্তুরই ছায়া দীর্ঘ হওয়ায় বোধ হইতে লাগিল যে, যেন তাহারা উন্নতস্কন্ধ হইয়া বশিষ্ঠ-বাক্য শ্রবণ করিতেছে[৯]।

এই সময়ে রাজপুরকর্ম্মচারী প্রধান ভৃত্য সভা মধ্যে উপস্থিত হইয়া বিনয়নম্র বচনে মহারাজ দশরথকে কহিল, দেব! স্নান পূজার সময় অতিক্রান্ত হইতেছে; গাত্রোত্থান করুন[১০]। এই সময়ে ভগবান্ মহর্ষি বশিষ্ঠদেবও প্রস্তাবিত বাক্য উপসংহার করতঃ "মহারাজ! আজ্ এই পর্য্যন্ত শ্রবণ করিলেন,[১১] অবশিষ্ট কল্য প্রাতে বলিব।" এই বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। তখন রাজা দশরথও তদীয় বাক্য শ্রবণ করতঃ "তাহাই হইবে" বলিয়া ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধিকামনায় পুষ্প, পাদ্য, অর্ঘ ও দক্ষিণা

দান ও যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শনাদির দ্বারা সমাদর পূর্ব্বক দেব, ঋষি, মুনি ও দ্বিজ দিগকে পূজা করিলেন[১২।১৩]। অনন্তর সভা ভঙ্গ হইল। সভাস্থ রাজন্যগণ, মুনিগণ ও অন্যান্য সভ্যগণ পরস্পর পরস্পরের প্রতি যথাযোগ্য সম্ভাষণ ও আলিঙ্গন দান করিতে লাগিলেন। সভ্য দিগের মুখমণ্ডল রাজাদিগের আভরণ রত্নের প্রভায় উদ্ভাসিত হইল। পরস্পরের অঙ্গসঙ্ঘট্টনে কেয়ূর ও কঙ্কণাদি অলঙ্কারের মনোহর ধ্বনি সমুত্থিত হইল। সকলেরই বক্ষঃ ও স্তনান্তরাল হার ভারে ও স্বর্ণজড়িত বসনে সুষমান্বিত[১৪।১৫]। বশিষ্ঠ বাক্যের অর্থাবধারণার্থ তত্রস্থ সমুদায় লোকের ইন্দ্রিয় নিচয় যেন প্রশান্তভাব অবলম্বন করিয়াছিল এবং মধুপগণ তাঁহাদের শিরোপরি কুসুমদাম বিরাজিত কেশপাশপ্রসরে বিশ্রান্ত মনে উপবিষ্ট হইয়া গুণ গুণ ধ্বনি করাতে বোধ হইতে লাগিল, যেন সেই সমস্ত কেশকলাপ মৃদু মধুর গীতধ্বনি করিতেছে[১৬]। আরও দেখা গেল, দিঙ্মণ্ডল যেন প্রদীপ্ত কনকাভরণ কিরণে সুবর্ণ সদৃশ সমুজ্জ্বল হইয়াছে[১৭]। দেখিতে দেখিতে বিমানচারিগণ আহ্নিক কৃত্য করণার্থ বিমানে ও ভূতলবাসিগণ ভূপৃষ্ঠস্থ স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন[১৮]। যেমন মধ্যযৌবনা নারী জনকোলাহল নিবৃত্ত হইলে ধীরে ধীরে পতিমন্দিরে গিয়া দেখা দেয়, তেমনি, সভাস্থ জনগণ স্ব স্ব গৃহে গমন করিলে শ্যামবর্ণা রজনী জগন্মন্দিরে আগমন করতঃ ধীরে ধীরে দেখা দিতে লাগিলেন[১৯]। দিবসনায়ক (সূর্য্য) এখন অন্য দেশে আলোক প্রদান করিতে গিয়াছেন। সর্ব্বত্র আলোক প্রদান করা সৎপুরুষের ব্রত[২০]।

ক্রমে তারানিকরধারিণী সন্ধ্যা সমাগতা হইলেন। কিংশুক প্রভৃতি কুসুম প্রস্ফুটিত হওয়াতে বনরাজি বসন্তসদৃশশোভা ধারণ করিল। যেমন চিত্তবৃত্তি সকল নিদ্রায় নিলীনা হয়, তেমনি, পক্ষিগণ এখন চূত ও কদম্ব প্রভৃতি বৃক্ষের পত্রান্তরালে নিলীন হইল[২১।২২]। মেঘখণ্ডে প্রভাকরপ্রভা নিপতিত হওয়ায় বোধ হইতে লাগিল, তাহা যেন কুঙ্কুমরাগে রঞ্জিত হইয়াছে। আরও বোধ হইল, শ্রীমান্ পশ্চিম পর্ব্বত (অস্তগিরি) যেন সূর্য্যকিরণরূপ পীতবস্ত্র ও তারা-হার পরিধান করতঃ আকাশে প্রবেশ করিতেছেন[২৩]। ক্রমে সমাগতা সন্ধ্যা দেবী যথাবিধি পূজাভাগ গ্রহণ করিয়া যথাস্থানে প্রস্থান করিলেন। বিগ্রহবান্ ভূতের ন্যায় ভীষণ অন্ধকার আসিয়া দেখা দিলেন। নীহারকণবাহী শীতল সমীরণ মৃদুমন্দ

সঞ্চার দ্বারা পল্লব ও কুসুম সমূহ সঞ্চালন করতঃ বহমান হইতে লাগিল। তারকাবৃন্দ নীহারপাতে আচ্ছন্ন হওয়ায় বোধ হইতে লাগিল, যেন দিগঙ্গনা-গণ পতিবিয়োগবিধুরা দীর্ঘকৃষ্ণকেশী বিধবা রমণীর ন্যায় দিবাকরবিরহে কাতরা হইয়া নীহাররূপ অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতে করিতে (কাঁদিয়া কাঁদিয়া) অন্ধতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, আর দেখিতে পাইতেছেন না[২৪।২৬]। দেখিতে দেখিতে ভুবন অমৃতময়াকার চন্দ্রের কিরণরূপ দুগ্ধ প্রবাহে প্রপূরিত হইল। জ্ঞানোপদেশ শ্রবণে অজ্ঞতারূপ তিমির পটল কোথায় পলাইয়া গেল তাহার চিহ্নও থাকিল না[২৭।২৮]। ঋষিগণ, দ্বিজগণ ও ভূমি-পালগণ স্ব স্ব স্থানে গমন পূর্ব্বক বিশ্রাম করিতে লাগিলেন[২৯]। ক্রমে যমশরীরসমা শ্যামবর্ণা তিমিরমাংসলা বিভাবরী দেশান্তরে গমন ও নীহার-বিপুলা উষা আগমন করিলেন[৩০]। নভোমণ্ডলস্থ তারকাগণ তখন অন্তর্হিত হইল ও নিপতিত কুসুমরাশি তখন প্রভাত পবন দ্বারা সঞ্চালিত হইতে লাগিল[৩১]। যেমন মহাত্মাদিগের অন্তঃকরণে বিবেকবৃত্তি (বুদ্ধি) অভিনবরূপে উদিত হয়, তেমনি, সর্ব্বলোকলোচন প্রভাকর পুনর্ব্বার অভিনবরূপে লোকপুঞ্জের নয়নগোচর হইলেন[৩২]। উদয়াচল এখন পূর্ব্বোক্ত অস্তকালীন অস্তাচলের ন্যায় পরম শোভা ধারণ করিলেন[৩৩]। এ দিকে পুনর্ব্বার সেই সকল নভশ্চর ও মহীচরগণ প্রাতঃকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক পূর্ব্বানুক্রমে রাজসভায় আসিয়া উপস্থিত ও পূর্ব্বের ন্যায় সন্নিবেশে উপবেশন করিলেন[৩৪]। সভা পূর্ব্ববৎ নীরব ও নিস্পন্দ হইল—বায়ুসঞ্চার-শূন্য সরোবরস্থ পদ্মিনী সমূহের ন্যায় সুদৃশ্য হইল[৩৫]।

অনন্তর রামচন্দ্র কথা প্রসঙ্গ অবলম্বন করতঃ বাগ্মিপ্রবর বশিষ্ঠদেবকে বিনয়নম্র মধুর বাক্য সকল বলিতে লাগিলেন। বলিলেন, ভগবন্! যাহা হইতে এই অশেষ দোষাকর বিশ্ব বিস্তৃত হইয়াছে সেই মনের স্বরূপ কি তাহা আমাকে বিশেষ করিয়া বলুন[৩৬,৩৭]। বশিষ্ঠ বলিলেন, রামচন্দ্র! প্রস্তাবিত মনের কোনও প্রকার রূপ দৃষ্ট হয় না। কেবল তাহার নামই শুনা যায় এবং তজ্জনিত একপ্রকার বিকল্প জ্ঞানও * হইয়া থাকে। যেমন আকাশ। আকাশের কোনও প্রকার রূপ ও আকার নাই। অথচ তাহার নাম আছে। উক্ত উভয়ই শূন্যাকার ও জড়[৩৮]। প্রস্তাবিত মন

* বিকল্পজ্ঞান = বস্তু নাই অথচ নাম আছে, এরূপ শাব্দ জ্ঞান। শব্দ শ্রবণের পর যে এক প্রকার জ্ঞান হয় তাহা। যেমন রাহুর শির পৃথক্ নহে, শিরই রাহু, অথচ শব্দানুসারে বোধ

কি বাহিরে কি হৃদয়ে কোথাও সদ্রূপে বিদ্যমান নহে। অথচ তাহা আকাশের ন্যায় সর্ব্বত্রই অবস্থিত আছে[৩৯]। তাদৃশ মন হইতে মৃগতৃষ্ণিকা সলিলের ন্যায় এই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে এবং তাহার রূপ দ্বিচন্দ্র দর্শনের ন্যায় ভ্রান্ত। অর্থাৎ ভ্রমজ্ঞানই তাহার আকার[৪০]। * পূর্ব্বে নহে, পরেও নহে; মধ্যে যে সৎ অথবা অসৎ বস্তু বিষয়ক জ্ঞান হয়, তাহাই মনের আকার, ইহা অবগত হও। অর্থাৎ যাহা অন্তরে ও বাহিরে বস্তুর আকারে প্রকাশ পায় তাহাই মন। এতদ্ব্যতীত মনের অন্য আকার নাই[৪১।৪২]। অথবা সঙ্কল্পই মন। যেমন দ্রবত্ব হইতে সলিল ও স্পন্দতা হইতে বায়ু ভিন্ন নহে, সেইরূপ, মনও সঙ্কল্প হইতে ভিন্ন নহে[৪৩]। যাহাতে সঙ্কল্প তাহাই মন সুতরাং সঙ্কল্প ও মন ভিন্ন নহে[৪৪]। সত্য হউক অথবা অসত্য হউক, পদার্থাকারে প্রকাশ হওয়াই মন এবং এই মনঃই লোকপিতামহঃ[৪৫]। আতিবাহিক দেহরূপী (আতিবাহিক=কল্পনাময়) লোকপিতামহ ব্রহ্মা শাস্ত্রে মন নামে উক্ত হইয়াছেন এবং ইনিই আধিভৌতিকী বুদ্ধি (স্থূল দেহের জ্ঞান) বিধান করেন[৪৬]। † সেইজন্য এই দৃশ্য প্রপঞ্চের অবিদ্যা, সংস্থতি, চিত্ত, মন, বন্ধন, মল এবং তমঃ প্রভৃতি অনেক নাম আছে[৪৭]। হে রামচন্দ্র! এতদ্দৃশ্য ব্যতিরেকে মনের অন্য কোনপ্রকার রূপ নাই। এবং দৃশ্যও বাস্তব পক্ষে উৎপন্ন হয় নাই; একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আবার বলিতেছি,[৪৮] যেমন কমলবীজে কমলবল্লরী অবস্থিতি করে, সেইরূপ, চিৎপরমাণুর মধ্যে দৃশ্য অবস্থিতি করে। যেমন প্রকাশ্য বস্তুতে আলোক, বায়ুতে চপলতা, এবং জলে তরলতা, সেইরূপ, দ্রষ্টাতে অর্থাৎ নিতান্ত দুর্লক্ষ্য পরমাত্মায় দৃশ্যবুদ্ধির অবস্থান নৈসর্গিক বলিয়া জানিবে[৪৯।৫০]। সুবর্ণে বলয়, মৃগনদীতে (রৌদ্রের সময় মরুভূমিতে যে জলপ্রবাহের ভ্রম হয়, তাহাই মৃগনদী) জল এবং স্বপ্নদৃষ্ট অট্টালিকার ভিত্তি যদ্রূপ অলীক, দ্রষ্টাতে দৃশ্যবুদ্ধি তদ্রূপ অলীক[৫১]। অহে রামচন্দ্র! দৃশ্য সকল যে দ্রষ্টায় উক্ত প্রকার অভিন্নভাবে অবস্থিতি

হয়, যেন তাহা একটা পৃথক্ বস্তু।

* অর্থাৎ পারমার্থিক রূপ না থাকিলেও ব্যবহারের উপযুক্ত কল্পিত রূপ আছে। কল্পিত রূপ পরশ্লোকে বলা হইবে।

† আগে সূক্ষ্মপ্রপঞ্চ, তৎপরে স্থূলপ্রপঞ্চ। সূক্ষ্ম ভূত দীর্ঘকাল সহাবস্থান করায় ক্রমনিয়মে পঞ্চীকৃত হইয়া (পাঁচে পাঁচ মিশিয়া) এই স্থূল ভূত ও তদাকারা বুদ্ধি জন্মিয়াছে ও জন্মাইয়াছে। সুতরাং সূক্ষ্মপ্রপঞ্চাত্মক মনোনামক ব্রহ্মাই স্থূলপ্রপঞ্চের কর্ত্তা অর্থাৎ স্রষ্টা।

করিতেছে, তাহা তুমি অচিরাৎ বোধগম্য করিতে পারিবে। শীঘ্রই আমি তোমার চিত্তদর্পণের উক্ত মালিন্য উন্মার্জ্জন করিব। (তোমার চিত্ত যে দৃশ্য অর্থাৎ জগৎ দেখিতেছে তাহাই তোমার চিত্তের মালিন্য। তাহা পরিমার্জ্জিত হইলে তখন আর দৃশ্য দর্শন হইবে না এবং তখন তুমি নির্ম্মল দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ হইবে)[৫২]। দৃশ্য দর্শনের অভাব হইলে দ্রষ্টা যে (দ্রষ্টা=দর্শনকর্ত্তা) অদ্রষ্টা হয়, তাহাকেই তুমি কৈবল্য বলিয়া জানিবে। কৈবল্যকালে এ সমস্তই সদ্রূপ আত্মায় অবশেষিত হয়[৫৩]। যেমন বায়ুর স্পন্দন স্থগিত হইলে বনলতাদি নিষ্কম্প হয়, স্থির হয়, তেমনি, কেবল হইলে অর্থাৎ একাত্মনিমগ্নতা বশতঃ চিত্তস্পন্দন অপগত হইলে তখন চিত্তস্থ রাগদ্বেষাদি ও তদ্বাসনানিচয় অন্তর্হিত হইয়া থাকে[৫৪]।

যে প্রকাশে (চৈতন্যময়জ্ঞানে) দিক্, ভূমি, আকাশ, ইত্যাদি প্রকাশ্য (জ্ঞেয়) প্রকাশ পাইতেছে, সে প্রকাশ প্রকাশ্যহীন অর্থাৎ দিগাদিহীন হইলে মদুক্ত নির্ম্মল আত্মপ্রকাশের উদাহরণ হইতে পারে[৫৫]। যখন তুমি, আমি, ত্রিজগৎ, সমুদায় দৃশ্য অসৎ বলিয়া বোধগম্য হইবে তখনই জানিবে, দর্শক মলশূন্য ও কেবল হইয়াছেন[৫৬]। যেমন দর্পণে শৈল প্রভৃতি বহিঃপদার্থের প্রতিবিম্ব না পড়িলে দর্পণ কেবল হয়, তেমনি, দ্রষ্টার তুমি, আমি, জগৎ, এ ভাব উন্মার্জ্জিত হইলে বা এ দর্শন না থাকিলে দ্রষ্টারও আত্মকৈবল্য জন্মে[৫৭।৫৮]।

রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! যাহা সৎ অর্থাৎ আছে, তাহা নষ্ট হইবার নহে। যাহা অসৎ অর্থাৎ নাই, তাহারও ভাব অর্থাৎ উৎপত্তি অসম্ভব। এই অশেষদোষপ্রদায়ী দৃশ্য যে অসৎ অর্থাৎ নাই, তাহা আমি বোধগম্য করিতে পারিতেছি না। * সেইজন্য আমার জিজ্ঞাসা— কি প্রকারে আমার ভ্রমকারিণী ও দুঃখসন্ততিদায়িনী দৃশ্যবিসূচিকার শান্তি হইবে?[৫৯।৬০] বশিষ্ঠ বলিলেন, বৎস! আমি তোমাকে দৃশ্যপিশাচ নিবারণের মন্ত্র বলি, শ্রবণ কর। শুনিলে সমুদায় দৃশ্য পিশাচ তিরোহিত হইবে[৬১]। রাঘব! যাহা আছে তাহা আত্যন্তিক বিনষ্ট হয় না

* ভাবার্থ এই যে, বিশ্ব অসৎ হইলে সৃষ্টি অসম্ভব এবং সৎ হইলে বাধ অসম্ভব। যখন প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, বিশ্ব আছে, তখন কি প্রকারে ইহা উন্মার্জ্জিত হইতে পারে? কি প্রকারেই বা ইহাকে নাই বলিয়া ভাবিতে পারি?

সত্য, পরন্তু দৃশ্যের স্বতঃসিদ্ধ অস্তিতা অসম্ভব। যাঁহারা বলেন, কোনও বস্তুর আত্যন্তিক বিনাশ হয় না, পর পর অবস্থার দ্বারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবস্থা আচ্ছন্ন বা পরিবর্ত্তিত হয় মাত্র, তাঁহাদের মতে অদর্শন প্রাপ্ত দৃশ্যের বীজ (সংস্কার) বুদ্ধিতে (সুষুপ্তিকালে বুদ্ধিতে এবং মহাপ্রলয়ে প্রকৃতিতে) অবস্থিত থাকে[৬২]। সেই বীজ (সেই সংস্কারীভূত জগৎ) আবার চিদাকাশে পুনর্ব্বার লোক ও শৈল প্রভৃতি সহ পূর্ব্ববৎ দোষাকর দৃশ্য প্রকাশ করায় (দেখায়)[৬৩]। সুতরাং তন্মতে মোক্ষ অসম্ভব হইয়া উঠে। অথচ অনেক জীবন্মুক্ত দেবতা, ঋষি ও মুনিদিগের অবস্থান দৃষ্ট হয়[৬৪]। অতএব, জগৎ যদি সত্য সত্যই থাকিত তাহা হইলে কদাচ কাহার মোক্ষ হইতে পারিত না। দৃশ্য বাহিরে থাকে থাকুক, তাহাতে ক্ষতি নাই; পরন্তু তাহা থাকাই নাশের কারণ। (অর্থাৎ অন্তরে দৃশ্য দর্শন হওয়াই মোক্ষের প্রতিবন্ধক)[৬৫]। অতএব হে রাঘব! আমার ভীষণ প্রতিজ্ঞার বিষয় সাবধানে শ্রবণ করিবে— যাহা আমি পশ্চাৎ বক্তব্য শ্লোক দ্বারা বলিব। তাহা শুনিলে নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবে, জগতের পারমার্থিক অবস্থা কি?[৬৬] পুরোভাগে এই যে ভৌতিক আকাশ প্রভৃতি ও অন্তরে অহং প্রভৃতি লক্ষ্য হইতেছে, তৎসমুদায় ব্যবহার দশায় জগৎ; কিন্তু পরমার্থদশায় ব্রহ্ম। ব্রহ্ম ব্যতীত, বাস্তবপক্ষে জগৎশব্দের বাচ্য বস্তন্তর নাই। যে কিছু দৃশ্য দেখা যায়, সমস্তই অজর অমর অব্যয় ব্রহ্ম; অন্য কিছু নহে[৬৭।৬৮]। পূর্ণে পূর্ণের প্রকাশ, শান্তে শান্তের অবস্থান, আকাশে আকাশের উদয়, সুতরাং ব্রহ্মে ব্রহ্মেরই অবস্থান। * বস্তুতঃই দৃশ্য, দ্রষ্টা ও দর্শন নাই। ইহা শূন্যও নয়, জড়ও নয়; পরন্তু কেবল ও শান্তিময় (ব্রহ্মময়)[৬৯।৭০]।

* পূর্ণ পদার্থের প্রবেশ ও নির্গম অসম্ভব। ব্রহ্মের বা আত্মার একীভাব বুঝিতে পারিলেই পূর্ণে পূর্ণের প্রকাশ (প্রবেশ) হইয়াছে বলা যায়। যত দিন ব্রহ্মতত্ত্ব অবুদ্ধ থাকে ততদিন তাঁহাতে রজ্জুতে সর্পদর্শনের ন্যায় জগদ্দর্শন হইতে থাকে। রজ্জুতে সর্পের যদ্রূপ অবস্থিতি, ব্রহ্মে জগতের তদ্রূপে অবস্থিতি, এই অবস্থিতি জগৎ। জগৎ নাই বলিয়াই শান্ত, সুতরাং শান্তে শান্তের অবস্থান বলিবার যোগ্য। প্রথম শান্ত শব্দে ব্রহ্ম, দ্বিতীয় শান্ত শব্দে জগৎ। ঘটাদি উপাধি নষ্ট হইলেই আকাশে আকাশের উদয় হইয়াছে বলা যায়। তেমনি জগৎ দর্শন লুপ্ত হইলে ব্রহ্মে ব্রহ্মের উদয় হইল বলা যায়। ব্রহ্মেই ব্রহ্মের অবস্থান, এ কথার অর্থ—জগৎ ব্রহ্মাতিরিক্ত নহে। রজ্জুসর্প যেমন রজ্জুর অতিরিক্ত নহে, তেমনি।

রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! বন্ধ্যাপুত্র শৈলপেষণ করিতেছে, শশ-শৃঙ্গ গান করিতেছে, শিলা সকল ভুজবিস্তার পূর্ব্বক নৃত্য করিতেছে, সিকতাময় পর্ব্বত হইতে ধাতু নিস্রুত হইতেছে, উপলপুত্রিকা অধ্যয়ন করিতেছে, চিত্রিত মেঘ গভীর গর্জ্জন করিতেছে, এ সকল কথা যেরূপ, আপনি যাহা বলিতেছেন আমার বোধে তাহাও সেইরূপ[১১।১২]। হে প্রভো! যদি এই জরমরণাদিদুঃখসমন্বিত শৈলাকাশাদিময় জগৎ না-ই থাকে, তবে এ সকল দেখা যায় কি! এবং আপনিইবা আমাকে কাহার জন্য কি করিতে বলিতেছেন? ব্রহ্মন্! এই বিশ্বমণ্ডল নাই কেন? কেনইবা উৎপন্ন হয় নাই? তাহা বিশেষ করিয়া বলুন। যাহাতে আমি ভবদুক্ত রহস্য অনায়াসে বুঝিতে পারি তাহার উপায় বিধান করুন[১৩।১৪]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! আমি তোমাকে যাহা বলিলাম তাহার কিছুই অসঙ্গত নহে। সত্য সত্যই ইহা বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় অলীক। অলীক হইলেও ইহা যে কারণে প্রতিভাত হইতেছে বা প্রকাশ পাই-তেছে, তাহাও বলি, শ্রবণ কর[১৫]। এই বিশ্ব কোনও কালে উৎপন্ন হয় নাই। সেইজন্য ইহা নাই। ইহা কেবল মনের প্রকাশ বা মনের মায়িক আবির্ভাব। ইহা স্বপ্নে স্বপ্ন দর্শনের অনুরূপ[১৬]। মনও বাস্তব-পক্ষে অনুৎপন্ন ও অসদ্বপু। যাহা বলিলে এ রহস্য বুঝিবে, তাহাও বলি, প্রণিহিত হও[১৭]। নশ্বরতম মনই এই নশ্বরতম ও দোষাকর বিশ্ব বিস্তার করিয়াছে। স্বপ্ন যেমন স্বপ্নান্তর বিস্তার করে, (জন্মায়), তেমনি, স্বরূপশূন্য মনও স্বরূপশূন্য জগৎ বিস্তার করিয়াছে[১৮]। (মন স্বপ্নের ন্যায় নিতান্ত অসৎ হইলেও জগৎকে সতের আকারে প্রকাশ করিয়া থাকে)। মন স্বকীয় ইচ্ছায় আগে আপনার দেহ কল্পনা করে, পরে তাহারই দ্বারা ইন্দ্রজাল শোভার ন্যায় জগৎ শোভা বিস্তৃত করে[১৯]। একমাত্র চলৎশক্তিমান্ মনই স্ফুরিত হইতেছে, ভ্রমণ করিতেছে, যাতায়াত করিতেছে, প্রার্থনা করিতেছে, নিমগ্ন হইতেছে, সংহার করিতেছে, নীচ-গামী হইতেছে ও মোক্ষ লাভ করিতেছে। সমস্তই মনের ক্রীড়া। মনই বিশ্বসংসার, মন ছাড়া পৃথক্ বিশ্ব নাই। (মন মূলে মিথ্যা, সেইজন্য তদ্বিজৃম্ভণ বিশ্বও মিথ্যা)[২০]।

চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চম সর্গ।

রামচন্দ্র বলিলেন, হে মুনিশার্দ্দূল! ভ্রম কল্পিত মনের মূল কি? ঐ ভ্রম কিসে হয়? মন কি প্রকারে ও কোথা হইতে হইল এবং উহার মায়াময়ত্বই বা কেন ও কিম্প্রকার? তাহা আমাকে বলুন। আগে সংক্ষেপে সম্প্রতি জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের প্রত্যুত্তর বলুন; পরে অবশিষ্ট প্রশ্নের প্রত্যুত্তর বিশেষরূপে বলিবেন১।২।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! শ্রবণ কর। মহাপ্রলয় হইলে সে সময়ে কোনও পদার্থ থাকে না। সকল পদার্থই লয় পায়। লয়ের পর ও ভাবী সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবলমাত্র শান্ত (অগাধ অচল নিত্য নির্ব্বিকার ও নিত্য প্রতিষ্ঠ) ব্রহ্মই অবশেষিত থাকেন। (শান্ত=নির্ব্বিশেষ বা বিক্ষেপশূন্য) তিনি জন্মরহিত, স্বপ্রকাশ, নির্ব্বিকার, নিত্য, সর্ব্বাত্মক, সর্ব্বকৃৎ, পরমাত্মা ও মহেশ্বর৩।৪। এই শান্ত-ব্রহ্ম বাক্যের অগোচর (বাক্যের দ্বারা বুঝান যায় না) পরন্তু যোগগম্য এবং ইহারই আত্মা, ব্রহ্ম ও পরমেশ্বর, ইত্যাদি নাম কল্পিত হইয়া থাকে। ঐ সকল নাম তাঁহার স্বাভাবিক নহে; কিন্তু কল্পিত৫।

যিনি সাঙ্খ্যের পুরুষ, বেদান্তবাদীর ব্রহ্ম, বিজ্ঞানবাদীর বিশুদ্ধ বিজ্ঞান, শূন্যবাদীর শূন্য, এবং যিনি সূর্য্য-চন্দ্রাদি তেজোময় পদার্থের প্রকাশক, যিনি শরীরে অবস্থান করতঃ বক্তা, অনুমন্তা, ভোক্তা, দ্রষ্টা ও স্মর্ত্তা হইয়া প্রকাশ পাইতেছেন এবং যিনি সত্য বা সৎস্বরূপ, যিনি নিত্য হইয়াও এই অনিত্য জগতে অবস্থিতি করিতেছেন, যিনি দেহস্থ হইয়াও দূরে অবস্থিতি করেন, প্রভাকরের প্রভার ন্যায় যাঁহা হইতে বিষ্ণ্বাদি দেবতা সমুৎপন্ন হইয়াছেন, যিনি দীপের ন্যায় আপনাকে ও বিশ্বকে প্রকাশিত করিতেছেন; সমুদ্রে বুদবুদ উৎপন্ন হওয়ার ন্যায় যাঁহা হইতে অসংখ্য ও অনন্ত জগৎ উৎপন্ন হইতেছে; প্রলয়কালে দৃশ্যবৃন্দ যাঁহাতে সমুদ্রে জলপ্রবাহ প্রবেশের ন্যায় প্রবেশ করিয়া থাকে, যিনি আকাশে, আমাদিগের শরীরে, প্রস্তরে, জলে, লতাসমূহে, ভস্মে, পর্ব্বতে, সমীরণমধ্যে ও পাতালে অবস্থিতি করিতেছেন,৬।১১ যিনি কর্ম্মে-

ন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয়, প্রাণ, অবিদ্যা ও কাম প্রভৃতিকে স্ব স্ব ব্যাপারে প্রয়োগ করিতেছেন; মূক ব্যক্তিরা স্বীয় অসৌভাগ্য নিবন্ধন যৎকর্ত্তৃক মূক হইয়াছে; যিনি শিলা সকলকে অচল, আকাশকে শূন্য, শৈলকে কঠিন ও জলকে তরল করিয়াছেন; যিনি দীপে ও সূর্য্যে আলোক প্রদান করিয়াছেন;[১২।১৩] যিনি অমৃতপূর্ণ (অমৃত=জল) বারিদ মণ্ডল হইতে বৃষ্টিধারা বর্ষণের ন্যায় এই সংসারের প্রতি বিচিত্র অসার দৃষ্টি প্রবর্ষণ করিতেছেন; অতিবিস্তীর্ণ মরুভূমিস্থিত মরীচিকার ন্যায় এই ত্রিভুবন যাঁহার আবির্ভাব ও তিরোভাব; যিনি অবিনশ্বর হইয়াও প্রপঞ্চ-রূপে নশ্বর; যিনি সূক্ষ্মভাবে সকল জীবের অন্তরে বিরাজ করিতেছেন; যিনি আপন চিদাকাশে ব্রহ্মাণ্ডরূপ ফল, চিৎস্বরূপ মূল, এবং আত্মারূপ বায়ু কর্ত্তৃক নর্ত্তনশীলা ইন্দ্রিয়দলশালিনী প্রকৃতিরূপা লতা সৃজন করিয়াছেন; এবং যিনি প্রত্যেক দেহরূপ সম্পুটক (পেটরা) মধ্যে চিৎস্বরূপ মণি স্থাপিত করিয়াছেন, যাঁহার প্রশান্তচিদ্বনে অর্থাৎ চিদাকাশরূপ মেঘে সৃষ্টিরূপ তড়িৎ আবির্ভূত ও প্রাণরূপ জলধারা নিপতিত হইয়া থাকে; যাঁহার আলোকে সমুদায় বস্তু চমৎকারজনক হইয়াছে, যিনি অসদ্বস্তুর সৃষ্টি করেন নাই; সদ্বস্তু সকল যাঁহার সত্তায় সত্তাবান্ হইয়াছে; যাঁহার প্রসাদে এই জড়শরীর প্রচলিত ও দেশকালানুযায়ী চলন স্পন্দন প্রভৃতি ক্রিয়া নির্ব্বাহ হইতেছে; যিনি শুদ্ধসম্বিন্মাত্রস্বভাব, অথচ ব্যোমচিন্তায় (আমি ব্যোম্ হইব, এইরূপ আলোচনা করিয়া) আকাশ ও পদার্থ চিন্তায় পদার্থ ভাব ধারণ করিয়াছেন; যিনি এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াও কিছুই করেন নাই এবং যিনি নির্ব্বিকল্পস্বরূপ ও উদয়-প্রলয়-স্থিতি-গতি-রহিত, বিজ্ঞানাত্মা, অদ্বৈত ও এক; প্রলয়কালে কেবল তিনিই অবশিষ্ট থাকেন, অন্য কিছু থাকে না[১৪।২৪]।

পঞ্চম সর্গ সমাপ্ত।

ষষ্ঠ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, আমি অব্যবহিত পূর্ব্বে যাঁহার কথা বলিলাম, সেই দেবদেব পরাৎপর পরমাত্মাকে জ্ঞানযোগে সাক্ষাৎকার করা ব্যতীত সিদ্ধি লাভের অন্য উপায় নাই। নিরবচ্ছিন্ন ক্লেশকর কর্ম্মানুষ্ঠানে তৎ-সাক্ষাৎকারাত্মিকা পরাসিদ্ধি (মোক্ষ) লাভ করা যায় না[১]। যেমন মরু-মরীচিকার জ্ঞান তত্রস্থ জলভ্রান্তির নিবারক, তেমনি, মৃগতৃষ্ণিকাসদৃশ-সংসারভ্রান্তি নিবারণের জন্য একমাত্র তত্ত্বজ্ঞানই উপযুক্ত; অন্য কোন অনুষ্ঠান উপযুক্ত নহে[২]। হে রাঘব! তিনি দূরেও নহেন, নিকটেও নহেন, সুলভও নহেন, দুর্লভও নহেন। সাধন-কৌশলে আপন আপন দেহেই সেই পূর্ণানন্দ পরমাত্মাকে পাওয়া যাইতে পারে[৩]। তপস্যা, দান, ব্রত, এ সকল তত্ত্বজ্ঞানের পুষ্কল (অসাধারণ) সাধন নহে। স্বরূপে বিশ্রাম লাভ ব্যতীত অন্য কিছুই তৎপ্রাপ্তির উপায় নহে[৪]। সৎসঙ্গ ও সৎ-শাস্ত্রের আলোচনা এবং যাহার যাহার দ্বারা মোহজাল ছিন্ন হয় তাহা তাহাও তৎপ্রাপ্তির উপায়[৫]। "এই সেই পরাৎপর পরমাত্মা" এতদ্রূপ সাক্ষাৎ জ্ঞান হইবামাত্র জীবগণ দুঃখ পরিহার পূর্ব্বক জীবন্মুক্ত হইয়া থাকে[৬]। রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! আপনি বলিলেন যে, বুদ্ধিযোগে সেই দেবদেব পরমাত্মাকে জানিতে পারিলে তখন হইতে আর মরণাদি দুঃখ হইবে না। এই স্থলে আমি জানিতে চাহি, কিসে ও কিম্বিধ বুদ্ধিযোগে সেই দেবদেবকে শীঘ্র পাওয়া যায়। কত দূরে, কত ক্লেশে, কত দিনে ও কোন্ তপস্যায় তাঁহাকে জানা যায়[৭।৮]। বশিষ্ঠ প্রত্যুত্তর করিলেন, রাঘব! বিবেকবিকাশী স্বীয় যত্নাধিক্যরূপ পৌরুষের অর্থাৎ উৎকট বিবিদিষার (জানিবার বা পাইবার ইচ্ছার) দ্বারা তাঁহাকে শীঘ্রই এই শরীররূপ উপাধিতে দেখিতে পাওয়া যায়। তদ্ব্যতীত অন্য কিছুতে অর্থাৎ স্নান, দান ও তপঃ প্রভৃতি কার্য্যে, তাঁহাকে লাভ করিতে পারা যায় না[৯]। হে রাঘব! রাগ, দ্বেষ, তম, ক্রোধ, মদ ও মাৎসর্য্য

পরিত্যাগ ব্যতীত তপস্যা ও দানাদি সমস্তই ব্যর্থ ও ক্লেশকর[১০]। রাগ-দ্বেষাদির বশ্য হইয়া পরবঞ্চনাদির দ্বারা যে ধন উপার্জ্জন করা যায়, সে ধনের দানে দাতা ফলভাগী হয় না। পরন্তু যিনি প্রকৃত ধনস্বামী তিনিই তাহার ফলভাগী হইয়া থাকেন[১১]। অপিচ, যে সকল ব্রতাদি লোভ ও অভিমানাদি প্রযুক্ত অনুষ্ঠিত হয়, সে সকল ব্রতাদির অল্পমাত্রও ফল হয় না। তাহাতে কেবল মাত্র দম্ভ প্রকাশ হয়; অন্য কিছু হয় না[১২]। অতএব, পৌরুষ প্রযত্ন আশ্রয় করিয়া সৎশাস্ত্রানুশীলন ও সৎসঙ্গ, সংসার-ব্যাধির এই দুই মহৌষধ আহরণ করা অতীব কর্ত্তব্য। লিখিত আছে যে, পৌরুষপ্রযত্ন ব্যতীত আত্যন্তিক দুঃখশান্তির অন্য উপায় নাই[১৩।১৪]। সে পৌরুষ কীদৃক তাহাও বলি, শ্রবণ কর। আত্মজ্ঞান লাভের নিমিত্ত যে পৌরুষ অবলম্বন করা কর্ত্তব্য—যাহা অবলম্বন করিলে রাগদ্বেষাদিরূপ বিসূচিকার (ব্যাধিবিশেষের) শান্তি হইবে, তাহা অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর[১৫]। লোক ও শাস্ত্র উভয়ের অবিরোধী যথাসম্ভব বৃত্তিতে (জীবিকায়) সন্তুষ্ট থাকা, ভোগবাসনাপরিহার ও দুরাকাঙ্ক্ষাজনিত উদ্বেগ পরিত্যাগ করা, সম্ভবানুযায়ী উদ্যোগ সহকারে সাধুসঙ্গের ও সৎশাস্ত্রের আশ্রয় লওয়া অতীব কর্ত্তব্য। এইগুলি জ্ঞানপ্রাপ্তির প্রথম সোপান[১৬।১৭]। যিনি যথাসম্ভব অর্থ প্রাপ্ত হইয়া সন্তুষ্ট হন এবং শাস্ত্রবিরুদ্ধ বিষয় উপেক্ষা করেন, তাঁহাকেই আমরা যথার্থ সাধুসঙ্গী ও সৎশাস্ত্রনিরত বলিয়া বর্ণন করি। এই সকল লোকেরাই শীঘ্র মুক্তি লাভের অধিকারী হয়[১৮]। যে মহামতি বিচার দ্বারা উত্তমরূপে আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, তাঁহা-দিগের প্রতি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র ও শঙ্কর, ইঁহারাও অনুকম্পান্বিত থাকেন[১৯]। সুজন লোকেরা যে প্রকার ব্যক্তিকে (বিশিষ্ট বৈরাগ্যাদি গুণযুক্ত ব্যক্তিকে) সাধু বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, প্রযত্ন সহকারে সেইরূপ সাধুর আশ্রয় গ্রহণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য[২০]। রাঘব! অধ্যাত্মবিদ্যাই বিদ্যা এবং সৎশাস্ত্রই শাস্ত্র। সেইজন্য, মনোযোগের সহিত অধ্যাত্মবিদ্যার আশ্রয় গ্রহণ ও সৎশাস্ত্রের আলোচনা কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারিত আছে। কেননা, ঋষিগণ বলিয়াছেন, সৎশাস্ত্রের আলোচনায় ও অধ্যাত্মবিদ্যার বিচারে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে[২১]। যেমন কতক সংযোগে (কতক=নির্ম্মলীফল। এই ফল ঘষিয়া জলে দিলে জল পরিষ্কার হয়) জলের মালিন্য ও যোগা-ভ্যাসে মনের মালিন্য বিনষ্ট হয়, তেমনি, সাধুসঙ্গমজনিত বিবেক দ্বারা

সংসারবীজ অবিদ্যা বিনষ্ট হইয়া থাকে। অবিদ্যা অর্থাৎ আত্মার আবরক অজ্ঞান নিবৃত্ত হইলেই সংসার অতিক্রম পূর্ব্বক দুঃখাতীত হওয়া যায়[২২]।

ষষ্ঠ সর্গ সমাপ্ত।

---

* সত্ত্ব, রজ, তম, এই তিন গুণ পরব্রহ্মের আশ্রিত। উক্ত তিন গুণের সাম্যাবস্থাকে প্রকৃতি কহে। প্রকৃতি দুই প্রকার। মায়া ও অবিদ্যা। সত্ত্ব গুণের নির্ম্মলতাকে মায়া ও মলিনতাকে অবিদ্যা কহে। মায়া ঈশ্বরের উপাধি এবং অবিদ্যা জীবের আশ্রয়। ফলিতার্থ— প্রতি ব্যক্তিতে অবস্থিত পরিচ্ছিন্ন মায়াই অবিদ্যা।
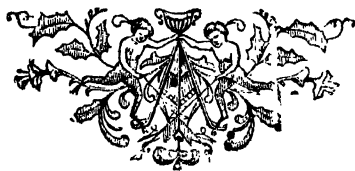
সপ্তম সর্গ।

রাম কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি যাঁহার কথা বলিলেন ও যাঁহাকে জানিতে পারিলে জীব সংসার মুক্ত হয়, সেই দেব কোথায় অবস্থিতি করেন? এবং আমিই বা তাঁহাকে কি প্রকারে লাভ করিতে পারি? তাহা বলুন[১]। বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! আমি যাঁহার কথা বলিলাম সেই দেব দূরে অবস্থিত নহেন। তিনি চৈতন্যরূপে সতত আমাদিগের শরীর মধ্যেই অবস্থিতি করিতেছেন[২]। বৎস! এই পরিদৃশ্যমান সমস্ত বিশ্বই তিনি, পরন্তু সেই সর্ব্বগ কোনও কালে বিশ্ব নহেন। ইনি অদ্বিতীয়; সেই কারণেই বিশ্ব নামক পৃথক দৃশ্য নাই[৩]। যাঁহাকে চন্দ্রশেখর মহাদেব বলিয়া জান, তিনিও সেই চিন্মাত্র; যিনি গরুড়েশ্বর বিষ্ণু, তিনিও সেই চিন্মাত্র; যিনি ভুবনপ্রকাশক সূর্য্য, তিনিও সেই চিন্ময় দেব, এবং কমলোদ্ভব ব্রহ্মাও সেই চিন্ময় দেবতা[৪]।

রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্! জগৎ যদি চেতনমাত্র হইত, তাহা হইলে বালকেরাও তাঁহাকে জানিতে পারিত। যাহা আপনা আপনি জানা যায় তাহার আবার উপদেশ কি?[৫]

মহর্ষি বশিষ্ঠ প্রত্যুত্তর করিলেন, রাম! যদি তুমি বিশ্বকে চিন্মাত্র বা চেতন বলিয়া জানিয়া থাক, তাহা হইলে তুমি অল্পমাত্রও ভবনাশন উপায় জানিতে পার নাই। কেন? তাহা বলিতেছি[৬]। *

এই যে জীবরূপ নামক চেতন, (অন্তঃকরণপ্রতিবিম্বিত চেতনাভাস), এই চেতনই সংসার। এই জীবচেতন বহির্ম্মুখী বৃত্তির দ্বারা (ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বহিরাগত হইয়া) বিষয় দর্শন করে এবং বিষয়কেই সার ভাবে। সেই কারণে তিনি পশু সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। অপিচ, এই জীবভাব হইতেই জরামরণাদি ভয় আবির্ভূত হয়[৭]। এই জীব বস্তুতঃ অমূর্ত্ত; পরন্তু অজ্ঞতা বিধায় সে আপনার অমূর্ত্ততা পরিজ্ঞাত নহে। জীব আপনাকে

* ভাবার্থ এইযে, জগতের জ্ঞান বিদ্যমান থাকিতে মোক্ষের উদয় হয় না। জগদ্‌জ্ঞান লুপ্ত হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান উদিত হইলেই মোক্ষ হয়। সুতরাং ব্রহ্মই জগৎ, এই বিশ্বাস ব্যতীত জগৎ ব্রহ্ম, এ বিশ্বাসে জগদ্‌জ্ঞান লুপ্ত হয় না।

জানে না বলিয়াই দুঃখভাজন হয়। জীব নিজ চৈতন্যে পরিব্যাপ্ত অন্তঃকরণে অবস্থিত থাকাতেই বৃথা অনর্থ ফল অনুভব করিতেছে[৮]। অতএব, পূর্ণস্বভাব ও নিত্যচেতন আত্মার চেত্য দর্শন অর্থাৎ জগ-দর্শন নিবৃত্ত হইলে, অথবা বহির্ম্মুখী গতি রুদ্ধ হইয়া অন্তর্ম্মুখী গতি (আত্মাবগাহী জ্ঞান) উৎপন্ন হইলে, তখন যে তাঁহার পূর্ণাবস্থা প্রকটিত হয়, অর্থাৎ পরিচ্ছেদভ্রান্তি নিবৃত্ত হয়, সেই নিবৃত্তির নাম তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার, এবং তাদৃশ তত্ত্বসাক্ষাৎকার (তত্ত্বজ্ঞান) হইলে তখন আর তাহাকে শোক মোহ আক্রম করে না[৯]। পরাবর পরমাত্মার দর্শন হইলে হৃদগ্রন্থি * ভাঙ্গিয়া যায়, সমুদায় সংশয় ছিন্ন হয়, এবং সঞ্চিত কর্ম্ম সকল পরিক্ষীণ হইয়া যায়[১০]। ভাবিতে পার যে, চিত্ত-নিরোধ দ্বারা চেত্য (দৃশ্য) দর্শন লুপ্ত হইতে পারে; বস্তুতঃ তাহা অসম্ভব। দৃশ্য সকল মিথ্যা, ভ্রান্তির পরিণাম, এ বোধ না হইলে, অন্য উপায়ে কদাচ চিত্তের চেত্যোন্মুখতা নিরুদ্ধ করা যায় না। সুতরাং দৃশ্য দর্শনের শান্তি হওয়াও অসম্ভব হয়। (যোগের দ্বারা চিত্তনিরোধ করিলেও যোগ ভঙ্গের পর পুনর্ব্বার যথা পূর্ব্বং তথা পরে ঘটনা হয়।)[১১]। দৃশ্য মাত্রেই অসম্ভব অর্থাৎ ইন্দ্রজালতুল্য, মিথ্যা, এ বোধ ব্যতীত দৃশ্যাতীত চিৎস্বরূপ মোক্ষের সম্ভাবনা কি? যোগের দ্বারা দৃশ্য-দর্শন লুপ্ত করিলে কি হইবে? তাহাতে জগতের স্বরূপ সাক্ষাৎকার হইবে না। তাহা না হইলেও মোক্ষ হইবে না[১২]।

রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! যাঁহাকে জীব বলিয়া জানায় সংসার যন্ত্রণার মোচন হইতেছে না অর্থাৎ ব্রহ্মভাব ভুলিয়া গিয়া ভ্রমে জীব বলিয়া অবগত হওয়ায় এতদ্বিধ সংসার সংঘটন হইয়াছে, এবং যে জীব ব্যোমরূপী (আকাশের ন্যায় কল্পিত রূপাদি বিশিষ্ট), সে জীব কিরূপ ও কোন্ আধারে অবস্থিত তাহা আমাকে বলুন[১৩]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাঘব। এই যে চেতন জীব, যিনি জন্মরূপ জঙ্গলে (নির্জ্জন ও নির্জ্জল অরণ্যে) পরিক্ষিপ্ত ও বিশীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহাকে যাঁহারা পরমাত্মা বলিয়া জ্ঞান করেন তাঁহারা পণ্ডিত হইয়াও

* হৃদ্‌গ্রন্থি=বুদ্ধির গেরো বা গাঁইট্। বুদ্ধিতে যে আমিত্ব স্থাপন করা আছে, তাহার নাম হৃদ্‌গ্রন্থি। তাহা তখন ভাঙ্গিয়া যায়। অর্থাৎ বুদ্ধি তখন পৃথক্ হইয়া যায়। পৃথক্ হইয়া যায় কোথায়? প্রকৃতিতে মিশিয়া যায় অর্থাৎ লয় প্রাপ্ত হয়।

মূর্খ[১৪।১৫]। কেননা, জীববুদ্ধিই সংসার ও দুঃখপ্রবাহের কারণ। সুতরাং জীবকে জানায় কিছুমাত্র ফল নাই[১৬]। যদি পরমাত্মাকে জানা যায়, অর্থাৎ তাঁহার জীবভাব বিদূরিত হইয়া পরমভাব প্রস্ফুরিত করা যায়, তাহা হইলে জানিবে যে, দুঃখসন্তান (প্রবাহ) ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে। যেমন বিষবেগ নিবৃত্ত হইলে তজ্জনিত বিষূচিকা উপশম প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তেমনি, জীবত্ব বোধের অভাবে ও ব্রহ্মত্বের অববোধে সংসার দুঃখ নিবৃত্ত হয়[১৭]।

রামচন্দ্র বলিলেন, মহর্ষে! যাঁহাকে জানিতে পারিলে, মন সমস্ত মোহ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে, সেই ব্রহ্মের রূপ কি তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন[১৮]। বশিষ্ঠ বলিলেন, বৎস! যে সম্বিদের (জ্ঞানের) বপু অর্থাৎ শরীর নিমেষ মধ্যে দেশ হইতে দেশান্তরে গমন করে, সেই সম্বিদ্‌ই পরমাত্মার রূপ[১৯]। * যে বোধরূপ মহাসমুদ্রে এই অত্যন্তাভাবগ্রস্ত অর্থাৎ ত্রিকাল মিথ্যা জগৎ নামক সংসার ভাসমান আছে, সেই বোধ সমুদ্রই পরমাত্মার রূপ[২০]। যাহাতে দ্রষ্টা, দর্শন, দৃশ্য, এ সকল ক্রম থাকিয়াও নাই অর্থাৎ নিত্য অস্তমিত, যাহা আকাশ না হইয়াও বিপুলত্ব প্রযুক্ত আকাশের তুলনায় তুলিত হয়, তাহাই পরমাত্মার রূপ[২১]। জগৎ শূন্যস্বভাব হইয়াও যদাধারে আপাত দর্শনে অশূন্যের ন্যায় প্রতীত হইতেছে, অথবা এই মিথ্যা জগৎ যাহাতে অবভাসিত হইতেছে, কিম্বা সৃষ্টি যাহাতে প্রবাহাকারে প্রবাহিত হইতেছে, অথবা এই সকল মিথ্যার বিজৃম্ভণ যদাধারে অবস্থিতি করিতেছে, তাহাই পরমাত্মার রূপ[২২]। যিনি মহাচিন্ময়রূপী হইয়াও বৃহৎ পাষাণের ন্যায় জড়ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন, অর্থাৎ পাষাণাদি আকারে প্রকাশিত হইতেছেন, তাহাই পরমাত্মার রূপ[২৩]। যাহার দ্বারা বাহ্য (অধিভূত) ও আভ্যন্তরস্থ (অধিদৈব) বস্তু সকল "আছে" এই ভাব প্রাপ্ত হইতেছে, তাহাই পরমাত্মার রূপ[২৪]। যেমন প্রকাশক পদার্থে আলোক এবং আকাশে শূন্যতা অবস্থিত, তেমনি, যাহাতে এই সকল অবস্থিত তাহাই পরমাত্মার রূপ[২৫]।

* অর্থাৎ মনোবৃত্তি সমারূঢ় হইয়া প্রকাশ পায় বা মনোবৃত্তি উদিত হইলে তাহাতে প্রতিফলিত বা প্রতিবিম্বিত হয়, সেই চৈতন্য নামক বোধই পরমাত্মা ও ব্রহ্ম। বৃহৎ অর্থাৎ পূর্ণ বলিয়া ব্রহ্ম।

রাম বলিলেন, ভগবন্! পরমাত্মা "সৎ—আছেন" এতন্মাত্ররূপী, ইহা কি প্রকারে বোধগম্য করা যাইতে পারে? এবং জগৎ-নামধেয় এই সকল দৃশ্যের অসম্ভব ভাবই (মিথ্যাত্বই) বা কিরূপে স্থির করা যাইতে পারে? তাহা আমাকে দৃষ্টান্ত সহকারে বলুন, অর্থাৎ বুঝাইয়া দিউন[২৬]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রামচন্দ্র! রূপহীন আকাশে যেমন নীলপীতাদি রূপ দেখা যায়, তাহার ন্যায় সেই চিন্ময় ব্রহ্মে এই জগৎ দেখা যাইতেছে, ইত্যাকার নিশ্চয় জ্ঞানের উদয় হইলেই ব্রহ্মের স্বরূপ অবগত হওয়া যায়[২৭]। দৃশ্যমাত্রেই মিথ্যা, অর্থাৎ ভ্রমদৃষ্ট, এ বোধ দৃঢ় ও অসন্দিগ্ধ না হইলে অন্য কিছুর দ্বারা ব্রহ্মের উক্তপ্রকার মহান্ রূপ জানা যায় না[২৮]। তাঁহাকে জানিবার জন্য ভাবা উচিত যে, প্রলয়কালে একমাত্র ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন, ও ছিলেন, এ সকল কিছু থাকে না, ও ছিল না। সেই সময়ে যিনি থাকেন বা ছিলেন, তিনি বোধস্বরূপ, পরে সেই বোধ হইতে এ সকল মায়িকরূপে উৎপন্ন হইয়াছে[২৯]। রাঘব! এই রহস্য হৃদিস্থ করিয়া বিবেচনা কর, ভাবিয়া দেখ, যদি দৃশ্য বুদ্ধি না থাকে, তাহা হইলে তিনি অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম (চৈতন্য) কিসে প্রতিবিম্বিত হইবেন? আবার ইহাও দেখা যায়, আদর্শ অন্ন কিছু প্রতিবিম্ব গ্রহণ না করিয়া অবস্থিতি করে না। (ভাবার্থ এই যে, দ্বৈতাক্রান্ত বুদ্ধিতে অদ্বয় ব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিবিম্বিত হয় না এবং বুদ্ধি ও বিনা প্রতিবিম্বে থাকে না। অর্থাৎ লুপ্ত হইয়া যায়) সেইজন্য, এ পর্য্যন্ত কেহই জগৎ-নামক দৃশ্যের অসত্ত্বাবধারণ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে পরম তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন নাই[৩০,৩১]।

রামচন্দ্র বলিলেন, মহর্ষে! এই মূর্ত্তিমান্ প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড চক্ষুর উপর দীপ্যমান থাকিতে কিরূপে ইহার অসত্ত্বাবধারণ হইতে পারে? অপিচ, এই অত্যন্ত বিস্তৃত জগৎ-নামক স্থূল প্রপঞ্চ সূক্ষ্মরূপী চিন্মাত্র পরব্রহ্মে অবস্থিতি করিতেছে, ইহাই বা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? সর্ষপোদরে কি সুমেরুর সমাবেশ হয়?[৩২]

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাঘব! যদি তুমি কিছু দিন অবিক্ষিপ্ত চিত্তে সাধুসঙ্গ ও সৎশাস্ত্রের আলোচনায় তৎপর থাকিতে পার, তাহা হইলে আমি এক দিনেই তোমার চিত্তস্থ দৃশ্যভ্রান্তি প্রমার্জ্জিত করিতে পারিব। তখন বুঝিবে, সমুদায় দৃশ্যই মৃগতৃষ্ণিকার ন্যায় মিথ্যা। মরুভূমিনিপতিত

সূর্য্যকিরণে জলভ্রান্তি হয় বটে ; পরন্তু সূর্য্য কিরণের জ্ঞান হইলে তখন আর তাহাতে জল জ্ঞান থাকে না। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, জগদাধার ব্রহ্ম-চৈতন্যের জ্ঞান হইলে ও তদাধেয় দৃশ্যের জ্ঞান তিরোহিত হইয়া থাকে। যখন দৃশ্যজ্ঞান পরিমার্জ্জিত হইবে, তখন দ্রষ্টৃত্বজ্ঞানও লুপ্ত হইবে। "দেখা যাইতেছে ও দেখিতেছি," এ বোধ পলায়ন করিলে তখন কেবল বোধ অর্থাৎ কেবলমাত্র চৈতন্য অবশিষ্ট থাকিবে। অন্য কিছু থাকিবে না[৩৩।৩৪]। "দেখা যাইতেছে" এ বোধ থাকিলেই "দেখিতেছি" এ বোধ থাকিবে। "দেখিতেছি" বোধ থাকিলেও "দেখা যাইতেছে" এ বোধ থাকিবে। অর্থাৎ দর্শক দৃশ্যেরই অন্তর্গত। যেমন দুএর অন্তর্গত এক, তেমনি, এক দুএর অন্তর্গত না হইলেও দুএর অধীন হইতে দেখা যায়। এক, আর এক, যোগে দুই হয় বলিয়াই এক দুএর অন্তর্গত। অভিপ্রায় এই যে, দৃশ্যজ্ঞান অর্থাৎ দ্বৈতবোধ প্রলুপ্ত হইলে তৎসঙ্গে একত্ব বোধও প্রলুপ্ত হইয়া যায়[৩৫]। আরও দেখ, যদি এক না থাকে, তাহা হইলে দুইও থাকে না। অতএব, যেমন একত্বযোগী দ্বিত্বের অভাবে কেবলমাত্র তদনুবিদ্ধ অস্তিতা (অস্তি আছে, মাত্র এই ভাবটুকু) প্রতিষ্ঠিত থাকে, তেমনি, দ্রষ্টৃ-দৃশ্য-ভাব অন্তর্হিত হইলে তদ্দ্বয়ের আশ্রয়ীভূত কেবলমাত্র ব্রহ্মসত্তা সুস্থিরা হয়[৩৬]। বৎস! আমি প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক বলিতেছি, শীঘ্রই আমি তোমাতে জগতের মিথ্যাত্ববোধ সঞ্চারিত করিয়া তোমার মনোমুকুর হইতে "অহং" হইতে আরম্ভ করিয়া সমুদায় দৃশ্যমল উন্মার্জ্জিত করিতে সক্ষম হইব[৩৭]। যাহা বস্তুতঃ অসৎ অর্থাৎ যাহা কোনও কালে নাই তাহার অস্তিতাও নাই। যাহা সৎ, তাহারও অসত্তা অসম্ভাব্য। সুতরাং যাহা অবাস্তব, মিথ্যা, যাহা কোনও কালে নাই, তাহার উন্মার্জ্জনে পরিশ্রম কি?[৩৮] এই যে বিস্তৃত জগৎ দেখিতেছ, এ জগৎ আদৌ উৎপন্ন হয় নাই। ইহা সেই নির্ম্মল ব্রহ্ম চৈতন্যেই উপবৃংহিত অর্থাৎ কল্পিত। যখন জগৎ নামধেয় বস্তু নাই, কস্মিন্ কালে উৎপন্ন হয় নাই, তখন তাহার বিদ্যমানতাও নাই। নাই বলিয়াই তাহা দৃশ্যও হয় না। যাহা নাই ও প্রকৃত দৃশ্য নহে, তাহা পরিমার্জ্জন করিতে কি শ্রম?[৩৯।৪০] বৎস রাম! যে ভাবে বলিলে তুমি সেই অবাধিত ব্রহ্মতত্ত্ব সহজে বুঝিতে পারিবে, আমি তোমাকে তাহা সেই ভাবে বহু যুক্তি সংযোগে বলিব। অর্থাৎ বুঝাইয়া দিব[৪১]।

বৎস! জগৎ যখন পূর্ব্বে উৎপন্ন হয় নাই, তখন ইহার বিদ্যমানতা কোথায়? কোথায় দেখিয়াছ—মরুভূমিতে জলাশয় এবং চন্দ্রে দ্বিত্ব বিদ্যমান রহিয়াছে?[৪২] যেমন বন্ধ্যাপুত্র নাই, মরুভূমিতে জলপ্রবাহ নাই, আকাশে বৃক্ষ নাই, তেমনি, ব্রহ্মেও সত্য জগৎ নাই। সেইজন্যই বলিতেছি, জগদ্দর্শন ভ্রান্তিজ্ঞান ব্যতীত অন্য কিছু নহে[৪৩]। রাম! তুমি যাহা যাহা দেখিতেছ, সমস্তই নিরাময় ব্রহ্ম। এই বিষয়টী আমি তোমাকে পশ্চাৎ বলিব এবং বুঝাইয়া দিব। কেবল বাক্যে নহে, যুক্তির দ্বারাও তাহা বুঝাইব[৪৪]। হে উদারমতি রাম! তত্ত্বজ্ঞানীরা যুক্তি সহকারে যে সকল উপদেশ প্রদান করেন, সে সকল উপদেশ অবহেলা করা উচিত নহে। যে মূঢ়চেতা যুক্তিযুক্ত বাক্য অবহেলন পূর্ব্বক অযৌক্তিক বিষয়ে মনোনিবেশ করে, পণ্ডিতেরা তাহাকে অজ্ঞ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন[৪৫]।

সপ্তম সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টম সর্গ

রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! তাহা কোন্ যুক্তিতে জানা যায় এবং কি প্রকারেই বা তাহা বিদিত হওয়া যায় তাহা আমাকে বলুন। তাঁহাকে যদি যুক্তি পথে পাওয়া যায়, অনুভূতি গোচর করা যায়, তাহা হইলে আমার জ্ঞানপিপাসা শেষ হইবে, কিছুই অবশেষ থাকিবেক না[১]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, বৎস! যাহার একটী নাম জগৎ এবং আর একটী নাম মিথ্যাজ্ঞান, সেই অবিচাররূপিণী বিষূচিকা (এক প্রকার রোগ) বহুকাল হইতে বদ্ধমূল হইয়া আছে। সুতরাং তত্ত্বজ্ঞান ব্যতিরেকে কদাচ তাহার শান্তি হইবে না[২]। হে সাধো! হে রামচন্দ্র! আমি তোমার বোধসিদ্ধির নিমিত্ত যে সকল আখ্যায়িকা বলিব; যদি তুমি তাহা মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে, তুমি মুক্তস্বভাব; বদ্ধস্বভাব নহ[৩]। আর যদি তুমি উদ্বেগ বশতঃ তাহার কিয়দংশ শ্রবণ করিয়াই ক্ষান্ত হও, তাহা হইলে, তুমি সৎশাস্ত্র শ্রবণের অযোগ্য পশুধর্ম্ম প্রাপ্ত হইবে; কাযেই সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে না[৪]। যে যে-বিষয়ের প্রার্থনায় যত্নাতিশয় প্রকাশ করে, সে সেই প্রযত্নের সাহায্যে তাহার ফল পায়; তাহার অন্যথা হয় না। আর যে তাহাতে যত্ন প্রকাশ করিতে পরিশ্রান্ত হয়, সে কদাচ প্রার্থিত বস্তু লাভে সমর্থ হয় না[৫]। রাম! যদি তুমি যথার্থতঃই সাধুসঙ্গ ও সৎশাস্ত্র পরায়ণ হইতে পার, তাহা হইলে নিশ্চয়ই এক দিনে, না হয় এক মাসে, সেই পরম পদ পাইয়া কৃতার্থ হইতে পারিবে[৬]।

রামচন্দ্র বলিলেন, গুরো! আপনি শাস্ত্রজ্ঞগণের শ্রেষ্ঠ। আপনি বলুন, আত্মজ্ঞান বিকাশের নিমিত্ত কোন্ শাস্ত্র শ্রেষ্ঠ এবং যাহা জানিলে শোকমুক্ত হওয়া যায় তাহা কি[৭]। বশিষ্ঠ বলিলেন, মহামতে! আত্মজ্ঞান প্রতিপাদক যে সকল শাস্ত্র আছে, সে সকলের মধ্যে এই মহারামায়ণই উত্তম। এই মহারামায়ণ কেবল অধ্যাত্ম শাস্ত্র নহে, ইহা ইতিহাসের মধ্যেও উত্তম ইতিহাস। কেননা ইহা শুনিলে তত্ত্বজ্ঞানের বিকাশ হয়[৮।৯]। যেহেতু এই বাক্যসন্দর্ভাত্মক (বাক্যময়) গ্রন্থের

শ্রবণে অক্ষয় জীবন্মুক্তি লাভ করা যায়, সেইহেতু ইহা পরম পবিত্র[১০]। যেমন স্বপ্নদর্শনের পর "ইহা স্বপ্ন" এইরূপ জ্ঞানের উদয় হইলে তাহার সত্যতা অপগত হয়, তেমনি, এতজ্জগৎ দর্শন পথে থাকিলেও এই শাস্ত্র অবলম্বনে বিচারের পর তাহার সত্যতা অস্তমিত হইয়া থাকে[১১]। এই শাস্ত্রে যাহা আছে; তাহা অন্য শাস্ত্রেও আছে এবং ইহাতে যাহা নাই, তাহা অন্য কোন শাস্ত্রে নাই। পণ্ডিতগণ জানেন, এই শাস্ত্র বিজ্ঞান শাস্ত্রের কোষস্বরূপ[১২]। যে ব্যক্তি নিত্য এই শাস্ত্র শ্রবণ করে, সেই উদারমতি পুরুষের গ্রন্থান্তরপাঠজনিত বোধ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর বোধ উৎপন্ন হয়[১৩]। দুর্ভাগ্য বশতঃ যাহার এই শাস্ত্রে রুচি না হইবে, তাহার উচিত—প্রথমতঃ অন্য কোন সৎশাস্ত্রের আলোচনা করা। তাহা হইলে তিনি যোগ্য কালে সুকৃতের উদয়ে এই শাস্ত্রে অধিকারী হইতে পারিবেন[১৪]। রোগী যেরূপ উৎকৃষ্ট ঔষধ সেবনে রোগমুক্ত হয়, সেইরূপ, যিনি এই শাস্ত্র শ্রবণ করেন তিনি নিঃসন্দেহ জীবন্মুক্তি অনুভব করিতে পারেন[১৫]। এই শাস্ত্র শ্রবণ করিলে শ্রোতা জানিতে পারিবেন, আমাদিগের এই উক্তি বরের অথবা অভিশাপের ন্যায় অনিবার্য্য ফলজনক[১৬]। হে রামচন্দ্র! আত্মবিচার ও তৎকথা ব্যতীত অন্য উপায়ে সংসার দুঃখ নিবারিত হয় না। ধনদান, তপোনুষ্ঠান, বেদাধ্যয়ন, যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান, কি গ্রন্থান্তরের আলোচনা, এ সকল সংসার যন্ত্রণা নিবারণের মুখ্য উপায় নহে[১৭]।

অষ্টম সর্গ সমাপ্ত।

নবম সর্গ।

মহর্ষি বশিষ্ঠ বলিলেন, বৎস! যাহাদের চিত্ত পরমাত্মাতেই অভিনিবিষ্ট, প্রাণ পরমাত্মলাভের জন্য ব্যাকুল, যাহারা সতত পরমাত্মকথাতেই পরিতুষ্ট, এবং যাহারা পরস্পর পরস্পরকে পরমাত্মতত্ত্ব বুঝাইতে আনন্দিত, সেই সকল মহাপুরুষেরাই ব্রহ্মবিচারপরায়ণ, ব্রহ্মবিজ্ঞাননিষ্ঠ ও ব্রহ্মজ্ঞ। অপিচ, যাহা জীবন্মুক্তি তাহাই বিদেহমুক্তি বলিয়া গণ্য[১।২]।

রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্মন্! বিদেহমুক্তের ও জীবন্মুক্তের লক্ষণ কি তাহা আমাকে বিশেষ করিয়া বলুন। আমি তাহা শুনিয়া শাস্ত্র, যুক্তি ও বুদ্ধির দ্বারা সেইরূপ হইতে যত্নবান্ হইব[৩]।

বশিষ্ঠদেব বলিলেন, হে মহামতে! যে ব্যক্তি অনিষিদ্ধ ব্যবহারে অর্থাৎ সদ্ব্যবহারে থাকিয়া এই দৃশ্য বিশ্বকে আকাশের ন্যায় স্বরূপশূন্য বোধ করেন, অথবা যেমন দর্পণপ্রতিবিম্বিত নগর প্রতীয়মান হইলেও তাহা অসত্য, সেইরূপ এই প্রতীয়মান বিশ্বকে অসত্য বলিয়া জানেন, সেই মহাপুরুষ ব্যক্তিই জীবন্মুক্ত[৪]। যিনি সর্ব্বদা জ্ঞাননিষ্ঠ ও কেবলমাত্র ব্যবহারসম্পাদক অথচ কর্ত্তৃত্ববোধশূন্য এবং যিনি জাগ্রৎ কালেও সুষুপ্তের ন্যায় নির্ব্বিকার, তিনিও জীবন্মুক্ত[৫]। যাঁহার মুখপ্রভা সুখে ও দুঃখে সমান থাকে, সুখকালে প্রফুল্ল ও দুঃখকালে ম্লান না হয়, এবং যিনি যথাপ্রাপ্ত জীবিকায় অবস্থিত, তিনিও জীবন্মুক্ত[৬]। যিনি নির্ব্বিকার আত্মায় সুষুপ্তের ন্যায় থাকিয়াও অবিদ্যারূপ নিদ্রার বিনাশ হেতু আত্মাতে জাগ্রৎ থাকেন এবং যাঁহার লোকপ্রসিদ্ধ জাগ্রৎ নাই অর্থাৎ যিনি ইন্দ্রিয়ের অধীনে থাকিয়া কোন কিছু করেন না ও দেখেন না, তাঁহাকেও জীবন্মুক্ত বলা যায়। অপিচ, যাঁহার বোধ বাসনাপরিহীন, তিনিও জীবন্মুক্ত[৭]। নট যেমন রাগদ্বেষাদির অভিনয় করে, সেইরূপ যিনি বাহিরে রাগ, দ্বেষ ও ভয়াদির অনুরূপ আচরণ করিয়াও অন্তরে রাগদ্বেষাদিবর্জ্জিত হন এবং নিতান্ত স্বচ্ছ ব্যোমতুল্য চিৎস্বরূপে অবস্থিতি করেন, তাঁহাকেও জীবন্মুক্ত বলা যায়[৮]। যাহার অহং নাই ও বুদ্ধি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বা পাপপুণ্যাদিতে প্রলিপ্ত না হয়, মনীষিগণ তাঁহাকে

জীবন্মুক্ত বলিয়া জানেন[৯]। যে চিদাত্মার উন্মেষে ও অর্দ্ধ নিমেষে যথাক্রমে লোকত্রয়ের প্রলয় ও উৎপত্তি হয়, সেই চিদাত্মাই প্রকৃত জীবন্মুক্ত[১০]। * যে মহাপুরুষ হইতে লোকের উদ্বেগ হয় না ও যে মহাপুরুষ লোক হইতে উদ্বিগ্ন না হন, এবং যিনি হর্ষক্রোধাদি হইতে বিমুক্ত, তিনিও জীবন্মুক্ত[১১]। যাঁহার সংসারের প্রতি আস্থা নাই, চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় থাকিলেও যিনি সে সকলের অনধীন, এবং চিত্ত থাকিলেও যিনি চিত্তরহিতের ন্যায়, তিনিও জীবন্মুক্ত[১২]। যিনি বিষয়-ব্যবহারে বিদ্যমান থাকিয়াও রাগ, দ্বেষ এবং হর্ষাদিপরিশূন্য ও সুশীতল, যিনি সমুদায় পদার্থে আপনার পূর্ণতা (আপনার সর্ব্বময়তা) অনুভব করেন, তিনিও জীবন্মুক্ত[১৩]। এবম্বিধ জীবন্মুক্ত ব্যক্তি দেহপাতের পর জীবন্মুক্তিপদ ত্যাগ করিয়া স্থির গম্ভীর বিদেহমুক্তিপদ লাভ করিয়া থাকেন। যদ্রূপ পবন চাঞ্চল্য পরিহারের পর স্থিরভাব অবলম্বন করেন তদ্রূপ[১৪]। বিদেহমুক্ত ব্যক্তি পুনর্ব্বার উদিত হন না ও অস্তগতও হন না। তিনি ব্যক্তও নহেন, অব্যক্তও নহেন, দূরস্থও নহেন, নিকটস্থও নহেন। অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী। আরও লক্ষণ এই যে, তিনি অহং ও তদন্য অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদি, উভয়বিধ ভেদবর্জ্জিত[১৫]। তিনি তখন সর্ব্বাত্মা ব্রহ্ম। যেহেতু ব্রহ্ম, সেই হেতু বলা যায়, তিনিই সূর্য্য-স্বরূপে উত্তাপ প্রদান, বিষ্ণুস্বরূপে জগত্ত্রয়ের রক্ষা, রুদ্ররূপে সকলের সংহার ও প্রজাপতিরূপে সৃষ্টি, ইত্যাদি ইত্যাদি বিধান করি-তেছেন[১৬]। এমন কি, তিনিই আকাশ হইয়া বায়ুস্কন্ধ (উপরি উপরি অবস্থিত ৪৯ সংখ্যক বায়বীয় স্তর) বিধারণ করিতেছেন, ঋষিত্ব সুরত্ব ও অসুরত্ব বিধান করিতেছেন এবং কুলপর্ব্বত হিমা-লয়াদি ৮ (বর্ষপর্ব্বত) হইয়া লোকপালদিগকে ধারণ করিতেছেন[১৭]। তিনি ভূমি হইয়া লোকমর্য্যাদা রক্ষা করিতেছেন, তৃণ, গুল্ম ও লতা হইয়া ফলাদি প্রদান দ্বারা প্রাণিধারিগণের হিতসাধন করিতেছেন, জল ও অনলাকার ধারণ করিয়া দ্রবত্ব ও উষ্ণত্ব বহন করিতেছেন, এবং

* অজ্ঞানাবরণ ভঙ্গে চিদাত্মার উন্মেষ এবং আবরণের অর্দ্ধ অবস্থিতিতে তাঁহার অর্দ্ধ নিমেষ। অর্দ্ধ=অসম্পূর্ণ। ভাব এই যে, বিদেহমুক্তি কালে জ্ঞানের কিছুমাত্র আবরণ থাকে না। কারণ এই যে, সাক্ষিচৈতন্যের আবরণ সম্পূর্ণ অসম্ভব। অপিচ, জীবন্মুক্তিতে আবরণ দগ্ধ হইয়া যায় বটে; পরন্তু তাহার লেশ বা আভাস থাকে। যেমন বস্ত্র দগ্ধ হইলেও বস্ত্রের আভাস (বস্ত্রাকার ভস্ম) থাকে, সেইরূপ।

চন্দ্রমা হইয়া অমৃত (জ্যোৎস্না) বর্ষণ করিতেছেন[১৮।১৯]। হলাহল হইয়া মৃত্যু বিস্তার, দিক্ হইয়া তেজঃপ্রকাশ ও তমঃ হইয়া অন্ধকার বিস্তার করিতেছেন। ইনি শূন্যভাবে ব্যোম (ফাঁক) ও পর্ব্বতভাবে অবরোধ (নীরেট্)[২০]। ইনিই অন্তঃকরণপ্রতিবিম্বিত চৈতন্যের দ্বারা জঙ্গমের ও অনভিব্যক্ত চৈতন্যের দ্বারা স্থাবরের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং ইনিই সমুদ্র হইয়া ভূরূপা রমণীর বলয়াকৃতি ভূষণ হইয়াছেন[২১]। ইনিই পরমার্কবপুঃ অর্থাৎ অনাবৃত চিদাত্মরূপে এই বিস্তৃত বিশ্ব প্রকাশ করতঃ স্বয়ং শান্ত অর্থাৎ নির্ব্বিকার স্বরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। অধিক কি বলিব—ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান, এই কালত্রয়ে অবস্থিত দৃশ্য মাত্রেই তিনি[২২।২৩]।

রামচন্দ্র বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! মনুষ্যের পক্ষে সমদৃষ্টি বা অদ্বয় জ্ঞান নিতান্ত দুর্লভ এবং তাহাদের চিত্তও নিতান্ত অস্থির। সেইজন্য আমার বোধ হয়, ঐরূপ মুক্তি মনুষ্যের পক্ষে বিশেষ দুষ্প্রাপ্য[২৪]।

বশিষ্ঠদেব বলিলেন, রাম! সাধু ব্যক্তিরা ব্রহ্মকেই মুক্তি ও নির্ব্বাণ বলিয়া বর্ণন করেন। তাহা যে প্রকারে লাভ করিতে পারা যায়, সম্প্রতি তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করি, শ্রবণ কর[২৫]। হে রামচন্দ্র! তুমি আমি তাহা ও ইহা ইত্যাদি ভাব বিশিষ্ট এই জগৎ প্রতীয়মান হইলেও ইহাকে বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় নিতান্ত অলীক বোধ করিতে পারিলে বর্ণিত প্রকারের মুক্তি লাভ করিতে পারা যায়[২৬]।

রামচন্দ্র বলিলেন, হে বেদবিদ্‌শ্রেষ্ঠ! আপনি বলিলেন, বিদেহমুক্ত ব্যক্তিরাই ত্রৈলোক্য সম্পাদন করিতেছেন। আপনার ঐ উক্তিতে আমার মনে হইতেছে, তাঁহারাই এবম্প্রকার সংসারভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন[২৭]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাঘব! এই ত্রিভুবন যদি বাস্তবতঃ থাকে, তাহা হইলে সেই বিদেহমুক্ত ব্যক্তিরা ঐভাব প্রাপ্ত হইতে পারেন। পরন্তু ত্রৈলোক্যশব্দশব্দিত যা ত্রৈলোক্য নামে কোন বস্তু নাই। ব্রহ্মের সংসারভাব প্রাপ্তির সম্ভাবনা কি? জগৎশব্দ কেবল কল্পনায় অবস্থিত। বস্তুতঃ এ সমুদায় সেই অদ্বিতীয় শান্ত ও প্রকাশমান্ সত্য ব্যতীত অন্য কিছু নহে। সত্য সত্যই নির্ম্মল আকাশস্বরূপ পরব্রহ্মই জগৎ। রাম! আমি বিচার করিয়া দেখিয়াছি, সুবর্ণময় বলয়ের "বলয়" এই শব্দটি নামমাত্র অর্থাৎ কল্পিত সংজ্ঞামাত্র, বস্তুকল্পে তাহার স্বরূপ নির্ম্মল সুবর্ণ। অর্থাৎ বলয় সুবর্ণাতিরিক্ত নহে[২৮।৩১]। যেমন জলতরঙ্গে জল ব্যতীত অন্য

কিছু দৃষ্ট হয় না; যেমন স্পন্দন বায়ু হইতে অভিন্ন; তেমনি, এই জগৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। যেরূপ আকাশে শূন্যত্ব, মরুভূমিতে তাপ এবং আলোকে তেজঃ স্বভাবতঃই অবস্থিতি করে, সেইরূপ, এই ত্রিজগৎ সেই পরব্রহ্মেই অবস্থিতি করিতেছে[৩২।৩৪]।

রামচন্দ্র বলিলেন, মুনিবর! যে অত্যন্তাভাব জ্ঞানে (কোনও কালে জগৎ নাই, ইত্যাকার অবিচলিত জ্ঞানে) জগদ্দ্রষ্টৃত্ব হইতে মুক্তি লাভ করা যায়, আমাকে যুক্তি সহকারে সেই জ্ঞানের উপদেশ করুন। হে ব্রহ্মন্! পরস্পরসাপেক্ষ দ্রষ্টা ও দৃশ্য এই উভয়ের অভাব হইলে যে প্রকারে নির্ব্বাণমাত্র অবশিষ্ট থাকে, এবং জগতের অত্যন্তাসম্ভব-জ্ঞান দ্বারা যে স্বভাবাবস্থিত ব্রহ্মকে অবগত হইতে পারা যায়, এবং যে যুক্তির দ্বারা তাঁহাতে সিদ্ধি লাভ করিতে পারা যায়, এবং যাহা পাইলে আর সাধনের প্রয়োজন থাকিবেক না, সেই সমস্ত আমার নিকট কীর্ত্তন করুন[৩৫।৩৮]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে বুদ্ধিমান্ রাম! "জগৎ" এই মিথ্যা জ্ঞানটী বহু-কাল (অনাদি কাল) হইতে মানব হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া আছে বটে; পরন্তু বিচার দ্বারা তাহা নির্ম্মূল হইতে পারে। মিথ্যা জ্ঞান এক-প্রকার রোগ, বিচার তাহার শান্তিমন্ত্র[৩৯]। যেমন পর্ব্বতশিখরোপরি আরোহণ ও তাহা হইতে অবরোহণ করা সুসাধ্য নহে; সেইরূপ, ঐ বদ্ধমূল অজ্ঞানকে সহসা সমুৎসাদন করা নিতান্ত সুকর নহে[৪০]। অতএব অভ্যাসযোগ, যুক্তি, ন্যায় ও উপপত্তির দ্বারা অথবা ন্যায়সঙ্গত উপদেশ দ্বারা যে প্রকারে জগদ্ভ্রান্তির শান্তি হইতে পারে, তাহা আমি তোমার নিকট কীর্ত্তন করি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর[৪১]। হে রামচন্দ্র! হে সাধো! তোমার বোধসিদ্ধির নিমিত্ত আমি যে আখ্যায়িকা বর্ণন করিব; তুমি যদি তাহা মনোযোগের সহিত শ্রবণ কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই মুক্ত হইতে পারিবে[৪২]। আপাততঃ আমি তোমার নিকট উৎপত্তি প্রকরণ (জগৎ যে প্রকারে উৎপন্ন হইয়াছে তাহার ক্রম) কহিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। ইহা শ্রবণ করিলে অবশ্যই সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারিবে[৪৩]। ভ্রান্তিময় জগৎ জন্মবান্ না হইয়াও ও জন্মরহিত শূন্যের ন্যায় হইয়াও যে প্রকারে প্রতিভাত হইতেছে, এই প্রকরণে আমি তোমার নিকট তাহাই বলিব। তাহা

শ্রবণ করতঃ হৃদয়ে ধারণ করিবে। করিলে সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারিবে[৪৪]।

সর্ব্বপ্রকার বস্তু সমন্বিত সুরাসুর কিন্নরাধিষ্ঠিত স্থাবরজঙ্গমাত্মক এই জগৎ—যাহা দৃষ্ট হইতেছে—মহাপ্রলয় উপস্থিত হইলে ইহার কিছুই থাকিবে না। সকলই বিনষ্ট হইবে। তখন না তেজঃ, না অন্ধকার, না কোন আখ্যা, কিছুই থাকিবে না। থাকিবে কি? থাকিবে—কেবলমাত্র এক অনির্দ্দেশ্য সৎ। অর্থাৎ যাহা অখণ্ডসত্তা তাহাই অবশিষ্ট থাকিবে[৪৫।৪৭]। তাহা শূন্য নহে, আকৃতিবিশিষ্ট নহে, দৃশ্য ও দর্শন নহে, পূর্ণ ও অপূর্ণ নহে, সৎ ও অসৎ নহে, ভাব ও অভাব নহে। তবে তাহা কি? তাহা কেবল, চিন্মাত্র, অজর, অমর, আদি মধ্য ও অন্ত বিহীন ও চিত্তরহিতচিৎ[৪৮।৫০]। পরে তাদৃশ সৎ (ব্রহ্ম) পদার্থ হইতে জগতের প্রস্ফুরণ হইয়া থাকে। মুক্তা ও মুক্তাভোজী হংস যেরূপ; জগৎকারণ সৎ ও জগৎ ঠিক সেইরূপ। * সেই সৎ "ইহা বা তাহা" বলিবার অযোগ্য। সুতরাং তাহা সৎ ও অসৎ উভয়াত্মক[৫১]। সেই সদ্বস্তু চিরকালই কর্ণ, জিহ্বা, নাসা ও নেত্রাদি বিহীন অথচ শ্রবণ, আস্বাদন, ঘ্রাণ, স্পর্শন ও দর্শন করিয়া থাকেন[৫২]। যে আলোকে আলোকনীয় আছে বা নাই বলিয়া জানা যায়, সেই চৈতন্য নামক আলোক তিনি। অপিচ, অজ্ঞান কালে যাঁহাতে বিচিত্র সৃষ্টি এবং অজ্ঞান নিবৃত্তিতে যিনি অনাদি নিধন চিৎপ্রকাশ, তিনিও ইনি[৫৩]। যোগীরা অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে কৃষ্ণতারক (চক্ষুর কাল মণি) দ্বয় অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রের মধ্যগামী করিয়া যাঁহাকে দেখেন, সেই ব্যোমাত্মা ইঁহার অনতিরিক্ত[৫৪]। যে বিভুর কারণ (জনক) শশশৃঙ্গের ন্যায় অলীক, এবং তরঙ্গভঙ্গ যদ্রূপ সমুদ্রের কার্য্য, এই জগৎ যাঁহার তদ্রূপ কার্য্য, এবং যিনি চিত্তস্থানে অবস্থিতি করিয়া তাহাকে (চিত্তকে) নিরন্তর উজ্জ্বলিত করিতেছেন, যাঁহার চৈতন্যাত্মক দীপের দীপ্তিতে ত্রিজগৎ ভাসমান, যাঁহার অভাবে এই সকল প্রকাশ পদার্থ অর্থাৎ চন্দ্রসূর্য্যগ্রহ নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্কগণ তিমিরতুল্য হয়, এবং যাঁহা হইতে

---

* হংসেরা মুক্তাভোজী অর্থাৎ মুক্তাকর শুক্তি ভক্ষণ করিয়া থাকে এবং তদ্দ্বারা তাহাদের শরীর বৃদ্ধি পায়। একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে, বলিতে পারা যায়, হংসশরীর মুক্তারই পরিণাম। সে ভাবে আগে মুক্তা ও পরে হংস এবং মুক্তাই হংস, এরূপ বলা যাইতে পারে। তাহা যেমন বলা যাইতে পারে, তেমনি, আগে সৎ পরে জগৎ সুতরাং সৎই জগৎ, এরূপ বলা যাইতে পারে।

এই ত্রিজগৎরূপ মৃগতৃষ্ণিকা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে,[৫৫।৫৭] যিনি মনোভাবাপন্ন হইলে এই জগৎ সমুদিত হয় ও যাঁহার অস্পন্দে অর্থাৎ মনোভাব ত্যাগে এ সকল বিলীন হয়, জগতের নির্ম্মাণ ও বিলয় যাঁহার বিলাস ; যিনি সর্ব্বব্যাপক, স্পন্দ ও অস্পন্দরূপী, যাঁহার স্বভাব নির্ম্মল ও অক্ষয়,[৫৮।৫৯] যাঁহার সত্তা ব্যবহার দশায় স্পন্দাস্পন্দরূপী ; পরন্তু বস্তু দর্শনে বায়ুর ন্যায় সর্ব্বব্যাপিনী,[৬০] যিনি সর্ব্বদা প্রবুদ্ধ ও সর্ব্বদা সুষুপ্ত, যিনি সুপ্তও নহেন, প্রবুদ্ধও নহেন,[৬১] যাঁহার অস্পন্দে শান্ত ও শিব (পরম মঙ্গল), যাঁহার প্রস্পন্দে ত্রিজগৎ অবস্থিতি করিতেছে, যিনি এক ও পূর্ণ,[৬২] যিনি পুষ্পস্থ সুগন্ধের সহিত উপমিত হন, নশ্বর পদার্থের নাশেও যাঁহার অবিনাশস্বভাব প্রতিষ্ঠিত থাকে, যিনি শুক্ল পটের শুক্লত্বের ন্যায় প্রত্যক্ষ হইয়াও অপ্রত্যক্ষ, যিনি মূকের তুল্য হইয়াও অমূক, যিনি নিত্যতৃপ্ত হইয়াও ভক্ষণ করেন ও ক্রিয়াতীত হইয়াও সকল কার্য্যের কর্ত্তা হন,[৬৩।৬৪] যিনি অনঙ্গ হইয়াও সর্ব্বাঙ্গযুক্ত, করচরণাদি না থাকিলেও শাস্ত্রে যাঁহাকে সহস্রকর বলে, চক্ষুঃ না থাকিলেও যাঁহাকে সহস্রলোচন বলা হয়, কোন প্রকার সংস্থান অর্থাৎ গঠন নাই অথচ যাঁহার দ্বারা এই ত্রিজগৎ ব্যাপ্ত,[৬৫] যিনি ইন্দ্রিয়বিহীন হইয়াও অশেষেন্দ্রিয়ক্রিয়াকারী, যাঁহার মন নাই অথচ মানস কার্য্য (মানস কার্য্য = মায়িক সংকল্প) আছে, অর্থাৎ যাঁহার সৃষ্টি মানস সৃষ্টির (মনোরাজ্যের) অনুরূপ,[৬৬] যাঁহার অনবলোকনে এই সংসাররূপ উরগভয় উপস্থিত হইয়াছে, যাঁহার দর্শনে সর্ব্বকামনা ও সর্ব্বভয় তিরোহিত হয়,[৬৭] যেমন নট সকল দীপ থাকায় নাট্যক্রিয়া করিতে সমর্থ হয়, তেমনি, যাঁহার বিদ্যমানতায় চিত্তের স্পন্দপূর্ব্বক চেষ্টা প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে,[৬৮] যেমন বারিধি হইতে তরঙ্গরাশি, নানা আকারের কল্লোল ও অসংখ্য ক্ষুদ্র লহরী উৎপন্ন হয়, তেমনি, যাঁহা হইতে ঘটপটাদি বিবিধ বস্তু সমুৎপন্ন হইয়াছে ও হইতেছে,[৬৯] সেই একই চিদাত্মা অজ্ঞানোত্থ ভেদ বৃত্তির প্রভাবে নানা জড় প্রপঞ্চে নানা রূপে প্রকাশ পাইতেছেন। যেমন একই কাঞ্চন কটক, অঙ্গদ ও কেয়ূর প্রভৃতি বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়, তেমনি, সেই একই চিদাত্মা সেই সেই ভ্রমময় শত শত ও সহস্র সহস্র পদার্থের আকারে সমুদিত হইতেছেন[৭০]। হে, রামচন্দ্র ! অজ্ঞান ত্যাগ হইলেই সেই বোধাত্মা তোমাতে, আমাতে ও অন্যত্র, সর্ব্বত্রই এক

বলিয়া অবধৃত হইবে। যে আত্মাকে তুমি জানিতেছ, আমি ও এই সকল লোক সেই আত্মাকেই জানিতেছি ও জানিতেছে। চিদাত্মা এক বৈ দুই নহে। আর যাহারা অজ্ঞানাত্মা (অজ্ঞানপরিচ্ছিন্ন জীব) তাহারা তুমি, আমি ও এই সকল, এবংক্রমে ভেদ দর্শন করে[১১]। সলিল হইতে তরঙ্গের ন্যায় তাঁহা হইতে এই ভঙ্গুর ও দৃশ্য জগৎ প্রস্ফুরিত হইয়াছে সত্য, বটে, এ সকল আপাততঃ তাঁহা হইতে ভিন্ন বলিয়া বোধ হয় বটে; পরন্তু তাহা বাস্তব নহে[১২]। তাঁহা হইতেই হেমন্ত, শিশির ও বসন্তাদি কালের উৎপত্তি ও পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তন হইতেছে, তাঁহারই দ্বারা দৃশ্য সকল দর্শনের গোচর হইতেছে, এবং তাঁহারই প্রকাশে জগৎ প্রকাশিত হইতেছে[১৩]। রাঘব! তুমি যে ক্রিয়া, রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ এবং চেতনাদি জানিতেছ, সে সমস্তই সেই দেব। এবং যাঁহার দ্বারা ঐ সমস্ত জানিতেছ, তিনিও সেই দেব[১৪]। হে সাধো! দ্রষ্টা, দর্শন ও দৃশ্য, এই তিনের মধ্যে প্রকাশরূপে অবস্থিত যে দর্শন—তাহাই চৈতন্যের স্বরূপ—তাঁহাকে অবগত হইতে পারিলেই আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারা যায়[১৫]। সেই ব্রহ্ম অজ, অজর, অনাদি, শাশ্বত, অমল ও মঙ্গলময়, অথচ শূন্যপ্রায়। অর্থাৎ অমূর্ত্ত। তিনিই সকল কারণের কারণ, অনুভবরূপী, অথচ অবেদ্য। অর্থাৎ তাঁহাকে কেহ জানিতে পারে না পরন্তু তিনি এই চরাচর বিশ্ব জানিতেছেন[১৬]।

নবম সর্গ সমাপ্ত।

দশম সর্গ।

রামচন্দ্র বলিলেন, মুনিবর! মহাপ্রলয় উপস্থিত হইলে যাহা অবশেষ থাকে তাহা আকার ও নামাদি রহিত, সে বিষয়ে সংশয় নাই। কিন্তু তাঁহা যে শূন্য নহে, প্রকাশ নহে, তমঃ নহে, ভাস্য (প্রকাশার্হ) নহে, চৈতন্যরূপী নহে এবং জীবও নহে, এ সকল কথার অর্থ কি? এবং কি প্রকারেই বা ঐ সকল কথার অর্থ সঙ্গত হইতে পারে?[১।২] অপিচ, তাহা কিজন্য বুদ্ধিতত্ত্ব ও মন নহে? ও কি নিমিত্তই বা তাঁহাতে তুমি আমি, এ সকল প্রভেদ নাই, আপনি একবার বলিলেন, তাহা কিছুই নহে, আবার বলিলেন, তাহাই সমস্ত। আপনার তদ্বিধ বাক্‌ভঙ্গী আমাকে যেন মুগ্ধ করিতেছে। এক্ষণে যাহাতে আমার মোহভঙ্গ হয় তাহার উপায় বিধান করুন[৩।৪]।

বশিষ্ঠদেব বলিলেন, রাম! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলে তাহা বিষম হইলেও, যেমন অংশুমালী (সূর্য্য) সমুদিত হইয়া অন্ধকার বিনষ্ট করেন, সেইরূপ, আমি অনায়াসে তোমার ঐ সমস্ত সংশয় ছেদন করিব[৫]। হে রামচন্দ্র! আমি যাহা বলি তাহা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর।

মহাপ্রলয় উপস্থিত হইলে, সেই যে সৎ অবশিষ্ট থাকেন, তিনি যে নিমিত্ত শূন্য নহেন, তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করি, শ্রবণ কর[৬]। যেরূপ অনুৎকীর্ণ স্তম্ভে (খোদাই করা হয় নাই এমন প্রস্তরের অথবা কাষ্ঠের থামে) কাষ্ঠপুত্তলিকা অবস্থিতি করে, তাহার ন্যায় এই জগৎ সেই পরব্রহ্মেই অবস্থিতি করে, সেজন্য তাহা শূন্য নহে। (শূন্য নাম-রূপ-আখ্যা-রহিত, অভাব বা বন্ধ্যাপুত্রাদির ন্যায় মিথ্যা পদার্থ, সুতরাং তাহাতে কোন কিছুর অবস্থান অসম্ভব)। এই জগৎ নামক মহাভোগ সত্যই হউক; আর মিথ্যাই হউক, যাহাতে অবস্থিতি করতঃ প্রতিভাত হইতেছে, তাঁহাকে কি প্রকারে শূন্য বলিতে পারা যায়?[৭।৮] যেমন অনুৎকীর্ণপুত্তলিক স্তম্ভ পুত্তলিকাশূন্য নহে, সেইরূপ, ব্রহ্মও জগৎশূন্য নহেন। শিল্পীর শিল্পক্রিয়ায় স্তম্ভলুকায়িত পুত্তলিকা সকল স্তম্ভ হইতেই প্রাদুর্ভূত হইতে দেখা যায়। তাহার ন্যায় ব্রহ্ম হইতেই মায়ার কৌশলে

জগতের আবির্ভাব হইয়াছে। সেই কারণে বলিয়াছি, সে পদ অর্থাৎ পরব্রহ্ম পদ শূন্য নহে[৯]। যেমন সুস্থির সলিলে তরঙ্গের সদ্ভাব ও অসদ্ভাব উভয়ই আছে, তেমনি, পরব্রহ্মে জগতের শূন্যতা ও অশূন্যতা উভয়ই বিদ্যমান রহিয়াছে[১০]। অন্যান্য উপকরণ থাকিলেও যেমন কর্ত্তার আকাঙ্ক্ষা বা ইচ্ছা না থাকিলে পুত্তলিকার রচনা সম্পন্ন হইতে পারে না, তেমনি, সর্ব্বধ্বংস মহাপ্রলয়ের পরেও জগৎ সর্জ্জন হইতে পারে না। এইরূপ আপত্তি উত্থাপন করতঃ বিপরীতবুদ্ধি জনগণ স্তম্ভস্থিত পুত্তলিকার দৃষ্টান্তে বিমুগ্ধ হন অর্থাৎ তাহা বুঝিতে অপারক হন[১১]। তাঁহারা ভাবেন, জগৎ অনন্ত পরমাত্মায় বিলীন হইলে কে তাহা হইতে পুনর্ব্বার তাহার আবির্ভাব করিবে? কে তাহার কর্ত্তা হইবে? কেহই ত থাকে না? কিন্তু রাম! পরমার্থ পক্ষে জগতের উৎপত্তি ও স্থিতি সম্বন্ধে ঐ দৃষ্টান্ত একাংশে, সর্ব্বাংশে নহে। অথাৎ উক্ত দৃষ্টান্ত কেবল আবির্ভাবাংশে, কর্ত্তাদি অংশে নহে[১২]।

বস্তুতঃই এই জগৎ সেই ব্রহ্ম হইতে কোনও কালে সত্য সত্যই উদিত ও অস্তমিত হয় না। কেবল ও সৎস্বরূপ সেই পরব্রহ্মই বর্ণিত প্রকার স্বকীয় স্বরূপে অবস্থিতি করিতেছেন[১৩]। তাঁহাকে যে শূন্য বলিয়া কল্পনা করা যায়, তাহা অশূন্য অপেক্ষা। নচেৎ একমাত্র অশূন্য হইতে শূন্য ও অশূন্য উভয়ের উৎপত্তি অসম্ভব হয়[১৪]। সেই ব্রহ্ম সূর্য্য, অনল, ইন্দু এবং তারাদি ভূত সকল দ্বারা প্রকাশিত হন না। বস্তুতঃ সেই অব্যয় পরমাত্মায় সূর্য্যানলাদির প্রকাশ সম্বন্ধ সর্ব্বথা অসম্ভব। রাম! এই ভাবের ভাবুক হইয়া আমি বলিয়াছি, তিনি ভাস্য নহেন অর্থাৎ প্রকাশ্য নহেন[১৫]। কোন কিছুতে ভৌতিক প্রকাশের অভাব দেখিলে তাহাকে আমরা তমঃ বলি। কিন্তু তাঁহাতে (পরব্রহ্মে) পৃথ্ব্যাদি প্রকাশক অগ্ন্যাদি ভূতের প্রকাশ প্রসর প্রাপ্ত হয় না। প্রত্যুত সেই ব্যোমরূপী স্বপ্রকাশ পরমাত্মার নিকট ভৌতিক প্রকাশ অভিভূত হইয়া যায়। সেই কারণে বলিয়াছি, তাহা তমঃ নহে[১৬]। তিনি যে স্বপ্রকাশ পদার্থ, পরপ্রকাশ্য নহেন, সে বিষয়ে এক মাত্র অনুভূতিই প্রমাণ। তিনি বুদ্ধ্যাদি পদার্থেরও অন্তরে অবস্থান করতঃ বুদ্ধ্যাদিকে প্রকাশ করিতেছেন। তিনি সাক্ষাৎ অনুভূতিস্বরূপ, সেজন্য তাঁহারই দ্বারা অন্যান্য পদার্থ অনুভবগম্য হয়। অথচ তিনি নিজে অননুভবনীয়[১৭]।

তিনি কথিতপ্রকারের তমঃ ও প্রকাশ, উভয়েরই অতীত। সেই কারণে বলিয়াছি, ব্রহ্মপদ অজর অর্থাৎ অক্ষয় অব্যয়। তিনিই এই জগৎস্থিতি-রূপ ধনের আগার এবং তাঁহাকে তুমি আকাশের উদরের ন্যায় বাধা-রহিত, অসীম ও স্বচ্ছ বলিয়া জানিবে[১৮]। রামচন্দ্র! যেমন বিল্বফলের সহিত তাহার অভ্যন্তরের বিশেষ অর্থাৎ প্রভেদ নাই, (উপরেও স্থূল, ভিতরেও স্থূল), সেইরূপ, ব্রহ্মের সহিত জগতের কিছুমাত্র প্রভেদ নাই[১৯]! যেমন সলিলের অন্তর্গত বীচি (বীচি=ক্ষুদ্র লহরী), যেমন মৃত্তিকার অন্তর্গত ঘট, তেমনি, এই জগৎ যাহার অন্তর্গত বা যাহাতে অবস্থিত, কিরূপে তাহাকে শূন্য (নাই অথবা মিথ্যাপদার্থ) বলিতে পারি?[২০] যদি বল, জলান্তর্গত মৃত্তিকাকে জলীয়স্বভাব এবং ঘটান্তর্গত জলকে ঘটের স্বভাব প্রাপ্ত হইতে দেখা যায় না। সুতরাং ব্রহ্মান্তর্গত জগতেরও ব্রহ্মস্বভাবতা কিরূপে বা কি দিয়া বুঝা যাইবে? এই বিষয়ে আমার বক্তব্য—ঐ দৃষ্টান্ত বিষম। অর্থাৎ অতুল্য বা সমান নহে। মৃত্তিকা ও জল সাকার পদার্থ, পরন্তু ব্রহ্ম নিরাকার বস্তু। সাকার পদার্থের ব্যবস্থা অন্যরূপ, নিরাকার বস্তুর ব্যবস্থা অন্যবিধ। বিশদাকার ব্রহ্ম নিরাকার বিধায় তদন্তর্গত জগৎও নিরাকার[২১]। আকাশ অপেক্ষা অধিক সুনির্ম্মল চিদাকাশ, যাহা তদন্তর্গত, তাহাও তদ্রূপ। ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত চিদাকাশকে জগৎ বলিতে পার সত্য, পরন্তু তাহা বস্তুকল্পে জগৎ নহে[২২]। যেমন মরীচির (সূর্য্য কিরণের) অভ্যন্তরে তীক্ষ্ণতা ব্যতীত অনুভব কর্ত্তা অন্য কিছু অনুভব করেন না, তেমনি, চিদাকাশেও (চৈতন্যরূপ আকাশেও) চেত্য অর্থাৎ চিতিগ্রাহ্যতা (চিতি=জ্ঞান) ব্যতীত অন্য কিছু থাকা লক্ষ্য হয় না। ভাবার্থ এই যে, দর্শন বা জ্ঞান দৃশ্যের বা জ্ঞেয়ের অনতিরিক্ত[২৩]। সেই কারণে বলা যায়, চিৎ অচিৎ উভয়রূপই প্রোক্ত পরমাত্মায় অবস্থিত। অর্থাৎ তিনিই দর্শন এবং তিনিই দৃশ্য। অথচ তাঁহাতে বাস্তব দৃশ্যতা নাই। যেমন বাস্তব দৃশ্যতা নাই তেমনি বাস্তব জগৎও নাই[২৪]। রূপালোক অর্থাৎ বাহ্যিক দর্শন এবং মনস্কার অর্থাৎ অন্তঃস্থ বিজ্ঞান, সমস্তই তিনি। কিছুই তদতি-রিক্ত নহে। বিশ্ব যেমন ভাবেই থাকুক, অবশেষে হয় সুষুপ্ত না হয় তুরীয়[২৫]। * অজ্ঞেরা ইহাকে যেরূপ দৃষ্টিতে দেখেন শান্তবুদ্ধি সুষু-

---

* সুষুপ্তিতেও দৃশ্য জগৎ থাকে না, নির্ব্বাণেও থাকে না। সুষুপ্তিতেও ব্রহ্মে জগতের

গুত্মা যোগীরা ব্যবহারপরায়ণ হইলেও তাঁহারা ইহাকে ঠিক্ তদ্রূপ দেখেন না অর্থাৎ তাঁহারা অজ্ঞ দিগের ন্যায় ব্যবহারকারী নহেন। ব্যবহারনিষ্ঠ হইলেও তাঁহারা সর্ব্বজ্ঞানের আধার স্বরূপ নিরাভাস পরব্রহ্মে অবস্থিতি করিয়া থাকেন[২৬]। রামচন্দ্র! যেমন আকারবিশিষ্ট সুস্থির সলিলে আকার-বিশিষ্ট মহোর্ম্মিমালা অবস্থিতি করে, সেইরূপ, নিরাকার পরব্রহ্মে তৎসদৃশ জগৎ অবস্থিতি করিতেছে[২৭]। যাহা সেই পূর্ণ ব্রহ্মে ঔপাধিক ভেদা-রভাসে প্রকাশিত, তাহাও পূর্ণ। এ রহস্য যৌক্তিক অর্থাৎ যুক্তির দ্বারা বিজ্ঞেয়। যাহা পূর্ণ তাহা নিরাকার। ব্রহ্ম পূর্ণ; সেজন্য ব্রহ্ম নিরাকার সুতরাং তৎপ্রকাশিত জগৎও পূর্ণতা বিধায় নিরাকার। ইহার যে আকার, তাহা মিথ্যা। সুতরাং নিরাকার দিক্‌টাই সত্য[২৮]। হে রাঘব! পূর্ণ হইতে বিসৃত হইয়া যাহা অবস্থিতি করে; তাহাও পূর্ণ। অতএব, এই বিশ্ব চিরকালই পৃথক্ ভাবে অনুৎপন্ন। যাহা উৎপন্ন হইয়াছে তাহা সেই ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছু নহে[২৯]। সেই পরম পদে যাহার চিত্ত অভিনিবিষ্ট হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে জগৎ নাই। যদি অনুভব কর্ত্তা না থাকে তাহা হইলে বুঝিয়া দেখ, মরীচিমালার শ্রীকৃতা কোথায় থাকে?[৩০] রাম! সেই পরব্রহ্ম কথিত প্রকারেই প্রতিভাত হইতেছেন, এ বিষয়ে অসন্দিগ্ধ প্রত্যয় আহরণ করিবে। এই সমস্ত জীব তাঁহারই প্রতিবিম্ব। তাঁহার প্রতিবিম্ব ভাব ব্যতীত কদাচ জীব ভাবের উৎপত্তি হইতে পারে না। প্রোক্তকারণে তাঁহাকে জীববান্ বলা যায়। তিনি পরমাণু হইতেও ক্ষুদ্র এবং আকাশ হই-তেও বৃহৎ। তিনি শুদ্ধ ও শান্তস্বরূপ[৩১।৩২]। দিক্‌কালাদির দ্বারা অন-বচ্ছিন্ন বলিয়া তাঁহার স্বরূপ আতিবিস্তৃত। সেই আদ্যন্তরহিত পরমাত্মা নিত্যপ্রকাশ স্বরূপ[৩৩]। যে স্থানে চৈতন্যের আবির্ভাব নাই সে স্থানে জীবতা, বুদ্ধিতা, চিত্ততা, ইন্দ্রিয়ত্ব এবং অনিলবায়ুরূপিণী বাসনা প্রভৃতি কিছুই নাই (বাসনা কি? বাসনা এক প্রকার বায়ুপ্রভেদ অর্থাৎ বাতিক বিশেষ)[৩৪]। হে রাঘব! এই প্রকারে সেই পূর্ণ, অজর, শান্ত ও আকাশ অপেক্ষা অধিক নির্ম্মল পরমাত্মা আমাদিগের দৃষ্টিগোচরে অব-স্থিতি করিতেছেন[৩৫।৩৬]।

রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! সেই অনন্ত চিদাকৃতি পরমার্থের রূপ

প্রলয় এবং মোক্ষেও জগতের প্রলয়। এ স্থলে প্রলয় শব্দের অর্থ অদর্শন।

কিম্বিধ তাহা বোধবৃদ্ধির নিমিত্ত পুনর্ব্বার আমার নিকট কীর্ত্তন করুন[৩৭]। বশিষ্ঠদেব বলিলেন, রাম! মহাপ্রলয় উপস্থিত হইলে সেই মূল কারণ ব্রহ্ম মাত্র অবশিষ্ট থাকেন। তাঁহার স্বরূপ যাহাতে তোমার বোধগম্য হইতে পারে তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করি, শ্রবণ কর[৩৮]। সমাধির দ্বারা সমুদায় মনোবৃত্তি বিলীন হইলে মন তখন ইন্ধনশূন্য অনলসদৃশ নিঃস্বরূপ ও আখ্যারহিত হইয়া যায়। তৎকালে যে সৎ অর্থাৎ সত্তা থাকে, সেই অবিনাশিনী কূটস্থ সত্তা সেই মূলকারণ ব্রহ্ম বস্তুর স্বরূপ[৩৯]। "দৃশ্য কিছুই নাই এবং দৃশ্যের অভাব হেতু দ্রষ্টাও বিলীনবৎ হইয়াছে" এরূপ হইলে তৎকালে যে বোধ বিদ্যমান থাকে, সেই বোধই পরমাত্মার রূপ[৪০]। চৈতন্যের জীবভাবরহিত হইয়া গেলে যে নির্ম্মল প্রশান্ত চিন্মাত্র বিদ্যমান থাকে, সেই পূর্ণ চিন্মাত্র ভাবই পরমাত্মার রূপ[৪১]। জীবদ্দেহে জল বায়ু অগ্নি প্রভৃতি সংলগ্ন হইলে যদি চিত্তে স্পর্শজনিত বিকার (দুঃখাদি) না জন্মে, তাহা হইলে সেই নির্ব্বিকার চিত্তের যেরূপ রূপ অনুভূতি গোচর হয়, সেইরূপ রূপ পরমাত্মার[৪২]। মন স্বপ্নবর্জ্জিত জাড্যরহিত অনন্ত অপরিচ্ছিন্ন ও চিরসুষুপ্ত হইলে তাহার স্বরূপ যেরূপে অনুভবনীয়, প্রলয়াবশিষ্ট ব্রহ্ম সেইরূপে অনুভবনীয়[৪৩]। আকাশের রহস্য, শিলার হৃদয় ও পবনের হৃদয় যেরূপ অচেত্য; চিৎস্বরূপ ব্যোমাত্মা পরমাত্মার রূপ সেইরূপ[৪৪]। * জীবের চেত্য (জ্ঞান গ্রাহ্য) বস্তু বিষয়ক জ্ঞান পরিত্যক্ত হইলে যে পরমা শান্তি ও নির্ব্বিশেষ সত্তা বিদ্যমান থাকে, সেই শান্তিময়ী সত্তাই আদিবস্তুর রূপ[৪৫]। যাহা চিৎপ্রকাশের অন্তরে (আনন্দময় কোষ), যাহা আকাশ প্রকাশের (মায়াকাশের) অন্তরে এবং যাহা ইন্দ্রিয়বৃত্তির অন্তরে প্রস্ফুরিত হয়, তাহাই পরব্রহ্মের রূপ[৪৬]। যাঁহার দ্বারা বহিরবস্থিত দৃশ্য ঘটপটাদি ও অন্ধকার প্রভৃতি ও অন্তঃস্থ মনোবৃত্তি প্রভৃতি প্রকাশ প্রাপ্ত হইতেছে, যাহা জীবের ও জ্ঞানের সাক্ষী এবং যাহা বেদান্তাদি শাস্ত্রে চিৎ নামে প্রসিদ্ধ, তাহাই সেই পরমাত্মার রূপ[৪৭]। নিত্য অনুদিতরূপী হইলেও যাহা হইতে জগৎ সমুদিত হইয়াছে ও হইতেছে, ভিন্ন হউক, আর অভিন্ন হউক, তাহা পরমাত্মার রূপ ব্যতীত অন্য

* আকাশের রহস্য শূন্যাকারত্ব। বায়ুর হৃদয় অর্থাৎ রহস্য অন্তরে ও বাহিরে পূর্ণতা। পাষাণের হৃদয় নিবিড়ত্ব।

কিছু নহে[৪৮]। যিনি ব্যবহার কার্য্যে নিয়োজিত থাকিয়াও আপনাকে পাষাণবৎ (নির্লিপ্ত ও অন্তরে বাহিরে একরূপ) বোধ করেন এবং যাহা ব্যোম না হইয়াও ব্যোম, তুমি অবগত হও যে তাহা পরমাত্মার রূপ ব্যতীত অন্য কিছু নহে[৪৯]। যাহাতে বেদ্য (ঘটাদি), বেদন (জ্ঞান), এবং বেত্তৃত্ব (জ্ঞাতার ধর্ম্ম), এই ত্রিবিধ ধর্ম্ম উদিত ও অস্তমিত হইতেছে, তাহা পরমাত্মার রূপ[৫০]। মহান্ আদর্শে প্রতিবিম্বপাতের ন্যায় যাহাতে জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞাতৃত্ব প্রতিবিম্বিত হইতেছে তাহাই পরমতত্ত্বের রূপ[৫১]। মন যদি স্বপ্নাদি ও ইন্দ্রিয়োপলক্ষিত জাগ্রদবস্থা বর্জ্জিত হয়, তাহা হইলে মহাচৈতন্যের স্থিতি যেরূপে পর্য্যবসিত হয়, স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ লয় প্রাপ্ত হইলে মহাচৈতন্য প্রায় সেইরূপে অবস্থিতি করেন[৫২]। যাহাকে তুমি স্থাবর বলিয়া জান, তাহা যদি বোধময় বা চিদ্ঘন বস্তু হয়, আর তাহাতে যদি মন ও বুদ্ধি প্রভৃতি সংযুক্ত না থাকে, তাহা হইলে সেই স্থিরভাবে অবস্থিত চিদ্ঘন পদার্থের সহিত পরমাত্মার কথঞ্চিৎ তুলনা হইতে পারে[৫৩]।

হে রাঘব! ব্রহ্মা, অর্ক, বিষ্ণু, হর, ইন্দ্র ও সদাশিবাদি ঈশ্বরবৃন্দ শান্তি প্রাপ্ত হইলে অর্থাৎ প্রলয়গ্রস্ত হইলে যিনি অবশিষ্ট থাকেন, তিনি পরম শিব এবং তিনিই ঐ সকল সংহার পূর্ব্বক বিশ্বসংজ্ঞা পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মসংজ্ঞায় একাদ্বয়রূপে অবস্থিতি করেন[৫৪]।

দশম সর্গ সমাপ্ত।

একাদশ সর্গ।

রামচন্দ্র বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! দেব, নর, অসুর এবং তির্য্যগাদি বিবিধ জীবপূর্ণ এই দৃশ্যমান জগৎ মহাপ্রলয় উপস্থিত হইলে কোথায় যাইবে?* এবং কিসেই বা অবস্থিতি করিবে? তাহা বর্ণন করুন[১]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাঘব! বন্ধ্যাপুত্র ও আকাশকানন কোথা হইতে আইসে? কোথায় গমন করে? এবং তাহাদের আকৃতি কিরূপ? এই সকল অগ্রে আমাকে বল, পশ্চাৎ তোমার প্রশ্নের প্রত্যুত্তর দিব[২]। রামচন্দ্র বলিলেন, মহর্ষে! বন্ধ্যাপুত্র ও আকাশকানন নাই। যাহা কোন পদার্থ নহে তাহার আবার দৃশ্যতা কি? নাস্তিতা কি? অস্তিতাই বা কি?[৩] বশিষ্ঠ বলিলেন, বৎস! বন্ধ্যাপুত্র ও ব্যোমবন যদ্রূপ, এই দৃশ্যমান জগৎও তদ্রূপ। যাহা কস্মিন্ কালেও হয় নাই, যাহা কেবল মাত্র ভ্রান্তি, তাহার আবার উৎপত্তি ও বিনাশ কি?[৪।৫]

রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! বন্ধ্যাপুত্র ও নভোবৃক্ষ কল্পনাময়। পরন্তু জগৎ প্রত্যক্ষসিদ্ধ। অতএব, বন্ধ্যাপুত্রাদির সহিত ইহা কিরূপে উপমিত হইতে পারে? বরং ঐ দৃষ্টান্তের বলে এমন প্রতীতি হইতেও পারে যে, বন্ধ্যাপুত্রাদি বৈকল্পিক ও অলীক হইলেও তাহাতে উৎপত্তিবিনাশাদি জগদ্ধর্ম্ম আছে[৬]। বশিষ্ঠদেব বলিলেন, রামচন্দ্র! যাহার প্রকৃত উপমা বা তুলনা অন্যত্র প্রাপ্ত না হওয়া যায়, আলঙ্কারিকেরা তাহাকে তাহারই দ্বারা তুলিত করিয়া থাকেন। সেরূপ তুলনা অলঙ্কার শাস্ত্রে অনন্বয় নামে বিখ্যাত।* তাহার ন্যায় আমরাও বন্ধ্যাপুত্রাদির সহিত জগৎ সত্তার তুলনা করিয়া থাকি। সে সকল তুলনার তাৎপর্য্য—বন্ধ্যাপুত্রাদির অস্তিত্ব যদ্রূপ, জগতের পৃথক্ সত্তাও তদ্রূপ[৭]। যেমন সৌবর্ণ কটকে (কটক=বালা নামক হস্তাভরণ) সুবর্ণ ব্যতীত অন্য কিছুই দৃষ্ট হয় না, এবং যেমন আকাশে শূন্যতা ব্যতীত অন্য কিছু অনুভূত হয় না, তেমনি, তত্ত্বজ্ঞানে পরব্রহ্মে পৃথক্ জগৎ নাই ও অনুভূতও হয় না[৮।৯]।

* আলঙ্কারিক দিগের উদাহরণটী এই—"গগনং গগনাকারং সাগরঃ সাগরোপমঃ" ইত্যাদি। এইরূপ তুলনায় সাগরের অনুপমত্বমাত্র ব্যক্ত করা হয়।

যেমন কজ্জলের সহিত শ্যামতার, শৈত্যের সহিত হিমের ও শিশিরের সহিত শীতলতার প্রভেদ নাই; সেইরূপ, পরব্রহ্মের সহিতও জগতের প্রভেদ নাই[১০।১১]। এই জগৎ আপাত দর্শনে প্রতীত হইলেও যেমন ভ্রান্তিদৃষ্ট নদীতে জলের ও দ্বিতীয়া তিথির চন্দ্রমায় চন্দ্রত্বের অভাব পশ্চাৎ সুস্পষ্ট হয়, সেইরূপ, সেই অমলাত্মা ব্রহ্মেও জগতের অভাব সেইরূপে অবধারিত হইয়া থাকে[১২]। যাহা আদৌ নাই, তাহার আবার উৎপাদক কারণ কি? অপিচ, যাহা পূর্ব্ব হইতেই নাই, বুঝিতে হইবে তাহা এখনও নাই। যাহা পূর্ব্বে ছিল না, বর্ত্তমানে নাই, ভবিষ্যতেও থাকিবেক না, তাহার আবার বিনাশ কি?[১৩] জড়ই জড়পদার্থের কারণ (উৎপাদক), ইহা দৃষ্ট হয়। ব্রহ্ম জড় নহেন, সেজন্য তৎ-কার্য্য জগৎও জড় নহে। যেমন ছায়া ও আতপ পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব, তেমনি, চিৎ ও জড় পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব। (ভাবার্থ এই যে, চেতন ব্রহ্মে অচেতন জগতের প্রকৃত সত্তা যুক্তিবিরুদ্ধ)[১৪]। ব্রহ্ম ব্যতীত কারণ না থাকায় ইহা ব্রহ্মাতিরিক্ত কার্য্যও নহে। যে কারণ নিত্যাবস্থিত, সেই কারণই এই জগদ্ভাবে বিবর্ত্তিত রহিয়াছে। অভিপ্রায় এই যে, এ সকল দৃশ্য ভ্রান্তি ব্যতীত অন্য কিছু নহে[১৫]। অবিদ্যা কারণের কথা বলিবে, তাহাও সত্য জগৎ সৃজন করে না। তাহা সেই সৎচিৎব্রহ্মবস্তুকে আভাসিত অর্থাৎ জগদাকারে অবভাসিত করে মাত্র; অল্প মাত্রও বিকৃত করে না। সুতরাং স্বপ্নদৃষ্ট জগৎ যদ্রূপ, এই জাগ্রদ্দৃষ্ট জগৎও তদ্রূপ[১৬]। যেমন স্বপ্নাবস্থায় নগরাদি প্রত্যক্ষবৎ প্রতীত হয় অথচ তাহা নাই, সেইরূপ, স্বাশ্রিত অজ্ঞানের কুহকে পরমাত্মায় জগৎ না থাকিলেও জগদ্দর্শন হইয়া থাকে[১৭]। এই যে-কিছু দেখিতেছ, সমস্তই আপনাতে অর্থাৎ আত্মায় অবস্থিত। জগৎ কোনও কালে সত্য সত্য উদয় ও অস্ত প্রাপ্ত হয় না ও হইবেও না[১৮]। যেমন সলিল দ্রব ভাবে, বায়ু স্পন্দনরূপে ও প্রকাশ আভার আকারে পরিচিত হয়, তেমনি, ব্রহ্মও ত্রিজগৎ আকারে পরিচিত হইতেছেন[১৯]। যেমন স্বপ্ন দ্রষ্টার অন্তঃস্থ-বিজ্ঞান নগরাদি আকারে বিবর্ত্তিত হয়, তেমনি, বিজ্ঞানঘন পরমাত্মা জগদাকারে অবভাসিত হইতেছেন[২০]।

রঘুবীর রামচন্দ্র বলিলেন, ব্রহ্মন্! এই বিষময় দৃশ্য (জগৎ) যদি সত্য সত্যই স্বপ্নানুভবের ন্যায় অলীক হয় তাহা হইলে ইহাতে মনু-

য্যের কল্প কল্পান্ত পর্য্যন্ত স্থায়ী দৃঢ় প্রত্যয় (সত্য বলিয়া বিশ্বাস) নিবদ্ধ আছে কেন ?[২১] * আমার অন্য সংশয় এই যে, দৃশ্য থাকা সত্বে দ্রষ্টার অপলাপ এবং দ্রষ্টা থাকায় দৃশ্যের অপলাপ নিতান্ত অসম্ভব। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, একতর থাকিলেই উভয়ের দ্বারা বদ্ধ থাকিতে হয়, পরন্তু একের সংক্ষয় হইলে উভয়ভাব হইতে মুক্ত হওয়া যায়[২২]। অতএব, যাবৎ না বুদ্ধিতে দৃশ্যজ্ঞান ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে তাবৎ দ্রষ্টা (আত্মা) দৃশ্য (জগৎ) দর্শন করিবেই করিবে। সুতরাং মোক্ষবুদ্ধি সমুদিত হইবে না[২৩]। যদি দৃশ্য জ্ঞান উদিত হইয়া পশ্চাৎ তাহা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলেও অনর্থ নিবারণ হয় না। কারণ, পূর্ব্বসংস্কার বশতঃ পুনর্ব্বার সংসার-ভাবের আবির্ভাব হইতে পারে। সুতরাং তাহাতেও বন্ধের অনি-বৃত্তি[২৪]। আদর্শ যে কোন অবস্থায় থাকুক, থাকিলেই তাহাতে বস্তুপ্রতিবিম্ব সংলগ্ন হইবে। তাহার ন্যায় চিদাদর্শ (চেতনরূপ আদর্শ, আয়না) যে কোন অবস্থায় থাকিবেক, থাকিলেই তাহাতে সংসার-প্রতিবিম্ব সংলগ্ন হইবে[২৫]। দৃশ্য যদি আদৌ উৎপন্ন না হইয়া থাকে, অথবা দৃশ্য যদি সত্য সত্যই না থাকে, তাহা হইলে দৃশ্যের অভাব-স্বভাবতা হেতু দ্রষ্টা তাহা হইতে স্বভাবতঃ মুক্ত হইতে পারেন, পরন্তু তাহা নিতান্ত অসম্ভব। হে আত্মবিদশ্রেষ্ঠ! প্রোক্ত কারণে নিবেদন করিতেছি, যাহাতে আমার দৃশ্যজ্ঞানের অত্যন্তাসম্ভব বুদ্ধি জন্মে ও ঐ সকল সংশয় অপনীত হয়, আপনি তাহা আমাকে যুক্তি সহকারে উপদেশ করুন[২৬।২৭]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! অসত্য হইলেও এই সাঙ্গোপাঙ্গ জগৎ যে প্রকারে সত্যের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে, আমি দীর্ঘ উপাখ্যান দ্বারা তাহা তোমার নিকট বর্ণন করি, স্থিরচিত্তে শ্রবণ কর[২৮]। যাবৎ না আমি পূর্ব্বকালের ব্যবহার প্রসিদ্ধ বহুবিধ দৃষ্টান্ত বাক্য দ্বারা তোমার নিকট ঐ বিষয় বর্ণন করিব, তাবৎ, যেরূপ হ্রদ হইতে ধূলিকণা

* জগতের জ্ঞান সুঘন অর্থাৎ নিতান্ত দৃঢ়, কিন্তু স্বাপ্নজ্ঞান অদৃঢ় অর্থাৎ যৎকিঞ্চিৎকাল-স্থায়ী। সুতরাং ইহার স্বপ্নতুল্যতা মনোমধ্যে ধারণা করা যায় না। অপিচ, দ্রষ্টার সহিত দৃশ্যের যে সম্বন্ধ তাহা স্বাভাবিক। কৃত্রিম বা কল্পিত নহে। সেই কারণে সে জ্ঞান অনিবার্য্য। প্রোক্ত কারণদ্বয়ে কথিত প্রকারের মুক্তি অসম্ভব বলিয়া প্রতীত হইতেছে। ইহাই রাম প্রশ্নের নিগূঢ় অর্থ।

উড্ডীয়মান হয় না, সেইরূপ, তোমার হৃদয় হইতে দৃশ্যজ্ঞান কদাচ অপনীত হইবে না[২৯]। রাম! এই জগৎ* নিতান্ত অলীক ও ভ্রমময়, ইহা মনে রাখিয়া ব্যবহার রত হইবে[৩০]। তাহা হইলে সায়ক যেমন পর্ব্বত ভেদ করিতে সমর্থ হয় না, তেমনি, প্রয়োজন বোধে গ্রহণ, অপ্রয়োজন বোধে ত্যাগ এবং বিবিধ স্থূল সূক্ষ্মাদি বিষয়ে সত্যতা বোধ ও সত্য বলিয়া ব্যবহার, এ সকল তোমাকে আক্রমণ করিতে পারিবে না[৩১]। রাঘব! আত্মা দ্বিতীয়বর্জ্জিত, অসঙ্গ ও ব্যাপক। তাদৃশ আত্মায় যেরূপে জগতের উৎপত্তি হয় তাহা তোমার নিকট এই মুহূর্ত্তেই কীর্ত্তন করিব। এই চরাচর বিশ্ব সেই এক মাত্র পরমাত্মা হইতেই আবির্ভূত হইয়াছে এবং সেই পরমাত্মাই বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বারা রূপাবলোকন প্রকারের আস্পদ-স্বরূপ (অর্থাৎ বাহ্য জগৎ) এই জগতের মননপ্রকারাস্পদ (অর্থাৎ অন্তর্জ্জগৎ) হইয়া উদিত ও বিলয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন[৩২।৩৩]।

একাদশ সর্গ সমাপ্ত।

* ভাবার্থ এই যে, তিনিই ব্যষ্টি, তিনিই সমষ্টি, তিনিই স্থূল, তিনিই সূক্ষ্ম, তিনি বাহ্য-প্রপঞ্চ এবং তিনিই অন্তঃপ্রপঞ্চ। তিনি নিজে নিজ মায়ায় দৃশ্যভাবে উদিত ও অদৃশ্যভাবে অস্তমিত হইতেছেন বা ভ্রান্তি বশতঃ সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় দেখিতেছেন।

দ্বাদশ সর্গ।

বশিষ্ঠদেব বলিতেছেন, সেই পরম পবিত্র শান্তপদ (তুরীয় ব্রহ্ম) হইতে যে প্রকারে এই অনন্ত বিশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করি, তুমি তাহা উত্তম (নির্ম্মল) বুদ্ধি অবলম্বনে শ্রবণ করিবে[১]। যেরূপ সুষুপ্ত্যবস্থা স্বপ্নবিশিষ্ট হইয়া প্রকাশ পায়, সেইরূপ, সর্ব্বাত্মক ব্রহ্মও সৃষ্টিবিশিষ্ট হইয়া প্রতিভাত হন। এ বিষয়ে যে ক্রম বা প্রণালী নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করি, শ্রবণ কর[২]।

এই বিস্তীর্ণ বিশ্ব সেই অনন্তপ্রকাশ অনন্তমহিম পরমাত্মরূপ চিৎনামক রত্নের বিচিত্রসত্তা ব্যতীত অন্য কিছু নহে[৩]। তিনি আকাশ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম ; এবং নির্ম্মল। তাদৃশ নির্ম্মল আত্মায় প্রথমে আপনা আপনি (নিজ মায়াশক্তির উদয়ে) যৎকিঞ্চিৎ চেত্যতার (জ্ঞেয় ভাবের) উদয় হয়। সে চেত্যতা অর্থাৎ বিজ্ঞেয় ভাব—অহম্। এই অহংএর গর্ভে সমুদায় সৃজ্যমান পদার্থের অনুসন্ধানাত্মক জ্ঞানসংস্কার অবস্থিত থাকে। তাহা অস্মদাদির সংস্কারবিশিষ্ট চিত্তের (স্মরণবৃত্তির) উদ্বোধের অনুরূপ[৪]।[৫]। অনন্তর সেই চিত্তবৃত্তির ন্যায় বৃত্তিবিশিষ্ট চেতনাত্মক ব্রহ্মসত্তার অনতিরিক্ত পরম-সত্তা চিন্নামযোগ্যা অর্থাৎ পরমেশ্বর সংজ্ঞার উপযুক্তা হইয়া থাকে[৬]। পশ্চাৎ তিনি যখন চিরানুবৃত্ত ঈক্ষণ সম্বেদন বশতঃ * জ্ঞানঘন হন, তখন তিনি আত্মস্বভাব বিস্মৃত ও পরমপদ পরিত্যাগ করতঃ ভাবিপ্রাণধারণোপাধিক জীবভাব প্রাপ্ত হইতে থাকেন[৭]। জীবভাব প্রাপ্ত হইলেও তাঁহার ব্রহ্মভাবের অপচয় হয় না। কারণ এই যে, পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মসত্তাই ভাবনাবিশেষ (এক প্রকার মায়িক ইচ্ছা) দ্বারা সংসরণোন্মুখী হয়, তাহাতে তাঁহার কোন প্রকার স্বরূপ বিকৃতি হয় না[৮]। ব্রহ্মস্বভাব অপরিচ্যুত থাকিয়া

* ব্রহ্মসত্তা=ব্রহ্মতত্ত্ব। চিত্তে যেমন জ্ঞানসংস্কার থাকে, তাহার ন্যায় প্রকৃতিতে অর্থাৎ মায়াশক্তিতে প্রলয়প্রাপ্ত জগতের সংস্কার থাকে। পরে পুনঃ সৃষ্টির প্রথমে সেই সংস্কার উদ্বুদ্ধ হয়। তখন ব্রহ্মে সৃজনশক্তির উদয় হয়, তাহাতেই তিনি ঈশ্বর হন। ঈশ্বর প্রথমে আমি বহু হইব, এইরূপ সঙ্কল্প করেন। তাঁহার ঐরূপ সঙ্কল্পের নাম ঈক্ষণ—সম্বেদন।

জীবভাব প্রাপ্ত হইলে পর প্রথমে তাঁহাতে খসত্তার (খ্=আকাশ) আবির্ভাব হয়। সেই খসত্তা এক্ষণে আকাশ ও শূন্য নামে প্রসিদ্ধ। সর্ব্বত্র প্রকাশমান বলিয়া আকাশ নাম এবং অন্যান্য ভূতের স্থান দানার্থ শূন্যপ্রায় বলিয়া শূন্য নাম দেওয়া হয়। এই খসত্তা, শূন্য বা আকাশ, সূর্য্যাদি সৃষ্টির পর আকাশ নামে প্রথিত হয় এবং ইহাই শব্দাদি গুণের বীজ স্বরূপ[৯]। অনন্তর তাহা হইতে কালসত্তার সহিত (কালসত্তা=কালের অস্তিত্ব। এই সময় হইতে কালের অস্তিত্ব বোধগম্য হইতে থাকে) অহংএর উদয় হয়। এই অহং ভাবি-সৃষ্টির ও তাহার স্থিতির মূল কারণ। (ইহা হিরণ্যগর্ব্ভের অহঙ্কার বা মূলীভূত সমষ্টি অহঙ্কার)। হে রাঘব! এইরূপে সেই পরমসত্তায় (ব্রহ্মে) অসদ্রূপ জগজ্জাল সমুৎপন্ন হইয়া সতের আশয়ে প্রতীয়মান হইতেছে[১০।১১]। অপিচ, সেই অহং ও আকাশ উভয়ান্বিত সম্বিৎ (অর্থাৎ অহং তত্ত্ব ও আকাশ উভয় সম্বলিত ব্রহ্ম চৈতন্য) সঙ্কল্পরূপ কল্পবৃক্ষের (সঙ্কল্প আকাশেরই কার্য্য) বীজ। সেই যে অহঙ্কার, তাহারই এক দেশ হইতে স্পন্দনধর্ম্মী বায়ুর উৎপত্তি হইয়াছে[১২]। সেইজন্য সেই অহম্ভাববিশিষ্ট আকাশরূপ পরমসত্তা শাস্ত্রীয় ভাষার শব্দতন্মাত্র। এই শব্দতন্মাত্রা হইতে স্থূল শব্দের বিবিধ উৎপত্তি হইয়াছে[১৩]। অভিহিত শব্দতন্মাত্রা শব্দৌঘশাখীর (শব্দৌঘশাখী=শব্দময় বৃক্ষ, বেদ) পরম বীজ। সেই বীজ হইতে ভবিষ্যৎ নাম ও আকার এবং পদ, বাক্য ও প্রমাণযুক্ত বেদ, সমস্তই উদিত হইয়াছে[১৪]। সেই বেদভাবাপন্ন পরমাত্মা এই পরিণামপ্রসারী নিখিল জগৎ প্রকাশিত করিয়াছেন[১৫]। পূর্ব্বে যে বায়ু প্রভৃতির কথা বলিয়াছি, তদ্‌যুক্ত চিৎ অর্থাৎ ব্রহ্মচৈতন্য জীব-নামের অভিধেয় অর্থাৎ বোধ্য। (জীবে প্রাণ সংযোগ আছে বলিয়া তাহা বায়ুযুক্ত)। এই জীব নিখিল মূর্ত্ত্যাকারের বীজ[১৬]। সেই প্রাণনামক মহাবায়ু হইতে তদ্ব্যাপ্ত চতুর্দ্দশ (সপ্ত পাতাল ও সপ্ত স্বর্গ) ভুবন ও চতুর্ব্বিধ প্রাণী (জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ) ও তৎসমন্বিত ব্রহ্মাণ্ড বিস্তৃত হইবে[১৭]। সেই বায়্বভিমানপ্রাপ্ত চৈতন্যের প্রস্পন্দে যে বপুঃ (আকারবিশেষ) প্রস্ফুরিত হয়, তাহাকে স্পর্শতন্মাত্রা কহে। তাহারই বিস্তারে একোনপঞ্চাশৎ বায়ুস্কন্ধ বিস্তৃত হইয়াছে। এবং তাহা হইতেই সমুদায় স্পন্দনক্রিয়া প্রসৃত হয়[১৮।১৯]। তাহাতে যে পরম চৈতন্যের প্রকাশাত্মক ভাবনা (সঙ্কল্প) বিস্তৃত আছে, তাহারই দ্বারা তেজস্তন্মাত্রার উৎপত্তি এবং সেই তেজস্তন্মাত্রা আলোক-শাখীর

(আলোকরূপ মহাবৃক্ষের) বীজ[২০]। এই বীজ হইতে বিদ্যুৎ, সূর্য্য, অগ্নি ও চন্দ্রমাদি উৎপন্ন হইয়াছে এবং তাহারই রূপ ভেদে এতৎ সংসার বিস্তৃত হইয়াছে[২১]। অনন্তর সেই তেজ (তেজঃস্কন্ধাভিমানী আত্মা) "আমি জলময় হইব" ইত্যাকার সঙ্কল্পের (ভাবনার) বলে জলশরীরী হন। তাহারই বিকাশ আস্বাদ। এই আস্বাদ রসতন্মাত্রা নামে ব্যপদিষ্ট[২২]। এই রসতন্মাত্রা সমুদায় জলের (দ্রবপদার্থের) ও অম্ল মধুরাদি বিস্পষ্ট আস্বাদের বীজ এবং এ বীজও সংসার বিস্তারের কারণ[২৩]। পূর্ব্বোক্ত জলভাবাপন্ন পরমাত্মা "আমি পৃথিবী হইব" এইরূপ ভাবনা করতঃ ভাবিরূপনামা হইয়া স্বীয় সঙ্কল্পগুণদ্বারা আপনাতে গন্ধ-তন্মাত্রতা দর্শন করেন[২৪]। সেই গন্ধতন্মাত্রা ভাবিভূগোলকের (স্থূল পৃথিবীর) মূল। অপিচ, তদ্ধেতুক তাহা মনুষ্যাদি-আকৃতি-শাখীর বীজ ও সে সকলের আধার[২৫]। তাপ ও বায়ু সংযোগে জল যেমন বুদ্বুদে পরিণত হয়, তেমনি, পূর্ব্বোক্ত অহঙ্কারযুক্ত চৈতন্যের বিভাবনায় (সঙ্কল্পের প্রতাপে) তন্মাত্রা (উৎপন্ন সূক্ষ্মভূত) সকল পরস্পর মিশ্রিত হইয়া ক্রমে ব্রহ্মাণ্ডা-কারে পরিণত হইয়াছে[২৬]। হে রামচন্দ্র! বর্ণিত প্রকারেই পঞ্চভূতের সৃষ্টি হয়, হইয়া কিয়ংকাল অবস্থিতি করে। অর্থাৎ যাবৎ না সর্ব্ব-বিনাশাত্মক মহাপ্রলয় উপস্থিত হয়, তাবৎ এ সকল বিশুদ্ধভাব প্রাপ্ত অর্থাৎ চিৎস্বরূপ প্রাপ্ত হয় না। এই জগৎ পূর্ব্বে অব্যাকৃত (অব্যাকৃত= ঐশী শক্তি বা মায়া) আকাশে সঙ্কল্পের ন্যায় ভাবরূপে অবস্থিত ছিল, সেই ঈশ্বর সঙ্কল্পস্থিত ভাবরূপী জগৎ এক্ষণে যেমন সূক্ষ্ম বটবীজ হইতে স্থূল বটবৃক্ষের আবির্ভাব হয়, তেমনি, স্থূলাকারে আবির্ভূত হইয়াছে[২৭।২৮]। মায়িক সৃষ্টির দর্শন যদ্রূপ, তাহা যেমন পরমাণুমধ্যেও সম্ভবে, * জগৎসৃষ্টির দর্শন ঠিক্ তদ্রূপ। এ সৃষ্টি ক্ষণমধ্যে আবির্ভূত ও ক্ষণমধ্যে তিরোভূত হইয়া থাকে[২৯]। এই যে স্থূলতা দেখিতেছ, ইহা বাস্তব নহে। এরূপ অবাস্তব স্থূলতায় বাস্তব সূক্ষ্মতার ক্ষতি হয় না। কারণ এই যে, সৃষ্টি বৈকারিক নহে; পরন্তু বৈবর্ত্তিক। (বিকার=সত্য সত্য অন্যথা হওয়া। যেমন দুগ্ধের বিকার দধি। বিবর্ত্ত=মিথ্যা অন্যথা হওয়া যেমন রজ্জুর বিবর্ত্ত সর্প)।। অর্থাৎ ভ্রমপ্রতীতির অনুরূপ। ভ্রমপ্রতীতির অনুরূপ

* মায়িক সৃষ্টিতে দেখা যায়, পরমাণুতুল্য একটী ক্ষুদ্র বীজে ক্ষণমধ্যে শত শত বৃহৎ বৃক্ষ জন্মিয়াছে। মায়িক সৃষ্টি=ঐন্দ্রজালিক সৃষ্টি।

বলিয়াই পরমচৈতন্যরূপ আধারে ইহা কখন স্থূলরূপে প্রকাশ পাইতেছে কখন বা সম্পিণ্ডিত হইয়া স্থিতি করিতেছে এবং কখন বা স্বীয় আধারে (চৈতন্যে) লুক্কায়িত হইয়া যাইতেছে[৩০]।

হে রাঘব! দৃশ্য জগতের বীজ তন্মাত্রাপঞ্চক। সে সকলের বীজ পরমাত্মার পরা শক্তি অর্থাৎ মায়াশক্তি। এই মায়াশক্তি শাস্ত্রান্তরের আদ্যাশক্তি। সেই আদ্যাশক্তি হইতেই জগৎশ্রী বিস্তৃত হইয়াছে। ভাবিয়া দেখ, সেই এক পরমাত্মতত্ত্ব মায়াশক্তির প্রস্ফুরণে জগদ্বীজ এবং জগৎ তাহার (সেই বীজের) অঙ্কুরাদি শাখাপ্রশাখান্ত মহাবৃক্ষ ব্যতীত অন্য কিছু নহে। সেই কারণে আমি বলিয়াছি, জগৎ অজ, অনন্ত ও চিন্মাত্র। চিন্মাত্র তাই ইহার রহস্য বা তত্ত্ব। এই তত্ত্ব আমরা সর্ব্বদা অনুভব করিয়া থাকি[৩১।৩২]।

দ্বাদশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রয়োদশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিতেছেন, রামচন্দ্র! শ্রবণ কর। নভঃ, তেজঃ, তমঃ, সমস্তই অনুৎপন্ন ঐ সকলের সত্তার কারণ (আছে বলিয়া প্রতীত হইবার হেতু) চিদাত্মা অর্থাৎ বিকারকৃতবৈষম্যশূন্য পরব্রহ্ম। চিদাত্মা মায়াকাশে প্রস্ফুরিত হইলেই তাঁহাতে প্রথমে চেত্যবিষয়িনী কল্পনা উদিত হয়। পরে তৎসংযোগে জীবভাবের আবির্ভাব, তৎপরে অহংএর কল্পনা[১।৩]। অনন্তর অহং হইতে বা অহম্ভাবের পরিণামে বুদ্ধির উদয় হয় এবং বুদ্ধি হইতে মনন-ধর্ম্মী মন জন্মে। * মনের অন্তর্গর্ত্তে শব্দাদিবিষয়মাত্রার (তন্মাত্রার) পূর্ব্বসংস্কার অবস্থিত থাকে। অর্থাৎ বুদ্ধিই শব্দতন্মাত্রকাদিবিশিষ্ট হইয়া মন হন[৪]। এই মন তন্মাত্রাপঞ্চকের ভাবনায় অর্থাৎ মেলনে বা পঞ্চীকরণে আধ্যাত্মিক মহাভূতরূপে প্রবর্দ্ধিত বা উপচিত হওয়ায় এই জগৎ নামক মহাগুল্ম বিলোকিত হইতেছে। অর্থাৎ মনই কল্পনার দ্বারা আপনাকে স্থূলদেহস্থ মনে করিতেছে ও জগৎ দেখিতেছে[৫]। স্বপ্নদ্রষ্টা যদ্রূপ স্বপ্নে অকৃত বা অনুৎপন্ন গ্রাম নগরাদি দর্শন করে, চিদাত্মাও তদ্রূপ মনের আবেশে জগৎ দর্শন করিতেছেন। সেইজন্য বলা যায়, ইহা স্বপ্নের ন্যায় চিৎনামক মহাকাশে পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইতেছে[৬]। চিদাত্মাই জগৎরূপ করঞ্জকুঞ্জের অনুপ্ত বীজ। (করঞ্জ=একপ্রকার বৃক্ষ)। এ বীজ ক্ষিতি, বারি ও তেজঃ, কিছুরই অপেক্ষা করে না, অথচ অঙ্কুরিত হয়[৭]। যাহা কেবল চিৎ তাহাই স্বাপ্নসৃষ্টির ন্যায় চিন্ময় পৃথ্যাদি সৃজন করে। যাহা কেবল চিৎ অর্থাৎ বিশুদ্ধ চৈতন্য, তাহা যে খানেই থাকুক, সর্ব্বত্রই বাস্তব জগদঙ্কুর বর্জ্জিত। অর্থাৎ অসঙ্গস্বভাব। স্থূল জগতের বীজ পঞ্চতন্মাত্রা, পঞ্চতন্মাত্রার বীজ অক্ষয় অব্যয় চিৎ[৮।৯]। যাহা বীজ, তাহাই ফল; সে ভাবেও এ জগৎ ব্রহ্মময়।

হে রামচন্দ্র! সৃষ্টির আদিতে চিৎ-ই কথিতপ্রকারে চেত্যবিস্তারকরণ সামর্থ্যের দ্বারা আপনাতে তন্মাত্রাপঞ্চক (শব্দতন্মাত্রা প্রভৃতি) কল্পনা

* বুদ্ধি শব্দের অর্থ এখানে মহত্তত্ত্ব এবং মন শব্দের অর্থ সঙ্কল্পবিকল্পকারী অন্তঃকরণ।

করেন; সেজন্য তাহা বাস্তব নহে। সেই কল্পিত তন্মাত্রাপঞ্চক উচ্ছূন বা উপচিত (পরস্পর অনুপ্রবিষ্ট বা পরস্পর বিমিশ্রিত) হইয়া এই স্থূল জগৎ বিস্তার করিয়াছে[১০।১১]। সুতরাং যাহা কেবল ও কল্পনাধিষ্ঠান, তাহাতে স্বপ্ন কল্পনার ন্যায় কল্পিত ভাবে অবস্থিত থাকায় এ সমস্তই তৎস্বরূপ; তাহার অতিরিক্ত নহে[১২]। যাহা কেবলমাত্র কল্পনা, তাহার স্বরূপসত্যতা কোথায়? পঞ্চতন্মাত্রা যেমন ব্রহ্মে অধ্যস্ত, তেমনি, তন্মাত্রা-প্রভব স্থূলভূত সমূহও ব্রহ্মচৈতন্যে অধ্যস্ত। সেই জন্যই বলিতেছি, ব্রহ্মই ত্রিজগৎ[১৩।১৪]। এই স্থানে বলিতে পার যে, ব্রহ্মই কারণ ও ব্রহ্মই কার্য্য, ইহা কি প্রকারে সুসম্ভব হয়? একের কারণ ও কার্য্য উভয় ভাব লোক মধ্যে যুক্তিবহির্ভূত? তাহার প্রত্যুত্তর এইযে, আদি সৃষ্টিকালে যে প্রকারে তন্মাত্রা পঞ্চকের স্ফুরণ হয় সেই প্রকারে স্থূলভূতেরও স্ফুরণ হয়। (অভিপ্রায় এই যে, মায়াবী যেমন নিজেই নিজ মায়িক সৃষ্টির কারণ ও কার্য্য; অথবা স্বপ্নদ্রষ্টা যেমন নিজেই নিজ স্বাপ্ন সৃষ্টির কারণ ও কার্য্য। তেমনি, ব্রহ্মও জগদ্বিবর্ত্তের কারণ ও কার্য্য। আরও বিশদ কথা এইযে, যেমন মৃত্তিকা ও মৃত্তিকার কার্য্য কুম্ভ ব্যবহার দৃষ্টিতে ভিন্ন হইলেও পরমার্থ দৃষ্টিতে অভিন্ন, তেমনি, ব্রহ্ম ও ব্রহ্মকার্য্য জগৎও ব্যবহার দৃষ্টি ভিন্ন হইলেও পরমার্থ দৃষ্টিতে অভিন্ন)। অতএব, জগৎ নামে কোন পৃথক্ পদার্থ এ পর্য্যন্ত জন্মে নাই ও জন্মিতে দেখাও যায় নাই[১৫]। যেমন স্বপ্নসৃষ্ট ও সঙ্কল্পনির্ম্মিত নগর অসৎ হইলেও অর্থাৎ না থাকিলেও সতের ন্যায় প্রতীত হয়, তেমনি, পরমপ্রকাশ ব্রহ্মাকাশ নামক পরমাত্মায় জীবাকাশের বাস্তব অভাব থাকিলেও অজ্ঞের দৃষ্টিতে তাহার ভাব অর্থাৎ অস্তিত্ব কল্পিত হইয়া থাকে। কথিতপ্রকারে পরম নির্ম্মল পরমাত্মায় বাস্তব পৃথ্ব্যাদির অবস্থান অসম্ভব; সুতরাং ব্রহ্মে ভৌতিক সৃষ্টির উদয় যদ্রূপ, জীবের উদয়ও তদ্রূপ[১৬।১৭]।

হে রাঘব! সেই পরমাকাশ ব্রহ্মকাশে উক্ত জীবাকাশ স্বপ্ন ও সঙ্কল্প পুরীর ন্যায় অসৎ হইয়াও সৎস্বরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। সেই নির্ম্মলাত্মা পৃথিব্যাদি উপাধিশূন্য হইলেও তাঁহাতে যে আকাশোদরে গন্ধর্ব্ব-নগরাদির ন্যায় আকাশাত্মা স্বরূপে উদিত হয়, তাহাকেই আমরা জীব নামে অভিহিত করি। হে রামচন্দ্র! অভিহিত জীবাকাশ (জীব নামক আকাশ। জীবভাব আকাশের ন্যায় আকারহীন বলিয়া আকাশ) যে

প্রকারে আপনাকে দেহী বলিয়া জানিয়াছে তাহাও বলিতেছি, শ্রবণ কর। প্রথমতঃ পরমেশ্বরে সমষ্টি জীবাকাশ কল্পিত হয়। অনন্তর সেই সুবিস্তৃত সমষ্টি জীবাকাশে (জীবঘন বা জীবসঙ্ঘরূপ আকারহীন পদার্থে) বিচ্ছিন্নভাবে "আমি স্ফুলিঙ্গের ন্যায় অল্প" ইত্যাকার অসংখ্য ভাবনার উদয় হয়। তাদৃশ ভাবনার উদয়ে ব্যষ্টি জীবের জন্ম হয়; সুতরাং তাহা সমষ্টির অনতিরিক্ত। যেমন সঙ্কল্পিত (মনঃকল্পিত) চন্দ্র অসৎ অর্থাৎ মিথ্যা হইলেও সতের ন্যায় বোধারূঢ় হয়, তেমনি, ঐ ভাব অসৎ হইলেও অর্থাৎ অসত্য হইলেও সত্যের ন্যায় ভাবিত হইয়া থাকে। অনন্তর তাদৃশ ভাবনার প্রভাবে তিনি ক্রমেই দৃশ্যরূপী হন[১৮।২০]। অনন্তর সেই অণুতেজঃ কণভাব অর্থাৎ সূক্ষ্মভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনাকে তারকার ন্যায় (ক্ষুদ্র নক্ষত্রের ন্যায় পরিচ্ছিন্ন) অনুভব করেন, তাহাতে তিনি অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ স্থূল হন। সেইরূপ স্থৌল্যই ভূতমাত্রাসম্বলিত লিঙ্গভাব এবং তাহাই শাস্ত্রান্তরের লিঙ্গদেহ[২১]। সেই লিঙ্গদেহ জ্ঞান ও চিত্তকল্পনা বশতঃ স্থূল শরীর পরিগ্রহ করে। জ্ঞান ও শরীর উভয়ই চিত্তকল্পনার বশে প্রাদুর্ভূত হয়। জীব সেই সেই কল্পনানুভবের বশে সেই সেই উপাধিতে সোঽহং ভাবে ভাবিত হয়। তাঁহার যে সেই তারকাকার লিঙ্গভাব, তাহাই তাহার ভবিষ্যৎ করচরণাদিমান্ স্থূল দেহের কারণ। স্বপ্নদ্রষ্টা যেমন স্বপ্নে আপনার পথিকত্ব অনুভব করে, তেমনি, এই জীবও আপনাকে তারকাকার অর্থাৎ শরীরী ও পরিচ্ছিন্ন মনে করে। চিত্ত যেমন যেমন চেত্যাকার অর্থাৎ বিষয়াকার ধারণ করে, জীব তেমনি তেমনি সেই সেই উপাধির পক্ষানুসারী হয়। অর্থাৎ জীব বাস্তব পক্ষে সর্ব্বগামী হইলেও উক্তপ্রকারে অন্তঃস্থের ন্যায় ও পরিছিন্নের ন্যায় হইয়াছেন। পর্ব্বত যেমন বহিঃস্থ হইয়াও দর্পণাদির প্রভাবে তদন্তরে আছে বলিয়া প্রতীত হয়, সর্ব্বত্র ব্যবহার অর্থাৎ গমনাগমনাদি করিতে সমর্থ এই দেহ যেমন কূপপতিত হইলে কূপ মাত্রে গতিবিধি করে, সর্ব্বগামী হয় না, অপিচ দূরপ্রচরণযোগ্য উচ্চৈঃস্বর যেমন আবরকের মধ্যে উৎপন্ন হইলে তন্মধ্যেই অবস্থিতি করে, বাহিরে আইসে না, তেমনি, সর্ব্বগামী আত্মাও তারকা কোঠরে অর্থাৎ লিঙ্গশরীরাদির অন্তরস্থ কল্পিতাকাশে অহং-অভিমান ধারণ করিয়া যেন তিনি তন্মধ্যেই অবস্থিতি করিতেছেন, মনে করেন[২২।২৫]। যদ্রূপ

স্বপ্নদর্শন ও সঙ্কল্প দেহমধ্যেই সম্পন্ন হয়, তদ্রূপ, স্ফুলিঙ্গতুল্য উপাধিতে অহঙ্কারের আরোপে জীব তত্ত্বস্থের ন্যায় হইয়া থাকেন এবং বাসনাময় দেহাদি অনুভব করেন[২৬]। প্রথমে বাসনাময় দেহাদির ব্যবহার করেন, অনন্তর তিনি ক্রমক্রমে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি, সঙ্কল্প বিকল্পরূপী মন, এবং চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা প্রভৃতি ইন্দ্রিয় ও প্রাণবায়ু, এবং চেষ্টা ও কর্ম্মেন্দ্রিয়বিশিষ্ট হইয়া প্রকাশিত হইতে থাকেন। আমি দেখিব, এই ভাবের প্রভাবে দেখিবার জন্য ছিদ্রদ্বয় প্রসারিত হইয়াছে। সেই দুই ছিদ্রের নাম নেত্র, তাহারই দ্বারা দর্শন লালসা পূর্ণ হয়। আমি স্পর্শ করিব, এই ভাবের প্রভাবে স্পর্শনেন্দ্রিয় ত্বক্ উৎপন্ন হইয়াছে। শ্রবণ করিব, এই ভাবের প্রভাবে শ্রবণেন্দ্রিয় কর্ণ, ঘ্রাণ লইব, এই ভাবের প্রভাবে ঘ্রাণেন্দ্রিয় (নাসারন্ধ্রস্থিত), এবং আস্বাদ গ্রহণ করিব, এই ভাবনায় রসনেন্দ্রিয় জিহ্বা বিস্তৃত হইয়াছে[২৭।৩০]। যাহা স্পন্দন তাহা বায়ু। চেষ্টা ও কর্ম্মেন্দ্রিয় সমূহ তাহার কার্য্য। বাহ্যজ্ঞান ও অন্তর্ব্বিজ্ঞান উক্তপ্রকারে সুসম্পন্ন হইতেছে এবং উক্ত সমস্তই বর্ণিতপ্রকারে ব্রহ্মে অধ্যস্ত। অর্থাৎ বর্ণিত বৃত্তান্ত সমস্তই সেই মূল চৈতন্যের বিবর্ত্ত[৩১]। এইরূপে ব্রহ্মই প্রথমে আতিবাহিকদেহী, * পরে স্থূলাকৃতি, তৎপরে এই সকল স্থূল দশন অনুভব করেন। ব্রহ্মই কথিতপ্রকারে স্ফুলিঙ্গাকারাদি বাহ্য বিষয় পর্য্যন্ত কল্পনা করতঃ তন্মধ্যে আকাশের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন। এবং কথিতপ্রকারে আপনার সূক্ষ্ম আকারকে উচ্ছুন অর্থাৎ স্থূল করিয়াছেন[৩২]। এ সকল ব্যবহারে সত্যের ন্যায় অথচ অসত্য। অতএব, ব্রহ্মই কথিতপ্রকারে জীব হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন[৩৩]। স্ববুদ্ধিকল্পিত উপাধির অন্তঃস্থ হইয়া স্ববুদ্ধিকল্পিত অণ্ড (ব্রহ্মাণ্ড) অবলোকন করিতেছেন[৩৪]। কেহ জলগত, কেহ বা সম্রাট এবং কেহবা ভাবিব্রহ্মাণ্ড দর্শন ও অনুভব করিতেছেন[৩৪।৩৫] †

হে রামচন্দ্র! দেশকালাদিশব্দনির্ম্মাণকর্ত্তা আতিবাহিক দেহী জীব চিৎস্থানে অবস্থিতি করিয়া দেশকালাদিভাবনা করতঃ সেই সেই শব্দের

* আতিবাহিকদেহ = চিত্তদেহ অর্থাৎ ভাবময় দেহ। এ দেহের দৃশ্যতা নাই। কেবল ভাব আছে।

† ইহার দ্বারা একই ব্রহ্মের প্রকারদ্বৈবিধ্য বলা হইল। প্রথমে জলান্তর্গত ব্রহ্মাণ্ডশরীরাভিমানী, তৎপরে চতুর্ম্মুখব্রহ্মশরীরাভিমানী। মহর্ষি মনু যে বলিয়াছেন, "অপএব সসর্জ্জাদৌ" এ সেই কথা।

দ্বারাও বদ্ধ হইয়া আছেন। (শব্দের অর্থাৎ নামের) বস্তুতঃ ইহা (জগৎ) স্বপ্নকল্পিতের ন্যায় অসৎ। অসৎ বলিয়া তুচ্ছ অর্থাৎ অত্যন্ত অলীক। সেই কারণে বলা যায়, ইহা অনুৎপন্ন। বাস্তব অনুৎপন্ন হইলেও বিরাট্‌রূপী আতিবাহিকদেহী আদ্য প্রজাপতি প্রভু স্বয়ম্ভু কথিতপ্রকারে উৎপন্ন হইয়াছেন বলিয়া ব্যাখ্যা করা হয়[৩৬।৩৮]।

হে রামচন্দ্র! ব্রহ্মাণ্ডাকার বিভ্রমে এমন কিছু নাই যাহাকে সম্পন্ন অর্থাৎ সিদ্ধ বস্তু (সিদ্ধ=যাহা সত্য সত্যই থাকে তাহা) বলা যাইতে পারে। ব্রহ্মাণ্ডের কিছুই জন্মে নাই এবং দৃশ্যতাও নাই। অথচ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সেই মহান্ ব্রহ্মাকাশ কোশে অবস্থিত আছে বলিয়া মনে হয়[৩৯।৪০]। ইহা সৎ (আছে) বলিয়া প্রতীত হইলেও সঙ্কল্প নগরের ন্যায় নিতান্ত অসৎ, এবং ইহা কোন দ্রব্যের দ্বারা নির্ম্মিত, রঞ্জিত ও প্রযত্ন সহকারে প্রস্তুত হয় নাই। প্রস্তুত বা কৃত না হইলেও ইহা সেই সৎস্বরূপে বিরাজিত আছে। যেহেতু মহাকল্প কালে ব্রহ্মাদিরও লয় হয়, সেই হেতু ইহা পূর্ব্ব স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার প্রাক্তনী স্মৃতির ফল নহে।* যিনি ইহার স্রষ্টা তিনি যেরূপ, এই জগৎও সেইরূপ[৪১।৪৩]। পৃথিব্যাদি সৃষ্টি বিষয়ে যে নিত্যজ্ঞান পরমাত্মা কারণরূপে বিদ্যমান আছেন, এই জগৎস্বপ্ন তিরোহিত হইলে তিনি কেবল হন অর্থাৎ অদ্বয় ব্রহ্ম ভাবে অবস্থিতি করেন। তখন এ সকল দৃশ্য থাকে না। স্বপ্নের পর যেমন স্বপ্নদৃষ্ট পৃথিব্যাদি, মাত্র স্মৃতির আকারে অনুভূয়মান হইতে থাকে, ব্যোমরূপী জগৎকারণ ঠিক্ তদ্রূপরূপী হন এবং জগৎও তদ্রূপরূপী হইয়া থাকে। দ্রবত্ব যেমন জলের অনতিরিক্ত, তেমনি, সৃষ্টিও পরমাত্মার অনতিরিক্ত[৪৪।৪৬]। ইহা নিরাধার, নিরাধেয়, দ্বৈতরহিত সুতরাং একত্ববর্জ্জিত। † ইহা নির্ম্মল পরমাকাশে (ব্রহ্মে) জন্মিয়াছে অথচ জন্মে নাই[৪৭।৪৮]। সুতরাং বাস্তব

* এক এক মহাকল্প শেষ হয় আর সেই সেই কল্পের ব্রহ্মা মুক্ত হন। সুতরাং নূতন কল্প নূতন ব্রহ্মার দ্বারা সৃষ্ট হয়। তাহার সহিত পূর্ব্ব ব্রহ্মার কোনরূপ সম্পর্ক থাকে না। সুতরাং এ জগৎ পূর্ব্ব ব্রহ্মার সংস্কার প্রভব নহে। সুতরাং স্বীকার করা উচিত যে, জগৎ নূতন ব্রহ্মারই অবিদ্যাসমুদ্ভূত। শাস্ত্রে লিখিত আছে, যে জীব পূর্ব্বকল্পে উপাসনা বিশেষে সিদ্ধ হয় সেই জীব পরকল্পে ব্রহ্মা হয়।

† একত্ববর্জ্জিত কথার তাৎপর্য্য এই যে, দ্বিত্ব থাকিলেই একত্বজ্ঞান হয়, নচেৎ কোন বস্তু 'এক" এ রূপে কল্পনা করা যায় না। তাদৃশ ভাবে একত্ববর্জ্জিত।

কল্পে সংসার নাই। ইহাতে দৃশ্য বা দ্রষ্টা কিছুই নাই। ব্রহ্মা ও ব্রহ্মাণ্ড প্রভৃতি কিছুই নাই[৪৯।৫০]। স্থাবর বল, জঙ্গম বল, জগৎ বল, সমস্তই ব্রহ্মের বিকাশ। যেমন সলিলে আবর্ত্তের আবির্ভাব, তেমনি, ব্রহ্মেই ব্রহ্মের আবির্ভাব। ব্রহ্মস্বভাবের আবর্ত্তে এবম্প্রকার জগতের আবির্ভাব হইয়াছে। ইহা বাস্তব অসৎ (অলীক) হইলেও আধারের অনুবর্ত্তী; সেই কারণে ইহা সতের ন্যায় প্রকাশিত হইতেছে[৫১।৫২]। যেমন স্বপ্ন তিরোহিত হইলে স্বপ্নদ্রষ্টার স্বীয় মরণ অলীক বোধ হয়, তত্ত্বজ্ঞান হইলে এই জগৎ সেইরূপ অলীক বলিয়া প্রতীত হইবে। সুতরাং ইহার স্বরূপ সেই অনাময় ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছু নহে[৫৩]।

হে রাঘব! প্রজাপতি স্বয়ম্ভূ সেই পরম আকাশে (পরমাত্মায়) উক্ত আকারে সমুৎপন্ন হইয়াছেন, সুতরাং তিনিও পরমাকাশস্বরূপ। এই জগৎ সেই মনোময় বা আতিবাহিক শরীরী ব্রহ্মার বা হিরণ্যগর্ভের সঙ্কল্পে সমুৎপন্ন সুতরাং ইহা সঙ্কল্পসদৃশ নিস্তত্ত্ব[৫৪]।

ত্রয়োদশ সর্গ সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, অহং প্রভৃতি দৃশ্য কথিতপ্রকারেই কল্পিত হইয়াছে। কল্পিত হইয়াছে, জন্মে নাই। এ সকলের জন্ম নাই বলিয়া ইহার বিদ্যমানতাও নাই। তবে যে বিদ্যমান বলিয়া বোধ হইতেছে সে বিদ্যমানতা পরম পদের অর্থাৎ সর্ব্বময় ব্রহ্মের[১]। যেমন নিস্পন্দ সাগরগর্ভে জলস্পন্দের অর্থাৎ তরঙ্গমালার আবির্ভাব, তেমনি, সেই পরমাকাশে আকাশরূপ অপরিত্যাগে জীববৃন্দের আবির্ভাব হইয়াছে। প্রথমে এক জীব; পরে তাহা হইতে অসংখ্য জীব। প্রথমাবির্ভূত জীব ব্রহ্মা। সেই বিরাটাত্মা প্রজাপতির পৃথ্ব্যাদিরহিত চিন্মাত্রস্বরূপ নভোময় যে দেহ, তাহা আতিবাহিক সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। তাহা অক্ষয় অথচ স্বপ্নশৈলের ন্যায় আভাসিত মাত্র। যদি স্বপ্ননগর চিরস্থায়ী হয়, চিত্রকর যদি মনে মনে একাগ্র চিত্তে যুদ্ধোদ্যোগী সৈন্যদলের চিত্র কল্পনা করে, তাহা হইলে তাহার সেই চিত্তস্থ সংস্কারময় সেনাদল সেই জীবঘন ব্রহ্মার সহিত উপমিত হইতে পারে[২।৫]। যদি কোন এক মহাস্তম্ভে অনুৎকীর্ণ শালভঞ্জিকা (শালভঞ্জিকা=ছবি। খোদাই করা নহে, এরূপ ছবি) বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে তাহার সহিত এই বিরাট্ পুরুষের তুলনা হইতে পারে। বিরাট্ পুরুষও ব্রহ্মস্বরূপ মহাস্তম্ভের অনুৎকীর্ণ ছবি[৬]। এই আদ্য প্রজাপতি ব্রহ্মা স্বকার্য্যের অভাব হেতু কারণবিহীন[৭] (অর্থাৎ তাঁহার সাধারণ জীবের ন্যায় উৎপাদক কারণ নাই)। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাপ্রলয়ে পূর্ব্ব পূর্ব্ব পিতামহগণ মুক্ত হইয়াছেন সুতরাং তাঁহাদের প্রাক্তন কর্ম্ম নাই[৮]। আদ্য প্রজাপতি ব্রহ্মা দর্পণপ্রতিবিম্বিত কুড্যের (দেওয়ালের) ন্যায় দৃশ্য হইলেও পৃথক সত্তা না থাকায় দর্শনের অযোগ্য। বস্তুতঃই তিনি দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন, স্রষ্টা, সৃষ্ট ও সৃজন, ভোক্তা, ভোগ্য ও ভোগ, ইত্যাদির কিছুই নহেন অথচ সকলিই তিনি[৯]। ইনিই প্রত্যগাত্মা (দেহীর অন্তরাত্মা) এবং ইনিই সর্ব্বপ্রকার পদার্থ ও সে সকলের বোধক শব্দ। যদ্রূপ দীপ হইতে দীপ সমূহের উৎপত্তি হয়, তদ্রূপ, আদ্য প্রজাপতি হইতে নিখিল জীবের

উৎপত্তি হইয়াছে[১০]। যেরূপ সঙ্কল্প হইতে সঙ্কল্পের ও স্বপ্ন হইতে স্বপ্নান্তরের উৎপত্তি, সেইরূপ, বিরাডাত্মা হইতে জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। যেরূপ বৃক্ষ হইতে শাখা নিঃসৃত হয়, সেইরূপ, বিরাডাত্মা ব্রহ্মার প্রতিস্পন্দ হইতে জীববৃন্দ বিসৃত হইয়াছে। সহকারী কারণ না থাকায় তাহারা তাঁহা হইতে ভিন্ন নহে[১১]। সহকারী কারণ না থাকিলেই কার্য্য ও কারণ উভয়ে এক অর্থাৎ অভিন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং সৃষ্টি পরমাত্মা হইতে ভিন্ন নহে[১২।১৩]। যাঁহা হইতে পৃথ্যাদি অলীক বস্তু পরম্পরা সৃষ্ট হইয়াছে, তিনি জীবাকাশস্বরূপ আদি ব্রহ্মা এবং তিনিই বিরাডাত্মা বলিয়া শাস্ত্রে পরিচিত[১৪]।

রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, মহর্ষে! জীব কি পরিমিত? (পরিমিত=পরিচ্ছিন্ন বা পরিমাণবিশিষ্ট) না অপরিমিত? অসংখ্য? না নির্দ্দিষ্টসংখ্যাবিশিষ্ট? অথবা অসংখ্য হইলেও অচলপিণ্ডের ন্যায় পরস্পরাশ্লেষে এক? * আপনি বলিলেন যে, আদ্য প্রজাপতি হইতে জীববৃন্দ নিঃসৃত হইয়াছে বটে কিন্তু তাহা অবাস্তব। মূল যদি সত্য সত্যই অবাস্তব হয় তাহা হইলে বারি হইতে বারিধারার উৎপত্তির ন্যায় হউক, আর বারিধি হইতে অম্বুকণার উৎপত্তির ন্যায় হউক, আর তপ্তলৌহপিণ্ড হইতে স্ফুলিঙ্গ নির্গমের ন্যায় হউক, জীবপুঞ্জ কোথা হইতে কিরূপে উৎপন্ন হইল তাহা বর্ণন করুন[১৫।১৬]? হে ভগবন্! আমি জীববৃন্দের তত্ত্ববিনির্ণয় যাহাতে পরিজ্ঞাত হইতে পারি, আপনি তাহাই আমার নিকট উপদেশ করুন[১৭]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রঘুকুলপাবন রাম! যখন এক জীবও নাই, তখন জীবরাশি কোথায়? কি প্রকারে তাহা সম্ভব হইবে? তোমার প্রশ্ন শশশৃঙ্গকে অতিক্রম করিতেছে[১৮]। রাঘব! জীবও নাই, জীবরাশিও নাই এবং পর্ব্বতের ন্যায় জীবপিণ্ডও নাই[১৯]। জীব কি? জীব প্রতিভাস ব্যতীত অন্য কিছু নহে। তুমি ইহা নিশ্চয় জানিবে যে, শুদ্ধচিন্মাত্রস্বরূপ সর্ব্বগ অমল ব্রহ্ম ব্যতিরেকে অন্য কিছুই নাই। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, সেই হেতু তাঁহাতে সর্ব্বপ্রকার কল্পনাকৌশল প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। যেমন লোক সকল বিচিত্র ফুল্লিত লতা দর্শন

* ভাব এই যে, সমষ্টি মিথ্যা হয় হউক, ব্যষ্টি জীবের মিথ্যাত্ব প্রত্যক্ষবাধিত। সকলেই 'আমি' ইত্যাকারে আপনাকে সত্য বলিয়া বিজ্ঞাত আছে।

করে, তাহার ন্যায় ব্রহ্মও সঙ্কল্পবৃত্তি অনুসারী চিন্মাত্রের আভাসে অনুপ্রবেশ দ্বারা আপনাকে মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত সন্দর্শন করেন[২০।২২]। যিনি চিন্ময় ব্রহ্ম তিনি আপনিই আপনাকে জীব, বুদ্ধি, ক্রিয়া বা প্রস্পন্দ, মন, দ্বিত্ব ও একত্ব প্রভৃতি নানা প্রকারে অবগত হন। সেরূপ অবগতির কারণ অবিদ্যা। তিনি স্বাশ্রিত অবিদ্যার বা অবোধতার দ্বারা ঐরূপ হন। আবার সম্যক্ বোধোদয় হইলে অর্থাৎ অবিদ্যা তিরোহিত হইলে তাঁহার ব্রহ্মত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়[২৩।২৪]। যখন আত্মপ্রবোধ উপস্থিত হয় তখনই সেই অবুদ্ধতা দূরীকৃত হয়। অন্ধকার যেমন দীপ দ্বারা দৃষ্ট হইবা মাত্র পলায়ন করে, তেমনি, অজ্ঞানও আত্মজ্ঞানোদয়ে পলায়ন করে। অজ্ঞান যে কি? তাহার স্বরূপ বা তত্ত্ব কিম্বিধ? তাহা নির্ণীত হয় না[২৫]। ব্রহ্মই কথিতপ্রকারে জীব। তিনি বিভাগরহিত, সর্ব্বশক্তিমান্, অনাদি, অনন্ত, মহাচৈতন্য ও সম্পন্নরূপী[২৬]। সর্ব্বব্যাপিত্ব-প্রযুক্ত তাঁহার কোন ভেদ কল্পনা নাই, যে কিছু ভেদকল্পনা সে সমস্তই তাঁহার মায়িক-বিভূতি[২৭]।

রামচন্দ্র বলিলেন, ব্রহ্মন্! যদি একই মহাজীব এবং তাহা হইতেই যদি পৃথক্ পৃথক্ সংসারী জীব, তাহা হইলে তাহারা কেন মহাজীবতুল্য নহে? অর্থাৎ সংসারী জীবেরা কিজন্য অল্পজ্ঞানী ও ব্যর্থসঙ্কল্প হয়?[২৮] বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! সেই সর্ব্বশক্তিমান্ ব্রহ্ম, যিনি মহাজীবের আত্মা, তিনি ব্যষ্টি বিভাগের পূর্ব্বে "আমি সর্ব্বদা সকল বিষয়ে সত্যসঙ্কল্প" ইত্যাকার ইচ্ছায় বিদ্যমান থাকেন। তখন তিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহা তৎক্ষণাৎ সুসম্পন্ন হয়। বিভাগের পূর্ব্বে, ব্যষ্টি ভাব উদয়ের পূর্ব্বে, তাঁহাতে সঙ্কল্পের উদয় হয়, পরে তাহা হইতে দ্বৈতপ্রপঞ্চের আবির্ভাব হয়। যেমন কুম্ভকারের দণ্ড, চক্র ও চক্রভ্রমণাদি ক্রমিক ক্রিয়ার দ্বারা ঘটের উৎপত্তি হয়, তেমনি, দ্বৈতবিভাগও ক্রমিক ক্রিয়ার দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। সেই সকল বিভাগ তাঁহার অংশ-স্বরূপ ও জীবরূপে কল্পিত (অংশ=ভাগ বা ঔপাধিক বিভাগ)[২৯।৩১]। মহর্ষিদিগের বিনা ক্রিয়াক্রমে কেবল মাত্র সঙ্কল্পের দ্বারা কার্য্য সিদ্ধ হইতে দেখা যায় সত্য; পরন্তু তাহাও সেই প্রধান পুরুষের ইচ্ছার দ্বারা। "ইহার এই ইচ্ছা বা এই সঙ্কল্প সিদ্ধ হউক" প্রধান পুরুষের এই অভিনিবেশের বলে তাহা সুসম্পন্ন হইয়া থাকে[৩২]। এই যে অল্প

শক্তিমান্ জীব, ইহাও সেই মহাজীবের শক্তি। তিনি মহাশক্তি, জীবেরা তাঁহার অংশ-শক্তি। * সুতরাং মহাশক্তির নিয়মন ব্যতীত কেবল ক্ষুদ্র শক্তিতে কোন কিছু হইবার সম্ভাবনা নাই। মহাশক্তির অনুগ্রহ থাকিলে ইচ্ছার ফল হয়, নচেৎ হয় না। রাম! কথিতপ্রকারে সেই অনাদ্যনন্তস্বরূপী মহাজীব ব্রহ্মই সমষ্টি ও ব্যষ্টিরূপে প্রতিপ্রকাশিত হইতেছে[৩৩।৩৫]। চিৎশক্তিই বিষয়ানুভব দ্বারা জীব হয় ও সংসার অনুভব করে। অপিচ, সেই চিৎশক্তি বিষয়ানুভব বর্জ্জিত হইলে সম-ব্রহ্ম রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়[৩৬]। তাম্র যেমন পারদের অথবা ঔষধ বিশেষের দ্বারা পাক বিশেষে অথবা স্পর্শ বিশেষে সুবর্ণাকার ধারণ করে, তেমনি, কনিষ্ঠ জীবেরাও শ্রেষ্ঠ জীবের উপাসনায় মহাজীবত্ব (ব্রহ্মভাব) প্রাপ্ত হইয়া থাকে[৩৭]। জীবভাব ও জগদ্ভাব বিচার করিয়া দেখিলে পৃথক্ বস্তু লব্ধ হয় না, কেবল মাত্র চেতনের অদ্ভুত লীলাই অবগত হওয়া যায়। রাম! শরীরাবৃত আত্মায় অর্থাৎ চৈতন্যনামক মহাকাশে এ সকল না থাকিলেও কথিতপ্রকারে সত্যবৎ উদিত হইতেছে[৩৮]।

রামচন্দ্র! চিতের যে স্বাভাবিক চমৎকারিতা (অদ্ভুত সৃষ্টি সামর্থ্য), তাহাই ভবিষ্যৎ নামের ও দেহাদির অবভাস। অপিচ, তাহাই অহংভাবের উৎপাদক[৩৯]। চিত্ত চিৎস্বরূপ রসের আস্বাদনে অনুরক্ত ও তন্ময়াত্মহেতু অনন্ত; অথচ তাহা চিৎ হইতে প্রস্ফুরিত। তাদৃশ চিত্তে এই ত্রিভুবন প্রতিবিম্বিত[৪০]। † সেই চিৎ যদিও অক্ষয় অব্যয় নিত্য নির্ব্বিকার ও একরূপ, তথাপি, তদীয় বিচিত্র শক্তির উদ্ভবে তিনি পরিণাম ও বিকার প্রভৃতি ভাবের দ্বারা বিভিন্নের ন্যায় প্রতীতি গোচর হইতেছেন[৪১]। চিতের ও চিৎপ্রকাশ্য চেত্য নিবহের (বিষয় সমূহের) যে স্বাভাবিক অথবা স্বতঃসমুত্থ মিলিত প্রকাশ, (বিমিশ্র প্রকাশ) তাহাই একণে জগৎ[৪২]। চিতের যে শক্তি উক্তপ্রকারে বিস্তৃত হইয়াছে সে শক্তি আকাশ অপেক্ষাও দুর্লক্ষ্য। সেই দুজ্ঞেয়তত্ত্ব চিৎশক্তিই অহং দেখিতেছে[৪৩]। আত্মাতেই আত্মার দ্বারা বারিতে বারিতরঙ্গের ন্যায় প্রস্ফুরিত এবং ক্রমশঃ উৎকর্ষ পরম্পরা দ্বারা পরিবর্দ্ধিত

---

* যেমন এক বিস্তীর্ণ বহ্নিশক্তি মহাশক্তি; স্ফুলিঙ্গ তাহার অংশশক্তি, সেইরূপ।

† জগৎ-সংস্কার-সংস্কৃত মায়ায় প্রতিফলিত আত্মচৈতন্যেই বিশ্বমণ্ডল স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। এরূপ জগৎস্ফূর্ত্তি অনাদিপ্রবাহে চলিতেছে।

এই জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ড সেই অহং দর্শনের সীমা অর্থাৎ সেই অহং ভ্রমই ঈদৃশ জগদ্ভ্রমের মূল[৪৪]। চমৎকারকারিণী চিৎশক্তির যে চিচ্চমৎকারিতা তাহাই জগৎ; তদ্ভিন্ন পৃথক্ জগৎ নাই[৪৫]। রাঘব! চিত্তের যে প্রথম চেত্য (প্রথম দৃশ্য বা প্রথম অবগাহ্য) তাহাই অহং এবং তাহা (অহংতা) কল্পনা ব্যতীত অন্য কিছু নহে। যাহার বীজ কল্পিত অবশ্য তাহার ফলও কল্পিত। এ নিয়ম অনুসারেও এই জগৎ কল্পিত। অতএব, কল্পনায় দ্বিত্ব একত্ব অবস্থানের বিচার বিফল[৪৬]। জীবভাব অবস্থানের কারণ— পূর্ব্বকর্ম্মসংস্কার—যাহার অন্য নাম অদৃষ্ট ও বাসনা। তাহা ত্যাগ হইলে পর তুমি আমি ইত্যাকার বুদ্ধি পরিত্যাগ করিতে হয়। যতই কল্পনা আছে, তৎসমুদায়ের মধ্যে "তুমি আমি" এই কল্পনা অত্যন্ত দুস্ত্যজ। তুমি আমি কল্পনা পরিত্যাগ করিতে পারিলে সুতরাং তখন সর্ব্ব কল্পনার অভাবে নির্ব্বিকল্প অবস্থা স্থায়ী হয় সুতরাং তখন অপরিচ্ছিন্ন কেবল আত্মসত্তা অবশিষ্ট থাকে[৪৭]। জ্ঞানের প্রভাবে দৃশ্যসত্তা তিরোহিত হইলে দৃশ্য দর্শনের আধার যে চৈতন্য, তদীয় নির্ম্মল সত্তা তদবধি সতত উদিত থাকে, কদাচ অন্যথা হয় না। মেঘের তিরোধানে নির্ম্মল ব্যোম-সত্তা যদ্রূপ, দৃশ্যসত্তার তিরোধানে দৃক্‌সত্তাও তদ্রূপ। বস্তুতঃই নির্ম্মেঘ সমেঘ আকাশের ন্যায়ে চিত্ত ও চিৎ উভয়ের সত্তা অভিন্ন[৪৮]। মন চেষ্টাত্মক তাহা শূন্যাকার, জগৎ তদাত্মক সুতরাং শূন্য (সূক্ষ্ম জগৎ বা অন্তর্জ্জগৎ শূন্য অর্থাৎ নিরাকার) এবং ইন্দ্রিয়রূপ প্রপঞ্চ দেবগণের আলয়স্বরূপ যে সাকার জগৎ (বিরাট ও বিশ্ব) তাহাও শূন্য। পরন্তু চিচ্চমৎকারিতা প্রযুক্ত ঐ সকল আকার বিশিষ্ট বলিয়া বোধ হয়। ফল কথা, চিৎচমৎকার ব্যতীত অন্য কিছু নাই। নিয়ম এই যে, যাহা যাহার বিলাস (লীলা), তাহা তদাত্মক। কদাচ তাহা তাহা হইতে ভিন্ন নহে। এ নিয়ম সাবয়ব পক্ষে দেদীপ্যমান, নিরবয়বের পক্ষে ত কথাই নাই[৪৯।৫০]। নামাদিরহিত সর্ব্বসাক্ষিণী চিতির যে রূপ, তাহাই এই জগতের তাত্ত্বিক রূপ। এ বিষয়ের বিশদ কথা এই যে, চিতির যে নামরূপাদি নিকৃষ্টভাব—তাহাই চৈত্য এবং সেই চেত্য হইতে জগৎ প্রস্ফুরিত হইয়াছে। (অভিপ্রায় এই যে, অপরিচ্ছিন্ন চিৎস্বরূপ হইতে এই স্ফুরণরূপী জগতের নাম রূপাদি কল্পিত ও প্রকাশিত হইয়াছে)[৫১]। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, পঞ্চ ভূত, তদ্বাচক বাক্য ও

দিক্ প্রভৃতির রচনা সমস্তই চিতি হইতে হইয়াছে এবং চিৎই কথিত-প্রকারে জগৎস্থিতির কারণ হইয়াছে[৫২]। চিতের চিত্বই জগৎ; অজগৎ চিত্ব (চিত্তের ধর্ম্ম বা সামর্থ্য বিশেষ) নাই। চিৎ ও চিত্ব উভয়ের কল্পনারূপ ভান (প্রতীতি) অনুসারেই ভেদ প্রতীতি হইতেছে, কিন্তু সে ভেদ বাস্তব নহে। ভাবিয়া দেখ, চিত্তের কল্পনা ব্যতিরেকে জগৎ কোথায়?[৫৩] চিদ্ব্রহ্মের যে অর্থপ্রথন সামর্থ্য অর্থাৎ বিষয় দেখিবার শক্তি, সেই শক্তিই অর্থাৎ সেই অর্থপ্রথনসামর্থ্যই জীব ও জীবভোগ্য ভূত ও ভৌতিক আকারে অর্থাৎ জগদাকারে অবস্থান করিতেছে[৫৪]। চিৎ হইতে চিত্তের ও চিত্ত হইতে যে অহং ভাবের স্ফুরণ হয়, সেই স্ফুরণ স্পন্দনক্রিয় প্রাণের যোগে জীব শব্দের অভিধেয় হইয়াছে[৫৫]। চিৎ পদার্থ চিত্তনামক ধর্ম্মের উদ্রেক হওয়ায় তদ্বিকার অহম্ভাবাদির দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইয়া জীব হইয়াছে সত্য, পরন্তু তাহা হইলেও সে সকল (উপাধি) মিথ্যা বা বৃথা অবভাস বলিয়া তদ্দ্বারা চিৎস্বভাবের অন্যথা ঘটনা হয় না[৫৬]। কোনও বস্তু আপনার ক্রিয়ায় আপনি ভিন্ন হয় না। যদি তাহা না হয় তবে অহঙ্কার-প্রধান চিৎ হইতে স্পন্দপ্রধান প্রাণ ভিন্ন হইবে কেন? যে চিৎ সে-ই প্রাণ, ইহা সিদ্ধ হওয়ায় স্থির হয় যে, স্পন্দশক্তিসম্বলিত চিৎ-ই পুরুষ ও আত্মা অর্থাৎ জীব[৫৭]। অপিচ চিত্ত, মন ও ইন্দ্রিয় ভাব প্রাপ্ত হইলেও তদ্দ্বারা বাস্তব জীব ভেদ সিদ্ধ হয় না। জীবের উপাধি মন, তাহা গোলক ভেদে (গোলক=স্থান) বিভিন্নপ্রায়; কিন্তু গোলকের অভাবে এক[৫৮]। কথিতপ্রকারে জীবের ও জগতের অবাস্তবত্ব অবগত হওয়া যায় এবং ইহাও বুঝা যায় যে, অতিতুচ্ছ কার্য্য-কারণাদি ভাবময় এই জগৎ চিৎপ্রকাশের ছটা অর্থাৎ প্রান্তভাগস্থ অন্য এক প্রকার প্রকাশ ব্যতীত অন্য কিছু নহে। এ প্রকাশ তদাশ্রিত মায়ার বিলাস; তাহার (মায়ার) উপশমে তাহা (চিৎ) নির্ব্বিশেষ পরমাত্মা[৫৯]। ইহারই নাম পরমাত্মদর্শন অর্থাৎ ব্রহ্মদর্শন। এ দর্শনের ফল অনর্থ নিবৃত্তি। অনর্থ নিবৃত্তি এইরূপে অনুভূত হইতে থাকে—

আমি অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য, সর্ব্বব্যাপী, স্থির, অচলের ন্যায় এক ও এক ভাবে অবস্থিতি করিতেছি[৬০]। অজ্ঞ জীব এ তত্ত্ব জানে না, না জানিয়া বিবাদ করে। তাহারা নিজে ভ্রান্ত হইয়া অন্যকেও ভ্রমে নিপাতিত করে[৬১]। ইহা দৃশ্য, ইহা মূর্ত্তি, এ সকল

ভাব অজ্ঞ দিগেরই জ্ঞানে রূঢ় থাকে। অজ্ঞ দৃষ্টিতেই পৃথক্ পৃথক্ বিকার দৃষ্ট হয়, জ্ঞানীর দৃষ্টিতে নহে। অজ্ঞানীর দৃষ্টিতে দ্বৈত, জ্ঞানীর দৃষ্টিতে অদ্বৈত[৬২]। চিৎ একটী তরু, তাহাতে বিষয়াশক্তিরূপ জলসিঞ্চন, তদ্দ্বারা বসন্তকান্তির অনুরূপ তদীয় অনির্ব্বাচ্য মায়াশক্তির বিলাস, তদ্দ্বারা অতিবিশদ কাল প্রভৃতি সম্বলিত জগৎ নাম্নী মঞ্জরী বিস্তৃত হয়[৬৩]। চিৎ-ই বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ডাকারে প্রস্ফুরিত হইতেছে, চিৎ-ই অণ্ডজাত্মক বায়ু অর্থাৎ (সূত্রাত্মা), চিৎ-ই বারিরূপে প্রস্ফুরিত। সে বারি তড়াগাদি খনন দ্বারা সমুৎপন্ন নহে। অর্থাৎ তাহা প্রথমোৎপন্ন চতুর্থ ভূত। সেই চিৎ-পদার্থই বিচিত্র স্বর্ণরজতাদি ধাতুরূপী; তাহা হইতেই দেব, অসুর ও মনুষ্যাদির দেহ নির্ম্মিত হইয়া থাকে[৬৪।৬৫]। তিনিই বিচিত্র ওষধি প্রভৃতির প্রকাশক জ্যোৎস্না রূপে সমুদিত হইয়া থাকেন। এই চিৎ স্বয়ম্প্রকাশ। সমুদায় বাহ্য বস্তু অন্তগত হইলেও ইনি (চিৎ) স্বপ্রভাবে সমুদিত থাকেন। ইনিই জাড্যভাব দ্বারা স্থাবরাদি জড় বস্তুতে সুষুপ্তি-ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন[৬৬।৬৭]। * ইনি যখন অবিচারপরায়ণ হন, অজ্ঞানাবিষ্ট হন, তখন স্বকল্পিত স্পন্দস্বভাব প্রাণাদিতে আত্মভাব কল্পনা করতঃ সংসারী হন। যখন বিচারপরায়ণ হন, আপনার অজ্ঞানাবরণ ভঙ্গ করিয়া স্বরূপ প্রত্যক্ষ করেন, তখন স্বীয় স্বভাবে অবস্থিতি করেন। সুতরাং এই জগৎ চিত্তর অবস্থা অনুসারে বিদ্যমান ও অবিদ্যমান উভয়রূপী। বিচারারূঢ় চিত্ত জগৎ নাই বলিয়া জানে এবং অবিচারাক্রান্ত চিত্ত জগৎ আছে বলিয়া জানে[৬৮]। চিৎ-ই শূন্য, চিৎ-ই মহালোক, চিৎ-ই স্পন্দনশীল সমীরণ, চিৎ-ই অন্ধকার, চিৎ-ই সূর্য্যের আলোক; এইরূপ বিবেচনা করিলে চিতের অস্তিত্বে জগতের অস্তিত্ব গ্রাহ্য করিতে হয়, অন্যথা ঐ সকলের স্বাধীন অস্তিত্ব নাই। ব্রহ্ম দৃষ্টিতে জগৎ নাই। জগৎ ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছু নহে, এরূপ বিবেচনায় জগতের অন-স্তিত্ব। যেমন তৈল দগ্ধ হইলে কজ্জল হয়, তেমনি, এই জগৎ লয় প্রাপ্ত হইলে চিন্মাত্রে অবশেষিত হয়। পরমাণু অপেক্ষাও সুসূক্ষ্ম অর্থাৎ দুর্লক্ষ্য চিৎ-ই উক্তরূপে জগতের উৎপত্তি-পরম্পরায় বিরাজিত রহিয়াছে[৬৯।৭১]। চিৎ-ই অগ্নির উষ্ণতা, চিৎ-ই জগতের চিহ্ন, চিৎ-ই জগৎ, চিৎ-ই শব্দের

* প্রস্তরাদিতেও চৈতন্য আছে, পরন্তু তাহা অব্যক্ত। আধার বিশেষে চৈতন্যের স্ফূর্ত্তি ও অস্ফূর্ত্তি। মন থাকিলে তাহাতেই চৈতন্যের প্রদীপ্ত প্রকাশ প্রকাশ পায়।

ধবলতা, চিৎই শৈলের জঠর, চিৎ-ই জলের দ্রবত্ব, জগদ্রূপিনী চিৎ-ই ইক্ষুরসের, মাধুর্য্য, ক্ষীরের মধুরতা, জলের স্নিগ্ধতা; হিমের শীতলতা, অনলের শিখা, সর্ষপের স্নেহ, সরোবরের বীচি, মধুর দ্রব্যের মাধুর্য্য, কনকের অঙ্গদ এবং পুষ্পের সৌগন্ধ। এই জগৎ সেই চিদ্রূপিনী লতার ফল। চিৎসত্ত্বাই জগতের সত্তা, পৃথক্ জগৎসত্তা নাই। জগতের যে অস্তিতা, তাহা চিতেরই বপুঃ অর্থাৎ শরীর[৭২।৭৫]। তুমি, আমি, অগ, নগ, নদ, নদী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হইলেও সে প্রতীতি অবস্তু অর্থাৎ সত্য নহে। অর্থাৎ মিথ্যা। যেমন আকাশে নীলিমার প্রতীতি হয় অথচ তাহা আকাশে অনবস্থিত, তেমনি, ভুবনত্রয় প্রতীত হয় বটে; পরন্তু তাহা নাই। (পৃথক্ অস্তিত্ব নাই। আধারের অস্তিত্বে, আছে বলিয়া প্রতীত হয়। আধার চিদ্ব্রহ্ম)[৭৬]।

পরমাত্মা অবিকল্প অর্থাৎ নির্ভেদ। সেইজন্য তাঁহার সত্তা ও অসত্তা উভয়ই তুল্য। যেমন অবয়ব অবয়বীর, শব্দের ও অর্থের প্রভেদ নাই, সেইরূপ, চিতের ও জগতের প্রভেদ নাই। বস্তুতঃ অবয়ব অবয়বী, শব্দ ও অর্থ, সমস্তই শশশৃঙ্গের ন্যায় অলীক। যেহেতু অলীক সেই হেতু সাগর ও পৃথিব্যাদি সমেত এতজ্জগৎ বস্তুকল্পে নাই[৭৭।৭৮]।

রাঘব! চিৎ এক ও একরস। সেজন্য তাহাতে অবয়বাদি বিন্যাসের প্রশক্তি বা সম্ভাবনা নাই। ইনি সর্ব্বকাল স্বীয় নির্ম্মল স্বভাবে অবস্থিত। যেমন স্ফটিকশিলা নগরাদি প্রতিবিম্বের সন্নিবেশ ধারণ করে, তেমনি, নির্ম্মল চিৎ এই অসৎ জগতের প্রতিভাস মাত্র ধারণ করিতেছে। পল্লব যেমন তরু হইতে পৃথগ্‌ভাবে অনিরূঢ় ও অনন্যাত্মা এবং তাহা যেমন স্বীয় অভেদে শিরাদি ধারণ করে, চিৎ সেইরূপে এই জগৎকে ধারণ করিতেছে। এই চিৎ কারণ সমূহের পিতামহ[৭৯।৮২]। চেত্য (চিতের বিষয় অর্থাৎ চৈতন্যের বিজ্ঞেয় বা প্রকাশ্য) নাই বলিলাম, এ কথায় যেন মনে করিও না যে, চিৎও নাই। চিৎ নাই, এ কথাটাও অযুক্ত। কারণ, চিৎ (চৈতন্য) স্বানুভবসিদ্ধ। যাহা কিছুতে থাকে, অদৃশ্য হইয়া থাকে, তাহাতেই দৃশ্যতা উদয় প্রাপ্ত হয়। বীজে অঙ্কুর থাকে বলিয়াই বীজ হইতে অঙ্কুর প্রাদুর্ভূত হয়[৮৩।৮৪]। দৃশ্য নাই বলিয়াছি, যদি তাহা তুমি ধারণ করিতে না পার, (তাহাতে যদি বিশ্বাস আগমন না করে) এবং দৃশ্য থাকা পক্ষে যদি বিশেষ আগ্রহই থাকে, তাহা হইলে

সূক্ষ্ম অনুভব দ্বারা চিত্তনিরূঢ় ভেদজ্ঞান দূরীকৃত কর। করিয়া "এ সকল সেই পরমপদাত্মক ও চিন্ময় এবং চিৎ আছে বলিয়াই এ সকল আছে" এইরূপে ইহার অস্তিত্ব অর্থাৎ থাকা স্বীকার কর[৮৫]।

বাল্মীকি কহিলেন, মহর্ষে! (ভরদ্বাজ!) বশিষ্ঠ এইরূপ কহিতেছেন, এমন সময়ে দিবা অবসান ও সাংকাল উপস্থিত হইল। তখন সায়ন্তন-কার্য্য সমাধানার্থ মুনিগণ এবং অন্যান্য সভাসদ্গণ প্রস্থান করিলেন। পরে রজনী অতিক্রান্ত ও দিবাকর সমুদিত হইলে, পুনর্ব্বার তাঁহারা সভায় আগমন পূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে উপবেশন করিলেন[৮৬]।

চতুর্দ্দশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চদশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! এই যে জগৎ দেখিতেছ, ইহা জগৎ নহে; কিন্তু চিদাকাশ। চিদাকাশ ও আত্মা সমান কথা। যেমন নির্ম্মল গগনমণ্ডলে মুক্তাশ্রেণীর ভ্রম হয়, (মেঘখণ্ডের ভঙ্গী বিশেষে) তেমনি, সেই নির্ম্মল আত্মায় জগৎ ভ্রম হইতেছে[১]। যেন চিদ্রূপ স্তম্ভে ত্রিজগদ্রূপ অনুৎকীর্ণ শালভঞ্জিকা (কেহ খোদাই করে নাই এরূপ আকৃতি) বিরাজ করিতেছে। অথচ ইহা উৎকীর্ণ নহে এবং ইহার উৎকর্ত্তাও কেহ নাই[২]। সমুদ্র যেমন স্বকীয় স্বভাবে প্রস্পন্দিত হয়, তরঙ্গের বেগ প্রসৃত হয়, তেমনি, পরব্রহ্মে জগৎ প্রতীতি হইয়া থাকে[৩]। মূঢ়েরা এই জগৎকে অত্যন্ত বৃহৎ মনে করে সত্য; পরন্তু জ্ঞানীর দৃষ্টিতে ইহা পরমাণু অপেক্ষাও ক্ষুদ্র। পর্ব্বত ও পরমাণুতে যেরূপ প্রভেদ, চৈতন্যে ও চৈতন্যে ভাসমান জগতে সেইরূপ প্রভেদ। পরমাণু এত ক্ষুদ্র যে গবাক্ষ ছিদ্রে নিঃসৃত প্রাতঃকালের সূর্য্য কিরণের সহায়তা ব্যতীত দৃষ্টিগোচর হয় না[৪]। যেমন গবাক্ষ ছিদ্রাগত প্রাতঃসূর্য্যকিরণে ভাসমান পরমাণু সকল তৎকিরণের অভাবে অনুভবগম্য হয় না, তেমনি, স্বচৈতন্যে ভাসমান জগৎ স্বচৈতন্যের ব্যতিরেকে অভাবাপন্ন হইয়া থাকে। কথাগুলির ভাবার্থ—স্বাত্মভ্রান্তিই জগদ্দর্শনের মূল। বিস্পষ্ট স্বাত্মদর্শন হইলেই জগদ্দর্শন তিরোহিত হয়[৫]। এই পৃথ্বী প্রভৃতি জগৎ অনুভূত হইলেও স্বপ্নসঙ্কল্পাদির ন্যায় অলীক। (যেমন পর্ব্বত কোথায় তাহার স্থিরতা নাই অথচ মন স্বপ্ন কালে ও কল্পনাকালে পর্ব্বত দেখে)। জগৎ বস্তুতঃ বিজ্ঞানাকাশরূপী। তাহাতে যে স্থূল পিণ্ডাকার জগৎ দেখা যায় তাহা যদ্রূপ মরুভূমিতে সরিৎভ্রান্তির দর্শন তদ্রূপ। অর্থাৎ ভ্রান্তি[৬,৭]। এই যে দৃশ্যতা, ইহা ভ্রান্তিবিশেষ। জগৎ মূর্ত্তও নহে, অমূর্ত্তও নহে, কিছুই নহে। অথচ ইহা মরুভূমিতে নদীপ্রবাহের ন্যায় ও মনোরথময় নগরের ন্যায় কেবল মাত্র অন্তরেই দেখা দেয়[৮]। যেরূপ স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু জাগ্রদবস্থায় অসৎ, বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তদ্রূপ, সারাসারবিবেচনাশালী বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি দিগের নিকট এই জগতের দৃশ্যশ্রী অসৎস্বরূপে প্রতিপন্ন

হইয়া থাকে। তাঁহারা জানিতে পারেন যে, জগতের অস্তিত্ব ব্রহ্মস্বরূপের অনতিরিক্ত[৯]। অবিবেকী ব্যক্তিরাই ব্রহ্ম শব্দের পরিবর্ত্তে জগৎ শব্দ কল্পনা করিয়া থাকে, কিন্তু বিবেকীরা ও তত্ত্বজ্ঞানীরা ইহাকে অদ্বয় ব্রহ্ম বলিয়াই জানেন। রাম! আমি তোমাকে সেইজন্যই বলিতেছি; তুমি অজ্ঞদিগের জ্ঞানের অনুগামী হইও না। বস্তুতঃই জগৎ, ব্রহ্ম, আমি, এ সকল শব্দের অর্থে কোন প্রকার ভিন্নতা নাই[১০]। যেমন শূন্যাত্মক আকাশ ও সূর্য্যের আলোক, যেমন সূক্ষ্ম মেঘ ও মনঃকল্পিত মেঘ, তেমনি, জগৎ ও তত্ত্বদর্শীর দৃষ্টি। অর্থাৎ তত্ত্বদর্শীর জগদ্দর্শন আর ব্রহ্মদর্শন তুল্য। তত্ত্বদর্শীরা দেখেন, এ সমস্তই সেই অচেত্য চিৎ (ব্রহ্ম)[১১]। যেমন স্বপ্নদৃষ্ট নগর ও জাগ্রদ্দৃষ্ট নগর তুলনায় সমান, তেমনি, এই জগৎ ও সঙ্কল্পিত জগৎ তুলনায় সমান[১২]। সুতরাং জগৎ কেবল চিন্ময় ব্যোম। শূন্য, ব্যোম, জগৎ, এ সকল চিন্ময় ব্রহ্মের নাম ভেদ[১৩]। প্রোক্ত কারণে স্থির হয়, জগৎ প্রভৃতি যে কিছু দৃশ্য—তত্তাবতের কিছুই উৎপন্ন হয় নাই। ইহার প্রকৃত নামাদিও নাই। যাহা ছিল তাহাই আছে, এতদ্ব্যতীত অন্য কিছু বলা যায় না[১৪]। জগৎ কথিতপ্রকারে মায়ারূপ মহাকাশে অবস্থিতি করিতেছে সুতরাং চিদাকাশ (ব্রহ্ম) তাহাতে বস্তুতঃ আবৃত হন নাই। এই কল্পিত জগৎ চিদাকাশের অণুমাত্রও আবৃত করিতে সমর্থ নহে[১৫]। ইহা আকাশসম নির্ম্মল এবং ইহার কোন বাস্তব মূর্ত্তি নাই। যেমন ব্যোমে ব্যোমময় চিত্ত ও সঙ্কল্পনগর অবস্থান করে, ইহা সেইরূপে অবস্থান করিতেছে[১৬]। এই বিষয়ে আমি মণ্ডপোপাখ্যান নামে একটী আখ্যান তোমাকে বলিব। তাহা শুনিতে মধুর। বিশেষতঃ তাহা শুনিলে তোমার চিত্তে উপদিষ্ট কথা সকলের অর্থ নিঃসন্দিগ্ধ রূপে প্রতীত হইবে[১৭]।

মণ্ডপোপাখ্যান।

রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! আপনি শীঘ্র আমার নিকট সংক্ষেপে বোধ বৃদ্ধির উপায়ীভূত সমুদায় মণ্ডপোপাখ্যান কীর্ত্তন করুন—যাহা শ্রবণ করিলে আমার বোধ বিবৃদ্ধ হইবে[১৮]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! শ্রবণ কর। এই মহীমণ্ডল কুলরূপ কমলের বিকাশক বিবেকশালী শ্রীমান্ ও বহুপুত্রবান্ পদ্মনামে এক নর-

পতি ছিলেন। তিনি শক্ররূপ তিমিরের ভাস্কর, কান্তারূপ কুমুদিনীর চন্দ্রমা, বিবুধবৃন্দের সুমেরু, সদ্‌গুণরূপ হংসরাজির সরোবর, দোষরূপ তৃণের হুতাশন, যশোরূপ চন্দ্রের অর্ণব, সংগ্রামরূপ লতার পবন, মনোমোহরূপ মাতঙ্গের কেশরী, বিদ্যারূপিণী প্রিয়ার প্রিয়, সর্ব্বপ্রকার গুণের আধার, বিলাসরূপ পুষ্প সমূহের বসন্তকাল, সৌভাগ্যরূপ কুসুমের আয়ুধ, লীলারূপিণী লতার সমীরণ, এবং সৌজন্যরূপ কৈরবের চন্দ্রচন্দ্রিকা[১৮-২৪]। এই গুণগণভূষণ ভূপতি পদ্ম ধরণ্যাদি উদ্ধার বিষয়ে কেশবের ন্যায় সাহসী ছিলেন এবং সর্ব্বপ্রকার দুশ্চেষ্টাকে বিষবল্লীর ন্যায় দগ্ধ করিতে পারিতেন। ইঁহার লীলা নামে সৌভাগ্যশালিনী প্রিয়া ভার্য্যা ছিল[২৫]। তাঁহাকে দেখিলে বোধ হইত, যেন সাক্ষাৎ কমলা মানুষী বেশে অবনীতলে আবির্ভূতা হইয়াছেন। এই লীলা স্বামীব ও অন্যান্য পরিজনবর্গের সেবায় সতত অনুরক্তা থাকিতেন। সানন্দ-মন্থর-গামিনী বদনাম্ভোজশালিনী সহাস্যবদনা লীলার অলকারূপ অলিকুল দ্বারা মুখকমল সর্ব্বদা সুশোভিত থাকিত। এই লীলা পদ্মকর্ণিকার ন্যায় গৌরবর্ণা ছিলেন। তাঁহাকে দেখিলে বোধ হইত, যেন একটী গতিশীল পদ্ম। অনেকেই কল্পনা করিত, লীলা ভূতলস্থ কুসুমধন্বা কন্দর্পের পরিচর্য্যার নিমিত্ত 'দ্বিতীয়' রতিরূপে অবনীতলে অবতীর্ণা হইয়াছেন। লীলা স্বামীর প্রতি এরূপ অনুরক্তা ছিলেন যে, স্বামী উদ্বিগ্ন হইলে তিনিও সাতিশয় উদ্বিগ্না, স্বামী আনন্দিত হইলে আনন্দিতা, স্বামী ব্যাকুলিত হইলে অত্যন্ত ব্যাকুলিতা এবং স্বামী ক্রোধান্বিত হইলে সাতিশয় ভীতা হইয়া তাঁহার রোষাপনোদনে যত্নবতী হইতেন। অধিক কি বলিব, এই লীলা ছায়ার ন্যায় নিরন্তর স্বামীর অনুগতা থাকিতেন[২৬-৩১]।

পঞ্চদশ সর্গ সমাপ্ত।

ষোড়শ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিতেছেন—নরপতি পদ্ম ভূতলবিহারিণী অপ্সরার অনুরূপা লীলার অকৃত্রিম প্রেমরসে সার্দ্রচিত্ত হইয়া কখন উদ্যানে, কখন তমাল-বনে, কখন রমণীয় পুষ্পমণ্ডপে, কখন লতাকুঞ্জে, কখন অন্তঃপুরস্থপুষ্প-শয্যায়, কখন ক্রীড়াপুষ্করিণীতে, কখন চন্দন, কখন কদম্ব ও পারিভদ্র প্রভৃতি বৃক্ষের তলদেশে, কখন কোকিলধ্বনিসমাকুল বসন্তবনরাজিতে, কখন বিবিধ তৃণরাজিপরিপূর্ণ বনস্থলীতে, কখন শীকরাসারবর্ষী নির্ঝর প্রদেশে, কখন মণিমাণিক্যাদিসুশোভিত শৈলতটে, কখন দেবায়তনে, কখন বা মুনি ও মহর্ষিগণের পবিত্র আশ্রমে অবস্থিতি করিতেন[১।৮]। তাঁহারা রজনীতে প্রফুল্ল কুমুদ্বতী সকাশে ও দিবাভাগে প্রফুল্ল নলিনী-সমীপে বিবিধ লৌকিক পরিহাস কথা ও পুরাণপ্রসঙ্গ প্রভৃতি বহুবিধ মনোহর আখ্যান সকল কীর্ত্তন করিতেন। এবং পুষ্পমালায় পরি-বেষ্টিত হইয়া বিবিধ সুস্বাদু ভক্ষ্য ভক্ষণ করিতেন। কখন মৃদুমন্দপাদ-সঞ্চারে, কখন জলযানে, কখন হস্তিপৃষ্ঠে এবং কখন বা অশ্বারোহণে পরিভ্রমণ করিতেন এবং ইচ্ছানুসারে জলকেলি, নৃত্য, গীত ও বাদ্যাদির দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে প্রসন্ন করিতেন ও বিহার করিতেন[৯।১৭]।

একদা শুভসঙ্কল্পশালিনী লীলা মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন—"আমার এই নরপতি স্বামী প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়। অতএব, এই যৌবনো-ল্লাসশালী শ্রীমান্ রাজা কি প্রকারে অজর ও অমর হইতে পারেন এবং আমিই বা কি প্রকারে এই প্রিয় স্বামীর সহিত শতযুগ পর্য্যন্ত বিহার করিতে পারি?" পুনর্ব্বার চিন্তা করিলেন—"আমি সেই প্রকার যত্নে তপঃ জপ নিয়ম ও দেব পূজাদি করিব—যাহা করিলে আমার চন্দ্রবদন প্রিয় স্বামী অজর ও অমর হইতে পারেন[১৮।২১]। আমি এ বিষয়ের জন্য অগ্রে পূজনীয়, বয়োবৃদ্ধ, বিদ্বান্ ও তপঃপরায়ণ ব্রাহ্মণগণকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিব যে, এই অবনীতে মানবগণ কি উপায়ে অমর হইতে পারে"[২২]।

অনন্তর, লীলা চিন্তার দ্বারা ঐ প্রকার স্থির করিয়া পণ্ডিত ব্রাহ্মণ দিগকে আহ্বান করতঃ তাঁহাদিগকে যথাবিধি পূজা ও প্রণাম পূর্ব্বক

পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। "হে ভূদেবগণ! এই পৃথিবীতে মানুবগণ কি উপায়ে অমরত্ব লাভ করিতে পারে?"[২৩]

ব্রাহ্মণেরা উত্তর করিলেন, দেবি! তপঃ ও জপাদি ক্রিয়াকলাপ দ্বারা প্রায় সমুদায় কার্য্যই সিদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু অমরত্ব লাভ হইতে পারে না[২৪]।

লীলা দ্বিজমুখে ঐরূপ বাক্য শ্রবণ করতঃ ভর্তৃবিয়োগভয়ে সাতিশয় ব্যাকুলিতা হইলেন এবং পুনর্ব্বার প্রজ্ঞার দ্বারা চিন্তা করিতে লাগিলেন[২৫]। "যদি দৈবাৎ শুভাদৃষ্ট বশতঃ ভর্ত্তার অগ্রে আমার মৃত্যু হয় তাহা হইলে আমার কোন দুঃখই ভোগ করিতে হইবে না। প্রত্যুত পরম সুখে কাল যাপন করিয়া যাইব। কিন্তু আমার স্বামী যদি সহস্র বৎসর পরেও আমার সম্মুখে লোকান্তর যাত্রা করেন তাহা হইলে আমি এরূপ রূপলাবণ্যসম্পন্ন প্রিয়পতির বিয়োগজনিত দুঃখ কখনই সহ্য করিতে পারিব না। আমার এই ভর্ত্তার জীব যদি আমার এই গৃহ হইতে অন্যত্র না যান তাহা হইলেও আমি এই অন্তঃপুর মণ্ডপে তাঁহা কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়া সুখে কালাতিপাত করিতে পারিব[২৬।২৮]। অতএব, আজ হইতেই আমি তদর্থে অর্থাৎ সংকল্পিত কার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত তপঃ, জপ, উপবাসাদি ও নিয়মাদির দ্বারা ভগবতী জ্ঞপ্তিদেবীর অর্থাৎ সরস্বতী দেবীর আরাধনায় প্রবৃত্তা হই[২৯]।"

অনন্তর রাজমহিষী লীলা পতির অজ্ঞাতসারে শাস্ত্রানুসারী উগ্রতর তপস্যাদির দ্বারা ভগবতী জ্ঞপ্তি দেবীর আরাধনায় নিযুক্তা হইলেন। * নিয়মশালিনী রাজ্ঞী লীলা সর্ব্বাস্তিক্যজ্ঞান (সকল বিষয়ে শ্রদ্ধা) সহকারে সদাচারপরায়ণা ও স্নান, দান, তপস্যা ও ধ্যান নিরতা থাকিয়া ত্রিরাত্র উপবাস ও চতুর্থ দিবসে পারণ, পুনশ্চ ত্রিরাত্র উপবাস ও চতুর্থ দিবসে পারণ, এতদ্বিধ নিয়ম অবলম্বন করতঃ তপশ্চর্য্যায় নিযুক্তা থাকিলেন। ব্রাহ্মণ, গুরু, প্রাজ্ঞ ও তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিগণের সেবায় এবং যোগ্য সময়ে

* যদিও শাস্ত্র আছে, স্ত্রী পতির বিনা অনুমতিতে উপবাসাদি করিবেক না। "যা স্ত্রী ভর্ত্রা হনমুজ্ঞাতা উপবাসব্রতং চরেৎ। আয়ুষ্যং হরতে ভর্ত্তু র্ম্মৃতা নরকমৃচ্ছতি।" তথাপি "প্রত্যক্ষং বা পরোক্ষং বা সদা ভর্ত্তৃহিতং চরেৎ। ব্রতোপবাসনিয়মৈরুপচারৈশ্চ লৌকিকৈঃ।" এই শাস্ত্রের দ্বারা স্থির করা যায় যে নারীরা ভর্ত্তৃহিতকর ব্রতাদি ভর্ত্তার অনুমতি ব্যতিরেকেও স্বাধীন ভাবে করিতে পারে।

উচিত উদ্যোগের সহিত শাস্ত্রানুসারে ভর্তার সন্তোষ সাধনে নিযুক্তা রহিলেন[৩০।৩৩]। ঐরূপে ত্রিশত নিশা অতিবাহিত হইল। ভগবতী জ্ঞপ্তিদেবী রাজমহিষীর উক্তবিধ পূজায় পরিতুষ্টা হইয়া তদীয় দৃষ্টিপথে আবির্ভূতা হইলেন। বলিলেন, বৎসে! আমি তোমার নিরন্তরিত তপস্যায় ও অকপট পরিচর্য্যায় প্রীতা হইয়াছি। এক্ষণে তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর[৩৪।৩৬]।

রাজমহিষী লীলা সানন্দিত চিত্তে বলিলেন, দেবি! আপনি জন্ম ও জরারূপ দহনে দগ্ধকল্প জীবের দাহনিবারিণী চন্দ্রপ্রভা এবং হৃদয়ান্ধকারনিবারিণী রবিপ্রভা। আপনার জয় হউক[৩৭]। আপনিই এই ত্রিজগতের জননী। মাতঃ! আপনি এই দুঃখিনী কন্যাকে বরদ্বয় প্রদান করতঃ পরিত্রাণ করুন[৩৮]। আমার এক বর—আমার স্বামী দেহবিহীন হইলে, তাঁহার জীবন যেন আমার এই অন্তঃপুরমণ্ডপ হইতে বহির্গত না হয়। অপর বর—আমি ইচ্ছানুসারে আপনার দর্শন প্রার্থনা করিলে যেন তন্মুহূর্ত্তে আপনার দর্শন লাভ করিতে পারি[৩৯।৪০]।

জগন্মাতা স্বরস্বতী তাঁহার বাক্য শ্রবণ করতঃ বলিলেন, "তাহাই হইবে।" ভগবতী জ্ঞানদেবী স্বরস্বতী ঐরূপ বলিয়া সাগরে সাগরসমুত্থিত তরঙ্গমালার ন্যায় সেই স্থলেই অন্তর্হিতা হইলেন[৪১]। অনন্তর রাজমহিষী লীলা ইষ্টদেবতার সন্তোষ সাধন করতঃ বর লাভ করিয়া হরিণী যেমন গীত শ্রবণে আনন্দিতা হয় সেইরূপ আনন্দিতা হইলেন[৪২]। পরে পক্ষ, মাস ও ঋতু যাহার বলয়, দিন যাহার অংশ, বর্ষ যাহার দণ্ড, ক্ষণ যাহার নাভি, স্পন্দ যাহার মধ্যভাগ, সেই কাল চক্রের ক্রমপরিবর্ত্তনে তাঁহার স্বামীর আয়ুঃশেষ হইল। মৃত্যু তদীয় সকাশে উপস্থিত হইলেন। দেখিতে দেখিতে তদীয় দেহ হইতে চেতনা অন্তর্হিত হইল। এ দিকে রাজমহিষী লীলা ভর্তৃবিয়োগশোকে নিতান্ত কাতরা হইলেন এবং শুষ্করস পত্রের ন্যায় ও সলিলবিহীন কমলিনীর ন্যায় ম্লানা হইয়া পড়িলেন[৪৩।৪৫]। তাঁহার অধরপল্লব অত্যুষ্ণ নিশ্বাস-পবনে বিবর্ণীকৃত হইল, শরীর দিন দিন কৃশ ও ধূসরবর্ণ হইতে লাগিল, তিনি পতিবিয়োগশোকে চক্রবাকবিয়োগিনী চক্রবাকীর ন্যায় ও শল্যাহতা মৃগীর ন্যায় মৃতকল্পা হইলেন। কখন রোদন, কখন বা মৌনাবলম্বন, কখন মূর্চ্ছিতা, কখন অঙ্গতাড়ন, কখন বা উন্মত্তার ন্যায় বিকট হাস্য করিতে লাগিলেন[৪৬।৪৯]।

অনন্তর যদ্রূপ শুষ্ক হ্রদস্থিত শফরীর প্রতি প্রথমা বৃষ্টি অনুকম্পান্বিতা হয়, তদ্রূপ, কৃপাময়ী অশরীরিণী বাণী (দৈববাণী) সেই অতিশয়িত শোকবিহ্বলা বালা লীলার প্রতি অনুকম্পান্বিতা হইলেন৩০।

ষোড়শ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তদশ সর্গ।

লীলাকে সম্বোধন করতঃ আকাশরূপিণী সরস্বতী বলিলেন, বৎসে! তুমি তোমার এই ভর্ত্তার মৃত শরীর পুষ্পগুচ্ছে আচ্ছাদন করতঃ রক্ষা কর, পুনর্ব্বার ইঁহাকে প্রাপ্ত হইবে[১]। শীঘ্রই দেখিতে পাইবে, একটীও পুষ্প ম্লান হইবে না এবং তোমার এই শবীভূত ভর্ত্তৃদেহও বিনষ্ট হইবে না। অধিকন্তু শীঘ্রই ইনি পুনর্জ্জীবিত হইয়া পুনর্ব্বার তোমার ভর্ত্তৃত্ব করিবেন[২]। অপিচ, আকাশের ন্যায় নির্ম্মল এতদীয় জীবাত্মা তোমার এই অন্তঃপুরমণ্ডপ হইতে অন্য কোথাও গমন করিবেক না[৩]।

লীলা তদ্বিধ আকাশবাণী শ্রবণ করতঃ কথঞ্চিৎ আশ্বাসিতা হইলেন। এবং পুষ্পমণ্ডপ মধ্যে স্বামীর দেহ সংস্থাপিত করতঃ অন্তঃপুর মধ্যে পরিজনবর্গের সহিত অতি দীনভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন[৪।৫]। পরে অর্দ্ধ রাত্র সময়ে, যখন সকলে নিদ্রাভিভূতা হইয়াছে তখন, সেই দীনা বালা ধ্যানপরায়ণা হইয়া ভগবতী জ্ঞপ্তিরূপা সরস্বতীর আরাধনায় প্রবৃত্তা হইলেন। ভগবতী সরস্বতী সমাধিযোগে আহূতা হইয়া লীলার পুরোবর্ত্তিনী হইলেন। বলিলেন, বৎসে! তুমি কি নিমিত্ত আমাকে স্মরণ করিয়াছ? তোমার শোকের কারণ কি? কেন তুমি শোক করিতেছ? সংসার ভ্রান্তির বিলাস ব্যতীত অন্য কিছু নহে। ইহা বাস্তব নহে; মৃগতৃষ্ণিকার ন্যায় মিথ্যা[৬।৮]। লীলা বলিলেন, দেবি! আমার ভর্ত্তা এক্ষণে কোন স্থানে ও কি প্রকারে অবস্থিতি করিতেছেন এবং কিরূপ কর্ম্ম করিতেছেন তাহা আমি জানিতে ইচ্ছা করি। আপনি তাঁহার নিকট আমাকে লইয়া চলুন। আমি একাকিনী জীবন ধারণে সমর্থ হইতেছি না[৯]।

দেবী বলিলেন, বরাননে! চিত্তাকাশ, চিদাকাশ ও মহাকাশ, এই তিন প্রকার আকাশের মধ্যে চিত্তাকাশ বাসনাময়। আর এই যে ব্যবহারিক প্রত্যক্ষ আকাশ, ইহা মহাকাশ নামে প্রসিদ্ধ। এই দুই ভিন্ন যে আকাশ, তাহাই চিদাকাশ। চিদাকাশে চিত্তাকাশ ও মহাকাশ, উভয়ই লয় প্রাপ্ত হয়। (চিদাকাশ=সর্ব্বব্যাপী মহান্ চৈতন্য।

অপর নাম ব্রহ্ম ও পরমাত্মা। সেই আকাশেই সমুদায় সৃষ্টি, এবং সমুদায়ের অবস্থিতি ও লয়। ইহলোক পরলোক সমস্তই চিদাকাশে। চিদাকাশ দেখ, অনুসন্ধান কর, ভর্ত্তা ও ভর্ত্তৃস্থান দেখিতে পাইবে)[১০]। * তোমার ভর্ত্তার অবস্থিতি স্থান সেই চিদাকাশ কোষে বিরাজ করিতেছে। সুতরাং তন্মনা হইয়া চিদাকাশ ভাবিতে পারিলে শীঘ্রই সে স্থান দেখিতে পাইবে। অনন্তর ইচ্ছা করিলে সে স্থানে গমন করিয়া সাক্ষাৎকার করিতেও পারিবে[১১]। হে বরবর্ণিনি! নিমেষ পরিমিত সময়ের মধ্যে চিত্ত মহাকাশ অতিক্রম করতঃ দূর হইতেও দূর দেশে যায় এবং যত দূর যায় তত দূর চিদাকাশ তাহাকে (সেই চিত্তবৃত্তিকে) প্রকাশিত করে। সেই যে প্রকাশ, তাহার নাম সম্বিৎ ও জ্ঞান। মহাকাশ ও চিত্তাকাশ উভয়ের প্রকাশক ও উভয়ের আধার সেই সম্বিৎ নামক আকাশকেই তুমি চিদাকাশ বলিয়া অবগত হইবে[১২]। যদি তুমি চিত্তস্থ সমুদায় সঙ্কল্প নিরোধ অর্থাৎ পরিত্যাগ করিয়া চিদাকাশে স্থিতি লাভ করিতে পার, তাহা হইলে সেই সর্ব্বাধার সর্ব্বাত্মক তত্ত্ব লাভ করিতে পারিবে[১৩]। তত্ত্ব লাভ দ্বারা দ্বৈত দর্শন নিবারিত করিতে না পারিলে অর্থাৎ প্রভেদবহুল কল্পিত জগৎকে আত্যন্তিকরূপে বিস্মৃতি সাগরে নিমগ্ন করিতে না পারিলে সে পদ পাওয়া যায় না। হে সুন্দরি! তাহা উৎকট শ্রমসাধ্য হইলেও আমার প্রসাদে তুমি তাহা সহজে লাভ করিতে পারিবে[১৪]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রামচন্দ্র! জ্ঞপ্তিরূপিণী সরস্বতী দেবী সেই রাজমহিলা লীলাকে ঐরূপ কহিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর লীলাও সরস্বতীর আদেশানুসারে অবলীলাক্রমে সমাধিস্থা হইলেন[১৫]। অপিচ, পক্ষিণী যেমন স্বীয় বাসস্থান (নীড়) পরিত্যাগ করতঃ উড্ডীনা হয়, তেমনি, লীলাও নির্ব্বিকল্প সমাধির দ্বারা নিমেষ মধ্যে অন্তঃকরণরূপ পিঞ্জর পরিত্যাগ করিলেন অর্থাৎ স্থূল সূক্ষ্ম দেহদ্বয়স্থ অভিমান পরিত্যাগ করিয়া চিদাকাশস্থ হইলেন[১৬]। তখন তিনি স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন, তাঁহার ভর্ত্তা রাজমণ্ডলমণ্ডিত রাজধানীস্থ পুরীমধ্যে সিংহাসনোপরি অবস্থান করিতেছেন[১৭]। তত্রস্থ গৃহ সকল পতাকামণ্ডলীতে পরিব্যাপ্ত এবং পুষ্প, কর্পূর ও ধূপাদির সুগন্ধে সতত আমোদিত রহিয়াছে।

* অভিপ্রায় এই যে, এই বিশ্বমণ্ডল সর্ব্বব্যাপী আত্মচৈতন্যে কল্পিত, সুতরাং, সমাধিযোগে আত্মচৈতন্য দর্শন করিতে পারিলে সমস্তই তাহাতে প্রতিভাত হয়, অর্থাৎ দেখা যায়।

ভৃত্যেরা চতুর্দ্দিক্ হইতে উপায়নাদি আহরণ করতঃ তাহা পরিপূর্ণ করিতেছে। শুভ্রবর্ণপর্ব্বতসদৃশ প্রাসাদের স্তম্ভ সকল স্বর্গস্পর্শী; তাহা স্বীয় প্রভায় প্রভাকর প্রভাকেও পরাজিত করিয়াছে। সামন্তগণ ও স্থপতিগণ ব্যগ্রচিত্তে গুরুতর কার্য্য সকল সম্পন্ন করিতেছে। এই পুরীর পূর্ব্ব দ্বারে অসংখ্য দেব ও মহর্ষিগণ উচ্চৈঃস্বরে বেদপাঠ করিতেছেন। দক্ষিণ দ্বারে ভূপালগণ ও পশ্চিম দ্বারে অসংখ্য ললনা অবস্থিতি করিতেছেন। উহার উত্তরদ্বারস্থিত প্রভূত রথ, হস্তী ও অশ্ব সমুদয় ধূলিপটলে গগনমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিতেছে। উহার চতুর্দ্দিক্ গীত ধ্বনিতে, বাদ্যধ্বনিতে, বন্দিগণের উল্লাসসূচক কোলাহলধ্বনিতে পরিপূর্ণ এবং সে সকলে বনকুঞ্জ ও গগনান্তরাল ধ্বনিত করিতেছে। লীলা রাজসভায় রাজগণমণ্ডিত সিংহাসনে বিরাজমান স্বীয় ভর্ত্তাকে দেখিতে পাইলেন। আরও দেখিলেন, বন্দিগণ তাঁহার চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান আছে, স্তব স্তুতি করিতেছে, অন্যান্য পরিচারকগণ তাঁহার আদিষ্ট কার্য্যসকল পরম সমাদরে সম্পন্ন করিতেছে।

রাজমহিলা লীলা এই সমস্ত দর্শন করিতেছেন, এমন সময়ে সেই রাজসভায় এক জন ভৃত্য উপস্থিত হইয়া কহিল; মহারাজ! দাক্ষিণ্যাত্য-প্রদেশে যুদ্ধ ঘটনা হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে[১৮।২১]। আর এক দূত আগমন করতঃ কহিল, কর্ণাটাধিপতি পূর্ব্বদেশে ব্যবহারমর্য্যাদা স্থাপন করতঃ তদ্দেশীয় দিগকে বশীভূত করিয়াছেন। অপর দূত আসিয়া বলিল, মহারাজ! মালবাধিপতি তঙ্গন দেশ সম্যক্‌রূপে আক্রমণ করিয়াছেন। অন্য সংবাদ সুরাষ্ট্রাধিপতি উত্তর দেশস্থ যাবতীয় ম্লেচ্ছদিগকে বশীভূত করিয়াছেন। ইতিমধ্যে দক্ষিণ মহাসমুদ্রের তট হইতে এক জন দূত আসিয়া লঙ্কাপুরী আক্রমণের বিষয় নিবেদন করিল[২২।২৩]। অনন্তর পূর্ব্বাব্ধিতট হইতে এক জন সিদ্ধ (তপস্বী) পুরুষ উপস্থিত হইয়া কহিলেন, রাজন্! যে স্থানে ত্রিপথগা ভাগীরথী সহস্রমুখে প্রবাহিত হইতেছেন; সেই সিদ্ধগণের আবাস স্থান মহেন্দ্র পর্ব্বতে মহান্ বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে। ঐ সময়েই উত্তরাব্ধিতটসমীপস্থ দেশ হইতে এক জন দূত আসিয়া বলিল, মহারাজ! যে স্থানে কুবেরানুচর গুহ্যকেরা বাস করেন, সেই স্থানে মহান্ বিদ্রোহ হইতেছে। এবং পশ্চিমাব্ধি তট হইতে অপর এক জন দূত উপস্থিত হইয়া বলিল, নরনাথ! পশ্চিম দেশেও বিগ্রহ ঘটনা হইয়াছে। আরও দেখিলেন, চত্বরে অনেক শত যুদ্ধজিত ভূপাল, যাগগৃহে

বেদধ্বনি ও বাদ্যনির্ঘোষ, পার্শ্ব দেশে বন্দিগণের সোল্লাসশব্দ ও গান বাদ্যের মধুর শব্দ সমুত্থিত হইয়া গগনতল ধ্বনিত করিতেছে। অশ্বের হ্রেষা, মাতঙ্গের বৃংহিত, রথের ঘর্ঘর শব্দ মেঘধ্বনির অনুকার করিতেছে[২৪।২৭]। পুষ্পের, কর্পূরের ও ধূপের সৌগন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত। মণ্ডলেশ্বর নৃপগণ শাসন ভয়ে ভীত হইয়া নানাবিধ উপঢৌকন আনয়ন করিতেছে[২৮]। সুধাধবলিত অত্যুচ্চ সৌধশ্রেণী, (চূণকাজ করা অট্টালিকা) তৎসংলগ্ন গগনস্পর্শী স্তম্ভরাজি, নিরতিশয় শোভা বিস্তার করিতেছে। কিঙ্করকুল কার্য্যে ব্যগ্র, শিল্পীরা নগরনির্ম্মাণে তৎপর রহিয়াছে[২৯।৩০]।

ব্যোমরূপিণী লীলা এই সমস্ত দর্শন করিয়া, পরে, যেরূপ অম্বর হইতে নীহারকণা আপতিত হয়, তাহা কেহই দেখিতে পায় না, তাহার ন্যায় সহসা অসংখ্য দলবদ্ধ ভূপালগণের উজ্জ্বল কান্তিসুশোভিত সেই রাজসভামধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু তত্রস্থ জনগণ তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। যেমন অন্যসঙ্কল্পরচিতা কামিনী ও নগরী অন্যে দর্শন করিতে সমর্থ হয় না, তেমনি, সেই পুরোবর্ত্তিনী ভ্রমণশীলা ব্যোমরূপিণী লীলাকে কেহই দেখিতে পাইল না[৩১।৩৩]। লীলা দেখিলেন, সেই রাজা, সেই রাজ্য, সেই সকল ভৃত্য, সেই অমাত্য, সমস্তই সেই। যেন তাঁহার ভর্ত্তা নগর হইতে নগরান্তরে আসিয়াছেন। লীলা প্রত্যক্ষবৎ দেখিলেন—সেই দেশ, সেই আচার, দেশীয় আচার ব্যবহার সম্পন্ন সেই সমস্ত বালক, বালিকা, মন্ত্রী, ভূপাল, পণ্ডিত, রহস্যবেত্তা ভৃত্য, স্বজনগণ ও অন্যান্য পণ্ডিত, সজ্জন, সুহৃদ ও পৌরজনগণ। সমস্তই সেই, কিছুমাত্র ব্যতিক্রম নাই[৩৪।৩৭]। সেই মধ্যাহ্নকাল, সেই দাবানল দগ্ধ দিক্, সেই চন্দ্র, সূর্য্য, মেঘ ও পবনধ্বনি। সেই মহীরুহ, নদী, শৈল, পুর, পত্তন, বিবিধ লতানিকুঞ্জ, গ্রাম ও অরণ্যসুশোভিত দেশপ্রান্ত এবং সেই রমণীয় পুরী। কেবল রাজা প্রাক্তন জরাজীর্ণ দেহ ত্যাগ করিয়া এক্ষণে ষোড়শ বর্ষীয় হইয়া রাজত্ব সুখ অনুভব করিতেছেন। তথায় পূর্ব্বতন নগরবাসী দিগকেও, দেখিলেন[৩৮।৪০]। লীলা এই বর্ণিতপ্রকার বাসনানগরে পূর্ব্বসদৃশ নগরবাসী দিগকে অবলোকন করিয়া ভাবিলেন। এ-কি! পূর্ব্ব নগরবাসীগণ কি সকলেই মরিয়াছে? কিয়ৎক্ষণ এই প্রকার চিন্তায় সমাকুল হইলেন[৪১]।

এই অবসরে দেবী সরস্বতীর কৃপায় তাঁহার সমাধিভঙ্গ হইল। দেখি-

লেন, তিনি ক্ষণকাল মধ্যে পুনর্ব্বার আপনার পূর্ব্ব নগরে ও পূর্ব্ব বাসগৃহে আসিয়াছেন। রাত্রি তখন দ্বিপ্রহর। সখিগণ ও পুরবাসিগণ সকলেই নিদ্রায় অচেতন। নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন, এখানেও পূর্ব্ববর্ণিত সমুদায় লোক ও সমুদায় দ্রব্য যথাবৎ বিদ্যমান রহিয়াছে।

অনন্তর তিনি সেই নিদ্রাক্রান্তা সখীদিগকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, সখীগণ! আমার সাতিশয় কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে, সেজন্য তোমরা আমাকে রাজসভায় লইয়া যাও। আমি স্বামীর সিংহাসনের পার্শ্ববর্ত্তিনী হইয়া যদি সেই সভ্যদিগকে দেখিতে পাই তাহা হইলে জীবিতা থাকিব, নচেৎ প্রাণ পরিত্যাগ করিব[৪২।৪৪]। অনন্তর রাজপরিবারবর্গ রাজমহিষীর নিদেশক্রমে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া যত্নসহকারে স্ব স্ব সমুচিত কার্য্য সকল সম্পন্ন করিতে আরম্ভ করিল[৪৫]। যষ্টিধারী ভৃত্যেরা পৌরজনগণকে ও সভ্যদিগকে আনয়ন করিতে গমন করিল, পরিচারকগণ যত্নসহকারে আস্থান ভূমি অর্থাৎ সভাস্থান মার্জ্জনা করিতে লাগিল[৪৬।৪৭]। উজ্জ্বল দীপ সকল চত্বর ভূমিতে প্রজ্বালিত হওয়ায় চত্বরভূমি পীতবর্ণ সলিলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল, নক্ষত্রগণ যেন এই সকল আশ্চর্য্য দর্শনার্থ গগনমণ্ডলে সমুদিত হইল[৪৮]। যেমন শুষ্ক সমুদ্র জলবর্ষণে পরিপূর্ণ হয়, তেমনি, অনতিবিলম্বে সেই অজিরভূমি জনতায় আকীর্ণ হইল[৪৯]। মন্ত্রিগণ ও সামন্তবর্গ আগমন করিলেন এবং আপন আপন স্থান অধিকার করিলেন। দেখিলে বোধ হয়, ত্রৈলোক্য যেন প্রলয়ান্তে পুনরায় উৎপন্ন হইয়াছে, তাই যেন দিক্‌পতিগণ আপন আপন দিক্‌পরিগ্রহ করিতেছেন[৫০]। কর্পূরসদৃশ শুভ্র নীহারকণা প্রচুর পরিমাণে নিপতিত হওয়াতে চতুর্দ্দিক্ শোভাময় হইয়াছে। প্রফুল্ল কুসুমসুরভিবাহী সমীরণ মৃদুমন্দভাবে প্রবাহিত হইয়া চতুর্দ্দিক্ আমোদিত করিতেছে[৫১]। যেমন সূর্য্যময়ুখ প্রতপ্ত ঋষ্যমূক পর্ব্বতবাসী দিগের শান্তিবিধানার্থ মেঘমালা উদিত হয়, তেমনি যেন আজ্ দ্বারপালগণ শুভ্র বসন পরিধান পূর্ব্বক সেই আস্থানের পর্য্যন্ত দেশে দণ্ডায়মান হইল[৫২]। যেমন প্রলয়কালে প্রচণ্ড বায়ুর তাড়নায় তারকানিকর বিক্ষিপ্ত হয়, তাহার ন্যায় আজ্ লীলাপতির সভাভূমিতে কুসুমনিকর নিপতিত হইয়া তমোরাশি তিরোহিত করিল[৫৩]। যেমন প্রফুল্ল কমলশোভিত সরোবর মরালমালায় শোভমান হয়, তেমনি, আজ্ লীলা-

নাথের আস্থান ভূমি মহীপালানুযায়ী জনগণ কর্তৃক পরিপূর্ণ ও শোভমান হইল[৫৪]। রতি যেমন কামহৃদয়ে অথবা শৃঙ্গার-রস-চেষ্টা যেমন কামাতুরের চিত্তে উপবেশন করে, তেমনি, লীলা ভর্তৃসিংহাসনের পার্শ্বাস্থিত হৈম সিংহাসনে উপবেশন করিলেন[৫৫]। দেখিলেন, পূর্ব্বে যাহাদিগকে দেখিয়াছিলেন তাহারা সকলেই আছে ও আসিয়াছে। লীলা সেই সকল ভূপাল, সেই সকল গুরুগণ, আর্য্যগণ, সখীগণ, সুহৃদগণ, সম্বন্ধী ও বান্ধবগণ দেখিয়া অনুপম আনন্দ লাভ করিলেন এবং স্থির করিলেন, রাজা ব্যতীত আর সকলেই জীবিত আছে[৫৬।৫৭]।

সপ্তদশ সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টাদশ সর্গ ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রামচন্দ্র! লীলা বর্ণিতপ্রকারে ভর্ত্তার সভাস্থান দেখিয়া আশ্বাসিতা হইলেন এবং আকার ইঙ্গিত দ্বারা সমাগত সভ্য-দিগকে "আমি আশ্বাসিতা হইয়াছি" এইরূপ বুঝাইয়া দিয়া সভা স্থান হইতে উঠিয়া গেলেন[১]। পরে অন্তঃপুরমণ্ডপে প্রবেশ করিয়া যে স্থানে ভর্ত্তার শরীর পুষ্পকরণ্ডকে সুরক্ষিত হইতেছে সেই স্থানে গিয়া ভর্ত্তার পার্শ্বদেশে উপবেশন করতঃ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন[২]। "একি অদ্ভুত মায়া!" আমার এই পুরমানবগণ বাহিরে ও অন্তরে, সেখানে ও এখানে, উভয় স্থানেই সমান দেখিলাম![৩] মায়ার একি অদ্ভুত বিলাস! তাল, তালী, তমাল, হিন্তাল প্রভৃতি বৃক্ষমালায় পরিব্যাপ্ত পর্ব্বতগুলিকেও সেখানে ও এখানে সমান দেখিলাম[৪]। কি আশ্চর্য্য! পর্ব্বত যেমন বাহিরে ও আদর্শ মধ্যে তুল্যানুতুল্য রূপে পরিদৃষ্ট হয়, তেমনি, সৃষ্টিকেও কি চিদ্রূপ আদর্শের অন্তরে ও বাহিরে সমান সমান দেখিলাম[৫]। যাহাই হউক, উভয়ের মধ্যে কোন্ সৃষ্টি ভ্রান্তিকৃত এবং কোন্ সৃষ্টি সত্য তাহা নিশ্চয় করিতে পারিলাম না। যেহেতু পারি-লাম না, সেই হেতু আমি বাগ্‌দেবীর অর্চ্চনা করিয়া এ বিষয় তাঁহা-কেই জিজ্ঞাসা করিব, করিয়া সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া লইব[৬]।

লীলা ঐ প্রকার স্থির করিয়া দেবী বাগ্বাণীর আরাধনা করিলেন। এবং কুমারীরূপধারিণী দেবীও তন্মুহূর্ত্তে তাঁহার দৃষ্টিপথে উপনীতা হই-লেন[৭]। দেবী লীলার সম্মুখবর্ত্তিনী হইয়া ভদ্রাসনে উপবেশন করিলেন। লীলা ভূতলে অবস্থিতি করতঃ মহাশক্তিস্বরূপিণী দেবীকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন[৮]। লীলা বলিলেন, পরমেশ্বরি! আপনিই সৃষ্টির মর্য্যাদা স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু তদ্বিষয়ে আমার সাতিশয় উদ্বেগ উপস্থিত হইয়াছে। সেই নিমিত্ত আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করি-তেছি, আপনি অনুকম্পান্বিতা হইয়া যদি আমার সন্দেহ নিরাস পূর্ব্বক উদ্বেগ বিদূরিত করেন, তাহা হইলে আমার প্রতি আপনার যে অনুগ্রহ আছে তাহা সফল হয়[৯।১০]। বুঝিয়াছি, যাহা জগতের আদর্শ (দর্পণ),

যাহাতে জগৎ দেখা যায়, তাহা আকাশ অপেক্ষাও নির্ম্মল এবং তাহার নিকট কোটি কোটি যোজন বিস্তীর্ণ দৃশ্য জগৎ অতি ক্ষুদ্র[১১]। * তাহাই বেদোক্ত মহাবাক্যোত্থ অখণ্ডার্থ বোধ বা প্রজ্ঞার জ্যোতিঃ অর্থাৎ তাহা প্রকাশ। ঘন অর্থাৎ অত্যন্ত নিবিড় (সৈন্ধব ঘনের ন্যায় অন্তরে ও বাহিরে সমান)। কাঠিন্য না থাকায় মৃদু, তাপ শান্তি করে বলিয়া শীতল, ভেদ বা আবরণ না থাকায় নির্ভিত্তি এবং অচেত্যচিৎ অর্থাৎ কোন কিছুর প্রকাশ্য নহে, অথচ সমুদায় বিষয়ের প্রকাশক। এই সূক্ষ্ম বস্তু সমুদায় ব্যবহারের অগ্রে অগ্রে স্ফুরিত হইয়া থাকে[১২]। দিক্, কাল ও তদন্তর্গত কার্য্য নিচয়ের উৎপত্তি, আকাশাদি পদার্থের স্ফুরণ অর্থাৎ প্রকাশ, নিয়ম ও পরিণামক্রম, এ সমস্ত তাহাতেই প্রতিবিম্বিত হইতেছে। আমি দেখিয়াছি, ত্রিজগতের প্রতিবিম্বশ্রী সেই চিদাদর্শের বাহ্যে ও অন্তরে উভয়ত্রই সংস্থিত রহিয়াছে। হে দেবি! উক্ত উভয় স্থানস্থ প্রতিবিম্বের মধ্যে কোন্‌টা কৃত্রিম ও কোন্‌টী অকৃত্রিম তাহা আমি স্থির করিতে পারিতেছি না[১৩।১৪]।

দেবী বলিলেন, সুন্দরি! সৃষ্টির কৃত্রিমত্বই বা কি? অকৃত্রিমত্বই বা কি? অগ্রে আমার নিকট বর্ণন কর, পরে আমি তোমার নিকট ঐ দুই প্রশ্নের যথাযোগ্য প্রত্যুত্তর প্রদান করিব[১৫]। লীলা বলিলেন, অম্বিকে! এই যে আমি এবং আপনি, আমরা উভয়ে এখানে যে অবস্থিতি করিতেছি, আমার মনে হইতেছে, এই সৃষ্টিই অকৃত্রিম[১৬]। আর আমার ভর্ত্তা যে স্থানে এখন অবস্থিতি করিতেছেন, আমার বিবেচনা হয়, সেই সৃষ্টি কৃত্রিম[১৭]। কারণ, শূন্যে দেশকালাদির সংস্থান, স্বপ্নদৃষ্ট পর্ব্বতাদির ন্যায় অলীক, বস্তুসৎ নহে। দেবী বলিলেন, লীলে! অকৃত্রিম সৃষ্টি হইতে কৃত্রিম সৃষ্টি জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। কারণ এই যে, কোনও কালে কারণ হইতে তদ্বিসদৃশ কার্য্য উৎপন্ন হয় না[১৮]। লীলা বলিলেন, অম্বিকে! কারণ হইতে অসদৃশ কার্য্যের উৎপত্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে। মৃৎপিণ্ড সলিলধারণে সমর্থ না হইলেও তদুৎপন্ন ঘট সলিলধারণ করিতে সমর্থ হয়। এস্থলে উৎপন্ন ঘট ও মৃৎপিণ্ড এক ও একরূপ নহে; সুতরাং উক্ত উভয়ের বৈসাদৃশ্য অবশ্যই স্বীকার্য্য[১৯]।

---

* লীলা যাহা সমাধিযোগে দেখিয়াছেন তাহার সহিত ব্যুত্থানদৃষ্ট জগতের তুলনা করিবার জন্য প্রথমে ভূমিকা-কথা বলিতেছেন।

দেবী বলিলেন, লীলে! সহকারিকারণের যোগে,যে কার্য্য উৎপন্ন হয়, সেই কার্য্যে কারণের বিভিন্নতা অনুসারে বিভিন্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে[২০]। বল দেখি, তোমার সেই ভর্ত্তার উৎপত্তিতে এমন কারণভেদ কি আছে—যাহা থাকাতে তিনি এখানে একরূপ ও সেখানে অন্যরূপ হইতে পারেন? এই সৃষ্টির পৃথ্ব্যাদি ভূত কি তোমার সেই ভর্ত্তৃসৃষ্টির কারণ যে তদ্বলে বৈলক্ষণ্য ঘটিবে? যদিও তোমার স্বামীর সৃষ্টি ভৌতিক হয়, তাহা হইলেও বৈষম্যের কারণ নাই। সেখানেও ভূমণ্ডল ও ভূত ভৌতিক, এখানেও ভূমণ্ডল ও ভূত ভৌতিক[২১]। যদি বল, এই ভূমণ্ডলে জন্মিয়া সেই ভূমণ্ডলে যায়, তাহা বলিলেও বুঝিতে হইবে, এ ভূমণ্ডল কোথায়! এখানকার মৃত্তিকা ভূতাদি সেখানে যায় কি না। যাওয়াও অসম্ভব অথচ না গেলে কি প্রকারে সেখানে তদনুরূপ সৃষ্টি হইতে পারে? অতএব, তোমার ভর্ত্তার উৎপত্তি বিষয়ে ভিন্নতাকারক পৃথক্ সহকারী কারণ কিছুই দেখা যায় না[২২]। সেইজন্যই বলিতেছি, অত্রত্য সহকারী কারণ না থাকায় ইহাই স্থির করিতে হইবে অর্থাৎ অনুমান করিতে হইবে যে, যাহার যাহার উৎপত্তি হয়, পূর্ব্ব সর্গীয় কাম কর্ম্ম বাসনাদিই তাহার কারণ। সেই কারণে সৃষ্টির অবৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। এ রহস্য বোধ হয় অল্প মনোনিবেশ করিলে সকলেই বোধগম্য অর্থাৎ অনুভব করিতে পারেন[২৩]।

লীলা বলিলেন, দেবি! এক্ষণে আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, আমার স্বামীর উৎপত্তির কারণ স্মৃতি। স্মৃতি অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মের জ্ঞান সংস্কার সেখানে সেই প্রকারে স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে[২৪]।

দেবী বলিলেন, অবলে! স্মৃতি আকাশস্বরূপ। সেজন্য তদুৎপন্ন তোমার ভর্ত্তার সৃষ্টিও আকাশরূপিণী। তাঁহা অনুভূত হইলেও ব্যোম-রূপী। লীলা বলিলেন, ভগবতি! এখন আমার বোধ হইতেছে, স্মৃতি হইতে যাহার উৎপত্তি হয়, তাহা আকাশস্বরূপ। যেমন আমার স্বামী। এই যে দৃশ্যমানা সৃষ্টি, বোধ হয় ইহাও সেই স্মৃতি হইতে উৎপন্ন, সুতরাং ইহাও শূন্যরূপী। এ সৃষ্টি যে শূন্যাত্মক তাহার নিদর্শন সেই সৃষ্টি[২৫।২৬]।

দেবী বলিলেন, পুত্রি! তুমি যাহা অনুভব করিয়াছ তাহাই সত্য। তোমার ভর্ত্তা যেমন আত্মা হইতে সমুৎপন্ন হইয়া প্রতিভাত হইতেছিলেন, তেমনি এই পরিদৃশ্যমান ভাস্বর সৃষ্টিও সেইরূপে প্রতিভাত হইতেছে[২৭]।

লীলা বলিলেন, ভগবতি! মূর্ত্তিবর্জ্জিত এতৎ সৃষ্টি হইতে যে প্রকারে আমার ভর্ত্তার সেই ভ্রমাত্মক সৃষ্টি হইয়াছে, জগদ্‌ভ্রম নিবৃত্তির নিমিত্ত তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন[২৮]।

সরস্বতী বলিলেন, লীলে! এ সৃষ্টিও পূর্ব্বসৃষ্টি অনুভব জনিত সংস্কার-সচিব (সচিব=সহায়) ভ্রান্তির বিলাস। স্বপ্নভ্রমসদৃশ এতৎ সৃষ্টি যে প্রকারে উদিত হইয়াছে ও প্রকাশ পাইতেছে, তাহা বর্ণন করি, শ্রবণ কর[২৯]।

চিদাকাশের কোন এক স্থানে (অজ্ঞানাবৃত অংশে) ও কোন এক অংশে (সৃষ্টিকর্ত্তার অন্তঃকরণ প্রদেশে) আকাশরূপ কাচ খণ্ডের দ্বারা আচ্ছাদিত সংসারমণ্ডপ অবস্থিত আছে। এই মণ্ডপের স্তম্ভ সুমেরু, চতুর্দ্দশ ভুবন অন্তর্গৃহ, ভানু দীপ; স্বর্গ, মর্ত্ত ও পাতাল, এই ভুবনত্রয়ের অন্তরাল উহার গর্ত্ত, লোকপালেশগণ ঐ গৃহের প্রতিমা প্রাণী সকল ঐ গৃহের কোণ-স্থিত বল্মীক এবং পর্ব্বতসকল লোষ্ট্র। এই মণ্ডপ বহুপুরীপরিব্যাপ্ত ও বহুপুত্র প্রজাপতি ব্রহ্মা এই গৃহের ব্রাহ্মণ। যে সমস্ত কীট কোশ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে আপনা আপনি বদ্ধ হয়, জীবগণ এই গৃহের সেই সমস্ত কীটের অনুরূপরূপী। ব্যোমার্দ্ধতল ও মেঘরাজি ঐ গৃহের কোণস্থিত ধূমকালিমা (ঝুল), নভোমণ্ডলবাসী সিদ্ধগণ উহার ঘুম্ ঘুম্ শব্দকারী মশক, এবং বাতমার্গ * সকল উহার শব্দায়মান মহাবংশ। এই গৃহের প্রাঙ্গনে সুরাসুরাদি বালক নিরন্তর ক্রীড়া করিতেছে। লোকান্তর ও গ্রামাদি সকল ঐ মণ্ডপান্তর্গত ভাণ্ডের উপস্কর স্বরূপ[৩০।৩৫]। উহা তরঙ্গসঙ্কুল অব্ধিরূপ সরোবর জলে পরিষিক্ত। এই সংসারমণ্ডপের এক একটী কোণে পর্ব্বতরূপ লোষ্টের তলদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামরূপ অসংখ্য গর্ত্ত সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে।

হে শুচিস্মিতে! এই নদী, শৈল ও বনসঙ্কুল দেশে এক সাগ্নিক, সপুত্র, রোগবিহীন, রাজভয়ানভিজ্ঞ, অক্ষুব্ধচিত্ত ও ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন[৩৬।৩৮]।

অষ্টাদশ সর্গ সমাপ্ত।

---

* আবহ প্রবহ প্রভৃতি বায়ুচক্র—যাহা জ্যোতির্গণের বহনকারী বলিয়া জ্যোতিষে বর্ণিত হইয়াছে। সে সকল বিশেষ বিশেষ বায়ুস্থান অর্থাৎ বাতমার্গ। পৃথিবীতল হইতে উর্দ্ধে প্রত্যেক চতুর্যোজনান্তে ক্রমিক ভিন্ন ভিন্ন বায়বীয় স্তর আছে। তাহার শেষ স্তরে স্থির বায়ু—সেই স্থির বায়ু কূটবৎ নির্ব্বিকার নিশ্চল ও মূলতত্ত্ব।

ঊনবিংশ সর্গ।

দেবী বলিলেন, বৎসে! এই ব্রাহ্মণ বিত্ত, বেশ, বয়স, কর্ম্ম ও বিদ্যা, সর্ব্বাংশে সাক্ষাৎ বশিষ্ঠ দেবের ন্যায় ছিলেন। কিন্তু মহর্ষি বশিষ্ঠ দেব ইক্ষ্বাকুবংশের পৌরহিত্য কার্য্য গ্রহণ পূর্ব্বক রামচন্দ্রকে শাস্ত্র উপদেশ করিয়াছিলেন, তিনি কেবল তাহাই করেন নাই[১]। তাঁহারও নাম বশিষ্ঠ এবং তাঁহারও সুধাংশুসমসৌন্দর্য্যশালিনী অরুন্ধতী নাম্নী ভার্য্যা ছিল। এ অরুন্ধতীও সর্ব্বপ্রকারে প্রসিদ্ধা বশিষ্ঠভার্য্যা অরুন্ধতীর সমান। বিশেষ এই যে, প্রসিদ্ধা বশিষ্ঠভার্য্যা অরুন্ধতী স্বর্গাকাশে অবস্থিতা, ইনি ভূম্যাকাশে অবস্থিতা[২]। প্রস্তাবিত অরুন্ধতী চিত্ত, বিভব, বেশ, বয়স, কর্ম্ম, উপাসনা, জ্ঞান, কার্য্য ও চেষ্টা, সর্ব্বাংশেই প্রসিদ্ধা অরুন্ধতীর সমান, কেবল চেতনসত্ত্বে অর্থাৎ জীবভাবে অসমান। * ব্রাহ্মণপত্নী অরুন্ধতী উক্ত ব্রাহ্মণের অকৃত্রিম প্রেমের আস্পদ ও সংসারের সার স্বরূপ ছিলেন[৩।৪]।

সেই ব্রাহ্মণ একদা তত্রত্য শৈলসানুস্থিত হরিদ্বর্ণ তৃণ ক্ষেত্রে উপবিষ্ট আছেন; এমন সময়ে দেখিলেন, সেই অচলের অধোভাগে এক মহীপতি সমগ্র আত্মীয়স্বজন ও মহতী সেনা সমভিব্যাহারে মৃগয়া-বিহারে গমন করিতেছেন। নরপতির সৈন্যগণের গভীর কোলাহল নির্ঘোষ যেন সুমেরুশৈলকেও বিদীর্ণ করিতেছে। ইহারা চামর দ্বারা লতানিকুঞ্জ, পতাকার দ্বারা চন্দ্রকিরণ, এবং রৌপ্যমণ্ডিত শ্বেত ছত্র দ্বারা নভোমণ্ডল আচ্ছাদিত করতঃ গমন করিতেছিলেন[৫।৭]। অশ্ব সমুদয়ের পাদত্রাণ দ্বারা মেদিনী উৎখাতিত হওয়াতে রজোরাশি উত্থিত হইয়া গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিতেছিল[৮] এবং সৈন্যগণের মহাকোলাহলে দিক্‌সমূহ প্রপূরিত হইতেছিল। অপিচ, তন্মণ্ডলস্থ জনগণের সকলেই মণিমাণিক্যাদি খচিত কাঞ্চনাভিরণে শোভা পাইতেছিল[৯]।

অনন্তর ব্রাহ্মণ সেই সৌভাগ্যশালী রাজাকে দেখিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, আহা! রাজপদ কি রমণীয়! ইহাই সর্ব্বসৌভাগ্যের

---

* অর্থাৎ প্রসিদ্ধ অরুন্ধতী জীবন্মুক্তা এবং প্রস্তাবিত অরুন্ধতী জীবন্মুক্তা নহে।

সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত[১০]। পরে ভাবিতে লাগিলেন, আমি কত দিনে এই-রূপ মহাপতি হইয়া হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি, পতাকা ও চামর দ্বারা দশ দিক্ প্রপূরিত করিব? কত দিনে কুন্দ-মকরন্দ-সুগন্ধি-বাহী সমীরণ মৃদুমন্দ সঞ্চারে বাহিত হইয়া আমার অন্তঃপুরস্থ সীমন্তীনীগণের সুরত-শ্রমজনিত ঘর্ম্মবিন্দু অপনীত করিবে? এবং কতদিনেই বা আমি কর্পূর ও চন্দনাদি দ্বারা পুরন্ধ্রীবর্গের মুখমণ্ডল সুশোভিত ও নির্ম্মল যশোদ্বারা দিঙ্মণ্ডল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সুপ্রকাশিত করিব?[১১,১৩]

লীলে! ধর্ম্মরত ব্রাহ্মণ সেই দিন হইতে আরম্ভ করিয়া জীবনের শেষ পর্য্যন্ত কেবল ঐ প্রকার চিন্তায় অর্থাৎ সঙ্কল্পে কালযাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। * অনন্তর যেমন হিমরূপ অশনি সলিলস্থিত অম্ভোজ-দিগকে জর্জ্জরীভূত করে, সেইরূপ, তিনি কালক্রমে জরা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া দিন দিন জীর্ণ হইতে লাগিলেন[১৪,১৫]। তখন তদীয় ভার্য্যা স্বামীর মৃত্যু সন্নিহিত দেখিয়া বসন্তকালীন লতা যেমন আসন্ন গ্রীষ্মের ভয়ে ম্লান ভাব অবলম্বন করে, তদ্রূপ, দিন দিন ম্লানা হইতে লাগিলেন[১৬]।

লীলে! সেই বরাঙ্গনা অমরত্ব সুদুর্লভ জানিয়া তোমার ন্যায় আমার আরাধনা করতঃ আমার নিকট এই বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে "দেবি! আমার স্বামীর মৃত্যু হইলে, যেন তাঁহার জীব আমার এই মণ্ডপ হইতে বহির্গত না হয়।" অনন্তর আমিও "তাহাই হইবে," বলিয়া তাঁহার বাক্যে অনুমোদন করিয়াছিলাম[১৭,১৮]। অনন্তর সেই ব্রাহ্মণ কালবশে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে তদীয় পূর্ব্ববাসনাবিশিষ্ট অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন জীবাকাশ সেই গৃহাকাশেই অবস্থিতি করিতে লাগিল এবং উৎকট পূর্ব্বসঙ্কল্পের প্রভাবে তিনি সেই আকাশেই দেবমানুষশক্তিসম্পন্ন ত্রিভুবন-জয়ী রাজা হইলেন[১৯,২০]। তিনি স্বপ্রভাবে পৃথিবী জয়, প্রতাপে স্বর্গ আক্রমণ, ও দয়ায় পাতালতল পালন করতঃ ত্রিলোকজয়ী হইলেন[২১]। তিনি তখন শত্রুরূপ আধিব্যাধি বৃক্ষের কল্পাগ্নি, কামিনীগণের মকর-কেতন, বিষয়রূপ বায়ুর সুমেরু, সাধুরূপ সরোজের দিবাকর, সকল শাস্ত্রের আদর্শ, অথিগণের কল্পপাদপ, ব্রাহ্মণগণের আশ্রয় ও অমৃত-জ্যোতিঃ নিশাকরের পূর্ণিমাতিথিরূপে কালাতিপাত করিতে লাগি-

* অর্থাৎ তদবধি তাঁহার সমুদায় ধর্ম্ম কর্ম্ম ঐ কামনায় অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল।

লেন[২২,২৩]। ব্রাহ্মণ মৃত হইয়া অর্থাৎ ভৌতিক স্থূল দেহ পরিত্যাগ করিয়া সেই গৃহাভ্যন্তরস্থ আকাশে সেই দিনে আপনার পূর্ব্বসঙ্কল্পসংস্কার প্রদীপ্ত চিত্তাকাশময় শরীরে সুতরাং আকাশতুল্য শরীরে ঐরূপ রাজা হইলেন, ও ঐরূপ রাজত্ব অনুভব করিতে লাগিলেন, (কেবল বিবাহ বাকি রহিল)[২৪]। এ দিকে তাঁহার পত্নী পতিবিয়োগশোকে নিতান্ত কাতরা হইলেন। তাঁহার হৃদয় শুষ্ক মাসশিম্বির ন্যায় দ্বিধা হইয়া গেল অর্থাৎ ফাঁড়িয়া গেল; সুতরাং তিনিও প্রায় ভর্ত্তার সঙ্গে সঙ্গেই স্বীয় আধিভৌতিক দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আতিবাহিক দেহে * তাঁহার সেই আকাশরূপী ভর্ত্তার সন্নিহিতা হইলেন এবং সমুদায় শোক বিস্মৃতা হইলেন[২৫,২৬]। নদী যেমন নিম্নবাহী হইয়া সমুদ্রে গমন করে, সেইরূপ, তিনিও অনুগমনের দ্বারা ভর্ত্তার সমীপস্থা হইলেন। এবং বাসন্তীলতিকার ন্যায় হর্ষোৎফুল্লা হইলেন[২৭]। আজ্ আট দিন গত হইল, সেই ব্রাহ্মণ দম্পতী প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেখানে (সেই গিরিগ্রামে) তাঁহাদের সেই গৃহ, সেই ভূমি, সেই সকল স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ও ধনাদি সমস্তই পড়িয়া রহিয়াছে। এবং তাঁহাদের জীবাত্মাও তাঁহাদের সেই গৃহ মণ্ডপে রহিয়াছে ও তথায় তাঁহারা ঐরূপ রাজা ও রাণী হইয়াছেন[২৮]।

ঊনবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

* আতিবাহিক দেহ=জীব যে দেহে পরলোকে যায় সেই দেহ বা ভাবময় দেহ।

বিংশ সর্গ।

দেবী বলিলেন, অঙ্গনে! সেই ব্রাহ্মণ—যে ব্রাহ্মণ আজ্ আট দিন হইল, রাজত্ব প্রাপ্ত হইয়া সিদ্ধসঙ্কল্প হইয়াছেন—তিনিই তোমার স্বামী এবং তাঁহার যে অরুন্ধতী নাম্নী ভার্য্যা, সেই ভার্য্যা তুমি। তোমরাই ইতঃপূর্ব্বে চক্রবাকমিথুনসদৃশী বিপ্রদম্পতী ছিলে, সম্প্রতি তোমরা পৃথিবী-জাত হরপার্ব্বতীর ন্যায় এই রাজত্ব করিতেছ।

হে চারুহাসিনি লীলে! পূর্ব্বসৃষ্টি যে প্রকারে ভ্রমময়—তাহা আমি তোমার নিকট বর্ণন করিলাম। উভয় সৃষ্টিই স্বপ্ন তুল্য ও প্রাতিভাসিক। সমস্তই জীবের স্বরূপে কল্পিতাকারে অবস্থিত[১।৩]। সেই ভ্রম হইতে অর্থাৎ পূর্ব্বভ্রম হইতে এতদভ্রম, আবার এতদভ্রম হইতে ভবিষ্যদভ্রম হইবে। সেই সকল ও এই সকল ভ্রম চিদাকাশে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। সুতরাং এ সকল আত্মদৃষ্টিতে অসত্য (মিথ্যা) হইলেও আশ্রয় দৃষ্টিতে সত্য। (আশ্রয়=চেতন আত্মা। তাহা সত্য, সুতরাং তদাশ্রিত এ সকল আমি, এই ভাবে সত্য)। যখন এ রহস্য বুঝিবে তখন আর এ সকল কিছুই দেখা যাইবে না। সেই জন্য বলিতেছি, কেই বা ভ্রান্তিময় এবং কেই বা ভ্রান্তিবর্জ্জিত। অর্থাৎ সংসার, ভ্রান্তি ব্যতীত অন্য কিছু নহে এবং সর্ব্বপ্রকার সৃষ্টি ভ্রান্তি পরিত্যাগে পলায়ন করিয়া থাকে। অধিক কি বলিব, ইহলোক পরলোক সমস্তই ভ্রমবিজৃম্ভিত[৪।৫]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাঘব! লীলা সরস্বতীর ঐ প্রকার মৃদুমধুর শ্রবণ মোহন বাক্য শুনিয়া কিয়ৎক্ষণ বিস্ময়োৎফুল্ললোচনা হইয়া অবস্থিতি করিলেন। অনন্তর তিনি বিনয়নম্র বচনে বলিতে লাগিলেন। বলিলেন,[৬] দেবি! আপনার বাক্য মিথ্যা কি সত্য তাহা আমার বোধগম্য হইতেছে না। যদি আমরাই সেই বিপ্রদম্পতী, তাহা হইলে, কি প্রকারে আপনার বাক্য সঙ্গত হইতে পারে? (সেই ব্রাহ্মণের জীবই বা কোথায় এবং আমরাই বা কোথায়? সেই বিপ্রজীব সেই ক্ষুদ্রায়তন গৃহাকাশে) কিন্তু আমরা এই বিস্তৃত ভূমণ্ডলে। অতএব, তত্রস্থ বিপ্রদম্পতী যে আমরা এবং সেই আমরাই যে রাজত্ব করিতেছি, ইহা নিতান্ত অসম্ভব ও নিতান্ত

বিরুদ্ধ কথা। আমি যে সমাধিযোগে ভর্ত্তৃরাজ্য দেখিয়াছি, তাহাও যে, এতদগৃহাভ্যন্তরে, সে কথাও অসম্ভব। আমার ভর্ত্তা এক্ষণে যে লোকে আছেন দেখিলাম, কি প্রকারে এতদগৃহ মধ্যে সেই লোকান্তর, সেই পৃথিবী, সেই শৈল ও সেই দশদিক সন্নিবেশ প্রাপ্ত হইতে পারে? তাহার সম্ভাবনাই বা কি? সর্যপ মধ্যে মত্ত ঐরাবত বদ্ধ, অণুকোটরে মশকের সহিত মহাসিংহের তুমুল সংগ্রাম, ভৃঙ্গশাবক কর্ত্তৃক পদ্মচক্রমধ্যস্থিত সুমেরু শৈলের গ্রাস এবং স্বপ্নদৃষ্ট মেঘের গর্জ্জন শ্রবণে ময়ূরের নৃত্য যেরূপ অসম্ভব, গৃহাকাশমধ্যে পৃথ্বীর ও শৈলাদির অবস্থিতি তদপেক্ষাও অসম্ভব। হে সর্ব্বেশ্বরি! আপনার প্রসাদে কাহারও কোন বিষয়ে উদ্বেগ থাকে না। অতএব, আপনি আমাকে নির্ম্মল বুদ্ধিতে যোজনা করুন, সন্দেহ দূরীভূত করতঃ আমার উদ্বেগ অপগত করুন[৭।১২]।

সরস্বতী বলিলেন, সুন্দরি! যাহা বলিলাম, তাহার কিছুই মিথ্যা নহে। কেন তাহা পুনর্ব্বার বলি, শ্রবণ কর। হে বরাঙ্গনে! "কেহ যেন অনৃত বাক্য না বলে" এ নিয়ম আমাদেরই সংস্থাপিত; সুতরাং আমরা তাহা কি প্রকারে অন্যথা করিতে পারি? বরং অন্য কর্ত্তৃক ঐ নিয়ম লঙ্ঘিত হইলে আমরা তাহার শাসন করিয়া থাকি। যদি আমাদিগের দ্বারা নিয়তি অর্থাৎ নিয়ম ভেদ প্রাপ্ত হয়, ভাঙ্গিয়া যায়, তাহা হইলে আর কে তাহার পালন করিবে?[১৩।১৪]

হে লীলে! গিরিগ্রামবাসী সেই ব্রাহ্মণের জীবাত্মা আকাশ-শরীরে গৃহাকাশে অবস্থিতি করতঃ পূর্ব্বসংসার (পূর্ব্বজন্মাদি) বিস্মরণ পূর্ব্বক রাজবাসনাব্যাপ্ত অন্তঃকরণোপহিত চিদাত্মায় তাদৃশ ব্যোমাকৃতি মহারাজ্য সন্দর্শন করিতেছেন[১৫]। যেমন স্বপ্নাবস্থায় জাগ্রৎ স্মৃতির লোপ হইয়া যায়, তেমনি, মৃত্যু হইলে জীবের আর পূর্ব্বসংসার অনুভূত হয় না। হে বরাননে! তোমরাও জীব, সে জন্য তোমাদিগেরও প্রাক্তনী স্মৃতি বিলুপ্ত হইয়া অন্য প্রকার স্মৃতি সমুদিত হইয়াছে[১৬]। স্বপ্নে ও মনোরাজ্যে ত্রিভুবন দর্শন যেরূপ, এবং মরুভূমিতে তরঙ্গমালাসমাকুল স্রোতস্বিনী অবলোকন যেরূপ, গৃহাকাশে গৃহাকাশস্থিত ব্রাহ্মণের সশৈলবনপত্তনা পৃথিবী দেখাও সেইরূপ। ক্ষুদ্রতম আদর্শে বৃহত্তম বস্তু ও সূক্ষ্মতম অন্তঃকরণে যৎপরোনাস্তি বৃহৎ ত্রিজগৎ দর্শন যেমন মিথ্যা অর্থাৎ স্বচ্ছতার প্রতিফলন মাত্র, সেইরূপ, তত্রত্য পৃথিব্যাদিও সেই সত্যস্বরূপ চিদ্ব্যোমের প্রতিফলন

মাত্র। সুতরাং উহার রহস্য এই প্রকারে বুঝিতে হইবে যে, নির্ম্মল-ব্যোমরূপী পরমাত্মার অন্তঃক্রোড়ে সমুদায় অসত্য সৃষ্টি সত্যবৎ প্রতিভাত হয় এবং জগৎকে যে সত্য বলিয়া বোধ হয় সে সত্যতা জগতের নহে; সে সত্যতা চিদাত্মার। পঞ্চকোষান্তর্গত চিদাত্মার সত্যতাই তদারোপিত জগতে প্রতিফলিত হয়[১৭।১৯]। হে লীলে! যেমন মৃগতৃষ্ণাতরঙ্গিণীর তরঙ্গ সৎ নহে, তদ্রূপ অসত্য স্মৃতি হইতে সমুৎপন্ন এই পৃথ্ব্যাদিও সৎ নহে[২০]। এই যে তোমার গৃহ এবং এই যে গৃহাকাশ, এতন্মধ্যে যে তুমি আমি ও অন্যান্য বস্তু, এখানে যাহা কিছু আছে বা দৃষ্টিগোচর হইতেছে, স্ব স্ব অনুভবনীয়রূপে প্রকাশ পাইতেছে, এ সমস্তই সেই চিদ্ব্যোম ব্যতীত অন্য কিছু নহে[২১]। দৃশ্যমিথ্যাত্বের উদাহরণ—স্বপ্ন, সম্ভ্রম ও মনোরাজ্য প্রভৃতি। অর্থাৎ স্বপ্নাদিদৃষ্ট জগৎ ও জাগ্রদ্দৃষ্ট জগৎ তুল্যানুতুল্যরূপে মিথ্যা। দীপ যেমন অন্ধকারাবৃত বস্তু বোধের প্রতি মুখ্য প্রমাণ, তেমনি, উক্ত উদাহরণ মূলক অনুমান জগন্মিথ্যাত্ব বোধের মুখ্য প্রমাণ[২২]। হে বরাঙ্গনে! ষট্পদ যেমন পদ্মৈকদেশে অবস্থিতি করে, তাহার ন্যায়, সেই ব্রাহ্মণের জীব তদীয় গৃহাকাশের কোন এক প্রদেশে (যে প্রদেশে তাহার চিত্ত সেই প্রদেশে) সমুদ্র, বন ও পৃথ্ব্যাদির সহিত অবস্থিতি করিতেছে[২৩]। সেই আকাশের এক কোণে অর্থাৎ সূক্ষ্মতম চিত্তাকাশে এই সাগরাম্বরা পৃথিব্যাদি কেশোণ্ড্রুকের ন্যায় বিরাজিত রহিয়াছে[২৪]। * হে তন্বি! সেই বিপ্রসদন, সেই তুমি, সেই আমি, এ সমস্তই এক চিদাকাশের অন্তর্গত চিত্তাকাশে কেশোণ্ড্রুকের ন্যায় রহিয়াছে। যখন এক ত্রসরেণুর মধ্যে জগতের অবস্থান সম্ভব হয়, তখন গৃহকাশ মধ্যে তাহার অবস্থান অসম্ভব হইবে কেন? †

লীলা বলিলেন, জননি! অদ্য অষ্টম দিবস হইল, সেই ব্রাহ্মণের মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু আমরা এখানে বহুকাল অবস্থিতি করিতেছি।

* নির্ম্মল আকাশে কখন কখন ভ্রম বশতঃ নীল কুঞ্চিত কেশকলাপাকার পদার্থ দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাহার নাম কেশোণ্ড্রুক। এই কেশোণ্ড্রুক মেঘের ছটা ব্যতীত অন্য কিছু নহে। অন্তর্নিরূঢ় বিশ্বচ্ছবি তাহারই অনুরূপ অর্থাৎ তাহার ন্যায় অলীক ও চিদ্‌ভ্রান্তির প্রতিচ্ছায়া।

† ত্রসরেণু শব্দের অর্থ এখানে মন। নৈয়ায়িকেরা মন'কে পরমাণু তুল্য বলেন। মনোমধ্যে এমন লক্ষ লক্ষ জগৎ সহজেই পর্য্যাপ্ত হইতে পারে। যখন এত বড় পৃথিবী মনোমধ্যে দেখা যায় তখন ইহা অপেক্ষাও অনেক ও বড় পৃথিবী দেখা না যাইবে কেন?

সেই কারণে বলিতেছি, কি প্রকারে উহা সম্ভব হইতে পারে? দেবী কহিলেন, বৎসে! যেমন দেশের হ্রস্বত্ব দীর্ঘত্ব নাই, তেমনি, কালেরও হ্রস্বত্ব দীর্ঘত্ব নাই। কেন নাই তাহা বলি, শ্রবণ কর[২৫।২৮]। যেমন জগৎ এক প্রকার প্রতিভাস মাত্র, অন্য কিছু নহে (জ্ঞানের প্রতিভাস ব্যতীত অন্য কিছু নহে), তেমনি ক্ষণ, মুহূর্ত্ত, দিবা, রাত্রি, মাস, অব্দ, যুগ, কল্প, এ সকলও বোধপ্রতিভাস ব্যতীত অন্য কিছু নহে। (অভিপ্রায় এই যে, কেবল মাত্র ভ্রান্তির দ্বারাই দেশ ও কাল ও তাহাদের হ্রস্বত্ব দীর্ঘত্ব অনুভূত হইয়া থাকে। যেমন স্বপ্নাবস্থায় অল্পক্ষণও বহুশত বর্ষ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ, ভ্রান্তিসময়ে অল্পকালও বহুকাল বলিয়া বোধ হয়)। লীলে! ক্ষণাদি কল্পান্ত কাল, তদন্বিত ত্রিজগৎ, তন্মধ্যবর্ত্তী তুমি আমি প্রভৃতি, এ সমস্তই আত্মসমুদ্ভূত প্রতিভাস (ভ্রান্তিজ্ঞান)। যে ক্রমে ঐ সকল উৎপন্ন ও উপপন্ন হয় সে ক্রম আমি তোমার নিকট বর্ণন করি, শ্রবণ কর[২৯।৩০]। হে সুব্রতে। জীব ক্ষণকাল মাত্র মিথ্যা মরণ মূর্চ্ছা অনুভব করতঃ প্রাক্তনভাব বিস্মৃত হইয়া অন্য এক প্রকার ভাব (সংসার) অনুভব করে[৩১]। তখন সেই ব্যোমাকার কল্পিতাকৃতি জীব পূর্ব্ব কর্ম্মাদি সংস্কারের উদ্বোধ অনুসারে অনুভব করিতে থাকে, "এই দেহ আমার আধার; আমি হস্তপদাদিবিশিষ্ট, এবং আমি এই দেহাধারের আধেয়, ইহাতে আমি অবস্থিতি করিতেছি, আমি এই পিতার পুত্র, আমার এই পরিমিত বয়স; এই আমার রমণীয় বান্ধব কুল, এই আমার মনোরম আস্পদ (গৃহ), আমি পূর্ব্বে বালক ছিলাম, এখন আমি যুবা হইয়াছি, আবার বৃদ্ধ হইব," ইত্যাদি[৩২।৩৫]।

হে লীলে! চিত্তাকাশের প্রভাব হেতুক ঐ প্রকার বিভ্রম অর্থাৎ আপনাতেই ঐ ঐ ভ্রান্তিজ্ঞান উদিত হইয়া থাকে। যেমন স্বপ্নাবস্থায় হয়, তেমনি পরলোকাবস্থাতেও হয়। সেই জন্যই বলিয়াছি, দ্রষ্টা ও দৃশ্য সমস্তই চিৎ। বস্তুতঃই এ সকল নির্ম্মল ব্যোম ভিন্ন অন্য কিছু নহে। সেই সর্ব্বগা অদ্বিতীয়া চিৎই স্বপ্নদ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শনরূপে বিকসিত হন। তিনি যেমন স্বপ্নে সমুদিত হন, তেমনি পরলোকেও সমুদিত হন। পরলোকে যেরূপ সমুদিত হন, ইহলোকেও সেইরূপ সমুদিত থাকেন। যেমন জল, বীচি, তরঙ্গ, তিনের প্রভেদ নাই, সেইরূপ, ইহলোক, পরলোক ও স্বাপ্নলোক, এ তিনেরও কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। প্রভেদ বোধ ভ্রান্তির

মহিমা। যেহেতু জগদ্ভাব ভ্রান্তিবিশেষের ক্রীড়া, সেইহেতু তাহা নাই। নাই বলিয়াই বিশ্ব অজাত এবং অজাত হেতুক অনশ্বর। এ সমুদায় স্বরূপতঃ চিৎ। কিছুই চিতের অতিরিক্ত নহে। চিৎ সকল অবস্থাতেই ব্যোমস্বরূপ। সেই কারণে তাহার সহিত ব্যোমরূপ মনের অভেদ[৩৬।৪১]।

হে লীলে! দৃশ্য সকল দ্রষ্টায় আরোপিত রূপে অবস্থিত, বস্তুসৎ রূপে অবস্থিত নহে। শুক্তিরৌপ্য যে ভাবে অবস্থিত, সেই ভাবে অবস্থিত। সেইজন্য আরোপিত দৃশ্যের দ্বারা চিদাকাশের বিকৃতি হয় না। যদ্রূপ তরঙ্গ জলের অনতিরিক্ত, তদ্রূপ, এই আরোপিত সৃষ্টিও চিদাকাশের অনতিরিক্ত[৪২]। যেমন জল হইতে পৃথক্, এরূপ তরঙ্গ নাই। এবং তরঙ্গ যেমন নিত্যমিথ্যা, তেমনি, চিদাকাশ হইতে পৃথক্ সৃষ্টি নাই এবং তাহা নিত্যমিথ্যা। একমাত্র চিদাকাশই স্বকীয় স্বভাবে (মায়িক আবরণে) জগদাকারে বিভাবিত হইতেছেন। সেইজন্যই বার বার বলিতেছি, দৃশ্য পারমার্থিকরূপে নাই। জীবের মরণমোহের পর নিমেষ মধ্যেই দেশ ও জগদ্রূপ দৃশ্যশ্রী দর্শন হইয়া থাকে। তাহা পূর্ব্বস্মৃতি অনুসারী। অর্থাৎ জীব পূর্ব্বে যেমন কাল, যেমন আরম্ভ ও যেমন ক্রমে জগৎ দেখিয়াছিল, অবিকল তদনুযায়ী ক্রমে দৃশ্য দর্শন করে। সেই চিদ্বপুঃ জীব পূর্ব্বের ন্যায় "আমি জন্মিয়াছি" "এই আমার মাতা, এই আমার পিতা, আমি বালক" ইত্যাদি প্রকার অনুভব করে। তাহা তাহার পূর্ব্বস্মৃতি বলে সমুদিত হয়[৪৩।৪৭]। যেমন হরিশ্চন্দ্রের এক রাত্রিকে দ্বাদশ বৎসর বলিয়া বোধ হইয়াছিল, এবং যেমন কান্তাবিরহিত ব্যক্তি এক দিবসকে এক বৎসর বোধ করে, তাহার ন্যায় নিমেষমাত্র কাল তাহার নিকট কল্প বলিয়া অনুভূত হয়। তখন তাহার অভুক্ত ব্যক্তির ভোজনভ্রান্তির ন্যায় আমি জাত, আমি মৃত, এই আমার পিতা, এই আমার মাতা, এইরূপ এইরূপ বুদ্ধি উৎপন্না হয়। হে লীলে! মরীচিকার অন্তর্গত তীক্ষ্ণতার ন্যায় ও স্তম্ভের অন্তর্গত অরচিত পুত্রিকার ন্যায় এই দৃশ্য সমূহ সেই অজে নিহিত রহিয়াছে বটে; পরন্তু তাহা পৃথক্ সত্ত্বায় নাই। সমস্তই ব্রহ্মের স্বাশ্রিত ও স্ববিষয়ক অজ্ঞানের বিলাস[৪৮।৫৪]।

বিংশ সর্গ সমাপ্ত।

একবিংশ সর্গ।

দেবী বলিলেন, বৎসে! যেমন চক্ষু উন্মীলন করিলে শ্বেত পীতাদি নানা বর্ণ দৃষ্টিগোচর হয়, তেমনি, জীবের মরণমূর্চ্ছার পরেই পর-জগৎ (পরলোক) দর্শন হইয়া থাকে। দিক্, কাল, আকাশ ও ধর্ম্মকর্ম্মময় সৃষ্টি এবং কল্পান্তস্থায়ী বস্তু তাহার চিদাত্মায় প্রস্ফুরিত হইয়া থাকে। (ধর্ম্মময় সৃষ্টি স্বর্গাদি, কর্ম্মময় সৃষ্টি গৃহাদি ও কল্পান্তস্থায়ী বস্তু পৃথিবী পর্ব্বতাদি)[১]। কস্মিন কালেও কেহ আত্মমরণ দেখে নাই। না দেখি-লেও স্বপ্নে যেমন আত্মমরণ দেখা যায়, সেইরূপ, জীবগণ মৃত্যুর পরে জগৎ (স্মৃতিময় বা বাসনাময়) দর্শন করে[২]। হে তন্বি! "এই জগৎ, এই সৃষ্টি" এ সকল মায়াকাশে কাল্পনিক নগরীর ন্যায় দৃষ্ট হইয়া থাকে[৩।৪]। আছে, হইতেছে, যাইতেছে, এ সমস্তই বাসনাবিশেষের বিস্তার, অন্য কিছু নহে। দূর, নিকট, কল্প, যুগ, বৎসর, মাস, এ সমস্তই বিপর্য্যয়ের অর্থাৎ ভ্রমের রূপ[৫]। অনুভূত ও অননুভূত উভয় প্রকার দর্শনই চিৎস্বরূপে অবস্থিত ও চিৎস্বরূপে প্রবর্ত্তিত[৬]। যাহা কখন অনুভূত হয় নাই তাহাকেও "ইহা আমার অনুভূত" এরূপ ভ্রম হইতে দেখা যায়। পূর্ব্বোক্ত স্বাপ্ন ভ্রম তাহার দৃষ্টান্ত[৭]। এই বাসনা-পুঞ্জাত্মক সংসার প্রথমে প্রজাপতির জ্ঞানে বাসনার আকারে অবস্থিত ছিল, পরে তাহাই স্থূলতায় পরিণত হইয়া বিভক্তক্রমে প্রকাশ পাই-তেছে[৮]। এই ত্রিভুবনাদি দৃশ্যজাত কাহার অনুভূত রূপে, কাহারও বা অননুভূতরূপে স্মৃতিপথে সমুদিত হয়, এবং কাহার বা বিনা সংস্কারে আকস্মিক রূপে অনুভূত হইয়া থাকে। * হে বালে! এই বাসনাময় সংসারের যে অত্যন্ত বিস্মৃতি তাহাই মোক্ষ। সেইজন্য ইহাতে (সংসারে) পারমার্থিক প্রার্থনীয় অপ্রার্থনীয় কিছুই নাই[৯।১১]। আমিত্ব ও জগৎ

* অভিপ্রায় এই যে, অনুভূত পদার্থই স্মৃত্যাকারে প্রতিভাত হইবে, অননুভূত দেখা যাইবে না, এমন কোন নিয়ম নাই। প্রজাপতি আপনার প্রজাপতিত্ব পূর্ব্বে কখন অনুভব করেন নাই, অথচ তাহা সৃষ্টি সমকালে অনুভব করেন।

উভয়ের অবস্থিতি অবিদ্যামূলা। সুতরাং তাহার অর্থাৎ অবিদ্যার (আত্মবিষয়ক মিথ্যা জ্ঞানের) আত্যন্তিক বিনাশ ব্যতীত নিত্যসিদ্ধা মুক্তির সম্ভাবনা কি?[১২]। সর্প শব্দ ও সর্পশব্দের অর্থ যাবৎ রজ্জুরূপে অবস্থান করিবে তাবৎ সর্পভয় অনিবারিত থাকিবেক[১৩]। যোগাদির দ্বারা যে বিশ্বের শান্তি, (বিশ্বের বিস্মরণ), তাহাকে সম্পূর্ণ শান্তি বলা যায় না। যেমন মূঢ় ব্যক্তিরা এক পিশাচের পরিত্যাগে অন্য পিশাচ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়, তেমনি, সমাধি হইতে উত্থিত হইলে তাহাদের পুনর্ব্বার সংসারান্তর হইয়া থাকে। অতএব, তত্ত্বজ্ঞান ব্যতিরেকে অন্য কোন উপায়ে মুক্তিলাভ করা নিতান্ত অসম্ভব জানিবে[১৪]। তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে তখন নিশ্চয় হয়, সংসার পরম পদের বিবর্ত্ত মাত্র; সুতরাং যাহা কিছু প্রকাশ পাইতেছে সমস্তই পরম পদ (ব্রহ্ম)। সংসারের উপাদান অজ্ঞান, তাহার বিনাশে ঐরূপ নিশ্চয় হইয়া থাকে[১৫]।

লীলা বলিলেন, দেবি! আমি আপনার প্রসাদে পরমাশ্চর্য্য দর্শন করিয়াছি। সম্প্রতি আপনি আমার বক্ষ্যমাণ উৎকণ্ঠা বিনাশ করুন। আপনি বলিলেন যে, সৃষ্টি বা জগৎ দর্শনের প্রতি পূর্ব্বসংস্কারই কারণ। কিন্তু আমি যে ব্রাহ্মণব্রাহ্মণীরূপ সৃষ্টি দেখিয়াছি, তাহার সংস্কার আমার কোথা হইতে উৎপন্ন হইল? কৈ! আমি-ত পূর্ব্বে আর কখন ঐরূপ সৃষ্টি দেখি নাই? অনুভবও করি নাই?[১৬]। দেবী বলিলেন, লীলে! বাসনা সৃষ্টিকারণ বটে; পরন্তু তাহা সংস্কাররূপিণী নহে। অর্থাৎ কেবল পূর্ব্বানুভবজনিত সংস্কারই যে সৃষ্টি দর্শনের কারণ তাহা নহে। মায়া নামক বাসনা বিশেষও সৃষ্টির কারণ, তাহা তোমাকে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি ও বলিতেছি। ভাবিয়া দেখ, আদি পিতামহ সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মার ভবিষ্যৎ সৃষ্টি সমূহের জ্ঞান বিদ্যমান থাকায় সমুদায় ভবিষ্যৎ সৃষ্টি তদ্বাসনা প্রভব, ইহা সুসম্ভব হইতে পারে কিন্তু তাহা তদীয় দেহাদি সৃষ্টির কারণ হইতে পারে না। পূর্ব্বকল্পীয় ব্রহ্মা মুক্ত হওয়ায় তাঁহার ঐ সংস্কার অভাবগ্রস্ত, সেজন্য তদীয় সংস্কারও এতৎকল্পীয় ব্রহ্মা সৃষ্টির কারণ নহে[১৭]। অতএব, বুঝিতে হইবে যে, মায়ায় পূর্ব্বকল্পীয় হিরণ্যগর্ভের দেহাদির বাসনা বা সংস্কার সংলগ্ন হইয়া ছিল, সেই মায়া এতৎকল্পে স্বোপহিত চৈতন্যকে অভিনব পদ্মযোনি ব্রহ্মাকারে বিবর্ত্তিত করিয়াছে[১৮]। এবংক্রমে ও কাকতালীয় ন্যায়ে পূর্ব্ব প্রজাপতি হইতে

অন্য প্রজাপতি উৎপন্ন হয়। সে প্রজাপতিও প্রতিভাময় অর্থাৎ শুদ্ধ-চেতন। তদ্দৃষ্টিতে তাঁহার ও সৃষ্টির সত্যতা প্রতিভাত হয় না। তাঁহার এই মাত্র প্রতিভা স্ফুরিত হইতে থাকে যে, আমি প্রজাপতি হইয়া-ছিলাম[১৯]। লীলে! সৃষ্টি সকল ঐরূপে অর্থাৎ মিথ্যাভাবে চৈতন্যা-কাশে উদিত হয়, দৃষ্ট হয়, অথচ সত্যরূপে কোন কিছু হয় না বা জন্মে না[২০]। পূর্ব্বানুভবজনিত সংস্কারজা স্মৃতির ও অনাদি অনির্ব্বাচ্য হিরণ্যগর্ব্ভের অবিদ্যাশক্তি নাম্নী মূল বাসনার উৎপত্তি-স্থিতি-প্রলয়ের কারণ মায়াবিশিষ্ট মহাচৈতন্য অর্থাৎ পরব্রহ্ম[২১]। * ইহা কার্য্য, ইহা কারণ, এ ভাব বিশুদ্ধ ব্রহ্মে নহে; কিন্তু মায়ান্বিত ব্রহ্মে। বিশুদ্ধ ব্রহ্মে সকল কল্পনার অভাব দৃষ্ট হয়। অবিচারময়ী মায়া তিরোহিত হইলে কার্য্য, কারণ, সহকারী, সমস্তই এক হইয়া যায়। তোমার স্বরূপ মহাচৈতন্য। তোমাতে যে স্মরণকারী অন্তঃকরণ সংলগ্ন আছে, সেই অন্তঃকরণ সৃষ্টি দর্শনের মুখ্য কারণ। পরন্তু তাহা নাম মাত্রে আছে, বস্তুগতিতে নাই[২২]। সেইজন্যই বলিয়াছি ও বলিতেছি, এই জগদাদি কিছুই উৎপন্ন হয় নাই। আপনাতে অর্থাৎ আত্মচৈতন্যরূপ মহাকাশে চৈতন্যাকাশই অবস্থিত আছে, অন্য কিছু নাই[২৩।২৪]। লীলা বলিলেন, কি আশ্চর্য্য! কি কৌতুক! হে দেবি! আপনি আমাকে অদ্ভুত জ্ঞান-চক্ষু প্রদান করিলেন। কিন্তু হে দেবি! যাবৎ আমার এই জ্ঞান দৃঢ় না হয় তাবৎ আপনি আমাকে নিঃশঙ্কা করুন। আমার অত্যন্ত কৌতুক জন্মিয়াছে, তাহা সফল করুন। ব্রাহ্মণ যে স্থানে স্বীয় পত্নীর সহিত অবস্থিতি করিতেছেন; আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে তথায় লইয়া চলুন; আমি তাঁহাদিগের সেই সর্গ ও সেই গৃহ প্রাতঃকালে চক্ষুঃ যেমন আলোকের সাহায্যে জগদ্দর্শন করে, তেমনি আমিও দর্শন করিব। আমি আপনার সাহায্যে সেই গিরিগ্রাম দেখিব, দেখিয়া নিঃসন্দেহ হইব[২৫।২৭]।

* দেবী লীলার প্রশ্নের প্রত্যুত্তর যাহা দিলেন, তাহার সার সঙ্কলন এই যে, পূর্ব্বানুভব-জনিত সংস্কারের প্রভাবে পূর্ব্ব সদৃশ দর্শন হয় এবং মূল মায়ার প্রভাবেও অদৃষ্টপূর্ব্ব বস্তু দেখা যায়। তুমি যে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী-রূপ সৃষ্টি দেখিয়াছ, তাহা তোমার পূর্ব্বানুভবজনিত সংস্কার মূলক নহে। তাহা তোমার আত্মাশ্রিত মূল অজ্ঞানের প্রভাব। মূলে আত্মভ্রান্তি থাকিলে যে কত শত অনির্ব্বাচ্য অননুভূত ও অদৃষ্টপূর্ব্ব দেখা যায় তাহার ইয়ত্তা নাই।

দেবী বলিলেন, লীলে! যদি সমাধির দ্বারা এই ভৌতিক দেহ বিস্মৃত হইয়া সেই অচেত্যচিদ্রূপময়ী পবিত্র দৃষ্টি অর্থাৎ প্রচুর চৈতন্য স্ফূর্ত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক অমলা হইতে পার, তাহা হইলে চিদাকাশস্থিত সেই ব্যোমাত্মস্বরূপ সাত্ত্বিক সর্গ দর্শন করিতে পারিবে সন্দেহ নাই[২৮।২৯]। অপিচ, তুমি তাহা পারিলে, তুমি ও আমি, আমরা উভয়েই সেই সর্গ দর্শন করিতে পারিব। পরন্তু তোমার এই দেহ সেই সর্গ দর্শনের মহান্ প্রতিবন্ধক। অর্থাৎ দেহ জ্ঞান থাকিলে তাহা পরলোক দর্শন দ্বারের অর্গল[৩০]। লীলা কহিলেন, পরমেশ্বরি! এই দেহ দ্বারা কি নিমিত্ত অন্য জগৎ দর্শন করিতে পারা যায় না তাহা আপনি অনুগ্রহ করিয়া যুক্তি সহকারে আমার নিকট কীর্ত্তন করুন[৩১]।

দেবী বলিলেন, বৎসে! এই সমুদয় জগৎ বস্তুতঃ অমূর্ত্ত। পরন্তু মোহের বশে তোমরা মূর্ত্ত বলিয়া বোধ কর। যেমন সুবর্ণ অঙ্গুরীয়-কাদিরূপে প্রতীয়মান হয়, তদ্রূপ, প্রকৃত বোধের অভাবে আপনাতে এই জগৎ মূর্ত্তিমান্‌রূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে[৩২]। সুবর্ণ অঙ্গুরীয়াকার ধারণ করিলেও যেমন তাহার অঙ্গুরীয়কত্ব নাই, তদ্রূপ, জগৎ প্রতিভাত হইলেও পরব্রহ্মে ইহার সত্তা নাই। ফলতঃ যাহা যাহা পরিদৃশ্যমান হইতেছে; সমস্তই সেই ব্রহ্ম। তদ্‌ভিন্ন অন্য কিছু নাই। মায়া যেমন সমুদ্রেরও কুল দর্শন করায়, তেমনি, অমূর্ত্ত ব্রহ্মেও মূর্ত্ত জগৎ দর্শন করায়। প্রপঞ্চ মিথ্যা এবং একাদ্বয় ব্রহ্মই সত্য অর্থাৎ আমি মাত্র সত্য, এ বিষয়ে বেদান্ততাৎপর্য্যব্যাখ্যাকারী গ্রন্থ, গুরু ও ব্রহ্মজ্ঞগণের অনুভব প্রমাণ[৩৩।৩৫]। ব্রহ্মই ব্রহ্ম দর্শন করেন। যে ব্রহ্ম নহে, সে ব্রহ্ম দেখিতে পায় না। অর্থাৎ আপনার ব্রহ্মত্বজ্ঞানই ব্রহ্মদর্শন। ব্রহ্মভিন্নত্ব জ্ঞান (আমি অন্য, ব্রহ্ম অন্য, এ জ্ঞান) ব্রহ্মদর্শন নহে। ব্রহ্মের স্বভাব এই যে, তিনি স্বকল্পিত সৃষ্ট্যাদির নামে প্রথিত হন। অর্থাৎ তাঁহার স্বরূপ-সত্তা মায়ার আবরণে আবৃত হইলেই তাঁহাতে সৃষ্ট্যাদি প্রকাশ পায়[৩৬]। ব্রহ্মে কোনও প্রকারে বাস্তব কার্য্যের ও কারণের উদয় (উৎপত্তি) হয় না। তিনি সর্ব্বদা ও সর্ব্বথা পরিশুদ্ধ। সর্ব্বপ্রকার সহকারী কারণের অভাব প্রযুক্ত ব্রহ্মস্বরূপ জগতেও বস্তুতঃ কার্য্যকারণভাব নাই। অর্থাৎ জগৎ ব্রহ্মের অনতিরিক্ত[৩৭]। হে অঙ্গনে! অভ্যাসযোগ দ্বারা যাবৎ না তোমার ভেদবুদ্ধি শমতা প্রাপ্ত হইবে, তাবৎ তুমি ব্রহ্মরূপিণী

হইতে পারিবে না। আপচ, দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি থাকায় পরব্রহ্ম দর্শনে সমর্থ হইবে না[৩৮]। আমরা যদি অভ্যাস বৈরাগ্যাদির দ্বারা পূর্ব্বোক্ত প্রকারের ব্রহ্ম দর্শনে দৃঢ় ব্যুৎপন্না হই, তাহা হইলে ব্রহ্মসম্পন্ন হইয়া ব্রহ্ম দর্শন করিতে পারি[৩৯]। বৎসে! আমার এই শরীর সঙ্কল্প নগরের ন্যায় ও শুদ্ধচিত্তাকাশ ময়। সেইজন্য আমি এতদ্দেহের অন্তরে পরম পদ ব্রহ্ম দেখিতে পাই[৪০]। লীলে! অভ্যাস ও বৈরাগ্যাদি না থাকায় তোমার আকার ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয় নাই। এখনও তোমার অন্তঃকরণে চিদাভাস (জীবভাব) নিরূঢ় আছে। অর্থাৎ এখনও তুমি আপনাকে ক্ষুদ্র ও অজ্ঞ জীব বলিয়া জানিতেছ। সেই কারণে তুমি তাহা (ব্রহ্ম, পরলোকাবস্থিত ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী ও তাহাদের আবাস) দেখিতে সমর্থ নহ[৪১।৪২]। তুমি যখন নিজ দেহে নিজের সঙ্কল্পিত নগর দেখিতে পাও না, তখন কি প্রকারে অন্যের সঙ্কল্পিত সৃষ্টি দেখিতে সমর্থা হইবে?[৪৩] হে লীলে! সেইজন্যই বলিতেছি, তুমি এই দেহ (দেহের অভিমান) পরিত্যাগ পূর্ব্বক চিদাকাশরূপিণী হও। যদি তাহা পার, তাহা হইলে এই মুহূর্ত্তেই সে সমুদায় দেখিতে পাইবে[৪৪]। অতএব, যাহাতে তুমি এতদ্দেহ (দেহে আত্মাভিমান) পরিত্যাগ পূর্ব্বক চিদাকাশরূপিণী হইতে পার, শীঘ্র তাহার জন্য যত্নবতী হও। সঙ্কল্পিত নগরের ব্যবহার ও উপভোগ বিষয়ে সঙ্কল্পই অর্থক্রিয়াকারী হয়, অন্য কিছু নহে। অর্থাৎ মানস শরীরেই মানস নগর সন্দর্শন করা যায়, পার্থিব শরীরে নহে[৪৫]।

লীলা বলিলেন, দেবি! আপনি কহিয়াছেন যে, আমরা উভয়েই সেই দ্বিজদম্পতীর সংসারে গমন করিব। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, আমি যেন এই দেহ এই স্থানে স্থাপিত করিয়া বিশুদ্ধ চিত্তদেহ অবলম্বন পূর্ব্বক সেই পরলোকে গমন করিব। পরন্তু হে দেবি! আপনি কি প্রকারে গমন করিবেন তাহা আমাকে বলুন[৪৬।৪৮]।

দেবী বলিলেন, বৎসে! যেমন তোমার অন্তঃস্থ সাঙ্কল্পিক বৃক্ষ থাকিলেও নাই, তেমনি, আমার দেহ তোমার দৃষ্টিতে থাকিলেও আমার দৃষ্টিতে নাই। যাহা কুড্যের ন্যায় মূর্ত্ত তাহাই মূর্ত্ত কুড্য ভেদ করে, অমূর্ত্ত অমূর্ত্ত প্রতিবন্ধী হয় না[৪৯]। আমার এই দেহ একমাত্র সত্ত্বগুণ দ্বারা নির্ম্মিত এবং ইহা সেই চিৎস্বরূপের প্রতিভাস মাত্র। সুতরাং পরব্রহ্মের সহিত ইহার অত্যল্প প্রভেদ। (যেমন সূত্রভস্ম সূত্রাকারে দৃষ্ট

হইলেও তাহা সূত্র নহে, তেমনি, আমার এই দেহও দেহ নহে)। সেই কারণে আমার দেহ পরিত্যাগ করিবার প্রয়োজন হইবে না। আমি এতদ্দেহেই অভিলষিত স্থানে যাইব। যেমন অনিল গন্ধের সহিত, সলিল সলিলের সহিত, অনল অনলের সহিত এবং বায়ু বায়ুর সহিত মিলিত হয়, তেমনি, আমার এই মনোময় দেহও অন্য মনোময় দেহের সহিত মিলিত হইবে[৫০।৫২]। পার্থিবত্বাজ্ঞান কখন অপার্থিব জ্ঞানের সহিত মিলিত হয় না। কোথায় দেখিয়াছ যে, কাল্পনিক শৈল ও প্রকৃত শৈল উভয়ে পরস্পর আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে?[৫৩] যদ্যপি দেহ মাত্রেই মূলে আতিবাহিক অর্থাৎ মনোময়, তথাপি, চিরকাল তাহাকে আধিভৌতিক জ্ঞানে ভাবিয়া আসিয়াছ এবং সেই ভাবনায় উহা পার্থিব অর্থাৎ ভৌতিকপ্রায় হইয়া গিয়াছে। ভাবনার প্রভাবে যে ভাব-শরীর নিষ্পন্ন হয়, তাহার নিদর্শন বা দৃষ্টান্ত—স্বপ্ন, দীর্ঘকাল ধ্যান, * ভ্রম, মনোরাজ্য ও গন্ধর্ব্বনগর দর্শন[৫৪।৫৫]। অতএব হে বৎসে! যখন তোমার বাসনা সকল ক্ষীণ হইবে, তখন তোমার এই স্থূল দেহ পুনর্ব্বার সমাধি অভ্যাসের দ্বারা আতিবাহিকে পরিণত হইবে[৫৬]।

লীলা বলিলেন, দেবি! আতিবাহিক-দেহত্ব-জ্ঞান সমাধি প্রভৃতির দ্বারা সুদৃঢ় হইলে তখন এ দেহ কি হয়? বিনষ্ট হইয়া যায়? কি অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়?[৫৭] দেবী বলিলেন, হে পুত্রি! যাহা সত্য সত্যই আছে, তাহাতেই নাশ হওয়া না হওয়ার ব্যবস্থা। যাহা আদৌ নাই, তাহার আবার নাশ কি? রজ্জুতে যে সর্পভ্রম হয় তাহা তিরোহিত হইলে, "সর্প কোথায় গেল, মরিয়া গেল কি অন্যথা হইল" এ সকল কথা যেরূপ, তেমনি, আতিবাহিক জ্ঞানের স্থিরতায় আধিভৌতিক দেহ কি হয় কোথায় যায়, এ কথাও (প্রশ্নও) সেইরূপ[৫৮।৫৯]। প্রকৃত প্রত্যুত্তর এই যে, যেমন সত্যবোধ সমুদিত (রজ্জুজ্ঞান) হইলে রজ্জুতে সর্পজ্ঞান থাকে না, তেমনি, আতিবাহিক ভাবের উদয় হইলে তখন আর ইহার আধিভৌতিকতা থাকে না[৬০]। তত্ত্বজ্ঞগণ বলিয়া থাকেন যে,

---

* ভাবশরীর—মনঃকল্পিত দেহ। মানুষেরাও স্বপ্নে মনের কল্পনায় আপনাকে ব্যাঘ্র-শরীরী দেখে। দীর্ঘকাল চিন্তা করিলেও মন তন্ময় হইয়া যায় তাহাতে সে আপনাকে তন্ময় দেখে। তেলাপোকা কাঁচপোকার ভয়ে ব্যাকুল হইয়া চিন্তা করে ও ভয়ে মনোমধ্যে কেবল কাঁচপোকা দেখিতে থাকে। তৎক্রমে সে অল্প দিন পরে কাঁচপোকা হইয়া যায়।

এ সকল যদি কাল্পনিক হয় তবে অবশ্যই উপদেশ দ্বারা কল্পনার তিরোধান সাধিত হইবে। যাহা বাস্তবরূপে নাই (ব্রহ্মে) তাহা অতীব তুচ্ছ৬১। ভদ্রে! আমরা দেখিতে পাইতেছি, দেহাদি সমস্তই পরব্রহ্মে পরিপূর্ণ। সেই কারণে আমরা যাহা পরম সত্য তাহা দেখিতে পাই। কিন্তু তোমার তদ্রূপ জ্ঞান নাই। তদ্রূপ জ্ঞান, (পূর্ণ ব্রহ্ম জ্ঞান) না থাকাতেই তুমি পরম সত্য ব্রহ্ম দেখিতে পাও না৬২। যদি বল, চিৎ-তত্ত্ব অদৃশ্য, কিরূপে তাহা দৃশ্যস্বভাব প্রাপ্ত হইল, তদুত্তরার্থ বলিতেছি, প্রথম সৃষ্টিতেই অর্থাৎ হিরণ্যগর্ব্ভের সৃষ্টি সমকালেই চিতের চিত্ত নামক ধর্ম্ম (চিতের পরিস্ফুরণের বিষয় বা আধার) প্রকটিত হইয়াছিল, তদবধি একই সত্তা দৃশ্যের অনুরোধে ভ্রান্ত হইয়া (যেমন একই চন্দ্র জলাশয়ের বহুত্ব অনুসারে বহুর ন্যায় হয় তেমনি কাল্পনিক বহু দৃশ্য প্রতিবিম্বিত হওয়ায় একাদ্বয় ব্রহ্ম ও দৃশ্য অনুসারে দৃশ্য হন) স্বাশ্রিত বিবিধ দৃশ্য দেখিয়া বা প্রকটিত করিয়া আসিতেছে৬৩।

লীলা অসহায় একাদ্বয় পদার্থের বহুভাব হওয়া অসম্ভব শঙ্কা করতঃ জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবি! বিভাগের অবিষয়ীভূত শান্তস্বরূপ সেই এক মাত্র পরম তত্ত্ব বিদ্যমান, আর সব অবিদ্যমান। এমত স্থলে কল্পনার অবসর কোথায়? (যে কিছু বিকৃত হয় ও বহু হয়, সমস্তই অন্যের সাহায্যে। একাদ্বয় পদার্থের সহায় কোথায়? সহায় থাকা স্বীকার করিলে একাদ্বয় বলা সঙ্গত হইবে না)৬৪।

দেবী বলিলেন, লীলে! যেমন হেমে কটকতা, জলে তরঙ্গতা এবং স্বপ্ন ও সঙ্কল্প নগরাদিতে সত্যতা নাই, সেইরূপ, পরব্রহ্মেও কল্পনা (সৃষ্টি) নাই। নাই বলিয়াই সত্যবোধ সমুদিত হইলে পরব্রহ্মে বিভিন্ন প্রকারের কল্পনা তিরোহিত হয়। হে বালে! সেই কল্পনারহিত, শান্তস্বরূপ একমাত্র অজ পরমাত্মা সদা ও সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে৬৫।৬৬। যেমন আকাশে ধূলি নাই, তেমনি, পরব্রহ্মে কোন প্রকার বিকার বা উৎপত্তি নাই। তাহা শান্ত শিব এক অজ ও অনুৎপত্তিস্বভাব৬৭। যে কিছু ভাসমান সমস্তই নিরাময় ব্রহ্ম। প্রতিভাস ভাসকের অনতিরিক্ত। অর্থাৎ মণির প্রতিচ্ছায়া মণি হইতে পৃথক্ বস্তু নহে৬৮।

লীলা কহিলেন, দেবি! আমরা এতাবৎ কাল কি নিমিত্ত দ্বৈতাদ্বৈত পরিজ্ঞানে বিমূঢ় হইয়া রহিয়াছি? কে আমাদিগকে দ্বৈতাদ্বৈত কল্পনায়

ভ্রান্ত করিয়াছে? দেবী কহিলেন, তরলে! তুমি এতাবৎ কাল অবিচার রূপ অবিদ্যার বশীভূত হইয়া ব্যাকুলা ছিলে। যে অবিচার তোমাকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে সেই অবিচার সদ্বিচার দ্বারা নিমেষ মধ্যে বিনষ্ট হইতে পারে। পরন্তু সে অবিদ্যাও অনন্ত ব্রহ্মসত্তার অতিরিক্ত নহে। অবিচার, অবিদ্যা, বন্ধন এবং নিরাবাধ মোক্ষ, এ সমুদায়ের কিছুই নাই। আছে কেবল শুদ্ধবোধ এবং তদ্দারা এই জগৎ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে[১১।১২]। বৎসে! তুমি এ পর্য্যন্ত বিচারপরায়ণা হও নাই বলিয়াই ভ্রান্তির দ্বারা ভ্রামিতা ও সমাকুলা হইতেছিল। এখন তোমার চিত্তে বাসনাক্ষয়ের বীজ উপ্ত হইয়াছে, এখন তুমি প্রকৃষ্ট বোধ লাভ করিয়াছ, বিবেক জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছ ও বিমুক্তবন্ধনা হইয়াছ অর্থাৎ তোমার বন্ধন ছিন্ন হইয়া গিয়াছে[১৩।১৪]। সংসার নামক দৃশ্য আদৌ উৎপন্ন হয় নাই, ইহা যখন বুঝিয়াছ, তখন আর এতদ্দারা তোমার দ্বৈতবাসনা উৎপন্ন হইবে না। নির্ব্বিকল্প সমাধি অবস্থায় চিত্ত একমাত্র পরব্রহ্মে নিরূঢ় হইলে, দ্রষ্টৃ দৃশ্য ও দর্শন অভাব প্রাপ্ত হইয়া যায়। তখন এই হৃদয়ক্ষেত্রে বাসনাক্ষয়াত্মক বীজ থাকিলেও তাহা দগ্ধকল্প হয়, আর তাহা অঙ্কুরিত হয় না। কিঞ্চিৎ অঙ্কুরিত হইলেও তাহা তৎপরিপাক কালে ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে। বাসনাক্ষয় হইলেই রাগ-দ্বেষাদি তিরোহিত ও সংসারভাব নির্ম্মূল হইয়া যায় এবং সংসারভাব তিরোহিত হইলেই অমল প্রতিষ্ঠা লাভ করা যায়। হে লীলে! তুমি উপদিষ্ট প্রকারের সমাধি অভ্যস্ত করিতে পারিলে নিশ্চিত অচিরকাল মধ্যে সর্ব্বপ্রকার ভ্রান্তির মূল অবিদ্যা বিদূরিত করিয়া নির্ম্মল হইতে পারিবে[১৫।১৯]।

একবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

দ্বাবিংশ সর্গ।

দেবী বলিলেন, লীলে! যেমন জাগ্রৎ জ্ঞানের উদয়ে স্বপ্ন দর্শন অবাস্তব অর্থাৎ মিথ্যা বলিয়া অবধারিত হয়, সেইরূপ, বাসনা ক্ষীণ হইলে এই স্থূল দেহ অসৎ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে[১]। যেমন স্বপ্ন জ্ঞানের পর স্বাপ্নদেহ থাকে না, তেমনি, বাসনা নাশের পর এই জাগ্রৎ দেহও থাকে না। (অর্থাৎ দেহাভিমান থাকে না)[২]। যেমন সঙ্কল্প ও স্বপ্ন দর্শন শেষ হইলে এতদ্দেহের দর্শন হয়, তেমনি, জাগ্রদ্ভাবনার অন্ত হইলে অর্থাৎ এই স্থূল দেহের অহম্ভাব নিবৃত্ত হইলে তখন সেই আতিবাহিক দেহ সমুদিত হইবে[৩]। যেমন স্বপ্নাবস্থায় বাসনাবীজ বিলীন হইলে সুষুপ্তির উদয় হয়, তেমনি যদি, জাগ্রদবস্থায় বাসনাবীজ প্রক্ষীণ হয় তাহা হইলে বিমুক্ততার উদয় হইয়া থাকে[৪]। জীবন্মুক্ত দিগের বাসনা বাসনা নহে; তাহা কেবল পরিশুদ্ধ সত্ত্ব অথবা সত্তাসামান্য মাত্র। (যেমন দগ্ধ বস্ত্রের অস্তিত্ব, তেমনি)। বাসনা সকল নিদ্রায় সুপ্ত হইলে তাহা সুষুপ্তি; আর জাগ্রৎ অবস্থায় সুপ্ত হইলে তাহা মোহ। নিদ্রায় বাসনা প্রক্ষীণ হইলে তাহা তুরীয় এবং জাগ্রতে জ্ঞানবলে বাসনাপুঞ্জ সমূলে উন্মূলিত হইলে তাহাও তুরীয়। তুরীয় লাভের অন্য নাম ব্রহ্ম-লাভ। তুরীয় লাভই পরম অর্থাৎ যার পর নাই উৎকৃষ্ট[৫]।[৭]। যাহাদের বাসনা একবারেই পরিক্ষীণ হইয়াছে তাদৃশ জীবের জীবনস্থিতি জীব-ন্মুক্ত পদের অভিধেয় এবং সেই জীবন্মুক্ত পদ অমুক্ত জীবের (যাহারা সংসারে বদ্ধ তাহাদের) অজ্ঞাত[৮]। হিমানী (বরফ) তাপ সংযোগে দ্রবত্ব প্রাপ্ত হইয়া জল হয়, চিত্তও বাসনা পরিত্যাগের পর সমাধিপটু ও শুদ্ধ সত্ত্বময় হওয়ায় আতিবাহিকতা প্রাপ্ত হয়। (স্থূল-পরিচ্ছেদ-ভ্রান্তি হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সূক্ষ্ম ও সর্ব্বব্যাপী হয়)[৯]। জ্ঞান দ্বারা প্রবুদ্ধ ও আতিবাহিক ভাব প্রাপ্ত যে মন, সেই মনঃই জন্মান্তরীয় ও সৃষ্ট্যন্তরীয় পদার্থ দেখিতে পায় এবং সিদ্ধ শরীরের সহিত মিলিত হইতে পারে[১০]। হে লীলে! তোমার অহম্ভাব অর্থাৎ দেহাভিমান যখন অভ্যাস দ্বারা উপশান্ত হইবে, তখন তোমার এ দৃশ্যজ্ঞান তিরোহিত হইয়া স্বাভা-

বিক চিৎস্বরূপতা আপনা আপনি উদিত হইবে[১১]। যখন তোমার আতিবাহিক জ্ঞান অবিনশ্বর ভাবে সমুদিত হইবে. অর্থাৎ স্থায়ী ও দৃঢ় হইবে, তখনই তুমি পবিত্র হইয়া অর্থাৎ মুক্ত হইয়া সেই সকল পবিত্র লোক দর্শন করিতে সমর্থা হইবে[১২]। অতএব হে অনিন্দিতে! তুমি বাসনা বিনাশের নিমিত্ত যত্নবতী হও, বাসনাক্ষয় বদ্ধমূল হইলে তুমি জীবন্মুক্ত হইতে পারিবে[১৩]। অতি সুশীতল বোধচন্দ্রমা যাবৎ না পূর্ণ হয়, তাবৎ তুমি স্থূল দেহ এই স্থানে স্থাপিত করিয়া লোকান্তর দর্শন কর অর্থাৎ সমাধির দ্বারা স্থূল শরীরের অভিমান ত্যাগ করিয়া চিত্ত মাত্র অবলম্বনে ও জ্ঞান চক্ষে সেই সেই পরলোক অবলোকন কর[১৪]। তুমি এমন আশা করিও না যে, আমার দেহে মিলিতা হইয়া তুমি সে লোকে গমন করিতে পারিবে। কারণ, মাংসময় দেহ অমাংস দেহে সংশ্লিষ্ট হইবার নহে। মাংসময় দেহ চিত্তময় দেহে মিলিত হইয়া কোনও ব্যবহারিক কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে সমর্থ নহে এবং চিত্তদেহও ব্যবহারিক কার্য্যে সংশ্লিষ্ট হইতে সমর্থ নহে[১৫]। আমি যাহা বলিলাম, ইহা অনভিজ্ঞ বালক হইতে সিদ্ধলোক পর্য্যন্ত সমুদায় লোকের অনুভবসিদ্ধ। আমরা বর ও শাপ দিয়া যোগ্য বিষয় সম্পন্ন করিতে পারি; পরন্তু অযোগ্য বিষয় সম্পন্ন করিতে পারি না। (দেবীর অভিপ্রায় এই যে, উপদেশানুরূপ কার্য্য না করিলে কোনও ক্রমে আমি তোমাকে স্থূল শরীরে পরলোক দেখাইতে পারিব না)[১৬]। নিবিড়তম (প্রগাঢ়) জ্ঞান অভ্যস্ত হইলে ও বাসনা জাল জীর্ণ হইলে এই দেহেই আতিবাহিক ভাব বা ভাবময় শরীর জন্মিয়া থাকে। * বৎসে! আতিবাহিক দেহ সমুদিত হইলে কেহ তাহা দেখিতে পায় না। লোকে এই মাত্র দেখে, তাহার স্থূল শরীর আবির্ভূত রহিয়াছে[১৭।১৮]। পরন্তু মুক্ত পুরুষেরা দেখেন, দেহমাত্রই অবাস্তব। সেজন্য তাঁহাদের বাস্তব মরণ অথবা জীবন নাই। কোন্ ব্যক্তি স্বপ্ন ও সঙ্কল্পভ্রান্তির দ্বারা মৃত ও জীবিত হয়?[১৯] হে পুত্রি! সঙ্কল্পনির্ম্মিত পুরুষের জীবন মরণ যদ্রূপ অসত্য অথচ ভান হয়, দৃশ্য দেহের উৎপত্তি বিনাশও তদ্রূপ অসত্য

* জীব যখন মরে ও পরলোক গমন করে, তখন তাহারা আতিবাহিক শরীরে লোকান্তরগামী হয়। স্থূল শরীর পড়িয়া থাকে। সেই আতিবাহিক শরীরকে পারলৌকিক শরীর বলে। সে শরীর অনাদি অনির্ব্বাচ্য স্বাজ্ঞানকল্পিত সূক্ষ্ম ভূতের দ্বারা নির্ম্মিত হয়।

অথচ তাহা তাহার ভান হইয়া থাকে।

লীলা বলিলেন, দেবি! যাহা শ্রবণ করিলে দৃশ্যদর্শনরূপ রোগ উপশম প্রাপ্ত হয়, আপনি আমাকে তাদৃশ নির্ম্মল জ্ঞান উপদেশ করিলেন। এক্ষণে আমার জিজ্ঞাস্য—বাসনাক্ষয় বিষয়ে কিরূপ অভ্যাস উপকারী হয় এবং অভ্যাসই বা কি প্রকারে পরিপুষ্ট হয়—তাহা আমাকে বলুন। অভ্যাস পরিপুষ্ট হইলে যে যে ফলের উদয় হয়, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন[২১।২২]।

দেবী বলিলেন, বরবর্ণিনি! যে যাহা কিছু করিবে, তাহা অভ্যাস ব্যতিরেকে সুসম্পন্ন হইবে না। সেইজন্য বুধগণ বলিয়া থাকেন, অনুক্ষণ ব্রহ্মচিন্তন, পরস্পর ব্রহ্মকথন, পরস্পর ব্রহ্ম বুঝান, এবং সর্ব্বদা ব্রহ্ম-নিষ্ঠ হওয়ার নাম ব্রহ্মাভ্যাস এবং ঐরূপ ব্রহ্মাভ্যাস তত্ত্বাববোধের কারণ[২৩।২৪]। যাহারা বিষয়বিরক্ত ও মহাত্মা, তাঁহারাই প্রযত্ন সহকারে ভোগবাসনা ক্ষয় করিতে সমর্থ হন। অপিচ, তাঁহারাই জন্ম মরণ জয় করিয়া কৃত কৃতার্থ হইয়া থাকেন[২৫]। যাঁহাদিগের আনন্দপ্রসবিনী মতি বৈরাগ্য রসে সুরঞ্জিত ও সর্ব্বপ্রকার পরিগ্রহ ত্যাগে লব্ধসৌন্দর্য্য—তাঁহারাই উত্তম অভ্যাসী[২৬]। যিনি যুক্তিসহকৃত অধ্যাত্মশাস্ত্রের আলো-চনা করিয়া জ্ঞেয় বস্তুর অত্যন্তাভাব (অনস্তিত্ব) অবগত হইয়াছেন, তাঁহারাও ব্রহ্মাভ্যাসে অবস্থিত[২৭]। দৃশ্য কখনও বাস্তবরূপে উৎপন্ন হয় নাই, সেজন্য দৃশ্য অর্থাৎ এ সকল নাই। সুতরাং জগৎ নাই, তুমি নহ ও আমি নহি, ইত্যাকার জ্ঞানসন্ততি জ্ঞানাভ্যাস বলিয়া গণ্য হয়[২৮]। দৃশ্য নাই; সে বিধায় তাহার অস্তিত্ব অলীক ও অসম্ভব, এ বোধ যখন অবিচাল্য হয়, যখন রাগদ্বেষাদি ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তখন মনের বল আত্মগামী হইয়া রমণ করিতে থাকে। ঐ প্রকার আত্মরতিও ব্রহ্মা-ভ্যাস নামে অভিহিত হয়। রাগদ্বেষাদির হ্রাস ও দৃশ্যাত্যন্তাভাবের বোধ (যাহা দেখা যায় তাহা সর্ব্বকাল মিথ্যা, এ বোধ) ব্যতীত যতই তপস্যা কর না কেন সমস্তই অজ্ঞানকল্প ও দুঃখভোগপ্রদ[২৯।৩০]। অপিচ, দৃশ্যের অসম্ভব বোধই বোধ ও সেইরূপ জ্ঞেয়ই জ্ঞেয় বলিয়া অব-ধারণ করিবে। অপিচ, তাহার অভ্যাসই অভ্যাস ও তাদৃশ অভ্যাসই নির্ব্বাণফলদায়ক[৩১]। হে লীলে! চিত্তে অভিহিত প্রকারের বিবেক-বোধাভ্যাসরূপ সুশীতল বারি সর্ব্বদা পরিষেক করিলে নিশ্চয়ই ভবরূপ-

নিশায় প্রবৃত্ত মোহরূপ প্রগাঢ় নিদ্রা ভঙ্গ হইবে[৩২]।

মহর্ষি বশিষ্ঠ এই পর্য্যন্ত কথা ভাগ বলিলে দিবাকর অস্তাচলগত ও সায়ংকাল সমুপস্থিত হইল। তখন রামচন্দ্র ও অন্যান্য সভ্যগণ সায়ন্তন কার্য্য সমাধানার্থ গমন করিলেন। পরে রজনী প্রভাত ও দিবাকর সমুদিত হইলে পুনর্ব্বার তাঁহারা সভায় উপস্থিত হইয়া স্ব স্ব স্থানে উপবেশন করিলেন[৩৩]।

দ্বাবিংশ সর্গ সমাপ্ত।
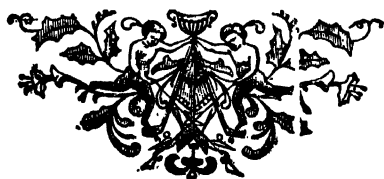
ত্রয়োবিংশ সর্গ।

প্রভাতে পুনঃ কথারম্ভ হইল। বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! সেই দুই বরাঙ্গনা অর্থাৎ লীলা ও সরস্বতী উভয়ে সেই রজনীতে ঐরূপ কথোপকথন করিয়া, পরিজনবর্গ প্রসুপ্ত হইলে, গৃহের দ্বার ও গবাক্ষাদি সমস্তই বদ্ধ, অন্তঃপুরমণ্ডপ পুষ্প গন্ধে আমোদিত ও রাজার মৃত দেহন্যস্ত পুষ্পমাল্যাদি অম্লান রহিয়াছে দেখিয়া সমাধিস্থানে গমন পূর্ব্বক তথায় রত্নস্তম্ভাদিতে সমুৎকীর্ণ পুত্তলিকার ন্যায় (খোদাই করা মূর্ত্তি)। নিশ্চলভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অর্থাৎ সমাধিস্থা হইলেন। * তখন তাঁহাদিগের সর্ব্বপ্রকার দুশ্চিন্তা অন্তর্হিত ও ইন্দ্রিয় সকল সঙ্কুচিত হইল; যেন সায়ংকাল আগতে দিবাপ্রস্ফুটিত দুইটী পদ্মিনী পরিমল (সুগন্ধ) উপসংহার করিতেছে। যেন বায়ুশূন্য শরৎকালে পর্ব্বতোপরি দুই খণ্ড সুশুভ্র মেঘ নিশ্চল নিষ্পন্দ ও পতিত হইয়াছে।১৬। তাঁহারা নির্ব্বিকল্প সমাধির দ্বারা বাহ্যজ্ঞান পরিত্যাগ করায় বোধ হইতে লাগিল, যেন দুইটী কল্পলতিকা নববসন্তসমাগমে পূর্ব্ববসন্তসঞ্চিত রস পরিত্যাগ করিয়া নিষ্পত্রাদি হইয়াছে। তাঁহাদের স্থূল দেহ সমাধিযোগে বাহ্যজ্ঞান শূন্য ও ভূমিনিপতিত হইয়াছে। সে দৃশ্যের তুলনা পদ্মিনীর বিশীর্ণতা, নিষ্পন্দ শুভ্র মেঘ ও নিষ্পত্র বনলতিকা। তাঁহারা সমাধিবলে তন্মুহূর্ত্তে জানিলেন; অন্তঃস্থ অহম্ভাব হইতে বাহ্য জগৎ পর্য্যন্ত সমুদায় দৃশ্য ভ্রান্তিসমুদ্ভব। তন্মুহূর্ত্তে তাঁহাদের অন্তর হইতে সমুদায় দৃশ্যপিশাচ অদর্শন গত হইল। হে অনঘ রামচন্দ্র! লীলা ও সরস্বতী সমাধি অবস্থায় দৃশ্যের অত্যন্তাভাব দর্শন করিয়া ছিলেন, পরন্তু আমরা সর্ব্বদাই ইহার ত্রৈকালিক অসত্তা (মিথ্যাত্ব) অনুভব করিয়া আসিতেছি।২০। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ আমাদিগের নিকট শশ-শৃঙ্গের ও মৃগতৃষ্ণিকার ন্যায় অলীকরূপে প্রতিভাত হয়। কারণ, যাহা পূর্ব্বে ছিল না তাহা প্রতীত হউক বা না হউক, বর্ত্তমানেও তাহা নাই বলিয়া অবধারণ করা যায়২২। রাম! সেই

---

* সরস্বতী লীলার সাহায্যার্থে অর্থাৎ লীলাকে সমাধি শিখাইবার নিমিত্ত সমাধিস্থা হইয়াছিলেন। ঐ সকল কার্য্য গুরুসাপেক্ষ। গুরু না শিখাইলে শিখা যায় না।

ললনাদ্বয় তখন দৃশ্যদর্শনবিমুক্ত হইয়া কেবল ও শান্ত হইলেন। আকাশ যদি চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদি পরিহীন হয় তবেই সে শান্ত ভাবের উপমা হইতে পারে। যে সময়ে কেবল মাত্র আকাশ হইয়াছে বায়ু উৎপন্ন হয় নাই অথবা প্রলয় কাল আগতে বায়ু পর্য্যন্ত বিনাশ হইয়াছে, কেবল আকাশ অবশিষ্ট আছে, সে অবস্থাও উহার উপমা হইতে পারে[১১]। অনন্তর জ্ঞানদেবতা সরস্বতী জ্ঞানময় দেহে এবং রাজমহিষী লীলা মানব দেহের অভিমান পরিত্যাগ করিয়া ধ্যান জ্ঞানের অনুরূপ দিব্য দেহ অবলম্বনে আকাশে বিচরণ করিতে লাগিলেন[১২]। তাঁহারা যে সত্যসত্যই দূরগামী হইলেন তাহা নহে। প্রাদেশ পরিমিত গুহাকাশে থাকিয়াই সর্ব্বগামী জ্ঞানে আরোহণ ও ব্যোম গমনের অনুরূপ চিদাকাশমূর্ত্তি অবলম্বন করিলেন[১৩]। * অনন্তর ললিতলোচনা ললনাদ্বয় পূর্ব্বসঙ্কল্প সংস্কারের উদ্বোধে † ও জ্ঞানের বিষয়পক্ষপাতিতা প্রযুক্ত অতি দূরতর আকাশে আপনাদের গমন দর্শন করতঃ পরিতৃপ্ত হইতে লাগিলেন। তাঁহারা সত্যসত্যই যে স্থানান্তরে গেলেন তাহা নহে। তাঁহারা চিদ্বৃত্তির দ্বারাই কোটিযোজন বিস্তীর্ণ আকাশের দূর হইতে দূরতর প্রদেশে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন[১৪।১৫]। ‡ চিদাকাশ দেহেও চিত্তস্থ পূর্ব্বসঙ্কল্পিত দৃশ্যের অনুসন্ধান অনুবৃত্ত থাকে। এই সময়ে তাহারা

* এ বিষয়ে মতদ্বয় আছে। এক মত এই যে, যোগীরা সমাধির দ্বারা স্থূল দেহ হইতে বহির্গত হইয়া সূক্ষ্ম দেহে বহিঃ সঞ্চরণ করেন। অন্য মত এই যে, তাঁহারা দেহবহির্গত হন না, কেবল মাত্র তদ্দেহের অভিমান পরিত্যাগ ও হৃদয় হইতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত প্রাদেশ পরিমিত নাড়ী স্থানে অবস্থান বা আরোহণ করিয়া সর্ব্বব্যাপী জ্ঞান লাভ করেন এবং সেই জ্ঞানে তাঁহারা স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালাদি পরিদর্শন করিয়া থাকেন।

† তাঁহারা সমাধি করিবার পূর্ব্বে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, আমরা পরলোক দেখিব ও সেখানে সঞ্চরণ করিব। পূর্ব্বের সেই সঙ্কল্প তাঁহাদের চিত্তে সংস্কারীভূত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা উদ্বুদ্ধ হইল। অর্থাৎ প্রত্যক্ষজ্ঞানাকারে পরিণত হইল। সাঙ্কল্পিক জ্ঞানের স্বভাব এই যে, তাহা সঙ্কল্পিতের অনুরূপ বিষয় কল্পনা করিয়া লইয়া তাহাতে ব্যবহার নিষ্পন্ন করিতে পারে। সুতরাং জ্ঞানস্বভাব প্রভাবে ঐ ঘটনা সুখনিষ্পন্ন হইবার বাধা হয় না।

‡ চিদ্বৃত্তি শব্দের অর্থ চৈতন্য সম্বলিত মনোবৃত্তি। লীলা ও সরস্বতী ইতিপূর্ব্বে মনে মনে "আমরা আকাশ পথে যাইব" এইরূপ সঙ্কল্পবৃত্তি উত্থাপন করিয়া সমাধিগতা হইয়াছিলেন, সেই কারণে তাঁহারা এক্ষণে তদনুরূপ চিত্তদেহে আকাশে উৎপতিত হওয়া অনুভব করিতে লাগিলেন।

সঙ্কল্পসংস্কার পূর্ণ চিত্তের সহিত একীভাব প্রাপ্ত হয়, সেই কারণে তাহারা পূর্ব্বসঙ্কল্পিত দৃশ্য দর্শন করিয়া পরিতৃপ্ত হয়। যে কারণ বর্ণনা করিলাম, সেই কারণে সেই সমস্বভাবা ললনাদ্বয় চিদাকাশদেহশালিনী হইয়াও পূর্ব্বসঙ্কল্পিত দৃশ্যের অনুসন্ধান ও পরস্পর পরস্পরের আকার বিলোকন করতঃ পরস্পরের প্রতি পরস্পর স্নেহানুরক্ত হইলেন[১৬]।

ত্রয়োবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

চতুর্ব্বিংশ সর্গ

বশিষ্ঠদেব বলিলেন, রামচন্দ্র! ঐরূপে তাঁহারা ঊর্দ্ধস্থানগত হইয়া পরস্পরের হস্তাবলম্বন পূর্ব্বক মৃদুমন্দ গমনে অদ্ভুত নভোমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে করিতে দূর হইতে দূরে গমন করিতে লাগিলেন[১]। তাঁহারা দেখিলেন, আকাশ প্রলয়কালীন সমুদ্রের ন্যায় অতি গভীর, নির্ম্মল, নিরাবাধ (বাধাশূন্য) স্নিগ্ধ, সুকোমল ও কোমলবায়ুসঙ্গী ও সুখভোগপ্রদ[২]। এই শূন্যসমুদ্রে অবগাহন করা বিলক্ষণ সুখাবহ ও আহ্লাদকর। তাহা অত্যন্ত শুদ্ধ, গম্ভীর ও সজ্জন মন অপেক্ষাও প্রসন্ন[৩]। ঈদৃশ আকাশ-সমুদ্র অবগাহন করিয়া তাঁহারা কখন মেরুশৃঙ্গস্থিত সৌধান্তর্গত মেঘ-মণ্ডলে, কখন দিক্ সমুদায়ে, কখন বা চন্দ্রমণ্ডলে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন[৪]। কখন চন্দ্রমণ্ডল হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইয়া সুখানুভব করিতে লাগিলেন এবং কখন বা সিদ্ধ ও গন্ধর্ব্ব দিগের পারিজাতমালাসুরভিবাহী সুখস্পর্শ সমীরণ মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। কখন বর্ষাকালীন সলিল পরিপূর্ণ কোকনদসুশোভিত সরোবরসদৃশ বিদ্যুদ্দামবিমণ্ডিত মন্থর মেঘমণ্ডলে ও কখন বায়ুবিতাড়িত বারিদমণ্ডলে পরিভ্রমণ করিতে লাগি-লেন। যেন দুইটী ভ্রমরী এক সরোবর হইতে অন্য সরোবরে লীলা বিহার করিয়া বেড়াইতেছে[৫।৭]। মধুরগামিনী ললনাদ্বয় ঐরূপে পরিভ্রমণ ও স্থানে স্থানে বিশ্রাম করিয়া পরে আকাশগর্ভে (শূন্য মধ্যে) অপর এক মহারম্ভ সন্দর্শন করিলেন। মহারম্ভ অর্থাৎ ভুবন ও ভুবনবাসী লোক পুঞ্জ[৮।৯]। দেখিলেন, ব্যোমোদরে অসংখ্য ভুবনাদি অবস্থিতি করিতেছে। এ সকল ভুবন জ্ঞপ্তিদেবীর পূর্ব্বদৃষ্ট, কিন্তু লীলা এ সকল আর কখন দেখেন নাই। কোটি কোটি জগৎ ইহার অন্তর্গত থাকিলেও অসংশ্লিষ্ট অর্থাৎ সম্যক্ অন্তরাল বিশিষ্ট। আরও অদ্ভুত এই যে, কোটি কোটি ভুবন ব্যোমের উদর পূর্ণ করিতে পারে নাই। সেই সকল বিচিত্রাকার ভুবনের ভূতল সকল পরস্পর পৃথক্ ভাবে অবস্থিত এবং চতুর্দ্দিকে পদ্মরাগমণি বিরা-জিত। আরও দেখিলেন, কল্পান্তকালীন অগ্নিশিখার ন্যায় উজ্জল মুক্তাময় শিখরপ্রভার দ্বারা হিমালয়সানুসদৃশ কাঞ্চনসমুদ্ভাসিত ও মহামরকত-

মণির প্রভার দ্বারা নীলিমাবিশিষ্ট এবং তাঁহাতে মেরু প্রভৃতি ভূধর সকল সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। কোন স্থানে সচঞ্চল পারিজাতলতা বৈদুর্য্যময়ী শোভা ধারণ করিয়াছে। কোন কোন স্থানে মনের ন্যায় বেগশালী সিদ্ধগণের গমনাগমন দ্বারা পবনসঞ্চারবেগ পরাজিত হইতেছে। কোন স্থানে দেবপত্নী সকল বিমানগৃহে অবস্থিতি করতঃ মনোহর গীতবাদ্য করিতেছে। কোন স্থানে সুরাসুরগণ পরস্পর অদৃশ্যভাবে গমনাগমন করিতেছেন। কোন স্থানে কুষ্মাণ্ড, যক্ষ, এবং পিশাচমণ্ডল বিচরণ করিতেছে। কোন স্থানে মহামেঘের ন্যায় গভীর ধ্বনি করতঃ বিমানসমূহ ও গ্রহ নক্ষত্রাদির ঘনসঞ্চার দ্বারা জ্যোতিশ্চক্র নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে। সূর্য্যসন্নিহিত কোন কোন স্থানে অল্পসিদ্ধ সিদ্ধগণ তপনতাপে দগ্ধকলেবর হইয়া সেই স্থান পরিত্যাগ করিতেছেন এবং তাঁহাদিগের সূর্য্যাতপদগ্ধ বিমান সকল অর্কদেবের অশ্বমুখনির্গত প্রবল সমীরণ দ্বারা দূরে নিক্ষিপ্ত হইতেছে। কোন কোন স্থানে লোকপালগণ ও অপ্সরোবৃন্দ সঞ্চরণ করিতেছেন। কোন কোন স্থানে দেবীগৃহ সমুত্থিত ধূমরাশি নভোমণ্ডলে বারিদমণ্ডলের ন্যায় অবস্থিতি করিতেছে। অপ্সরাগণ ইন্দ্রাদি দেবগণ কর্ত্তৃক সমাহূত হইয়া পরস্পর পরস্পরের অপেক্ষা না করিয়া "আমি অগ্রে যাইব" এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া ধাবিত হইতেছেন তাহাতে তাঁহাদিগের অঙ্গ হইতে ভূষণ সকল পরিভ্রষ্ট হইতেছে। কোন স্থানে বারিদমণ্ডস্থ মহাবল সিদ্ধগণের গমনাগমন দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যেন সভয়ে হিমবান্, মেরু ও মন্দর ভূধরের অধিত্যকা আশ্রয় করায় ঐ সকল ভূধর বস্ত্র পরিধানের অভিনয় প্রদর্শন করিতেছে। কোন কোন স্থান কাক, উলূক ও গৃধ্র প্রভৃতি পক্ষিসমূহে পরিবৃত। কোন কোন স্থানে ডাকিনীগণ বারিধি-তরঙ্গের ন্যায় নৃত্য করিতেছে ও যোগিনীগণ অভীষ্টলাভে কৃতকার্য্য হইয়াও কুক্কুর, কাক ও উষ্ট্র মূর্ত্তি ধারণ করতঃ বৃথা বহুদূরে গমন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার প্রত্যাগত হইতেছে। কোন স্থানে গগনবিহারী জীব স্বর্গীয় গীতি বাদ্যে উন্মত্তপ্রায় হইয়া আছে। কোন স্থানে যাহার নিরন্তর পরিভ্রমণ বশতঃ শুক্ল ও কৃষ্ণ এই দুই পক্ষের বিভাগ নিষ্পন্ন হয়; সেই নক্ষত্রপুঞ্জমালী নভোমণ্ডলস্থ জ্যোতিশ্চক্রের নিম্নদেশে ত্রিপথগা প্রচণ্ডবেগে প্রবাহিতা হইতেছেন এবং দেববালকগণ স্থিরচিত্তে তাহার আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া কৌতুকী হইতেছে।

কোন স্থানে বজ্র, চক্র, শূল এবং শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বজ্র, চক্র, শূল এবং শক্তিবিশিষ্ট হইয়া স্ব স্ব দেহ সঞ্চালন করিতেছেন। কোন স্থানে ভিত্তিশূন্য ভবন, কোন স্থানে বীণাযন্ত্র সহকারে দেবর্ষি নারদের সুমধুর গীত; কোন মেঘমার্গ প্রদেশে মহামেঘ, এই সকল মেঘ প্রলয়কালীন জলধরের ন্যায় অবিরল ধারা বর্ষণ করিতেছে ও কোন কোন মেঘ চিত্রন্যস্তের ন্যায় ব্যাপারশূন্য হইয়া অবস্থিতি করিতেছে। কোন স্থানে কজ্জলবর্ণ অদ্রিশ্রেষ্ঠ হইতে পরম সুন্দর অম্ভোধর উৎপতিত হইতেছে। কোন স্থানে বায়ুপ্রবাহ মধ্যে প্রৌঢ় বিমান সকল তৃণপল্লবের ন্যায় বিচলিত হইতেছে, কোন স্থানে অলিকুল প্রচলিত হইতেছে, কোন স্থানে বায়ুসহকারে সমুড্ডীন ধূলিপটল মেরু-নদীর ন্যায় দৃশ্য হইতেছে, কোন স্থানে সুচিত্র বিমান, নর্ত্তনশীল মাতৃ-মণ্ডল, যোগেশ্বরী ও ক্রোধাদি বিহীন সমাধিনিষ্ঠ মুনিগণ অবস্থিতি করিতেছেন। কোন স্থানে কিন্নরী, গন্ধর্ব্বী ও সুরপত্নীদিগের মনোহর গীত, কোন স্থান নিস্তব্ধ পুরবর দ্বারা সমাকীর্ণ, এবং কোন কোন স্থানে পুরবর সকল নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে। কোন স্থানে রুদ্রপুরী, কোন স্থানে ব্রহ্মপুরী এবং কোন স্থানে মায়াকৃতপুরী প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। কোন স্থানে চন্দ্রচন্দ্রিকার লহরী, কোন স্থানে অমৃতপূর্ণ সরোবর, মায়া সরোবর, এবং কোন স্থানে দৈবী শক্তির দ্বারা ঘনীভূত সলিলময় সরোবর দৃষ্ট হইতেছে। কোন স্থানে চন্দ্রমা ও কোন স্থানে দিবাকর সমুদিত হইতেছেন। কোন স্থানে গাঢ় তমোময়ী রজনী, কোন স্থানে নীহার-পটলা ধূষরবর্ণা সন্ধ্যা, কোন স্থানে বর্ষণকারী পয়োধর ও ঊর্দ্ধাধো গমনে সব্যগ্র সুরাসুরগণ দৃষ্ট হইতেছে। কোন স্থানে দিগ্বিহারিগণ কর্ত্তৃক পূর্ব্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তর, এই চতুর্দ্দিক্ সমাকীর্ণ। কোন স্থান লক্ষযোজন পরিমিত ভূধর দ্বারা, কোন স্থানে পর্ব্বতগুহা সদৃশ অবিনাশী তমোরাশির দ্বারা, কোন স্থান সূর্য্যের ও অনলের তেজোরাশির দ্বারা ও কোন স্থান মহাহিমরাশির দ্বারা পরিপূর্ণ রহিয়াছে। কোন স্থানে অত্যুচ্চ দেবগৃহ সকল দৈত্যগণ কর্ত্তৃক প্রতিহত হইয়া পতিত হইতেছে। কোন স্থান বিমান নিপতন দ্বারা বহ্নিরেখার ন্যায় অঙ্কিত হইতেছে। কোন স্থানে শত শত কেতু (ধূমকেতু) নিপতিত হওয়ায় ঘনসন্নিবিষ্ট শৈলের ন্যায় দেখা যাইতেছে। কোন স্থানে শুভগ্রহগণের

উৎকৃষ্ট মণ্ডল সুশোভিত রহিয়াছে। কোন স্থান অন্ধকারময়ী রজনীর ও কোন স্থান ভাস্বর দিবাভাগ দ্বারা পরিব্যাপ্ত। কোন স্থানে মেঘমণ্ডল গভীর গর্জ্জন করিতেছে এবং কোন স্থানে বা নিস্তব্ধভাবে অবস্থিত রহিয়াছে। কোন স্থানে শুভ্রবর্ণ মেঘমণ্ডল বায়ুবেগে ছিন্ন ভিন্ন হওয়ায় উহা শুভ্র পুষ্পের ন্যায় দেখাইতেছে। কোন কোন স্থানে ময়ূর ও স্বর্ণচূড় পক্ষীর দ্বারা এবং কোন স্থান বিদ্যাধরী ও দেবী দিগের বাহন দ্বারা আকীর্ণ রহিয়াছে। কোন স্থান অভ্রমণ্ডল মধ্যে কার্ত্তিকেয় দেবের ময়ূর সকল নৃত্য করিতেছে। কোন স্থান শুকপক্ষিগণের প্রতিচ্ছায়ায় হরিদ্বর্ণ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। কোন স্থানে মেঘমণ্ডল প্রেতরাজের মহিষ সদৃশের ন্যায় অবস্থিত রহিয়াছে। কোন স্থানে অশ্বগণ তৃণরাশি ভ্রমে মেঘমণ্ডল কবলিত করিতেছে। কোন স্থানে দেবপুর ও দৈত্যপুর। কোন স্থানে পর্ব্বতভেদকারী প্রবল বায়ু নগরপরম্পরার অন্তরালে প্রবাহিত হওয়ায় সে সকল তত্রস্থ অধিবাসী দিগের নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য হইতেছে। কোন স্থানে কুলপর্ব্বতাকার ভাস্বর ভৈরব, কোন স্থানে পক্ষবিশিষ্ট শৈলেন্দ্রের ন্যায় গরুড়পক্ষী, কোন স্থানে পক্ষশালী পর্ব্বত, তাহারা বায়ুর ন্যায় প্রোড্ডীয়মান এবং কোন স্থানে মায়াকৃত আকাশনলিনী ও তদাধার শীতল সলিল দৃষ্ট হইতেছে। কোন স্থানে সুরভিবাহী আনন্দদায়ক শীতল সমীরণ প্রবাহিত হইতেছে। আবার স্থানান্তরে তপ্তানিল দ্বারা দ্রুম, পর্ব্বত ও মেঘমণ্ডল দগ্ধ হইতেছে। কোন স্থানে প্রশান্ত সমীরণ নিঃশব্দে সঞ্চারিত হইতেছে, কোন স্থানে পর্ব্বতের ন্যায় শত শত শৃঙ্গবিশিষ্ট মেঘ সমুদিত হইতেছে, কোন স্থানে বর্ষাকালের উন্মত্তজলধর গভীর গর্জ্জন করিতেছে, কোন স্থানে সুরাসুরগণ তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছে, কোন স্থানে ব্যোমকমলবিহারিণী হংসীরা উচ্চৈঃস্বরে অজবাহন হংসকে আহ্বান করিতেছে, কোন স্থানে মন্দাকিনীতীরস্থিত মৃদু অনিল স্বর্গীয় নলিনীর সৌরভ হরণ করিতেছে, কোন স্থানে গঙ্গা প্রভৃতি সরিৎ সন্নিধান হইতে মৎস্য, মকর, কুলীর ও কূর্ম্ম প্রভৃতি জলজন্তুগণ দেবশরীর দ্বারা উড্ডীন হইতেছে, কোন্ স্থানে সূর্য্য পাতালগামী হওয়ায় চন্দ্রগ্রহণ এবং কোন স্থানে বা অন্য প্রকারের সূর্য্যগ্রহণ দৃষ্টিগোচর হইতেছে। * অপিচ, কোন স্থানে মায়াকুসুমকানন

* সূর্য্য পাতালগামী, এই কথাটীর জ্যোতিষ অনুসারী অর্থ সুগ্রাহ্য। জ্যোতির্জ্ঞগণ

(দেবমায়া বিনির্ম্মিত পুষ্পোদ্যান) স্বর্গানিল দ্বারা কম্পিত হইতেছে।

রাঘব! যেমন মশক সকল পক্ক উড়ুম্বর মধ্যে পরিভ্রমণ করে, তেমনি, রাজমহিষী লীলা ও সরস্বতী উভয়ে আকাশোদরে পরিভ্রমণ করতঃ আকাশচরদিগের বৈভব সন্দর্শন করিলেন। পরন্তু তদ্দর্শনে মুগ্ধ হইলেন না। অনন্তর তাঁহারা পুনর্ব্বার নভোমণ্ডল অতিক্রম করিয়া মহীতলাভিমুখে আগমন করিতে প্রবৃত্তা হইলেন[১০।৬৫]।

বলেন, সূর্য্য ভূগোল বেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছেন, তৎসঙ্গে ভূচ্ছায়াও ঘুরিতেছে। সূর্য্য যখন ভূচ্ছায়াচ্ছাদিত হন, তখন তাঁহাকে পাতালগামী বলা যায়। অপিচ, চন্দ্রগ্রহণ বিষয়ে পাতাল শব্দের অর্থ—চন্দ্রের ব্যবহিত পশ্চাদ্ভাগ। সূর্য্য তদ্গত হইলে চন্দ্রমণ্ডলে ভূপ্রতিবিম্ব নিপতিত হয়, হইলে লোকে তাহাকে চন্দ্রগ্রাস নামে অভিধান করে।

চতুর্ব্বিংশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠদেব বলিলেন, হে রামচন্দ্র! দেবী সরস্বতীর অভিপ্রায়—তিনি লীলাকে ভূমণ্ডল দেখাইবেন। তদনুসারে তাঁহারা উভয়ে নভস্তল হইতে গিরিগ্রামস্থিত মৃতবশিষ্ঠগৃহ দর্শনার্থ গমন করিতে প্রবৃত্তা হইয়া প্রথমতঃ ভূমিতল দর্শন করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মাণ্ড যেন পুরুষ,—বিরাট্ পুরুষ। ভূমণ্ডল তাহার হৃদয় পদ্ম, অষ্টদিক তাহার দল, (পাঁবড়ি), গিরিরাজি তাহার কেশর, সরিৎ তাহার অন্তরশাখা, হিমকণা তাহার মধুবিন্দু, শর্ব্বরী তাহার ভ্রমরী ও অসংখ্য প্রাণিবৃন্দ তাহাতে মশক[১।৩]। ভোগ্য বস্তু-ও তদ্গুণ তাহার মৃণালান্তর্গত তন্তু, জলপূর্ণ পাতালাদি ছিদ্র তাহার রন্ধ্র, তাহা দিবসালোক দ্বারা কান্তিবিশিষ্ট[৪] ও শৃঙ্গারাদি রসে আর্দ্র। সূর্য্য ইহার হংস। এই পদ্ম যামিনীযোগে সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। পাতাল-পঙ্কে নিমগ্ন নাগনাথ বাসুকি ইহার মৃণাল[৫]। অম্বুনিধি এই কমলের আস্পদ। ভূপদ্মের আস্পদ মহাসমুদ্র কম্পিত হইলে ভূপদ্মও দিগ্দলের সহিত প্রকম্পিত হইতে থাকে। দৈত্য ও দানব গণ এই পদ্মের মৃণাল-কণ্টক[৬]। এই ভূপদ্মের মধ্যস্থলে নগর, গ্রাম ও নদ নদ্যাদি কেশরিকা-নালবিশিষ্ট জম্বুদ্বীপরূপ মহাকর্ণিকা প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। যাহা সুমেরু প্রভৃতির উৎপাদক, এবং যাহা জীবদেহের মহাবীজ, তাহাই এতৎপদ্মের নালমূলাবস্থিত অসুররমণীবৃন্দের সুখচ্ছেদ্য অসংখ্য মৃণালকলিকা (মৃণালের অঙ্কুর)। উত্তুঙ্গ কুলাচল সপ্তক এই কলিকার মহাবীজ। সেই সাতটী মহাবীজের মধ্যস্থলে মহামেরু প্রতিষ্ঠিত আছে এবং তাহা নভঃ আক্রম-কারী[৭।৮]। হিমবিন্দু সকল অত্রস্থ সরোবর, ধূলি সকল পরাগ, শৈল সকল কেশর ও কর্ণিকা, সে সকল জীবরূপ ভ্রমরে পরিব্যাপ্ত[১০]। এই মহাদ্বীপ শতযোজন পরিসর এবং প্রতি পূর্ণিমায় সমুচ্ছলিত সমুদ্র নামক ভ্রমরে ও দিক্চতুষ্টয়ে পরিবেষ্টিত[১১]। আট্ দিক্পাল ও সমুদ্রগণ ইহার ষট্পদ। ইহার ভ্রাতৃস্বরূপ নবসংখ্যক রাজাধিরাজ ইহাকে নব ভাগে বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছে[১২]। * এই মহাদ্বীপ লক্ষযোজন বিস্তীর্ণ, রজঃকণে

* পূর্ণিমাতিথি জোয়ার আরম্ভের প্রথম কালকেন্দ্র। সমুদ্রকে ভ্রমর বলার অভিসন্ধি—

আকীর্ণ ও নানা জনপদে পরিপূর্ণ[১৩]। পরিসরে এই দ্বীপের দ্বিগুণিত পরিমাণ লবণসমুদ্র ইহাকে বলয়াকারে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে[১৪]। ইহার পরে দ্বিগুণ পরিমিত শাকদ্বীপ। এই দ্বীপ দ্বীপের দ্বিগুণ পরিমাণ ক্ষীর সমুদ্রের দ্বারা বলয়াকারে পরিবেষ্টিত রহিয়াছে। অনন্তর এতদ্দ্বিগুণ কুশদ্বীপ এবং ঘৃতসমুদ্র তাহার চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টিত। তৎপরে তদ্দ্বিগুণ ক্রৌঞ্চদ্বীপ। এই দ্বীপের দ্বিগুণ পরিমিত দধিসমুদ্র তাহাকে বেষ্টন করিয়া আছে। তৎপরে তদ্দ্বিগুণ শাল্মলী দ্বীপ। এই দ্বীপ দ্বীপের দ্বিগুণ পরিমিত সুরাসমুদ্রের দ্বারা বেষ্টিত। তাহার পর তদ্দ্বিগুণ প্লক্ষদ্বীপ। এই প্লক্ষদ্বীপ তাহার দ্বিগুণ পরিমিত ইক্ষুরস নামক সমুদ্রের দ্বারা পরিবেষ্টিত। তৎপরে তদ্দ্বিগুণ পুষ্কর দ্বীপ। এই দ্বীপ দ্বীপের দ্বিগুণপরিমিত স্বাদুজল সমুদ্রে পরিবেষ্টিত। সরোবরে যেমন সনাল পদ্মলতার পত্র পর পর সংস্থানে অসংলগ্ন ভাবে ভাসমান হয়, তেমনি, কথিতপ্রকারে সপ্ত দ্বীপ ও সপ্ত সমুদ্র সমন্বিত ভূমণ্ডল জলোপরি ভাসমান রহিয়াছে[১৫]।

অনন্তর ঐ সকল দ্বীপের দশগুণ পরিমিত নিম্নভূমি এবং তাহা গর্ত্তরূপী। (ঐ সকল নিম্নভূমি পাতাল নামে খ্যাত)। এই সমুদায়ের দশগুণ পরিমিত পাতালগামী পথে অবস্থিত সর্ব্বোচ্চ লোকালোক পর্ব্বত। এই পর্ব্বতের পাদ দেশে দূর গভীর গর্ত্ত সমূহ থাকাতে ইহা ভীষণ বলিয়া বোধ হয়। ইহার উপরিভাগের অর্দ্ধাংশে সূর্য্য প্রকাশিত থাকাতে অপর অর্দ্ধভাগ তমসাচ্ছন্নপ্রযুক্ত বলায়াকার নীলোৎপলমালামণ্ডিত বলিয়া বোধ হয়। ঐ পর্ব্বতের শিখরদেশ নানাবিধ মাণিক্য ও কুমুদকহ্লার প্রভৃতি কুসুমনিকরে সুশোভিত থাকাতে, উহা বিবিধ কুসুমমালাবেষ্টিত ধর্ম্মিল্লশালিনী ত্রিজগল্লক্ষ্মীর ন্যায় শোভাবিস্তার করিতেছে[১৬।২৩]। ইহার পরে অন্য কিছু নাই, কেবল শূন্য। এই শূন্যের পরিমাণ বর্ণিত সমুদায় ভূমণ্ডলের দশগুণ। এই শূন্যে ভূতগণের সঞ্চারাদি নাই। ইহাও দশগুণ মহাসমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত।

পদ্ম যেমন ভ্রমর কর্তৃক চুম্বিত হয়, তেমনি এই জম্বুদ্বীপও সমুদ্র কর্ত্তৃক জোয়াব উচ্ছ্বাসে চুম্বিত হইতে থাকে। এই জম্বুদ্বীপ নববর্ষে বিভক্ত। যেমন ভারতবর্ষ ও ইলাবৃতবর্ষ, ইত্যাদি। এই সকল বর্ষ পূর্ব্বকালের রাজাদিগের দ্বারা কৃত ও চিহ্নিত হইয়াছিল। ভরতের বর্ষ ভারতবর্ষ, ইত্যাদি। ঐ সকল রাজা এই দ্বীপের সহোদর সমান। তাঁহারা পৃথিবীর পুত্র। এই দ্বীপও পৃথিবীর পুত্র। এই ভাবের সহোদর।

তৎপরে তদ্দশগুণ পরিমিত মেরুপ্রভৃতি ভূধরের দ্রাবণকারী ও ব্রহ্মাণ্ড শোষণকারী প্রলয় মহাহুতাশন পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। তৎপরে তদ্দশগুণ মেরুপ্রভৃতি অচল সমূহের বহনকারী মহাবেগশালী প্রলয় মহামারুত বিস্তৃত রহিয়াছে। তৎপরে শতকোটিযোজন বিস্তৃত ঘনরূপী ব্যোম-মণ্ডল পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। হে রাঘব! সেই মানবী লীলা এবম্বিধ জলধি, মহাদ্রি, লোকপাল, ত্রিদশালয়, অম্বর ও ভূতলাদির দ্বারা পরিব্যাপ্ত ব্রহ্মাণ্ড কটাহ * অবলোকন করিয়া অবশেষে তন্মধ্যগত ক্ষুদ্র নিজ মন্দিরকোটর দর্শন করিলেন[২৭।৩৫]।

* ব্রহ্মাণ্ডকটাহ। কটাহ শব্দের ভাষা নাম 'কড়া।' দুইখানি লোহার কড়া মুখোমুখি রাখিলে যদ্রূপ গোল আকার সম্পন্ন হয়, ব্রহ্মাণ্ডের গোলত্ব ও আবরণ তদ্রূপ। সেই কারণে শাস্ত্রকারেরা সাবরণ জগত্রয়কে ব্রহ্মাণ্ডকটাহ বলেন।

পঞ্চবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ষড়্‌বিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠদেব বলিলেন, রাঘব! সেই বরবর্ণিনীদ্বয় ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল হইতে নির্গত হইয়া যে স্থানে সেই ব্রাহ্মণের আস্পদ (গৃহ), সেই স্থানে গমন করিলেন[১]। অনন্তর সেই দুই সিদ্ধরমণী লোকের অদৃশ্যভাবে সেই বিপ্রের সদ্ম ও অন্তঃপুরমণ্ডপ পরিদর্শন করিতে প্রবৃত্তা হইলেন[২]। দেখিলেন, তত্রস্থ চিন্তাবিধুর (কাতর) দাস দাসী ও অঙ্গনাগণের মুখমণ্ডলে অবিরত বাষ্পবারি বিগলিত হওয়ায় শীর্ণপর্ণ অম্বুজের ন্যায় বিবর্ণীকৃত হইয়াছে[৩]। এই পুরী আজ্ নষ্টোৎসব পুরীর ন্যায়, অগস্ত্যপীত সমুদ্রের ন্যায়, গ্রীষ্মদগ্ধ উদ্যানের ন্যায়, বিদ্যুদ্দগ্ধ দ্রুমের ন্যায়, বাতবিচ্ছিন্ন মেঘের ন্যায়, তুষারম্লান অম্বুজের ন্যায় ও অল্পস্নেহ দীপের ন্যায় যার পর নাই প্রভাহীন হইয়াছে। আসন্নমৃত্যুকাতর মানবগণের মুখমণ্ডল যেরূপ কান্তিবিহীন হয়, তরু সকল জীর্ণ ও তাহাদিগের পত্র সমুদয় বিশীর্ণ হইলে যেমন অরণ্যের কোন শোভাই থাকে না, এবং অনাবৃষ্টি উপস্থিত হইলে যেমন দেশাদি, ধূষরবর্ণ ও রুক্ষ হয়, তাহার ন্যায় এই গৃহ গৃহেশ্বরের বিয়োগে শোভাবিহীন হইয়াছে[৪।৬]।

বশিষ্ঠদেব বলিলেন, রামচন্দ্র! কথিতপ্রকার দুরবস্থা দেখিয়া নির্ম্মলজ্ঞানসম্পন্না সত্যসঙ্কল্পা রাজমহিষী লীলা "এই সমস্ত বান্ধবগণ আমাকে এবং এই দেবী সরস্বতীকে সামান্য ললনার ন্যায় দর্শন করুক" মনে মনে এইরূপ ইচ্ছা বা সঙ্কল্প করিলে পর তত্রস্থ গৃহজন সকলেই সেই রমণীদ্বয়কে সমাগত লক্ষ্মীর ও গৌরীর ন্যায় দেখিতে পাইল। তাঁহারা দেখিলেন, যেন সেই রমণীদ্বয় চন্দ্রিকামৃত (চন্দ্রিকা=জ্যোৎস্না) দ্বারা সেই গৃহ, সেই গ্রাম, এবং গ্রামের নিকটস্থ বন, উপবন ও ওষধি সকল সমুদ্ভাসিতকরতঃ শীতলাহ্লাদ সুখদ চন্দ্রমার ন্যায় সমুদিত হইয়াছেন। কানন যদ্রূপ যুগল বসন্তলক্ষ্মীর দ্বারা সুশোভিত ও আমোদিত হয়, সেই ললনাদ্বয়ের আপাদ লম্বমান বিবিধ অম্লানমালার দ্বারা সেই মন্দির তদ্রূপ সুচিত্রিতা ও সুশোভিতা হইয়াছে[৭।১১]। তাঁহাদিগের নয়ন আন্দোলিত লম্বায়মান লতার সুষুমা তিরস্কৃত করিতেছে এবং চূর্ণকুন্তলের সিতান্ত সমীপে অবস্থিত

থাকায় ভ্রমরশোভা ও নীলোম্মিশ্র ধবলচ্ছবি কটাক্ষ নিক্ষেপে কুবলয়োম্মিশ্র মালতীকুসুম বিকীরণের সুষমা বিস্তার করিতেছে[১২]। তাঁহাদিগের দেহের কান্তি এরূপ যে, যেন বিগলিত সুবর্ণনদীর লহরী ও তাহার প্রভারাশি যেন সর্ব্বত্র প্রসৃত হইয়া সর্ব্বস্থান কনকান্বিত করিতেছে[১৩]। এই ললনাদ্বয়ের শরীর শোভা এরূপ যে, যেন লাবণ্য সমুদ্রের তরঙ্গ অথবা বিলাসের দোলা[১৪]। ইঁহাদের চঞ্চল বাহুলতিকার ও অরুণবর্ণ পাণি যুগলের বিন্যাস যেন ক্ষণে ক্ষণে সুবর্ণবর্ণ নব নব কল্পবৃক্ষলতিকার কানন সৃজন করিতেছে[১৫]। এবমাকারে সেই দেবীদ্বয় পুষ্পপল্লবকোমল স্থূলাব্জদলমালার শোভাবিকাশকারী অম্লান কুসুমসদৃশ চরণযুগল দ্বারা ভূতল স্পর্শ করিলেন। তাঁহাদিগের অবলোকনরূপ অমৃতের পরিসেকে যেন পাণ্ডুবর্ণ শুষ্ক বনও বালপল্লবে পল্লবিত হইল[১৬।১৭]।

হে রাঘব! এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া সেই মৃত ব্রাহ্মণের জ্যেষ্ঠশর্ম্মা নামক জ্যেষ্ঠপুত্র গৃহজনের সহিত "বনদেবীদিগকে নমস্কার" এই বলিয়া প্রণিপাত করিলেন এবং তাঁহাদিগের পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিলেন[১৮]। তাঁহাদিগের চরণে কুসুমাঞ্জলি অর্পিত হইলে বোধ হইল, যেন পদ্মবল্লীস্থ পদ্মোপরি তুষারসীকর বর্ষণ হইয়াছে[১৯]। অনন্তর জ্যেষ্ঠশর্ম্মাদি পুরবাসিগণ সকলেই বলিতে লাগিল, হে বনদেবীদ্বয়! আপনাদিগের জয় হউক। বোধ হয় আপনারা আমাদিগের দুঃখবিনাশার্থ আগমন করিয়াছেন। কেননা, পরপরিত্রাণ করাই সাধুদিগের স্বভাব[২০]।

অনন্তর সেই দেবীদ্বয় জ্যেষ্ঠশর্ম্মার বাক্যাবসানে সস্নেহবাক্যে বলিলেন, এই সকল ব্যক্তি যে দুঃখে দুঃখিত সে দুঃখ কি তাহা তোমরা বল[২১]।

অনন্তর সেই জ্যেষ্ঠশর্ম্মা প্রভৃতি সকলেই সেই দেবীদ্বয়ের নিকট দ্বিজদম্পতীর ব্যসনজনিত (ব্যসন=মৃত্যুরূপ বিপদ) দুঃখবর্ণন করিলেন[২২]।

জ্যেষ্ঠশর্ম্মা বলিলেন, হে দেবীদ্বয়! এই স্থানে অতিথিবৎসল এক ব্রাহ্মণদম্পতী বাস করিতেন। তাঁহারা দ্বিজগণের মর্য্যাদা রক্ষণের একমাত্র আধার ছিলেন এবং তাঁহারা আমার মাতা ও পিতা। সম্প্রতি তাঁহারা পুত্র ও বান্ধব দিগকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন, সেই নিমিত্ত আমরা সকলেই এই জগৎ শূন্য দেখিতেছি[২৩।২৪]।

হে দেবীযুগল! ঐ দেখুন, পক্ষিগণ গৃহোপরি আরোহণ পূর্ব্বক প্রতিক্ষণ শূন্যে পক্ষবিক্ষেপ করতঃ করুণস্বরে শোক প্রকাশ করিতেছে[২৫]। পর্ব্বত সকল গুহারূপ বদন দ্বারা উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করতঃ সরিৎরূপ অশ্রুধারা বিসর্জ্জন করিতেছে[২৬]। দুঃখসন্তপ্ত দিগঙ্গনাগণের উত্তপ্ত নিশ্বাস পবন দ্বারা তাহাদিগের মেঘরূপ পয়োধর (স্তন) বস্ত্ররূপ অম্বর (আকাশ) বিহীন হইয়াছে[২৭]। গ্রামবাসী জনগণ উপবাসনিরত, ধূল্যবলুণ্ঠিত ও ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হইয়া মৃতপ্রায় হইয়া রহিয়াছে[২৮]। প্রতিদিন বৃক্ষদিগের পত্রগুচ্ছরূপ লোচনকোশ হইতে নীহাররূপ উষ্ণ অশ্রু অধোভাগে নিপতিত হইতেছে[২৯]। রথ্যা সকল আনন্দহীনা বিধবার ন্যায় ধূষর বর্ণ ধারণ পূর্ব্বক বিরলজনসঞ্চার হইয়া যেন শূন্যহৃদয়ে অবস্থিতি করিতেছে[৩০]। অত্যন্ত শোকসন্তপ্তা লতা সকল যেন বৃষ্টিরূপ বাষ্পবিহীন হইয়া কোকিল কূজন ও অলিগুঞ্জন দ্বারা নিরন্তর বিলাপ করিতেছে এবং ঘন ঘন উত্তপ্ত নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক পল্লবরূপ পাণির দ্বারা অনবরত স্বীয় শরীর আঘাতিত করিতেছে[৩১]। শোকসন্তপ্ত নির্ঝর সকল যেন আপনাকে শতধা করিবার মানসে প্রবলবেগে বৃহৎ শুভ্র শিলাতলে নিপতিত হইতেছে[৩২]। ঐ দেখুন, গৃহ সকল হর্ষবার্ত্তাবিরহে মূকের ন্যায় অবস্থিতি করিতেছে ও অন্ধকারাচ্ছন্ন গহন অরণ্যের সমান রহিয়াছে[৩৩]। ভ্রমরগুঞ্জন দ্বারা রোদনশীল উদ্যানখণ্ড হইতে সঞ্চারিত আমোদজনক সৌগন্ধ সকল যেন শোকার্ত্ততা বশতঃ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের পীড়াদায়ক পূতিগন্ধ সমানে অনুভূত হইতেছে[৩৪]। চৈত্যদ্রুমবিলাসিনী সুকোমলা লতা সকল গুচ্ছরূপ লোচন সঙ্কুচিত করতঃ দিন দিন বিরস ও বিশীর্ণ হইতেছে[৩৫]। কলধ্বনিকারিণী সরিৎ সকল সমুদ্রে স্বদেহ বিসর্জ্জন করিবার নিমিত্ত গমনে সমাকুলা হইয়া ভূতলে দোলায়মান হইতেছে[৩৬]। সচঞ্চল সরোবর সমুদয় এক্ষণে নিষ্পন্দভাবে অবস্থিতি করিতেছে[৩৭]। হে দেবী যুগল! যে নভঃ প্রদেশে (স্বর্গে) কিন্নরী, গন্ধর্ব্বী এবং সুরাঙ্গনাগণ গান করেন, সম্প্রতি আমার মাতা ও পিতা সেই স্থানে গমন করিয়া সে স্থান অলঙ্কৃত করিয়াছেন[৩৮]।' হে দেবীযুগল! মহতের দর্শন কদাচ নিষ্ফল হয় না, সেইজন্য আশা করি, আপনারা আমাদিগের শোক অপনোদন করিবেন[৩৯]।

লীলা জ্যেষ্ঠশর্ম্মার তদ্বিধ বচনপরম্পরা শ্রবণ করতঃ স্বকীয় শীতল

করপল্লব দ্বারা তাঁহার মস্তক স্পর্শ করিলেন। যেমন প্রাবৃট্ কালে মেঘসমাগমে বৃক্ষগণের গ্রীষ্ম বিদূরিত হয়, তেমনি, তদীয় করস্পর্শে জ্যেষ্ঠশর্ম্মার শোক ও সর্ব্বপ্রকার দুর্ভাগ্য সঙ্কট তিরোহিত হইল এবং তদীয় পরিজনবর্গও দেবীদ্বয়কে সন্দর্শন করতঃ দুঃখবিমুক্ত ও সর্ব্ব-সৌভাগ্যে বিভূষিত হইল[৪০।৪২]।

রামচন্দ্র বলিলেন, মহর্ষে! লীলা কি নিমিত্ত মাতৃশরীর দ্বারা তদীয় পুত্র জ্যেষ্ঠশর্ম্মাকে দর্শন দেন নাই তাহা আপনি বর্ণন করিয়া আমার মনোমোহ নিবারণ করুন[৪৩]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, পিশাচাদির জ্ঞান থাকাতেই বালকেরা তৎকর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। যাহারা একবার পিশাচের মিথ্যাত্ব জানিয়াছে, তাহারা আর পিশাচ দেখে না ও পিশাচ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয় না। রাঘব! এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, যে সকল অজ্ঞ লোক মিথ্যাপৃথ্ব্যাদিময় (ভৌতিক) শরীরকে ভ্রান্তিক্রমে সত্য বলিয়া অবগত আছে, সেই সকল ব্যক্তির চিদাত্মাই ভ্রান্তির প্রভাবে পিণ্ডাকার ভৌতিক দেহ ধারণ করিয়া থাকে। কিন্তু যাহারা জ্ঞানী অর্থাৎ যাহাদের ভ্রমনিবৃত্তি হইয়াছে, তাহারা কেবলাদ্বয় চিদাকাশ স্বভাবে অবস্থান করিয়া থাকেন। * বৎস! বাস্তব পক্ষে পৃথ্ব্যাদিভূত না থাকিলেও ভাবনার বলে তাহার সত্তা দণ্ডায়-মান হইয়া থাকে[৪৪।৪৫]। জ্ঞান হইলে তখন আর অজ্ঞান নির্ম্মিত পৃথ্ব্যাদি পৃথ্ব্যাদি আকারে প্রতিভাত হয় না। যেমন স্বপ্নাবস্থায় "ইহা স্বপ্ন" এইরূপ জ্ঞান হইলে স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের অদর্শন ঘটনা হয়, তেমনি, জাগ্রৎ কালেও পৃথ্ব্যাদি জ্ঞান তিরোহিত হইলে অপৃথ্ব্যাদি ভাব সমু-দিত হইয়া থাকে[৪৬]। পৃথ্ব্যাদি শূন্য অর্থাৎ নাই, ইত্যাকার জ্ঞান বা ভাবনা সুদৃঢ় হইলে পৃথ্ব্যাদি শূন্যরূপেই অনুভূত হইয়া থাকে। যেমন বিক্ষিপ্তচিত্ত পুরুষ কুড্যাকে (কুড্য=গৃহভিত্তি) শূন্য দেখে অথবা ভিত্তিস্থ স্ফটিকাদির গর্ভে শূন্যতা (ফাঁক অথবা দ্বার) দর্শন করে, তেমনি, মনোভাব অনুসারে বাস্তব অশরীরকে শরীর বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে। স্বপ্নে নগর, সমতল ভূমি ও খাত দেখা যায় এবং অঙ্গনাদর্শনও হয়, অথচ সে সকল না থাকিলেও অর্থাৎ অলীক হইলেও মানবগণের অর্থক্রিয়া-

* লীলা প্রপঞ্চ মিথ্যা বোধগম্য করিয়াছিলেন, সেজন্য তাঁহার পুত্রস্নেহ ছিল না। অপিচ, তত্ত্বজ্ঞানে মূলাজ্ঞান দূরীভূত হওয়ায় পূর্ব্বশরীর ধারণের উপায় ছিল না।

কারী হইয়া থাকে, সেইরূপ, পরমাকাশকে পৃথ্ব্যাদি জ্ঞানে জানিলে তাহাও পৃথ্ব্যাদি হইয়া থাকে। কেহ মূর্চ্ছাকালে কেহ বা মরণকালে পরলোক প্রত্যক্ষ করে[৪৭।৪৯]। বালকেরা শূন্যে বেতাল (ভূত) এবং ভীত, উন্মত্ত, অর্দ্ধনিদ্র ও অর্দ্ধজাগরূক লোকেরা ও নৌকারোহী পুরুষেরা সর্ব্বদাই শূন্যে কেশোণ্ড্রক, মুক্তাশ্রেণী, বেতাল, বন ও বৃক্ষাদি দেখে ও অনুভব করে[৫০।৫১]। ঐ সকলের বপু অর্থাৎ শরীর দর্শকের অভ্যাসজনিত ভাব অনুসারে প্রকাশ পায়, অথচ ঐ সকলের একটীও পরমার্থ সৎ অথবা নিয়ত সত্যরূপী নহে[৫২]। লীলার বস্তুজ্ঞান সমুদিত হইয়াছিল, তিনি বুঝিয়া ছিলেন, পৃথ্ব্যাদি কিছুই নহে। একমাত্র চিদাকাশই ভ্রান্তির দ্বারা নানা আকারধারী বা নানা আকার বিশিষ্ট হয়[৫৩]। এক্ষণে ব্রহ্মাত্মসাক্ষাৎকারী মুক্ত ও মুনি ব্যক্তির আবার পুত্র মিত্র ও কলত্রাদি কি?[৫৪] তাঁহাদের বিশ্বাস—কোনও দৃশ্য উৎপন্ন হয় নাই। যাহা প্রতিভাত হয় তাহা পরমাত্মা ব্যতীত অন্য কিছু নহে। যাহারা তত্ত্বজ্ঞ, তাহাদের জ্ঞানে পরমাত্মাতিরিক্ত দৃশ্য নাই। তাঁহাদের অনুরাগ বা বিদ্বেষাদি সম্ভব হয় না[৫৫]। লীলা যে জ্যেষ্ঠশর্ম্মার মস্তকে হস্ত প্রদান করিলেন তাহা পুত্রস্নেহপ্রযুক্ত নহে। তাহা জ্যেষ্ঠশর্ম্মার পরমার্থজ্ঞানদায়িকা চিতির *ফল।

হে রাঘব! বিশুদ্ধ বোধ সমুদিত হইলে, এই সকল পদার্থ স্বপ্ন এবং সঙ্কল্পপুরস্থিত কল্পিত পদার্থ সমূহের ন্যায় নিতান্ত অলীক ও একমাত্র ব্রহ্মই সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন, প্রতীতি হইয়া থাকে[৫৬।৫৭]।

* ভাবার্থ এই যে, জ্যেষ্ঠশর্ম্মার পূর্ব্বসঞ্চিত সুকৃত ছিল, সেই সুকৃতের স্বভাবে তাহার তত্ত্বজ্ঞানোদয়ের কাল উপস্থিত হওয়ায় সর্ব্বাধিষ্ঠান চেতনের অর্থাৎ ব্রহ্মচৈতন্যের সেই প্রকার বিবর্ত্তন ঘটনা হইয়াছিল।

ষড়বিংশ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তবিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠদেব বলিলেন, হে রামচন্দ্র! সেই দুই সিদ্ধ রমণী সেই গিরিতটস্থিত গিরিগ্রামের সেই ব্রাহ্মণের সেই গৃহে অবস্থিত থাকিলেও অন্তর্হিত হইলেন। অর্থাৎ তত্রস্থ জনগণের অদৃশ্য হইলেন[১]। গৃহজনেরা "দুই বনদেবী আমাদিগকে অনুগ্রহ করিলেন" মনে করিয়া সুখী হইল। শোকাদি বিদূরিত হওয়ায় তাহারা পুনর্ব্বার নিজ নিজ গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত হইল[২]। এই সময়ে আকাশলীনা ব্যোমরূপা সরস্বতী ব্যোমরূপিণী লীলাকে মৌনাবলম্বিনী দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন[৩]। বাছা! তুমি জ্ঞেয়তত্ত্ব নিরবশেষ অবগত হইয়াছ, সংসারভ্রমও প্রত্যক্ষ অবলোকন করিলে, এ সমস্তই যে ব্রহ্মসত্তা, ব্রহ্মের অতিরিক্ত নহে, তাহাও তুমি জানিয়াছ, এক্ষণে আর কি জিজ্ঞাস্য আছে তাহা বল[৪]।

বশিষ্ঠদেব রামচন্দ্রকে সন্দিহান প্রায় অবলোকন করিয়া বলিতে লাগিলেন, রাঘব! অদৃশ্যা রমণীদ্বয়ের কথোপকথনপ্রচার অসম্ভব মনে করিও না। লোকমধ্যেও দেখিতে পাইবে, যাহাদের দেবতানুগ্রহাদির দ্বারা উষানিরুদ্ধের ন্যায় পরস্পর কথোপকথনরূপ সম্বাদী (সত্যফল) স্বপ্ন অথবা সঙ্কল্প হয়, তাহাদের সেই কথোপকথন পরে কার্য্যে পরিণত ও লোকমধ্যে প্রচারিত হইয়া থাকে। সরস্বতীর ও লীলার পরস্পর কথোপকথন সেইরূপ, ইহা স্থির জানিবে। তাঁহাদের পার্থিব শরীরাদি না থাকিলেও স্বপ্নের ও সঙ্কল্পের অনুরূপে পরস্পরালাপরূপ চেতনা (জ্ঞান) উদিত হইয়াছিল[৫]। সরস্বতী জিজ্ঞাসা করিলেন, লীলে! আর কি বলিতে অথবা করিতে হইবে তাহা শীঘ্র বল।

লীলা বলিলেন, দেবি! আমার মৃত ভর্তার জীব যে স্থানে রাজত্ব করিতেছেন, আমি সে স্থানে যখন গমন করিয়াছিলাম, তখন আমাকে কেহই দেখিতে পায় নাই; কিন্তু এখানে আমার পুত্রেরা আমাকে দেখিতে পাইল, ইহার মর্ম্ম কি তাহা বলুন[৬]।

সরস্বতী বলিলেন, যখন তুমি স্বামিসমীপে গমন করিয়াছিলে তখন তোমার অভ্যাস দৃঢ় হয় নাই সেইজন্য দ্বৈতজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়

নাই। যে অদ্বয় হইতে না পারে কি প্রকারে সে অদ্বৈত কর্ম্মে অর্থাৎ সত্যসঙ্কল্পাদিক্রিয়ায় সিদ্ধ হইবে? যে তাপ মধ্যে অবস্থান করে সে কি ছায়ার গুণ (শীতলতা) জানিতে পারে?[৮।৯] তুমি যখন ভর্ত্তসকাশে গমন করিয়াছিলে তখন তুমি "আমি রাজমহিষী লীলা" এ ভাব ভুলিতে পার নাই। তাহা না পারায় সত্যকামা (যাহার কামনা অর্থাৎ ইচ্ছা সফল সে সত্য কামা) হইতে পার নাই[১০]। সম্প্রতি তুমি জ্ঞানাভ্যাসে সিদ্ধ ও সত্য-কামা হইয়াছ, সেই কারণে তোমার "পুত্রেরা আমাকে দর্শন করুক" এই কামনা সিদ্ধ হইয়াছে[১১]। এখন যদি তুমি ভর্ত্তৃসমীপে গমন কর, তাহা হইলে এখন তোমার কামনানুরূপ সমুদায় ব্যবহার সম্পন্ন হইতে পারে[১২]।

লীলা বলিলেন, দেবি! এই মন্দিরাকাশেই আমার স্বামী বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। পরে এই স্থানেই তাঁহার মৃত্যু হয় এবং মৃত্যুর পর তিনি এই স্থানেই রাজা হন[১৩]। অপিচ, এই মণ্ডপাকাশেই তাঁহার ভূমণ্ডলান্তর্গত রাজধানী ছিল এবং তৎপুরমধ্যে আমি পুরন্ধ্রী ছিলাম[১৪]। আমার সেই বসুধাধিপ স্বামী মৃত্যুগ্রাসে নিপতিত হইলে এই মণ্ডপাকাশেই তিনি ভূপতি হইয়া নানাজনপদের অধীশ্বর হইয়াছেন। জননি! আমার বোধ হইতেছে, যেমন সম্পুটক মধ্যে সর্ষপ সমূহ অবস্থিত থাকে, তাহার ন্যায়, নিখিল ব্রহ্মাণ্ডভূমি এই মণ্ডপাকাশেই অবস্থিত রহিয়াছে[১৫।১৭]। আমার ভর্ত্তৃসংসারমণ্ডলও অদূরে অবস্থিত রহিয়াছে। অতএব, যাহাতে আমি তাহা পার্শ্বস্থ বস্তু দর্শনের অনুরূপে দর্শন করিতে পারি, আপনি তাহার উপায় বিধান করুন[১৮]।

দেবী বলিলেন, পুত্রি! ভূতলবাসিনি অরুন্ধতি! তোমার ভর্ত্তা অনেক, পরন্তু সে সকলের দর্শন অসম্ভব। তবে সন্নিহিত স্বামিত্রয়ের মধ্যে যে স্বামীর মণ্ডল দেখিতে ইচ্ছা কর তাহা আমি এই মুহূর্ত্তে দেখাইতে পারি। তোমার সাম্প্রতিক ভর্ত্তৃত্রয়ের মধ্যে বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ কালগ্রাসে নিপতিত হইয়া পদ্মনামক নরপতি হইয়াছিলেন, যাঁহার মৃত শরীর তুমি স্বীয় অন্তঃপুরে পুষ্পমণ্ডপে সংস্থাপিত করিয়াছিলে, সেই পদ্মনামক নরপতি এক্ষণে জন্মগ্রহণ করতঃ বিদূরথ নামে তৃতীয় বসুধাধিপ হইয়াছেন। তিনি এক্ষণে ভ্রান্ত ও সংসার-জলধির মহাকল্লোলে প্রবিষ্ট আছেন। তিনি ভোগতরঙ্গসঙ্কুল সংসারসমুদ্রের ভোগকল্লোলবিক্ষিপ্ত কচ্ছপ সমান হইয়া অবস্থিতি করতঃ জাড্যজর্জ্জরচিত্তবৃত্তিশালী হইয়া রাজকার্য্যাদিতে

সমাকুল হইয়া রহিয়াছেন। তিনি জড়ের ন্যায় সুপ্ত আছেন, জাগরিত হইতেছেন না[১৯।২৩]। তিনি মনে করিতেছেন, আমি সকলের অধীশ্বর, আমি উৎকৃষ্টভোগশীল, আমি এই সংসারে অমিতবলশালী ও আমি মহাসুখী। তিনি ঐরূপ ভাবনায় ভাবিত ও অনর্থসংস্কারপাশে নিবদ্ধ রহিয়াছেন[২৪]। হে বরবর্ণিনি! আমি তোমার সাম্প্রতিক ভর্ত্তৃত্রয়ের কথা বর্ণন করিলাম; এক্ষণে তুমি কোন্ ভর্ত্তৃসমীপে গমন করিতে ইচ্ছা কর, তাহা বল, সমীরণের সুরভি বহনের ন্যায় আমি শীঘ্র তোমায় তথায় বহন করিব[২৫]।

বৎসে! তুমি যে ভর্ত্তৃ সংসার দর্শন করিতে ইচ্ছা করিতেছ, তাহা অন্য ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডপান্তর্গত অন্য সংসার। তথায় অন্যপ্রকার ব্যবহারিক কার্য্য সকল বিস্তৃত হইয়া থাকে[২৬]। জ্ঞানদৃষ্টিতে সেই সকল সংসার পার্শ্বে অবস্থিত থাকিলেও সংসার দৃষ্টিতে সে সকল এই সংসার হইতে কোটি কোটি যোজন দূরে অবস্থিত[২৭]। কিন্তু পারমার্থিক দৃষ্টিতে ঐ সকল সংসারের শরীর অর্থাৎ আধার চিদাকাশ ব্যতীত অন্য কিছু নহে। অবলোকন কর, একমাত্র ব্যোমরূপ মহাসংসারে কোটি কোটি মেরু-মন্দর অবস্থিত রহিয়াছে[২৮]। যদ্রূপ সূর্য্য কিরণে অনন্ত পরমাণু ভাসমান হয় তদ্রূপ মহাচৈতন্যে অনন্ত সৃষ্টি প্রকাশমান হইতেছে[২৯]। ঐ সকল সৃষ্টি যতই মহারম্ভ ও মহাগুণশালী হউক, চিদ্দৃষ্টি তুলনায় বটবীজ অপেক্ষাও ক্ষুদ্র[৩০]। চিৎ-নামক জগতে পৃথিব্যাদি ভেদ নাই। না থাকিলেও চিন্তার প্রভাবে অর্থাৎ সুদৃঢ় আবিদ্যক (মিথ্যা জ্ঞানের) সংস্কারের অর্থাৎ ভ্রমবিশেষের প্রভাবে জগৎ দর্শন হয়[৩১]। ভ্রান্তির দ্বারা জগদ্দর্শন আত্মাতেই হয়; পরন্তু তদ্দ্বারা আত্মার জগৎ হওয়া হয় না। ভ্রান্তি দৃষ্ট সর্প কি কখন রজ্জুকে সর্প করিতে পারিয়াছে? তাহা পারে নাই[৩২]। যেমন সরোবরে তরঙ্গমালা পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইয়া তাহাতেই বিলীন হয়, সেইরূপ, বিচিত্রাকার কাল; কালের অঙ্গ দিবা রাত্রি পক্ষ মাস, বৎসর যুগ কল্প, ও ভুবনাদি দেশ, সমস্তই জ্ঞানরূপ মহাচৈতন্যে পুনঃ পুনঃ উত্থিত ও লয়প্রাপ্ত হয়[৩৩]।

লীলা বলিলেন, জগন্মাতঃ! যাহা বলিলেন, তাহাই বটে, এখন আমার স্মরণ হইতেছে, আমার এতজ্জন্ম (লীলা জন্ম) রাজসিক।

শাস্ত্রে নির্দ্ধারিত আছে, মর্ত্ত্যজন্ম রাজস, তির্য্যক্‌জন্ম তামস ও দেবতাজন্ম সাত্ত্বিক।

ইহা তামসিক নহে, ও সাত্ত্বিক নহে[৩৪]। এখন আমার স্মরণ হই-তেছে, হিরণ্যগর্ভ হইতে উৎপন্ন হওয়া অবধি আমার অষ্টশত জন্ম অতীত হইয়াছে এবং সে সকল জন্ম নানা যোনিতে হইয়াছিল। সে সমস্তই আপনার প্রসাদে আমার স্মৃতিপথারূঢ় হইতেছে। সেই সকল জন্মপরম্পরা আমি যেন আমার সম্মুখে প্রকাশিত দেখিতেছি[৩৫]। দেবি! পূর্ব্বে আমি এক জন্মে এই সংসারমণ্ডলে বিদ্যাধরলোকরূপ পদ্মের ভ্রমরী স্বরূপ বিদ্যাধরনারী হইয়াছিলাম[৩৬]। পরে দুর্ব্বাসনার দ্বারা কলুষিত হওয়াতে মানুষী হই, তৎপরে অন্য সংসারমণ্ডলে অর্থাৎ অন্য জন্মে পন্নগরাজের পত্নী হই[৩৭]। তাহার পর দুরদৃষ্টের আতিশয্যে কদম্ব-কুন্দ-জম্বীর-বনচরী পত্রাম্বরধারিণী কৃষ্ণবর্ণা চণ্ডালিনী হইয়া জন্মিয়াছিলাম[৩৮]। সে জন্মে বনবাসনিবন্ধন ধর্ম্মমর্য্যাদায় অনভিজ্ঞা ও অত্যন্ত মূঢ়া ছিলাম, সেই কারণে পরজন্মে বনবিলাসিনী লতা হইয়া এক মুনির পবিত্র আশ্রমে কিছুকাল অবস্থিতি করিয়াছিলাম[৩৯]। সে বার সেই পুণ্যাশ্রমে মুনিসংসর্গে পবিত্রতা লাভ করিয়াছিলাম, সেই কারণে আমার সেই লতা দেহ দাবানলে দগ্ধ হওয়ার পর সেই আশ্রমে সেই মুনির কন্যা হইয়া জন্মিয়াছিলাম[৪০]। তৎপরে আমার অন্য শুভাদৃষ্ট সমুদিত হইলে পুরুষজন্মদায়ক কর্ম্ম সকলের পরিণামে সুরাষ্ট্রদেশে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক শ্রীমান্ রাজা হইয়া একশত বৎসর ঐশ্বর্য্যভোগ করিয়াছিলাম[৪১]। পরে পুনর্ব্বার আমার দুরদৃষ্ট প্রবল হইয়া উঠিলে আমি পরস্বাপহরণাদি দুষ্কৃত কার্য্য পরম্পরার দ্বারা কলুষিত হইয়া রাজদেহ পরিত্যাগ করতঃ তালীবৃক্ষতলস্থ কোন জলাশয়ের তীরে কুষ্ঠবিকলাঙ্গী নকুলী হইয়া তথায় নয় বৎসর অবস্থিতি করিয়াছিলাম[৪২]। তৎপরে মোহবশতঃ অষ্টবর্ষ পর্য্যন্ত সুরাষ্ট্রদেশে গো জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক অবলীলাক্রমে দুর্জ্জন অজ্ঞ গোপাল গণের তাড়না সহ্য করিয়াছিলাম[৪৩]। দেবি! আমি যেমন এতজ্জন্মে অতিকষ্টে বাসনা রজ্জু ছিন্ন করিয়াছি, তেমনি, অন্য এক জন্মে পক্ষিণী জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক বিপিন মধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে ব্যাধগণের মহাপাশে নিপতিত হইয়া অতিকষ্টে তাহা ছেদন করিয়াছিলাম[৪৪]। পরে ভ্রমরী হইয়া নির্জ্জনে ভ্রমরের সহিত পদ্মকলিকান্তর্গত কর্ণিকায় বিশ্রাম ও সুকোমল কমলকেশর ভক্ষণ করিয়াছিলাম[৪৫]। অনন্তর উত্তুঙ্গ পর্ব্বতশৃঙ্গোপরি হরিণী হইয়া তত্রত্য

সুরম্য বনস্থলীতে বিচরণ করিতে করিতে কিরাত কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছিলাম[৪৬]। পরে তরঙ্গমালাসমাকুল অব্ধি জলে ভ্রান্তির মহিমায় মৎস্যজন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক তরঙ্গ দ্বারা উহ্যমান হইয়া কূর্ম্মপৃষ্ঠে নিপতিত হওয়ায় মৎস্যবেধীরা যষ্ট্যাঘাত করিয়াছিল, পরন্তু কূর্ম্মপৃষ্ঠ হইতে অব্ধি জলে নিপতিত হওয়ায় তাহার সে তাড়না বিফল হইয়াছিল[৪৭]। অনন্তর পুনর্ব্বার দুর্ভাগ্যবশতঃ চর্ম্মণ্বতী নদীর তীরে চণ্ডালিনী হইয়া মধুর স্বরে গান ও সুরতান্তে নারিকেলরসাসব পান করিয়াছিলাম[৪৮]। তাহার পর সারসী হইয়া সীৎকাররূপ সুমধুর গানে সারসাধীশ্বরকে প্রীত করিয়াছিলাম[৪৯]। তৎপরে তালীতমালনিকুঞ্জমধ্যে মদিরাতরলায়িত (মদ্যপানজনিত চল) নেত্রের কটাক্ষে কান্তকে অবলোকন করিয়াছিলাম[৫০]। অনন্তর নানালঙ্কার ভূষিতা সুন্দরকান্তিসম্পন্না অপ্সরা হইয়া বদনকমলনির্গত অমৃতকল্প বাক্যরূপ মধুর দ্বারা ষট্পদরূপ সুরগণের সন্তোষসাধন করিয়াছিলাম[৫১]। অপিচ, কখন মণি, মাণিক্য ও মুক্তা বিরাজিত ভূতলে, কখন কল্পদ্রুমবনে এবং কখন বা সুমেরূপরি সেই সমস্ত সুরযুবক গণের সহিত বিহার করিয়াছিলাম[৫২]। অনন্তর প্রবলতরঙ্গমালা-সমাকুল জলাশয়ে, কখন বা সমুদ্রতীরস্থিত বনবিরাজিত পর্ব্বতগুহামধ্যে, বহুদিবস কচ্ছপী হইয়া অবস্থিতি করিয়াছিলাম[৫৩]। তৎপরে এক শাল্মলী বৃক্ষের পত্র প্রান্তোপরি একটী মশককে দুলিতে দেখিয়া আমার দোলন কামনা উদিত হওয়ায় তজ্জন্মের অবসানে মশকী হইয়া মশকের সহিত বহুদিন বৃক্ষপত্ররূপ দোলায় দোলায়মান হইয়াছিলাম[৫৪,৫৫]। অনন্তর আমি তরঙ্গসঙ্কুলগিরিনদীতীরে বেতস লতা হইয়া জন্মিয়াছিলাম। তাহাতে আমি নিরন্তর সেই নদীর প্রবল তরঙ্গ দ্বারা সমাকুল হইতাম। তাহার পর আমি গন্ধমাদন পর্ব্বতস্থ মন্দারমন্দিরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম, সেই জন্মে তত্রস্থ কামাসক্ত বিদ্যাধরগণ আমার পদতলে নিপতিত হইয়াছিল[৫৬।৫৭]। আমার সেই বিদ্যাধরজন্মও সুখের জন্ম নহে। কারণ, সে জন্মেও আমি নানা বিপদ ও দুঃখ অনুভব করিয়াছি[৫৮]।

আমি কথিতপ্রকারে এই সংসাররূপ সুদীর্ঘ সরিতে দুর্ব্বাসনারূপ বায়ুর তাড়নায় সমুদ্ভূত উন্নতাবনত লহরীর ন্যায় কখন অপ্সরা ও বিদ্যাধরী প্রভৃতি উচ্চ যোনিতে কখন বা শত শত দুঃখাবহ ইতর যোনিতে জন্ম গ্রহণ করতঃ বহুবিধ উৎপাতপরম্পরা দ্বারা সমাকুল হইয়াছিলাম[৫৯]।

সপ্তবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টাবিংশ সর্গ।

এই স্থানে রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, মহর্ষে! সেই অবলাদ্বয় কোটিযোজনবিস্তৃত বজ্রসার ও নিবিড় ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল হইতে কি প্রকারে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলেন তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন[১]। বশিষ্ঠ বলিলেন, বৎস! কোথায় ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল! কোথায় তাহার ভিত্তি! এবং তাহার বজ্রসারতাই বা কি! বস্তুতঃ সেই রমণীদ্বয় অন্তঃপুরাকাশেই অবস্থিত ছিলেন, কোথাও গমন করেন নাই ও কোন স্থান হইতে নির্গতাও হন নাই[২]। সেই বশিষ্ঠনামক ব্রাহ্মণ সেই গিরিগ্রামস্থিত গৃহাকাশেই বিদূরথ হইয়া রাজত্ব অনুভব করিয়াছেন ও পদ্ম ভূপাল হইয়া সেই মণ্ডপাকাশের কোন এক ক্ষুদ্র কোণে সমুদ্রচতুষ্টয় পরিবেষ্টিত ভূমণ্ডল অনুভব করিয়াছেন[৩।৪]। তদীয় আকাশকল্প চিদাত্মায় ভূমণ্ডল; তদাধারে তাঁহার রাজ্য ও রাজপুরী, ব্রাহ্মণপত্নী, অরুন্ধতী, তাহাতে লীলা, লীলা অর্চ্চনার দ্বারা জ্ঞপ্তিদেবীকে প্রসন্না করিয়াছেন, অনন্তর তৎসহচারিণী হইয়া মনোহর ও অদ্ভুততম আকাশ উল্লঙ্ঘন করিয়া ঐ সকল আশ্চর্য্য অবলোকন করিয়াছেন[৫।৬]। তাঁহারা কোথাও যান নাই। তাঁহারা প্রাদেশ পরিমিত হৃদয়াকাশে সেই গৃহাকাশ দেখিয়াছিলেন, এবং সেই আকাশেই ব্রহ্মাণ্ড, গিরিগ্রাম, তদন্তর্গত মন্দির, তথা হইতে লোকান্তর গমন, পুনর্ব্বার ভূমণ্ডলে অবতরণ ও গৃহ দর্শন, এই সমস্ত অনুভব করিয়াছিলেন। যেমন স্বপ্নদ্রষ্টা শয্যায় থাকিয়া দেশ দেশান্তর ভ্রমণ ও দর্শন করে ও অদ্ভুত দেশ দেশান্তর অবলোকন করে, সেইরূপ[৭।৮]। সমস্তই প্রতিভা, অর্থাৎ ভ্রমের বিবর্ত্তন ও সমস্তই আকাশ। সেইজন্যই বলিতেছি, ব্রহ্মাণ্ড নাই, সংসার নাই, তাহার ভিত্তিও নাই, তাহার দূরত্বও নাই[৯]। কেবল মাত্র বাসনার দ্বারা নিজ নিজ চিত্ত সমস্ত ব্যবহার-পরম্পরার সহিত সেই সেই মনোহর দিঙ্মণ্ডলরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল[১০]। সুতরাং ব্রহ্মাণ্ড ও সংসার সমস্তই আবরণরহিত অনন্ত অগাধ চিদাকাশ এবং সেই চিদাকাশই তাঁহাদের চিত্তপরিকল্পনায় ব্রহ্মাণ্ডাকারে বিবর্ত্তিত হইয়াছিল[১১।১২]। জন্মাদিবর্জ্জিত ও শান্তরূপী মহান্ চিদাকাশ চিত্তের কল্পনায়

জগদাকারে বিবর্ত্তিত হন, এ রহস্য যে ব্যক্তি জ্ঞাত হইতে পারেন, সে ব্যক্তির নিকট এ সমুদায় শূন্য অপেক্ষাও শূন্য। পরন্তু যে ব্যক্তি ঐ রহস্যে অবুদ্ধ, তাহার নিকট এ সমুদায় বজ্র অপেক্ষাও দুর্ভেদ্য[১৩]। যেমন গৃহস্থিত ব্যক্তি স্বপ্নে চিদাকাশেই এই সমস্ত মিথ্যা জগৎ সত্যের ন্যায় অবলোকন করে, যেমন মরুভূমিস্থিত মরীচি মালায় জলপ্রবাহ প্রতীতি হয়, অথবা সুবর্ণে কটকের (অলঙ্কারের) জ্ঞান হয়, সেইরূপ, অসৎ দৃশ্যপ্রপঞ্চও চিদাত্মায় সতের ন্যায় প্রতিভাত হয়[১৪।১৫]।

মহর্ষি বশিষ্ঠ ঐরূপে রামপ্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদান পূর্ব্বক পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন। লীলা বর্ণিতপ্রকারে আপনার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের বৃত্তান্ত স্মরণ করতঃ দেবীসকাশে বর্ণন করিতে করিতে উভয়ে উভয়ের সম্মুখবর্ত্তী এক পর্ব্বত দেখিতে দেখিতে তথা হইতে নির্গতা হইলেন। গ্রামস্থ জনগণ তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইল না। অনন্তর গ্রামস্থ জনগণের অদৃশ্যভাবে সেই গৃহ হইতেও নির্গতা হইলেন।

অনন্তর সেই লোকললামভূতা ললনাদ্বয় তথা হইতে বহির্গত হইয়া পুরোভাগস্থিত গিরি দেখিতে লাগিলেন। তাঁহারা দেখিলেন, ঐ ভীষণ ভূধরের অত্যুচ্চ শৃঙ্গ সকল যেন গগনমণ্ডল অতিক্রম করিয়া আদিত্যমণ্ডল স্পর্শ করিতেছে[১৬।১৭]। ঐ ভূধরের স্থানে স্থানে নানা রঙের ফুল ও নানাবিধ বৃক্ষের বন বিরাজিত রহিয়াছে। কোথাও নির্ম্মল নির্ঝর সকল ঝর্ঝর শব্দে নিপতিত হইতেছে। কোন কোন প্রদেশে বনবিহঙ্গমগণ মধুর স্বরে গান করিতেছে[১৮]। কোন কোন স্থানে অভ্রভেদী উচ্চ পুষ্পিতাগ্র বৃক্ষের অগ্রভাগে বিচিত্র সারস পক্ষী বিশ্রাম করিতেছে[১৯]। কোন স্থানে প্রবাহিত পার্ব্বত্য নদীর তীর ভূমি বেতস বনে সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে। কোন কোন স্থানে সুবিস্তীর্ণ নদীবক্ষে তরঙ্গমালা সমুত্থিত, কোন স্থানে নদীতট বনবৃক্ষসমূহে পরিবেষ্টিত, কোন কোন স্থানে বহুল পুষ্পবিরাজিতশিখর দ্রুম সকল আকাশকোশস্থিত বারিদ মণ্ডল সমাচ্ছাদিত করতঃ দণ্ডায়মান রহিয়াছে, এবং স্থানে স্থানে বনবিরাজিত সরিৎ সকলের অবস্থান প্রযুক্ত সেই সেই স্থানের ছায়া সততই শান্ত ও সুশীতল বলিয়া অনুভূত হইতেছে[২০।২২]।

রাঘব! অনন্তর সেই রমণীদ্বয় সেই পর্ব্বতের অন্যতম প্রদেশে আকাশ হইতে অবতরিত স্বর্গখণ্ডের ন্যায় গিরিগ্রাম দেখিতে পাইলেন[২৩]।

এই গ্রাম নানা প্রকার জলপ্রণালী ও সলিলপূর্ণ সরোবর দ্বারা শোভমান রহিয়াছে, বিহঙ্গমগণ কুচকুচ ধ্বনি করতঃ লীলার্থে সেই সকল সরোবরের তীরে গমন করিতেছে,[২৪] কোন কোন স্থানে গোসমূহ হুঙ্কার-ধ্বনি করিয়া ছায়াবিশিষ্ট ও গুল্মসমাচ্ছন্ন বনকুঞ্জাভিমুখে গমন করিতেছে[২৫]। এই সকল বন সূর্য্যরশ্মির অপ্রবেশ হেতু সততই নীহার-ধূসরের ন্যায় দৃষ্ট হইয়া থাকে। অপিচ, এতন্মধ্যে কোন কোন বৃক্ষের মঞ্জরীপুঞ্জবিশিষ্ট জটাবলম্বী উর্দ্ধগামিনী শেখর (অগ্রভাগ) ভারাক্রান্ত হওয়াতে অবনত হইয়া রহিয়াছে[২৬]। এই গিরিগ্রামের অন্য এক স্থানে শিলাকুহর হইতে নিপতিত নির্ঝরধারা শত শত বিম্ব উৎপন্ন করিতেছে, সে সকল দেখিতে মুক্তামালার অনুকারী এবং তাহা দেখিলে দেবাসুরের ক্ষীরোদমন্থনের শ্রীসৌষ্টব স্মৃতি পথাগত হয়[২৭]। এই গ্রামের অনেক স্থানেই দেখা যায়, অজিরস্থিত বৃক্ষ সকল ফলপুষ্পসম্ভারধারী মানবের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে[২৮]। কোন কোন স্থানে পুষ্পিত বৃক্ষাগ্র হইতে অজস্র পুষ্পবর্ষণ হইতেছে, কোন কোন স্থানে পক্ষিগণ শিলোপরি নির্ঝরজলপতনের কঠোর শব্দ শুনিয়া ধনুষ্টঙ্কারশব্দ ভ্রমে বৃক্ষপত্র মধ্যে লুক্কায়িত হইতেছে, কোন কোন স্থানে রাজহংসগণ নদীলহরীর আস্ফালনে এক দিক্ হইতে অপর দিকে নীত হইয়া নক্ষত্রপঙ্‌ক্তির ন্যায় পরিবর্ত্তিত হইতেছে[২৯।৩১]। কোন কোন স্থানে দেখা যায়, বালকেরা কাকের ও বিড়ালের ভয়ে ক্ষীর শর ছানা মাখম প্রভৃতি খাদ্য সকল লুকাইয়া রাখিতেছে, আবার অন্য স্থানে দেখা যায়, গ্রামবালকেরা ফুলের বসন ও ফুলের ভূষণ পরিধান করিয়া বেড়াইতেছে। কোন বালক খর্জ্জুর বনের, কোন বালক জম্বীর বনের ছায়ায় বিশ্রাম সুখ অনুভব করিতেছে[৩২।৩৩]। দরিদ্র, নীচ, অলস, এই সকল মনুষ্যের রমণীরা ক্ষুধাক্লেশে ক্ষীণাঙ্গিনী হইয়া পথে পথে ভ্রমণ করিতেছে, গ্রাম্য জনগণ তাহাদিগকে কীট অপেক্ষাও হেয় জ্ঞান করিতেছে, ভিল্ রমণীরা পত্রের ও অতসী তৃণের বস্ত্র পরিধান ও কর্ণে পুষ্পমঞ্জরী স্থাপন করতঃ ভ্রমণ করিতেছে,[৩৪] অন্য এক স্থানে ঝঙ্কারকারী মারুতের হিল্লোলে সরিত্তরঙ্গ কম্পিত হইতেছে ও তাহার কল্লোলের কলকল ধ্বনিতে তত্রস্থ জনগণের পরস্পরালাপ শুনা যাইতেছে না। এই গ্রামের অপর এক স্থানে ভীরুস্বভাব অনেকগুলি অলস ব্যক্তি অবস্থিতি করিতেছে, অপর এক স্থানে উলঙ্গ বালকগণ

হস্তে, বদনে ও স্কন্ধে দধি ম্রক্ষণ করতঃ হস্তে লতা ও পুষ্প ধারণ করিয়া এবং কোন কোন বালক অঙ্গে গোময়ের ও পঙ্কের রেখাঙ্ক ধারণ করিয়া নৃত্যের ও ক্রীড়ার দ্বারা চত্বরভূমি সমাকুল করিতেছে[৩৫।৩৬]। কোন কোন স্থানে তরঙ্গসঙ্কুল নদীর স্রোতঃপ্রবাহে তীরস্থিত তৃণ সকল কম্পিত হইয়া বালুকাময় তীরে রেখাসমূহ উৎপাদন করিতেছে[৩৭]। কোন কোন স্থানে দধিক্ষীরাদির নিবিড় গন্ধে মন্থর হইয়া মক্ষিকা সকল উন্মত্তপ্রায় হইয়া ভণ্ ভণ্ শব্দ করিতেছে, কোন স্থানে কৃশ-দুর্ব্বল বালকগণ অভিলষিত বস্তুর নিমিত্ত নয়নবিগলিত বাষ্পবারির দ্বারা বিক্তাঙ্গ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতেছে[৩৮]। কোন স্থানে ইতর রমণীরা গৃহ লেপন করিতে করিতে গোময়পঙ্কলিপ্ত হস্তে ঝকড়া বাঁধাইয়া ক্রোধে অধীরা হইয়া এলোথেলো বেশে উচ্চ গলধ্বনি করিতেছে, এবং তাহা-দিগকে দেখিয়া নগরবাসী সভ্য বালকেরা হাস্য করিতেছে[৩৯]। অপর এক স্থানে শান্ত স্বভাব মুনিরা প্রাণিগণের উদ্দেশে ভক্ষ্য বিকীরণ করিয়াছেন (ছড়াইয়া দিয়াছেন) ও কাকাদি পক্ষী অবিশঙ্কিত চিত্তে আগমন করতঃ সে সকল ভক্ষণ করিতেছে[৪০]। কোন কোন প্রদেশে গৃহপার্শ্বস্থ পুষ্পকাননে প্রাতঃসমীরণের আন্দোলনে রাশি রাশি পুষ্প নিপতিত হইতেছে। কোন স্থানে জিতেন্দ্রিয় মুনিগণ গিরিশিখর হইতে আপতিত যজ্ঞস্থানস্থিত বলিভোজী বায়সগণকে পুষ্পপত্রাদির দ্বারা ইতস্ততঃ উৎসারিত করিতেছেন। কোন কোন স্থানে গৃহদ্বার ও পন্থা সকল কণ্টকযুক্ত কুরণ্টক (গুল্মবিশেষ) দ্বারা সমাকীর্ণ রহিয়াছে। কোন স্থানে জঙ্গলবিহারী তৃণভোজী মৃগ ও বিহঙ্গমগণ বিচরণ করি-তেছে। কোন কোন স্থানে মৃগশিশু নিঃশঙ্কচিত্তে নিকুঞ্জজাত নব-তৃণোপরি নিদ্রিত রহিয়াছে[৪১।৪২]। কোন কোন স্থানে গোবৎসগণ পুষ্প শয্যায় শয়ন করিয়া কর্ণস্পন্দন দ্বারা অঙ্গস্থ মক্ষিকাগণকে উৎসারিত করিতেছে। কোন কোন স্থানে মক্ষিকাপুঞ্জ গোপ দিগের ভক্ষণাবশিষ্ট দধির নিমিত্ত নিতান্ত চঞ্চল হইতেছে[৪৩]। কোন কোন স্থানে দেখি-লেন, মধুমক্ষিকাগণ গৃহে গৃহে মধুচক্র রচনা করিতেছে। কোন কোন স্থানে অশোকপাদপোদ্যানে লাক্ষারঞ্জিত কাষ্ঠের ক্রীড়ামন্দির সংস্থা-পিত রহিয়াছে[৪৪]। কোথাও বা জলকণবাহী মারুত কর্ত্তৃক প্রত্যহ আর্দ্র হওয়াতে কদম্বদ্রুম সকল নিত্য মুকুলিত, তৃণরাজি অঙ্কুরিত,

লতানিকর বিকসিত, শুভ্রবর্ণ কেতকী পুষ্প প্রস্ফুটিত ও সমুদয় বৃক্ষ প্রফুল্ল হইয়া রহিয়াছে। এই গ্রামের কোন কোন প্রদেশে পয়ঃপ্রণালী দিয়া পয়োরাশি গুর্ গুর্ শব্দে প্রবাহিত হইতেছে[৪৫।৪৬]।

অনন্তর সেই রমণীদ্বয় ঐ গিরিগ্রাম মধ্যে অত্যুচ্চ অট্টালিকা শ্রেণী ও প্রফুল্লকমলদলশোভিত পুষ্করিণীবিশিষ্ট পূর্ণচন্দ্রপ্রভাবিকাসী শুভ্রবর্ণ মনোহর গিরিমন্দির অবলোকন করিলেন। এই গিরিমন্দিরসমূহ সৌন্দর্য্যগুণে পুরন্দরমন্দিরকেও পরাভব করিয়াছে। নিবিড় বৃক্ষচ্ছায়া, নির্ম্মল শাদ্বল ভূমি, তত্রস্থ প্রতিতৃণের অগ্রভাগে তারকাকার নীহার-বিন্দু পরম শোভা বিস্তার করিতেছে[৪৭।৪৮]। অনবরত নীহারপাতে ও পুষ্পনিপতনে তত্রস্থ মন্দির সকল কুন্দকুসুমসদৃশ শুভ্রবর্ণ দেখাইতেছে। স্থানে স্থানে মঞ্জরীপুষ্পের পাদপ, পত্রপাদপ ও ফলবৃক্ষ সকল শোভা বিস্তার করিতেছে। মেঘ সকল গৃহ কক্ষার অন্তরালে নিবিষ্ট থাকিয়া সেই সেই স্থানে তড়িতের দ্বারা আলোকিত হইতেছে[৪৯।৫০]। স্থানে স্থানে হারীত ও চকোর প্রভৃতি পক্ষিগণ অবিরত কাকলী শব্দে গান করিতেছে, এবং শুক, শারিকা ও দ্রোণকাক প্রভৃতি বিহঙ্গম নিচয় ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। ঐ সকল মন্দির কুসুমসুরভিবাহী সমীরণ দ্বারা সাতিশয় আমোদিত ও স্থানে স্থানে পথ সকল আলোলপল্লব লতাবলয় দ্বারা বেষ্টিত। কোন কোন স্থানে শাল তাল ও তমাল বৃক্ষ শ্রেণীকৃত, কোন কোন স্থানে লতাবিতানের শোভা, স্থানে স্থানে লতা-বলয়িত বৃক্ষশ্রেণী এবং তদ্দ্বারা যেন পথ সকল অবরুদ্ধ রহিয়াছে[৫১।৫৫]। কোন কোন স্থানে অন্তঃপ্রবাহশালিনী শব্দায়মানা নদী উত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত গোকুল ও গোপ সকল ব্যাকুল হইতেছে। এই সকল মন্দির উদ্যানজাত কুন্দ-মকরন্দ-সুগন্ধির দ্বারা সতত‌ই আমোদিত রহিয়াছে; ষট্পদগণ মকরন্দ গন্ধে অন্ধ হইয়া কমলদল পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঐ সকল মন্দিরের চতুর্দ্দিক্ পরিভ্রমণ করিতেছে। এই স্থানে যে সকল ফুল্ল পদ্ম বিরাজ করিতেছে, সেই সকল পদ্মের পরাগরাশি বায়ু প্রবহনে উড্ডীন হইয়া গগনমণ্ডল অরুণিত করিতেছে[৫৬।৫৭]। উহার স্থানে স্থানে বেগবতী গিরিনদী ঝর ঝর শব্দ করতঃ প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছে। কোন কোন সৌধের (সৌধ=শ্বেত প্রাসাদ) অলিন্দ দেশে ফুল্লকুসুমশোভিত লতানিকুঞ্জ সংস্থাপিত রহিয়াছে। কোন স্থানে লীলাবিলাসী চঞ্চল

বিহঙ্গমগণ অবিরত কলকল ধ্বনি করতঃ ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে[৫৮]। কোন স্থানে যুবকগণ সোল্লাস চিত্তে কুসুমাস্তরণে উপবিষ্ট রহিয়াছে। কোন কোন স্থানে বিলাসিনীগণ পাদতল পর্য্যন্ত লম্বমান মাল্যে শোভিত হইয়া অবস্থিতি করিতেছে। এবং সর্ব্বত্রই নবাঙ্কুরসম্পন্ন শরস্তম্ব সকল লতাবিজড়িত থাকায় অনির্ব্বচনীয় শোভা বিস্তার করিতেছে[৫৯]। কোন কোন স্থানে সুকোমল উৎপল-লতা উৎপন্ন হইয়াছে এবং অপর কোন স্থানে তাহা কুসুমিত হইয়াছে। তত্রস্থ কোন কোন গৃহে পয়োদ (মেঘ) মালা সংলগ্ন রহিয়াছে। এবং কোন কোন স্থান হরিদ্বর্ণক্ষেত্রে নীহারবিন্দুসমূহ নিপতিত হইয়া হারাবলীর শোভা বিস্তার করিতেছে। আবার অন্য-এক স্থানে অঙ্গনাগণ সৌধস্থ মেঘতড়িত দ্বারা সমাকুলিত হইতেছে। এবং আর এক স্থানে জনগণ নীলোৎপল সৌরভ দ্বারা উল্লাসিত হইতেছে। কোন কোন স্থানে গো সমুদয় তৃণপূরিতমুখে হুঙ্কার রব করিতেছে এবং অন্য এক স্থানে অজির ভূমিতে মৃগ সকল বিশ্বস্তভাবে শয়ন করিয়া রহিয়াছে। এই গিরিগ্রামের অন্য এক প্রদেশে নির্ঝর-শীকর নিপতন স্থলে শিখীকুল নৃত্য করিতেছে এবং সমুদায় গিরিমন্দির সুগন্ধবাহী সমীরণ দ্বারা বীজিত হওয়ায় জনগণের ইন্দ্রিয়-বৈকুল্য তিরোহিত করিতেছে। বপ্রস্থিত ওষধি সকলের দীপ্তির দ্বারা তত্রস্থ জনগণ দীপালোক বিস্মৃত হইয়াছেন। নীড়স্থিত পক্ষিকুলের কলরবে গিরিমন্দির সকল আকুলিত হইতেছে এবং গিরিনির্ঝরের কলকল ধ্বনিতে তত্রত্য মানবগণের সংলাপ শ্রুতিগোচর হইতেছে না। এই গিরিমন্দিরের নিখিল দ্রুম, লতা, তৃণ, এবং পল্লব হইতে মুক্তাফলের ন্যায় পরম সুন্দর শিশিরবিন্দু সকল নিপতিত হইতেছে। এবং বিকসিত কুসুমশোভা অক্ষুণ্নভাবে বিরাজিত থাকায় বোধ হইতেছে যে, যেন লক্ষ্মী এই গিরিগ্রামে নিত্য বিরাজমানা রহিয়াছেন[৬০।৬৩]।

অষ্টাবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ঊনত্রিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! যেমন আত্মতত্ত্বজ্ঞ পুরুষে ভোগ ও মোক্ষ উভয় শ্রী প্রবিষ্ট হয়, তেমনি, সেই শান্ত্যাদি সাধন সম্পন্না দেবীদ্বয় সেই অন্তঃশীতল সুরম্য গিরিগ্রামে প্রবিষ্ট হইলেন এবং ঐ সকল দর্শন করিলেন। লীলা এ পর্য্যন্ত যে জ্ঞানাভ্যাস করিয়াছিলেন, সেই অভ্যাসের প্রভাবে এক্ষণে বিশুদ্ধজ্ঞানদেহিনী ও ত্রিকালদর্শিনী হইয়াছেন[১।২]। সেই নিমিত্ত এখন তিনি তাঁহার পূর্ব্বসংসারের বৃত্তান্ত স্মরণ করিতে সমর্থা হইয়াছেন। তাই এখন গিরিগ্রাম দৃষ্টে লীলার পূর্ব্বতন জন্ম মরণ প্রভৃতি সমুদায় ভাব সহজে স্মৃতিপথারূঢ় হইতে লাগিল[৩]।

লীলা বলিতে লাগিলেন, দেবি! আপনার প্রসাদে এই দেশ দর্শন করিয়া আমার প্রাক্তন জন্মপরম্পরা ও সেই সেই জন্মের কার্য্যচেষ্টাদি সমুদয় স্মৃতিপথে সমুদিত হইতেছে[৪]। পূর্ব্বে আমি শিরাব্যাপ্ত শরীরা কৃষ্ণবর্ণা ব্রাহ্মণীরূপে এই স্থানে বৃদ্ধা ও অতিশয় কৃশাঙ্গিণী হইয়াছিলাম। এই সকল শুষ্ক দর্ভাগ্র দ্বারা আমার পদতল ও করতল ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল[৫]। এই স্থানে আমি দোহন পাত্র ও মন্থনদণ্ড ধারিণী হইয়া ভর্ত্তার কুলকরী ভার্য্যা হইয়াছিলাম এবং পুত্রগণের ও অতিথিদিগের প্রিয়ানুষ্ঠানে অনুরক্তা ছিলাম[৬]। দেব, দ্বিজ ও সাধুগণের প্রতিও অনুরক্তা ছিলাম এবং সতত ঘৃতের ও দুগ্ধের দ্বারা সিক্তাঙ্গী থাকিতাম। এই স্থানে আমি ভর্জ্জনপাত্র ও চরুস্থালী প্রভৃতি মার্জ্জন করিতাম এবং একটীমাত্র কাচবলয় (কাচের বালা বা চুড়ি) প্রকোষ্ঠে ধারণ করতঃ জামাতা, দুহিতা, পিতা, মাতা ও ভ্রাতাদিগের পরিচর্য্যা করিতাম। অপিচ, কার্য্যের ত্বরানিবন্ধন নিরন্তর তাঁহাদিগকে "সত্বর স্ব স্ব কার্য্য সাধন কর, বিলম্ব করিতেছ কেন?" এই বলিয়া ব্যাকুলা হইতাম। যত দিন না আমার দেহপাত হইয়াছিল, তত দিন আমি ঐ প্রকারে সংসারের দাসীত্ব করিয়াছিলাম[৭।৮]। হে দেবি! আমার ন্যায় আমার সেই শ্রোত্রিয় পতিও গৃহাসক্ত ছিলেন। আমি কে? সংসার কি?

কিংস্বরূপ? এ সকল এক দিনের জন্যও এবং স্বপ্নেও ভাবি নাই। আমার সেই শ্রোত্রিয় পতির ন্যায় আমিও অত্যন্ত মূঢ়বুদ্ধি ছিলাম[১০]। আমি কেবল সমিৎ, শাক, গোময় এবং ইন্ধন সঞ্চয়ে সতত যত্নপরায়ণা থাকিতাম। একমাত্র মলিন কম্বল আমার ব্যবহারোপযোগী ছিল এবং সতত সাংসারিক কার্য্যে ব্যাসক্ত থাকায় আমার শরীর কঙ্কালমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছিল[১১]। আমি বৎসগণের কর্ণকীট নিষ্কাসনে তৎপরা থাকিতাম। এই স্থানে আমি পরিচারিকার ন্যায় গৃহস্থিত শাকক্ষেত্রে জলসেক ও তরঙ্গসঙ্কুল নদীতীরস্থিত তৃণ আহরণ পূর্ব্বক বালবৎস গণের তৃপ্তি সাধন ও প্রত্যহ বর্ণক দ্বারা গৃহ দ্বার রঞ্জিত করিতাম[১২।১৩]। যাহারা আমাকে জানিত না তাহারা আমাকে আক্ষেপ বাক্যে নিন্দা করিত। বলিত, "এমন লোকের বাড়ী এমন অবিনীতা পরিচারিণী কি প্রকারে অবস্থিতি করিতেছে?" সমুদ্র যেমন বেলা অর্থাৎ তীর ভূমি অতিক্রম করে না, সেইরূপ, আমিও তাঁহাদিগের মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করিতাম না[১৪]। ঐরূপে কিয়ৎকাল অতীত হইলে আমি জরা কর্ত্তৃক আক্রান্তা হইয়াছিলাম। তখন আমার দেহ জীর্ণপর্ণের ন্যায় শিরাবিশিষ্ট হইয়াছিল ও শিরঃকম্পন দ্বারা আমার দক্ষিণ কর্ণ নিরন্তর দোলায়মান হইত। ক্রমে আমি বধির হইয়াছিলাম। কোন বলবান লোক দুর্ব্বলকায় লোকের বধার্থ যষ্টি উদ্যম করিলে সে যেরূপ ভীত হয়, আমি জরার আগমনে সেইরূপ ভীতা হইয়াছিলাম[১৫]।

বশিষ্ঠমুনি বলিলেন, রাঘব! লীলা এই সকল কথা কহিতে লাগিলেন এবং গিরিগ্রাম কোটরে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর যেন তিনি আপনাকে ও দেবীকে বিস্মাপিত করতঃ বলিতে লাগিলেন[১৬]।

দেবি! দেখুন, এই আমার গুল্মপরম্পরামণ্ডিত পুষ্পবাটিকা। এই আমার পুষ্পোদ্যানস্থিত অশোকবাটিকা[১৭]। পুষ্করিণী তীরে ক্রমতলে ঐ যে বৎসটী অল্প রজ্জু গ্রন্থির দ্বারা নিবদ্ধ রহিয়াছে, ওটী আমারই সেই কর্ণিকা-নামক বৎস[১৮]। আহা! এই ধূলিধূসরিত শান্তপ্রকৃতি অবোধ বৎসটী আমার বিয়োগদুঃখ নিবন্ধন এক্ষণে সাতিশয় কৃশ ও বলহীন হইয়াছে এবং অদ্য আট দিন বাষ্পক্লিন্নাক্ষ হইয়া রোদন করিতেছে[১৯]।

হে দেবি! আমি এই স্থানে ভোজন, এই স্থানে উপবেশন, এই স্থানে পান, এই স্থানে দান ও এই স্থানে ধান্যাদি আহরণ করি-

স্তাম[২০]। ঐ আমার জ্যেষ্ঠশর্ম্মানামক পুত্র গৃহমধ্যে রোদন করিতেছে। ঐ আমার দুগ্ধবতী ধেনু তৃণপূরিত ক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছে[২১]। ঐ আমার প্রিয়জনেরা গৃহবহির্দ্বারে অবস্থান পূর্ব্বক ধূলি বিধূসরাঙ্গ হইয়া হাহাকার ধ্বনি করিতেছে[২২]। ঐ আমার স্বহস্তারোপিত তুম্বী লতা, যথোচিত পরিপালিতা না হইলেও পরিপুষ্টা হইয়া বহু প্রদেশ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। ঐ আমার পাকশালা। ঐ পাকশালা আমার শরীর অপেক্ষা যত্নের ও আদরের ছিল[২৩]। ঐ আমার সংসারের সাক্ষাৎবন্ধনস্বরূপ বন্ধুগণ হস্তে রুদ্রাক্ষ বলয় অর্পণ করিয়া অনলেন্ধন (অগ্নি ও কাষ্ঠ) আহরণ করিতেছে। নিরন্তর রোদন দ্বারা উহাদিগের চক্ষুর্দ্বয় তাম্রবর্ণ হইয়াছে[২৪]। ঐ আমার প্রফুল্ললতাপরিবেষ্টিত গুলুচ্ছদলসমাচ্ছন্ন গবাক্ষবিশিষ্ট সুন্দর গৃহমণ্ডপ লক্ষিত হইতেছে[২৫]। ঐ মণ্ডপ কুল্যাদির দ্বারা পরিবেষ্টিত ও শোভমানা। ঐ সমস্ত কুল্যার জলতরঙ্গ অনবরত শিলারাশিতে আঘাত করাতে তরঙ্গভঙ্গশীকর সমুত্থিত হইয়া মধ্যাহ্নকালীন দিবাকরের কিরণজাল ও তীরস্থিত বৃক্ষ সকলকে সমাচ্ছন্ন করিতেছে[২৬।২৭]। ঐ দেখুন, তরঙ্গান্দোলিত লতা সমুদয়ের আস্ফালনে উৎপল সকল ফেনিল ও কম্পিত হইতেছে। উহার তটস্থিত প্রফুল্লকুসুমপূর্ণ বৃক্ষে ভ্রমর সকল নিনাদ করিতেছে। ঐ কুল্যার তরঙ্গমালা ভীষণ শব্দে আবর্ত্তিত হইতেছে। উহার তরঙ্গাস্ফালনে তটসন্নিহিত উৎপল সকল ধৌত হইতেছে, এবং ঐ মণ্ডপ ঘনপত্রসম্পন্ন তরুরাজির দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকায় উহার ছায়া সততই সুশীতল অনুভূত হইয়া থাকে[২৮।৩১]। হে দেবি! এই স্থানে আমার ভর্ত্তা জীবাকাশ (জীব প্রকৃতপক্ষে আকাশের ন্যায় নির্লেপ ও নিষ্ক্রিয়) হেতু নিষ্ক্রিয় হইলেও আসমুদ্র মেদিনীর অধিপতি হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন[৩২]। আমার স্মরণ হইতেছে, ইনি শীঘ্র রাজা হইবার নিমিত্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন, এবং তাহাতেই তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে[৩৩]। ইনি আট দিনের মধ্যেই চিরাভিলষিত সমৃদ্ধিসম্পন্ন রাজ্যলাভ করিয়াছেন। বায়ু যেমন আকাশে অদৃশ্য ভাবে অবস্থিতি করে, তাহার ন্যায় আমার সেই ভর্ত্তৃজীব এই গৃহাকাশে অবস্থিতি করিতেছেন। এই অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত স্থানেই আমার সেই ভর্ত্তৃজীব যোজনকোটিবিস্তৃত মহারাজ্য অনুভব করিতেছেন[৩৪]। পরমেশ্বরি! আমার এই সকল সংসার, আমার ঐ ভর্ত্তা ও

ভর্ত্তৃরাজ্য, সমস্তই চিদাকাশ। কিন্তু এমনি মায়ার কাণ্ড যে, আমার ভর্ত্তৃরাজ্য তদ্রূপ হইলেও যেন, উহা, সহস্র সহস্র শৈলে পরিপূর্ণ রহিয়াছে[৩৫।৩৭]। হে দেবি! প্রোক্ত কারণে আমি পুনর্ব্বার ভর্ত্তৃনগরে গমন করিবার নিমিত্ত উৎসুক হইয়াছি, আপনি আগমন করুন, আমরা পুনর্ব্বার তথায় গমন করিব। ব্যবসায়ী দিগের আবার দূর নিকট কি? (ব্যবসায়ী=দৃঢ়সঙ্কল্পধারী)[৩৮]

বশিষ্ঠদেব বলিলেন, রাঘব! লীলা ঐ প্রকার কহিলে পর দেবী সরস্বতী ও লীলা উভয়ে সেই কুসুমপ্রভ মণ্ডপাকাশে প্রবেশ পূর্ব্বক তদন্তর্গত মহাকাশে পক্ষিণীর ন্যায় উড্ডীনা হইলেন[৩৯]। এই আকাশ তরলায়িত কজ্জলতুল্য গাঢ়কৃষ্ণবর্ণ অথচ মনোজ্ঞ। দেখিতে নিশ্চল ও অক্ষোভ্য একার্ণব সদৃশ। নারায়ণের অঙ্গপ্রভার ন্যায় প্রভাশালী ও ভৃঙ্গপৃষ্ঠের ন্যায় সুচিক্কণ[৪০]। তাঁহারা প্রোক্ত আকাশস্থ মেঘমার্গ অতিক্রম করিয়া বায়ুপূর্ণ প্রদেশে উপনীত হইলেন। অনন্তর সূর্য্যলোক ও চন্দ্রলোক অতিক্রম করিলেন[৪১]। সূর্য্যলোকাদি অতিক্রম করিয়া ধ্রুবলোকে উপনীত হইলেন। তথা হইতে সাধ্যলোকে, তথা হইতে সিদ্ধলোকে গমন করিলেন। ঐ সকল স্বর্গলোক অতিক্রম করিয়া পরে ব্রহ্মলোকে উপনীত হইলেন। তথা হইতে তুষিত (নিত্যতৃপ্ত) দিগের বৈকুণ্ঠলোকে উপনীত হইলেন। অনন্তর গোলোক, শিবলোক, পিতৃলোক ও দূরস্থিত বিদেহ ও সদেহ দিগের লোক সকল সমুত্তীর্ণ হইলেন। লীলা একবার মাত্র উক্তরূপে দূর হইতে দূরে গমন করিয়া চকিতের ন্যায় আপনার অপরিচ্ছিন্নতা বিস্মৃত হইলেন। যেমন বিস্মৃত হইলেন, তেমনি পশ্চাৎ ভাগ অবলোকন পূর্ব্বক দেখিলেন, অধোভাগ অন্ধকারময়। তথায় চন্দ্র, সূর্য্য ও তারাদি কিছুই লক্ষিত হয় না। দিক্ সকল একার্ণবোদরের ন্যায় ও পর্ব্বতগুহার ন্যায় তমসাচ্ছন্ন রহিয়াছে[৪২।৪৩]। তাহা দেখিয়া লীলা সরস্বতী দেবীকে বলিলেন, দেবি! চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র তারকাদির তেজ (আলোক) কোথায় গেল? কোন্ অধস্তলে গেল? কেনই বা এখানে শিলাজঠরের ন্যায় নিশ্চল নিষ্পন্দ ঘোর অন্ধকার? এত ঘন অন্ধকার কোথা হইতে আসিল তাহা আমাকে বলুন[৪৭]।

সরস্বতী বলিলেন, লীলে! তুমি আকাশপথের এত দূরে আগমন করিয়াছ যে, এখান হইতে অর্কাদি তেজঃপদার্থ কিছুই দৃশ্য হয় না।

যেমন অন্ধতমসাচ্ছন্ন কূপের অধোভাগস্থিত খদ্যোত দৃষ্টিগোচর হয় না, সেইরূপ, এখান হইতে দূরোর্দ্ধগামী কর্ত্তৃক অধোভাগস্থিত সূর্য্যাদি দৃশ্য হয় না[৪৮।৪৯]।

লীলা বলিলেন, মাতঃ! ইহার উত্তরে কোন্ পথ? তাহা কি প্রকার? এবং এ পথে কোথায় ও কি প্রকারে গমন করা যায়? এই সকল আমাকে বলুন[৫০]। দেবী প্রত্যুত্তর করিলেন, ইহার উত্তরে ও অগ্রে ব্রহ্মাণ্ড পুটের উর্দ্ধ কর্পর। চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি ঐ ব্রহ্মাণ্ড কর্পরের কণিকামাত্র[৫১।৫২]।

বশিষ্ঠদেব বলিলেন, রামচন্দ্র! সেই দুই ললনা ঐরূপ কথোপকথন করিয়া সেই ব্রহ্মাণ্ড কর্পর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদের এই কার্য্য ভ্রমরীদ্বয়ের নিশ্ছিদ্র পর্ব্বত গর্ত্তে ও কুড্যে প্রবেশ করার সহিত তুলিত হইতে পারে। গগন হইতে ব্রহ্মাণ্ড কর্পর প্রবেশ করিতে তাঁহাদের অল্পমাত্রও ক্লেশ হইল না। যাহা সত্য বলিয়া নিশ্চয় থাকে তাহাই বজ্রসদৃশ দুর্ভেদ্য পর্য্যবসিত হয়। যাহা মিথ্যা বলিয়া অবধারিত থাকে তাহা ভেদ করা জ্ঞানীর পক্ষে কঠিন নহে[৫৩।৫৪]। অনন্তর সেই অনাবৃতপ্রজ্ঞা ললনাদ্বয় ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডপের পারে অবস্থিত বৃতির (বৃতি= বেষ্টন, প্রাচীর) স্বরূপ জলাদি আবরণ অবলোকন করিলেন। প্রথম আবরণ ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলের দশ গুণ ভাস্বর জলরাশি। দ্বিতীয় আবরণ তাহার দশ গুণ হুতাশন। তৃতীয় আবরণ সেই বহ্নির দশ গুণ মারুত। চতুর্থ আবরণ তদ্দশগুণ ব্যোম। এই ব্যোম অসীম অম্বরে (অবিদ্যা-সম্বলিত চিদাকাশে) পরিবেষ্টিত রহিয়াছে। হে রাঘব! এই নির্ম্মল শান্তস্বরূপ অনন্ত চিদাকাশের আদি, অন্ত বা মধ্য, কিছুই নাই। যদি উহার কোন স্থান হইতে শিলাখণ্ড তীব্রবেগে আকল্প পর্য্যন্ত অধোভাগে নিপতিত হইতে থাকে, পতগরাজ গরুড় যদি প্রবলবেগে আকল্প পর্য্যন্ত উর্দ্ধে উৎপতিত হইতে থাকেন, অথবা মারুত (বায়ু) যদি উহার অন্তরালে আকল্প পর্য্যন্ত দ্রুতবেগে প্রবাহিত হন, তাহা হইলে, উহাদের কেহই অনাদি অনন্ত চিদাকাশের সীমা প্রাপ্ত হইবে না। এই আদি, অন্ত ও মধ্য বিরহিত শুদ্ধ বোধময় অনন্ত পরমাকাশ কেবল স্বীয় মহিমায় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে[৫৫।৫৬]।

উনত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, তাঁহারা নিমেষ মধ্যে সেই ব্রহ্মাণ্ডকর্পরে পর পর দশ গুণ অধিক পৃথিবী, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম অতিক্রম করতঃ অসীম পরমাকাশ অবলোকন করিলেন। তখন দেখিতে পাইলেন, প্রাগ্বর্ণিত ব্রহ্মাণ্ডলক্ষণ জগৎ ও অন্য অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড উক্ত পরমাকাশে বিস্তৃত রহিয়াছে[১।২]। যেমন গবাক্ষরন্ধ্রে নিপতিত সূর্য্যকিরণে লক্ষ লক্ষ ত্রসরেণু ভাসিতে দেখা যায় তাহার ন্যায় জলাদি-আবরণ-বিশিষ্ট কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড উক্ত পরমাকাশে ভাসমান রহিয়াছে[৩]। সেই সকল ব্রহ্মাণ্ড মহাকাশরূপ মহাসমুদ্রের মহাশূন্য অবিদ্যারূপ বারির ক্ষুদ্র বুদ্‌বুদ্[৪]। আরও দেখিলেন, সেই সকল ব্রহ্মাণ্ডের কতক অধোভাগে, কতক ঊর্দ্ধভাগে এবং কতক তির্য্যগ্‌ভাবে গমনাগমন করিতেছে এবং কতক নিস্তব্ধ ভাবে রহিয়াছে[৫]। * বৎস রাম! ঐ অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল সেই সেই ব্রহ্মাণ্ডাভিমানী জীবের সম্বিদনুসারেই প্রস্ফুরিত হইতেছে। (সম্বিৎ = ধ্যানাদিজনিত সংস্কারে সমুজ্জলিত জ্ঞান)। যে যেরূপ কার্য্য করিয়াছিল, ধ্যান বা উপাসনা করিয়াছিল, ঐ সকল ব্রহ্মাণ্ড তাহার নিকট সেই-রূপেই অবস্থিত ও প্রতিভাত হইতেছে[৬]। যাঁহারা বস্তুদর্শী, তত্ত্বজ্ঞানী, তাঁহাদের দৃষ্টিতে ব্রহ্মাণ্ডের অধঃ ঊর্দ্ধ ও তির্য্যক্ কিছুই নাই। তাঁহারা যাহা দৃষ্টিগোচর করেন তাঁহাদের দৃষ্টিতে সে সমস্তই চিদাকাশ। সুতরাং ঐ সকল ব্রহ্মাণ্ডের কোন কিছু বাস্তব আকার নাই। ঐ সকল শূন্যপদ ব্যতিরেকে অন্য কিছু নহে। সম্বিদের স্বভাব এই যে, সে, সঙ্কল্পের দ্বারা বালকের সঙ্কল্প জালের ন্যায় চিদাকাশে বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ডের কাল্পনিক সৃষ্টি স্থিতি লয় নির্ব্বাহ করে[৭।৮]।

রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! যদি ব্রহ্মাণ্ডাধারে অধঃ ঊর্দ্ধ তির্য্যকত্ব না থাকে, তাহা হইলে কিরূপে তৎপরিকল্পিত ব্রহ্মাণ্ডে অধঃ ঊর্দ্ধা-দির দর্শন সঙ্গত হইতে পারে?[৯] বশিষ্ঠ বলিলেন বৎস! যেমন নির্ম্মল

* জ্যোতির্ব্বিদেরাও বলিয়া থাকেন, পৃথিব্যাদি ব্রহ্মাণ্ড পরস্পর পরস্পরকে নিরন্তর বেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছে।

আকাশে দূষিতদৃষ্টি নরেরা কেশোণ্ড্রক দর্শন করে, তেমনি, আদ্যন্তাদি-রহিত নির্ম্মল চিদাকাশে স্বাশ্রিত অবিদ্যাদোষে ঐ সকল সাবরণ ব্রহ্মাণ্ড দৃষ্ট হইয়া থাকে[১০]। ফলতঃ সমুদায় পদার্থ ব্রহ্মাণ্ডাধিষ্ঠাতা ঈশ্বরের ইচ্ছানুরূপে প্রধাবিত হইয়া থাকে। ঈশ্বরকল্পিত সেই সেই ব্রহ্মাণ্ডের পার্থিব ভাগই অধঃ এবং তদ্বিপরীত ভাগই ঊর্দ্ধ। কল্পিত ঊর্দ্ধাধঃ ব্যতীত বাস্তব ঊর্দ্ধাধঃ নাই। সেইজন্যই শাস্ত্রাদিতে উদাহৃত হইয়াছে যে, আকাশমধ্যগত বর্ত্তুলাকার লোষ্ট্রের পৃষ্ঠস্থিত পিপীলিকার পাদ-সংলগ্ন ভাগই অধঃ এবং তাহার বিপরীত ভাগই ঊর্দ্ধ[১১।১২]। বৎস! ঐ সকল ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে, কোন কোন ব্রহ্মাণ্ডের হৃদয়প্রদেশে অর্থাৎ মধ্যভাগে ভূতল; তাহা কেবল বৃক্ষবল্মীকাদির দ্বারা পরিব্যাপ্ত। অর্থাৎ তাহাতে মনুষ্যের বাস নাই। কিন্তু তাহার ব্যোম ভাগ সুর অসুর ও কিম্পুরুষ (কিম্পুরুষ=দেবযোনি বিশেষ) লোকে পরিব্যাপ্ত[১৩]। আবার ইহাও দেখা যায় যে, কোন কোন ব্রহ্মাণ্ড জরায়ুজাদি চতুর্ব্বিধ জীব-বর্গের সহিত, গ্রাম নগরাদির সহিত ও বৃক্ষপর্ব্বতাদির সহিত উৎপন্ন হইয়া অবস্থিতি করিতেছে[১৪]। যেমন বিন্ধ্যপর্ব্বতের কোন কোন অরণ্য-বিভাগে হস্তী জন্মে, সর্ব্বত্র নহে, তেমনি, চিদাকাশের মায়া সমন্বিত প্রদেশেই ত্রসরেণু তুল্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু ব্রহ্মাণ্ড জন্মিয়াছে, সর্ব্বাংশে নহে[১৫]। সমুদায় পদার্থ উৎপত্তিকালে উক্ত চিদাকাশেই উৎপন্ন হয়, স্থিতিকালেও তাহাতে অবস্থিতি করে এবং প্রলয়কালে আবার তাহাতেই বিলীন হয়। সুতরাং তাহাই সর্ব্বময়[১৬]। সেই শুদ্ধবোধময় পরমালোক চিদাকাশ-বারিধি হইতে অজস্র ব্রহ্মাণ্ডনামক তরঙ্গ সমূহ উৎপন্ন হইয়া আবার তাহাতেই বিলীন হইতেছে[১৭]। সেই চিদাকাশরূপ মহার্ণবের মধ্যে অনেক তরঙ্গ (ব্রহ্মাণ্ড) অব্যাকৃত আছে, (এখনও উৎপন্ন হয় নাই) সে সকল তরঙ্গ পরে উঠিবে, এবং কোন কোন তরঙ্গ (ব্রহ্মাণ্ড) সুষুপ্ত প্রায় রহিয়াছে। সে সকল তরঙ্গ তর্কণার (অনুমানের) দ্বারা বোধগম্য হইয়া থাকে[১৮]। আবার এমন সকল তরঙ্গ (ব্রহ্মাণ্ড) আছে, যাহার কল্পান্ত প্রবৃত্ত ঘর্ঘর শব্দ অদ্যাপি কেহ জানে নাই ও শুনে নাই। * অপিচ, কোথাও বা কোন কোন ব্রহ্মাণ্ডের মাত্র সৃষ্ট্যারম্ভ হইয়াছে।

* অভিপ্রায় এই যে, প্রতিক্ষণেই অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের বিনাশ হইতেছে। অন্য ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি ও স্থিতি হইতেছে। অজ্ঞ জীব তাহা জানিতেছে না।

সে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি নিতান্ত পরিশুদ্ধ। যেমন সিক্ত বীজের কোষ হইতে প্রথমে শুভ্রবর্ণ অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, তেমনি, তদ্ব্রহ্মাণ্ডস্থ ভূভাগ হইতে শুদ্ধস্বভাব জীবই উৎপন্ন হইয়া থাকে[১৯।২০]। যেমন তাপসংযোগে ঘনীভূত হিম গলিতে থাকে, তেমনি, আমাদের এই কথোপকথন সময়ে কত শত ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয়কাল উপস্থিত হওয়াতে তত্রস্থ ব্রহ্মাণ্ডের সূর্য্য, বিদ্যুৎ ও অগ্নি প্রভৃতি গলিতে আরম্ভ হইয়াছে[২১]। কতকগুলি ব্রহ্মাণ্ড আধার প্রাপ্ত না হইয়া আকল্প পর্য্যন্ত অধোভাগে নিপতিত হইতেছে এবং কতকগুলি স্তব্ধভাবে অবস্থিত রহিয়াছে। ফলতঃ এমন মনে করিও না যে, সে সকল ব্রহ্মাণ্ডের পতনাদি অসম্ভব। পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থা অনুসারে সমস্তই সুসম্ভব। যখন সমস্তই বাসনাময় সম্বিদ্, তখন, যে কোন কল্পনা, সমস্তই সুসম্ভব। যেমন বায়ুর স্পন্দন ও আকাশে কেশোণ্ড্রুক দর্শন, উক্তপ্রকার সম্বিদের উদয়ও সেইরূপ[২২।২৩]। যিনি পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত বেদশাস্ত্রানুযায়ী জ্ঞান কর্ম্মাদির অর্জ্জন দ্বারা কল্পারম্ভ কালে এতদ্ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির বিধাতা হন তাঁহার এতদ্ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির সহিত অন্য ব্রহ্মাণ্ডনাথের ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির বৈলক্ষণ্য আছে। সে বৈলক্ষণ্য শাস্ত্রসিদ্ধ। * সুতরাং সৃষ্টির ক্রম অনিয়ত[২৪]। কোন কোন ব্রহ্মাণ্ডের আদিপুরুষ পিতামহ ব্রহ্মা, কোন কোন ব্রহ্মাণ্ডের বিষ্ণু, এবং কতকগুলি ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা রুদ্র, ভৈরব, দুর্গা ও বিনায়ক প্রভৃতি। কোন কোন ব্রহ্মাণ্ড অনন্যপ্রজানাথ কর্ত্তৃক পরিপালিত এবং কোন কোন ব্রহ্মাণ্ডস্থ মৃগপক্ষ্যাদি জন্তুগণ নাথশূন্য। কোন কোন ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর বিচিত্র। (অর্থাৎ সে ব্রহ্মাণ্ডে দুই তিন ও ততোধিক পরস্পর মিলিত হইয়া ঈশ্বরত্ব নির্ব্বাহ করেন)। কোন ব্রহ্মাণ্ডে কেবল তির্য্যক্, কোন ব্রহ্মাণ্ড একার্ণব প্রায় এবং কোন ব্রহ্মাণ্ড মনুষ্যবর্জ্জিত[২৫।২৬]। কোন কোন ব্রহ্মাণ্ড শিলাবৎ নিবিড়, কতকগুলি ব্রহ্মাণ্ড কৃমিদ্বারা, কতকগুলি দেবগণদ্বারা, কতকগুলি নরগণদ্বারা, এবং কতকগুলি নিত্য নিবিড় অন্ধকারে ও অন্ধকারে বস্তুদর্শী পেচকাদি জন্তুগণে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। আবার কোন কোন ব্রহ্মাণ্ড নিত্য প্রকাশে ও প্রকাশে বস্তুদর্শী জীবে পরিপূর্ণ রহিয়াছে[২৭।২৮]। † কোন কোন ব্রহ্মাণ্ড উড়ুম্বর ফলের

---

* অর্থাৎ এক ব্রহ্মার সৃষ্টি একরূপ ও অন্য ব্রহ্মার সৃষ্টি অন্যরূপ।

† প্রকাশে বস্তুদর্শী অর্থাৎ যাহারা আলোকের দ্বারা পদার্থ দর্শন করে।

ন্যায় মশক পূর্ণ এবং কোন কোন ব্রহ্মাণ্ড অন্তঃশূন্য নিস্পন্দ জন্তুগণে পরিপূর্ণ রহিয়াছে[২৯]। তাদৃশ ও অন্যাদৃশ সৃষ্টির দ্বারা পরিপূর্ণ অন্যান্য ব্রহ্মাণ্ড এত আছে সে সকল ব্রহ্মাণ্ড যোগীদিগের কল্পনা পথেও উদিত হয় না[৩০]। যতই বলিনা কেন, সমস্তই একমাত্র মহাকাশ। স্বয়ং মহাকাশই সেই সেই ব্রহ্মাণ্ডাকারে বিস্তৃত রহিয়াছে। যদি বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতাগণ আজীবন উক্ত অসীম মহাকাশে পরিভ্রমণ করেন, তাহা হইলেও তাহার পরিমাণ নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হন না। তাদৃশ পরমাকাশস্থিত প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডই পরস্পর স্বাভাবিক ভূতাকর্ষণ শক্তিতে বিধৃত রহিয়াছে, জানিবে[৩১।৩২]।

হে মহামতে! আমি তোমার নিকট জগতের মাত্র এইটুকু বৈভব ও বৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম। পরন্তু সম্পূর্ণরূপে জগদ্বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতে আমাদিগেরও শক্তি নাই। যেমন ভীমান্ধকারে গাঢ় অরণ্য মধ্যে যক্ষগণ পরস্পর অদৃশ্যভাবে নৃত্য করে, তেমনি, অনন্ত পরমাকাশে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড পরস্পর অদৃশ্যভাবে প্রস্ফুরিত হইতেছে[৩৩।৩৪]।

ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

একত্রিংশ সর্গ

বশিষ্ঠদেব বলিলেন, সরস্বতীর অভিপ্রায়—লীলা আপনার পূর্ব্বজন্ম-সংক্রান্ত জগৎ হইতে নির্গত হউক। লীলা তদনুসারে সরস্বতীর সহিত বর্ণিতপ্রকারের অসংখ্য জগদ্বৈচিত্র্য দেখিতে দেখিতে তদন্তর্গত এক ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যস্থলস্থিত বক্ষ্যমাণ লক্ষণসম্পন্ন অন্তঃপুরমণ্ডপ দর্শন করিলেন। ইহা সেই পদ্মভূপতির অন্তঃপুরমণ্ডপ। এখানে তাঁহারা অধিক ক্ষণ থাকিলেন না, শীঘ্রই এ স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন[১]। তাঁহারা দেখিলেন, অন্তঃপুরমধ্যে নরপতি পদ্মের মহাশব পুষ্পদ্বারা সমাচ্ছাদিত ও সংস্থাপিত রহিয়াছে। রাজমহিষী লীলা সেই প্রকার সমাধি-অবলম্বন পূর্ব্বক সেই ভর্ত্তৃশবপার্শ্বে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। সেই সমস্ত শোকাকুল পরিজনবর্গ রাত্রি অধিক হওয়ায় নিদ্রায় অভিভূত রহিয়াছেন এবং সেই অন্তঃপুরমণ্ডপ ধূপ, কর্পূর, চন্দন ও কুঙ্কুমাদির সৌরভ্যে আমোদিত রহিয়াছে[২।৩]।

অতঃপর লীলা তাঁহার অন্য ভর্ত্তার সংসার দেখিবার নিমিত্ত উৎসুকা হইলেন। তদনন্তর সেই আতিবাহিকদেহা লীলা সেই অন্তঃপুরমণ্ডপের আকাশে উৎপতিতা হইলেন, হইয়া তাঁহার সেই অন্য ভর্ত্তার সঙ্কল্পরচিত সংসারে প্রবেশ করিলেন। এ বারও তাঁহারা সংসারের আবরণ ভেদ করিলেন, পূর্ব্বের স্বীয় ব্রহ্মাণ্ডকর্পরও ভেদ করিলেন, করিয়া বর্ণিত প্রকারের আবরণে বেষ্টিত অন্য এক ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডপ প্রাপ্ত হইলেন। সবেগে অথবা শীঘ্র এই ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করিয়া লীলাপতি বিদূরথের সঙ্কল্পরচিত জগৎ দেখিতে পাইলেন। যেমন সমবয়স্কা ও সমশীলা দুইটী পিপীলিকা অক্লেশে কোমল বিল্বমধ্যে অথবা যেমন দুই সিংহী মেঘপরিপূর্ণ শৈলকুহরমধ্যে অনায়াসে প্রবেশ করে, সেইরূপ, সেই দুই ব্যোমদেহা দেবী লীলানাথ বিদূরথের সঙ্কল্পরচিত জগতে অনায়াসে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা শত শত লোক, লোকান্তর, অদ্রি ও অন্তরীক্ষ অতিক্রম করতঃ সুমেরুপর্ব্বতালঙ্কৃত নববর্ষবিশিষ্ট জম্বুদ্বীপমধ্যস্থিত ভারতবর্ষে গমন করিয়া তন্মধ্যস্থিত বিদূরথের মণ্ডল প্রাপ্ত হইলেন[৪।১০]। বিদূরথের মণ্ডলে গমন করিয়া দেখিলেন, ভূপতি সিন্ধুরাজ স্বীয় সৈন্যসামন্তের

সহিত ঐ রাজ্য আক্রমণ করিয়াছেন এবং তাঁহাদিগের সমুপস্থিত অদ্ভুত সংগ্রাম অবলোকনার্থ ত্রৈলোক্যস্থ সমুদয় প্রাণী তথায় সমবেত হইয়াছেন। গগনবিহারিগণ তত্রত্য ব্যোমমণ্ডলে সমাগত হওয়াতে ব্যোমমণ্ডলও নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে[১১।১২]।

অনন্তর সেই সঙ্কল্পদেহধারিণী কামিনী দ্বয় নিঃশঙ্কচিত্তে সেই দুর্ভেদ্য নভোমণ্ডলে প্রবেশপূর্ব্বক দেখিলেন, অম্বুদমালা যেমন গগনতল সমাচ্ছন্ন করে, তাহার ন্যায় তত্রত্য গগন নভশ্চরগণে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে[১৩]। তন্মধ্যে সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব ও বিদ্যাধর গণ অবস্থান করিতেছেন। কোন স্থানে স্বর্গলোকস্থিত অপ্সরোগণ শূরগণকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইতেছেন[১৪]। কোন স্থানে রক্তমাংসভোজী রাক্ষস, ভূত ও পিশাচ গণ নৃত্য করিতেছে। কোন স্থানে বিদ্যাধরীগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতেছেন[১৫]। কোন স্থানে সমরদর্শনাভিলাষী বেতাল, যক্ষ ও কুষ্মাণ্ডগণ আয়ুধপাত আশঙ্কায় স্ব স্ব রক্ষণার্থ অদ্রিতটের আশ্রয় লইতেছে[১৬]। কোন স্থানে ভূতমণ্ডল সকল অস্ত্রপাত যোগ্য আকাশ পরিত্যাগ করিয়া দূরে পলায়ন করিতেছে। কোন কোন স্থানে পৌরুষাভিমানী অক্ষুব্ধচেতা বীরবৃন্দ যুদ্ধ দর্শনার্থ সমবেত হইয়া আমোদ প্রমোদ করিতেছেন[১৭]। কোন স্থানে ভূতগণ পরস্পর উপস্থিত ঘোর সংগ্রামের বিষয় কথোপকথন করিতেছে। কোন স্থানে বিলাসপরায়ণা চামরধারিণী সুন্দরী সকল উৎকণ্ঠিতচিত্তে অবস্থান করিতেছেন। কোন স্থানে অপ্সরোগণ লোকপাল দিগের স্তুতি করিতেছেন। কোন স্থানে মুনি ঋষি গণ স্বস্ত্যয়ন ও দেবার্চ্চনা করিতেছেন। কোন স্থানে ইন্দ্রসেনাগণ স্বর্গার্হ শূরগণকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়া অত্যুচ্চ ঐরাবতাদি বাহন বৃন্দকে অলঙ্কৃত করিতেছেন[১৮।২০]। কোন স্থানে গন্ধর্ব্ব ও চারণ গণ যুদ্ধমৃত্যুর পর স্বর্গগমনকারী শূরগণের মান বর্দ্ধনের উপকরণ আয়োজন করিতেছেন। কোন স্থানে অমরস্ত্রীগণ অপাঙ্গ ভঙ্গ কটাক্ষে সন্তুটদিগকে নিরীক্ষণ করিতেছেন[২১]। কোন স্থানে বীরগণের বাহুলতালিঙ্গন প্রার্থিনী নারীগণে সমাকীর্ণ এবং কোন স্থান শূরগণের শীতল শুভ্র যশের দ্বারা দিবাকরও চন্দ্রীকৃত হইতেছেন[২২]।

এই অবসরে রামচন্দ্র বশিষ্ঠদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! কীদৃশ যোদ্ধাকে শূর বলা যায়, কাহারাই বা স্বর্গার্হ এবং কাহারাই বা স্বর্গ-

লোকের অনুপযুক্ত, এই সকল বিষয় সংক্ষেপে আমার নিকট বর্ণন করুন[২৩]।

বশিষ্ঠদেব বলিলেন, রাম! যে সকল সত্তটগণ শাস্ত্রসম্মত আচারশীল প্রভুকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত যুদ্ধে মৃত, ক্ষীণ বা জয়ী হয়, তাহারাই শূর ও সুরপ্রাপ্য স্বর্গ লোকের উপযুক্ত[২৪]। যাহারা শাস্ত্রবিরুদ্ধাচারী প্রভুর রক্ষণার্থ স্বদেহ পণ করিয়া যুদ্ধ করে ও রণস্থলে প্রাণ পরিত্যাগ করে, তাহারা স্বর্গের একান্ত অনুপযুক্ত ও অক্ষয় নিরয় গমনের উপযুক্ত[২৫।২৬]। যাঁহারা ন্যায়ানুসারে যুদ্ধ করেন তাঁহাদিগকে ভক্তশূর বলা যায়। যাঁহারা গো, ব্রাহ্মণ, মিত্র, সাধু ও শরণাগতগণের রক্ষণার্থ যত্নসহকারে যুদ্ধ করেন, করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করেন, তাঁহারা স্বর্গের ভূষণ[২৭।২৮]। যাঁহারা স্বদেশ পরিপালনে রত থাকেন, এবং প্রভুর বা রাজার রক্ষণার্থ যুদ্ধ করেন, সেই সকল বীরেরাই বীরলোকের উপযুক্ত[২৯]। যাহারা প্রজার উপদ্রবকারী প্রভুর বা রাজার নিমিত্ত যুদ্ধ করে, তাহারা নরকগামী হয়[৩০]। ফলতঃ যোধগণ ধর্ম্মযুদ্ধে বিনষ্ট হইলেই স্বর্গে গমন করে, আর অধর্ম্ম যুদ্ধে প্রাণত্যাগী হইলে তাদৃশ যোধগণের পরলোক অতীব ভয়াবহ হইয়া থাকে[৩১।৩২]। "যোধগণ সংগ্রাম স্থলে বিনষ্ট হইলেই স্বর্গ প্রাপ্ত হন," এ কথা প্রবাদমাত্র; বস্তুতঃ যাঁহারা ধর্ম্মযুদ্ধ করিয়া মৃত হন, তাঁহারাই স্বর্গের ভূষণ ও শূর শব্দে অভিহিত হন। ইহাই শাস্ত্র বাক্যের মর্ম্ম[৩৩]। বৎস! যাঁহারা সদাচারপরায়ণ ব্যক্তিগণের রক্ষণার্থ খড়্গাধার সহ্য করেন, তাঁহারাই প্রকৃত শূর ও তাঁহারাই স্বর্গবাসের উপযুক্ত পাত্র। আর সব ডিম্বাহবহত অর্থাৎ বৃথা প্রাণ পরিত্যাগী। আমরা দেখিয়াছি, সমর সময়ে ধর্ম্মযুদ্ধকারী শূর দিগকে লক্ষ্য করিয়া সুরাঙ্গনাগণ "আমি এই মহাবল শূরপ্রধানের দয়িতা হইব," এই প্রকার আশয়ে উৎকণ্ঠিতচিত্তে শূন্যে অবস্থান করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদিগেরই নিমিত্ত বিদ্যাধরীগণ মধুরমন্থর সঙ্গীত অনুষ্ঠান করেন, এবং তাঁহাদিগেরই নিমিত্ত সুরকামিনীগণ সোৎসাহে ও ব্যগ্রতা সহকারে স্ব স্ব কবরীতে সুন্দর মন্দারমাল্য বেষ্টন করিয়া থাকেন। অপিচ, তাঁহাদিগের নিমিত্তই সুর ও সিদ্ধ গণের সুন্দর বিমানরাজি বিশ্রাণিত ও তাঁহাদিগের নিমিত্তই স্বর্গের উৎসবশোভা অধিকতর বিকসিত হইয়া থাকে[৩৪।৩৬]।

একত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

দ্বাত্রিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠদেব বলিলেন, জ্ঞপ্তিদেবীসমন্বিতা লীলা সেই শূরসমাগমোৎকণ্ঠিত নর্ত্তনশীল অপ্সরোগণে বিরাজিত নভোমণ্ডলে অবস্থান করতঃ অবনীতলস্থিত উভয় পক্ষীয় সৈন্যদল অবলোকন করিলেন[১]। দেখিলেন, একদিকে স্বীয় ভর্ত্তা বিদূরথের পরিপালিত চতুরঙ্গ সৈন্য, অপর দিকে সমুদ্রসদৃশ অক্ষুব্ধ বহুসৈন্য সোৎসাহে অবস্থান করিতেছে। বিদূরথের সৈন্যপুরমণ্ডলভাগে এবং সমাগত দ্বিতীয় সৈন্য প্রান্তর বিভাগে অবস্থিত দেখিলেন। অনন্তর উভয় সৈন্য পরস্পর অভিমুখীন হইলে উভয় দলস্থ যুদ্ধোন্মত্ত রাজদ্বয় ও সুসজ্জিত সৈন্যগণ সমরকার্য্যোদ্যোগরূপ মহাড়ম্বর দ্বারা সাড়ম্বর জলধরের ন্যায় ও উজ্জ্বল কবচাবৃত হওয়াতে সুসমিদ্ধ হুতাশনের ন্যায় শোভা ধারণ করিতেছে। তাঁহারা যুদ্ধার্থ নির্ম্মল সলিলধারার ন্যায় দিব্য নিস্ত্রিংশ (তরবার) ধারণ পূর্ব্বক পরস্পর পরস্পরের প্রহার সম্পাত লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের পরশ্বধ, প্রাস, ভিন্দিপাল, ঋষ্টি এবং মুদ্গর প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র সকল প্রদীপ্ত ও ইতস্ততঃ বিচলিত হইতে লাগিল[২।৫]। তাঁহাদিগের কনকনির্ম্মিত উজ্জ্বল বর্ম্ম হইতে দিনকর কিরণের ন্যায় ছটা বিনির্গত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে খগরাজ গরুড়ের পক্ষবিক্ষোভকম্পিত বনরাজির ন্যায় সেই ভীষণ সমরক্ষেত্র বিকম্পিত হইতে লাগিল[৬]। অনন্তর সেই উভয়দলস্থ অনিবার্য্য অসঙ্খ্য সৈন্যগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া ক্রোধভরে স্ব স্ব শরাসন উদ্যত করতঃ ভিত্তিন্যস্ত চিত্রের ন্যায় অনিমিষলোচনে পরস্পর পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে প্রবৃত্ত হইল[৭]। তৎকালে তাহাদিগের ভীষণ হুঙ্কারধ্বনিতে অন্যান্য সংলাপ সকল অশ্রুত হইয়া উঠিল[৮]।

হে রাঘব! প্রলয়কালের প্রচণ্ড বাত্যা যদি তৎকালের একার্ণবকে দ্বিধা বিভক্ত করে, তাহা হইলে যেরূপ ভীষণ দৃশ্য হয়, মধ্যে দ্বিধনুপরিমিত স্থান জনশূন্য (ফাঁক) থাকাতে সেই উভয়পক্ষীয় সৈন্যদল সেরূপ ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিল। সেই উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণ দ্বিধা বিভক্ত হইয়া স্তব্ধভাবে রাজাজ্ঞা অপেক্ষা করিতে লাগিল[৯।১০]।

তখন সেই ভীষণ সংগ্রামরূপ কার্য্যসঙ্কট উপস্থিত দেখিয়া সেই দুই রাজা ঘোরতর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। ভয়ে ভীরুগণের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল[১১]। লক্ষ লক্ষ সৈনিক প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া সংগ্রামার্থ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল। ধনুর্দ্ধরগণ শরাসন কর্ণপর্য্যন্ত আকর্ষণ করতঃ শরপরিত্যাগার্থ উন্মুখ হইয়া রহিল[১২]। অসঙ্খ্য যোধগণ প্রহার পাত লক্ষ্য করিবার নিমিত্ত নিস্পন্দভাব অবলম্বন করিলেন। অন্যান্য যোধগণ ক্রোধভরে ভ্রুকুটী বিস্তার করতঃ জনগণের দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিলেন[১৩]। তাঁহাদিগের সেই ভ্রুকুটীকুটিল মুখবিনির্গত ক্রোধাগ্নির দ্বারা দগ্ধ হইয়া ভীরু পুরুষেরা ম্লানমুখে পলায়ন করিতে সচেষ্ট হইল। রজোরাশি উত্থিত হইয়া দিগ্বিভাগ সমাচ্ছন্ন করায় যোধগণ, মাতঙ্গগণ ও অশ্বগণ ইতস্ততঃ প্রধাবিত হইতে লাগিল। অনন্তর তন্মধ্যস্থ সৈন্যগণ স্থিরচিত্তে পরস্পর পরস্পরের প্রথম প্রহার নিরীক্ষণ (কে আগে প্রহার করে তাহা লক্ষ্য) করিতে লাগিল। ক্রমে নিদ্রাক্রান্ত পুরীর ন্যায় কলরব রহিত অর্থাৎ রণস্থল নিস্তব্ধ হইল। শঙ্খধ্বনি, তূর্য্যনিনাদ ও দুন্দুভিধ্বনি আর শুনা গেল না। কেবল মেদিনী হইতে ধূলিরাশি সমুত্থিত হইয়া আকাশমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করতঃ জলধরপটলের ন্যায় শোভা বিস্তার করিতে লাগিল। কোন কোন ভীরুস্বভাব সেনা আপনার অধিপতি শূর যোদ্ধাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়নপর হইল।

ক্রমে উভয়পক্ষীয় সৈন্যদল পরস্পর মৎস্য এবং মকর ব্যূহ নির্ম্মাণ করতঃ যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, সেই সংগ্রামস্থল তিমি মকর সঙ্কুল সমুদ্রের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল[১৪।১৮]। তখন উভয় পক্ষীয় সৈন্যদলের অসঙ্খ্য পতাকা উড্ডীয়মান হইয়া নভোমণ্ডলস্থিত তারকানিকর সমাচ্ছাদিত করিল। গজারোহিগণ ঊর্দ্ধবাহু হইয়া অবস্থিতি করাতে বোধ হইল, যেন গগনান্তরাল কাননময় হইয়াছে[১৯]। পক্ষিপক্ষসুশোভিত উজ্জ্বল শরজাল হইতে প্রভাজাল বিনির্গত হইতে লাগিল এবং অসঙ্খ্য দুন্দুভি প্রভৃতি বাদিত্রসমূহের "ধমদ্‌ধমৎ" শব্দে ও বহুতর শঙ্খাদির গম্ভীর নিনাদে গগনান্তর ধ্বনিত হইয়া উঠিল[২০]।

ঐ অবসরে একপক্ষীয় সৈন্যগণ চক্রব্যূহে ব্যূহিত হইয়া বিপক্ষ পক্ষীয় যোধ দিগকে আক্রমণ করিলে, সেই আক্রান্ত যোধগণ দুর্বৃত্ত

দানবাক্রান্ত সুরগণের অনুরূপ দৃশ্যে দৃষ্ট হইতে লাগিল। এই সময়ে তাহারা গরুড়ব্যূহ নির্ম্মাণ করতঃ মাতঙ্গগণকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলে, তদ্‌বিপক্ষগণ শ্যেনব্যূহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক সেই ব্যূহাগ্র ভেদ করিয়া চীৎকার ধ্বনি করিতে লাগিল। এই সময়ে অসঙ্খ্য যোধগণের বাহ্বাস্ফোট দ্বারা ভূরি ভূরি সৈন্য সমরক্ষেত্রে পতিত হইয়াছিল[২১।২২]।

ঐরূপে উভয়পক্ষীয় যোধগণ পুনঃ পুনঃ ব্যূহিত হওয়াতে রণস্থলে ভীষণ কোলাহল সমুত্থিত হইল। সৈন্যগণের কৃষ্ণবর্ণ অস্ত্রশস্ত্রসমূহ হইতে সমুত্থিত কৃষ্ণবর্ণ কিরণজাল নীলমেঘের ন্যায় হইয়া দিবাকরপ্রকাশ সমাচ্ছাদিত করিল। বাতসমাহত তৃণ হইতে যেরূপ শন্ শন্ শব্দ সমুত্থিত হয়, সেইরূপ, এই সমর ভূমি হইতে শর সমূহের শন্ শন্ শব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল[২৩।২৪]। কল্পান্তকালের পুষ্কর ও আবর্ত্তক নামক জলধর দ্বয়ের ন্যায়, মহামেরুর সদ্যশ্ছিন্ন পক্ষদ্বয়ের ন্যায়, পাতালকুহরস্থিত অক্ষুব্ধ অন্ধকারের ন্যায়, সেই সৈন্যদলদ্বয় প্রলয়কালীন বাতবিক্ষুব্ধ মহার্ণবের ন্যায়, মারুত নির্দ্ধূত (কম্পিত) ক্ষুদ্র কজ্জলশৈলের ন্যায় নিতান্ত বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল ও যোদ্ধৃগণের কুন্ত, মুষল, অসি ও পরশ্বধ প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র সমুদয়ের কিরণরূপ সলিলরাশির দ্বারা সেই সমরক্ষেত্র একার্ণবের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল[২৫।২৮]।

দ্বাত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ।

রাম বলিলেন, ভগবন্! শ্রোতৃগণের শ্রুতিসুখাবহ এই যুদ্ধের বৃত্তান্ত আমার নিকট সংক্ষেপে বর্ণন করুন[১]। বশিষ্ঠ বলিলেন, রঘুপতে! শ্রবণ কর। অনন্তর সেই লীলা ও সরস্বতী তথায় সাঙ্কল্পিক বিচিত্র বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক স্থিরভাবে অবস্থিতি করতঃ সেই অদ্ভুত সংগ্রাম অবলোকন করিতে লাগিলেন[২]। তাঁহারা দেখিলেন, উভয়-পক্ষীয় যোধগণ পরস্পর পরস্পরের অভিমুখীন হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে লীলানাথের বিপক্ষপক্ষীয় একদল সেনা ক্রোধভরে স্বীয় সৈন্য হইতে প্রলয়কালীন অর্ণবকল্লোলের ন্যায় প্রবলবেগে বিনির্গত হইয়া লীলাপতি বিদূরথের অভিমুখে আগমন করিল। পরন্তু তাহারা সম্মুখ-সংগ্রামে অসমর্থ হইয়া দূর হইতে যোধগণের বক্ষঃস্থলে শিলা ও মুদ্গর বর্ষণ করিতে লাগিল[৩।৪]। তখন উভয় পক্ষীয় যোধগণ ক্রোধপ্রজ্জ্ব-লিত হইয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি কল্পান্তকালীন বারিধিতরঙ্গের ন্যায় আপতিত হইল ও পরস্পর পরস্পরের প্রতি প্রবলবেগে অস্ত্রা-ঘাত করিতে প্রবৃত্ত হইল। তাহাদিগের হুতাশন সদৃশ সমুজ্জ্বল অস্ত্র শস্ত্র হইতে বিদ্যুৎসদৃশ ছটা ও স্ফুলিঙ্গ বিনির্গত হইতে লাগিল। অসংখ্য নিক্ষিপ্ত অস্ত্র সমূহের তরল ধারাগ্রভাগ দ্বারা নভোমণ্ডল যেন রেখা-ঙ্কিত হইল। এই সময়ে শরনিকরের কল কল ধ্বনির দ্বারা চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত ও যোধগণের ঘোর হুহুঙ্কার দ্বারা বর্ষাকালীন জলধর-মণ্ডলের ভীষণ গম্ভীর নিনাদ পরাজিত হইয়াছিল। তাহারা অসঙ্খ্য শরবর্ষণ করতঃ দিবাকর-কিরণকেও সমাচ্ছাদিত করিয়াছিল[৫।৭]। খড়্গ প্রহারে যোধগণের বর্ম্ম হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিনির্গত হইতে লাগিল, সুমুজ্জ্বল খড়্গ সকল নভোমণ্ডলে বিঘূর্ণিত হওয়ায় বোধ হইতে লাগিল, যেন শত শত ব্যোমচর পক্ষী আকাশমার্গে পরস্পর সংলগ্ন হইয়া ভ্রমণ করিতেছে[৮]। তাহাদিগের বাহু সমূহ সঞ্চালিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল, যেন নভস্থলে বনরাজি সঞ্চালিত হইতেছে। ধনুর্যোদ্ধা ধনুক সকল চক্রাকারে বিঘূর্ণিত করিতে লাগিল, তদ্দর্শনে খেচরপ্রাণী পলা-

য়ন আরম্ভ করিল[৯]। সৈন্যগণের এমন ভীষণ কোলাহল উঠিল যে, চতুর্দ্দিকে কেবল অবিচ্ছিন্ন ঘোর মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় গর্জ্জন শ্রুত হইতে লাগিল। যেমন সমাধিকালে কোনপ্রকার বাহিক শব্দ শুনা যায় না, সেইরূপ, এই সংগ্রামে মেঘগর্জ্জনানুরূপ নিবিড় কোলাহল ধ্বনি ব্যতীত অন্য কোন শব্দ শ্রবণ গোচর হইল না[১০]। নারাচের আঘাতে শত শত শূর ছিন্নমস্তক ও ছিন্নবাহু হইয়া নিপতিত হইল। অঙ্গে অঙ্গে সঙ্ঘট্টিত হওয়াতে তাহাদিগের বর্ম্মসম্ভূত রণ রণ ধ্বনি সেই সংগ্রামস্থল ভীষণ করিয়া তুলিল[১১]। মধ্যে মধ্যে ঘোর হুহুঙ্কার ধ্বনি উত্থিত হইয়া অস্ত্রটঙ্কার ধ্বনি অভিভূত করিতে লাগিল। তরঙ্গশ্রেণীর সদৃশ অসঙ্খ্য শস্ত্রশ্রেণী নভোমণ্ডলে জলদমণ্ডলের ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিল। ঐ সমস্ত শস্ত্রের তরলধারাগ্রভাগ প্রদীপ্ত থাকায় বোধ হইতে লাগিল, দিক্ সকল যেন ভয়ানক দন্তুর (বিকটদন্ত) হইয়াছে[১২]। শত্রুদমনোদ্যত যোধগণের মুষ্টিগ্রাহ হইতে অসি সঙ্ঘট্টনের "ঝন্ ঝন্" শব্দ বাহ্বাস্ফোটনের চটচটা ধ্বনির সহিত মিশিয়া রণস্থল ভৈরবাকার করিয়া তুলিল[১৩]। কোশ হইতে খড়্গানিষ্কাশন সময়ে শীৎকার সহকৃত কন কন ধ্বনির সহিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সকল বিনির্গত হইতে লাগিল এবং হননকারী যোধগণের শরনিকরের শস্ত্রের সন্ সন্ ধ্বনির সহিত অস্ত্রাঘাত-হত প্রাণিগণের ছিন্নকণ্ঠ হইতে শোণিত বিনির্গমের ধকৎ ধকৎ শব্দ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। অনবরত রণনিহত যোধগণের ছিন্ন শির ও ছিন্ন বাহু ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল এবং নিরন্তর অসিখণ্ড সমূহ সঞ্চালিত হওয়াতে গগনমণ্ডল বিদ্যুৎসমাচ্ছন্নের ন্যায় দেখা যাইতে লাগিল। তখন আয়ুধবর্ষণ দ্বারা সেই সমস্ত যোধগণের বর্ম্ম হইতে অগ্নিজ্বালা বিনির্গত হইয়া তাহাদিগের শিরোরুহ স্পর্শ করিতে লাগিল। রণোৎসাহী প্রফুল্লদেহী অসিধারী শূরগণের খড়্গ সমূহ হইতে "ঝন্ ঝন্" শব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল, কুন্তাহত মাতঙ্গ সমূহের শোণিত তরঙ্গ-মালা সহকারে প্রবাহিত হইতে লাগিল, দন্তিগণ পরস্পর দন্ত বিনি-স্পেষিত করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল[১৪।১৭]। যোধগণ মহামুষল প্রহারের দ্বারা বিনিষ্পিষ্ট হওয়াতে সেই সকল বীরের কাতর রব শ্রুত হইতে লাগিল, শূরগণের শিরোরুহরূপ কমলসমূহ দ্বারা নভোমণ্ডল আচ্ছাদিত হইল[১৮]। সৈন্যগণের ব্যোমন্যস্ত ভূজসমূহ অহীন্দ্রের ন্যায়

দেখাইতে লাগিল, ঊর্দ্ধে ধূলিরাশি সমুত্থিত হওয়ায় তাহা মেঘমণ্ডলের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল, অস্ত্র সকল ছিন্ন হওয়ায় উপায়ান্তর না দেখিয়া বৈরনির্যাতনার্থ পরস্পর পরস্পরের কেশাকর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল[১৯]। অসংখ্য যোদ্ধা পরস্পর পরস্পরের নখর প্রহারে ছিন্নাক্ষি, ছিন্নকর্ণ, ছিন্ননাসিক ও ছিন্নস্কন্ধ হইতে লাগিল, ছিন্নধনু যোদ্ধারা পরস্পর পরস্পরকে তিরস্কার করতঃ ক্রীড়াসহকারে বাহুযুদ্ধ করিতে লাগিল[২০]। সমরহত মত্ত মাতঙ্গগণ সবেগে নিপতিত হওয়াতে পৃথ্বীতল বিকম্পিত হইতে লাগিল, রথবেগবিনষ্ট অসংখ্য সমরোন্মত্ত সৈন্যের শোণিত ক্ষরিত হইয়া নদীর ন্যায় প্রবাহে প্রবাহিত হইতে লাগিল[২১]। সেই ক্ষুভিত সৈন্য-সমুদ্র প্রলয় জলধরের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিল[২২]। এই রণব্যাপার দেখিবা মাত্র বোধ হয়, মৃত্যু যেন সেই রণস্থলে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া বিকট হাস্য করতঃ যোধগণকে আপন করাল কবলে নিক্ষেপ করিতেছেন। তখন সুমেরুসদৃশ বৃহৎকায় গর্ব্বিত করীন্দ্রগণের (উচ্চ হস্তীর) গর্জ্জনে জলদগর্জ্জন খর্ব্বিত, শূরগণের যন্ত্রনিক্ষিপ্ত পাষাণ ও চক্র প্রভৃতি বিবিধ-শস্ত্র দ্বারা পক্ষিগণ দূরে বিদ্রুত, মরণোন্মুখ যোধগণের ক্রন্দনের কাতর শব্দ সমুত্থিত ও কুঠার সমুদায়ের আঘাতে সৈন্যগণের মস্তক বিদলিত হইতে দেখা গেল[২৩।২৬]। অসংখ্য খড়্গ আকাশমণ্ডলে সমুত্থিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল, যেন গগনমণ্ডল তারকাময় হইয়াছে। আরও দেখা গেল, যোধগণের নির্ম্মুক্ত শক্তিসমূহ পরস্পর আহত হইয়া ছিন্ন হওয়াতে তন্নির্গত প্রভা অবনীমণ্ডল আলোকময় করিতেছে[২৭]। শূরগণ কর্ত্তৃক গগনমণ্ডলে প্রেরিত বৃহতকায় তোমর শ্রেণী তোরণ মালার শোভা বিস্তার করিল এবং গগনমার্গে ভুষণ্ডি সকল ও খড়্গ সমূহ দ্বিত্রিখণ্ডে খণ্ডিত হইতে লাগিল। এই সকল ভগ্ন ও খণ্ডিত ভুষণ্ডি ও খড়্গ ব্যোমকুন্তলের (ব্যোমকুন্তল=ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেঘ খণ্ড) ন্যায় দেখা যাইতে লাগিল। কুন্ত-সমূহ গগনমণ্ডলে সমুত্থিত হইয়া বেণুবনলগ্ন দাবাগ্নির ন্যায় প্রতিভাত হইতে লাগিল[২৮।২৯]। প্রধান প্রধান সৈনিকগণ পরস্পর খড়্গ ও ঋষ্টি প্রভৃতি শস্ত্রের বর্ষণে সমাচ্ছন্ন হইল, অপ্সরাগণ শক্তি উদ্যমনকারী স্বর্গার্হ শূরগণকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত উৎসুক হইতে লাগিল[৩০]। কেয়ূর প্রভায় দিঙ্মণ্ডল বিকাশকারী ভটগণের বদনকমল সকল গদাঘাত দ্বারা তুষার বিগলিত (বিশীর্ণ) কমলের ন্যায় বিগলিত হইতে লাগিল, শত

শত যোদ্ধা প্রাসাস্ত্রের বেগে সংপিষ্ট হইল, চক্র ও ক্রকচ (করাৎ) প্রভৃতি অস্ত্রের দ্বারা অশ্ব, নর ও বারণ সমূহ ছিন্ন ভিন্ন হইল, মত্ত-মাতঙ্গগণ পরশুর আঘাতে ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল[৩১।৩২]। বহুসংখ্যক সৈন্য পরস্পর যষ্টি ধারণ পূর্ব্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। যন্ত্র-বিনির্ম্মুক্ত পাষাণনিচয়ের বর্ষণে অসঙ্খ্য রথ ও ধ্বজ নিষ্পেষিত হইল, করবাল প্রহারে বিচ্ছিন্ন হইয়া লক্ষ লক্ষ সৈন্যগণের শিরঃপঙ্কজ (মস্তক রূপ পদ্ম) পাণ্ডুরবর্ণ হইল, পাশবিশারদ বীরগণ পরস্পর সন্নিহিত হইয়া পরিদেবনা সহকারে যুদ্ধ করিতে লাগিল, অনেক যোদ্ধা ক্ষুরিকাস্ত্রের দ্বারা নির্ভিন্নকুক্ষি ও গলিতহৃদয় হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল, ছিন্নমস্তক যোধগণ ত্রিশূল হস্তে নৃত্য করিতে করিতে শত্রু আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইল, এই সময়ে টঙ্কারকারী ধানুষ্কগণ (ধনুর্ধারীবৃন্দ) ভিন্দিপালরূপ কেশর সমুচ্ছ্রিত ও সগর্ব্ব হুঙ্কাররূপ ভীষণ সিংহনিনাদ করতঃ নৃসিংহবেশধারী নটের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। অসঙ্খ্য যোদ্ধা মল্ল-গণের বজ্রমুষ্টি প্রহারে নিষ্পিষ্ট হইয়া সমরশায়ী হইলেন। অসঙ্খ্য তীব্র-গামী সুতীক্ষ্ণ পট্টিশ সমূহ শ্যেনপক্ষীর ন্যায় নভোমার্গে উৎপতিত হইতে লাগিল। অঙ্কুশাকৃষ্ট শূরগণ পরস্পর রথ, হস্তী, অশ্ব ও ধ্বজ বিহীন হইয়া হস্তযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে তাহারা পরস্পর হতাহত হইতে লাগিল। তাহাদের বলবেগে কুলাচল সকল কম্পিত ও আকুলিত হইতে লাগিল। উন্নত পুরুষগণ সুতীক্ষ্ণ কুদ্দালদ্বারা রণভূমি নিখাতিত করিতে লাগিল। শরাসননির্ম্মুক্ত শরনিকর প্রতিপক্ষীয় যোধগণনিক্ষিপ্ত শিলাসকল ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিল এবং শাণিত ক্রকচ সমূহের উভয় পার্শ্ব দ্বারা মত্ত মাতঙ্গগণ ছিন্ন ভিন্ন হইতে লাগিল। সুদক্ষ যোধগণ এই সংগ্রামরূপ উলূখলে রাশি রাশি সৈন্যরূপ তণ্ডুল চূর্ণ বিচূর্ণ করিলেন[৩৩।৪২]। ধূর্ত্ত ব্যাধগণ যেমন জাল দ্বারা শকুন্ত ধৃত করে, সেইরূপ, প্রধান প্রধান বীরেরা বিপক্ষীয় দিগের সৈন্যরূপ বিহঙ্গম দিগকে নিস্ত্রিংশরূপ শৃঙ্খলজালে নিবদ্ধ করিয়া স্বশিবিরে আনয়ন করিতে লাগিলেন। ব্যাঘ্র যেমন পশু দিগকে খরতর নখরাঘাতে বিদীর্ণ করে, সেইরূপ, তীব্র বেগশালী বীর-বিঘাতী শূরেরা বিপক্ষীয় দিগের সৈন্যপশু দিগকে বিদীর্ণ করিলেন[৪৩।৪৫]। যোধগণের নিক্ষিপ্ত কুন্তাগ্নির প্রভাবে (পূর্ব্বকালের কুন্তাগ্নি এক্ষণে বারুদ নামে প্রসিদ্ধ) মৃত যোধগণের হস্ত হইতে অস্ত্র সকল স্খলিত হইয়া

মহাশব্দে নিপতিত হওয়াতে অন্যান্য শব্দ তিরোহিত হইল এবং তদাশ্রিত তপ্তাঙ্গার দ্বারা চাপ সকল দগ্ধ ও আয়ুধ সকল স্খলিত ও সৈন্যগণের নেত্র সমুদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। এই অবসরে জলদরূপ সৈন্যগণ বিষরূপ বারি বর্ষণ করতঃ যোধগণকে বিদলিত করিতে আরম্ভ করিল এবং কবন্ধরূপ ময়ূরগণ সেই সমস্ত উন্মত্ত বীররূপ মত্ত মেঘ দর্শন করতঃ সমরাঙ্গনে নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হইল। এই ভীষণ সংগ্রাম, যেন কল্পান্তকালীন মহাবেগের ন্যায় বেগে ভ্রমণশীল মাতঙ্গরূপ শৈলগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া ভ্রমণ করিতে লাগিল৪৬।৪৭।

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

চতুস্ত্রিংশ সর্গ।

মুনিরাজ বশিষ্ঠ বলিলেন, অনন্তর সেই রণস্থলে যুযুৎসু রাজগণের, বীরগণের, মন্ত্রিগণের ও নভোমণ্ডলস্থিত সমরদর্শক নভশ্চরগণের বক্ষ্যমাণ-প্রকার বচনপরম্পরা (পরস্পর বলাবলি) সমুত্থিত হইতে লাগিল[১]।

দেবগন্ধর্ব্বাদিগণ বলিতে লাগিলেন, ঐ দেখ, চঞ্চল বিহগের ন্যায় অবিরত নিপতিত শূরমস্তকের দ্বারা গগনতল তারকীকৃত হইল। ঐ দেখ, ধরণীতল কমলসঙ্কুল সরোবরের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে[২]। ও দিকে দেখ, বীরগণের রুধিরকণবাহী মারুত সিন্দূরের ন্যায় অরুণবর্ণ হইয়াছে। দেখ দেখ, এই মধ্যাহ্ন কালেও দিগ্বিভাগ আজ্ সায়ংকালীন প্রভাকরপ্রভায় অরুণবর্ণ মেঘমণ্ডলাচিত (ব্যাপ্ত) বলিয়া ভ্রম জন্মিতেছে[৩]।

কোন পুরুষ শূরগণের নিক্ষিপ্ত অসঙ্খ্য লোহিতবর্ণ শরনিকর দূর হইতে অবলোকন করিয়া ভ্রম বশতঃ কোন প্রধান পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিল, ভগবন্! গগনমণ্ডল কি পলালরাশির দ্বারা ভরিত হইয়াছে? তিনি উত্তর করিলেন, অহে! উহা পলালরাশি নহে; উহা বীরগণের শর-নিকরাচ্ছাদিত অম্বুদমণ্ডল[৪]।

নভশ্চরগণ বীরগণকে সম্বোধন করতঃ বলিতে লাগিলেন, অহে বীরগণ! তোমাদিগের ভয় নাই। তোমরা পরস্পর উৎসাহ সহকারে যুদ্ধ কর। ভূতলে বীরগণের রুধিরধারার দ্বারা রণস্থলস্থিত যে পরিমাণ রেণু সিক্ত হয়, ধর্ম্মযুদ্ধে প্রাণপরিত্যাগকারী বীরেরা সেই পরিমিত অষ্ট সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত স্বর্গে অবস্থিতি করেন[৫]। অহে বীরগণ! ঐ যে নীলোৎপলদলসঙ্কাশ নিস্ত্রিংশ, উহা নিস্ত্রিংশ নহে। উহা কেবল বীরাবলোকিনী স্বর্গলক্ষ্মীর নয়নবিভ্রম[৬]। অথবা কুসুমধন্বা ঐ সমস্তের-দ্বারা বীরালিঙ্গনলোলা (যাহারা বীর দিগকে আলিঙ্গন দান করিবার জন্য চঞ্চলা, তাহারা) সুরযোষিৎগণের কটিতটস্থ মেখলা (চন্দ্রহার) শিথিল করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে[৭]। হে বীরগণ! তোমরা স্বর্গারোহণ করিবে, সেই প্রত্যাশায় আনন্দিত হইয়া দেবতাগণ নন্দনকাননে ভুজলতা ও কর-পল্লবসম্পন্ন উন্নত নয়নরূপসুরভিশালী মঞ্জরীর কটাক্ষবিক্ষেপাদি সহকৃত দৃষ্টি-

বিলাস প্রদর্শন করতঃ তাল ও সঙ্গীত যোগে সানন্দ নৃত্য করিতেছেন[৮।৯]।

সৈন্যগণের মধ্যে বক্ষ্যমাণ প্রকার বচনপরম্পরা সমুত্থিত (বলাবলি আরব্ধ) হইতে লাগিল। ঐ দেখ, সেনাপতিরূপ বনিতাগণ কঠোর কুঠাররূপ কটাক্ষবিক্ষেপ দ্বারা প্রতিযোধরূপ দয়িতগণের মর্ম্মভেদ করিতেছেন[১০]। একি! হায় হায়! ভীষণ ভল্লাস্ত্রের দ্বারা আমার পিতার সমুজ্জ্বল কুণ্ডলশোভিত মস্তক ছিন্ন হইল। উঃ! কালের কি দুঃস্বভাব! কালই গ্রহণকালে রাহুকে সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী করে[১১]। হায় হায়! এই বীর যমের ন্যায় দক্ষিণ দিক্ হইতে সমাগত হইয়া লম্বমান ও দৃঢ় শৃঙ্খলসংলগ্ন উপলখণ্ড চিত্রদণ্ডনামক চক্রযন্ত্রে বিঘূর্ণিত ও বিক্ষিপ্ত করতঃ সমস্ত সেনা সংহারে প্রবৃত্ত হইয়াছে। আইস, আমরা যথাগত স্থানে পলায়ন করি[১২।১৩]। ঐ দেখ, রণচত্বরে অসংখ্য ছিন্নশির কবন্ধ তালে তালে উন্মত্তের ন্যায় নৃত্য করিতেছে। ঐ শুন, ও দিকে দেবগণের মধ্যে কিরূপ কথোপকথন হইতেছে। উহাঁরা বলাবলি করিতেছেন "কোন্ বীর কবে কিরূপে কোন্ লোকে গমন করিবেন"[১৪।১৫]। ঐ দেখ, এ দিকে আবার সৈন্যগণ মৎস্য ব্যূহে ও মকরব্যূহে ব্যূহিত হইয়া মৎস্যমকরসঙ্কুল সাগর প্রস্রবণের ন্যায় প্রধাবিত হইতেছে। হায় হায়! সাগর যদ্রূপ নদীসমূহকে গ্রাস করে, তদ্রূপ, সমাগত এই সকল সৈনা অত্রস্থ সেনা সমূহকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। এই সমস্ত যোদ্ধা অতি বিষম[১৬]। ইহাদিগের নারাচ বর্ষণ করিকুম্ভ সকল সমাচ্ছন্ন করিয়া বারিধারা-সমাচ্ছন্ন শৈলশৃঙ্গের ন্যায় সুশোভিত করিতেছে[১৭]। ঐ দেখ, অসংখ্য যোধগণ বিপক্ষীয় কুন্তাস্ত্রে ছিন্নমস্তক হইয়া "হায়! কুন্তাস্ত্রে আমার মস্তক ছিন্ন হইয়াছে" এইরূপ কহিতে কহিতে আকাশপথে স্বর্গে গমন করতঃ তত্রস্থ উৎসব সন্দর্শনে আনন্দিত হইয়া বলাবলি করিতেছে "আ!! আমি মস্তক দ্বারা জীবিত হইলাম, মৃত হই নাই[১৮]" যদ্রূপ গগনে পক্ষিশিঞ্জিত শ্রুত হয়, তদ্রূপ, যুদ্ধমৃত যোধগণের স্বর্গগমনোৎসব কথা ঐরূপে শ্রুত হইতে লাগিল।

ঐ শুন, এ দিকে সৈন্যগণ কিরূপ আক্রোশ বাক্য বলিতেছে। বলিতেছে, যাহারা আমাদের উপর যন্ত্রপাষাণ বর্ষণ করিতেছে তাহাদিগকে ঘেরাও কর[১৯]।

যে সকল বীরপত্নী পূর্ব্বে মৃতা হইয়া অপ্সরা হইয়া জন্মিয়াছিলেন,

তাঁহারা আজ্ যুদ্ধমৃত স্বীয় ভর্ত্তাকে দেবতা জানিয়া পুনর্ব্বার গ্রহণ করিতেছেন[২০]। ঐ দেখ, আজ্ যোধগণ কর্ত্তৃক কুন্তাস্ত্রের শ্রেণী কেমন অদ্ভুত রচনায় স্বর্গ পর্য্যন্ত রচিত হইয়াছে। বোধ হইতেছে, উহা যেন বীরগণের স্বর্গারোহণের সোপান (সিঁড়ি)[২১]। যে সকল বীরনারী ইতিপূর্ব্বে কাঞ্চনবিভূষিত কমনীয় কান্তবক্ষে সমাশ্লিষ্টা ও রোরুদ্যমানা দৃষ্টা হইয়াছিলেন, সেই সকল বীরপত্নীরা এক্ষণে দেবপুরন্ধ্রী হইয়া ভর্ত্তার অন্বেষণ করিতেছেন[২২]।

সেনাপতিগণ বলাবলি করিতে লাগিলেন, হায় হায়! যেমন মহাপ্রলয় কল্লোল সহকারে সুমেরু শৈল বিদীর্ণ করে, তেমনি, বিপক্ষগণ আজ্ উদ্ধত মুষ্টির দ্বারা অস্মৎপক্ষীয় যোধগণকে বিনষ্ট করিতেছে[২৩]। অরে মূঢ় সৈন্যগণ! তোমরা পুরোবর্ত্তী হইয়া যুদ্ধ কর, পাদপ্রহারে অর্দ্ধমৃত দিগকে উৎসারিত কর, স্বপক্ষীয় দিগকে বিদীর্ণ করিও না[২৪]। ঐ দেখ, সমরমৃত বীরগণ দিব্যশরীরে কবরীরচনব্যগ্রা অপ্সরাগণের পার্শ্বপ্রাপ্ত হইতেছেন[২৫]।

স্বর্গীয় অপ্সরোগণ বলিতেছেন, ইহাকে এই প্রফুল্লহেমকমলসুশোভিত, দীর্ঘায়ত, শীতলসমীরণসম্পন্ন ও ছায়াবিশিষ্ট সুরধুনীর তটে বিশ্রাম করাও[২৬]। ঐ দেখ, নভোমণ্ডলে বীরগণের অস্থিসমূহ আয়ুধ দ্বারা বিখণ্ডিত হইয়া কণৎ কণৎ শব্দে তারকার ন্যায় ইতস্ততঃ প্রসৃত হইতেছে[২৭]। ঐ দেখ, আকাশে কেমন অদ্ভুত সায়কবারিসঙ্কুলা (সায়ক বাণ। তদ্রূপ বারি) জীববাহিনী নদী প্রবাহিত হইতেছে। স্তূপীভূত রণরেণু ঐ নদীর পঙ্ক এবং উহাতে বীর ও ভূভৃৎ (রাজা) গণের মস্তকনিকররূপ কমলরাজি কেমন অপূর্ব্বশোভা বিস্তার করিতেছে। উহা বাতবিচলিত, পদ্মরাজিবিরাজিত সরোবরের ন্যায় শোভা বিতরণ করতঃ গ্রহমার্গে প্রবাহিত হইতেছে। আয়ুধাংশু অর্থাৎ অস্ত্রশস্ত্রের কিরণ বা ছটা ঐ পদ্মের মৃণাল, অসি উহার দল; শূল ও কুন্তাদি অস্ত্র উহার কণ্টক, কেতুপট্ট অর্থাৎ পতাকা সমূহ উহার পট্ট (মৃণালের আবরণত্বক্ উপরের ছাল), শিলীমুখ উহার ভ্রমর। আহা! নভোমণ্ডল যেন আজ্ অপূর্ব্ব পদ্মসরোবর[২৮,৩০]। এ দিকে দেখ, ভীরু মানবেরা রণাঙ্গনে মৃতমাতঙ্গের অন্তরালে পর্ব্বতান্তরালে পিপীলিকার ন্যায় ও পতিবক্ষে পত্নীর ন্যায় লুক্কায়িত হইতেছে[৩১]। ঐ দেখ, বিদ্যাধরীগণের

কান্তসমাগমসূচক অলকোল্লাসী মৃদুমন্দ সমীরণ প্রবাহিত হইতেছে[৩২]। ঐ দেখ, বীরগণের ছত্রসমূহ চন্দ্রমার ন্যায় নভোমণ্ডলে অবস্থান করতঃ পৃথিবীর আতপত্রস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে ও ভূমণ্ডলে কিরণরূপ শুভ্র যশশ্ছায়া বিস্তার করিতেছে[৩৩]। বীরগণ মরণমূর্চ্ছা অনুভব করিয়া নিমেষমধ্যে স্বপ্নরচিত পুরীর ন্যায় স্বকর্ম্মরূপ শিল্পীর রচিত অমরবপু প্রাপ্ত হইতেছেন[৩৪]। ব্যোমরূপ সমুদ্রে শূল, শক্তি, ঋষ্টি এবং চক্র প্রভৃতি আয়ুধ সকল সচঞ্চল মৎস্য মকর প্রভৃতির অনুকার করিতেছে[৩৫]। বাণচ্ছিন্ন শুক্লবর্ণ রাজছত্র সকল হংসরাজির ন্যায় ও অসংখ্য পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সুশোভিত হইতেছে[৩৬]। গগন মণ্ডলে সমুড্ডীন চামরনিকর বাতাহত চঞ্চল তরঙ্গের শোভা বিতরণ করিতেছে[৩৭]। বীরগণের ছত্র, চামর এবং কেতু সকল বিদলিত হইয়া আকাশমণ্ডলে অবস্থিতি করিয়া বীরগণের যশোবর্দ্ধন করিতেছে[৩৮]। ঐ দেখ, যেমন পতঙ্গপাল (পঙ্গপাল) ক্ষেত্রস্থ শস্য ভক্ষণ করে, তেমনি, আকাশমণ্ডলে উৎপতনশীল শরসমূহ শক্তি সকল ক্ষয় করিতেছে[৩৯]। ঐ শুন, প্রতাপান্বিত ভটগণের খড়্গ সমুদায় যোধগণের কঠিন বর্ম্মে আহত হওয়াতে তাহা হইতে উগ্র ধ্বনি সমুত্থিত হইতেছে[৪০]। ঐ দেখ, যদ্রূপ প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে কল্পানিল দ্বারা নির্ঝরশালী পর্ব্বত সকল ক্ষয় প্রাপ্ত হয় তদ্রূপ এই জনক্ষয়কর যুদ্ধে বীরগণের শরজালে দন্তবিশিষ্ট পর্ব্বতাকার মাতঙ্গগণ বিনষ্ট হইতেছে। ঐ দেখ, রক্তমহাহ্রদে নিমগ্ন দুঃখাভিভূত মন্দগতি যোধগণ হাহাকার করতঃ চক্রী রথী ও সারথী দিগকে ও অশ্ববিশিষ্ট সজ্জিত রথ সকল অন্বেষণ করিতেছে[৪১।৪২]। ঐ দেখ, বীরগণ বীরগণের কবচে (বর্ম্মে) কালরাত্রিকম্প ভীষণ খড়্গাসঙ্ঘট্ট (খড়্গাপ্রহার) উদ্ভাবন করতঃ বীণাবাদ্যের অনুকার করতঃ যেন নৃত্য করিতেছেন[৪৩]। ঐ দেখ, ও দিকে নর, খর, ও অশ্বগণ হইতে বিনিঃসৃত রক্তনির্ঝরের শীকর বহনকারী সমীরণ দিঙ্মণ্ডল অরুণিত করিয়াছে। ঐ দেখ, যেমন মেঘে বিদ্যুৎ, তেমনি, চিকুরসম শ্যামবর্ণ ব্যোমতলে যোধগণের শস্ত্রকিরণ ক্রীড়া করিতেছে[৪৪।৪৫]। ঐ দেখ, ভুবনমণ্ডল রক্তসংসিক্ত আয়ুধ দ্বারা অগ্নিব্যাপ্ত মানবের ন্যায় আকুলিত হইয়াছে[৪৬]। ঐ দেখ, বীরগণ শত্রু কর্ত্তৃক ছিন্ন হওয়াতে তাহাদিগের হস্ত হইতে ভুষণ্ডী, শক্তি, শূল, অসি, মুষল এবং প্রাস

প্রভৃতি শস্ত্র সমূহ স্খলিত হইয়া পড়িতেছে[৪৭]। ঐ দেখ, অবিরত প্রহার নিবন্ধন অস্ত্র সমূহের ঝন্ ঝন্ শব্দ সমুত্থিত হওয়াতে বোধ হইতেছে, ঐ প্রহার সকল যেন ঐরূপ শব্দের দ্বারা ক্ষতজনিত ক্ষোভ প্রকাশক সঙ্গীত (রোদন) করিতেছে। হায়! হায়! যুদ্ধ ক্রমেই ভীষণ হইয়া উঠিল[৪৮।৪৯]। ঐ দেখ, ও দিকে পরস্পরাঘাতবিচূর্ণিত ভীষণ খড়্গ সমূহ হইতে সমুত্থিত রেণু সমূহের দ্বারা ছত্ররূপ তরঙ্গে সঙ্কুল রণসাগর যেন বালুকাময় হইয়া যাইতেছে[৫০]। এই রণশৈল যেন প্রলয়কালে বাতেরিত অচলের ন্যায় পরস্পর পরস্পরের প্রতিকূলে ধাবমান হইতেছে[৫১]। এই যুদ্ধের বাদ্যনির্ঘোষে লোকালোক (পর্ব্বতবিশেষ) পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত হইতেছে। কোন বীর বলিতেছে, হায়! আমাদিগকে ধিক্। কোন বীর বলিতেছে, উঃ কি খেদ! খেদ এই যে, আমাদিগের প্রযুক্ত অর্থাৎ বিনিক্ষিপ্ত নারাচ সকল কার্য্য সাধন করিতেছে না, অধিকন্তু কঠিন উপলখণ্ডে আহত হওয়াতে তদ্বিনির্গত তড়িচ্ছটাসদৃশী অনলশিখা প্রতাপিত হইয়া সেই সকল উপলখণ্ড ভেদ করতঃ শব্দ সহকারে বৃথা বিনষ্ট হইতেছে। অহে ছিন্নেচ্ছ মিত্রগণ! সম্প্রতি বেলা অবসানপ্রায়। অতএব, আইস, আমরা যাবৎ এই প্রজ্বলিত অনলসদৃশ নারাচ দ্বারা ভগ্নাঙ্গ না হই তাবৎ আমরা স্থানান্তর আশ্রয় করি[৫২।৫৩]।

চতুস্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চত্রিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠদেব বলিলেন, রাঘব! অনন্তর সেই রণসমুদ্র নিতান্ত উদ্বেল হইয়া উঠিল। গগনাক্রমকারী তুরঙ্গ সকল এই সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ, ছত্র সকল ফেন, ও শুভ্রবর্ণ শরনিকর অসঙ্খ্য শফরী, অশ্বারোহী সৈন্ত উহার মহাকল্লোল[১।২]। চতুর্দ্দিক্ হইতে বহুবিধ আয়ুধরূপ নদীস্রোত এই সমরার্ণবে আপতিত ও তদ্গর্ভে নিরন্তর ভ্রাম্যমাণ সৈন্যগণ অনবরত আবর্ত্তিত হইতে লাগিল। মাতঙ্গগণের বৃহৎ কুম্ভ এই অর্ণবের পর্ব্বতকূট, ঘূর্ণমান প্রদীপ্ত চক্রসমূহ আবর্ত্ত, (ঘূর্ণিজল), এবং যোধগণের ছিন্নমস্তক সকল তদাবর্ত্তস্থ তৃণ। এবম্বিধ রণসমুদ্রে মহা আড়ম্বরে ধূলিরূপ জলধরপটল সমুড্ডীন হইয়া খড়্গপ্রভারূপ সলিলরাশি পান করিতে লাগিল[৩।৪]। শত শত মকরব্যূহ এই মহাসমুদ্রের অসংখ্য মকর। এই সকল মকরের দ্বারা সৈন্যরূপ নৌকা সকল হতাহত হইতে লাগিল। ভীষণ সৈন্যাবর্ত্তের গুড় গুড় ধ্বনির দ্বারা মেঘকন্দর প্রতিধ্বনিত ও মীনব্যূহরূপ মৎস্যসমূহ হইতে শররূপ শুভ্র অণ্ড সকল অবিরত বিনিষ্ক্রান্ত হইতে লাগিল[৫]। খড়্গরূপ প্রবল তরঙ্গমালার দ্বারা পতাকারূপ লহরী সকল ছিন্ন ভিন্ন হইতে লাগিল। এই সমরমহার্ণবের শস্ত্ররূপ চঞ্চল সলিল ও মেঘের ন্যায় অস্থায়ী আবর্ত্ত সমূহের ভীষণ সংরম্ভ দ্বারা সেনারূপ তিমি ও তিমিঙ্গিলগণ ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতে লাগিল[৬।৭]। লৌহকবচাবৃত সৈন্যরূপ সলিল রাশির মধ্য হইতে শত শত কবন্ধরূপ আবর্ত্ত সমুত্থিত হইতে লাগিল এবং দিঙ্মণ্ডল অন্ধকারাবৃত ও এই অর্ণবের নির্ঘোষ হইতে ঘুম্‌ঘুম্ শব্দ প্রসৃত হইতে লাগিল[৮।৯]। সৈন্যগণের উৎকর্ত্তিত মস্তক এই মহার্ণব হইতে শীকরনিকরাকারে উৎপতিত ও চক্রব্যূহরূপ আবর্ত্তের মধ্যে সৈন্যরূপ কাষ্ঠ সমূহ প্রবাহিত হইতে লাগিল[১০]। এই রণসাগর অনন্ত ছত্র বস্ত্র পতাকাদির দ্বারা ফেনিল। ইহার অন্তরাগত বহমান রক্তনদীর স্রোতে রথরূপ ক্রমরাজি ভাসমান এবং গজদেহ বিনির্গত মহারুধির তাহার বুদ্‌বুদ্। এই সমুদ্রের সৈন্যরূপপ্রবাহে হস্তিরূপ অসংখ্য জলচর বিচলিত[১১।১২]। বৎস! এবম্বিধ সংগ্রামার্ণব দর্শকগণের গন্ধর্ব্ব-নগরের ন্যায় চিত্তচমৎকারক

হইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। যদ্রূপ কল্পান্তকালে অনবরত ভূকম্প হয়, এই রণস্থলে তদ্রূপ অবিরত ভূকম্প হইতে লাগিল[১৪]। তখন অচলরাজি কম্পিত, বিহঙ্গমরূপ (এস্থলে বিহঙ্গম বাণ) তরঙ্গমালা অজস্র প্রবাহিত, করিকুম্ভরূপ অসংখ্য পর্ব্বতশৃঙ্গ নিপতিত, ভীতসৈন্যরূপ ভীরু মৃগগণ বিত্রাসিত, যোধগর্জ্জনের গুর্ গুর্ ধ্বনি সমুত্থিত, চঞ্চল শরনিকর-রূপ অসংখ্য শর ইতস্ততঃ বিদ্রুত ও শরধারী যোধমণ্ডল বনসঙ্কুল ভূমির ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল[১৫।১৬]। ধূলিপটলরূপ জলদজাল বিস্তৃত, সৈন্যরূপ পর্ব্বতসমূহ বিগলিত, মহারথগণের অঙ্গসমূহ নিপতিত, খড়্গিমৃগ সকল প্রপতিত, সৈন্যগণের পদরূপ কুসুমনিকর উৎপতিত, পতাকা ও ছত্ররূপ বারিদমণ্ডল সমুত্থিত, রক্তনদী প্রবাহিত ও বারণগণ চীৎকার করতঃ নিপতিত হইতে লাগিল। বোধ হইতে লাগিল, যেন সেই সমরপ্রলয় জগৎ গ্রাস করিবার নিমিত্ত উদ্যত হইয়াছে।

অনন্তর সেই সমরপ্রলয়ে ধ্বজ, ছত্র ও পতাকার সহিত রথ সমূহ বিনষ্ট, নির্ম্মল খড়্গরূপ অসংখ্য প্রদীপ্ত সূর্য্যমণ্ডল নিপতিত ও যোধগণের প্রাণসন্তাপে তত্রস্থ প্রাণিগণের প্রাণ সন্তপ্ত হইতে লাগিল[১৭।২১]। কোদণ্ড সকল এই সমরপ্রলয়ের পুষ্কর ও আবর্ত্ত নামধেয় মেঘ। এই মেঘ হইতে অনবরত শরধারা রূপ বারিধারা নিপতিত হইতে লাগিল। আকাশ মণ্ডল সৈন্যগণের খড়্গসমূহের উজ্জ্বল ছটায় বিদ্যুৎ পরিবৃতের ন্যায় দেখাইতে লাগিল। উচ্ছলিত শোণিতসমুদ্রে মাতঙ্গরূপ কুলাচল সমূহ নিপতিত, শোণিতবিন্দুরূপ তারকানিকর নভোমণ্ডল হইতে বিকীর্ণ হইয়া প্রপতিত, অস্ত্ররূপ কল্পাগ্নির দ্বারা দগ্ধ হইয়া যোধগণ বীরগতি প্রাপ্ত, হেতি ও বর্ষারূপ (শস্ত্রবিশেষ) অশনির দ্বারা অমল ভূধরসম্পন্ন ভূমণ্ডল ছিন্ন ভিন্ন, মহামাতঙ্গরূপ পর্ব্বতনিকর নিপতিত এবং তদ্দ্বারা জনগণ নিষ্পেষিত হইতে লাগিল[২২।২৫]। এই সময় মহাপ্রলয়ে শররূপ বারি-ধারাবর্ষী সৈন্যসামন্তরূপ নিবিড় জলধরপটল দ্বারা মহী ও নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল। ক্রমেই মহাসেনারূপ অর্ণবের সংক্ষোভ দ্বারা মহাড়ম্বর সমুত্থিত হইতে লাগিল। সেই সমস্ত শরবর্ষিগণের নিক্ষিপ্ত অসংখ্য শর-নিকরে রণভূমি পরিব্যাপ্ত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল, যেন কল্পান্ত-কালীন প্রচণ্ড মারুত দ্বারা জলচর সর্পগণ সবেগে উদ্গত হইয়া সমুদ্রস্থিত পর্ব্বতের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। বীরগণের নিক্ষিপ্ত শূল, অসি, চক্র,

শর, গদা ও ভুষুণ্ডী প্রভৃতি বাণসমূহ পরস্পর বিদলিত হইয়া শব্দসহকারে দশ দিকে পরিভ্রমণ করতঃ যেন প্রলয়বাতবিচলিত শিলা বৃক্ষাদি পদার্থ সমূহের বিলাপপরম্পরা প্রকাশ করিতে লাগিল২৬।২৮।

পঞ্চত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাঘব! অতঃপর সেই সমরাঙ্গনে সৈন্যগণের শব-সমূহ রাশীকৃত হইয়া অদ্রিশিখরের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। সমস্ত ভীরুগণ সমরস্থল পরিত্যাগ পূর্ব্বক দশ দিকে পলায়ন আরম্ভ করিল। বিনষ্ট মাতঙ্গ সমূহ শৈলাকারে দৃষ্ট হইতে লাগিল। যক্ষ, রক্ষ ও পিশাচগণ রুধিরার্ণবে ক্রীড়া করিতে লাগিল১।২। এই সময়ে ধর্ম্মনিষ্ঠ, অপরাঙ্মুখ, শৌর্য্যবীর্য্যসম্পন্ন ও কুলোজ্জ্বলকারী বীরগণ পরস্পর মিলিত হইয়া দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা পরস্পর পরস্পরকে অভিভব করিবার জন্য উৎসুক ও মেঘের ন্যায় গর্জ্জনকারী৩।৪। উভয়পক্ষীয় বীরগণ এরূপ ভাবে মিলিত হইলেন যে, যেন দুই দিক্ হইতে দুই অরণ্যযুক্ত মহাশৈল একত্রিত হইতেছে। যেমন সমুদ্রতরঙ্গ গর্জ্জন করতঃ পরস্পর মিলিত হয়, সেইরূপ, সেই রণক্ষেত্রে মাতঙ্গগণ মাতঙ্গসমূহের সহিত, অশ্বগণ অশ্বসমূহের সহিত ও পদাতিগণ পদাতি বৃন্দের সহিত সবেগে গর্জ্জন সহকারে পরস্পর মিলিত হইতে লাগিল৫।৬। এবং নরসৈন্যগণ পরস্পর শরাসন ধারণ করতঃ বাতবিচলিত বেণুর ন্যায় ভীষণ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। যেমন সমুড্ডীন আসুর নগর দৈব নগর দ্বারা বিদলিত হয়, তেমনি, এই যুদ্ধে বীরগণের রথরাজির দ্বারা রথনিকর নিষ্পেষিত হইতে লাগিল৭।৮। শূরগণের শরজাল গগনমণ্ডলে উত্থিত হইয়া অভিনব জলদজালের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল এবং ধনুর্দ্ধরগণের পতাকাজালে গগনমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইল৯। যাহারা ভীরুস্বভাব, তাহারা তাদৃশ নিদারুণ অস্ত্রযুদ্ধ প্রবৃত্ত দেখিয়া ইচ্ছানুসারে পলায়ন করিলে চক্রধারী চক্রধারীর সহিত, ধনুর্দ্ধর ধানুষ্কের সহিত, খড়্গাবিদ্ খড়্গাধারীর সহিত, ভূষুণ্ডী-ধারী ভূষুণ্ডীধরের সহিত, মুষলজ্ঞ মুষলযোদ্ধার সহ, কুন্তায়ুধ কুন্তধরের সহিত, ঋষ্ট্যায়ুধ ঋষ্টিধারীর সহিত, প্রাসধারী প্রাসজ্ঞের সহিত, সমুদ্গর মুদ্গরধারীর সহিত, গদাবিৎ গদাধারীর সহিত, শক্তিধারী শাক্তিকের সহিত, শূলবিশারদ শূলধারীর সহিত, বিখ্যাত পরশুবিশারদ পরশু-ধারীর সহিত, লকুটীগণ লকুটীর সহিত, (লকুট=লাঠি) উপলধর উপ-

লধরের সহিত, পাশী পাশস্ত্রের সহিত, শঙ্কুধর শঙ্কুধরের সহিত, ক্ষুরিকা-যুধ ক্ষুরিকায়ুধের সহিত, ভিন্দিপালধারী ভিন্দিপালধরের সহিত, বজ্র-মুষ্টিগণ বজ্রমুষ্টিগণের সহিত; অঙ্কুশায়ুধ অঙ্কুশধরের সহিত, হলস্ত্রগণ হলযোদ্ধার সহিত, ত্রিশূলী ত্রিশূলায়ুধের সহিত, কবচসম্পন্ন বীরগণ সক-বচ যোধগণের সহিত সেই সমরার্ণবে মিলিত হইয়া প্রলয়বিক্ষুব্ধ অর্ণ-বের ঊর্ম্মিঘটার ন্যায় নিতান্ত ক্ষুভিত হইয়া উঠিল[১০।১৭]। এই সময়ে, ভ্রাম্যমাণ চক্রব্রজ যাহার আবর্ত্ত, গতিশীল শর সকল যাহার শীকরবাহী মারুত, ভ্রমণশীল হেতি (হাতিয়ার) সকল যাহার মকর, উৎফুল্ল আয়ুধ সকল যাহার কল্লোল, শিলাকুল যাহার জলচর জন্তু, সেই স্বর্গ ও মর্ত্ত্য উভয়ের অন্তরালস্থ রণমহাসমুদ্র অমর (জীবিত) গণের নিতান্ত দুস্তর হইয়াছিল[১৮।১৯]। এই সময়ে এক দিকে যক্ষ রাক্ষস পিশাচ ও অসুর, অপর দিকে দেব গন্ধর্ব্ব কিন্নর ও বিদ্যাধরগণ উভয় সৈন্যের ভাবী জয় পরাজয় দর্শনার্থে সমবস্থান করিয়াছিলেন[২০]।

রাঘব! এই সমরাঙ্গণে লীলানাথ বিদূরথের সাহায্যার্থ যে সমস্ত বীরগণ সমাগত হইয়াছিলেন আমি তোমার নিকট তাঁহাদিগের জনপদ ও নাম কীর্ত্তন করি, শ্রবণ কর[২১]।

পূর্ব্বদিক্ হইতে কোশল, কাশী, মগধ, মিথিলা, উৎকল; মেকল, কর্কর, সংগ্রামশৌণ্ড মুখ্যাহিম, রুদ্রমুখ্য, তাম্রলিপ্ত, প্রাগ্‌জ্যোতিষ, বাজিমুখ, অম্বষ্ঠ, নিষাদ[২২।২৩] বর্ণকোষ্ঠ এবং সবিশ্বোত্রদেশীয় আমমীনাশিগণ, (আমমীন= কাঁচা মাচ) ব্যাঘ্রবক্ত্র, কিরাত, সৌবীর ও একপাদক, মাল্যবান্, শিবি, আঞ্জন, বৃষলধ্বজ, পদ্মাক্ষ এবং উদয়গিরিবাসী যোধগণ আগমন করিয়া-ছিলেন[২৪।২৫]।

পূর্ব্বদক্ষিণদিক্ হইতে চেদী, মৎস্য, দশার্ণ, অঙ্গ, বঙ্গ, উপবঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র, জঠর, বিদর্ভ, মেকল, শবরানন, শবরবর্ণ, কর্ণ, ত্রিপুর, পূরক, কণ্টকস্থল, পৃথগ্‌দ্বীপ, কোমল, কর্ণান্ধ্র, চৌলিক, চার্ম্মণ্বত, কাকক, হেম-কুড্য, শ্মশ্রুধর, বলিগ্রীব, মহাগ্রীব, কিষ্কিন্ধ্যা ও নালিকেরীবাসী বীরগণ সমাগত হইয়াছিলেন[২৬।২৯]।

লীলানাথের দক্ষিণ দিক্ হইতে সমাগত নৃপগণের উল্লেখ করি, শ্রবণ কর। বিন্ধ্য, কুসুমাপীড়, মহেন্দ্র, দর্দ্দুর, মলয়, সূর্য্যবান্, সমৃদ্ধিশালী গণরাজ্য, অবন্তী, শাম্ববতী, ঋষিক, দশপূরক, কচ্ছপ, বনবাসোপগিরি, ভদ্রগিরি,

নাগর, দণ্ডক, নূরাষ্ট্র, সাহা, শৈব, ঋষ্যমূক, কর্কট, বনবিম্বিল,[৩০।৩৩] পম্পানিবাসীগণ, কৈরকদেশীয় মহাবীরগণ, কর্কবীরগণ, স্বৈরিকগণ, নাসিকদেশীয় বীরগণ, ধর্ম্মপত্তন, পঞ্জিকগণ,[৩৪] কাশিক, তৃষ্ণখল্লুন, যাদ, তাম্রপর্ণ, গোনর্দ্দ, কানক, দীনপতন,[৩৫] তাম্রীক, দন্তুর, কীর্ণক, সহকার, এনক, বৈতুণ্ডক, তুম্বনাল, জীমদ্বীপ, কর্ণিক,[৩৬] কণিকার সদৃশ প্রভাসম্পন্ন শিবি, কোঙ্কণ, চিত্রকুট, কর্ণাট, মণ্টবটক, মহাকটকিক, অন্ধ্র, কোলগিরি, অচলান্তক, বিবেষিক, দেবনক, ক্রৌঞ্চবাহ, শিলাক্ষারোদ, ভোনন্দ, মর্দ্দন, মলয়, চিত্রকুটশিখর ও লঙ্কাস্থিত রাক্ষসগণ[৩৭।৩৯]।

যে সকল রাজা পশ্চিমদক্ষিণ দিকে বাস করেন তাঁহাদেরও নামোল্লেখ করি, শ্রবণ কর। মহারাজ্য, সুরাষ্ট্র, সিন্ধু, শূদ্র, সৌবীর, আভীর, দ্রবিড়, কীকট, সিদ্ধখণ্ডাখ্য, কালিরুহ, হেমগিরি, রৈবতক, জয়কচ্ছ, ময়বরদেশীয় যবনগণ, বাহ্লীক, মার্গণ, আবন্ত, ধুম্র, তুম্বক ও এতদ্দিক্স্থিত পর্ব্বতবাসী ও সমুদ্রতটস্থিত অসঙ্খ্য বীর লীলাপতির সাহায্যার্থ এই মহাযুদ্ধে সমাগত হইয়াছিলেন[৪০।৪৩]।

রামভদ্র! এক্ষণে লীলানাথের প্রতিপক্ষীয় বীরগণের ও তাঁহাদিগের জনপদ সকলের নাম কীর্ত্তন করি, শ্রবণ কর। পশ্চিম দিকে যে সকল মহাগিরি বিদ্যমান আছে সে সকল এই—মণিমান্, অক্ষুর, অর্পণ, শৈব্য, চক্রবান্ ও অস্তগিরি। এই সকল মহাগিরি নিবাসী যোধগণ ও অমরক, অছায়া, গুহুত্ব, হৈহয়, গুহ্যক ও গয়ানিবাসী এবং পঞ্চজন নামক প্রসিদ্ধ জনগণ, ভারক্ষ, পারক ও শান্তিকগণ,[৪৪।৪৬] জাতিক, হুণক, কর্ক ও গিরিপর্ণবাসী ধর্ম্মমর্য্যাদাবিহীন ম্লেচ্ছজাতি ও দ্বিশত যোজন পরিমিতস্থান্ বিস্তৃত মহেন্দ্রশিখরিস্থিত মুক্তামণিময় ভূমি, রথাশ্ব নামক পর্ব্বত ও মহার্ণবতটস্থিত পারিপাত্র গিরি হইতে মহাবল বীরগণ সিন্ধুরাজের সাহায্যার্থ সেই যুদ্ধে সমাগত হইয়াছিলেন[৪৭।৫০]।

পশ্চিমোত্তরদিক্স্থিত গিরিমতীদেশের রাজা মহারাজা, নিত্যোৎসবশালী নরপতি, বেণুপতি, ফাল্গুনক, মাণ্ডব্য, অনেত্রক, পুরুকুন্দ, পার, ভানুমণ্ডলভাবননিবাসী যোধগণ, বল্মীক এবং ননিলদেশস্থ দীর্ঘকায়গণ, কেশ ও দীর্ঘবাহু বীরগণ, রঙ্গ, স্তনিক, গুরুহ, লুহদেশীয় জনগণ ও গোবৃষাপত্যভোজী স্ত্রীরাজ্যদেশীয় জনগণ এই সময়ে সমাগত হইয়াছিল। এক্ষণে উত্তরদিক্ সমাগত যোধগণের কথা বলি, শ্রবণ কর[৫১।৫৪]।

উত্তরদিকস্থ হিমবান্, ক্রৌঞ্চ, মণিমান্, কৈলাস, বসুমান্ এবং এই উভয় পর্ব্বতের প্রত্যন্তপর্ব্বতস্থিত জনগণ, মদ্রবার, মালব ও শূরসেনীয় যোধগণ, ত্রিগর্ত্ত, একপাত্য, ক্ষুদ্র, মালব, এবং অন্তগিরিনিবাসিগণ, অবল, প্রস্থবল, কাশ, দশধান, ধানদ, সারক, বাটধানক, অন্তরদ্বীপ ও গান্ধারদেশীয় বীরগণ, তক্ষশিলা, বীলবর্গঘাতী, প্রসিদ্ধ পুষ্করাবর্ত্ত, যশোবতী মহী, নাভিমতী, তিক্ষাকালবর, কাহকনগর, সুরভূতিপুর, রতিকাদর্শ, অন্তরাদর্শ, পিঙ্গল এবং পাণ্ডব্য নিবাসী জনগণ ও যমুনাতীরবর্ত্তী যাতুধানকগণ, হিমবান্, বসুমান্, ক্রৌঞ্চ ও কৈলাস এবং তদনন্তর অশীতিশতযোজনপরিমিত জনপদভূমি হইতে বীরোত্তমগণ সিন্ধুরাজের সাহায্যর্থ সমাগত হইয়াছিল৫৫।৬২।

উত্তরপূর্ব্বদিক্স্থিত জনপদাদির নাম কীর্ত্তন করি, শ্রবণ কর। মালব, রন্ধ্ররাজ্য, বনরাষ্ট্র, সিংহপুত্র, সাবাক, আপলবহ, কাশ্মীর, দরদ, কালূত, ব্রহ্মপুত্র, কুনিদ, খদিন, মতিমান, পলোল, কুবিকৌতুক, কিরাত, যামুপাত, স্বর্ণমহী, দেবস্থল, উপবনভূমি, বিশ্বাবসুর উত্তম মন্দিরভূমি, কৈলাস ভূমি, তদনন্তর মঞ্জুবনশৈল এবং বিদ্যাধর ও অমরগণের বিমান সদৃশ ভূমি প্রদেশ হইতে যোধগণ সমাগত হইয়া লীলানাথের প্রতিপক্ষতা অবলম্বন করিয়াছিল৬৩।৬৭।

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তত্রিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠদেব বলিলেন, রামচন্দ্র! শ্রবণ কর। সেই নরবারণসঙ্কুল দারুণ সংগ্রামে ঐ সকল যোধগণ "আমি অগ্রে যাইব, আমি অগ্রে যাইব" এইরূপ পণ করতঃ শলভের পাবকপ্রবেশের ন্যায় সমরে প্রবেশ করিয়া ভস্মীভূত হইতে লাগিল। হে রাঘব! লীলানাথের পক্ষাবলম্বী মধ্যদেশীয় জনপদবাসী বীরগণের নামাদি পূর্ব্বে কথিত হয় নাই, সেজন্য সে সকল কীর্ত্তন করি, শ্রবণ কর১।৩।

তদ্দেহিকা, শূরসেন, গুড়, আশ্বাদ্যনায়ক, উত্তমজ্যোতিভদ্র, মদমধ্যমিকাদি, শালূক, কেদ্যমাল, দৌজ্জের্য়, পিপ্পলায়ন, মাণ্ডব্য, পাণ্ড্যনগর, সৌগ্রীব, গুরুগ্রহ,৪।৫ পারিপাত্র, সুরাষ্ট্র, যামুন, উডুম্বর, রাজ্যনামা, উজ্জিহান, কালকোটী, মাথুর,৬ পাঞ্চালদেশস্থ ধর্ম্মারণ্য ও তাহার উত্তর মধ্যস্থিত জনপদবাসিগণ ও পঞ্চালক, কুরুক্ষেত্র, সারস্বত জানপদগণ, অবন্তী, কুন্তী ও পাঞ্চনদের মধ্যস্থিত জনপদবাসী ও লীলাপতির স্বপক্ষ জনগণ ঐ সকল প্রতিপক্ষ কর্ত্তৃক বিকম্পিত হইয়া ইতস্ততঃ বিদ্রুত ও গিরিপ্রপাতে নিপতিত হইতে লাগিল৭।৮। অন্তরবতীজনপদবাসিগণ দ্বারা কোশ ও ব্রহ্মাবসান এই দুই জনপদবাসিগণ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ভূতলে নিপতিত ও মত্তবারণগণ কর্ত্তৃক বিমর্দ্দিত হইতে লাগিল৯। দশপুরদেশীয় শূরগণ বানক্ষতিনিবাসী বীরগণ দ্বারা পরাজিত, ছিন্নোদর ও ছিন্নস্কন্ধ হইয়া পলায়নপর হওয়াতে তাহারা হ্রদমধ্যে নিমজ্জিত হইতে লাগিল১০। রাত্রিকালে পিশাচগণ সেই সমস্ত ছিন্নোদর যোধগণের উদরনিসৃত অন্ত্র সমূহ আকর্ষণ ও চর্ব্বণ করতঃ ভক্ষণ করিতে লাগিল১১। গভীরনিনাদকারী রণদীক্ষিত ভদ্রগিরিনিবাসী সেনাগণ মরগনিবাসী যোধগণকে বলপূর্ব্বক কচ্ছপাদির ন্যায় পল্বলাদিতে নিক্ষেপ করিতে লাগিল১২। মহাশক্র সকল ক্ষরিত-রুধির-কলেবর, ইতস্ততঃ বিদ্রুত ও বিত্রাসিত হইতে লাগিল। মহাবল হৈহয়গণ দণ্ডিকাবাসী যোধগণকে অনলবিভাবিত হরিণের ন্যায় চতুর্দ্দিকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিল১৩। এই যুদ্ধে দন্তিগণ পরস্পর দন্তবিদারিত দেহ হইতে লাগিল। দরদবাসী শূরগণ অরাতি দিগকে বিদলিত

করিতে লাগিল। তৎকালে সেই সমরভূমিতে ভীষণ শোণিতনদী প্রবাহিত হইল[১৪]। চীনদেশীয় যোধগণ নারাচ প্রহারে ক্ষতবিক্ষত, জীর্ণ পর্ণের ন্যায় জর্জ্জরিত ও বিকলাঙ্গ হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। কেহ বা জলধিজলে দেহ সমর্পণ করিল। নলদদেশীয় যোধগণ কর্ণাট বীরগণের বিনিক্ষিপ্ত কুন্ত দ্বারা ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হইয়া নিপতিত ও তারকানিকরের ন্যায় প্রভগ্ন ও বিশীর্ণ হইতে লাগিল[১৫।১৬]। দাশক ও শকগণ নষ্টায়ুধ হইয়া পরস্পর কেশাকর্ষণ করতঃ সমরে প্রবৃত্ত হইল[১৭]। দশার্ণদেশীয় যোধগণ পাশদেশীয় বীরগণ-বিনির্ম্মুক্ত ভীষণ শৃঙ্খলের ভয়ে ভীত হইয়া বেতসমূলাশ্রয়ী অস্থিহীন মৎস্যের ন্যায় রক্তপঙ্কে নিলীন হইতে লাগিল[১৮]। তঙ্গনবাসিগণ শত শত অসি ও শঙ্কু প্রভৃতি শস্ত্রের দ্বারা গুর্জ্জরাধিপতির সৈন্যগণকে বিনষ্ট করিতে লাগিল[১৯]। অম্বুদপ্রভার ন্যায় হেতিপ্রভাসম্পন্ন জলধররূপ নিগড়দেশীয় শূরগণ বারিধারার ন্যায় শস্ত্রধারা বর্ষণ করতঃ বনরূপ গুহদেশীয় যোদ্ধা দিগকে অভিষিক্ত করিতে লাগিল[২০]। বিপক্ষগণের মণ্ডলোদ্যত ভূষণ্ডী দিবাকর আচ্ছাদিত করতঃ আভীরদেশীয় ভীরু যোধগণকে বিনষ্ট করিল[২১]। তাম্রাখ্য যবন গণের বাহিনী গৌড়বাসী যোদ্ধৃগণের ভটরূপ বৃকের সহিত মিলিত হইয়া পরস্পর কেশাকেশি ও নখানখি সংগ্রাম করিতে লাগিল[২২]। সেই গৃধ্রকঙ্কসমাকুল রণক্ষেত্রে ভাসকনিবাসিগণ বৃক্ষশৈলচ্ছেদী চক্র সমূহ দ্বারা তঙ্গন সেনা দিগকে ছিন্ন ভিন্ন ও বিদীর্ণ করিতে লাগিল[২৩]। গৌড়দেশীয় ভটগণের বিঘূর্ণিত লগুড়ের ভীষণ গুড় গুড় ধ্বনি শ্রবণ করিয়া গান্ধারদেশীয় যোধগণ গোসমূহের ন্যায় বিদ্রুত হইতে লাগিল[২৪]। যেমন নিশার অন্ধকার শুভ্র জ্যোৎস্না গ্রাস করে, তেমনি, নীলপরিচ্ছদধারী সাগরসদৃশ শকসেনা শুভ্র পরিচ্ছদ পারসিক দিগকে আক্রম করিল[২৫]। যোধগণের আয়ুধ সকল এই সময়ে ক্ষীরসাগরমধ্যস্থিত মন্দর ভূধরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল[২৬]। দর্শকগণ দেখিতে লাগিলেন, যেন হিমাচলশিরে বনরাজি শোভা পাইতেছে। আকাশে বীরগণের প্রেরিত শস্ত্র সমূহের গতি গগনবিহারী প্রাণীর নিকট সমুদ্রের চঞ্চলতরঙ্গমালার প্লুত গতি বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। শতচন্দ্রসমান শুভ্রবর্ণ ছত্র, কুন্তাস্ত্র ও শক্তি সকল গগনমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল, নভোমণ্ডল শলভ দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়াছে[২৭।২৮]। সমুড্ডীন শক্তি সমূহের

দ্বারা সমাচ্ছন্ন হওয়ায় দৃষ্ট হইতে লাগিল, নভোমণ্ডল যেন রন্ধ্রবিহীন ও কাননীকৃত হইয়াছে। কেকয়গণ ভীষণ রবে কঙ্কাস্ত্র দ্বারা অরাতিগণের মস্তক ছেদন করিয়া আকাশমণ্ডল কঙ্কুল (কঙ্ক=একপ্রকার পতঙ্গ) সমাচ্ছন্নের ন্যায় করিল[২৯]। ভীষণরবকারী অঙ্গদেশীয় বীরগণ কর্তৃক কিরাতসৈন্যরূপ কন্যাগণ অনঙ্গত্ব প্রাপ্ত হইল (অনঙ্গ=দেহত্যাগ)[৩০]। কাশদেশীয় যোধগণ মায়াবলে পক্ষিরূপ ধারণ করতঃ পবনোড্ডীন পাংশুর ন্যায় স্বীয় সঞ্চালিত পক্ষ দ্বারা আকাশমণ্ডলে উত্থিত হইয়া অদৃশ্যভাবে তদ্দেহিক নিবাসী যোধগণকে বিনাশ করিতে লাগিল[৩১]। পরিহাসপটু যুদ্ধোন্মত্ত সচঞ্চল নার্ম্মদগণ শত্রু মধ্যে হেতিসমূহ নিক্ষেপ করতঃ হাস্য, নর্ত্তন ও গান করিতে লাগিল[৩২]। যোধগণের কণ্ কণ্ ধ্বনিকারী কিঙ্কিণীজাল শাল্বগণের বাণে খণ্ড বিখণ্ড হইতে লাগিল[৩৩]। শৈব্যগণ কুন্তীদেশ নিবাসী বীরগণের ভ্রাম্যমাণ কুন্তের দ্বারা বিঘট্টিত, বিখণ্ডিত, বিনষ্ট ও বিদ্যাধরের ন্যায় স্বর্গনীত হইল[৩৪]। আক্রমণকারী ধীরপ্রকৃতি অহীনদেশীয় সেনাগণ সোল্লাস গমন সহকারে পাণ্ডুনগরীয় বীরগণকে লুণ্ঠিত করিতে লাগিল[৩৫]। যেমন মাতঙ্গগণ বৃক্ষ সমূহ দলন করে, তেমনি, পঞ্চনদনিবাসী দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ বীরগণ কুন্ত, গজদন্ত ও ক্রমযুদ্ধে কুশল তদ্দেহক নিবাসী বীর দিগকে বিদলিত করিতে লাগিল[৩৬]। নীপজনপদবাসী (নীপ একপ্রকার দেশ) বীরগণ ব্রহ্মবৎসানক জনপদবাসী দিগকে চক্র দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ভূতলে নিপাতিত ও হৈয়জনপদবাসী দিগকে ক্রকচ দ্বারা কর্ত্তিত করিতে লাগিল[৩৭।৩৮]। জঠরজনপদবাসিগণ কুঠার দ্বারা শ্বেতকাক নিবাসী জনগণের শিরঃছেদ ও পার্শ্বস্থ ভদ্রেশগণ শরানল প্রজ্বালন দ্বারা সেই সমস্ত জঠরসৈন্যদিগকে দগ্ধ করিতে লাগিল। মতঙ্গদেশীয় যোধরূপ মাতঙ্গগণ কাষ্ঠযুদ্ধকুশল বীররূপ মহাপঙ্কে নিমগ্ন হইয়া সমিদ্ধ হুতাশনস্থিত ইন্ধনের ন্যায় লয়প্রাপ্ত হইতে লাগিল[৩৯]। মিত্রগর্ত্তনিবাসী বীরগণ ত্রিগর্ত্তদেশীয় জনগণ কর্ত্তৃক নিগৃহীত হইয়া এরূপ ভাবে তৃণের ন্যায় ঊর্দ্ধে ভ্রামিত হইতে লাগিল যে, যেন তাহারা পলায়ন মানসে অধঃশিরা হইয়া পাতালান্তে প্রবেশ করিতেছে[৪০]। বনিক্ৰদেশীয় যোধগণ মহাবল মাগধ দিগের মধ্যে আপতিত হইয়া পঙ্কনিমগ্ন গজের ন্যায় জীর্ণ হইতে লাগিল[৪১]। যেমন পথিমধ্যে আতপবিশীর্ণ কুসুম শুষ্কতা প্রাপ্ত হয়, তেমনি, সেই রণক্ষেত্রে তঙ্গন সৈন্য কর্ত্তৃক চিতিসৈন্যগণের জীবন বিনষ্ট হইতে লাগিল[৪২]।

অন্তকসদৃশ কোশলগণ পৌরব গণের ভীষণ নিনাদ ও শর, গদা, প্রাস, হেতি প্রভৃতি শস্ত্র সমূহের অতিবর্ষণ সহ্য করিতে পারিল না। তাহারা ভল্লাস্ত্র দ্বারা বিক্বতাঙ্গ হইতে লাগিল। পৌরব গণের ভীষণ পরাক্রম দর্শনে তাহারা সাতিশয় বিস্ময় প্রাপ্ত ও রুধিরার্দ্রকলেবর প্রযুক্ত তরুণাদিত্যের ন্যায় মূর্ত্তি বিধারণ করতঃ পর্ব্বতস্থিত বিক্রম দ্রুম সদৃশ শোভা ধারণ করিল। অনন্তর পলায়নপর হইল। অতঃপর তাহারা শক্র কর্ত্তৃক নারাচ সমূহের ও মহাস্ত্র সমূহের দ্বারা বিকম্পিত হইতে লাগিল[৪৩।৪৫]। দূর হইতে দেখা গেল, যেন শরধারাবর্ষণকারী মেঘ অথবা শরলোমাঞ্চিত মেষ কিম্বা শরপত্রাবৃত বৃক্ষ নিচয় ভ্রমণ করিতেছে ও গজগর্জ্জনের ন্যায় গর্জ্জন করিতেছে[৪৬]। আরও দেখা গেল, কন্দাকস্থলনিবাসী হস্তী ও মনুষ্য প্রভৃতি জন্তুগণ বনরাজ্যনিবাসী বীররূপ জরার দ্বারা জীর্ণ হইয়া বলসমাকৃষ্ট পেলব (সূক্ষ্ম) তন্তুর অনুরূপে ছিন্ন হইতেছে[৪৭]। গর্ত্তে নিরোধ প্রযুক্ত তাহাদের রথচক্র বিধ্বস্ত হওয়াতে, সেই সমস্ত রথের মস্তকরাজি, বনাদ্রি মধ্যে নিপতিত মেঘের ন্যায় সেই রণক্ষেত্রস্থিত প্রহারকারী শক্রদল মধ্যে নিপতিত হইতে দেখা গেল[৪৮]। শাল ও তাল বৃক্ষের অনুরূপ প্রাংশুকায় যোধগণ মহাবনস্বরূপ সমরক্ষেত্র প্রাপ্ত হইয়া পরস্পর পরস্পরের ভুজ ও মস্তক ছেদন করিলে, সেই সমরক্ষেত্ররূপ মহাবন যেন উন্নত স্থাণুশ্রেণীর দ্বারা শোভমান হইতে লাগিল[৪৯]। যুদ্ধমৃত বীরগণের আশ্রিতা সুরসুন্দরীগণ কর্ত্তৃক এই যুদ্ধের বিষয় মেরুসংস্থিত উপবনে আনন্দ সহকারে জল্পিত হইতে লাগিল[৫০]। এই সমরাঙ্গনে সৈন্যগণের উচ্চস্বরসম্পন্ন মুখমণ্ডল যাবৎ না পরপক্ষীয় কল্পান্তকালীন হুতাশনসদৃশ অনলশিখা প্রাপ্ত হইয়াছিল তাবৎ উজ্জ্বলপ্রভাসম্পন্ন ও সুষুমান্বিত ছিল[৫১]। কামরূপদেশীয় পিশাচগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া দশার্ণদেশীয় ভৃত্যগণ ছিন্নাঙ্গ ও অপহৃতায়ুধ হইয়া পলায়নের নিমিত্ত পথি কর্ণপাতন পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিল[৫২]। হতস্বামিক সৈন্যগণ বিজেতৃযোধগণের বলপ্রভাবে শুষ্কসরোবরস্থিত কমলের ন্যায় কান্তিবিহীন হইল[৫৩]। নরকজনপদবাসী কর্ত্তৃক শর, শক্তি, ঋষ্টি ও মুদ্গর দ্বারা বিদ্রুত হইয়া কণ্টকস্থলনিবাসী সৈন্যগণ পলায়ন আরম্ভ করিল[৫৪]। প্রস্থবানস্থ যোধগণ এক স্থলে অবস্থিতি করতঃ শর বর্ষণ দ্বারা কৌন্তিক্ষেত্রগণকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিতে লাগিল[৫৫]। দ্বিপিযোধগণ কমলবনচ্ছেদকারী পুরুষের ন্যায় ভল্লাস্ত্রের দ্বারা বাট-

ধান গণের হস্ত পদ মস্তক হরণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিল[৩৬]। পণ্ডিতগণ যেরূপ বাদ বিষয়ে পরাজিত বা উদ্বিগ্ন হন না, সেইরূপ, সরস্বতীতীরোদ্ভব বীরগণ দিবসের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত নিরন্তর যুদ্ধ করিয়াও উদ্বিগ্ন বা পরাজিত হইল না[৩৭]। ক্ষুদ্র সর্ব্বগগণ সমরে বিদ্রাবিত হইলেও লঙ্কাস্থ যাতুধানগণের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া ইন্ধনপ্রাপ্ত শান্ত অনলের ন্যায় পুনর্ব্বার পরম তেজঃ প্রাপ্ত হইল[৩৮]। রাঘব! আমি এই যুদ্ধের বিষয় সামান্যমাত্র বর্ণন করিলাম। ফলতঃ সহস্রফণা বাসুকি এই রণ বর্ণন করিবার নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া স্বীয় সহস্র জিহ্বার দ্বারাও এই রণ যথাযথ বর্ণন করিতে সমর্থ হন না[৩৯]।

সপ্তত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টত্রিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রামচন্দ্র! বর্ণিত প্রকারে যখন সেই সকল বিজেতৃগণের বাহ্বাস্ফোট, পরাজিতগণের ত্রাস, ভয়সঙ্কুল ভীষণ সংগ্রামে বীরগণের শরনিকর অন্ধকারাচ্ছন্ন, বীরগণের বিদীর্ণ বর্ম্ম প্রদেশ হইতে শোণিতক্লেদরূপ নদী প্রবাহিত, অভ্রপংক্তিসদৃশ শুভ্রবর্ণ অশ্ব সকল এক স্থান হইতে অন্য স্থানে উৎপ্লুত ও ঐ নদীর স্থানে স্থানে নিপতিত হইতেছিল; যখন যোধগণের নিক্ষিপ্ত শরফলাগ্র সমুহের পরস্পর সঙ্ঘট্টন দ্বারা বহ্নিকণা সমুত্থিত ও উক্ত শরনদীপ্রবাহ দূরে গমন করতঃ পুনর্ব্বার প্রত্যাগত হইতেছিল, যখন ব্যোমার্ণবস্থ যোধগণের ছিন্নমস্তকরূপ কমলরাজি সুশোভিত, চক্ররূপ আবর্ত্তের দ্বারা আবর্ত্তিত, আকাশ প্রসর আয়ুধরূপ নদীসমূহে পরিপূর্ণ হইয়াছিল, এবং যখন কপিকচ্ছবাসিগণের ব্যথাপ্রদ সমীরণসদৃশ কণ্‌কণ্‌ধ্বনিসম্পন্ন শস্ত্রসমূহ নিবিড় জলধরপটলের ন্যায় গগনমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিতেছিল, তখন সিদ্ধচারণগণ প্রলয়কাল সমুপস্থিত বিবেচনা করিয়া সন্দিগ্ধ হইয়াছিলেন। তখন দিবসের অষ্টম ভাগ শেষ হওয়াতে, দিবাকর দেবও যেন শস্ত্রাঘাত দ্বারা পীতকান্তি যোধগণের ন্যায় ক্ষীণপ্রভা প্রাপ্ত হইলেন। এই সময়ে সেই উভয় দলস্থ সেনাধিনাথদ্বয় স্ব স্ব মন্ত্রীর সহিত বিচার করতঃ যুদ্ধবিরামার্থ পরস্পর পরস্পরের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন[১।৮]। উভয় পক্ষীয় বীরগণই যুদ্ধ পরিশ্রমে শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের যন্ত্র, শস্ত্র ও পরাক্রম হতসামর্থ্য হইয়াছিল, সুতরাং তাঁহারা সকলেই সেই প্রস্তাব স্বীকার করিলেন[৯]। যুদ্ধের উপসংহার স্থিরীকৃত হইলে উভয়পক্ষীয় উভয় মহারথের ধ্বজে রণবিরামের সঙ্কেত পতাকা উড্ডীন করা হইল এবং সঙ্কেত অনুসারে তৎপতাকা সৈন্যমধ্যে ভ্রামিত করিয়া যোধগণকে "তোমরা যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হও" এইরূপ বিজ্ঞাপিত করা হইল[১০।১১]।

তদনন্তর সেই উভয়দলস্থ সৈন্যগণ পুষ্কর ও আবর্ত্ত নামক প্রলয় জলধর গর্জ্জনের অনুরূপ নিনাদে দুন্দুভি বাদন দ্বারা দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিল[১২]। যেরূপ মানস সরোবর হইতে নিষ্প্রতিবন্ধকে সরযূ প্রভৃতি

নিম্নগা নিম্নে আগমন করে, সেইরূপ, সেই সমরাঙ্গনাকাশ হইতে অতি বিস্তৃত অস্ত্রনদী সকল নিরাবাধে ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। যেমন ভূমিকম্পের অন্তে বৃক্ষলতাদির স্পন্দন ও শরৎকাল আগতে অর্ণব স্থিরতা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ, বীরগণের ভুজপরিচালন একে একে উপশান্ত হইল[১৩।১৪]। যেমন প্রলয়কালীন সমুদ্র হইতে জলোচ্ছ্বাস সবেগে প্রধাবিত হয়, সেইরূপ, উভয় দিকে অবস্থিত উভয়পক্ষীয় সৈন্য সেই রণভূমি হইতে বিনির্গমনে প্রবৃত্ত হইল[১৫]। মন্দরভূধর নিষ্কাষিত হইলে ক্ষীরসমুদ্র যেরূপ প্রশান্তভাব অবলম্বন করিয়াছিল, সেইরূপ, যোধগণ সমরে বিরত হইলে সৈন্যাবর্ত্তও ক্রমে প্রশান্তভাব ধারণ করিল[১৬]। তখন দেখিতে দেখিতে সেই ভীষণ রণক্ষেত্র বিকটাকার রাক্ষসীর উদরের ন্যায় ও অগস্ত্যপীত অর্ণবের ন্যায় শূন্য হইয়া উঠিল[১৭]। রক্তনদী বহমানা হইল, তাহার কল কল শব্দে সেই শবপূর্ণ সমরাঙ্গন ঝিল্লিরব পরিব্যাপ্ত বনভূমির সাদৃশ্য ধারণ করিল[১৮]। তখন সরিৎস্রোতের ন্যায় বহমানা রক্তনদীর তরঙ্গসমূহের ঘোর শোঁ শোঁ ধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল। অর্দ্ধমৃত মানবগণ ক্রন্দন করতঃ প্রাণ-ব্যগ্র মানবগণকে আহ্বান করিতে লাগিল[১৯]। মৃত ও অর্দ্ধমৃত যোধগণের দেহ হইতে বিনির্গত শোণিতধারা কুটিল গতিতে প্রসৃত হইতে লাগিল। সজীব দেহের স্পন্দনে তৎপৃষ্ঠস্থিত মৃত দেহ সকল স্পন্দিত হওয়াতে সেই সেই মৃত দেহকে সজীব বলিয়া ভ্রান্তি হইতে লাগিল[২০]। অম্বুদমণ্ডল পর্ব্বতশিখর ভ্রমে করীন্দ্রগণের রাশীকৃত মৃত দেহের উপর বিশ্রাম করিতে লাগিল। বিশীর্ণ রথসমূহ বাতবিচ্ছিন্ন মহাবনের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল[২১]। ভীষণ রক্তনদীর প্রবাহে শর, শক্তি, ঋষ্টি, মুষল, গদা, প্রাস, অসি, অসিকোষ, হয় ও হস্তিগণের মৃতশরীর ভাসিতে লাগিল[২২]। এই সময়ে পর্য্যাণ, সন্নাহ ও কবচাদির দ্বারা ভূতল এবং কেতু ও চামরপট্ট প্রভৃতির দ্বারা তত্রস্থ মৃত দেহ সকল সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল[২৩]।

হে রাঘব! পবনদেব এই রণে ফণিফণাকারে সমুচ্ছ্রিত ও সচ্ছিদ্র তূণীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া বেণুরন্ধ্রপ্রবিষ্ট বায়ু কূজনের অনুকার করিতে লাগিলেন এবং পিশাচগণ এই অবসরে শবরাশিরূপ পলালশয্যায় শয়ন করতঃ সুখে নিদ্রা যাইতে লাগিল[২৪]। চূড়ামণি, হার ও অঙ্গদ প্রভৃতি অলঙ্কারের দীপ্তিতে দীপ্তিমান্ চাপসমূহ চতুর্দ্দিক্ পরিব্যাপ্ত থাকায় বোধ

হইতে লাগিল, যেন সমর ভূমি এখন খদ্যোৎ-পরিবৃত নিবিড় অরণ্যের শোভা বিস্তার করিতেছে। অবসর পাইয়া কুকুর ও শৃগালগণ শব-সমূহের উদর হইতে দীর্ঘরজ্জুবৎ আর্দ্র অন্ত্র সমূহ আকর্ষণ করিতে লাগিল[২৫]। আসন্নমৃত্যু নরগণ বিকটদশন হইয়া ঘর্ঘরধ্বনি করিতে লাগিল। সজীব নরভেকগণ রক্তকর্দ্দমে নিমগ্ন হইতে লাগিল[২৬]। তত্রত্য অতি ভীষণ শত শত শোণিতনদীর গাত্রে যোধগণের উৎপাটিত রাশি রাশি চক্ষু ভাসমান হইয়া বিন্দুচিত্রিত কবচের অনুকার করিতে লাগিল এবং তাহাদিগের বাহু ও উরুরূপ বৃহৎ কাষ্ঠ সকল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। বন্ধুগণ মৃত ও অর্দ্ধমৃত মানবগণকে বেষ্টন করতঃ ক্রন্দন করিতে লাগিল। হে কুলপাবন রাম! এই রণে রণক্ষেত্র শর, আয়ুধ, রথ, অশ্ব, হস্তী এবং পর্য্যাণ প্রভৃতির দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল। নর্ত্তনশীল দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ কবন্ধগণের দ্বারা নভোমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। ঘ্রাণপীড়াদায়ক মদ, মেদ ও বসা প্রভৃতির গন্ধ দ্বারা জনগণের নাসারন্ধ্র আর্দ্র হইয়াছিল। অর্দ্ধমৃত হস্তী ও অশ্ব সকল মরণোন্মুখ ও ঊর্দ্ধতালু হইয়া অবস্থিতি করিয়াছিল। রক্তনদীর প্রবাহপ্রহারের শব্দ (তরঙ্গা-ঘাতের শব্দ) দুন্দুভিবাদ্যের সাদৃশ্য বিস্তার করিয়াছিল[২৭।৩০]। ম্রিয়মাণ নরসৈন্যগণের ফুৎকারে তাহাদিগের মুখপ্রদেশ হইতে শোণিতপ্রণালী প্রসৃত হইয়াছিল[৩১]। শত শত শোণিত-নদীতে মৃত হস্তী ও অশ্ব রূপ মকর বাহিত হইতে হইয়াছিল। হে রামচন্দ্র! দর্শকেরা দেখিল, শরপূর্ণমুখ স্বল্পজীবনাবশিষ্ট সৈন্যগণের ক্রন্দনধ্বনি অবরুদ্ধ হইয়াছে। ক্ষণকাল এই স্থানে থাকিলে পিণ্ডভার্য্যার অর্থাৎ বামকুক্ষিস্থ মাংস খণ্ডের (প্লীহার) বসাগন্ধসম্পৃক্ত বায়ুর সঞ্চারে শরীরস্থ শোণিত ঘনীভূত হইয়া যায়[৩২]। আরও দেখা গেল, কবন্ধগণ অর্দ্ধমৃত করীন্দ্রগণের ঊর্দ্ধনাসার দ্বারা আক্রান্ত হইতেছে। হস্তিপকহীন হস্তী ও আরোহি-বিহীন অশ্ব সমূহের ভ্রমণ বেগে উত্তাল কবন্ধগণ নিপতিত হইতে লাগিল[৩৩]। ক্রন্দনকারী, নিপতিত ও মৃত জীবগণ দ্বারা রণভূমিস্থ রুধিরপ্রবাহ উচ্ছলিত হইতে লাগিল। কুলাঙ্গনাগণ মৃত ভর্ত্তার গল-দেশ আলিঙ্গন করতঃ শস্ত্রাঘাত দ্বারা স্ব স্ব প্রাণ পরিত্যাগ করিতে লাগিল[৩৪]। বিদেশী নরগণ স্ব স্ব স্বামীর আদেশক্রমে শিবির হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইয়া সংস্কার করিবার নিমিত্ত রণক্ষেত্র হইতে স্ব স্ব আত্মীয়জন-

গণের শব পরীক্ষা করিয়া আনয়নার্থ প্রবৃত্ত হইলে, শবাহরণ-ব্যাকুল সেই সকল মানবগণের প্রাণতুল্য অনুচরগণ তাঁহাদিগের সেই স্বাভিলষিত শবান্বেষণে ব্যাকুল হইয়া হস্তধারণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে আকর্ষণ করিতে লাগিল[৩৫]। সেই সমরক্ষেত্ররূপ উত্তুঙ্গতরঙ্গসমাকুল সমুদ্রে কেশরূপ শৈবাল, বদনরূপ কমল, ও চক্ররূপ আবর্ত্তযুক্ত শত শত রক্তনদী প্রবাহিত হইতে দেখা গিয়াছিল[৩৬]। কেহ অর্দ্ধমৃত মানবগণের অঙ্গলগ্ন আয়ুধ উদ্ধার করিবার নিমিত্ত ব্যগ্র, কেহ বা বিদেশে স্বজনব্যসন হওয়ায় শোকে নিতান্ত আকুল, কেহ বা মৃত যোধগণের পারলৌকিক হিতকামনায় তাহাদিগের অঙ্গভূষণ ও গজ বাজী প্রভৃতি বিতরণ করিতে লাগিল[৩৭]। সৈন্যগণ প্রাণত্যাগকালে স্বীয় পুত্র, মাতা, ইষ্ট দেবতা ও পরমেশ্বরের নাম স্মরণ করিতে লাগিল। এই সময়ে সেই রণস্থলে কেবল মর্ম্মভেদী ব্যথাপ্রদ হা হা! হী হী! ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল[৩৮]। ম্রিয়মাণ ব্যক্তিরা উচ্চৈঃস্বরে স্ব স্ব প্রারব্ধ কর্ম্ম স্মরণ করিতে লাগিল। দন্তিযুদ্ধে অসমর্থ মৃতপ্রায় ব্যক্তিরা দন্তিগণের নিকট অবস্থিতি করতঃ তাহাদিগের দন্তনিষ্পেষণ ভয়ে স্ব স্ব ইষ্টদেবতা স্মরণ করিতে লাগিল। মহৎ পদাঘাতাদির দ্বারা মৃতকল্প হইয়া পলায়নকারী ভীরুগণ অসুরগণের আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া অশঙ্কিতচিত্তে রুধিরাবর্ত্তসঙ্কুল ভীষণ স্থানে গমনোন্মুখ হইল[৩৯।৪০]। সৈন্যগণ মর্ম্মভেদী শরনিকরের আঘাত প্রাপ্তে পূর্ব্বজন্মকৃত দুষ্কৃতি অনুভব করিতে লাগিল। বেতালগণ কবন্ধগণের বদনবিনিঃসৃত শোণিত পান করিবার নিমিত্ত মুখব্যাদানপূর্ব্বক সেই সমস্ত কবন্ধগণের ছিন্নশির আকর্ষণ করিতে লাগিল[৪১]। সেই সমরক্ষেত্র উচ্ছ্রীয়মান ধ্বজ, ছত্র ও চামররূপ পঙ্কজে পরিপূর্ণ, চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত অরুণরাগরূপ সান্ধ্য (সন্ধ্যা কালের) কিরণে দিঙ্মণ্ডল সমুদ্ভাসিত, ভাসমান রক্তোষ্ণীষরূপ কোকনদে শোভিত, রথ, চক্র ও পর্ব্বতরূপ আবর্ত্তে সঙ্কুল, পতাকারূপ ফেনপুঞ্জে সমাকীর্ণ, চারুচামররূপ বুদ্‌বুদে পরিব্যাপ্ত, পঙ্কনিমগ্নপুরীসদৃশ বিপর্য্যস্ত রথনিকররূপ ভূমি (দ্বীপ) সম্পন্ন হইয়া যেন অষ্টম রক্তমহার্ণবের ন্যায় (প্রসিদ্ধ সমুদ্র ৭, এটী ৮) দৃষ্ট হইতে লাগিল। সৈন্যগণ উৎপাতবাতনির্দ্ধূত দ্রুম বনের ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিল[৪২।৪৩]। হে রঘুনাথ! প্রলয়দগ্ধ জগতের ন্যায়, অগস্ত্যপীত সমুদ্রের ন্যায় ও অতিবৃষ্টিবিনষ্ট দেশের ন্যায় এই

জনশূন্য সমরভূমি সৈন্যগণের অঙ্গ বিভূষণ দ্বারা পরিব্যাপ্ত ও ভূশুণ্ডীমণ্ডল দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল[৪৫]। সর্পাকার বাণ, কুন্তাস্ত্র, ভূশুণ্ডী, তোমর ও মুদ্গর সহ সামন্ত গণের অঙ্গভ্রষ্ট ভূষণে সেই সমর ভূমি সমাচিত হইয়াছিল[৪৬]। বীরগণের দেহ, শরীরে আবিদ্ধ কুন্তাস্ত্র সমূহের দ্বারা রক্ত-নদীতীরস্থ শৈলশিখরসঞ্জাত তালদ্রুমের ন্যায় পরিদৃষ্ট হইয়াছিল[৪৭]। করীন্দ্র-গণের অঙ্গপ্রোথিত হেতিরূপ বৃক্ষ সকল স্বীয় উজ্জ্বল প্রভায় কুসুমনিকর-শোভিত বৃক্ষের অনুকার করিয়াছিল এবং কঙ্ক প্রভৃতি পক্ষিগণসমাকৃষ্ট অন্ত্রের (নাড়ী বিশেষের) ও রসনাবৃন্দের দ্বারা গগনমণ্ডল জালকসদৃশ হইয়াছিল[৪৮]। কুন্ত সকল এই সমরভূমিস্থিত রুধির সরিতের তীরে উন্নত সরল দ্রুমের (সরল একপ্রকার বৃক্ষ) ন্যায় ও পতাকা সকল রক্ত সরোবরের মধ্যে রক্ত পদ্মের শোভা বিস্তার করিয়াছিল[৪৯]। মৃত হস্তীর পতন প্রহারে নিপতিত জনগণের কটিদেশ ভগ্ন হওয়াতে তাহারা কষ্টস্পষ্টে কিয়দ্দূর গমন করতঃ অবশেষে রণকর্দ্দমনিপতিত সেই সেই হস্তীর প্রতি কাতর দৃষ্টি নিপাতিত করিয়াছিল। এই সময়ে সুহৃদ্গণ মুমূর্ষু যোধগণ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া আগমন করতঃ রণকর্দ্দমে নিপতিত হইয়া মৃতকল্প হইতে লাগিল[৫০]। হেতির দ্বারা ছিন্নমস্তক মানবগণ স্থাণু বলিয়া অর্দ্ধসন্দিগ্ধ হইতে লাগিল। সেই শোণিতনদীতে হস্তিগণের গণ্ড এবং পর্য্যাণ (যাহা হস্তীর পৃষ্ঠোপরি বসিবার জন্য থাকে তাহা পর্য্যাণ) ভাসিয়া যাওয়ায় সে সকল নৌকা শ্রেণীর সাদৃশ্য ধারণ করিল এবং রক্তস্রোতে ভাসমান শুভ্রবস্ত্র সকল ফেনপুঞ্জের শোভা বিতরণ করিতে লাগিল। আজ্ঞাপ্রাপ্ত ভৃত্যগণের দ্বারা ক্ষিপ্রসঞ্চারে রণক্ষেত্রস্থ হতাহত মানবগণ বিবেচিত হইতে (কে জীবিত আছে এবং কে মৃত হইয়াছে তাহা অবধারিত হইতে) লাগিল[৫১।৫২]। রণস্থলের চতুর্দ্দিকে কবন্ধ ও দানব আপতিত হইতে দেখা গেল। ঊর্দ্ধ, স্থূল ও বৃহৎ ছিদ্র চক্রের দ্বারা সৈন্যগণ বিচ্ছিন্ন, চূর্ণীকৃত ও পলায়িত হইতে লাগিল[৫৩]। ভীষণ রণ নিস্বনের সহিত অর্দ্ধমৃত প্রাণি-গণের ভাঙ্কার ও ফেৎকার ধ্বনি (একপ্রকার ভয় জনক কাতর শব্দ) শ্রুত হইতে লাগিল। কঙ্কাদি পক্ষিগণ পক্ষনিক্ষেপ করতঃ ঊর্দ্ধে উৎ-পতিত হইয়া শিলীমুখবিনিঃসৃত শোণিতধারা নিরবলম্বে পান করিতে লাগিল[৫৪]। উত্তাল বেতালগণ উন্মত্ত হইয়া তালে তালে নৃত্য করিতে লাগিল। জীবিত ভটগণ ভগ্নরথের দ্বারা নিষ্পীড়িত ও অর্দ্ধাচ্ছন্ন হইতে

লাগিল[৫৫]। অন্তর্জ্জীবিড সৈন্যগণ ভীতিপ্রদ স্পন্দন (ছটফট করা) ও শোণিতাক্তমুখে কিঞ্চিজ্জীবিত জীবের কৃপা.প্রাপ্তির নিমিত্ত সসম্ভ্রমে শবাক্রমণ করিতে লাগিল[৫৬]। সেই সমরস্থল তখন কুক্কুর, বায়স ও শ্বাপদগণের মহাকোলাহলে সমাকুল ও সম্যক নিকৃত্ত অসংখ্য অশ্ব, হস্তী, পুরুষ, অধীশ্বর এবং রথাদির দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। মাংসাশী প্রাণীরা সেই সেই ভক্ষ্যের নিমিত্ত যুদ্ধকলহ ও কোলাহল করিতে লাগিল। উষ্ট্র-গ্রীবা হইতে রক্ত নিস্রুত হইয়া মনোহর নদী প্রবাহিত হইতে লাগিল। সেই রক্তরূপ জলের অবসিঞ্চনে পল্লবিত আয়ুধরূপ লতা সকল চতুর্দ্দিকে বিততাঙ্গ হওয়ায় বোধ হইতে লাগিল, রণভূমি যেন মৃত্যুর উপবন বা প্রমোদ কানন হইয়াছে। যেমন কল্পান্তকালে সমুদায় জগৎ বিপর্য্যস্ত হয়, তেমনি আজ জগৎ যেন বিপর্য্যস্ত হইয়াছে[৫৭।৫৮]।

অষ্টত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

একোনচত্বারিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রামচন্দ্র! অনন্তর স্বচ্ছ নভোমণ্ডলে দিবাকর রণবিনষ্ট বীরগণের ন্যায় আরক্তবর্ণ হইয়া স্বীয় পরিম্লান প্রতাপ, সমুদ্রে বিসর্জ্জন করিলেন১। দেখিতে দেখিতে আকাশ রক্তবর্ণতা ত্যাগ করিলেন ও সন্ধ্যালক্ষণগ্রাহী হইলেন। ক্রমে রাত্রি আগমন করিলে রণস্থল যে কি ভীষণ হইল তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। তখন প্রলয়সমুদ্রের মহাকল্লোলের ন্যায় ভুবন, পাতাল, নভোমণ্ডল ও চতুর্দ্দিক হইতে করতালধ্বনিকারী বেতালগণ বলয়াকারে রণভূমিতে সমুপস্থিত হইতে লাগিল২,৩। নভোমণ্ডলে তারকা নিকর দেখা গেল। বোধ হইল, যেন দিনরূপ নাগেন্দ্রের মস্তক তীক্ষ্ণ খড়্গে ছিন্ন হইয়াছে, তাই সন্ধ্যারাগরূপ তদীয় শোণিত দ্বারা অরুণবর্ণ গজমুক্তা সকল ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইয়াছে৪। যোধ গণের হৃদয়পদ্ম আজ্ প্রাণরূপহংসবিহীন, মোহান্ধকারে সমাচ্ছন্ন ও সঙ্কুচিত হইয়াছে৫। আসন্নমৃত্যু যোধগণ নিমীলিতনেত্রে ও মরণদুঃখে উন্নতকন্ধর হইয়া কুলায়স্থিত পক্ষীর ন্যায় রণস্থলে শয়ন করিয়াছে। অথবা মৃতযোধগণের অঙ্গে অস্ত্র সকল এরূপ ভাবে বিদ্ধ হইয়াছে যে, দূর হইতে দেখিলে বোধ হয়, যেন পক্ষী সকল কুলায়ে উন্নতগ্রীব হইয়া রহিয়াছে৬। যেমন চন্দ্রদেবের সৌন্দর্য্যময়ী জ্যোৎস্নায় কুমুদাদি কুসুম প্রফুল্ল হয়, তেমনি, বিশ্রান্ত বীরগণের হৃদয় প্রফুল্ল হইয়াছে৭। সেই প্রদোষকালে সেই রক্তবারিময়ী রণভূমি সঙ্কুচিত[illegible] ও পদ্মবনবিশিষ্ট মহাসরোবরের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। ([illegible] বীরগণের শরীরাভ্যন্তরে বাণ প্রবিষ্ট আছে, এবং তাহারাও সঙ্কুচিত[illegible] শয়িত আছে, সুতরাং সে দৃশ্য উক্তপ্রকার সরোবরের অনুরূপ)৮। উর্দ্ধভাগে ব্যোমরূপ সরোবর, তাহাতে তারারূপ কুমুদ, নিম্নভাগে ভূতলস্থ রুধির পরিপূর্ণ সরোবর, তাহাতে প্রস্ফুরিত বী[illegible]রূপ কুমুদ শোভা বিস্তার করিতে লাগিল৯। যেমন সেতু না থাকিলে সলিলরাশি দিক্ বিদিক্ গমন করে, সেইরূপ, আজ্ ভূতগণ অন্ধকারে ভূতগণের সহিত মিলিত হইয়া পরিচয় অভাবে ভয়ে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত [illegible]

য়াছে[১০]। সেই সমরাঙ্গনে বেতালগণ গান করিতে লাগিল এবং কণ্-কণ্ধ্বনিকারী নরকঙ্কাল সমূহের অঙ্কোপরি কঙ্ক ও কাকোল প্রভৃতি মাংসাশী পক্ষী নৃত্য করিতে লাগিল[১১]। বীরগণের চিতাগ্নি হইতে জ্বলন্ত শিখা সমূহ উত্থিত হইয়া তারানিকরসঙ্কুল নভোমণ্ডল ভাস্বর করিয়া তুলিল ও সেই প্রজ্বলিত চিতানলে মেদ ও মাংসের পচপচধ্বনি শুনা যাইতে লাগিল[১২]। সেই সমরক্ষেত্র, কুক্কুর, কাক ও বেতালগণের মহাকোলাহলে ও ভূতগণের ঘনসঞ্চারে সাগরের ন্যায় ভীষণ দৃশ্য হইয়া উঠিল[১৩]। কোলাহলকারী শৃগাল, কুক্কুর, যক্ষ, বেতালগণ ও ভূত গণের গমনাগমনে সেই অন্ধকারনিলীন রণস্থল সূর্য্যালোকবিহীন উড্ডীয়মান অরণ্যের উপমা প্রাপ্ত হইল[১৪]। ডাকিনীগণ ব্যগ্র হইয়া রক্ত, মাংস, বসা ও মেদাদি হরণ করিতে লাগিল। স্কন্ধবিগলিতরুধির পিশাচগণ রুধির, বসা ও মাংসাদি ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। মধ্যে মধ্যে তাহারা চিতালোক দ্বারা প্রকাশীভূত রুধির ও শবসমূহ অন্বেষণ করতঃ গ্রহণ করিতে লাগিল। বিরূপিকাগণ (পুতনাজাতিয়া পিশাচী) স্কন্ধোপরি মহাশব বিন্যস্ত করতঃ গমন করিতে লাগিল[১৫।১৬]। উগ্রমূর্ত্তি কুষ্মাণ্ড (একজাতীয় প্রেত) গণ দলে দলে মণ্ডলাকারে সঞ্চরণ করায় রণস্থল উত্তালীকৃত হইয়া উঠিল। চিতানলশিখা চিম্ চিম্ শব্দে শব-বস্ত্র দগ্ধ করিতে লাগিল। মেদ ও রক্ত সমুত্থিত বাষ্পের দ্বারা অদ্ভুতাকার মেঘ উৎপন্ন হইতে লাগিল[১৭]। খেচর ভূতপ্রেতগণের পদপ্রদেশ রক্তনদীর স্রোতে নিমগ্ন হওয়ায় তাহারা ভূচরের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। কাকোল পক্ষিগণ আনন্দে কল কল ধ্বনি করতঃ বেতালকুলাহৃত কঙ্কাল আকর্ষণ করিতে লাগিল[১৮]। বেতালবালকগণ মৃতমাতঙ্গোদররূপ মঞ্জুষা মধ্যে সানন্দে শয়ন করিতে লাগিল। গতজীবন জীবে পরিব্যাপ্ত ঈদৃশ সমরক্ষেত্রে রাক্ষসগণ আনন্দে যানারোহণ পূর্ব্বক ক্রীড়া করিতে লাগিল[১৯]। চিতানল শিখায় সমুজ্জ্বলিত সেই রণভূমিতে উন্মত্ত বেতালগণ পরস্পর কলহ করিতে লাগিল। রক্ত ও বসাদির উগ্রগন্ধের মিশ্রণে মারুত ঘনীভূত হইল[২০]। পূতনাগণের (পূতনা রাক্ষসী বিশেষ) করণ্ডের (পেটরার) রট রট শব্দ শুনা যাইতে লাগিল। যক্ষগণ অর্দ্ধপক্ক শব ভক্ষণে লুব্ধ হইয়া পরস্পর কলহ করিতে লাগিল[২১]। নিশাচর পক্ষিগণ তুঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, অঙ্গ ও তঙ্গনাবাসী মৃত যোধগণের অঙ্গে

সংলগ্ন হইয়া রহিল। রূপিকাগণের হাস্যকালে তাহাদিগের বদন হইতে তারা-পাতোপম প্রভা বিনির্গত হইতে লাগিল। তাহাতে বোধ হইতে লাগিল, যেন তাহাদিগের সম্মুখে অগ্নিজ্বালা অবস্থিত রহিয়াছে[২২]। শোণিতাভিলাষী বিরূপিকাগণ উল্লাস সহকারে, আপতিত বেতালগণের মধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিল। যোগিনীনায়কগণ, পিশাচগণ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া সমাগত হইতে লাগিল[২৩]। তাহারা বীরপুরুষ গণের অস্ত্র সকল আকর্ষণ করায়, যে, শব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল, সে শব্দ বীণা নিনাদের সহিত তুলিত হইতে পারে। পিশাচের ভয়ে মানুষেরাও পিশাচ প্রায় হইতে লাগিল[২৪]। জীবিত সৈন্যগণ বিরূপিকা দিগের আকার প্রকার অবলোকন করিয়া ভয়ে মৃতকল্প হইতে লাগিল। কোন কোন স্থলে বেতাল ও যক্ষগণ আনন্দোৎসব করিতে লাগিল[২৫]। স্বরূপিকা (রাক্ষসী) গণের স্কন্ধ হইতে নিপতিত শবরাশির শব্দে নিশাচরগণ ত্রস্ত হইতে লাগিল। ব্যোমমার্গ, ভূত প্রেত ও পিশাচগণের পেটরায় সঙ্কট হইয়া উঠিল[২৬]। যক্ষপিশাচাদি নিশাচরগণ অতিযত্নে নরামিষ আহরণ করতঃ ভক্ষণার্থ অপেক্ষাকারী স্বপক্ষগণের নিকট নিক্ষেপ করিতে লাগিল[২৭]। ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ রুধিরাক্তকলেবর নরগণ মূর্চ্ছান্তে সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া জম্বুকগণের মুখবিনির্গত অগ্নিশিখোপম উজ্জ্বল আলোকে (আলেয়ার আলোকে) এরূপ দৃষ্ট হইতে লাগিল যে, যেন অশোকপুষ্পের গুচ্ছ সকল সজ্জিত রহিয়াছে[২৮]। বেতালবালকগণ কবন্ধগণের স্কন্ধে ছিন্ন-মস্তক যোজনা করিয়া ক্রীড়া করিতে লাগিল। আকাশে ভ্রমণকারী যক্ষ, রক্ষ ও পিশাচাদির উল্মুখ (অলাত) নভোমার্গ দীপ্তিমান্ করিল। এই অন্ধকারসমাচ্ছন্ন ও ভূতগণের বেগবিকম্পিত রণক্ষেত্র আজ্ আকাশ, ভূধর, নিকুঞ্জ ও পর্ব্বতগুহামধ্যস্থিত পীঠবৎপ্রতিষ্ঠিত মেঘসমাচ্ছন্ন কল্পা-নিলবিকম্পিত করকাসঙ্কুল ব্রহ্মাণ্ডের ন্যায় ভীষণ হইয়াছে[২৯।৩০]।

একোনচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

চত্বারিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠদেব বলিলেন, জনগণ যদ্রূপ দিবসে নিঃশঙ্কে বিচরণ করে, তদ্রূপ, সেই ঘোর অন্ধকার রাত্রে রণাঙ্গনে নিশাচর রাক্ষস, পিশাচ ও যমদূত সকল সঙ্কুল হইয়া বিচরণ আরম্ভ করিল[১]। যেন হাত দিয়া ছুরীকৃত করিতে হয় এরূপ গাঢ় অন্ধকারে পরিপূর্ণ সেই নিশারূপ গৃহে ভক্ষ্যসমৃদ্ধি লাভে আনন্দিত হইয়া ভূত, প্রেত ও পিশাচগণ উদ্গতবস্ত্র (উলঙ্গ) হইয়া নাচিতে লাগিল[২]। নগরে নাগরিকগণ নিদ্রায় অচৈতন্য, দিক্ সকল নিঃশব্দ, রণাঙ্গনে কেবল নিশাচর জীবের ঘোর সঞ্চার, এতদ্রূপ ভীষণ মধ্যরাত্র সময়ে উদারাত্মা লীলাপতি রাজা বিদূরথ কিঞ্চিৎ খিন্নমনা হইলেন[৩]। অনন্তর মন্ত্রকোবিদ মন্ত্রিগণের সহিত সত্বর প্রাতঃকাল কর্ত্তব্য যুদ্ধাদি কার্য্যের বিষয় বিচার করিয়া শশাঙ্কনিভ মনোহর, শিরীষসম পেলব, অর্থাৎ সুকোমল ও শিলাসদৃশ সুশীতল শয়নে (শয্যায়) মুহূর্ত্তকাল নয়নপদ্ম মুদ্রিত করতঃ নিদ্রাগত হইলেন[৪।৫]। এই সময়ে লীলা ও সরস্বতী উভয়ে ব্যোমমণ্ডল পরিত্যাগ করতঃ বাতলেখা (সূক্ষ্ম বায়ু) যেমন পদ্মমুকুল মধ্যে অলক্ষ্যে প্রবেশ করে, তেমনি, দ্বারসন্ধিগত সূক্ষ্মরেখার ন্যায় সূক্ষ্ম রন্ধ্র দিয়া লীলাপতির তাদৃশ গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন[৬]।

রামচন্দ্র বলিলেন, প্রভো! বাগ্মিপ্রবর! উক্ত দেবীদ্বয়ের স্থূল দেহ কি প্রকারে সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়া গৃহমধ্যে শীঘ্র প্রবিষ্ট হইল? তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন[৭]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, অনঘ! যাহার "আমি ভৌতিকদেহী ও স্থূল" এইরূপ নিরূঢ় বিভ্রম বিদ্যমান আছে, সেই ব্যক্তিই সূক্ষ্মরন্ধ্র গমনে সমর্থ হয় না[৮]। যে পূর্ব্ব হইতে বার বার বহুবার অনুভব করিয়া আসিতেছে যে, আমি মানব—বৃহৎশরীরী—কি প্রকারে সূক্ষ্ম ছিদ্রে প্রবিষ্ট হইব? আমার শরীর সূক্ষ্ম আয়তনে পর্য্যাপ্ত হইবে কেন? (ধরিবে কেন?) সে ব্যক্তিই আপনার সেই প্রকার স্থূল দেহত্ব অনুভব করিয়া সূক্ষ্মায়তনে প্রবিষ্ট হইতে পারে না এবং সেই ব্যক্তিই সূক্ষ্মাদি গমনে নিরুদ্ধ

হয়[৯]। কিন্তু যে ব্যক্তির নরদেহে অহংবুদ্ধি নাই এবং আপনার সুসূক্ষ্ম আতিবাহিকদেহতা নিশ্চয় আছে, সেই ব্যক্তি সেই নিশ্চয়ের দৃঢ় সংস্কার বলে স্বপ্নে গমনাগমন করিতে পারে। যে ব্যক্তি পূর্ব্বে বহুবার এইরূপ অনুভব করিয়াছে যে, আমি অনবরুদ্ধস্বভাব, সেজন্য আমি সূক্ষ্মতম ছিদ্রে গমন করিতে সমর্থ; সেই ব্যক্তির চেতনাংশে অর্থাৎ জীবচৈতন্যে তাদৃক্ স্বভাব আবির্ভূত হয়। তখন সে অনায়াসে সর্ব্বত্র অব্যাহতা গতি অবলম্বন করিতে পারে[১০]। যেমন অন্তরে, তেমনি বাহিরেও। যে বস্তু কঠিনস্বভাব, সে বস্তু সেইরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে। বায়ু তির্য্যক্ গমন ব্যতীত কদাচ উর্দ্ধ গমন ও পাবক উর্দ্ধগমন ব্যতীত অধোগমন করে না। যে চৈতন্যে যে শক্তির আবির্ভাব হয় সে চৈতন্য সেই প্রকারেই অবস্থিতি করে[১১]। পরমাত্মা সম্যক্ প্রকারে বিদিত হইলে কোন প্রকার দুঃখ থাকে না। ছায়োপবিষ্ট ব্যক্তির কি তাপানুভব হয়? চিত্ত, সম্বিদের (চৈতন্যের বা জ্ঞানের) অনুগামী হইয়াই অবস্থিতি করে। রজ্জুতে সর্পভ্রম হইলে তাহা যেমন জ্ঞানবলে বিনষ্ট হইয়া যায় ও রজ্জুজ্ঞান প্রথিত হয়, সেইরূপ, প্রযত্ন বিশেষের বলে সম্বিৎ পদার্থে ভ্রান্তিবিদিত চিরনিরূঢ় স্থৌল্যের অন্যথা হইয়া থাকে[১২,১৪]। চিত্ত যেমন সম্বিদের অনুসারী, সেইরূপ, চেষ্টাও চিত্তের অনুসারিণী। তাহা বালক প্রভৃতি সকলেই অনুভব করিয়া থাকেন[১৫]। অতএব, যাহার প্রকৃত আকার স্বপ্নের ও সঙ্কল্পপুরুষের অনুরূপ, অথবা আকাশের সদৃশ, কি প্রকারে তাহা অবরুদ্ধ হইতে পারে? তাহার অবরোধ অসম্ভব[১৬]। চিত্তমাত্রাকৃতি আতিবাহিক শরীর কোনও কিছুতে অবরুদ্ধ হয় না। হৃদ্গতজ্ঞানপ্রভাবে এই ভৌতিক শরীর আতিবাহিকত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এবং চিত্তবৃত্তির উদয়াস্তানুসারে এই ভৌতিক দেহেরও উদয় ও অস্ত অনুভূত হইয়া থাকে। জ্ঞান ও কর্ম্ম অনুসারে সমুৎপন্ন ভূত সকলের একীভাবই স্থূলদেহের কারণ[১৭,১৮]। ভাবনাপ্রভাবে চিত্তাকাশ, চিদাকাশ, মহাকাশ, এই আকাশত্রয় অভিন্ন অর্থাৎ এক হইয়া যায়[১৯]। হে রামচন্দ্র! চিত্তশরীরত্ব সকল বস্তুতেই আবির্ভূত হইয়া থাকে। চিত্তশরীর এত সূক্ষ্ম যে, তাহা ত্রসরেণু মধ্যে অবস্থিত, গগনোদরে অন্তর্হিত, অঙ্কুরমধ্যে বিলীন ও পল্লব মধ্যে রসরূপে অবস্থিতি করে[২০]। তাহাই জলে বীচিভাব প্রাপ্ত হইয়া উল্লাসিত হইতেছে, শিলোদরে নৃত্য

করিতেছে, অম্বুদরূপে বারিধারা বর্ষণ করিতেছে, শিলারূপেও অবস্থিতি করিতেছে[২১।২২]। এই চিত্তশরীর যথেচ্ছগামী। এমন কি, পর্ব্বত জঠরেও প্রবেশ করিতে সমর্থ। এই শরীর অনান্তাকাশব্যাপী, আবার তাহাই পরমাণুতুল্য[২৩]। সে শরীর গগনস্পর্শী অধোমূল ধরাধর রূপে অবস্থিতি করিতেছে, বাহিরে বনতরুরুহ (বৃক্ষাদি) প্রভৃতি ও অন্তরে প্রাণশক্তি প্রভৃতি বিধারণ করিতেছে[২৪]। যদ্রূপ জলনিধির আবর্ত্তরচনা জলনিধির অভিন্ন, তদ্রূপ, কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডরচনাও চিত্তস্বরূপের অভিন্ন। আত্মচিত্তই সমুদ্রের আবর্ত্ত ধারণের ন্যায় অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করিতেছে[২৫]। এই চিত্তদেহই সৃষ্টির পূর্ব্বে উদ্বেগরহিত অর্থাৎ নিরাকুল শুদ্ধবোধরূপে অবস্থিতি করে। পরে তাহাই আকাশাদি ক্রমে বৃহদ্ব্রহ্মাণ্ডের আকার ধারণ করতঃ প্রারব্ধানুরূপ প্রবৃত্তির অধীন হয়[২৬]। যেমন অসত্যবুদ্ধির দ্বারা মরু-মরীচিকায় মিথ্যা সলিলের উদয় হয়, এবং যেমন স্বপ্নে "এই বন্ধ্যাপুত্র রহিয়াছে" বলিয়া প্রতীত হয়, তেমনি, সেই আকাশাত্মা ও স্বনিষ্ঠ অসত্য বুদ্ধির দ্বারা মহান্ ব্রহ্মাণ্ড হইয়া বিস্তৃততা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন[২৭]।

রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! আমাদের সকলেরই চিত্ত কি ঐরূপ শক্তিসম্পন্ন? অথবা কোন এক বিশেষ চিত্ত ঐরূপ শক্তিবিশিষ্ট? অপিচ, আপনি যে বলিলেন, চিত্তও সৎপদার্থ নহে। সে বিষয়েও আমার জিজ্ঞাসা জন্মিতেছে যে, কি নিমিত্ত চিত্ত সৎস্বরূপ নহে? আরও জিজ্ঞাস্য এই যে, আমাদের প্রত্যেকের চিত্ত কি ভিন্ন ভিন্ন জগৎ অনুভব করে? কি এক অভিন্ন জগদ্দর্শন করে?[২৮]

বশিষ্ঠ বলিলেন, রামচন্দ্র! প্রত্যেক চিত্তই ঐরূপ শক্তিসম্পন্ন ও প্রত্যেক চিত্তই পৃথক্ পৃথক্ জগদ্ভ্রম ধারণ করে[২৯]। মহাপ্রলয়ের পর সৃষ্টি, এ প্রবাদ যেরূপে সঙ্গত হয়, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। যে ক্রমে ক্ষণকাল মধ্যে অসংখ্য ও অনন্ত জগৎ সমুদিত ও বিগলিত হয়, তাহাও বলিতেছি, প্রণিধান কর[৩০]।

হে রাঘব! এই জগতে প্রত্যেক ব্যক্তিই মরণমূর্চ্ছা অনুভব করিয়া থাকেন। হে সুমতে! সেই মুর্চ্ছাই তাহাদের প্রলয়যামিনী।* সেই প্রলয়-

* তাৎপর্য্য এই যে, ব্যষ্টি সৃষ্টি পক্ষে প্রত্যেক ব্যক্তির পূর্ব্বমরণ মহাপ্রলয় এবং সমষ্টি সৃষ্টিতে সমষ্টিচিত্তশরীর হিরণ্যগর্ভের সুষুপ্তি ও মরণ মহাপ্রলয়।

রাত্রি প্রভাতা হইলে সকলেই পৃথক্ পৃথক্ সৃষ্টি বিস্তার করে। যাহার যেমন জ্ঞান ও যেমন কর্ম্ম, সেই তদনুরূপ সৃষ্টি দর্শন ও অনুভব করে। অর্থাৎ যেমন, বিকারের রোগী চিত্তব্যামোহে অচলের (পর্ব্বতের) নৃত্য দেখে, তাহার ন্যায়, অনাদি অবিদ্যার প্রভাবে সংসারের সৃষ্টি অনুভূত হয়[৩১।৩২]। যদ্রূপ মহাপ্রলয়ের অবসান হইলে সমষ্টিমনোবপু হিরণ্যগর্ভ সমষ্টিভোগ্যপ্রপঞ্চ বিস্তার করেন, তাহার ন্যায়, ব্যষ্টিমনোবপুঃ জীবও মৃত্যুর অব্যবহিত পরে স্ব স্ব ব্যষ্টিভোগ্যপ্রপঞ্চ বিস্তার (অনুভব) করিয়া থাকেন[৩৩]।

রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! যেমন ব্যষ্টিমনোবপুঃ জীব মৃত্যুর অব্যবহিত পরে স্বকৃত সৃষ্টি (আত্মকল্পিত বিশ্ব) অনুভব করেন, তেমনি, সমষ্টিমনোবপুঃ হিরণ্যগর্ভও প্রলয়ান্তে পূর্ব্বস্মরণের দ্বারা অতিবিস্তৃত সৃষ্টি অনুভব করেন। সুতরাং জগৎ অকারণ অর্থাৎ ইহার ব্রহ্মাতিরিক্ত কারণ নাই, নাই, দেখা যায় বটে; কিন্তু অসত্য, এ সকল কথা এক্ষণে অন্যথা হইতেছে। কেননা, সত্যসঙ্কল্প হিরণ্যগর্ভের সত্যসঙ্কল্পে যাহা উৎপন্ন হইয়াছে তাহা অসত্য হইবার কোন কারণ নাই[৩৪]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, বৎস! মহাপ্রলয়ে হরিহরাদি সকলেই বিদেহমুক্ত হন। সেজন্য তৎকালে তাঁহাদের জগৎস্মৃতি অসম্ভব জানিবে[৩৫]। কল্পান্তকালে যখন বুদ্ধাত্মা আমরা মুক্ত হইব, তখন যে ব্রহ্মাদি দেবতারা বিমুক্ত হইবেন, তাহা বলা বাহুল্য[৩৬]। যে সকল জীব অপ্রবুদ্ধ থাকে; মোক্ষ না হওয়ায় তাহাদিগেরই জন্ম ও মরণ স্মৃতিমূলক। অর্থাৎ প্রাক্তন সংস্কারই তাহাদিগের জন্মমরণের কারণ[৩৭]। মরণমূর্চ্ছার অব্যবহিত পরেই জীবের অন্তরে যে অল্প অল্প অর্থাৎ অবিস্পষ্ট সৃষ্টির ভাব উদিত বা অঙ্কিত হয়, তাহাই পুরাণাদি শাস্ত্রের সৃষ্টির প্রকৃতি[৩৮]। সেই মূলপ্রকৃতি ব্যোমপ্রকৃতি নামেও উদাহৃত হয়। ঐ অব্যক্ত অর্থাৎ মূলপ্রকৃতি জড়ও বটে, অজড়ও বটে। * সেই বিশ্ববীজ প্রকৃতিই এই বিস্পষ্ট বিশ্বের সংস্মৃতির ও অস্মৃতির, প্রলয়ের ও প্রলয়াবসানের অর্থাৎ সৃষ্টির ও সংহারের মূল কারণ[৩৯]। সেই ব্যোমাত্মিকা (আকাশের অনুরূপা) প্রকৃতি যখন প্রবুদ্ধা বা চিৎপ্রতিফলিতা হয়, অর্থাৎ যখন তাহাতে অহম্ভাবের উদয় হয়, তখন তাহাতে তন্মাত্রাপঞ্চক, দিক্ ও কাল প্রভৃতি সূক্ষ্ম ভাব সকল প্রস্ফুরিত বা

* ভাবার্থ এই যে, প্রকৃতি-নামক অব্যক্ত স্বয়ং জড়; পরন্তু তাহাতে চিন্ময় পুরুষের প্রতিবিম্ব পড়ায় তাহা অজড় অর্থাৎ চেতনের ন্যায় হয়।

প্রকটিত হইয়া থাকে। অনন্তর তাহাই অল্পপীবর (কিঞ্চিৎ স্থূল) হইয়া সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় পঞ্চক বিস্তারিত করে। সেই যে সূক্ষ্ম বুদ্ধিময় ইন্দ্রিয় পঞ্চক, তাহাই জীবের আতিবাহিক শরীর[৪০।৪১]। দীর্ঘকাল পরে সেই আতিবাহিক দেহ আমি স্থূল এইরূপ কল্পনার দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া আধিভৌতিকতা প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ ভৌতিক স্থূলদেহ ও তাহাতে অহং-ভাব দৃঢ় হইয়া দাড়ায়[৪২]। তখন সেই চক্ষুঃ, কর্ণ ও নাসিকাদিবিশিষ্ট ভৌতিক দেহ, দিক্, কাল ও তদাশ্রিত পদার্থ নিচয় বায়ুতে স্পন্দক্রিয়ার ন্যায় তাহারই অধীনে তাহাতে (বুদ্ধিতে) মিথ্যাভাবে উৎপন্ন হইয়া থাকে। অর্থাৎ সমস্তই বায়ুবিকার প্রস্পন্দের ন্যায় মনোমাত্রের বিকার। অতএব, এ সকল অনুভূত হইলেও স্বপ্নাঙ্গনাসঙ্গসদৃশ অসৎ। বুদ্ধিই স্বীয় কল্পনায় কথিত প্রকারে প্রকটিত হয় এবং মোহের প্রভাবে (আত্ম-জ্ঞানের অভাবে) ভুবনভ্রান্তি হইয়া থাকে[৪৩।৪৪]। জীব যে স্থানে মৃত হউক, সেই স্থানেই সে তৎক্ষণাৎ উক্তপ্রকার জ্ঞানে আরূঢ় হয় সুতরাং সেই স্থানেই তাহার ভুবন দর্শন সঙ্ঘটন হয়[৪৫]।

হে রামচন্দ্র! ঐ প্রকারে আকাশ সম সূক্ষ্ম জীব বাস্তব জন্মাদিবর্জ্জিত হইয়াও আগন্তুক দেহাদিভাবনার পরবশ হইয়া আমি, আমি জন্মিয়াছি, এবং আমি জগৎ দেখিতেছি, ইত্যাদিবিধ ভ্রম অনুভব করিতেছে। নভো-মণ্ডল সতঃ নির্ম্মল, অথচ অজ্ঞ লোক তাহাতে ইন্দ্রনীলকটাহাকার তল, মালিন্য কেশোণ্ড্রক ও সুরপত্তনাদি (গন্ধর্ব্বনগর প্রভৃতি) দর্শন করে। জগদ্ভ্রম অসংখ্যবিশেষণান্বিত। যথা—মর্ত্ত ও মর্ত্তবাসী, স্বর্গ ও স্বর্গবাসী ইন্দ্রাদিদেবতা, তাহাদের বাসস্থান অমরাবতী, সুমেরু প্রভৃতি শৈল, তৎপ্রদক্ষিণকারী সূর্য্য, চন্দ্র ও তারানিকর, ইহা মর্ত্তলোক, অত্রস্থ মানব, তাহাদের জরা, মরণ, বৈক্লব্য, ব্যাধি ও সঙ্কট, অনুকূল বিষয়ে উদ্যোগ ও প্রতিকূল বিষয়ে অনুদ্যোগ, ঐ সকলে সম্পন্ন স্থূল, সূক্ষ্ম, চর ও অচর প্রাণিসমূহ, অব্ধি, অদ্রি, উর্ব্বী, নদী, অধিপতি, দিবা, রাত্রি, ক্ষণ ও কল্প এবং এই আমি এই স্থানে, এই আমি এই পিতা কর্তৃক জন্মগ্রহণ করিয়াছি; এই আমার আধার; এই আমার সুকৃত, তাহা আমার দুষ্কৃত, আমি পূর্ব্বে বালক ছিলাম, সম্প্রতি যুবা হইয়াছি, এক্ষণে আমার হৃদয়ে বহু ভাব বিলাস করিতেছে, ইত্যাদি[৪৬।৫০]। জীব এইরূপে জগৎ নামক স্বকল্পিত বিষয়ে ভ্রান্ত হইয়া বৃথা জগদ্ভ্রম

অনুভব করিতেছে। এতদ্রূপ জীবসংসার (জীব পূর্ণ জগৎ) বহু অর্থাৎ অসঙ্খ্য। এবং এক এক জীবসংসার তুলনায় এক একটী অরণ্যের সমান। তারা সকল ঐ ঐ অরণ্যের ফুল ও নীলমেঘ ঐ বনের চঞ্চল পল্লব[৫১]। এ সকল অরণ্যে নররূপ মৃগগণ ও সুরাসুররূপ বিহঙ্গমগণ নিয়ত বিচরণ করিতেছে। আলোকপ্রধান দিন ইহার কুসুমরাজির রজঃ ও দুষ্প্রবেশ্যা শ্যামবর্ণা বিভাবরী ইহার নিকুঞ্জ[৫২]। সমুদ্র ইহার পুষ্করিণী, মেরুপ্রভৃতি কুলপর্ব্বত সকল ইহার লোষ্ট্র, এবং চিত্ত ইহাতে পুষ্করবীজ। ঐ বীজের অন্তরে যে অনুভূতি সমূহের সংস্কার নিলীন হইতেছে সেই সকল সংস্কার অপর সংসারারণ্যের অঙ্কুর[৫৩]। জন্তুগণ যে স্থানে মৃত্যুগ্রাসে নিপতিত হয়, সেই স্থানেই তাহারা তৎক্ষণাৎ এই সংসাররূপ বনখণ্ড দর্শন করে। কোটি কোটি ব্রহ্মা, রুদ্র, মরুৎ, বিষ্ণু, বিবস্বান্, গিরি, অব্ধিমণ্ডল ও দ্বীপ গত হইয়াছে[৫৪।৫৫]। আকারবর্জ্জিত পরব্রহ্মে যে কত অসৎ জগদ্বিজ্ঞান আবির্ভূতা হইয়াছে ও হইবে, তাহা কে নিরূপণ করিতে সমর্থ হইবে?[৫৬] এই স্থূল বিশ্ব মনন ব্যতীত অর্থাৎ স্বকীয় সঙ্কল্প ব্যতীত অন্য কিছু নহে। যদি বল, মন চঞ্চলস্বভাব; পরন্তু দেখা যাইতেছে, স্থূল বিশ্ব স্থিরস্বভাব, তাহার প্রত্যুত্তর এই যে, যেরূপে ইহাও চঞ্চল (এই বিশ্বও ক্ষণভঙ্গুর) তাহা বিচার করিয়া দেখ[৫৭]। যাহাকে পূর্ব্বোক্ত চিদাকাশ বলা হইয়াছে তাহাই মনন অর্থাৎ তাহা মনের অব্যতিরিক্ত আশ্রয়। অপিচ, যাহা চিদাকাশ, পরমার্থ দৃষ্টিতে তাহাই পরম পদ[৫৮]। যেমন, যাহা জল তাহাই আবর্ত্ত, তেমনি, যাহা দৃশ্য তাহাই দ্রষ্টা। জলের ও আবর্ত্তের অভিন্নতার দৃষ্টান্তে দৃশ্যও দ্রষ্টা হইতে ভিন্ন নহে[৫৯]। যেমন ঐন্দ্রজালিক মণি আকাশমণ্ডলে বিবিধ ছিদ্র ও তন্মধ্যে নানাবিধ বিচিত্র বস্তু প্রতীয়মান করায়, তেমনি, মিথ্যারূপী অনাদিমায়াও চিদাকাশে অথবা সূক্ষ্মভূত বিরচিত চিত্তাকাশে নাম রূপাদি সম্পন্ন বিবিধবস্তুদর্শনকারী জীবভাবের স্ফুরণ করাইয়া থাকে। চিত্তের সেই সেই স্ফুরণই এক্ষণে জগৎ। একমাত্র "আমি" এই জ্ঞান থাকিলেই জগৎশব্দ পরমার্থস্বরূপে অনুভূত হয়; কিন্তু "তুমি" এইরূপ জ্ঞান দ্বারা জগৎশব্দ আরোপিত বলিয়া বোধ হয়[৬০।৬১]। *

হে রামচন্দ্র! চিদাকাশরূপিণী পরমাত্মস্থিতা অপ্রতিহতগামিনী সেই

* ভাবার্থ এই যে, আত্মাই সব; তাহাতে "তুমি" এই জ্ঞান কল্পিত।

সরস্বতী ও লীলা উক্ত কারণে ও কথিত প্রকারে স্ব স্ব ইচ্ছানুসারে বিদূরথগৃহে আবির্ভূত হইতে সমর্থা হইয়াছিলেন, তাহাতে প্রতিবন্ধক ঘটনা হয় নাই। চিদ্‌বস্তু সর্ব্বগামী এবং তাহাতেই যথার্থ জ্ঞানের উদয় হয়। অপিচ, তাহা আতিবাহিক ও সূক্ষ্ম। অতএব, এমন কি আছে, যাহা তাদৃশ সূক্ষ্ম ও সর্ব্বতঃ প্রসারী আতিবাহিক দেহকে অর্থাৎ চিত্তশরীরকে অবরোধ করিতে পারে? তাহা কোনও কিছুতে অবরুদ্ধ হইবার নহে৬২।৬৪।

চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

একচত্বারিংশ সর্গ ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রামচন্দ্র! অনন্তর সেই দেবীদ্বয় ভূপতি সদনে প্রবেশ করিলে সদ্মমধ্য সমুদিত চন্দ্রদ্বয়ে ধবলীকৃতের ন্যায় সুসুন্দর হইয়া উঠিল[১]। তখন ঐ গৃহে মন্দার-কুসুমবাহী মৃদুসমীরণ ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতে লাগিল। সেই দেবীদ্বয়ের প্রভাবে অন্যান্য নরনারীগণ নিদ্রায় অচেতন হইয়া রহিল, কেবল রাজা বিদূরথ ঐ সময়ে সচেতন থাকিলেন। এই সময়ে সেই গৃহ যেন সৌভাগ্যের নন্দনোদ্যান, সর্ব্ব-প্রকার ভয়নিবারণ ও সবসন্ত বন ও প্রাতঃকালীন প্রফুল্ল অম্বুজ সদৃশ মনঃপ্রসন্নকর হইয়াছিল। রাজা সেই দেবীদ্বয়ের নিস্পন্দ শশাঙ্কশীতল দেহপ্রভায় আহ্লাদিত হইয়া যেন আপনাকে অমৃতাভিষিক্তের ন্যায় বোধ করিতে লাগিলেন[২।৪]।

অনন্তর রাজা দেখিলেন, সেই দিব্য সীমন্তিনীদ্বয় মেরুশৃঙ্গদ্বয়ে সমু-দিত চন্দ্রবিম্বদ্বয়ের ন্যায় আসনোপরি উপবিষ্টা হইয়াছেন। অতঃপর লম্বমান দিব্যমাল্যধারী রাজা বিস্মিতমনে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া শেষ-শয্যা হইতে সমুত্থিত ভগবান্ বিষ্ণুর ন্যায় পর্য্যঙ্ক শয্যা হইতে উঠিলেন। উঠিয়া উপধান প্রদেশে অবস্থিত পুষ্পকরণ্ড হইতে কুসুমাঞ্জলি গ্রহণ পূর্ব্বক "হে দেবীযুগল! আপনারা জন্মদুঃখরূপ দাহের শশিপ্রভা এবং বাহ্য ও অন্তর্গত অন্ধকার বিদ্রাবণকারিণী রবিপ্রভা। আপনাদিগের জয় হইক।" এই বলিয়া নদীতীরস্থিত বিকসিত কুসুম দ্রুম যেমন পদ্মিনীর প্রতি কুসুমাঞ্জলি নিক্ষেপ করে, (জলে পদ্মপুষ্প ফুটিয়া আছে, তদুপরিতীরস্থ বৃক্ষের ফুল পড়িতেছে। সেই দৃশ্য যেরূপ দেবীদ্বয়ের চরণে পুষ্পাঞ্জলি নিক্ষেপ তদ্রূপ) সেই প্রকার, দেবীদ্বয়ের পদদ্বয়ে কুসুমাঞ্জলি অর্পণ করিলেন[৫।১০]। অনন্তর ঈশ্বরী সরস্বতী লীলাকে ভূপতি পদ্মের জন্ম-বৃত্তান্ত বলিবার নিমিত্ত সঙ্কল্প দ্বারা পার্শ্ববর্ত্তী মন্ত্রীকে প্রবোধিত করি-লেন[১১]। মন্ত্রী প্রবুদ্ধ হইয়া সেই দিব্যনারীদ্বয়কে সন্দর্শন পূর্ব্বক প্রণাম ও তাঁহাদিগের পদদ্বয়ে কুসুমাঞ্জলি প্রদান করতঃ পুরোভাগে উপবিষ্ট হইলেন[১২]। অনন্তর দেবী সরস্বতী রাজাকে সম্বোধন পূর্ব্বক

বর্ণিতে লাগিলেন। বলিলেন, রাজন্! তুমি কাহার পুত্র? কিপ্রকারে জন্মগ্রহণ করিয়াছ? এই স্থানে কতকাল অবস্থিতি করিতেছ? এই সমস্ত আমার নিকট বর্ণন কর।

মন্ত্রী দেবীর-প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া রাজার পক্ষ হইতে প্রত্যুত্তর করিলেন, হে দেবীদ্বয়! আমি আপনাদিগের সম্মুখে যে আমার প্রভুর জন্মবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতে সমর্থ হইব, তাহা আপনাদিগেরই প্রসন্নতার মহিমা। যাহাই হউক, আপনারা আমার প্রভুর জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণ করুন[১৩।১৪]।

হে দেবীদ্বয়! পূর্ব্বকালে ইক্ষ্বাকুবংশসম্ভূত রাজীবলোচন শ্রীমান্ কুন্দরথ নামক এক নরপতি ছিলেন। তিনি ভুজচ্ছায়ার দ্বারা দারিদ্র প্রভৃতি জনগণের সন্তাপ তিরোহিত করিয়া অবনী পালন করিতেন[১৫]। সেই মহারাজ কুন্দরথের পুত্র ভদ্ররথ, ভদ্ররথের পুত্র বিশ্বরথ, বিশ্বরথের পুত্র বৃহদ্রথ, বৃহদ্রথের পুত্র সিন্ধুরথ, সিন্ধুরথের পুত্র শৈলরথ, শৈলরথের পুত্র কামরথ, কামরথের পুত্র মহারথ, মহারথের পুত্র বিষ্ণুরথ, এবং বিষ্ণুরথের পুত্র নভোরথ। পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় নিম্মল শরীর আমাদিগের এই প্রভু উক্ত মহারাজ নভোরথের পুত্র[১৬।১৮]। ইনি ক্ষীরোদসমুদ্রীয় চন্দ্রমার ন্যায় জনগণকে অমৃতের দ্বারা অভিষিক্ত করিয়া থাকেন। আমাদিগের এই মহারাজ মহৎপুণ্যসম্ভার সহ উৎকৃষ্ট পুণ্যপুঞ্জের প্রভাবে উপরিউক্ত রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, বলিয়া ইহার নাম বিদূরথ[১৯]। যেমন দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয় গৌরীমাতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তেমনি, আমাদিগের এই মহারাজা সুমিত্রা মাতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইহার পিতা ইহার দশবর্ষবয়ঃক্রম কালে ইহার প্রতি রাজ্যভার সমর্পণ করতঃ বনগমন করিলে তদবধি ইনি ধর্ম্মানুসারে মহীমণ্ডল পালন করিতেছেন। শত শত ব্যক্তি সুদীর্ঘকাল পরম ক্লেশের সহিত তপস্যা করিয়াও যাহাদিগের দর্শন লাভ করিতে সমর্থ হয় না, অদ্য আমাদিগের সুকৃতদ্রুম ফলিত হওয়াতে আমরা সেই দুষ্প্রাপ্য দেবীদ্বয়কে প্রাপ্ত হইলাম। হে দেবীযুগল! আমরা আজ্ আপনাদের প্রসন্নতায় পরমপুণ্যলাভ করিলাম, সন্দেহ নাই।

হে রামচন্দ্র! মন্ত্রী এই পর্য্যন্ত বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন এবং রাজাও কিয়ৎক্ষণ কৃতাঞ্জলিপুটে ও অবনতবদনে তুষ্ণীম্ভাবে অবস্থান করিলেন। অনন্তর সরস্বতী স্বীয় হস্ত দ্বারা রাজার মস্তক স্পর্শ করতঃ কহিলেন,

রাজন্! তুমি বিবেক দ্বারা তোমার প্রাক্তন জন্মপরম্পরা স্মরণ কর[২০।২৪]।

সরস্বতীর স্পর্শে ভূপতির হৃদয়ান্ধকার (জীবের আবরণ মায়া নামক তমঃ) বিনষ্ট হইল। মায়ার বা তমের অপসারণে হৃদয়পদ্ম (বুদ্ধিরূপ পদ্ম) বিকসিত হইল ও সমুদায় পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মৃতিপথারূঢ় হইতে লাগিল[২৫।২৬]। (জ্ঞানের প্রকাশে) বিকশিতহৃদয় নরপতি জ্ঞপ্তিদেবীর অনুগ্রহবলে পূর্ব্ববৃত্তান্ত সকল পরিজ্ঞাত হইতে প্রবৃত্ত হইলে তিনি একে একে সমুদয় পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ করিতে সমর্থ হইলেন। তিনি সম্রাট্ ছিলেন, তাঁহার লীলানাম্নী মহিষী ছিল, লীলা ব্রতপরায়ণা ও জ্ঞপ্তিদেবীর সেবিকা ছিল, পরে তাঁহার দেহের সহিত রাজ্য পরিত্যাগ (মরণ) হয়, মরণের পর পদ্মনৃপতি হইয়া জন্মগ্রহণ করেন, এ সমস্তই তাহার অন্তরে প্রত্যক্ষের ন্যায় প্রস্ফুরিত হইল। যেমন সমুদ্রবক্ষে শ্রেণীবদ্ধ তরঙ্গ-মালা উত্থিত হয়, সেইরূপ, বিদূরথের অন্তরাকাশে সমুদায় প্রাক্তন বৃত্তান্ত যথানুপূর্ব্বী উদিত হইতে লাগিল। তিনি বিস্ময় প্রাপ্ত হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, একি! এ কাহার মায়া! এক্ষণে আমি এই দেবীদ্বয় কর্ত্তৃক কি পরিজ্ঞাত হইলাম? পরে বলিলেন, হে দেবিদ্বয়! এ কি আশ্চর্য্য! আমি বিস্পষ্ট দেখিতেছি, আমার এক দিন মাত্র মৃত্যু হইয়াছে, অথচ তাহারই মধ্যে আমার সপ্ততিবর্ষ বয়স অতীত হইয়াছে ও পূর্ব্বজন্মের অনেক কার্য্যকলাপ স্মৃতিপথারূঢ় হইতেছে। পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, বাল্য, যৌবন, মিত্র, বন্ধু ও পরিবার, সমস্তই স্মরণ হইতেছে। হে দেবীদ্বয়! এ কি কাণ্ড তাহা বলুন[২৭।৩০]।

জ্ঞানদেবী বলিলেন, রাজন্! তুমিই বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিলে। যে মুহূর্ত্তে তোমার মরণমূর্চ্ছা হয়, সেই মুহূর্ত্তে ও সেই স্থানেই তুমি ঐ সকল লোক অনুভব করিয়াছ। তোমারই মায়াবরণবর্জ্জিত চিদাত্মায় ঐ সকল মায়িক ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত ছিল। সেই গিরিগ্রামীয় ব্রাহ্মণের গৃহাদি, পদ্মভূপতির রাজ্য ও রাজপুরী, তন্মধ্যস্থ প্রধান গৃহ ও গৃহা-কাশ, সমস্তই তোমার অন্তরাকাশে অর্থাৎ চিত্তাকাশে প্রতিরঞ্জিত হইয়াছিল। তুমি যাহা যাহা দেখিয়াছ, অর্থাৎ যাহা অনুভব করিয়াছ, সমস্তই উক্ত ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডপে অর্থাৎ অন্তঃস্থ কল্পনাময় চিত্তে, অন্য কোথাও নহে। কেবল যে সেই ব্রাহ্মণের জগৎ-ই ঐরূপ, তাহা নহে। প্রত্যেক জগৎ-ই ঐরূপ। অর্থাৎ সমস্তই ভিন্ন ভিন্ন বা পৃথক্

পৃথক্ প্রতিভাত হইয়া থাকে। তোমারই জীব সেই গৃহাকাশে আমার উপাসক হইয়া অবস্থিত ও সেঁই প্রকারে প্রথিত হইয়াছিল। যে স্থানে তোমার জীব ছিল, সেই স্থানেই পদ্মভূপালের পৃথিবী এবং সেই পৃথিবীতেই তাঁহার রাজ্যগৃহাদি এবং সেই স্থানেই তোমার এই আরম্ভমন্থর (মহাসমৃদ্ধিশালী) গৃহ রহিয়াছে[৩১।৩৫]। নির্ম্মল আকাশ অপেক্ষাও সুনির্ম্মল ত্বদীয় চিদাকাশস্থ চিত্তাকাশে ঐ সকল ভ্রান্তিব্যাবহার পরম্পরার বিস্তার প্রতিভাত হইয়াছে। * আমার নাম অমুক, ইক্ষ্বাকুকুলে আমার জন্ম হইয়াছে, পূর্ব্বে আমার অমুকনামধারী পিতা ছিলেন, ও পিতামহ ছিলেন, এই আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি, আমি বালক ছিলাম, দশবর্ষ বয়সের সময় পিতা আমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করতঃ বনে গমন করিয়াছিলেন, অনন্তর আমি দিগ্বিজয় করিয়া এই সমস্ত মন্ত্রী ও পৌরগণের সহিত বসুন্ধরা পালন করতঃ অকণ্টকে রাজ্য ভোগ করিতেছি, এবং যজ্ঞ ক্রিয়াদির অনুষ্ঠান করতঃ ধর্ম্মানুসারে রাজ্যপালন করিতেছি, আমার বয়স এক্ষণে সপ্ততি বর্ষ অতিক্রান্ত হইয়াছে,[৩৬।৪০] সম্প্রতি পরবল কর্ত্তৃক সমাক্রান্ত হওয়ায় আমার সহিত তাহাদের দারুণ বিগ্রহ সমুপস্থিত হইয়াছে, আমি যুদ্ধ করিয়া গৃহে সমাগত হইবা মাত্র অপূর্ব্ব দৃষ্ট দেবীদ্বয় এই স্থানে সমাগত হইয়াছেন, আমি তাঁহাদিগকে যথাবিধি পূজা করিলাম, তাঁহাদিগের মধ্যে এক দেবী আমার পূজায় পরিতুষ্ট হইয়া জাতিস্মরত্বপ্রদ ও প্রফুল্লকমলসপ্রভ তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করিলেন, এই সমস্ত ভাব তোমার মনে সম্প্রতি উদিত হইতেছে। আবার ইহা ভাবিয়াও পরিতুষ্ট হইতেছ যে, দেবতারা পূজায় পরিতুষ্ট হইলে, বাঞ্ছিত প্রদানে পরাঙ্মুখ হন না। আরও ভাবিতেছ যে, আমি এখন গতসংশয়, কৃতকৃত্য, শান্ত, বিগতসর্ব্বদুঃখ ও পরম সুখী হইলাম। মহারাজ! তোমার এবম্প্রকার বহ্বাচারসম্পন্না লোকান্তর সঞ্চারিণী ভ্রান্তিই বিস্তৃত হইয়াছে, অন্য কিছু হয় নাই। † তুমি যে মুহূর্ত্তে মৃত্যুগ্রস্ত হইয়াছিলে সেই মুহূর্ত্ত হইতেই তোমার হৃদয়ে অভিবর্ণিত ভ্রান্তির বিলাস আরব্ধ হইয়াছিল। যেমন নদীপ্রবাহ

* কথাগুলির স্থূল মর্ম্ম বা নিষ্কর্ষ—বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণের, পদ্মভূপতির ও বিদূরথ রাজার, এই তিন্ সংসার বিস্তারের মূল কারণ চিত্তবিকার।

† অর্থাৎ জন্ম জন্মান্তর ও লোক লোকান্তর প্রভৃতি সমস্তই অনাদি ভ্রান্তির মহিমা।

এক আবর্ত্ত ত্যাগ করিয়া অন্য আবর্ত্ত অবলম্বন করে, সেইরূপ, চিৎপ্রবাহও এক দৃশ্য ত্যাগ করিয়া অন্য দৃশ্য প্রতিভাসিত করে[৪৭।৪৮]। অপিচ, আবর্ত্ত যেমন আবর্ত্তান্তরের সহিত মিলিত হইয়া অন্য আবর্ত্তের উৎপত্তি করে, সেইরূপ, সৃষ্টিশ্রীও মিশ্র ও অমিশ্র রূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে[৪৯]।

হে ভূপতে! তুমি যে কিছু অনুভব করিয়াছ ও স্মরণ করিতেছ, সমস্তই অসৎ অর্থাৎ মিথ্যাকল্প ও চৈতন্যরূপ সূর্য্য হইতে সমুত্থিত। যেমন স্বপ্নে মুহূর্ত্ত মধ্যে সম্বৎসরশত ভ্রম উপস্থিত হয়, যেমন সঙ্কল্প রচনায় পুনঃ পুনঃ জন্ম ও মরণ কল্পিত হইয়া থাকে, যেমন গন্ধর্ব্ব-নগর কুড্য ও বেদ্যাদির দ্বারা বিভূষিত দৃষ্ট হয়, যদ্রূপ নৌকাদির গমনে তীরস্থিত পর্ব্বতাদির গমন অনুভূত হয়, যেমন বাতপিত্তাদির সংক্ষোভে বৃক্ষ পর্ব্বতাদির অপূর্ব্ব নর্ত্তন দৃষ্ট হয়, যেমন স্বপ্নে স্বশির-শ্ছেদ দৃষ্ট হয়, এই বিস্তৃতরূপধারিণী ভ্রান্তিকে তুমি সেইরূপ জানিবে[৫০।৫৩]। বস্তুতঃ উক্ত সমস্তই মিথ্যা। তুমি জাত বা মৃত হও নাই। তুমি চির-কালই কেবল, শুদ্ধ ও শান্ত বিজ্ঞান স্বরূপ পরমাত্মায় অবস্থিতি করি-তেছ[৫৪]। তুমি অখিল জগৎ দর্শন করিতেছ, অথচ কিছুই দেখিতেছ না। সর্ব্বাত্মকত্বপ্রযুক্ত তুমি আপনি আপন আত্মায় প্রকাশিত হই-তেছ[৫৫]। এই যে মহামণির ন্যায় উজ্জ্বল ও সূর্য্যের ন্যায় ভাস্বর ভূপীঠ, ইহা বাস্তব ভূপীঠ নহে এবং তুমিও বাস্তব ঐরূপ নহ[৫৬।৬২]। এই গিরিগ্রাম, এই জনগণ, এই আমরা, এ সকল কিছুই নহে ও নাই। সেই যে, গিরিগ্রামীয় বিপ্রের মণ্ডপাকাশ, সেই যে মণ্ডপাকাশেই সেই সভর্তৃক লীলার সহিত ভাস্বর জগৎ প্রতিভাত হইতেছে, সেই যে, গৃহাকাশস্থিত ব্যোমমণ্ডল লীলা-রাজধানীতে সুশোভিত রহিয়াছে, আমরা যে এই জগতে অবস্থিতি করি-তেছি, এ সমস্তই সেই গৃহাকাশে অবস্থিত। সে মণ্ডপাকাশ কি? সে মণ্ডপাকাশ নির্ম্মলব্রহ্ম। সে মণ্ডপে মহী, পত্তন, বন, শৈল, সরিৎ, অর্ণব, মানবগণ, পার্থিব ও ভূধর প্রভৃতি কিছুই নাই। জনগণের ভ্রমণ ও পরস্পর দর্শনাদি, সমস্তই মিথ্যা এবং সমস্তই চিন্মাত্রে পরিপূর্ণ।

বিদূরথ বলিলেন, হে দেবি! যদি এ সমস্ত কিছুই নহে, তাহা হইলে, আমার এই সমস্ত অনুচরগণ কি আত্মা হইতে সমুৎপন্ন হইয়া আত্মাতেই অবস্থিত আছে? অথবা অন্য কিছুতে অবস্থিত আছে? স্বাপ্ন

পদার্থের ন্যায় যদি এই জগৎ প্রতিভাত হইতেছে; যদি এই সমস্ত নরনারী স্বপ্নস্বরূপে দৃষ্ট হইতেছে, তাহা হইলে আমার এই সমস্ত অনুচর-বর্গেরাও স্বপ্নস্বরূপ। অতএব হে দেবি! ইহারা কি প্রকারে আমাতে সত্যস্বরূপে অবস্থিতি করিতেছে? কি প্রকারেই বা এ সমস্ত অসৎ? তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন[৬৩।৬৬]।

সরস্বতী প্রত্যুত্তর করিলেন, রাজন্! বিদিতবেদ্য, শুদ্ধবোধৈকরূপী, চিদ্ব্যোমাত্মা দিগের সম্বন্ধে সমুদায়ই অসদ্রূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। কারণ, শুদ্ধবোধাত্মা দিগের জগদভ্রম নাই। সর্পজ্ঞান তিরোহিত হইলে যেমন রজ্জুতে আর কখন সর্পভ্রম হয় না, তেমনি, জগতের অসদ্ভাব পরিজ্ঞাত হইলে জগদ্ভ্রম সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়া যায়, কদাচ আর তাহার উদয় হয় না। মৃগতৃষ্ণিকাভ্রান্তি উপশান্ত হইলে তখন আর জলভ্রম উপ-স্থিত হইবে কেন? "ইহা স্বপ্ন" এরূপ জ্ঞান হইলে স্বপ্নদৃষ্ট স্বমরণ কি প্রকারে সত্য হইবে?[৬৭] সর্ব্বদা অমর জীব স্বপ্নে স্বপ্নদর্শনের ন্যায় আপনাকে মৃত ও জাত মনে করিতেছে। হে অঙ্গ! শরৎকালের নির্ম্মল নভোমণ্ডলের অপেক্ষাও নির্ম্মল চিত্ত ও শুদ্ধবোধ ব্যক্তিরা "এই আমি, এই জগৎ" এরূপ কুৎসিত শব্দ বাগাড়ম্বর ব্যতীত অন্য কিছু মনে করেন না[৬৮]।

মহর্ষি বশিষ্ঠ রামচন্দ্রকে এইরূপ বলিতেছেন, এমন সময় ভগবান্ মরীচিমালী অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলেন। তখন সভ্যগণ পরস্পর অভিবাদন পূর্ব্বক স্নান ও সায়ন্তন কার্য্য সাধনার্থ স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। অনন্তর তমোময়ী যামিনী আগতা হইলেন। যামিনী অবসান হইলে পুনর্ব্বার দিবাকর সমুদিত হইলেন এবং পুনর্ব্বার তাঁহারা সভায় সমাগত হইয়া স্ব স্ব স্থান অধিকার করিলেন[৬৯]।

একচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাঘব! যে ব্যক্তি প্রবুদ্ধ হয় নাই, যে পরম পদে আরোহণ করে নাই, এই অসৎ জগৎ তাহারই নিকট বজ্রের ন্যায় দুর্ভেদ্য ও সদ্রূপে প্রতিভাত হয়[১]। যেমন বাল্য সংস্কারে আবদ্ধ বেতাল (ভূতের ভয়) মরণ পর্য্যন্ত দুঃখপ্রদ হয়, তেমনি, এই অসদাকার জগৎ আকারসম্পন্ন হইয়া অবোধ দিগকে দুঃখপ্রদান করিয়া থাকে[২।৩]। যেমন মরুভূমিস্থ সূর্য্যকিরণ বারি না হইলেও অজ্ঞ মৃগ দিগের বারি-ভ্রম জন্মায়, সেইরূপ, এই জগৎ সত্য না হইলেও অতত্ত্বজ্ঞ দিগকে সত্য বলিয়া ভ্রান্তি জন্মায়। যেমন জীব দিগের স্বপ্নদৃষ্ট স্বীয় মরণ অসত্য হইলেও সত্য বলিয়া প্রতীত হয় ও অর্থক্রিয়াকারী (অর্থক্রিয়া = শোক রোদনাদি। সে মরে নাই অথচ মরণ স্থির করিয়া শোক ও রোদন করে) হয়, সেইরূপ, এই অসৎ জগৎ অপ্রবুদ্ধ জনগণের নিকট সত্য বলিয়া প্রতিভাত ও বৃথা অর্থক্রিয়াকর হইয়া থাকে[৪]। যেমন সুবর্ণ-তত্ত্বে অব্যুৎপন্ন জনগণের সুবর্ণালঙ্কারে অলঙ্কার বুদ্ধিই হয়, সুবর্ণবুদ্ধি হয় না, তেমনি, এই জগতে ও জগদন্তর্গত পুর, গ্রাম, অগার, নগ ও নাগেন্দ্র প্রভৃতিতে অতত্ত্বজ্ঞ জনগণের দৃশ্যতা ব্যতীত পরমার্থ দৃষ্টি জন্মে না[৫।৬]। যেমন নির্ম্মল নভোমণ্ডলে অসত্য মৌক্তিকমালা, কেশোণ্ড্রক ও বর্হ (ময়ূরের পিচ্ছ) প্রভৃতি সত্যরূপে অনুভূত হয়, সেইরূপ, এই অসৎ জগৎ তত্ত্বজ্ঞান বর্জ্জিত দিগের নিকট সত্যরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে[৭]। রাম! অহংভাবাদিবিশিষ্ট এই বিশ্বমণ্ডল একটী সুদীর্ঘ স্বপ্ন। তন্মধ্যে যে স্বাতিরিক্ত পুরুষ, তাহাও স্বপ্নকল্প। স্বপ্নকল্প হইলেও তাহা সত্যের ন্যায় ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। যেমন তুমি আমি তিনি ইনি সমস্তই সত্য। যেরূপে ঐ সকল সত্য, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর[৮]। সমুদায় দৃশ্যের আধার একমাত্র শান্ত, সত্য, পবিত্র, অচেত্য ও চিন্মাত্রবপু পরমাকাশ বিস্তৃত রহিয়াছে[৯]। এই চিদাকাশ স্বয়ং, সর্ব্বগ, সর্ব্বশক্তিমান্ ও সর্ব্বাত্মক। ইনি স্বীয় সর্ব্বাধারত্ব ও সর্ব্বশক্তিত্বপ্রভাবে যে যে স্থানে যে যে অর্থ-ক্রিয়োপযোগী হইয়া সমুদিত হন, সেই সেই স্থলে তদনুরূপ ক্রিয়াদি

প্রথিত হইয়া থাকে[১০]। এই বিশ্বরূপ স্বপ্নপুরে যে দ্রষ্টা, অজ্ঞগণ তাহাকে যে ইঁ নর বলিয়া জানে, সেই অর্থাৎ তৎক্ষণাৎ তাহা তাঁহার নিকট নবাকারে অনুভূত হয়[১১]। দ্রষ্টার স্বরূপ চৈতন্য, যাহা স্বপ্নদ্রষ্টার স্বপ্নাকাশের অন্তরে (স্বপ্নাকাশ পুরিততী নাম্নী নাড়ীর ছিদ্র প্রদেশ) অবস্থিত, তাহা স্বপ্নদ্রষ্টার বাসনানুসারে (বাসনা=পূর্ব্বসংস্কার) বাসনার আধার চিত্তের সহিত এক হইয়া প্রকাশ পায় এবং সেই ঐক্যের প্রভাবে সে আপনাকে নর (মনুষ্য) বলিয়া বোধ করে। সুতরাং বুঝা গেল যে, সত্য চৈতন্যের প্রভাবেই সমুদায় চিত্তবিকার প্রকাশের সত্যতা প্রথিত হয়[১২।১৩]। অভিপ্রায় এই যে, আত্মচৈতন্যই সত্য; চিত্তবৃত্তি সকল মিথ্যা। তুমি, আমি, তিনি, এ সকল বোধ চিত্তেরই বিকার বা বৃত্তি; সুতরাং মিথ্যা। কিন্তু মিথ্যা হইলেও ঐ সকল সত্যচৈতন্যের সংশ্রবে সত্যবৎ জানিবে।

এই স্থানে রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে মহামুনে! যদি মায়ামাত্র-শরীর স্বাপ্নপুরুষ আত্যন্তিক অসত্য হইলে অর্থাৎ সত্য সংশ্রব শূন্য হইলে দোষ কি?[১৪] * বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! স্বপ্নকালেও পুর ও বাস্তব্য প্রভৃতি সত্যচৈতন্যের সংশ্রবে সত্যরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। স্বপ্নকালেও যে স্বাপ্ন পদার্থে সত্যের সংশ্রব থাকে, সে বিষয়ে প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছি, প্রণিধান কর। † সে প্রমাণ প্রত্যক্ষ, অন্য কিছু নহে[১৫]। সৃষ্টির আদিতে স্বয়ম্ভূ প্রজাপতি স্বপ্নের ন্যায় আভাসসম্পন্ন ছিলেন। তিনি অনুভবরূপী ও হিরণ্যগর্ভ। অর্থাৎ সংস্কারীভূত জ্ঞানসমষ্টিরূপী। সেইজন্য তাঁহার সঙ্কল্পসম্ভূত এই বিশ্ব স্বপ্নসদৃশ[১৬]। হে রাঘব! স্বপ্ন যেরূপ, এই বিশ্বও সেইরূপ। ইহাতে আমার সম্বন্ধে তুমি যেরূপ সত্য, স্বপ্নে অন্য নরগণ অন্য নরগণের সম্বন্ধে সেইরূপ সত্য[১৭]। অন্যের কথা এই যে, স্বপ্নদৃষ্ট নগর ও নগর

---

* রামপ্রশ্নের অভিপ্রায়—জাগ্রৎ পুরুষ সম্পূর্ণরূপে অসত্য হইলে ব্যবহার কার্য্যের বিরোধ ও কর্ম্মশাস্ত্রের অপ্রামাণ্য দোষ হয়। স্বাপ্নপুরুষের সত্যতার সে দোষ হয় না। কেননা, স্বাপ্নপুরুষের কোন কিছু কর্ত্তব্য নাই। সুতরাং ব্যবহারের ও শাস্ত্রের অপ্রমাণ্যের আশঙ্কা নাই। যখন তাহা নাই, তখন স্বাপ্নপুরুষে সত্যচৈতন্যের সম্বলন স্বীকারের প্রয়োজন কি?

† বশিষ্ঠের অভিপ্রায়—সত্যচৈতন্যের বিনা সংশ্রবে কোনও কিছু প্রত্যক্ষ হয় না। সুতরাং স্বাপ্ন প্রত্যক্ষেও সত্যচৈতন্যের সংশ্রব আছে। স্বাপ্নদৃষ্ট বস্তু ব্রহ্মের ন্যায় সত্য নহে, পরন্তু ব্রহ্মে ভাসমান হওয়ায় ব্রহ্মের সত্যতা স্বপ্নকল্পিত মিথ্যায় মিশিয়া সেই সকল মিথ্যাকে সত্য করিয়া তুলে।

বাসীরা যদি কোনও অংশে সত্য না হয়, তাহা হইলে, তদাকার সম্পন্ন তুমিও আমার সম্বন্ধে কোন অংশে সত্য নহ। তোমার সম্বন্ধে আমি যেরূপ সত্যাত্মা, সেইরূপ, আমার সম্বন্ধে সকলই সত্যাত্মা। এই নিদর্শনই স্বপ্নবৎ অনুভূত এই সংসারের পরম্পর সিদ্ধির প্রমাণ ও ক্রম[১৮।২০]।

রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! আপনার উপদেশ শ্রবণে আমার মনে হইতেছে যে, স্বপ্নদ্রষ্টা নিনিদ্র হইলেও তদ্দৃষ্ট (স্বপ্নদৃষ্ট) গ্রামনগরাদি বিদ্যমান থাকে। কেননা, সমস্তই সৎ, সৎ ব্যতীত অসৎ কিছুই নাই। (কিন্তু কৈ? তাহা ত থাকে না? জাগ্রৎ হইলে স্বপ্নদৃষ্ট কোনও কিছু প্রমাণগোচর হয় না। হইতে দেখাও যায় না এবং কস্মিন্‌কালে ঐরূপ শুনাও যায় নাই)[২১]। বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! তুমি যাহা মনে করিতেছ তাহাই ঠিক্। অর্থাৎ স্বপ্নদ্রষ্টার স্বপ্নদৃষ্ট পুরনগরাদি জাগ্রৎ কালেও থাকে; পরন্তু তাহার যাহা সত্য, তাহাই তদাকারে থাকে। আকাশের ন্যায় নির্ম্মল নির্লিপ্ত দর্শনাধার আত্মচৈতন্যই পরমসৎ এবং সে সকল তন্মাত্রে বিদ্যমান থাকে; মিথ্যাংশের অপলাপ হয়[২২]। হে রাঘব! তুমি যাহা জাগ্রদবস্থায় অনুভব করিতেছ, তাহাই স্বপ্নাবস্থায় অনুভব করিয়াছ ও করিবে। স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু জাগ্রদ্দৃষ্টের ন্যায় স্বপ্নান্তরে দৃষ্ট না হইবার কারণ, কালের ও স্থানের প্রভেদ বা পরিবর্ত্তন। (রামের অভিপ্রায় এই যে; স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থও যদি সৎ হয় তবে তাহা জাগ্রৎ কালে না থাকে বা না দেখা যায় কেন? বশিষ্ঠের অভিপ্রায় জাগ্রৎদৃষ্ট ও স্বপ্নদৃষ্ট উভয়ই সমান। জাগ্রদ্দৃষ্ট যেমন স্বপ্নকালে থাকে না, তেমনি, স্বপ্নদৃষ্টও জাগ্রৎকালে থাকে না। সুতরাং যাহা দেখা যায় তাহা পরিবর্ত্তনশীল বলিয়া মিথ্যা; পরন্তু তন্মধ্যে যে অপরিবর্ত্তনস্বভাব আত্মচৈতন্য তাহাই ত্রিকালব্যাপী ও সত্য)[২৩]। অতএব, যে কিছু দৃশ্য প্রতিভাত হইতেছে সমস্তই সেই সতে (আত্মব্রহ্মে) অবস্থিত। যাহাতে অবস্থিত, তাহাই সত্য এবং সেই সত্যের সত্যতায় এ সকলও সত্য-বৎ। অর্থাৎ মিথ্যা হইলেও সত্য। যেমন স্বপ্নাবস্থার স্ত্রীসঙ্গম মিথ্যা হইলেও সত্য, সেইরূপ[২৪]। উক্তপ্রকারে সমস্তই সর্ব্বত্র সমান বিদ্যমান এবং যিনি সর্ব্ববেত্তা তিনিই স্বকীয় মায়া শক্তির সামর্থ্যে সর্ব্বপ্রকারে প্রস্ফুরিত হন[২৫]। ধনাগারে ধন থাকে, যে তাহা দেখিতে পায়, সে তাহা লাভ করে। সেইরূপ, সমস্তই চিদাকাশে ভাসমান আছে, কিন্তু সেই চিদাকাশ যাঁহা দৃষ্ট করায়, দ্রষ্টা তাহাই দর্শন করিয়া তৃপ্ত হয়[২৬]।

অনন্তর জ্ঞানদেবী সরস্বতী এতাদৃশ বোধরূপ অমৃতে পরিষেক করতঃ মহারাজ বিদূরথের বিবেকরূপ অঙ্কুর সমুৎপাদন করতঃ কহিলেন, রাজন্! আমি লীলার প্রীতিসাধনের নিমিত্ত তোমার নিকট এই সমস্ত কথা বলিলাম। এক্ষণে তোমার অভিলষিত সিদ্ধ হউক; আমরা যথাগত স্থানে গমন করি। লীলা মণ্ডপান্তর্গত কল্পিত জগৎ দর্শন করিলেন, আর আমাদের থাকিবার প্রয়োজন নাই[২৭।২৮]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! ভগবতী সরস্বতী মধুর বাক্যে ঐ সকল কথা কহিলে ধীমান্ ভূপাল বিদূরথ বলিলেন,[২৯] দেবি! আপনি মহাফলপ্রদা। সেই কারণে বলিতেছি, যখন প্রার্থনাকারী ব্যক্তি দিগের প্রতি তাদৃশ মনুষ্যের দর্শন বিফল হয় না, তখন আমাদের সম্বন্ধে আপনার দর্শন কি নিমিত্ত বিফল হইবে?[৩০] হে দেবি! স্বপ্ন হইতে স্বপ্নান্তর প্রাপ্তির ন্যায় আমি এই দেহ পরিত্যাগ করিয়া কত দিনে স্বীয় প্রাক্তন দেহ প্রাপ্ত হইব? তাহা আমাকে বলুন। হে বরদে! হে মাতঃ! আমি আপনার শরণাগত। আপনি কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ দ্বারা আমাকে এই বিষয়ের উপদেশ প্রদান করুন। হে দেবি! আপনি আমার প্রতি প্রসন্না হউন। আমার অপর প্রার্থনা এই যে, আমি যে প্রদেশে গমন করিব, আমার এই মন্ত্রী ও এই কুমারী যেন তথায় গমন করিতে পারে[৩১।৩৩]।

সরস্বতী বলিলেন, আমাদিগের দ্বারা অর্থিজনের কামনা বিফলীকৃত হয়, ইহা কেহ কখন দৃষ্টিগোচর করেন নাই। অতএব, হে মহারাজ! তুমি অশঙ্কিত চিত্তে আগমন পূর্ব্বক অর্থবিলাস সম্পন্ন সেই মনোহর রাজ্য উপভোগ কর[৩৪]।

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ।

সরস্বতী বলিলেন, মহারাজ! এই মহাসংগ্রামে তোমার মৃত্যু হইবে। অনন্তর তুমি মৃত্যুর পর, সর্ব্বসমক্ষে তোমার সেই প্রাক্তন রাজ্য ও শবীভূত প্রাক্তন দেহ প্রাপ্ত হইবে। এই কুমারীও এই সমস্ত মন্ত্রিগণের সহিত সেই প্রাক্তন পুর প্রাপ্ত হইবে[১।২]। বায়ু যেমন আগমন ও গমন করে, আমরা উভয়ে সেই প্রকারে যথাগত স্থানে গমন করি, তুমি ও এই কুমারী মন্ত্রিগণের সহিত সেই প্রাক্তন দেশে আগমন কর[৩]। অশ্বের গমন এক প্রকার, খরের ও উষ্ট্রের গতি অন্য প্রকার, মদমত্ত হস্তীর গতি অন্য প্রকার। (ভাব এই যে, আতিবাহিক দেহের গত্যাগতি মানোরথিক গত্যাগতির ন্যায় দূরে ও অদূরে ও অন্যের অদৃশ্য। অশ্বাদির গতি সেরূপ নহে। কেননা, অশ্বাদি নিতান্ত স্থূল ও পরিচ্ছিন্ন বস্তু)[৪]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রামচন্দ্র! ভগবতী সরস্বতী ও বিদূরথ উভয়ে ঐরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে এক জন দূত তথায় সসম্ভ্রমে উপস্থিত হইয়া কহিল, মহারাজ! পট্টিশ, চক্র, অসি, গদা ও পরিঘ প্রভৃতি বহুবিধ অস্ত্র বর্ষণকারী প্রলয়ার্ণবসদৃশ উদ্ধত ও দুঃসহ শক্রবল আগমন করিতেছে[৫।৭]। তাহারা নগরমধ্যবর্ত্তী প্রাসাদশিখরে কাষ্ঠ রাশি স্থাপন করতঃ পর্ব্বতাকার করিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিয়াছে। তাহাতে সেই সমস্ত প্রাসাদশিখরলগ্ন অগ্নি চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া চট্ চট্ ধ্বনি সহকারে উত্তম উত্তম পুরী সকল দগ্ধ করতঃ ভূমিসাৎ ও ভস্মসাৎ করিতেছে[৮]। যেমন কল্পান্তিকালে সম্বর্ত্তনামক মেঘ উদিত হয়, তাহার ন্যায় ভীমদর্শন ধুমরাশি উত্থিত হইয়া আকাশ পরিব্যাপ্ত করাতে বোধ হইতেছে যে, যেন মহাদ্রি সকল গরুড়ের ন্যায় সবেগে আকাশে উড্ডীন হইতে প্রবৃত্ত হইয়াছে[৯]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাঘব! সেই দূত সসম্ভ্রমে ঐরূপ কহিতেছে, সেই অবসরে শক্রভীষণ শব্দ দ্বারা চতুর্দ্দিক্ পরিপূর্ণ হইল ও পুরবহির্ভাগে মহাকোলাহল সমুত্থিত হইল[১০]। শরবর্ষিগণের বলাকৃষ্ট ধনুর টঙ্কার, মদমত্ত কুঞ্জরগণের বৃংহিত, পুরস্থিত দহনশীল অগ্নির চট চট শব্দ,

পুরবাসিগণের ও দগ্ধনারীগণের হল হলা শব্দ, স্পন্দমান অগ্নিজিহ্বা-সমূহের ও প্রজ্বলিত শিখা স্পন্দনের ধগ ধগ শব্দ বিমিশ্রিত হইয়া ভীষণ কর্ণকঠোর নিনাদে পরিণত হইয়াছে[১১।১৩]।

সেই মহারজনীতে সরস্বতী, লীলা, মন্ত্রী ও রাজা বিদূরথ বাতায়ন ছিদ্র দিয়া সেই কোলাহলপূর্ণা বিভীষিকাময়ী পুরী দর্শন করিতে লাগিলেন[১৪]। তাঁহারা দেখিলেন, পুরী প্রলয়বাতবিক্ষুব্ধ সপ্তসমুদ্রমিশ্রিত একার্ণবসদৃশ বেগসম্পন্ন উগ্রহেতিরূপ (হেতি=হাতিয়ার) মেঘকুল দ্বারা তরঙ্গায়মান শক্রসৈন্যগণে পরিপূর্ণ হইয়াছে এবং তাহা গগনস্পর্শী অনলশিখার দ্বারা দহ্যমান হইয়া কল্পান্তানলবিগলিত মহামেরুর অনুকার করিতেছে। অপিচ, মহামেঘ গর্জ্জনের ন্যায় গর্জ্জনকারী বিপক্ষগণের লুণ্ঠন শব্দ, দস্যুগণের জল্পনা ও ঘোর কল কল শব্দ, দিক্ বিদিক্ ধ্বনিত করিতেছে[১৫।১৭]। দহ্যমান পুরীর ধূমরাশি নভোমণ্ডলে অভ্রমণ্ডলের ন্যায় সমুড্ডীন হইয়া পুষ্কর ও আবর্ত্ত নামক জলধর যুগলের উপমা সম্পাদন করিতেছে। হেমপত্রসন্নিভ অগ্নিশিখা নিরন্তর প্রোড্ডীন হইতেছে। ভীষণ উল্মুক খণ্ড সমূহের অগ্রভাগ স্পন্দিত হওয়াতে পুরস্থ আকাশ যেন তারকামালায় বিভূষিত হইয়াছে। প্রজ্বলিত গৃহ সমুদায় হইতে সমুত্থিত অগ্নিশিখা পরস্পর মিলিত হইয়া প্রজ্বলিত অচলের ন্যায় শোভা বিস্তার করিতেছে। হতাবশিষ্ট সৈন্যগণ পর্ব্বতগুহায় প্রবিষ্ট হইতেছে। লোক সকল শক্রগণকর্ত্তৃক দগ্ধ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছে। অগ্নি-কণা ও নারাচ সমূহ দ্বারা নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। দগ্ধপুরস্থিত জনগণ শক্রগণের নিক্ষিপ্ত বহুল হেতি ও শিলাজাল প্রহারে ভূমিলুণ্ঠিত হইতেছে। কেহবা ঊর্দ্ধবাহু হইয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে[১৮।২১]। মহাবল সৈন্যগণ সমরকরিগণের সঙ্ঘট্টনে চূর্ণীকৃত হইতেছে। দ্রুতবেগে পলায়মান তস্কর-গণের শিরশ্ছেদনে তাঁহাদিগের অপহৃত মহাধন পথে বিকীর্ণ ও সমাকীর্ণ হইতেছে[২২]। শক্রগণনিক্ষিপ্ত অঙ্গাররাশির দ্বারা নরনারীগণ দগ্ধ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছে। প্রজ্বলিত কাষ্ঠখণ্ড চট চটা শব্দ সহকারে চতুর্দ্দিকে নিপতিত হইতেছে[২৩]। বিপুল জলন্ত উল্মুখ ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হওয়ায় তত্রত্য নভস্থল যেন শতসূর্য্যে সমাকীর্ণ হইয়াছে। প্রজ্বলিত অঙ্গারখণ্ড-সমূহ দ্বারা বসুধাতল সমাকীর্ণ হইতেছে[২৪]। দগ্ধ কাষ্ঠ সমুদায়ের কেঙ্কার-ধ্বনি মিশ্রিত প্রজ্বলিত বেণুসমূহের রণ রণ শব্দ সমুত্থিত হইতেছে।

সৈন্য ও অন্যান্য প্রাণিগণ অগ্নির দ্বারা দগ্ধ হইয়া আর্ত্তস্বরে রোদন করিতেছে[২৫]। সর্ব্বভোজী হুতাশন উক্তপ্রকারে যেন সমুদয় নগর গ্রাস করিতে সমুদ্যত হইয়া অবশেষে সেই রাজশ্রী ভস্মাবশেষ করতঃ পরিতৃপ্ত হইলেন[২৬]। জনগণ এই অবসরে অসংখ্য মনুষ্যের ও অশ্বাদির ভোজনার্হ ধান্যরাশি ও তণ্ডুল প্রভৃতি সর্ব্বভোজী হুতাশন কর্ত্তৃক ভুক্ত হইলে অবশিষ্ট গ্রহণের নিমিত্ত লোলুপ হইতে লাগিল[২৭]।

অনন্তর রাজা বিদূরথ স্বসন্নিধানে বেগে আগম্যমান দগ্ধভার্য্য যোধগণের এই বাক্য শুনিতে পাইলেন। "হায়! হায়! বিপদরূপ প্রচণ্ড বায়ু সমাগত হইয়া আমাদিগের শীত গ্রীষ্ম বর্ষাদি হইতে পরিত্রাণ লাভের উপায় গৃহরূপ উচ্চতর আশ্রয় পাদপ সমূলে উন্মূলিত করিল। হায়! হায়! আমাদিগের এই সমস্ত মহৎ স্নিগ্ধ ব্যক্তি গণের মনের ন্যায় প্রশান্ত স্বভাব দারাগণের মূর্ত্তি দাবানলে দগ্ধ হরিণীর ন্যায় হইয়া দন্তিগণের দেহে লীন হইতেছে। হা পিতঃ! হেতিরূপ হুতাশন বীরগণরূপ অনিলপ্রেরিত হইয়া এই সমস্ত স্ত্রীগণের কবরীরূপ তৃণগুচ্ছে সংলগ্ন হওয়ায় সে সকল যেন শুষ্ক পর্ণের ন্যায় প্রজ্বলিত হইতেছে[২৮।৩১]। ঐ দেখ, আবর্ত্তসম্পন্না ঊর্দ্ধগামিনী দগ্ধকাষ্ঠবাহিনী ধূমরূপিনী যমুনা যেন ব্যোমগঙ্গার প্রতি প্রধাবিত হইয়া বৈমানিক গণকে গ্রাস করতঃ প্রবাহিত হইতেছে। রাশি রাশি অগ্নিকণা সকল ঐ নদীর বুদ্ বুদ্[৩২]।"

কেহ স্বীয় কন্যাকে সম্বোধন করতঃ অন্য অনাথা নারী দেখাইয়া কহিতেছে। "পুত্রি! এই অবলার মাতা, পিতা, ভ্রাতা, যামাতা এবং তনয়গণ এই গৃহে দগ্ধ হওয়াতে এই অবলা অগ্নির দ্বারা দগ্ধ না হইলেও শোকে দগ্ধ হইয়াছে[৩৩]।" কেহ কহিতেছে, হা, তোমারা শীঘ্র আগমন কর। তোমাদের এই মন্দির এই স্থান হইতে বিচলিত হইয়াছে। যেমন প্রলয় কালে সুমেরুশৈল নিপতিত হয়, তদ্রূপ ইহাও শীঘ্র নিপতিত হইবে[৩৪।৩৫]। কেহ কহিতেছে, ঐ দেখ, যেমন সন্ধ্যাকালে শলভকুল মেঘমণ্ডলে প্রবেশ করে, তাহার ন্যায় অজস্র শর, শিলা, শক্তি, কুন্ত, প্রাস ও হেতি প্রভৃতি অস্ত্র বাতায়ন দ্বারা গৃহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে[৩৬]। কোন ব্যক্তি কহিতেছে, হায়! হায়! ঐ দেখ, যেমন বড়বানলশিখার দ্বারা উচ্ছলিত অর্ণবের তরঙ্গ তটাভিমুখে প্রধাবিত হয়, তেমনি, এই সমস্ত অস্ত্রশিখার দ্বারা উৎক্লিষ্ট জনগণ পলায়নার্থ নভোমার্গে উৎপতিত হইতেছে[৩৭]। যেমন রাগী-

দিগের হৃদয় ক্রোধ দ্বারা শুষ্ক হয়, তেমনি, প্রাসাদশিখর সমুত্থিত অভ্রমণ্ডলসদৃশ ধূমরাশির দ্বারা উদ্যান ও সরোবর প্রভৃতি শুষ্ক হইতেছে[৩৮]। কেহ কহিতেছে, ঐ দেখ, দন্তিগণ ক্রোধভরে চীৎকার করতঃ আলান ভঙ্গ করিয়া বৃক্ষ সমূহ কট কট শব্দে নিপাতিত করিতেছে[৩৯]। সর্ব্বস্ব দগ্ধ হইলে গৃহস্থগণ যেরূপ দীনতা প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ, পুষ্পফলপরিপূর্ণ গৃহসন্নিহিত দ্রুম সকল শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছে[৪০]। যে সকল মৃতকল্প বালক পিতামাতা কর্ত্তৃক পরিমুক্ত হইয়া রথ্যায় নীত হইয়াছিল, হায়! তাহারা এক্ষণে ভিত্তি পতন দ্বারা মৃত হইল[৪১]। ঐ দেখ, বাতবিদ্রাবিত প্রজ্বলিত হস্তিশালা সকল নিপতিত হওয়াতে তত্রত্য হস্তিগণ ভীত হইয়া কুৎসিত শব্দ করিতেছে[৪২]। অপরে কহিতেছে, হায়! কি কষ্ট! একে ত বক্ষঃস্থল, তদুপরি আবার তাহা বীরপুরুষগণের অসির দ্বারা নির্ভিন্ন, তাহাতে আবার প্রজ্বলিতকাষ্ঠসংলগ্ন যন্ত্রপাষাণ বজ্রের ন্যায় নিপতিত হইতেছে[৪৩]। ঐ দেখ—গো, অশ্ব, মহিষ, হস্তী, উষ্ট্র, শৃগাল ও মেষ সকল গমনশীল ব্যক্তিদিগের গমনমার্গ অবরোধ করতঃ পরস্পর ঘোর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছে[৪৪]। ঐ দেখ, নারীগণ অনলভয়ে ভীতা হইয়া আর্দ্রবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক গমন করাতে ভূমণ্ডল যেন স্থলপদ্মসমাচিত বোধ হইতেছে। উহাদিগের ঐ আর্দ্র বস্ত্রের পট পটা শব্দে পথ সকল সমাকুল হইতেছে[৪৫]। ঐ দেখ, অগ্নিকণা সকল অশোক কুসুমের ন্যায় শোভা বিস্তার করতঃ স্ত্রীগণের অলকপংক্তি সংলগ্ন হইয়া যেন বিশ্রাম লাভ করিতেছে[৪৬]। উঃ—নরগণের স্নেহবাগুরা কি দুশ্ছেদ্য! ইহারা স্বয়ং দগ্ধ হইলেও ভার্য্যা পরিত্যাগ করিয়া গমনে সমর্থ হইতেছে না[৪৭।৪৮]। ঐ দেখ, করিগণ বেগে প্রজ্বলিত আলানপাদপ (হস্তী বাঁধিবার গাছ) ভগ্ন করতঃ দগ্ধশুণ্ড হইয়া ক্রোধভরে পদ্মসরোবরে গিয়া নিমগ্ন হইতেছে[৪৯]। অনলশিখারূপ চঞ্চল বিদ্যুৎযুক্ত ধূমরূপ মেঘ নভোমণ্ডলে সমুত্থিত হইয়া অঙ্গার ও নারাচনিকর বর্ষণ করিতেছে[৫০]। কেহ রাজাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, দেব! ধূমমণ্ডল নভোমণ্ডলে বহ্নিকণারূপ আবর্ত্ত ও শিখারূপ তরঙ্গ উৎপাদন করতঃ রত্নপূর্ণ অর্ণবের ন্যায় অবস্থিতি করিতেছে[৫১]। কেহ বলিতেছে, তোমরা এ দিকে দেখ, বহ্নিশিখার দ্বারা আকাশমণ্ডল গৌরবর্ণে প্রতিফলিত হওয়াতে বোধ হইতেছে, যেন, মৃত্যুদেব প্রাণিবিনাশ উৎসবে দিগ্বধূ দিগকে, সুবর্ণবর্ণ নভোরূপ কুঙ্কমাক্ত সম্পুটক (পেটরা)

প্রদান করিয়াছেন[৫২]। উঃ! কি বিষম অসচ্চরিত্রতা উপস্থিত! ঐ দেখ, বৈরিবীরগণ উদ্যতায়ুধ হইয়া রাজমারীগণকেও গ্রহণ করিতেছে[৫৩]। ঐ দেখ, সুপ্রভান্বিত চঞ্চল কুসুমমালা, অর্দ্ধদগ্ধ কবরী ও সুস্তনসম্পন্না রমণীগণ রাজপথ সমাকীর্ণ করিয়াছে। উহাদিগের অঙ্গ হইতে বিগলিত মাণিক্যখচিত বলয় সমূহ অবনীমণ্ডল মণ্ডিত করিতেছে[৫৪।৫৫]। উহাদিগের ছিন্নভিন্নহারলতা, নির্ম্মল মুক্তাফল সকল রাজপথে বিকীর্ণ করিতেছে। আহা! উহাদিগের স্তনমণ্ডলের পার্শ্ব হইতে কনকপ্রভা নির্গত হইতেছে[৫৬]। উহাদিগের কুররীর ন্যায় করুণ ক্রন্দনধ্বনির দ্বারা রণধ্বনি অভিভূত হইয়াছে। উহারা অবিরল ধারায় অশ্রুবারি বিসর্জ্জন পূর্ব্বক রোদন করিতেছে। হায়! উহাদিগের কাহার পার্শ্বদেশ এবং কাহার বা কুক্ষি বিদীর্ণ হইয়াছে, সেই কারণে উহারা বেদনানুভবে বিচেতনপ্রায়[৫৭]। উহারা পলায়নেচ্ছু; পরন্তু সৈন্যগণ উহাদিগকে রক্তকর্দ্দমলিপ্ত ও বাস্প-বারির দ্বারা ক্লিন্ন অঙ্গবস্ত্রের দ্বারা বন্ধন করতঃ ভুজমূলে স্ব স্ব ভুজ বিন্যস্ত করিয়া লইয়া যাইতেছে[৫৮]। যখন উহারা "কে আমাদিগকে পরিত্রাণ করিবে" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে, তখনই বোধ হইতেছে, যেন সেই সেই দিকে উৎপল বর্ষণ হইতেছে। তদ্দর্শনে সহৃদয় সৈন্যগণ দুঃখিত হইয়া রোদন আরম্ভ করিয়াছে[৫৯]। ঐ সকল মৃণালসদৃশ সুন্দর ও কোমলোরু রমণীগণের সুনির্ম্মল চরণরাজি ও স্বচ্ছ বসনান্তপ্রদেশ আকাশস্থ নলিনীর ন্যায় শোভমান। ঐ সকল আলোলমাল্যবসনা অলঙ্কারপরিশোভিনী অঙ্গরাগসম্পন্না বাস্পাকুললোচনা চঞ্চলালকবল্লরীযুক্তা (চঞ্চল=দোদুল্যমান। অলক=চুলের গোছা ও বেণী। বল্লরী=লতা। মিলিতার্থ, লতার ন্যায় বক্রানুবক্র কেশগুচ্ছ) রমণী বিষয়সুখস্বরূপ মন্দর ভূধর দ্বারা নিরন্তর মথ্যমান হইয়া কামরূপ সমুদ্র হইতে লক্ষ্মীর ন্যায় সমুদ্ভূত হইয়াছেন, সন্দেহ নাই[৬০।৬১]।

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রামচন্দ্র! ঐ অবসরে পূর্ণযৌবনা, আলোলমাল্য-বসানা ছিন্নহারলতাকুলা, চন্দ্রবদনা, তারকাকারদশনা শ্বাসোৎকম্পিত-পয়োধরা পরমরূপবতী রাজমহিষী লীলা (বিদূরথের মহিষী। এ লীলা সরস্বতী সহচারিণী লীলার প্রতিচ্ছায়া মাত্র) ভয়বিহ্বলচিত্তে বয়স্যা ও দাসী গণের সহিত লক্ষ্মীর ন্যায় সেই রাজগৃহরূপ পঙ্কজকোটরে প্রবেশ করিলেন[১।৩]। তাঁহার সেই সমস্ত বয়স্যার মধ্যে অপ্সরার ন্যায় সৌন্দর্য্য-শালিনী এক বয়স্যা রাজাকে বিজ্ঞাপিত করিলেন যে, "হে দেব! ভূত-গণের মহাসংগ্রাম আরব্ধ হইয়াছে। এই নিমিত্ত বাতপীড়িত লতা যেরূপ মহাদ্রুম আশ্রয় করে, সেইরূপ, আমাদের এই দেবী (প্রধানা রাজ-মহিষী) আমাদিগের সহিত অন্তঃপুর হইতে পলায়ন করিয়া আশ্রয় গ্রহণার্থ আপনার নিকটে সমাগতা হইয়াছেন[৪।৫]। হে মহারাজ! যেমন মহাসমুদ্রের ঊর্ম্মিজাল তীরস্থিত দ্রুমলতা হরণ করে, তেমনি, মহাবল উদ্যতায়ুধ ভূতগণ অন্যান্য ভূতভার্য্যাগণকে হরণ করিতেছে[৬]। অন্তঃ-পুররক্ষকগণ অশঙ্কচিত্ত উদ্ধত শক্রগণ কর্ত্তৃক বাতনিষ্পিষ্ট দ্রুমের ন্যায় বিনষ্ট হইতেছে[৭]। যেমন বর্ষাকালের রাত্রে বারিবর্ষণে কমলিনীগণ আহত হয়, তেমনি, দূর হইতে সমাগত অশঙ্কচিত্ত শত্রুগণ আমা-দিগের অন্তঃপুর আহত করিতেছে[৮]। ভীষণ নিনাদ সহকারে ধূম বর্ষণকারী ও চঞ্চল তীক্ষ্ণধার হেতিবহ্নিবর্ষণকারী যোধগণ আমাদিগের অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়াছে[৯]। যেমন ব্যাধগণ কুররীগণকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করে, তেমনি আজ, বলবন্ত শত্রুগণ ক্রন্দনশীলা বিলাসপরায়ণা দেবীদিগের কেশাকর্ষণ করতঃ বলপূর্ব্বক লইয়া যাইতেছে[১০]। অতএব হে দেব! আমাদিগের এই যে নানাপ্রকার বিষম (ছোট বড়) বিপত্তি উপস্থিত, এ বিপত্তিতে একমাত্র আপনিই আমাদের শান্তিবিধান করিতে সক্ষম[১১]।"

অনন্তর রাজা বিদূরথ দাসীর নিকট তদ্বিধ বচনপরম্পরা শ্রবণ করিয়া সেই দেবীদ্বয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করতঃ কহিলেন, হে দেবীদ্বয়!

আমি যুদ্ধার্থ গমন করি। আপনাদিগের পাদপদ্মের ভ্রমরীস্বরূপা আমার এই ভার্য্যা আপনাদিগের রক্ষণীয়া। সেইজন্য প্রার্থনা—আপনারা ইহাকে রক্ষা করুন। আপনাদিগকে রাখিয়া যাওয়ায় আমার যে গমনাপরাধ হইবে, তাহা আপনারা দয়া করিয়া ক্ষমা করিবেন[১২]। রাজা বিদূরথ দেবীদ্বয়কে এইরূপ কহিয়া, অঙ্কুশাঘাত প্রাপ্ত মদমত্ত হস্তীর ন্যায় কোপারুণনেত্রে সবেগে শৈলগুহা হইতে কেশরীর বিনির্গমনের ন্যায় তথা হইতে বিনির্গত হইলেন[১৩]।

অনন্তর প্রবুদ্ধলীলা (সরস্বতীসহায়া লীলা), চারুদর্শনা বিদূরথ ভার্য্যা লীলাকে স্বসমীপে আগমন করিতে দেখিলেন। আরও দেখিলেন, সমীপাগতা লীলা অবিকল আত্মসদৃশী। যেমন নির্ম্মল আদর্শে আত্মপ্রতিবিম্ব দেখা যায়, তাহাকে তিনি ঠিক্ সেইরূপ দেখিলেন। দেখিয়া দেবী সরস্বতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবি! একি দেখিতেছি! কি প্রকারে ইনি আমার ন্যায় আকারসম্পন্না হইলেন? আমি আমার প্রথম বয়োবস্থায় যেরূপ আকারসম্পন্না ছিলাম, এই মহিষীকেও ঠিক্ তদ্রূপ দেখিতেছি। আমিই কি ইনি? অথবা ইনিই আমি? এই মন্ত্রী ও এই সকল বলবাহনসম্পন্ন পৌর যোধ, এ সমস্তই যেন আমার সেই পূর্ব্বরাজ্যস্থিত জনগণ। আমার বোধ হইতেছে, যেন তাহারাই। ইহারা যদি সেই সমস্তই হয়, তাহা হইলে কি প্রকারে ইহারা এখানে অবস্থিতি করিবে? হে মাতঃ! ইহারা কি দর্পণপ্রতিবিম্ববৎ আমার বাহ্যে ও অন্তরে চেতনসম্পন্নের ন্যায় অবস্থিতি করিতেছে? যদি প্রতিবিম্বই হইবে, তাহা হইলে সচেতন হইবে কেন? বৃত্তান্ত কি তাহা আমাকে বিশেষ করিয়া বলুন[১৪।১৭]।

দেবী বলিলেন, সুন্দরি! যাহার জ্ঞানসংস্কার যেরূপ থাকে, তাহা উদ্বুদ্ধ হইলে ঠিক্ সেইরূপ অনুভূতি জন্মায়। চিৎশক্তির মহিমা অপ্রতর্ক্য। তাহা চিত্তের সহিত একীভূত হইয়া চিত্তেরই অনুরূপে প্রথিত হইয়া থাকে। যেমন চিত্ত অর্থাৎ অন্তঃকরণ স্বপ্নকালে জাগ্রদনুভূত পদার্থের আকার ধারণ করে, তেমনি, চিৎশক্তিও চিত্তের আকারে প্রথিত হয়[১৮]। চিত্তে ও তৎপ্রতিফলিত চৈতন্যে যে আকারের সংস্কার থাকে, উদ্বোধ হইলে সে সংস্কার সেই আকারে সমুদিত হয়, তাহার অন্যথা হয় না। তাহাতে দেশের কি কালের দীর্ঘতা অথবা পদার্থের বিচিত্রতা প্রতিবন্ধক

হয় না[১৯]। জগৎ উক্তক্রমে অন্তঃস্থ আত্মচৈতন্যে অধ্যস্ত ও অধিষ্ঠিত থাকিলেও প্রোক্ত কারণে বাহিরে আছে বলিয়া বোধ হয়। যেমন স্বপ্ন, তেমনি জগৎ। যেমন স্বপ্ননির্ম্মিত ও সঙ্কল্পরচিত পুরী অন্তরে কল্পিত ও অবস্থিত হইলেও বহির্ব্বিদ্যমানের ন্যায় দেখা যায়, তেমনি, অন্তঃপরিকল্পিত জগৎও চৈতন্যের সর্ব্বব্যাপিতা কারণে বহির্ব্বিদ্যমানের ন্যায় প্রতীত হইয়া থাকে[২০]। অতএব, অন্তরে উদীয়মান মিথ্যা জগৎ চিরাভ্যাস বশতঃ অবাধে বাহিরে সত্যের ন্যায় প্রতীত হইয়া থাকে। তোমার ভর্ত্তা তোমার পুরে যে ভাবে অর্থাৎ যেরূপ বাসনাক্রান্ত হইয়া মৃত্যুগ্রাসে নিপতিত হইয়া ছিলেন, সেই মৃত্যুমুহূর্ত্তেই ও সেই স্থানেই তাঁহার সেই সেই ভাব অন্তঃপ্রস্ফুরিত বা বহিঃপ্রব্যক্ত হইয়াছিল। অর্থাৎ মৃত্যুর পর হইতেই তিনি সেই সেই সৃষ্টি অনুভব করিয়া আসিতেছেন। মন্ত্রী প্রভৃতি এই সমস্ত ব্যক্তিগণ আকারগত সাদৃশ্যে তোমার পূর্ব্বমন্ত্রী প্রভৃতির ন্যায় হইলেও তাহাদিগের সহিত ইহারা অভিন্ন নহে, সম্পূর্ণ বিভিন্ন[২১।২২]। অপিচ, রাজা যাহা অনুভব করিতেছেন তাহাও রাজার চিৎসত্তার সত্যতায় সত্য। চিৎসত্তার সত্যতা ব্যতীত আর কাহার সত্যতা নাই। সমস্তই অসত্য অর্থাৎ মিথ্যা। মিথ্যা কেন? না সে সকল স্বচৈতন্যে স্বকীয় অজ্ঞানে কল্পিত। তবে জাগ্রতের ও স্বপ্নের প্রভেদ এই যে, জাগ্রদনুভূত বস্তু বাস্তবপক্ষে অর্থাৎ পরমার্থ দর্শনে অতত্ত্ব হইলেও ব্যবহারে তত্ত্বের ন্যায় অবিসম্বাদী[২৩]। ব্যবহারে অবিসম্বাদী হইলেই যে সত্য হয় তাহা হয় না। ইন্দ্রজালপ্রদর্শিত পদার্থকেও সকলে একরূপ দেখে, সুতরাং অবিসম্বাদী। আরও দেখ, যেমন উত্তরকালে না থাকায় স্বপ্ন দৃষ্ট পদার্থ অলীক অর্থাৎ মিথ্যা বলিয়া অঙ্গীকার করা হয়, তেমনি, জগৎও তত্ত্বজ্ঞানে মিথ্যা বলিয়া প্রতীত হওয়ায় অলীক বলিয়া অবধৃত হয়[২৪]। ভাবিয়া দেখ, জাগ্রৎকালে স্বপ্নের যেরূপ নাস্তিতা, স্বপ্নকালেও জাগ্রতের সেইরূপ নাস্তিতা। অল্পমাত্রও নাস্তিতার ভিন্নতা বা প্রভেদ নাই। সেইজন্য বলা যায়, স্বপ্নের ন্যায় জাগ্রৎও মিথ্যা[২৫]। যেমন জন্মকালে মৃত্যু অসদ্রূপ, তেমনি মৃত্যুকালেও জন্ম অসদ্রূপ। বস্তু সকল নাশকালে অবয়ব ধ্বংস পূর্ব্বক অভাবগ্রস্ত হয় এবং বাধকালে তদ্বিষয়ক অনুভবের বিপর্য্যয় হয়[২৬]। জগৎ যে ভাবে সত্য তাহা বলিলাম, এবং যে ভাবে অসত্য তাহাও বলিলাম। বস্তুতঃ

জগৎ অন্যথা হইয়া যায় বলিয়া সৎ নহে এবং ব্রহ্মময়ত্ব প্রযুক্ত অসৎও নহে। ব্রহ্মময়ত্বের বৈপরীত্যে যে পৃথক্ জগৎজ্ঞান হয়, তাহা ভ্রান্তিরই মহিমা, অন্য কিছু নহে। মহাকল্প প্রারম্ভাবধি অতীত অনাগত বহুযুগ পর্য্যন্ত জগৎভ্রান্তি ভাসমান হইয়া আসিতেছে[২৭]। এই সৃষ্টিনামিকা ভ্রান্তি ব্রহ্ম হইতেই সমুৎপন্না, সেজন্য ইহা ব্রহ্মের অনতিরিক্ত[২৮]। যেমন আকাশে কেশোণ্ড্রক প্রভৃতি বাস্তব পদার্থ নহে, অথচ দৃষ্ট হয়, তেমনি, জগৎও বাস্তব নহে, অথচ অজ্ঞানীর দর্শনে দৃষ্ট হয়। যেমন জলধিতে তরঙ্গসমূহ বিস্তৃত হয়, তেমনি, পরব্রহ্মে এই সৃষ্টি বিস্তৃত হইয়াছে[২৯]। যেমন ধুলিজাল প্রবল বায়ুতে পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন ও বিলীন হয়, তেমনি, তুমি, আমি ও জগৎ, এই সকল ভ্রান্তিময় ভাবও আভাসাত্মা (জীবচৈতন্য) হইতে পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন ও বিলীন হইয়া থাকে[৩০]। মৃগতৃষ্ণিকাজলের ন্যায় ও দগ্ধপটের ন্যায় সৃষ্টির প্রতি আস্থা কি? কিসের আস্থা? ইহা ভ্রান্তি ব্যতীত অন্য কিছু নহে। ব্রহ্ম ও জগৎ, ইত্যাকার ভেদ জ্ঞান তিরোহিত হইলে ইহা সেই পরম পদেই পর্য্যবসিত হইবে[৩১]। গাঢ় অন্ধকারে বালকগণের যে যক্ষভ্রান্তি, তাহা সেই অন্ধকার বৈ যক্ষ নহে। অতএব, এই জগৎ জন্মমৃত্যুরূপ মোহের ও ব্যামোহের অর্থাৎ অজ্ঞানের বিস্তার ব্যতীত অন্য কিছু নহে[৩২]। মহাকল্পের সহিত দৃশ্যসমূহের শান্তি হইলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই ব্রহ্ম। অতএব, জগৎ ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ অর্থাৎ অতিরিক্ত সত্য নহে, এবং ব্রহ্মময়ত্ব প্রযুক্ত ইহা নিতান্ত অসত্যও নহে[৩৩]। অথবা এক পদার্থের সত্যতা ও অসত্যতা উভয়রূপিত্ব অসম্ভব। সেই কারণে অবধারিত হয়, পরিদৃশ্যমান জগৎ অদ্বয় ব্রহ্মের স্বরূপের প্রচ্ছাদন মাত্র অর্থাৎ আবরণ মাত্র। আকাশে, পরমাণুর অন্তরে ও দ্রব্যাদির অণুমধ্যে, যে যে স্থানে জীবাণু অবস্থিতি করে, সেই সেই স্থানেই জগৎ বা পরমাত্মার শরীর বিদ্যমান রহিয়াছে। যেমন অগ্নি আপন ভাবনার বলে আপনাকে উষ্ণ বলিয়া জানেন, তেমনি, বিশুদ্ধ চিদাত্মাও ভাবনার বলে এই দৃশ্য জগৎকে আত্মভূত অবলোকন করেন। * যেমন সূর্য্য সমুদিত হইলে গৃহমধ্যস্থ তদীয় আলোকে ত্রসরেণু সকলকে পরিভ্রমণ করিতে দেখা যায়, সেইরূপ,

* এতৎ শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র, সূর্য্য, এই সমস্তই পূর্ব্বকল্পীয় জীব। এক্ষণে ইহাঁরা দেবতা। পূর্ব্বকল্পীয় উপাসনার প্রভাবে এতৎকল্পে দেবভাব প্রাপ্ত। পূর্ব্বকল্পে

সেই পরমাকাশে ব্রহ্মাণ্ডরূপ অসংখ্য ত্রসরেণু নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে, অভিজ্ঞগণ দেখিয়া থাকেন। যেমন বায়ুতে স্পন্দন ও আমোদ থাকে, এবং আকাশে শূন্যতা আছে, সেইরূপ, আবির্ভাব, তিরোভাব, উৎসর্গ ও ত্যাগ, এতচ্চতুষ্টয়াত্মক স্থূল সূক্ষ্ম জগৎ সেই পরমাত্মাতেই অবস্থিত রহিয়াছে[৩৪।৩৮]। হে রাঘব! এই বিশ্ব সেই অবয়ববর্জ্জিত (নিরাকার) ব্রহ্মের ভাবান্তর মাত্র। সেই কারণে তুমি এই সাকার বিশ্বকেও নিরাকার বলিয়া বিবেচনা করিবে[৩৯]। ফলতঃ ইহা পরমাত্মারই নৈজ মায়িকভাব অনুসারে সমুদিত, সুতরাং পূর্ণব্রহ্মে অবস্থিতি প্রযুক্ত বিশ্বশব্দ অর্থশূন্য নহে। অর্থাৎ বিশ্বশব্দ পূর্ণ পরব্রহ্ম পদার্থের নামান্তর মাত্র। অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখিতে পাইবে, ইহা সত্যও নহে, মিথ্যাও নহে, কিন্তু অনির্ব্বাচ্য। যেমন রজ্জুসর্প। যাহা ভ্রান্তিদৃষ্ট, তাহা সত্য নহে। যাহা পরীক্ষাদৃষ্ট, তাহা অসত্য নহে। এই দুই বা দ্বিবিধ যুক্তির সাহায্যে জানা যায়, জগৎ অনির্ব্বাচ্য। অর্থাৎ পরমাত্মার ন্যায় সত্য নহে এবং রজ্জুসর্পের ন্যায় মিথ্যাও নহে। পরিদৃষ্ট রজ্জুসর্পও অনির্ব্বাচ্য অর্থাৎ সত্যও নহে ও মিথ্যাও নহে। সত্য হইলে বাধ হইত না, এবং মিথ্যা হইলে দৃষ্ট হইত না। চৈতন্য, অনির্ব্বাচ্য মায়াপিহিত হওয়াতেই জীবরূপে প্রকাশ পাইয়াছে, সেই কারণে জীবত্বও অনির্ব্বাচ্য[৪০।৪২]।

হে রামচন্দ্র! চিরকাল আপনার জীবভাব অনুভব করায় ক্রমে তাহার সংস্কার দৃঢ় হইয়া যায়, সেই কারণে জগতে আপনার সত্যতা অধ্যস্ত হইয়া যাওয়ায়, জগৎ সত্য, এতদ্রূপ প্রতীতি হইয়া থাকে। ফলতঃ জগৎ সত্য হউক, আর অসত্য হউক, চিদাকাশ ব্যতীত অন্য কোথাও নাই ও অন্য কিছুও নহে। চিদাকাশেই জগদ্দর্শন হইয়া থাকে[৪৩]। জীবের যে ভোগেচ্ছা, তাহাই সংসারের উৎপাদক কারণ, সে অংশে সত্য মিথ্যার উপযোগিতা নাই। বিষয় সত্যই হউক, আর অসত্যই হউক, তাহার অনুরঞ্জনাই সংসারের উৎপত্তির ও স্থিতির মূল কারণ। জীব অগ্রে স্বেচ্ছাকৃত বিষয়ানুভবে অনুরঞ্জিত হয়, পরে, সেই পূর্ব্বানুভূত বিষয় সকল পুনরনুভব করে[৪৪]। অনুভবের মহিমা এরূপ বিচিত্র যে, তাহা কদাচিৎ পূর্ব্বানুভবের অবিকল মূর্ত্তি প্রদর্শন করায় এবং কখন

অগ্নি অনগ্নি জীব ছিলেন, এবং আপনাকে অগ্নিভাবে ভাবিত করিয়াছিলেন। সে কল্পের সেই দৃঢ় ভাবনার প্রভাবে এ কল্পে তিনি অগ্নি হইয়াছেন। অন্য দেবতা পক্ষেও এইরূপ সিদ্ধান্ত।

বা অসমান ও অর্দ্ধসমান অনুভবনীয় উপস্থাপিত করিয়া সে সকলকে পুনঃ পুনঃ অনুভবগম্য করায়। অর্থাৎ বাসনার যেমন যেমন উদ্বোধ, তেমনি তেমনি বাহ্য-বস্তুর দর্শন হয়। পরন্তু বিচার চক্ষে দেখিবা মাত্র বুঝা যায় যে, সেই সেই অনুভব সমস্তই অসত্য অথচ একমাত্র জীবাকাশে (জীবরূপ আকাশে। জীব আকাশতুল্য নিরবয়ব, সেজন্য তাহা আকাশ) বিকসিত (দৃষ্ট)। বৎসে! তোমার পূর্ব্ববাসনা (পূর্ব্বসঞ্চিত জ্ঞানসংস্কার) সর্ব্বাংশে সমান হইয়া উদ্বুদ্ধ হওয়ায় সম্প্রতি তুমি দেখিতেছ, অনুভব করিতেছ, সেই কুল, সেই আচার, সেই আকার প্রকার ও সেই চেষ্টা প্রভৃতি সমন্বিত মন্ত্রী ও পুরবাসী প্রভৃতি এই স্থানে আমার দর্শন পথে রহিয়াছে। ফলতঃ এ সমস্তই তোমার আত্মায় অবস্থিত, অন্যত্র (অর্থাৎ বাহিরে) নহে[৪৫।৪৭]। সর্ব্বব্যাপী আত্মার রূপ প্রতিভা। তাহার স্থিতিও সেইরূপ অর্থাৎ যে প্রকার বলিলাম সেই প্রকার। অপিচ, যেমন রাজার আত্মাকাশে সত্যবৎ প্রতিভা (জ্ঞান) উদিত হইতেছে, তেমনি, তোমারও আত্মাকাশে সত্যবৎ প্রতিভা (জ্ঞান বা অনুভব) প্রকাশ পাইতেছে। সেই কারণে তুমি দেখিতেছ, সমাগতা নারী (বিদুরথপত্নী দ্বিতীয়া লীলা) অবিকল তোমারই অনুরূপা[৪৮।৪৯]। বৎসে! প্রতিভা সর্ব্বব্যাপী সম্বিদ্রূপ নির্ম্মল আদর্শে কথিত প্রকারেই প্রতিবিম্বিত হয়, তাহার অন্যথা হয় না। সর্ব্বান্তর্যামী ঈশ্বরের প্রতিভা অন্তরে প্রতিভাসিত অর্থাৎ প্রতিবিম্বিত হইয়া পশ্চাৎ তাহা বাহিরের ন্যায় প্রকটিত হয়। পরন্তু সর্ব্বপ্রকার প্রতিভার প্রতিবিম্ব, জীবরূপ আকাশ ব্যতীত অন্য কোথাও সমুদিত হয় না। অর্থাৎ জীবই স্বকীয় প্রতিভায় স্বসংস্কারানুরূপ প্রতিবিম্ব দেখিতে পায় অর্থাৎ অনুভব করে[৫০।৫১]। বৎসে! এই মহান্ আকাশ, এতদন্তর্গত ভুবন, ভুবনান্তর্গত ভূমণ্ডল, তদন্তর্গত তুমি, আমি ও রাজা, এ সমস্তই প্রতিভাময় অর্থাৎ চিন্মাত্রস্বভাব। যেহেতু চিন্মাত্রস্বভাব, সেইহেতু সমস্তই অহং অর্থাৎ আপন আত্মার স্ফুরণ বিশেষ। এ রহস্য তত্ত্বজ্ঞানীরাই বিদিত হইতে পারেন, অন্যে নহে। তত্ত্বজ্ঞগণ জানেন, এ সমস্তই চৈতন্যাকাশরূপ বিল্লের উদরস্থ। লীলে! আশা করি, তুমিও এ সমুদায়কে চিদাকাশ বলিয়া জানিবে। জানিলে তুমিও তত্ত্বজ্ঞ দিগের ন্যায় পরিপূর্ণ নির্ব্বিক্ষেপ কেবল ও শান্ত নির্ব্বাণ রূপে অবস্থিত হইবে[৫২]।

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ।

অতঃপর জ্ঞপ্তিদেবী সরস্বতী, সমাগতা লীলাকে বলিলেন, লীলে! তোমার এই ভর্ত্তা রাজা বিদূরথ উপস্থিত যুদ্ধে শরীর পরিত্যাগ করিয়া সেই অন্তঃপুর মণ্ডপে গিয়া তদাকার প্রাপ্ত হইবেন। অর্থাৎ এতদীয় জীবের অনুপ্রবেশ দ্বারা সেই মৃত পদ্মভূপতির শবীভূত দেহ পুনর্জ্জীবিত হইবেক[১]।

মহামুনি বশিষ্ঠ বলিলেন, রাঘব! সেই দ্বিতীয়া লীলা সরস্বতী দেবীর ঐ প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া বিনয়নম্রা হইয়া কাতরস্বরে বলিতে লাগিলেন[২]। বলিলেন যে, হে দেবি! আমি প্রত্যহ জ্ঞানদেবীর অর্চ্চনা করিয়াছিলাম, তাহাতে তিনি রাত্রিকালে স্বপ্নযোগে আমাকে দর্শন দিয়াছিলেন[৩]। হে অম্বিকে! আমি স্বপ্নে তাঁহাকে যেরূপ দেখিয়াছিলাম, আপনাকে ঠিক্ সেইরূপ ও সেই আকার সম্পন্না দেখিতেছি। এক্ষণে আপনাকে দেখিয়া আমার অভিলাষ হইতেছে, আপনি দয়া করিয়া আমাকে বর প্রদান করুন[৪]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, সমাগতা লীলা ঐরূপ বলিলে, জ্ঞানদেবী সরস্বতী তদ্দেশলীলার তাদৃশ ভক্তিভাব স্মরণ করিয়া প্রসন্না হইলেন ও অগ্রিমোক্ত কথা বলিলেন[৫]।

দেবী বলিলেন, বৎসে! আমি তোমার ভক্তিতে নিতান্ত পরিতুষ্টা হইয়াছি, এক্ষণে তুমি অভিলষিত বর গ্রহণ করিয়া কৃতার্থা হও[৬]।

সমাগতা লীলা বলিলেন, আমার এই পতি যুদ্ধে দেহ পরিত্যাগ করিয়া যে স্থানে, যে শরীরে অবস্থান করিবেন, আমি যেন এই শরীরে তাঁহার সেই অবস্থিতি স্থানে যাইতে ও থাকিতে পারি[৭]। দেবী প্রসন্না হইয়া বলিলেন, তাহাই হইবে। পুত্রি! তুমি আমাকে বহুকাল একচিত্তে পুষ্প ধূপ ও বিবিধ পরিচর্য্যাদির দ্বারা পূজা করিয়াছ, তাহাতে আমি পরিতুষ্টা হইয়াছি[৮]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, অনন্তর তদ্দেশীয় লীলা উক্ত বর প্রাপ্তে প্রফুল্লা হইলে পূর্ব্বলীলা কিঞ্চিৎ সন্দিহানা ও বিস্মিতা হইলেন। কিয়ৎক্ষণ

পরে দেবী সরস্বতীকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন[৯]। বলিলেন, দেবি! যাহারা আপনার ন্যায় সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প, সেই ব্রহ্মরূপী দিগের ইচ্ছা অচিরাৎ পূর্ণ হইয়া থাকে[১০]। তাই আমি জিজ্ঞাসা করি, হে ঈশ্বরি! আপনি কি নিমিত্ত আমাকে আমার সেই স্থূল শরীর ত্যাগ করাইয়া এতল্লোকে ও সেই গিরিগ্রামে আনীতা করিয়াছেন? এবং কোন্ কারণে এই লীলাকে স্বশরীরে ভর্তৃলোক গমনের আদেশ করিলেন। জানিবার জন্য আমার চিত্ত চঞ্চল হইতেছে, ব্যক্ত করিয়া আমার চপল চিত্তকে সুস্থির করুন[১১]।

দেবী প্রত্যুত্তর করিলেন। বলিলেন, বরবর্ণিনি! আমি কাহার কিছু করি না। জীবেরা নিজেই নিজের অভীপ্সিত সিদ্ধ করিয়া থাকে[১২]। প্রাণিগণের ভবিষ্যৎ শুভ আমি বর প্রদান দ্বারা মাত্র প্রকট করিয়া থাকি, অন্য কিছু করি না। প্রত্যেক জীবে পূর্ব্বকৃত কাম, কর্ম্ম (কর্ম্ম সংস্কার) ও জ্ঞান প্রভৃতি পরিব্যাপ্ত চিদাত্মরূপিণী জীবশক্তি বিদ্যমান থাকে, সেই বিদ্যমানশক্তিই তাহাদিগকে ফল প্রদান করিয়া থাকে। আমি কেবল তাহাদের সেই সম্বিদের (চিচ্ছক্তির) প্রকাশকারিণী অধিষ্ঠাত্রী মাত্র[১৩]। জীবের যখন যে চিচ্ছক্তি উদয়োন্মুখা হয়, তদনুসারে আমি তাহাদিগের বরপ্রদা হই[১৪]। তুমি যখন আমার আরাধনায় তৎপরা ছিলে, তৎকালে তোমার জীবশক্তি "আমি দেহাভিমানশূন্যা হইব" এইরূপে উদ্বোধিত হইয়াছিল। যেহেতু তুমি আমাকে উক্ত প্রকারে উদ্বুদ্ধা করিয়াছিলে, সেই কারণে তুমি আমা কর্তৃক অলংভাবে অর্থাৎ অজ্ঞানাবরণ বর্জ্জিত নির্ম্মল স্থিতিপ্রবাহে নীতা হইয়াছ[১৫।১৬]। এ লীলা আমাকে যে ভাবে বোধিত করিয়াছে, আমিও সেই ভাবে ইহাকে ফল প্রদান করিতেছি। ইহার চিৎশক্তি পূর্ব্বেই অভিহিত প্রকারে সমুদিত হইয়াছিল সুতরাং আমিও তদনুগামিনী হইয়া ইহাকে স্থূল শরীরে ভর্তৃলোক গমনের বর দিয়াছি[১৭]। অধিক কি বলিব, যাহার যেরূপ চৈতন্যপ্রধান প্রযত্ন, যোগ্যকালে তাহার সেইরূপ ফলই স্বচৈতন্যে সমুপস্থিত হয়[১৮]। তপস্যা বল, আর দেবতা বল, কেহ কিছুই নহে। ইহা নিশ্চয় জানিবে যে, আপনার প্রযত্নপ্রদীপ্ত চিৎশক্তিই সেই সেই তপস্যা ও দেবতা হইয়া ফল প্রদান করিয়া থাকে। নিজ সম্বিদের প্রযত্ন ব্যতীত অন্য কেহ ফলদাতা নাই, ইহা জানিয়া যাহা ইচ্ছা

তাহা করিতে পার। অর্থাৎ যে ফল ইচ্ছা করিবে, পূর্ব্ব হইতে তদনুরূপ কার্য্য করিবে। করিলে অবশ্যই সেই ফল অনুভব করিবে[১৯।২০]। এই যে অপরিমিত-মহিমা ও দেহপরিচ্ছিন্না চিতিশক্তি, এই শক্তিকে পূর্ব্বকালে রম্য ও অরম্য (রম্য=বিহিত। অরম্য=নিষিদ্ধ) যে বিষয়ে ব্যাপারিত করিবে এবং যেরূপ ও প্রযত্নে উত্থাপিত করিবে, উত্তর কালে তাহা তাহারই অনুরূপা ও ফল স্থানিয়া হইয়া উদিত হইবে। এক্ষণে আমার অপর বক্তব্য এই যে, তুমি মদীয় উক্তি সকল বিচার কর, করিয়া যাহা পবিত্র, তাহাই বুদ্ধিস্থ করিয়া তদন্তরে অব-স্থান কর[২১]।

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ।

রাম জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! রাজা বিদূরথ কুপিত হইয়া গৃহ মধ্য হইতে নির্গত হইলেন এবং লীলাদ্বয় ও জ্ঞানদেবী ঐরূপ কথোপকথন করিলেন। কিন্তু আমার চিত্ত, বিদূরথ গৃহবহির্গত হইয়া কি কার্য্য করিলেন তাহা জানিবার নিমিত্ত অত্যন্ত সমুৎসুক হইতেছে। অতএব, বলুন, বিদূরথ কোপভরে গৃহবহির্গত হইয়া কি কি কার্য্য করিয়াছিলেন১।

বশিষ্ঠ বলিলেন, বিদূরথ কোপভরে আপন কক্ষা (গৃহ) হইতে নির্গত হইয়া চন্দ্রমা যেমন নক্ষত্রবৃন্দে পরিবৃত হন, সেইরূপ, অসখ্য পরিবারে পরিবৃত হইলেন২। অনন্তর বর্ম্মে ও অস্ত্রশস্ত্রে সর্ব্বাঙ্গ সন্নদ্ধ করিলেন এবং অঙ্গে হার প্রভৃতি দিব্যাভরণ ধারণ করিলেন। সুররাজ ইন্দ্র যেমন দেবগণ কর্ত্তৃক জয় শব্দে বন্দিত হইয়া অসুর বধার্থ যুদ্ধ যাত্রা করেন, সেইরূপ, মহারাজ বিদূরথও অমাত্য ও সামন্তগণ কর্ত্তৃক জয় শব্দে বন্দিত হইয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন৩। পরে যোদ্ধা দিগকে যথাযথ আদেশ করিলেন। মন্ত্রিগণের নিকট ব্যূহ রচনার ও রাজ্য রক্ষার ব্যবস্থা শ্রবণ করিলেন এবং বীরদিগের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে রথারোহণ করিলেন৪। মহারাজ বিদূরথের যুদ্ধরথ পর্ব্বতের ন্যায় উচ্চ, মুক্তা ও মণিমাণিক্যে খচিত এবং পতাকা পঙ্‌ক্তে পরিশোভিত। দেখিলে বোধ হয়, যেন স্বর্গের বিমান স্বর্গ হইতে অবতরণ করিয়াছে। ইহার চক্রে ও ভিত্তিপ্রদেশে সুবর্ণকীলক প্রোথিত এবং ইহার অগ্রভাগ (সম্মুখভাগ) মুক্তামালায় বিজড়িত৫।৬। অত্যন্ত বেগশীল, কৃশকায়, সুগ্রীব ও সুলক্ষণ সম্পন্ন সদশ্ব সকল এই রথ বহন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, বোধ হইল, যেন উড্ডয়নশীল পক্ষীন্দ্রেরা অন্তরীক্ষে কোন দেবতাকে বহন করিতেছে৭। বায়ু অগ্রগামী হইবে, ইহা যেন তাহাদের অসহ্য। অসহ্য বোধ করিয়াই যেন তাহারা বায়ুর অগ্রে আকাশ চুম্বন করতঃ ধাবমান হইল৮। তাদৃশ বেগগামী, চন্দ্রচন্দ্রিকাতুল্য শুভ্রবর্ণ আট অশ্ব উক্ত রথ উক্ত প্রকারে বহন করিতে প্রবৃত্ত হইল৯। অনন্তর, যেমন গিরিগহ্বরে মেঘগর্জ্জন হইলে তাহার প্রতিধ্বনি ভীষণ হইয়া উঠে, তদনুরূপ ধ্বনিতে

দুন্দুভি সকল বাদিত হইতে লাগিল[১০]। তাদৃশ দুন্দুভিধ্বনি উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণের কলকলারবে, আয়ুধসঙ্ঘাতের সঙ্ঘট্টশব্দে, ধনুকের চটচটাশব্দে, শরের সীৎকার বা শন্ শন্ শব্দে, অঙ্গসঙ্ঘট্টজনিত অঙ্গস্থ কবচের ঝন্ ঝন্ শব্দে, অলাতাগ্নির টনৎ টনৎ শব্দে, যুদ্ধাহতগণের কাতর শব্দে, বীরগণের পরস্পরাহ্বানজনিত বজ্রবৎ কঠোর বা কর্কশ শব্দে ও বন্দিগণের রোদন শব্দে নিবিড়িত হইয়া উঠিল[১১।১৩]। বোধ হইল, এই নিবিড় যুদ্ধগর্জ্জন যেন সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডছিদ্র (আকাশ) প্রপূরিত করিয়াছে[১৪]। এই অবসরে আকাশে এরূপ ধূলি উড্ডীন হইল যে, তত্রস্থ দর্শকগণ তদ্দর্শনে মনে করিলেন, সমুদায় ভূপীঠ যেন উর্দ্ধে উৎপতিত হইয়া আদিত্য পথ রুদ্ধ করিয়াছে[১৫]। তৎকারণে এরূপ অন্ধকার উপস্থিত হইল যে, রাজপুরী যেন গর্ব্ভবাসে নিমগ্ন হইয়াছে[১৬]। যেমন দিবসাগমে তারকা-রাজি অন্তর্হিত হয়, সেইরূপ, সমুদায় লোক অন্ধকারে লীন হইয়া গেল এবং রাত্রিঞ্চর ভূত প্রেতাদি জীবের বল বৃদ্ধি পাইল[১৭]। সে অন্ধকারে সকলেই অন্ধ, কেবল দেবীর প্রসাদে লব্ধদিব্যদৃষ্টি লীলাদ্বয় ও বিদূরথকন্যা দৃক্‌শক্তিসম্পন্ন রহিলেন। সুতরাং তাঁহারা সেই যুদ্ধ দেখিতে অবসর পাইলেন[১৮]।

অনন্তর, যেমন প্রলয়কালে জগৎ একার্ণবীকৃত হইলে বাড়বানল উপশান্ত হয়, তেমনি, রাজার আগমনে নগর লুণ্ঠক দিগের, রথের, সৈন্যের ও অস্ত্রশস্ত্রের কটকটা রব প্রশমিত হইল[১৯]। যদ্রূপ সুমেরু পর্ব্বত প্রলয়মহার্ণবে প্রবিষ্ট অর্থাৎ নিমগ্ন হয়, সেইরূপ, রাজা বিদূরথ স্বপক্ষ বিপক্ষ সৈন্যসমুদ্রের তারতম্য অনুধাবন না করিয়াই শত্রুসেনা মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন[২০]। অতঃপর কেবল জ্যা-সিঞ্জিত শুনা যাইতে লাগিল এবং স্বপক্ষ বিপক্ষ হইতে অস্ত্রাংশুময় মেঘ সকল সৃষ্ট হইতে লাগিল[২১]। অসংখ্য অস্ত্ররূপ বিহঙ্গম গগনমার্গে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। এবং অস্ত্র সকল পরপ্রাণ হরণ করিয়া পাপীর ন্যায় মলিনদীপ্তি হইতে লাগিল[২২]। প্রক্ষিপ্ত অস্ত্রের পরস্পর সংঘর্ষে যে অগ্নি নির্গত হইতে লাগিল, সে সকল অগ্নি উল্মুকের বা অলাতের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। বীররূপ মেঘেরা শরবর্ষণ ও গর্জ্জন করিতে লাগিল[২৩]। বীর দিগের অঙ্গে আয়ুধ সকল প্রবিষ্ট হইতে লাগিল এবং উভয়দলের খড়্গ প্রহারের শব্দ আকাশে সঞ্চরণ করিতে লাগিল[২৪]। শস্ত্ররূপ দীপের আলোকে রণসঙ্ঘট্ট

জনিত অন্ধকার দূরে পলায়ন করিল। বীর দিগের অঙ্গে নারাচ প্রোথিত হওয়ায় তাহারা রোমশ পুরুষের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল[২৫]। সেই যমযাত্রায় (যমসম্বন্ধীয় উৎসবে) অনেক শত কবন্ধ (নির্ম্মস্তক যোদ্ধৃদেহ) নটের ন্যায় নৃত্য করিতে লাগিল এবং পিশাচকন্যাগণ আসিয়া তৎসঙ্গে নটকন্যার অনুকার করিতে লাগিল[২৬]। পৃথিবীতে দন্তের কট-কটাধ্বনি এবং আকাশে যন্ত্রক্ষিপ্ত প্রস্তরের সঙ্ঘট্টজনিত ঠন্ ঠন্ শব্দ অন-বরত শ্রুত হইতে লাগিল[২৭]। যেমন বায়ুর প্রচলনে শুষ্কপত্র সকল নিপতিত হয়, সেইরূপ, শবীভূত প্রাণিনিকর ভূতলে নিপতিত হইয়া স্তূপীকৃত হইতে লাগিল। সেই যুদ্ধরূপ অদ্রি হইতে সর্ব্বদিকেই প্রাণিমরণরূপ অসঙ্খ্য নদী বিনিঃসৃত হইল[২৮]। অজস্র রক্ত নিপতনে রণাঙ্গনের পাংশু কর্দ্দমিত হইল। অস্ত্রাগ্নির প্রতাপে অন্ধকার বিনষ্ট হইল। যুদ্ধে তন্মনা হওয়ায় বীরগণের সংলাপশব্দ বিনিবৃত্ত হইল এবং অনেক প্রাণী ভয়ে ব্যাকুলিতচিত্ত হইতে লাগিল[২৯]। অভিহিত প্রকারে ও নিঃশব্দে যুদ্ধ চলিতে লাগিল এবং বাত বিরহিত বর্ষণের ন্যায় অজস্র শরবর্ষণ হইতে লাগিল। এই বর্ষণের বিদ্যুৎ ও বজ্র খড়্গের ক্রীড়া ও শব্দ[৩০]। শরের খদ খদ ধ্বনি, ভুশুণ্ডির টকটক নিস্বন, মহাস্ত্রসমূহের ঝন্ঝনা শব্দ, মিলিত হওয়ায় এই যুদ্ধ নিতান্ত ভীষণ ও দুস্তর হইয়া উঠিল[৩১]।

ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।
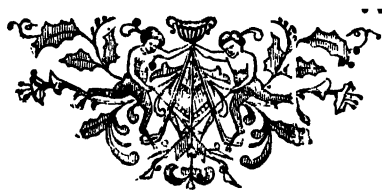
সপ্তচত্বারিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রঘুনাথ! উপস্থিত ঘোর সংগ্রামে উক্ত উভয় লীলা পুনর্ব্বার জ্ঞাপ্তিদেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন[১]। "দেবি! আপনি আমাদের প্রতি পরিতুষ্টা হউন এবং বলুন যে, আমাদের ভর্ত্তা কিজন্য জয় লাভে সমর্থ হইতেছেন না। আমাদের চিত্ত সোৎসুক হইতেছে, এ অবস্থায় উহা ব্যক্ত করিয়া আমাদের উৎকণ্ঠা দূর করুন[২]।" সরস্বতী বলিলেন, পুত্রিযুগল! বিদূরথের শত্রু এই সিন্ধুরাজ জয় লাভের নিমিত্ত দীর্ঘকাল আমার আরাধনা করিয়াছেন। কিন্তু রাজা বিদূরথ সেরূপ কামনায় আমার আরাধনা করেন নাই[৩]। সেই কারণে সিন্ধুরাজের জয় ও বিদূরথের পরাজয় হইতেছে।" আমিই সর্ব্বভূতের অন্তর্গতা সম্বিৎ। আমাকে যে যে প্রকারে ও যে কার্য্যে প্রেরণ করে, আমি তাহার সেই কার্য্য সেই প্রকারে সম্পন্ন করিতে বাধ্য। আমার স্বভাব এই যে, আমাকে যে, যে কার্য্যে নিয়োগ করে, আমি তাহার সেই কার্য্যের ফলরূপিণী হই। যাহা যাহার স্বভাব, তাহা তাহার কদাচ অন্যথা হয় না। উষ্ণ-স্বভাব বহ্নি কি কখন উষ্ণতা পরিত্যাগ করে? বিদূরথ আমাকে মুক্তি কামনায় বিভাবিত করিয়াছেন, তাই আমি বিদূরথের প্রতিভায় মুক্তিদাত্রী হইয়াছি। সেই কারণে বিদূরথ শীঘ্রই মুক্ত হইবেন। বিদূরথের শত্রু সিন্ধুমহীপতি যুদ্ধজয় কামনায় আমার আরাধনা করায় আমিও তাহার জয়দাত্রী হইয়া উদিত হইয়াছি। দেখিবে, শীঘ্রই বিদূরথ দেহ পরি-ত্যাগ করিয়া তোমার ও ইহার সহিত মুক্ত হইবেন, এবং এতদীয় শত্রু সিন্ধুরাজ ইহাকে বিনাশ করিয়া জয়ী ও এতদ্রাজ্যাধিপতি হইবেন। বশিষ্ঠদেব বলিলেন, রাম! দেবী সরস্বতী এইরূপ বলিতেছেন, এবং উভয়পক্ষীয় সৈন্য যুদ্ধ করিতেছে, এমন সময়ে ভগবান্ রবি যেন যুদ্ধ দেখিবার জন্য উদয়াচলে আরোহণ করিলেন। তখন তিমির সঙ্ঘাত পাতালে পলায়ন করিল। জীব সকল সচেতন হইল, অল্পে অল্পে আকাশ ও পর্ব্বতকন্দর প্রকাশ প্রাপ্ত হইল, এবং জগৎ যেন কজ্জল সমুদ্রে নিমগ্ন ছিল, রবি যেন তাহা হইতে তাহাকে উদ্ধৃত করিলেন।

রবিরশ্মি এখন যে ভাবে পৃথিবীতে পতিত হইতেছে, সে ভাব দেখিলে মনে হয়, যেন স্বর্গ হইতে কনক রাশি গলিয়া পড়িতেছে[১২।১৩]। কনকদ্রব-সন্নিভ সুন্দর রবিরশ্মি শৈলোপরি ও বীরশরীরে নিপতিত হওয়ায় তাহা রক্তছটার শোভা বিতরণ করিতে লাগিল। অপিচ, রণস্থল বীরগণের ভুজগ-সদৃশ ভুজ সমূহে পরিব্যাপ্ত দেখা গেল। আরও দেখা গেল, রণস্থল যেন বীরগণের রত্নকুণ্ডল দ্বারা রত্নৌঘসমাকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে[১৪।১৫]। কোন ভূভাগ খড়্গী সমূহে (খড়্গী=গণ্ডার পশু) পরিব্যাপ্ত হইলে যেরূপ দৃশ্য হয়, আয়ুধ সম্পাতে রণভূমি আজ্ সেইরূপ দৃশ্য হইয়াছে। শলভ পতনে (শলভ=পঙ্গপাল) শস্য ক্ষেত্র যেরূপ অদৃশ্য হয়, উভয়পক্ষীয় শরবর্ষণে সমরভূমি আজ্ সেইরূপ অদৃশ্য হইয়াছে। রক্তের লোহিত প্রভায় চতুর্দ্দিক্ সন্ধ্যারাগের ন্যায় অরুণিত হইয়াছে এবং সমর নিপতিত শবের (মৃত দেহের) দ্বারা সমরভূমি যেন সমাধিসাধক সিদ্ধ পুরুষের অভিনয় করিতেছে[১৬]। নিপতিত হার সকল সর্পনির্ম্মোক, পতাকা সকল লতার বিলাস, এবং ছিন্ন উরু সকল তোরণ[১৭]। এই আকারের রণভূমি যেন আজ্ নিকৃত্ত হস্তপদাদির দ্বারা পল্লবিত, শর সমুদায় দ্বারা শরবনোপম এবং শস্ত্রাংশুর দ্বারা শ্যামলবর্ণ হইয়াছে। সর্ব্বত্র সমাকীর্ণ রাশি রাশি আয়ুধমালার দ্বারা, উন্মত্ত ভৈরবের অস্ত্রসঙ্ঘট্টন সম্ভূত অনলশিখার দ্বারা, প্রফুল্ল অশোক-বনের ও আয়ুধ সমুদায়ের বালসূর্য্যোপম কান্তির দ্বারা রণস্থল এখন সৌবর্ণ নগরের আকার ধারণ করিয়াছে[১৮।১৯]। প্রাস, অসি, শক্তি, চক্র, ঋষ্টি ও মুষল সম্পাতের মহাশব্দে রণস্থলস্থ আকাশ প্রতিধ্বনিময় হইয়াছে। মহাবেগে রক্তনদী প্রবাহিত, তাহাতে রাশি রাশি শব ভাসিয়া যাইতে লাগিল[২০।২১]। ভুষণ্ডী, শক্তি, কুন্ত, অসি, শূল ও পাষাণ এবং শস্ত্র, ছত্র, কবন্ধ, এই সকলের পতনে ও উৎপতনে রণভূমি সমাকুল হইয়াছে। এই অবসরে করালরূপ বেতালকুল নর্ত্তন সহকারে হলহলা ধ্বনি করিতে লাগিল এবং এই অবসরে পদ্মভূপতির ও সিন্ধুরাজের দীপ্তিশীল দিব্য রথদ্বয় অচলের ন্যায় দর্শকগণের দৃষ্টিগোচর হইল[২২।২৩]। অর্থাৎ উভয়ের দ্বৈরথ যুদ্ধ আরব্ধ হইল।

যদ্রূপ অন্তরীক্ষে নভোমণ্ডলের কেতুস্বরূপ সূর্য্য ও চন্দ্র উভয়ে পরিভ্রমণ করেন, রাজদ্বয়ের রথদ্বয় সেইরূপ দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। চক্র, শূল, ভুষণ্ডী, ঋষ্টি, প্রাস, গদা ও আয়ুধ দ্বারা সমাকুল ও বীরগণে

পরিবৃত ঐ রথদ্বয় মহাশব্দে ও স্বেচ্ছানুসারে কুণ্ডলাকারে ভ্রমণ করিতে লাগিল[২৪।২৫]। তখন ঐ উভয় রথের কুবর হইতে মণি মুক্তার ঝন ঝন শব্দ ও বাতাহত পতাকার অগ্রভাগ হইতে পট পটা শব্দ সমুত্থিত হইল[২৬।২৮]। রথদ্বয় যেন রণলীলায় মত্ত হইয়া শব্দায়মান মহাচক্রের দ্বারা মৃতামৃত অসঙ্খ্য ব্যক্তিকে পরিপেষণ করতঃ সেই কেশশৈবলাদিসম্পন্ন, (কেশ সকল এই নদীর শেয়ালা। চক্র=রথচক্র ও অস্ত্র। চক্রবাক্= জলচরপক্ষী)। চক্ররূপ চক্রবাকসমূহে সমাকূল ও বহমান বারণসঙ্কুল শোণিত-নদী সন্তরণ করিতে লাগিল। যে সকল সৈনিকগণ ভীত হইয়াছিল, এতক্ষণ পরে তাহাদিগের অগ্রনায়ক বীরেরা শরাসন আকর্ষণ পূর্ব্বক শরধারা বর্ষণ ও কুন্ত, শক্তি, প্রাস ও চক্র প্রভৃতি আয়ুধ সমুদয় নিক্ষেপ করতঃ রথ-দ্বয়ের অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিল। অনন্তর সেই রথদ্বয় মণ্ডলা-কার গতিক্রমে পরস্পর সম্মুখীন হইলে তত্রস্থ নরপতিদ্বয় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হই-লেন। তখন পরস্পর প্রহারকারী রাজদ্বয় নারাচধারা নিক্ষেপের ধ্বনি উত্থাপন করতঃ মেঘোদয়ে গর্জ্জনকারী মত্তমহাসমুদ্রের ন্যায় গভীর গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। এই দুই নরসিংহ প্রহারপ্রবৃত্ত হইলে তাঁহাদের ধনুক হইতে নানাপ্রকার প্রহরণ বিনিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। উভয়পক্ষ হইতে যে সকল বাণ প্রেরিত হইতে লাগিল, সে সকলের কেহ পাষা-ণের ও মুষলের ন্যায় আকারসম্পন্ন, কেহ করবাল মুখ, কেহ মুদ্গরানন, কেহ শুভ্রবর্ণ ও চক্রমুখ, কেহ পরশুর ও মহাচক্রের আকার, কেহ শক্তি-মুখ, কেহ স্থূল শিলীমুখ, কেহ ত্রিশূলবদন, কেহ বা মহাশিলার ন্যায় স্থূলদেহ। এই সকল বাণ আকাশমণ্ডলে এরূপ ভাবে উৎপতিত ও বিস্তৃত হইতে লাগিল যে, যেন সমরস্থলে প্রলয়বায়ুবেগে উৎপতিত প্রস্তর সকল উড্ডীন হইয়া দিগ্‌দিগন্ত আচ্ছন্ন করিতেছে[২৯।৩৫]।

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে কুলপাবন রাম! অনন্তর রাজা বিদূরথ দীপ্তবল সিন্ধুরাজকে সম্মুখে প্রাপ্ত হইয়া কোপে মধ্যাহ্নকালীন তপন সদৃশ প্রজ্জ্বলিত হইলেন। যেমন কল্পান্তপবন সুমেরু পর্ব্বতের প্রতি আস্ফালন করে, সেইরূপ, রাজা বিদূরথ ধনুরাস্ফালন ও তদ্দ্বারা চতুর্দ্দিক্ নিনাদিত করিতে লাগিলেন[১।২]। যেরূপ প্রলয়মার্ত্তণ্ড রশ্মিজাল বিস্তার করেন, তদ্রূপ, তিনি তূণীর হইতে শিলীমুখপরম্পরা বিস্তার করিতে লাগিলেন[৩]। তাঁহার নিক্ষিপ্ত এক এক শর নভোমণ্ডলে শতধা ও সহস্রধা হইতে লাগিল এবং পতন কালে সে সকল লক্ষাধিক হইতে দেখা গেল[৪]। সিন্ধুরাজেরও সেই প্রকার শক্তি, শিক্ষা ও ক্ষিপ্রহস্ততা ছিল। তাঁহারা উভয়েই বিষ্ণুর বরে সমান ধনুর্য্যুদ্ধকুশলতা লাভ করিয়াছিলেন[৫]। তাঁহাদের নিক্ষিপ্ত মুষলাকার বাণ সকল অশনির ন্যায় ভীষণ ধ্বনি করতঃ চতুর্দ্দিক্ সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিল[৬]। কল্পান্তকাল উপস্থিত হইলে তারকানিকর যেমন প্রচণ্ড মারুত দ্বারা আলোড়িত হইয়া গভীর নিনাদ সহকারে নিপতিত ও নিহত হয়, উক্ত রাজদ্বয়ের কনকনির্ম্মিত নারাচ সকল তদ্রূপ মহাশব্দ করতঃ নভোমার্গে বিচরণ করিতে লাগিল[৭]। বিদূরথ হইতে ভীষণ শর সমূহ অব্ধিস্রোতের ন্যায়, সূর্য্যকিরণের ন্যায়, প্রচণ্ডপবননির্দ্ধূত পুষ্পরাজির ন্যায়, সন্তাড়িত তপ্তলৌহপিণ্ড হইতে স্ফুলিঙ্গসমূহের ন্যায়, ধারাবর্ষী জলধর হইতে ধারাবর্ষণের ন্যায় ও নির্ঝর হইতে উৎপতিত শীকরনিকরের ন্যায় অনবরত নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল[৮।১০]। সেই ধনুর্য্যুদ্ধকুশল উক্ত রাজদ্বয়ের ধনুরাস্ফোটের চট চটা শব্দ শ্রবণ করিয়া উভয় দলস্থ সৈন্যগণ প্রশান্ত অর্ণবের ন্যায় স্থির ভাব অবলম্বন করিল[১১]। বিদূরথনির্ম্মুক্ত শরনিকর প্রলয়বায়ুর ন্যায় মহাশব্দে ও গঙ্গার স্রোতের ন্যায় অতিবেগে নভোমার্গে প্রধাবিত হইয়া পশ্চাৎ সিন্ধুরাজরূপ মহাসমুদ্রাভিমুখে নিপতিত হইতে লাগিল[১২]। তাঁহার কোদণ্ডরূপ মেঘ হইতে অবিশ্রান্ত কনকনির্ম্মিত বিচিত্রপ্রভ নারাচ ও শররূপ জল নির্গত হইতে দেখা গেল[১৩]।

এই সময়ে কমলবদনা রাজমহিষী লীলা বিদূরথের শরনিকর বর্ষণ অবলোকন করতঃ ভর্ত্তার জয়লাভ আশা করিয়া নিরতিশয় আনন্দিতা হইলেন এবং জ্ঞপ্তিদেবীকে বলিলেন। "দেবি! তোমার জয় হউক। মাতঃ! ঐ দেখুন, আমার ভর্ত্তা জয়ী হইতেছেন। সিন্ধুরাজ কি, ইহার শর সমূহে সুমেরু পর্য্যন্তও চূর্ণীকৃত হয়"[১৪।১৬]। মানুষহৃদয়া লীলা এইরূপ বলিতেছেন এবং তত্রস্থ দেবীদ্বয় (প্রবুদ্ধ লীলা ও সরস্বতী) তদবলোকনার্থ ব্যগ্র হইয়াছেন ও হাস্যবিস্তার করিতেছেন, এমন সময়ে সিন্ধুরাজরূপ বাড়বাগ্নি, অগস্ত্যের সমুদ্রপানের ন্যায় ও জহ্নুর মন্দাকিনী পানের ন্যায় বিদূরথনিক্ষিপ্ত সেই শরার্ণব সহসা পান করিল এবং অজস্র শরবারি বর্ষণ দ্বারা সেই সায়কজালরূপ বিস্তৃত মেঘ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করতঃ ধূলিকণার ন্যায় চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া আকাশার্ণবে নিক্ষিপ্ত করিল[১৭।১৯]। যদ্রূপ দীপ নির্ব্বাপিত হইলে তাহার গতি পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না, সেইরূপ, বিদূরথনিক্ষিপ্ত সায়ক সমূহের গতি আর দৃষ্টিগোচর হইল না[২০]। ইত্যবসরে সিন্ধুসেনাগণ বিদূরথের শরজাল ছেদন পূর্ব্বক গগনতলে শররাশি নিক্ষেপ করতঃ চতুর্দিক্ সমাচ্ছন্ন করিল। তদ্দর্শনে রাজা বিদূরথও কল্পান্তপবন যেমন সামান্য মেঘ ছিন্ন ভিন্ন করে, সেইরূপ, উৎকৃষ্ট শর সমূহ বর্ষণ করতঃ সেই শররাশিরূপ মেঘজাল ছিন্ন ভিন্ন করিলেন। মহীপতি বিদূরথ অনবরত বাণবর্ষণ দ্বারা সিন্ধুপক্ষীয় সমস্ত শর ব্যর্থ করিলেন[২১।২৩]।

অনন্তর সিন্ধুরাজ, বান্ধবতাবশতঃ গন্ধর্ব্ব হইতে যে মোহনাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই অস্ত্র পরিত্যাগ করিলে তদ্দ্বারা বিদূরথ ব্যতীত তৎপক্ষীয় আর আর সমুদায় যোদ্ধৃবর্গ মোহপ্রাপ্ত হইল[২৪]। মোহপ্রাপ্ত যোধগণ ব্যস্তশস্ত্রাস্ত্র ও বিষণ্ণবদনেক্ষণ হইয়া মৃতের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইলে, মহারাজ বিদূরথ তৎক্ষণাৎ তাহাদিগের সেই মোহ অপনীত করিলেন[২৫]। যন্মুহূর্ত্তে বিদূরথ ব্যতীত আর আর সৈন্য মোহপ্রাপ্ত হইয়াছিল, তন্মুহূর্ত্তেই রাজা বিদূরথ প্রবোধাস্ত্র বিস্তার করিয়াছিলেন এবং প্রবোধাস্ত্রের প্রভাবে সূর্য্যোদয়ে পদ্মপ্রবোধের ন্যায় প্রবুদ্ধ করিয়াছিলেন। শত্রুসেনাগণ গতমোহ হইল, দেখিয়া, দিবাকর যেমন পূর্ব্বকালে রাক্ষসের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া লোহিত বর্ণ ধারণ করিয়াছিলেন, আজ্ সিন্ধুরাজ বিদূরথের প্রতি সেইরূপ ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ক্রোধে উষাসমুদিত

অরুণদেবের ন্যায় রক্তবর্ণ হইলেন২৬।২৭। অনন্তর, ক্রোধে লোহিতাক্ষ হইয়া সমুদায় সৈন্য লক্ষ্য করিয়া নাগাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। যদ্রূপ পর্ব্বত সর্পপরিব্যাপ্ত ও সরোবর মৃণালে প্রপূরিত হয়, সিন্ধুরাজের নাগাস্ত্র সমুদ্ভূত নাগসকল তদনুরূপে ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইল। এই সকল নাগ পর্ব্বতাকার ও বন্ধনদুঃখপ্রদ২৮।২৯। এই সময়ে সমুদায় পদার্থ সেই সর্পগণের উগ্রবিষ প্রভাবে ম্লান ও সপর্ব্বতবনা (পর্ব্বতের ও বনের সহিত) মেদিনী কম্পিতা হইতে লাগিল৩০।

অনন্তর মহাস্ত্রবিৎ রাজা বিদূরথ গারুড়াস্ত্র পরিত্যাগ করিলে, পর্ব্বত প্রমাণ লক্ষ লক্ষ মহাগরুড় উৎপতিত ও সমুড্ডীন হইল। তাহাদিগের সুরঞ্জিত পক্ষপ্রভায় দিক্ সকল কাঞ্চনীকৃত হইল। তাহাদিগের পক্ষ সঞ্চালনের বায়ু প্রলয়মারুতের ন্যায় বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল৩১।৩২। গারুড়াস্ত্রসম্ভূত সেই সমস্ত গরুড়ের নিশ্বাস-বায়ুর দ্বারা নাগাস্ত্রসম্ভুত ভুজগ-গণ সমাকৃষ্ট হইয়া ভয়ে ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল৩৩। বলিতে কি, দেখিতে দেখিতে, মহর্ষি অগস্ত্য যেমন সমুদ্র পান করিয়া-ছিলেন, তেমনি, এই সকল গরুড় পৃথিবীব্যাপ্ত সর্পপ্রবাহ পান করিয়া ফেলিল৩৩।৩৫। মেদিনী এখন সর্পাবরণ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। দীপ যেমন বায়ুসংযোগে অদৃশ্য হয়, মেঘ যেমন শরৎকালে পলায়ন করে, বজ্রভয়ে যেমন মৈনাক প্রভৃতি ভূধরের পক্ষ লুকায়িত হইয়াছিল, এবং স্বপ্নদৃষ্ট জগৎ ও পুরপত্তনাদি যেমন জাগ্রতে অদৃশ্য হয়, সেইরূপ, সেই সকল গরুড়, সর্প ভক্ষণ করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল৩৬।৩৮। অতঃপর সিন্ধুরাজ বিদূরথ সৈন্যের প্রতি গাঢ় অন্ধকারপ্রদ তমঃ অস্ত্র প্রয়োগ করিলে তাহা স্বর্গের ও মর্ত্ত্যের অন্তরালে মহাসমুদ্রের ন্যায় বিস্তৃত হইল। ভূমিস্থিত সৈন্যগণ এই তমঃসমুদ্রের মৎস্য ও নভঃস্থিত তারকাগণ তাহার রত্নস্থানীয় হইল। তাদৃশ গাঢ় অন্ধকার প্রবৃত্ত হইলে, জনগণের বোধ হইল, দিক্ সকল যেন কৃষ্ণবর্ণ পঙ্কে প্রলিপ্ত হইয়াছে অথবা প্রলয় সমীরণ যেন অঞ্জনগিরির উপাদান রেণু চতুর্দ্দিকে পরি-ব্যাপ্ত করিয়াছে৩৯।৪১। প্রজাগণ যেন অন্ধকূপে নিপতিত হইয়াছে এবং ব্যবহারপরম্পরা যেন কল্পান্ত কালে প্রলীন হইয়া গিয়াছে৪২।

অনন্তর মন্ত্রবিদ্‌শ্রেষ্ঠ বিদূরথ মার্ত্তণ্ডাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। মন্ত্রপূত মার্ত্তণ্ডাস্ত্র প্রযোজিত হইলে তদ্বিনিঃসৃত কিরণজাল অগস্ত্যের ন্যায় সেই

তমোরূপ মহাসাগর পান করিয়া ফেলিল। যেমন শরদাগমনে কৃষ্ণমেঘ সকল আকাশোদরে লুক্কায়িত হয়, অন্ধকার সকল সেইরূপ অবস্থাম্বিত হইল। পয়োধর-যুগল-শালিনী কান্তা যেমন ভূপতির পুরোভাগে শোভা প্রাপ্তা হয়, এই সময়ে দিক্ সকল অন্ধকারমুক্ত হইয়া সেইরূপ শোভা ধারণ করিল। লোভরূপ কল্মল হইতে মুক্তি লাভ করিলে সাধুগণের বুদ্ধি যেরূপ সুপ্রকাশিত হয়, নিখিল বনরাজি এখন সেইরূপ প্রকাশিত হইল[৩।৪৬]। এতদ্দর্শনে সিন্ধুরাজ অধিক কুপিত হইলেন। কোপাকুলিত হইয়া ভীষণ রাক্ষসাস্ত্র মন্ত্রপূত করতঃ বিকীর্ণ করিলেন[৪৭]। দেখিতে দেখিতে রণস্থল বৃহৎকায় রাক্ষসগণে পরিপূরিত হইল। এই সকল রাক্ষস কর্কশ ও ক্রোধন স্বভাব। পাতালস্থ দিগ্গজ ক্রুদ্ধ হইলে তাহার ফুৎকারে মহাসমুদ্র যেমন ঘোর গর্জ্জন করিতে থাকে, এই সকল রাক্ষস তদ্রূপ গর্জ্জন করিতে লাগিল। তাহাদের কেহ কপিল বর্ণ, কেহ ধূম্রবর্ণ, কেহ অগ্নিবর্ণ, কেহ বা ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। কেহ কপিলবর্ণজটাধারী, কাহার বা বিদ্যুৎবর্ণ জটা উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত, কেহ গর্জ্জন করিতেছে, কেহ তর্জ্জন করিতেছে, কাহার জিহ্বা বাড়বাগ্নির ন্যায় লক্ লক্ করিতেছে, কেহ আকাশে পরিভ্রমণ করিতেছে, কেহ ঘোর চিৎকার, করিতেছে ও উজ্জ্বল উল্মুকের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কেহ স্তব্ধ, কেহ কর্দ্দমাক্ত, কাহার গাত্রলোম শৈবালের অনুরূপ। এই সকল ঘোর দর্শন রাক্ষস তর্জ্জন ও গর্জ্জন সহকারে জনগণকে বিত্রাসিত ও বিতাড়িত করিতে লাগিল এবং কোন কোন রাক্ষস যোধগণকে অস্ত্রসহ গ্রাস করিতে প্রবৃত্ত হইল[৪৮।৫২]।

অনন্তর লীলানাথ বিদূরথ দুষ্টভূত নিবারক নারায়ণাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। যেমন দিবাকর উদিত হইলে অন্ধকার বিনষ্ট হয়, তেমনি, সেই অস্ত্ররাজ উদীর্য্যমাণ হইয়া সেই সমস্ত রাক্ষস বিনাশ করিয়া ফেলিল[৫৩।৫৪]। অস্ত্রপ্রভাবে রাক্ষসগণ প্রমর্দ্দিত হইলে, যেমন চন্দ্রোদয়ে অন্ধকার বিনাশে দিক্ সকল নির্ম্মলাকার ধারণ করে, সেইরূপ, ত্রিভুবন ও ব্যোম (আকাশ) এখন নির্ম্মলাকার ধারণ করিল[৫৫]। অনন্তর মহারাজ সিন্ধু আগ্নেয়াস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। এই অস্ত্রের প্রভাবে আকাশ ও দিক্ সমস্তই যেন জ্বলিয়া উঠিল। যেমন কল্পকাল উপস্থিত হইলে তন্নিবন্ধন প্রলয়মহাগ্নি প্রজ্বলিত হয়, মন্ত্রপূত আগ্নেয়াস্ত্র সেইরূপ প্রজ্বলনে

অতিভীষণাকার হইয়া উঠিল। এই অস্ত্রের অগ্নি হইতে যে সকল মহাধূম জন্মিল ও নির্গত হইল, তদ্দ্বারা দিক্ সকল মেঘায়মান হইল। বোধ হইতে লাগিল, রণস্থল যেন পাতালতিমিরে সমাকুলিত হইয়াছে৫৬।৫৭। পর্ব্বত সকল জ্বলিতে লাগিল। প্রজ্বলিত পর্ব্বত সকল কাঞ্চনের ন্যায় ও প্রফুল্লচম্পকারণ্যের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। উৎসব সময়ে কুম্ কুম্ পরিষিক্ত কুসুমমালা যেরূপ শোভা বিস্তার করে; তৎকালে ব্যোম, অদ্রি ও দিক্ সমুদায় সেইরূপ শোভা প্রকাশ করিয়াছিল৫৮।৫৯। তদ্দর্শনে জনগণ মনে করিয়াছিল, সমুদ্রস্থ বাড়বানল বুঝি সহস্র সহস্র জলযানের বেগে সমুদ্ধৃত ও এক হইয়া ভুবন গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। এই ব্যাপার দর্শনে রাজা বিদূরথ উক্ত আগ্নেয়াস্ত্রের নিরাকরণ ও সিন্ধুরাজের পরাজয় এই দুই অভিলাষে বারুণাস্ত্রের অর্চ্চনা করিলেন এবং তাহা পরিত্যাগ করিলেন। অমনি সেই মুহূর্ত্তে অধঃ ঊর্দ্ধ দিক্ বিদিক্ হইতে কৃষ্ণবর্ণ জলপ্রবাহ আসিয়া রণস্থল পরিপূর্ণ করিল। বোধ হইল, যেন কজ্জলপর্ব্বত গলিয়া আসিতেছে। লক্ষ লক্ষ মেঘ যেন দৌড়িয়া আসিতেছে। মহাসমুদ্র যেন ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে। কুলপর্ব্বত যেন উচ্চ হইয়াছে। তমালবন যেন উড়িয়া বেড়াইতেছে। রাত্রি যেন দিবস হীন হইয়াছে৬০।৬৪। পাতালের গুহা যেন ব্যোম দর্শনে আসিতেছে। ইহার শব্দও ইহার আকৃতির অনুরূপ ভীষণ৬৫। কৃষ্ণপক্ষীয় যামিনী যেমন শীঘ্র শীঘ্র সন্ধ্যা আক্রমণ করে, তদ্রূপ, এই সলিলরাশি সিন্ধুরাজ নিক্ষিপ্ত হুতাশনকে অতিশীঘ্র গ্রাস করিল৬৬। নিদ্রা যেমন জীব দেহ আক্রমণ ও অভিভূত করে, তদ্রূপ, সেই সলিলরাশি আগ্নেয়াস্ত্র গ্রাস করিয়া ভূতল কবলিত করিল৬৭। তখন মহারাজ সিন্ধুর সৈন্য ও সৈন্যরক্ষক সেই সলিলে তৃণের ন্যায় উহ্যমান ও তাঁহার রথ বিপর্য্যস্ত হইতে লাগিল। সিন্ধুরাজ এই সলিলাক্রম হইতে পরিত্রাণ পাইবার মানসে শোষণাস্ত্র যোজনা করতঃ পরিত্যাগ করিলেন। যেরূপ দিবাকর কর্তৃক ত্রিযামা অপসারিত হয়, সেইরূপ, সেই শোষণাস্ত্রকর্ত্তৃক পৃথিবী পরিশোষিত হইলে অম্বুময়ী মায়ার শান্তি হইল। পরে মূর্খদিগের ক্রোধের ন্যায় সেই অস্ত্রতাপ প্রজাগণকে সন্তাপিত করিয়া রণস্থলীতে শুষ্কপত্রসমাকীর্ণ করতঃ বিরাজ করিতে লাগিল। তখন সেই কনকদ্রবপ্রভ অস্ত্রতাপ রাজভার্য্যার অঙ্গরাগের ন্যায় দিক্ সমুদায়কে রঞ্জিত করিয়া তৎসদৃশ

আকারে বিরাজ করিতে লাগিল। সিন্ধুরাজের বিপক্ষগণ গ্রীষ্মকালীন দাবানলোত্তপ্ত কোমল পল্লবের ন্যায় সেই ঘর্ম্মময়ী মায়ার দ্বারা সমাক্রান্ত হইয়া সাতিশয় সন্তপ্ত হইতে লাগিল[৬৮।৭৪]। অনন্তর বিদূরথ স্বপক্ষীয় দিগের তৎক্লেশ নিবারণার্থ কোদণ্ড কুণ্ডলীকৃত করিয়া পর্জ্জন্যাস্ত্র সন্ধান করতঃ পরিত্যাগ করিলেন[৭৫]। পর্জ্জন্যাস্ত্রের সামর্থ্যে তমাল বনের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ মেঘপংক্তি উদিত হইতে লাগিল। সেই সকল মেঘ হইতে নিরন্তর বৃষ্টিধারা নিপতিত ও শীকর সম্পৃক্ত সমীরণ প্রবাহিত হইতে লাগিল। তদ্‌গাত্রে বিদ্যুৎপুঞ্জ, সুবর্ণবর্ণ সর্পের ন্যায় ও সুন্দরী যুবতীর কটাক্ষের ন্যায় ক্রীড়া করিতে দেখা গেল। দেখিতে দেখিতে তাদৃশ মেঘমণ্ডলের সঞ্চরণে দিক্ বিদিক্ প্রপূরিত হইল[৭৬।৮০]। অনন্তর মুষলধারে ও মহাশব্দে কৃতান্তদৃষ্টিসদৃশ বারিধারা নিপতিত হইতে লাগিল[৮১]। এই মেঘাস্ত্রের যুদ্ধে পাতাল তল হইতে অনলের ন্যায় উষ্ণ বাষ্প সমুত্থিত হইয়াছিল। আত্মবোধ সমুপস্থিত হইলে যেমন নিরতিশয় আনন্দরসের আবির্ভাব হয়, সংসার বাসনা তিরোহিত হয়, সেইরূপ, সে বাষ্প, ক্ষণকাল মধ্যে মৃগতৃষ্ণিকার ন্যায় প্রশমিত হইয়া গেল[৮২।৮৩]। তৎকালে পৃথিবী পঙ্কপরিপূর্ণ হওয়াতে লোক সকলের চলাচল রহিত হইয়াছিল। এবং মহারাজ সিন্ধু যেন সিন্ধুসলিলে নিমগ্ন হইয়াছিলেন[৮৪]। অনন্তর সিন্ধুরাজ বায়ু অস্ত্র পরিত্যাগ করিলে তদ্দ্বারা আকাশকোটর পরিপূর্ণ হইল ও সেই বায়ুব্যূহ যেন প্রমত্ত হইয়া কল্পান্তকালীন বায়ুর ন্যায় ভীষণ নিনাদে নৃত্য করিতে লাগিল[৮৫]। জনগণ সেই প্রবল মারুতে আহত হইয়া যেন অশনিনিপাতে নিপীড়িতাঙ্গ হইতে লাগিল ও যোধগণ প্রতিযোধগণের প্রতি শিলাখণ্ড নিক্ষেপ করিলে তাহা হইতে যেরূপ শব্দ সমুত্থিত হয়, সেই প্রলয়সমীরণসদৃশ মহাসমীরণ সেই প্রকার শব্দ করতঃ রণস্থলে প্রবাহিত হইতে লাগিল[৮৬]।

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

একোনপঞ্চাশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, তখন নীহার ও ধূলি পরিপূর্ণ বায়ু প্রবাহিত হইলে বনস্থলী কম্পিত, বৃক্ষশাখা ছিন্ন ভিন্ন, ক্ষুদ্র বৃক্ষ উদ্ধৃত ও আকাশে পক্ষিবৎ ভ্রমণ করিতে লাগিল। ভটগণ উৎপতিত ও নিপতিত, সৌধ সকল চূর্ণ বিচূর্ণ ও অভ্র সকল ছিন্ন ভিন্ন হইতে লাগিল১।২। নদী যেমন সবেগে জীর্ণ পল্লব বহন করে, তাহার ন্যায় বিদূরথের রথ সেই ভীম-বায়ুবেগে বাহিত হইতে (উড়িতে) লাগিল৩। মহাস্ত্রবিদ্ বিদূরথ তন্মুহূর্ত্তে পর্ব্বতাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। তখন বোধ হইল, তাঁহার এই মহাস্ত্র যেন বিদূরথের প্রেরিত জলধরের বারিবর্ষণের সহিত নভোমণ্ডল গ্রাস করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে৪। ক্ষণমধ্যে সেই অতি বিস্তৃত প্রচণ্ড বায়ু শৈলাস্ত্র দ্বারা সমাহত হইয়া শমতা প্রাপ্ত হইল৫। তখন বায়ুসমুড্ডীন অন্তরীক্ষগত বৃক্ষ সমূহ কাকসমূহের ন্যায় ভূতলস্থ শবব্যূহোপরি নিপতিত হইতে দেখা গেল, এবং চতুর্দ্দিক্‌স্থ পুর, গ্রাম, বন, লতা মনুষ্য প্রভৃতির শূৎকার (নিশ্বাস শব্দ) ডাৎকার (লুণ্ঠন রব) ভাঙ্কার (অন্যান্য ভীষণ শব্দ) ও চিৎকার (উদ্ভট সামরিক গণের শব্দ) শব্দ সকল শমতা প্রাপ্ত হইল৬।৭।

অনন্তর সিন্ধুরূপ সিন্ধুরাজ স্বসৃষ্ট পর্ব্বতাস্ত্রপ্রভব মৈনাকাদি পর্ব্বত সকল পর্ববৎ নভোমণ্ডলে উৎপতিত হইতেছে (উড়িতেছে) দেখিয়া সুদীপ্ত বজ্রাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। সেই বজ্রাস্ত্র হইতে বজ্র সমূহ বিনির্গত হইয়া অনলের ইন্ধন ভক্ষণের ন্যায় সেই সকল গিরীন্দ্রতিমির পান করিয়া ফেলিল৮।৯। এই অস্ত্রের চঞ্চুসদৃশ অগ্রভাগ দ্বারা সেই সমস্ত গিরিশিখর সমূহ খণ্ডিত হইয়া বাতছিন্ন ফল সমূহের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল১০।

অনন্তর বিদূরথ বজ্রাস্ত্র শান্তির নিমিত্ত ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। ব্রহ্মাস্ত্রের তেজে তাহা তৎক্ষণাৎ প্রশান্ত হইল১১। সিন্ধুরাজ বজ্রাস্ত্র প্রশমিত দেখিয়া শ্যামবর্ণ পিশাচাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। তখন দিগ্‌-দিগন্ত হইতে অতি ভয়প্রদ পিশাচপংক্তি রণস্থলে আগমন করিতে

লাগিল। দিবাকর তদ্দ্বারা যেন নিতান্ত ভীত হইয়া সন্ধ্যাকালের ন্যায় শ্যামতা প্রাপ্ত হইলেন। অন্ধকার সদৃশ ভীষণ পিশাচগণ যেন মূর্ত্তিমান্ ভয়ের ন্যায় ভূতলে আগমন করিল[১২।১৩]। সেই সমস্ত পিশাচগণ দগ্ধস্তম্ভাকার, তালসহকারে নর্ত্তনশীল ও ভীষণাকার সম্পন্ন। ইহারা কাহারও মুষ্টিগ্রাহ্য নহে (কেহ ইহাদিগকে ধরিতে পারে না)। ইহারা দীর্ঘকেশসম্পন্ন ও কৃশাঙ্গ। এই নভশ্চর পিশাচগণের মধ্যে কেহ কেহ গ্রাম্যগণের ন্যায় শ্মশ্রুধারী, কৃষ্ণবর্ণ ও মলিনাঙ্গ। মূঢ়ব্যক্তিরা সভয় অন্তঃকরণে সেই সমস্ত অস্থি, কপাল, বজ্র ও অসিধারী সচঞ্চল পিশাচ দিগকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। এই সমস্ত পিশাচ গ্রাম্যজনগণের ন্যায় ক্রূর ও দীন স্বভাব। ইহারা তরু, কর্দ্দম, রথ্যা, শূন্য পুরি ও শূন্য গৃহাভ্যন্তরে গমনানুরক্ত, সৃক্কণীলেহনশীল, প্রেতরূপী ও বিদ্যুতের ন্যায় দৃশ্য ও অদৃশ্য স্বভাব[১৪।১৭]। এই সমস্ত পিশাচ উন্মত্ত হইয়া হতাবশিষ্ট শত্রু বল গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলে, বিদূরথসৈন্যগণ হতচেতন, ভিন্নাস্ত্র, আয়ুধহীন, বর্ম্মবিহীন ভীতচিত্ত ও নিশ্চেষ্ট হইয়া ভূতাবিষ্টচেতার ন্যায় কখন হস্ত, পদ, অঙ্গ ও মুখাদি কর্ষণ, কখন কৌপীন ও উত্তরীয় বসন পরিত্যাগ, কখন বিষ্ঠা মূত্রাদি বর্জ্জন, কখন উন্মত্তের ন্যায় নর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইল[১৮।২০]। অতঃপর যখন এই সকল পিশাচেরা বিদূরথকে আক্রমণ করিল, তখন বিদূরথ পরপ্রযুক্ত পিশাচসংগ্রামকারিণী মায়া অবগত হইয়া ক্রোধভরে রূপিকাস্ত্র সন্ধান করতঃ পরিত্যাগ করিলেন[২১।২২]। তখন ভূতল হইতে বিবিধাকারের রূপিকা সমুত্থিত হইয়া ব্যোমমণ্ডল আক্রম করিল। তাহারা ঊর্দ্ধমূর্দ্ধজ, ভীমলোচন, কোঠরলোচন ও চঞ্চলশ্রোণিপয়োধর[২৩।২৪]। তাহাদের মধ্যে কতক উদ্ভিন্ন যৌবনা, কতক বৃদ্ধা, কতক পীবরাঙ্গী, কতক জরাজীর্ণদেহা, কতক সুন্দরজঘনা, কতক বিরূপজঘনা, কতক বিবৃত্ত ও বিকৃতনাভি, কতক বিস্তৃত ও কূপসদৃশ জননেন্দ্রিয় যুক্ত[২৫]। কাহার কাহার হস্তে শোণিতপূর্ণ নরকপাল ও নরশির। তাহাদের গাত্র সায়ংকালীন অভ্রমণ্ডলের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন। তাহারা অস্থি ও মাংস চর্ব্বণ করিতেছে। তাহাদিগের স্কন্ধদ্বয় হইতে নিরন্তর রুধিরধারা ক্ষরিত হইতেছে[২৬]। তাহারা নানাপ্রকারে শরীর সঞ্চালন করিতেছে। তাহাদের ঊরুদেশ শিলার ন্যায় কঠিন ও ভুজগের ন্যায় বক্র, তাহাদের পার্শ্ব ও কর অত্যন্ত দৃঢ়[২৭]। তাহারা মৃত বালকগণকে মালা স্বরূপে ধারণ ও

অন্ত্ররজ্জু হস্তে করিয়া আকর্ষণ করিতেছে। সেই সকল রূপিকাগণের মধ্যে কেহ কেহ কুক্কুরবদনা, কেহ কেহ কাকাস্যা, কেহ কেহ উলূকমুখী, কেহ কেহ নিম্নবক্ত্রা এবং কেহ কেহ নিম্নহনু ও নিম্নোদরী[২৮]। এই সকল রূপিকা দুষ্কৃতকারী দুর্ব্বল বালকের ন্যায় সেই সকল পিশাচগণকে পতিত্বে গ্রহণ করিল। তখন পিশাচ ও রূপিকা এই উভয় সৈন্য একতা প্রাপ্ত হইল এবং ক্রীড়ারসে নিমগ্ন হইয়া শবাহরণ পূর্ব্বক নর্ত্তন করিতে করিতে পরস্পর হস্ত ধারণ করতঃ দিক্‌দিগন্তে প্রধাবিত হইতে লাগিল। অপিচ, পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল[২৯।৩০]। তাহারা মহাজিহ্বা নিষ্কাশিত করিয়া নানা প্রকার মুখবিকার দেখাইতে আরম্ভ করিল। এই সকল লম্বোদর, লম্বভুজ, লম্বকর্ণ, লম্বোষ্ঠ ও লম্বনাসিকা রূপিকা ও পিশাচ গণ কখন রুধিরসলিলে নিমগ্ন ও তাহা হইতে পুনঃ উন্মজ্জিত হইতে লাগিল এবং রক্ত মাংসরূপ মহাপঙ্কে নিপতিত হইয়া পরস্পর স্বানন্দে আলিঙ্গন অভ্যাস করিতে লাগিল; বোধ হইতে লাগিল, যেন মন্দর ভূধর দ্বারা ক্ষীরসমুদ্র সমালোড়িত হইতেছে ও তন্মুখনির্গত কল কল ধ্বনি চতুর্দ্দিক্ সমাকুল করিতেছে[৩১।৩৩]। বিদূরথ সিন্ধুরাজের সম্বন্ধে এইরূপ মায়া বিস্তার করিলে সিন্ধুরাজ তাহা বুঝিতে পারিলেন। পারিয়া তদ্বিনাশার্থ বেতালাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। তাহা হইতে তখন সমস্তক অমস্তক নানা প্রকার বেতাল অর্থাৎ শব আবির্ভূত হইয়া পরবলমর্দ্দন বেশে সঞ্চরণ করিতে লাগিল[৩৪।৩৫]। সেইরূপে পিশাচ, বেতাল ও রূপিকাগণ সমবেত হইলে বোধ হইল, যেন এই সকল উগ্রবল সৈন্য উর্ব্বীভক্ষণে সমর্থ ও উদ্যত হইয়াছে[৩৬]। অনন্তর বিদূরথ সিন্ধুরাজের সে মায়া সংহার পূর্ব্বক সিন্ধুরাজসৈন্যের প্রতি পর্ব্বতপ্রমাণ ত্রৈলোক্য প্রহননক্ষম রাক্ষসাস্ত্র সৃজন করিলেন। তখন বৃহৎকায় রাক্ষসগণ সর্ব্বদিক্ হইতে বিনিক্রান্ত ও আগত হইতে লাগিল। তখন বোধ হইল, যেন পাতাল হইতে মূর্ত্তিমান্ নরক সমূহ আগমন করিতেছে। সুরাসুরভীতিপ্রদ, গভীরগর্জ্জন ও ভীষণ নিনাদ সম্পন্ন, কবন্ধনৃত্যসঙ্কুল, মেদমাংসোপদংশাঢ্য, (মাংসচর্ব্বণকারী) রুধিরাসবদুন্দর ও নর্ত্তনশীল কুষ্মাণ্ড, বেতাল ও যক্ষ সঙ্কুল এই রাক্ষসবল অতি ভয়াবহ হইয়া উঠিল[৩৭।৪২]।

একোনপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চাশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, তখন ধৈর্য্যশালী সিন্ধুরাজ ঘোর সংগ্রামবিভ্রাট উপস্থিত দেখিয়া স্বসৈন্য রক্ষা ও পরসৈন্য বিনাশ উদ্দেশে বৈষ্ণবাস্ত্র স্মরণ করিলেন[১]। সেই অস্ত্র অভিমন্ত্রিত করিয়া পরিত্যাগ করিলে তাহা হইতে রাশি রাশি চক্রাস্ত্র ও অন্যান্য অসখ্য অস্ত্র নির্গত হইতে লাগিল[২।৩]। সেই সকল অস্ত্রপঙ্‌ক্তি শত সূর্য্য সমুদ্ভাষিত দিক্‌তটের ন্যায় সমুজ্জ্বলিত হইল। তাহা হইতে গদা, শিতধার বজ্র, পট্টিশ, শিতধার শরনিকর ও শ্যামবর্ণ খড়্গ সমূহ আবির্ভূত হইয়া রণাকাশ আচ্ছাদিত করিল[৪।৬]।

অনন্তর বিদূরথ সেই বৈষ্ণবাস্ত্র শান্তির নিমিত্ত তদনুরূপ বৈষ্ণবাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর তাহা হইতেও শক্তি, গদা, প্রাস ও পট্টিশ প্রভৃতি নানাপ্রকার অস্ত্র শস্ত্র মেঘ হইতে নির্গমের ন্যায় নির্গত হইতে লাগিল। আকাশ মণ্ডলে সেই সকল অস্ত্রের শৈলবিদ্রাবণকারী তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল[৭।৯]। সেই যুদ্ধে আপতিত শরনিকর দ্বারা শূল, অসি, খড়্গ ও পট্টিশ প্রভৃতি অস্ত্র চূর্ণ, মুষল নিপাতনে প্রাস ও শক্তি সমুদয় খণ্ডিত হইতে লাগিল[১০]। মুদ্গররূপ মন্দরভূধর দ্বারা শররূপ অম্বুনিধি মথিত ও গদাবদন হইতে দুর্ব্বার প্রতিযোদ্ধার ন্যায় অসি সকল বিনির্গত হওয়ায় তদ্দ্বারা বিপক্ষ দল আলোড়িত হইতে লাগিল[১১]। তৎপ্রসূত প্রাসাস্ত্র সকল জনবিনাশোদ্যত কৃতান্তের ন্যায় সেই যুদ্ধে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। যাহার শব্দে ব্রহ্মাণ্ড ফাটিয়া যায়, যাহার আঘাতে কুলাচলও ভগ্ন হয়, সেই সর্ব্বায়ুধক্ষয়কর চক্রাস্ত্র অকুণ্ঠিত আকারে ঊর্দ্ধে ভ্রমণ করিতে লাগিল। অতঃপর শঙ্কু অস্ত্রের দ্বারা শূল ও শিলাশাণিত অসি তিরোহিত এবং ভুষণ্ডীর দ্বারা দণ্ড ও ভীষণ ভিন্দিপাল নির্জ্জিত হইতে দেখা গেল[১২।১৩]। সর্ব্বসংহারসমর্থ উৎকৃষ্ট শূলধারী রুদ্রের ন্যায় এক একটি আয়ুধশ্রেষ্ঠ শূল সমুদায়কে কুণ্ঠিত ও সমুৎসাদিত করিল এবং শত্রুবিদ্রাবণকারী কুটিল গমনে সংছিন্ন আয়ুধ সকল কুটিলগতি অবলম্বনে আকাশে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। হেতি ও অস্ত্র

সকল চূর্ণ হওয়াতে তাহার চট চটা শব্দে ও তাহা হইতে সমুত্থিত ধূমরাশির দ্বারা গগন মণ্ডল ধ্বনিত ও পরিপূরিত হইল[১৬।১৭]। এই রূপে উভয়পক্ষীয় অস্ত্র আকাশ পথে যুদ্ধ করতঃ পরস্পর দ্বারা পরস্পর সজ্ঘটিত হওয়াতে মেঘ হইতে বিদ্যুতের ন্যায় অগ্নি জ্বালা নির্গত হইতে লাগিল। তদুত্থ ভয়ঙ্কর শব্দে ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল কম্পিত হইতে লাগিল। এতদ্দর্শনে সিন্ধুরাজ মনে করিতে লাগিলেন, বিদূরথ কেবল আমার অস্ত্র নিবারণ মাত্র করিয়া কালক্ষেপ করিতেছেন। ইহার পরাক্রম ফুরাইয়া গিয়াছে। যে যৎকিঞ্চিৎ আছে তাহা আমার নিকট তুচ্ছ। সিন্ধুরাজ এইরূপ মনে করিয়া যুদ্ধে অবহেলা করতঃ অবস্থান করিতেছেন, এমন সময়ে বিদূরথ অশনি শব্দের ন্যায় মহাশব্দ উত্থাপন করতঃ আগ্নেয়াস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন[১৮।২০]। তখন সেই অস্ত্রের প্রভাবে সিন্ধুরাজের রথ শুষ্ক তৃণের ন্যায় প্রজ্বলিত হইল। অনন্তর হেতিপরিপূর্ণ নভোমণ্ডলে সেই রাজদ্বয়ের একতর সন্নদ্ধকলেবর ও প্রাবৃট্পয়োধরের ন্যায় বর্দ্ধিত হইয়া শরবর্ষণ আরম্ভ করিলেন। নারায়ণাস্ত্র দ্বারা তাঁহাদিগের ক্ষণকাল এইরূপ ঘোর সংগ্রাম হইল[২১।২২]। উভয়েই তুল্যবলশালী, সুতরাং কাহার ন্যূনাধিক্য দেখা গেল না। এই অবসরে সিংহ যেমন বন দগ্ধ হইলে বনকন্দর হইতে নির্গত হয়, তেমনি, সেই হুতাশন সিন্ধুরাজের রথ ভস্মসাৎ করিয়া সিন্ধুরাজকেও আক্রমণ করিল। তখন সিন্ধুরাজ বারুণাস্ত্র দ্বারা সেই প্রবল আগ্নেয়াস্ত্রের শমতা করতঃ রথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন এবং খড়্গ পরিচালন আরম্ভ করিলেন। অনন্তর নিমেষ মাত্রে করবাল দ্বারা মৃণালের ন্যায় বিপক্ষ রাজার রথ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন বিদূরথও বিরথ ও অসিধারী হইলেন[২৩।২৬]। এখন উভয়েই সমায়ুধ। এই সমায়ুধ, সমোৎসাহ ও সমযোদ্ধা বীরদ্বয় মণ্ডলাকারে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ইহাদের খড়্গ, ক্রকচের ন্যায় কঠিন বর্ম্ম বিদারণে সমর্থ[২৭]। ইত্যবসরে বিদূরথ খড়্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শক্তি গ্রহণ করতঃ তাহা সিন্ধুরাজের উচ্ছেদার্থে পরিত্যাগ করিলেন[২৮]। অশনিপাতের ন্যায় ও সিন্ধুসলিলের উচ্ছ্বাসের ন্যায় মহোৎপাত সূচক সেই শক্তি অবিচ্ছিন্ন বেগে ভীষণরবে সমাগত হইয়া সিন্ধুরাজের বক্ষঃস্থলে নিপতিত হইল[২৯]। যেমন স্বীয় কামিনী ভর্ত্তার অপ্রিয়ানুষ্ঠান করে না, সেইরূপ, সেই শক্তি

সমাগতা হইয়াও সিন্ধুরাজের মৃত্যুসাধন করিল না। কিন্তু তদ্দ্বারা তিনি সমাহত হওয়ায়, হস্তিগণ্ড হইতে যেরূপ মদক্ষরণ হয়, তাঁহার দেহ হইতে সেইরূপ শোণিত ক্ষরণ হইতে লাগিল। এই ব্যাপার দেখিয়া তদ্দেশবাসিনী লীলা সাতিশয় আহ্লাদিতা হইয়া পূর্ব্বলীলাকে বলিতে লাগিলেন, দেবি! দেখুন, নরসিংহসদৃশ আমাদের ভর্ত্তা সিন্ধুরাজকে নিহত করিলেন৩০।৩২। ঐ দেখুন, উন্নতস্কন্ধ সিন্ধুরাজ শক্তির দ্বারা নিপীড়িত হওয়াতে, সরোবরমধ্যস্থিত গজেন্দ্রের কর হইতে যেরূপ ফুৎকার শব্দে সলিল নির্গত হয়, সেইরূপ, উহাঁর বক্ষঃ হইতে চুলু চুলু শব্দে শোণিত নির্গত হইতেছে৩৩।

হায় হায়! পুনর্ব্বার সিন্ধুর আরোহণার্থ সুবর্ণময় রথ সমানীত হইয়াছে। এই রথ সুমেরু শৃঙ্গের ন্যায় ও ইহার অশ্ব পুষ্করাবর্ত্ত মেঘের ন্যায়। হে দেবি! ঐ দেখুন, ঐ রথও মুদ্গরাঘাতে চূর্ণিত হইল৩৪।৩৫। যেমন পার্থশরনিপাতে নিবাতকবচগণের সুবর্ণ নগর বিঘূর্ণিত হইয়াছিল, * আমার পতি সেইরূপ বিঘূর্ণিত ও হরিদ্বর্ণ ক্রমের ন্যায় সমুচ্ছ্রিত সমানীত রথে সিন্ধুরাজকে বঞ্চনা করিয়া আরোহণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন৩৬।

কি কষ্ট! সিন্ধুরাজ আবার শরবর্ষণ দ্বারা তাঁহাকে নিপীড়িত করিল। আর্য্যপুত্র বিদূরথ এবার ছিন্নধ্বজ, ছিন্নরথ, ছিন্নাশ্ব, ছিন্নসারথি, ছিন্নকার্ম্মুক, ছিন্নচর্ম্ম এবং ছিন্নগাত্র হওয়াতে সাতিশয় সমাকুল হইলেন। হা ধিক্! হায় হায়! কি কষ্ট! সিন্ধু এবার আর্য্যপুত্রের হৃদয় ও মস্তক বজ্রসদৃশ বাণ দ্বারা আঘাতিত করিল। হায় হায়! আর্য্যপুত্রকে এবার ভূতলে নিপাতিত করিল৩৭।৪১। ঐ যে, তিনি চেতনা লাভ করতঃ সমানীত অন্যরথে কষ্টে আরোহণ করিতেছেন। এ কি! দুর্ব্বৃত্ত সিন্ধুরাজ খড়্গ দ্বারা রথারোহণেচ্ছু মহারাজার শির-

---

* অর্জ্জুনের নামোল্লেখ থাকাতে রামচন্দ্রের সময়ের পূর্ব্বে পার্থের জন্ম হইয়াছিল বলিয়া সন্দেহ হয়। কিন্তু তাহা নহে। অর্জ্জুন দ্বাপর যুগের শেষে জন্মগ্রহণ করেন। দ্বাপরযুগ এক নহে। সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে বহু শত দ্বাপর অতীত হইয়াছে। অতএব, রামচন্দ্রের সময়ে, যে অর্জ্জুনের কথা লিখিত হইয়াছে সে অর্জ্জুন অন্য দ্বাপর যুগ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তদানীন্তন লোক সকল সেই অর্জ্জুনের নাম শ্রবণ করিয়াছিলেন। তদনুসারে ঋষি অর্জ্জুন কর্ত্তৃক নিবাত কবচগণের সুবর্ণ নগর পরিচালনের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন।

চ্ছেদন করিল। হায় হায়! কি খেদ! দেবি! আমার ভর্ত্তার স্কন্দদেশ অবলোকন করুন। দেখুন, আমার ভর্ত্তার ছিন্নশির হইতে পদ্মরাগ সন্নিভ শোণিত নিঃসৃত হইতেছে। হা ধিক্! হায়! কি কষ্ট! পাদপ যেমন ক্রকচ দ্বারা ছিন্ন হয়, আমার ভর্ত্তার মৃণাল সদৃশ কোমল জানুদ্বয় তাহার ন্যায় সিন্ধুরাজ কর্ত্তৃক শিতধার খড়্গ দ্বারা ছিন্ন হইল। হায়! আমি হত হইলাম, মৃত হইলাম, দগ্ধ হইলাম ও উপহত হইলাম!৪২।৪৩

ভর্ত্তৃভাবদর্শনকাতরা সেই লীলা ঐরূপ বিলাপ করিয়া পরশুছিন্ন লতার ন্যায় ভূতলে নিপতিতা মূর্চ্ছিতা ও অবসন্না হইলেন। এ দিকে বিদূরথ শত্রু কর্ত্তৃক সমাহত হইয়া ছিন্নমূল দ্রুমের ন্যায় পতনোন্মুখ হইলে সারথি তাঁহাকে গৃহে আনয়নার্থ রথ দ্বারা বহন করিতে সচেষ্ট হইল। কিন্তু উদ্ধতস্বভাব সিন্ধুরাজ তাঁহার অনুগামী হইয়া তদীয় কণ্ঠে খড়্গাঘাত করিল। বিদূরথ অর্দ্ধছিন্নস্কন্ধ অবস্থায় সরস্বতীর প্রভাবপূর্ণ গৃহে সারথি কর্ত্তৃক প্রবেশিত হইলেন। যেমন মশক জ্বালোদরমধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় না, তেমনি, সিন্ধুরাজ পদ্মগৃহে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইল না৪৫।৪৬। অনন্তর সারথি সেই খড়্গনিকৃত্তগলনালী হইতে নির্গত শোণিতধারার দ্বারা পরিষিক্তগাত্র-বস্ত্র-তনুত্র-সহ বিদূরথকে গৃহে প্রবেশিত করাইয়া তন্মধ্যবর্ত্তী ভগবতী সরস্বতীর সম্মুখস্থিত কোমলাস্তরণসমন্বিত সুখমরণযোগ্য কোমল শয্যায় স্থাপিত করিলেন৪৭।

পঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

একপঞ্চাশ সর্গ।

বশিষ্ট বলিলেন, রাঘব! অনন্তর যুদ্ধে সিন্ধুরাজ কর্ত্তৃক মহারাজা বিদূরথ হত হইলেন, হত হইলেন, এই শব্দ সমুত্থিত হইলে সেই রাজ্য মহাভয়ে ব্যাকুলিত হইল১। নগরবাসীরা গৃহসামগ্রীসহ শকটারোহণে কলত্রাদির সহিত কাঁদিতে কাঁদিতে পলায়ন আরম্ভ করিল। দুর্দ্দম্য শত্রুগণ পথিমধ্যে তাহাদের কলত্রাদি কাড়িয়া লইতে লাগিল। লোক সকল পরদ্রব্য লুণ্ঠন করিতে প্রবৃত্ত হইল। দেখিতে দেখিতে নগর অতি ভয়ানক আকার ধারণ করিল২।৩। বিপক্ষীয় জনগণের নৃত্য, জয়লাভজনিত আনন্দ নিনাদ, আরোহিবিহীন হস্ত্যশ্বের শব্দ ও কবাটোৎপাটনের শব্দ মিলিত হইয়া ভয়প্রদ হইতে লাগিল। লুব্ধ যোধবৃন্দ লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইল। এই অবসরে চোরেরা চুরি আরম্ভ করিল, দুরাত্মারা নরনারী বধ করিয়া অলঙ্কার অপহরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল, চণ্ডাল প্রভৃতি নিকৃষ্ট লোক রাজান্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়া সুখানুভব করিতে লাগিল, পামরগণ রাজভোগ্য অন্নাদি অপহরণ করতঃ ভক্ষণে উন্মুখ হইল, হেম-হার-ধারী শিশুগণ বীরগণ কর্ত্তৃক পদদলিত ও আহত হইয়া রোদন করিতে লাগিল,৪।৭ দুরাশয় যুবক কর্ত্তৃক অনেক যুবতীর কেশাকর্ষণ হইতে লাগিল, চৌরগণের হস্তচ্যুত মহামূল্য রত্নরাজি পথে নিপতিত হওয়ায় তল্লব্ধ পথিকের বদন হাস্যপ্রফুল্ল হইতে দেখা গেল এবং হয়, হস্তী ও রথাদির মহা আড়ম্বর দৃষ্ট হইল। সিন্ধুপক্ষীয় সমস্ত রাজারা ব্যগ্র হইয়া ঘোষণা করিতে লাগিলেন, অদ্য সিন্ধুরাজ এই রাজ্যে অভিষিক্ত হইবেন। কেহ অভিষেক দ্রব্য আনয়নের আদেশ করিতেছে, কেহ গৃহোপকরণ সংগ্রহ করিতেছে, কোন মন্ত্রী শিল্পীদিগকে নূতন রাজধানী নির্ম্মাণের জন্য আদেশ দান করিতেছেন। সিন্ধুরাজের প্রিয় পাত্রেরা অট্টালিকোপরি আরোহণ করতঃ গবাক্ষের অন্তরাল দিয়া নগরের অদ্ভুত সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে লাগিলেন৮।১০। সিন্ধুরাজের পুত্র অভিষিক্ত হইলে তৎপ্রতি জয়শব্দ সমুদ্ঘোষিত হইতে লাগিল। ভটগণ (শান্তিরক্ষক বীরগণ) চোর দিগের দৌরাত্ম্য নিবারণার্থ ভ্রমণে প্রবৃত্ত

হইল। সিন্ধুপক্ষীয় রাজন্যবর্গ সিন্ধুরাজ কর্তৃক স্থাপিত রাষ্ট্রমর্য্যাদা রক্ষণা-বেক্ষণ করিতে লাগিল। বিদূরথের প্রিয় ব্যক্তি সকল প্রচ্ছন্নভাবে গ্রামান্তরে অবস্থিতি করিলেও বিপক্ষরাজ কর্তৃক সমাক্রান্ত হওয়ায় তথা হইতে বিক্রুত হইতে লাগিল। সিন্ধুরাজের সৈন্যগণ তদ্রাজ্যস্থিত গ্রাম নগরাদি লুণ্ঠন করিতে লাগিল। চৌরগণ অপহরণাভিলাষে রাজপথ অবরোধ করাতে মনুষ্যগণের গমনাগমন রহিত হইতে লাগিল। বিদূরথের বিয়োগদুঃখে আজ্ জনগণের দিবসেও সনীহার আতপ (সূর্য্যকিরণ) অনুভূত হইতে লাগিল[১১।১৩]। মৃত বন্ধুগণের রোদনধ্বনিতে, জিতশত্রু দিগের তূর্য্য রবে এবং হয় হস্তী ও রথ প্রভৃতির শব্দে ঐ নগর যেন পরিপূর্ণ হইয়াছে। জনগণ "একছত্র ভূমণ্ডলাধিপতি সিন্ধুরাজের জয়" এইরূপ ঘোষণা করতঃ নগরে নগরে ভেরী বাদন করিতে লাগিল[১৪।১৫]।

যেমন যুগান্তকাল উপস্থিত হইলে অপর মনু জগৎ সৃষ্টির নিমিত্ত সমাগত হন, সেইরূপ, উন্নতস্কন্ধ মহারাজ সিন্ধু আজ্ অভিষিক্ত হইয়া রাজধানী প্রবেশ করিলেন[১৬]। রত্নরাজি যেমন সমুদ্র মধ্যে প্রবিষ্ট থাকে, সেইরূপ, আজ্ দশ দিক্ হইতে বহুবিধ রাজস্ব সমাগত হইয়া সিন্ধুরাজপুরে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল[১৭]। চতুর্দ্দিকে সিন্ধুনামাঙ্কিত চিহ্ন সংস্থাপিত হইল। প্রত্যেক দেশের ও পুরের নিয়ম বিভিন্ন হইয়া উঠিল। পবন প্রশান্ত ভাব অবলম্বন করিলে যেমন তৃণ, পর্ণ ও ধূলি প্রভৃতির আবর্ত্তন প্রশান্ত হয়, সেইরূপ, রাজবিপ্লবজনিত উৎপাত পরম্পরা শীঘ্র তিরোহিত হইয়া গেল এবং যেন নিমেষ মধ্যে দেশের সমুদায় বিপ্লব ও উপপ্লব নিরাকৃত ও দিক্ সকল প্রশান্ত হইয়া গেল। সমীরণ এখন সিন্ধুরমণীগণের মুখকমলস্থিত অলকারূপ ভ্রমরপংক্তি সঞ্চালিত করতঃ বদনকমলস্থ স্বেদবিন্দুরূপ মধুপানে প্রমত্ত হইয়াই যেন সকল প্রদেশের সন্তাপ ও দৌর্গন্ধ্য প্রভৃতি ক্লেশকর পদার্থ দূরীকৃত করিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল[১৮।২২]।

একপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! এ দিকে জ্ঞপ্তিসমভিব্যাহারিণী লীলা সম্মুখ-বর্ত্তী ভর্ত্তাকে শ্বাসমাত্রাবশিষ্ট ও মূর্চ্ছিত অবলোকন দেখিয়া দেবী সরস্বতীকে বলিতে লাগিলেন। বলিলেন, অম্বিকে! আমার ভর্ত্তা দেহ পরিত্যাগে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সরস্বতী বলিলেন, পুত্রি! রাষ্ট্রবিপ্লব ও মহাড়ম্বরসম্পন্ন সংগ্রাম উপস্থিত হইলেও রাষ্ট্র ও মহীতল দুএর কিছুই বিনষ্ট হয় নাই। কেননা, এই স্বপ্নাত্মক জগৎ ভাসমান হইলেও ইহার স্থিতি নাই[১।৩]। অনঘে! তোমার ভর্ত্তা বিদূরথের এই পার্থিব রাজ্য ভূপতি পদ্মের অন্তঃপুরস্থ গৃহাকাশে ও ভূপতি পদ্মের তথাবিধ ব্রহ্মাণ্ডও সেই বশিষ্ঠব্রাহ্মণের গৃহাকাশে অবস্থিত রহিয়াছে। সেই বশিষ্ঠব্রাহ্মণ-গৃহের মধ্যস্থিত শবগৃহে এই জগৎ ও এই জগন্মধ্যে এই বিদূরথ-ব্রহ্মাণ্ড উভয়ই অবস্থিত রহিয়াছে। তুমি, আমি, এই লীলা, এই বিদূরথ ও এই সসাগরা মেদিনী প্রভৃতি মিথ্যা জগত্রয় সেই গিরি-গ্রামীয় বিপ্রের গৃহাভ্যন্তরস্থ গগনকোষে অবস্থিত রহিয়াছে[৪।৮]। স্বীয় আত্মাই উক্ত আকারে কখন বৃথা প্রকাশিত, কখন বা অপ্রকাশিত হইয়া থাকেন। যে আত্মা ঐ প্রকার হন, সেই আত্মাই উৎপত্তি বিনাশ-বিবর্জ্জিত পরম পদ[৯]। সেই অনাময় শান্ত পরমাত্মা স্বপ্রকাশ, তিনিই মণ্ডপগেহান্তে স্বীয় চিন্মাত্র স্বভাব দ্বারা আপনিই আপনাতে সমুদিত আছেন[১০]। লীলে! পূর্ব্বোক্ত মণ্ডপদ্বয়ের মধ্যে যে ভূতাকাশ, বস্তুতঃ তাহাতেও শূন্য ব্যতীত অন্য কিছুই নাই। অর্থাৎ তাহাতেও জগৎ নাই। যখন তাহা ভূতাকাশেও নাই, তখন চিদাকাশে থাকিবার সম্ভাবনা কি? ভাবিয়া দেখ, ভ্রমদ্রষ্টা না থাকিলে ভ্রান্তি কোথায় ও কাহার হইবে? অতএব, ভ্রমেরও বাস্তব অস্তিত্ব নাই। যাহা আছে, তাহা সেই নিত্য পরমপদ[১১।১২]। দৃশ্য কি? দৃশ্য দ্রষ্টার ব্যাপারের আধার সুতরাং কোনও দ্রষ্টা আপনাতে আপনার ব্যাপার আহিত করিতে সমর্থ নহে। কর্ত্তা আপনিই আপনার কর্ম্ম, ইহা অসম্ভব। অতএব, দ্রষ্টৃ দৃশ্যের দৃষ্ট ক্রম অদ্বৈতবাদের ভূষণ। বৎসে! দৃশ্যভ্রান্তির অভাব হইলে

দ্রষ্টা ও দৃশ্য উভয়ের অভাব হয়। দ্রষ্টার ও দৃশ্যের অভাব হইলে অদ্বয় পরমাত্মাই অবশিষ্ট থাকেন। বস্তুতঃ উক্ত পদ (প্রাপ্য আত্মা) পরম ও উৎপত্তি বিনাশ বর্জ্জিত। চিদাত্মপদই স্বতঃ উক্তপ্রকারে প্রকাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে[১৩।১৪]। সেইজন্যই বলিতেছি, সেই মণ্ডপগৃহে জনগণ স্ব স্ব ভাবে সমুদিত হইয়া স্ব স্ব ব্যবস্থাতেই বিহার করিতেছেন। অথচ তাহাতে জগৎ বা সৃষ্টি কিছুই নাই। নাই বলিয়াই বলা যায়, জগৎ অজ ও আকাশস্বরূপ[১৫।১৬]। অন্তর্দৃষ্টির দ্বারাই উক্তবিধ অহম্ভাবের সাক্ষী-ভূত চিদাকাশ জগৎস্বরূপে অনুভূত হইয়া থাকেন। এই মরু ও ভূধর প্রভৃতি দৃশ্য সেই শূন্যরূপী চিদাত্মার স্বরূপ। ঐ সকলের দৃশ্যতা স্বপ্নদৃষ্ট মহাপুরীর ন্যায় অলীক[১৭]। জনগণ স্বপ্নে কণ্ঠ হইতে হৃদয় পর্য্যন্ত প্রাদেশ পরিমিত স্থানে তৎপ্রদেশাবচ্ছিন্ন আত্মচৈতন্যে লক্ষ লক্ষ পর্ব্বতাদি ভাসমান (অবস্থিত) দর্শন করে[১৮]। এক পরমাণুতে (পরমাণুতুল্য মনে) লক্ষ্য লক্ষ্য জগৎ দেখা যায়, সে সকল বিবিধ বেশে কদলীত্বকের ন্যায় স্তরে স্তরে অবস্থিত রহিয়াছে[১৯]। স্বপ্ন নির্ম্মিত পুর ও নগরাদির অব-স্থিতির ন্যায় চিদণুর (জীবভাবের) মধ্যে ত্রিজগৎ অবস্থিতি করিতেছে সুতরাং ত্রিজগতের মধ্যে চিদণু ও চিদণুর মধ্যে আরও এক একটী জগৎ অবস্থিত রহিয়াছে[২০]। লীলে! সেই সকল জগতের মধ্যে যে জগতে ভূপতি পদ্মের শব অবস্থিত আছে, তোমার সপত্নী লীলা পূর্ব্বেই তোমার অজ্ঞাতসারে তথায় গমন করিয়াছেন। তুমি দেখিলে, তোমার সম্মুখে লীলা মূর্চ্ছিতা হইলেন। যেই মূর্চ্ছা হইল সেই তিনি ভর্ত্তা পদ্মের নিকটে গিয়া স্থিতা হইয়াছেন[২১।২২]।

লীলা বলিলেন, দেবি! তিনি তথায় কি প্রকারে দেহধারিণী হইয়া আমার সপত্নী ভাব অবলম্বন করতঃ অবস্থিতি করিতেছেন? এবং মহা-রাজ পদ্মের গৃহবাসী সেই সমস্ত জনগণ তাঁহার কি প্রকার রূপ দর্শন করিতেছেন? আর তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহারা কিইবা বলিতেছেন? এই সমস্ত আমার নিকট সংক্ষেপে বর্ণন করুন[২৩।২৪]।

দেবী বলিলেন, লীলে! আমি তোমার জিজ্ঞাসিত বিষয় সংক্ষেপে কীর্ত্তন করি; অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। শ্রবণ করিলে সম্যক্ জ্ঞান লাভ পূর্ব্বক সকল বিষয় অবগত হইতে পারিবে। সেই বিদূরথরূপ তোমার স্বামী ভূপতি পদ্ম সেই শবাশ্রয়ীভূত সদ্মে সেই নগরাদিভাবে

পরিদৃশ্যমান জগন্ময়ী ভ্রান্তি দর্শন করিতেছেন[২৫]। বৎসে! এই যুদ্ধ ভ্রান্তি-যুদ্ধ। এই সমস্ত জনও জন নহে; সমস্তই ভ্রান্তি। বস্তুতঃ জন্মাদি-বিক্রিয়ারহিত আত্মাই সংসার[২৬।২৭]। লীলা যে ভূপতি পদ্মের দয়িতা হইয়াছিলেন তাহাও ভ্রান্তির ক্রম ও ভ্রান্তির বিলাস। হে বরারোহে! তুমি ও এই লীলা তোমরা উভয়েই স্বপ্নসদৃশ[২৮]। তোমরা যেমন মহারাজ পদ্মের স্বপ্ন, তেমনি, মহারাজ পদ্মও তোমাদের স্বপ্ন। তোমাদের এই ভর্ত্তা ও আমি, ইহাও তোমাদের অন্তবিধ স্বপ্ন[২৯]। ঈদৃশী জগৎশোভা-কেই দৃশ্য কহে। বস্তুতঃ "ইহা দৃশ্য নহে" ইত্যাকার অপরোক্ষ জ্ঞানের উদয় হইলে দৃশ্যশব্দার্থ পরিত্যক্ত হইয়া যায়[৩০]। কেবল আত্মাই পরিপূর্ণ। তদাশ্রয়ে তুমি, লীলা, আমি ও এই নৃপতি প্রভৃতি জনসমাকীর্ণ সংসার তদীয় ভ্রান্তিরই বিজৃম্ভণ। এই নৃপতি প্রভৃতি, আমরা ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ, যে প্রকারে সেই মহাচিতের মিথ্যা কল্পনা হইতে সমুদিত হইয়াছে ও হইয়াছিল, মনোহারিণী, হাস্যবিলাসশালিনী, নবযৌবনসম্পন্না চঞ্চলবান্ধে, সাধুশীলা, মধুরোদারভাষিণী, কোকিলস্বরসম্পন্না, মদমন্মথ-মন্থরা, অসিতোৎপলপত্রাক্ষী, পীনপয়োধরা, কাঞ্চনগৌরাঙ্গী, পক্কবিম্বফলা-ধরা রাজমহিষী লীলাও সেইরূপে সমুৎপন্না হইয়াছেন[৩১।৩৫]। তোমার ভর্ত্তা তোমারই মনঃকল্পিত এবং এই সপত্নী লীলাও তোমার মনঃকল্পিত ভর্ত্তার মনোবৃত্তিময়ী। যে দিন তোমার ভর্ত্তার চিত্ত লীলামূর্ত্তির বাসনায় বাসিত হইয়াছিল, সেই দিন চমৎকার স্বভাব চৈতন্যাকাশে তোমার ন্যায় আকারবিশিষ্টা এই লীলা দৃশ্যরূপে পরিণতা হইয়াছিল[৩৬]। যে দিন তোমার ভর্ত্তার মরণ হয়, সেই দিনই তোমার ভর্ত্তা এই বাসনাময়ী ও স্বৎপ্রতিবিম্বময়ী লীলাকে দেখিতে পাইয়াছিলেন[৩৭]। চিত্ত যখন আধি-ভৌতিক ভাব অনুভব করে, তখন, আধিভৌতিক ভাবকে সৎস্বরূপ ও আতিবাহিক ভাবকে কল্পিত জ্ঞান করে। আর যখন চিত্ত আধি-ভৌতিক ভাবকে অসৎ বিবেচনা করে, তখন, আতিবাহিক সঙ্কল্পই সৎরূপে অনুভূত হয়। এই লীলা বাসনাময়ী হইলেও তোমার ভর্ত্তা ইহাকে উক্ত কারণে বাসনাময়ী বলিয়া জানিতেন না, সত্য বলিয়াই জানিতেন[৩৮।৩৯]। হেতু এই যে, তোমার ভর্ত্তা মরণমূর্চ্ছান্তে পুনর্জ্জন্মভ্রম ভ্রমে নিপতিত হইয়া এই বাসনাময় লীলার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। সুতরাং সে লীলাও তুমি অর্থাৎ সে তোমারই প্রতিবিম্ব। চিদাত্মার সর্ব্ব-

গামিত্ব হেতু তুমিও আপনার বাসনাময় শরীরান্তর দেখিয়াছ এবং বাসনাময়ী লীলাও তোমাকে দেখিয়াছে। বলিতে কি, এ সমস্তই স্বদীয় বুদ্ধিস্থ বাসনার বিলাস[৩০।৩১]। যখন যে স্থানে যে বাসনা উদ্রিক্ত হয়, সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম তখনই সেই স্থানে তদনুরূপ দৃশ্য, স্বপ্ন দেখার ন্যায় দেখেন[৩২]। আত্মা সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বশক্তিমান্। অত্যন্ত অভিনিবেশের প্রভাবে যখন যে শক্তির উদ্রেক হয়, সর্ব্বব্যাপী আত্মা তখন তাহারই অনুরূপে অবস্থিতি করেন ও প্রকাশিত হন[৩৩]। এই দম্পতি (পদ্ম ও লীলা) পূর্ব্বে মরণমূর্চ্ছার অব্যবহিত পরক্ষণেই আপন আপন হৃদয়ে পূর্ব্ববাসনার উদয়ে বক্ষ্যমাণ প্রকার অনুভব করিয়াছিলেন। যথা—এই আমাদিগের পিতা, এই আমাদের মাতা, এই আমাদের দেশ, এই আমাদের ধন, এই আমাদের পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম, আমরা বিবাহিত হইয়া অভিন্ন হৃদয় হইয়াছি, এবং এই আমাদের পরিজনবর্গ, ইত্যাদি[৩৪।৩৫]। লীলে! এ বিষয়ের প্রত্যক্ষ নিদর্শন স্বপ্ন। যেমন নিদ্রাবৃত্তির উদ্ভবমাত্রেই জাগ্রৎ বাসনা দেশদেশান্তর দেখায়, তেমনি, মরণমূর্চ্ছার পরেও পূর্ব্ববাসনার উদয়ে জীব বাসনানুরূপ সৃষ্টি অনুভব করে। তোমার পূর্ব্ববাসনা ঐরূপই ছিল, তাই তুমি তদনুরূপ দৃশ্য, স্বপ্ন দর্শনের ন্যায় দর্শন করিতেছ। ইনি আমার অর্চ্চনা করিয়াছিলেন, এবং প্রার্থনা করিয়াছিলেন, "আমি যেন বিধবা না হই[৩৭]।" আমিও ইঁহাকে বাসনানুরূপ বর দিয়াছিলাম। সেই কারণে লীলা ভর্ত্তার অগ্রে মৃতা হইয়াছেন। এখনও তিনি বালিকা। হে বরাঙ্গনে! তোমরা চৈতন্যেরই অংশরূপিণী এবং আমিও তোমাদের চেতনারূপা কুলদেবী ও পূজ্যা। আমি স্বভাবতঃই এইরূপ করিয়া থাকি[৩৮।৩৯]। এক্ষণে শ্রবণ কর, কিরূপে তিনি সদেহা হইয়া এখানে আসিয়াছেন।

অনন্তর সেই লীলার জীব প্রাণবায়ুসহকারে তদীয় মুখ হইতে বিনির্গত হইল। অনন্তর লীলা মরণমূর্চ্ছান্তে স্বীয়সঙ্কল্পে রচিত বুদ্ধিরূপ আকাশে সেই সেই ভাব অনুভব করিতে প্রবৃত্তা হইলেন। বাসনার উৎকর্ষে তিনি পূর্ব্ব দেহ স্মরণ করিয়া রবিকরবিকসিতা পদ্মিনীর ন্যায় বাসনানুরূপ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় মনোহর কান্তকে উপভোগ করিবার নিমিত্ত পূর্ব্বস্মৃতির দ্বারা ভূপতি পদ্মের মণ্ডপে গমন করতঃ স্বীয় ভর্ত্তার সহিত মিলিতা হইলেন[৪১।৪২]।

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, অনন্তর লব্ধবরা লীলা সেই বাসনাময় দেহে মহীপতি পতির সকাশে নভোমার্গে গমনোদ্যতা হইলেন[১]। তিনি চিন্তার দ্বারা শরীরধারীণীর ন্যায় হইলেন এবং পতি পাইবেন, সেই উৎসাহে আনন্দিত হইয়া সেই লঘু দেহে নভস্তল বিহঙ্গিনীর ন্যায় অতিক্রম করিতে লাগিলেন[২]। এ দিকে তাঁহার সেই কন্যা জ্ঞপ্তিদেবী কর্ত্তৃক প্রেরিতা হইয়া তাঁহার অগ্রগামিনী হইয়াছেন। যেন তিনি লীলার সংকল্প রূপ আদর্শ (আয়না) হইতে অগ্রেই নির্গতা হইয়াছেন[৩]। লীলা সমীপবর্ত্তিনী হইলে কুমারী তাঁহাকে বলিলেন, মাতঃ! আপনি ত সুখে আগমন করিতেছেন? আমি আপনার দুহিতা। আপনার প্রতীক্ষায় আমি এই আকাশপথে অবস্থিতি করিতেছি[৪]।

লীলা কুমারীকে দেবী জ্ঞান করতঃ বলিলেন, দেবি! নীরজলোচনে! মহতের দর্শন কদাচ নিষ্ফল হয় না। আপনি আমাকে শীঘ্র আমার ভর্ত্তৃসমীপে লইয়া যাউন। মহতের দর্শন নিষ্ফল হইবার নহে[৫]। তৎশ্রবণে কুমারী অন্য কিছু না বলিয়া বলিলেন, আসুন, আমরা উভয়ে তথায় গমন করিব। এই বলিয়া লীলার অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিলেন এবং লীলাও আকাশপথ দেখিতে দেখিতে তাহার অনুগামিনী হইলেন[৬]। ভাবি শুভাশুভ লক্ষণ সূচক বিধাতৃবিহিত হস্তরেখা যেমন প্রাণিগণের করতল প্রাপ্ত হয়, তেমনি, লীলা ও কন্যা অম্বরকোটর (ব্রহ্মাণ্ড কর্পরের মধ্যস্থল অর্থাৎ আকাশ মধ্য) প্রাপ্ত হইলেন[৭]। তাঁহারা প্রথমে মেঘ সঞ্চার স্থান অতিক্রম করিয়া,বায়ুরাশির মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। পরে সূর্য্যমার্গ ও নক্ষত্রমার্গ হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইয়া ত্বরিত গমনে বায়ু, ইন্দ্র, সুর ও সিদ্ধ-দিগের লোক সকল উল্লঙ্ঘন করিলেন। পরে বিষ্ণুর ও মহেশ্বরের লোক প্রাপ্ত হইলেন[৮।৯]। যেমন কুম্ভ ভগ্ন না হইলেও তন্মধ্যগত হিমানীর (বরফের) শীতলতা বহিরাগত হয়, তাহার ন্যায়, সেই সিদ্ধসঙ্কল্পা লীলা ব্রহ্মাণ্ডকর্পর হইতে নির্গতা হইলেন[১০]। এস্থলে বলা বাহুল্য যে, সেই চিত্তদেহা লীলা সঙ্কল্পসম্ভূত ঐ সকল

বিভ্রম স্বীয় অন্তরেই অনুভব করিতে লাগিলেন[১১]। লীলা উক্ত প্রকারে ব্রহ্মলোকাদি অতিক্রম করতঃ ব্রহ্মাণ্ডকপাল ভেদ করিয়া জলাদি সপ্ত পদার্থের সপ্ত আবরণ উল্লঙ্ঘন করিয়া দেখিলেন, সম্মুখে অসীম অপার মহাচিদাকাশ। গরুড় যদি মহাবেগে শতকোটি কল্প উড্ডয়ন করেন, তাহা হইলেও এই চিদাকাশের অন্ত প্রাপ্ত হইবার নহে[১২।১৩]। এবম্বিধ মহাচিদ্গগনের অন্তরালে দেখিতে পাইলেন, যেমন মহাবনে অসংখ্য ফল থাকে, তাহার ন্যায় মহাচিদ্গগনে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড বিদ্যমান রহিয়াছে[১৪]। ঐ সকল ব্রহ্মাণ্ড পরস্পর পরস্পরের দৃষ্ট নহে। অর্থাৎ এক ব্রহ্মাণ্ড অন্য ব্রহ্মাণ্ডের বিজ্ঞাত নহে। (কেহ কাহার খবর রাখে না ও জানে না)। পরে কীট যেমন অলক্ষ্যে বদর মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তেমনি, সেই অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে পুরোবর্ত্তী বিস্তৃত আবরণ যুক্ত এক ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করিলেন। সে ব্রহ্মাণ্ডেও ব্রহ্মা ইন্দ্র বিষ্ণু প্রভৃতির ভাস্বর পুরমণ্ডল আছে, সে সকল উল্লঙ্ঘন করিয়া তত্রস্থ নভোমণ্ডলের অধোভাগে শ্রীমান্ ভূপতি পদ্মের মহীমণ্ডলস্থিত রাজধানীস্থ লীলান্তঃপুরমণ্ডপ দেখিতে পাইলেন। অনন্তর সেই মণ্ডপে প্রবেশ পূর্ব্বক পদ্মনরপতির পুষ্পগুপ্ত শবের নিকট গিয়া অবস্থিতা হইলেন[১৫।১৭]। বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! অতঃপর সেই বরাননা লীলা সেই কুমারীকে আর দেখিতে পাইলেন না। যেন তিনি মায়ার ন্যায় কোথায় লুকাইয়া গিয়াছেন[১৮]। পরে লীলা সেই শবরূপী ভর্ত্তার মুখমণ্ডল দর্শন করিয়া স্বীয় স্বাভাবিক প্রতিভা বশতঃ এইরূপ বোধ করিতে লাগিলেন যে, আমার এই ভর্ত্তা সম্প্রতি সংগ্রামে সিন্ধুরাজকর্ত্তৃক নিহত হইয়া এই বীরলোকে আগমন পুর্ব্বক এই সুখশয্যায় শয়ন করিয়া আছেন[১৯।২০]। পরে মনে করিলেন, যাহাই হউক, আমি যে দেবীর প্রসাদে সশরীরে এই স্থানে উপনীতা হইয়া এই ভর্ত্তৃশব প্রাপ্ত হইলাম; ইহা আমার সমধিক সৌভাগ্যের ফল। আমিই ধন্যা। আমার সদৃশী রমণী ইহ জগতে আর কে আছে?[২১]। তিনি কিয়ৎক্ষণ এইরূপ চিন্তা করিলেন, অনন্তর মনোহর চামর লইয়া সেই ভর্ত্তৃশব বীজন করিতে লাগিলেন[২২]।

ঐ সময়ে প্রবুদ্ধ লীলা জ্ঞপ্তিদেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবি! ইহারা পদ্মভূপতির সেই সমস্ত ভৃত্য, সেই সকল দাসী এবং সেই রাজাও এই অবস্থিত রহিয়াছেন। তাই জানিতে ইচ্ছা করি, এক্ষণে ইহারা

এই সমাগতা লীলাকে কে কিরূপ বুঝিবে, কে কি প্রকার বলিবে, কে কি প্রকার ব্যবহার করিবে, তাহা আমাকে বলুন[২৩]। দেবী বলিলেন, এই সেই রাজা, এই সেই লীলা ও এই সেই সমস্ত ভৃত্য, ইহারা কেহই চিদাকাশের একতা, অর্থাৎ পরমাত্মার পরিপূর্ণতা বা সর্ব্বব্যাপিতা ও আমাদিগের উভয়ের প্রভাব, মহাচিতের প্রতিভাস ও মহানিয়তির প্রেরণা প্রযুক্ত পরস্পর পরস্পরকে অপরিচিত বলিয়া জানিতেছে না। সকলেই সকলে প্রতিবিম্বিত হইয়া সকলকে আপন আপন সম্বন্ধ সহ দর্শন করিতেছে। সুতরাং রাজা এই আমার ভার্য্যা, এই আমার সখী, এই আমার মহিষী ও এই আমার ভৃত্য, এইরূপ অনুভব করিতেছেন। কিন্তু হে লীলে! এই রহস্য বা তথ্য তুমি, আমি ও বিদূরথপত্নী লীলা এই তিন্ ব্যতিরেকে অপর কেহ বুঝিতে পারিতেছে না[২৫।২৭]। না বুঝিবার কারণ, ঐ সকল ব্যক্তির অজ্ঞানাবরণ ভঙ্গ হয় নাই।

প্রবুদ্ধ লীলা পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবি! আপনি বর দিলেও ললিতবাদিনী লীলা কি নিমিত্ত স্থূল শরীরে পতিসমীপে আগমন করিতে পারিল না তাহা আমাকে বলুন[২৮]। দেবী বলিলেন, যদ্রূপ অন্ধকার আলোকে সংগত হয় না, তদ্রূপ, অপ্রবুদ্ধধী ব্যক্তিরা (যাহারা আপনাকে অস্থূল বলিয়া না জানে তাহারা) কদাচ স্থূল দেহে পবিত্র লোকে সমাগত হইতে পারে না[২৯]। সৃষ্টির আদিতে সত্যসঙ্কল্প হিরণ্যগর্ভ কর্তৃক এই নিয়তি (অবশ্যম্ভাবী নিয়ম) স্থাপিত হইয়াছে যে, সত্য কদাচ অলীকের সহিত মিলিত হইবে না[৩০]। যাবৎকাল বালকগণের বেতালসঙ্কল্প থাকে, তাবৎ তাহাদিগের নির্ব্বেতাল বুদ্ধি কি প্রকারে উদিত হইবে?[৩১] যাবৎকাল আপনাতে অবিবেকরূপ জ্বরের উষ্ণতা বিদ্যমান থাকে, তাবৎ তাহাতে বিবেকরূপ শীতাংশুর শৈত্য উদিত হইবে না[৩২]। "আমি পৃথ্ব্যাদিময় স্থূলদেহী, আকাশে আমার উত্তমা গতির সম্ভাবনা নাই" এইরূপ কৃতনিশ্চয় ব্যক্তির কিরূপে স্থূল শরীরে আকাশে উত্তমা গতি হইবে?[৩৩] যদি কেহ জ্ঞান, বিবেক, পুণ্যবিশেষ ও বর দ্বারা তোমার এই দেহের ন্যায় দেহ ধারণ করিতে পারে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তিই ঈদৃশ পরলোকে আগমন করিতে পারে, অন্যে নহে[৩৪]। যেমন শুষ্কপর্ণ প্রজ্বলিত অঙ্গারে শীঘ্র দগ্ধ হয়, তেমনি, সুবাসনার দৃঢ়তায় আতিবাহিক দেহ প্রাপ্ত হইলে স্থূলদেহ

তখন বিশীর্ণ হইয়া যায়[৩৫]। বরের ও অভিশাপের দ্বারা পূর্ব্বকৃত জ্ঞান কর্ম্মের উদ্বোধনমাত্র * হয়, অন্য কিছু হয় না[৩৬]। রজ্জুতে "ইহা রজ্জু" এইরূপ জ্ঞানের উদয় হইলে তখন কি আর ভ্রান্তিদৃষ্ট সর্প তাহাকে বিষমূর্চ্ছা প্রদান করিতে পারে? তাহা পারে না। সেইরূপ, যাহা আত্মাতে বিদ্যমান নাই, অর্থাৎ যাহা অসত্য; কিরূপে তাহা সত্য কার্য্য প্রসব করিবে?[৩৭] "এ মরিয়াছে" এ জ্ঞান মিথ্যা-অনুভব মাত্র। পরিপুষ্ট পূর্ব্ব অভ্যাস দ্বারাই ঐরূপ অনুভব হইয়া থাকে। হে সুবুদ্ধিশালিনি! সৃষ্টির ঈদৃশ নিয়তি হিরণ্যগর্ভ কর্ত্তৃক কল্পিত হইয়াছে, রচিত হয় নাই। অবিদিতবেদ্য অজ্ঞানচক্ষু ব্যক্তির অন্তরে এই সংসার অনুভূত হইলেও, বস্তুতঃ ইহা জলে চন্দ্রবিম্বের ন্যায় বাহ্যে প্রতিভাত বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকে[৩৮,৪০]।

---

* বর বল, আর অভিশাপ বল, সমস্তই পূর্ব্বকৃত কর্ম্মানুসারে লাভ ও সফল হয়। বর ও অভিশাপ সেই সেই ফলোন্মুখ কর্ম্মের সূচক মাত্র। যখন কর্ম্মফল ফলিবার সময় আইসে, তখন বর পাওয়া ও অভিশাপ ঘটনা হইয়া থাকে।

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।
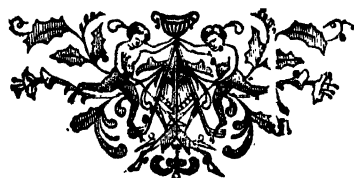
চতুঃপঞ্চাশ সর্গ।

দেবী বলিলেন, বৎসে! উক্তকারণে পুনর্ব্বার বলিতেছি যে, যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞ এবং যাঁহারা যোগাভ্যাসজনিত পরম ধর্ম্ম লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই আতিবাহিক লোক প্রাপ্ত হন; অন্যে আতিবাহিক লোক প্রাপ্ত হন না[১]। আধিভৌতিক দেহ মিথ্যা। যাহা মিথ্যা, কি প্রকারে তাহা সত্যে (আতিবাহিকে) অবস্থিতি করিবে? ছায়া কি কখন আতপে থাকিতে পারে?[২]। কেবল উৎকৃষ্ট যোগজ ধর্ম্ম প্রাপ্তা তত্ত্বজ্ঞানশালিনী লীলাই আতিবাহিক দেহ পাইয়াছেন এবং আতিবাহিক দেহে এতল্লোক প্রাপ্ত হইয়াছেন; অপর কেহ এরূপ হইতে পারে নাই[৩]।

প্রবুদ্ধ লীলা বলিলেন। যাহা বলিলেন, লীলা সেই প্রকারেই আগমন করুক, তাঁহা আমি অযুক্ত মনে করিতেছি না। কিন্তু, ঐ দেখুন, সম্প্রতি আমার স্বামী প্রাণ পরিত্যাগে উদ্যত হইয়াছেন। ঐ বিষয়ের কি উপপত্তি করিবেন, তাহা বলুন। অর্থাৎ আপনি যে নিয়তির কথা বলিলেন, তাহা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? ভগবতি! আপনিই ভাবিয়া দেখুন, নিয়তিই দেহিগণের সুখ দুঃখের ভাব ও অভাব উভয় বিষয়ে সমাগত হয়। আবার অনিয়তি (অনিয়ম) তাহাদিগের মৃত্যুর ও জন্মাদির সূচক হইয়া উপস্থিত হয়।৫ এ সকল ঘটনা কেন হয়? কি প্রকারে হয়? তাহা বর্ণন করুন। জলের শীততা ও অগ্নির উষ্ণতা প্রভৃতি স্বভাব, কি প্রকারে সংসিদ্ধ হয়? কি প্রকারে সত্তা, পদার্থগামিনী হয়? (সত্তা=ভাব অর্থাৎ বিদ্যমানতা। যাহা থাকাতে ঘটপটাদি আছে, ইত্যাকার প্রতীতি হইয়া থাকে) অগ্ন্যাদিতে উষ্ণত্বাদি, পৃথ্ব্যাদিতে স্থিরতাদি, হিমাদিতে শীততাদি, কালের ও আকাশের বিদ্যমানতা প্রভৃতি কিরূপে অনুভূত হয়? ভাবাভাবের গ্রহণ ও উৎসর্গ, পদার্থের স্থূলতা ও সূক্ষ্মতা প্রভৃতির নিয়মই বা কি কারণে দৃষ্ট হয়? (ভাব সত্যরজতাদি, তাহার গ্রহণ, অভাব শুক্তিরজতাদি, তাহার উৎসর্গ অর্থাৎ বর্জ্জন। ভূম্যাদির স্থূলতা এবং ইন্দ্রিয়াদির সূক্ষ্মতা)। তৃণ গুল্ম ও লতাদির উচ্চ নীচ ধর্ম্ম কি প্রকারে সংসিদ্ধ হয়? কূপ সকল

শাল তালাদির ন্যায় উচ্চ না হয় কেন? কেন এত সুনিয়ম ও সুশৃঙ্খল দৃষ্ট হয়? এই সমস্ত বিষয় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন৭।৮।

দেবী বলিলেন, বৎসে! মহাপ্রলয় উপস্থিত হইলে যখন সমুদায় পদার্থ অন্তগত হইবে, তখন অনন্ত আকাশস্বরূপ একমাত্র ব্রহ্ম থাকিবেন৯। তুমি যেমন আকাশ গমনাদি অনুভব কর, সেইরূপ, ব্রহ্ম চিৎস্বরূপতা প্রযুক্ত "আমি তেজঃকণ" এইরূপ অনুভব করেন। তেজঃকণ অর্থাৎ চৈতন্যব্যাপ্ত ভাস্বর সূক্ষ্ম ভূত। অনন্তর সেই তেজঃকণ চৈতন্যের ব্যাপ্তিতে আপনিই আপনাতে স্থৌল্য অনুভব করেন। তাঁহার সেই স্থূলভাব ব্রহ্মাণ্ড। ইহা অসত্য হইলেও সত্য বলিয়া অনুভূত হইতেছে১০।১১। ব্রহ্ম স্বকল্পিত ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে অবস্থিতি করতঃ "আমি হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা" এইরূপ অভিমান ধারণ (সঙ্কল্প) করতঃ এই মনোরাজ্য বিস্তৃত করিয়াছেন। তাঁহার সেই সত্যসঙ্কল্পস্বরূপ মনোরাজ্যই এই জগৎ১২। সৃষ্টির প্রারম্ভে তাঁহার সঙ্কল্পবৃত্তি অনুসারে যে প্রকারে ও যে নিয়মে যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল, অদ্যাপি সেই প্রকার ও সেই নিয়ম নিশ্চল ভাবে অবস্থিত রহিয়াছে১৩। চিত্ত যে যে প্রকারে প্রস্ফুরিত হয়, চৈতন্যও সেই সেই প্রকারে প্রস্ফুরিত হন। সেইজন্য এই জগতের কোনও কার্য্য অনিয়মিতরূপে সম্পন্ন হয় না১৪। সুবর্ণ যেমন কটক ও কুণ্ডলাদিরূপে অবস্থিতি করে, তাহার ন্যায় সমুদয় বস্তু পরমাত্মায় অবস্থিতি করিতেছে১৫। জগতের কোনও বস্তু সেই বিশ্বরূপ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে। সৃষ্ট্যারম্ভ কালে যাহা যে স্বভাবে আবির্ভূত হইয়াছিল, অদ্যাপি তাহা সেই স্বভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে১৬। তিনি কদাচ স্বীয় স্বাভাবিক সত্তা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ নহেন। সেইজন্য নিয়তির বিনাশ নাই১৭। এই ব্যোমরূপী পৃথিব্যাদি সৃষ্টির আদিতে যেরূপে সৃষ্ট হইয়াছে, উক্তবিধ নিয়তির দ্বারা সে সকল সেই রূপেই অবস্থিত রহিয়াছে, কিছুমাত্র ব্যতিক্রান্ত হইতেছে না। জীবননিয়তি ও মরণনিয়তি এ উভয়ও উক্তকারণে বিপর্য্যস্ত হয় না। প্রাণী সকল উক্তবিধ স্বভাব দ্বারা জীবন ও মরণ এবং স্থিতি প্রভৃতি অনুভব করে, তাহার অন্যথা হয় না১৮।১৯। কিন্তু ইহার পারমার্থিক পক্ষ দেখিতে গেলে দৃষ্ট হইবে যে, জগৎ আদৌ উৎপন্ন হয় নাই। ইহা স্বপ্নাঙ্গনা সঙ্গমের অনুরূপ মিথ্যা অথচ আত্মচৈতন্যের বিকাশ। বাস্তবপক্ষে অসত্য হইলেও বিশ্ব যে বর্ণিত

প্রকারে অবস্থিতি করিতেছে ও অনুভূত হইতেছে, ঐ অবস্থান ও অনুভব স্বকীয় স্বভাবেরই সম্পত্তি[২০।২১]। প্রস্ফুরণশীল সম্বিদ্ সৃষ্টির আদিতে যে যে প্রকারে আবির্ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই সেই প্রকারে অদ্যাপিও অবিপর্য্যস্ত ভাবে অবস্থিত আছে, এবং এই অবিপর্য্যস্ত ভাব শাস্ত্রীয় ভাষায় নিয়তি[২২]। সেই চিদাকাশই সৃষ্টির আদিতে ব্যোমসম্বিদ্ গ্রহণ করায় ব্যোমত্ব প্রাপ্ত, কালসম্বিদ্ স্বীকার করায় কালত্বপ্রাপ্ত ও জলসম্বিদ্ গ্রহণ করায় জলভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন। পুরুষ যেমন স্বপ্নে আপনাতেই জল দর্শন করে, সেইরূপ, সেই চিৎশক্তিও আপনাতে আকাশাদিভাব দর্শন করেন। মায়ার এতই কুশলতা ও এতই চমৎকারিতা যে, যাহা নাই তাহাই উহ্য করিয়া লয় ও দেখায়[২৩।২৫]। আকাশত্ব, জলত্ব, পৃথিবীত্ব, অগ্নিত্ব ও বায়ুত্ব, এ সমস্তই অসৎ। অসৎ হইলেও চিৎসত্ত্ব স্বপ্ন দেখার ন্যায় ও ধ্যানাদির ন্যায় স্বীয় অন্তরে ঐ সকলের অবস্থান অনুভব করে[২৬]। আমি তোমার সন্দেহ ভঞ্জনের নিমিত্ত তোমার নিকট জীবগণের মরণানন্তর স্বকর্ম্মানুসারী ফলানুভবের বৃত্তান্ত বা প্রকার বর্ণন করি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর[২৭]।

সৃষ্ট্যারম্ভকালে এইরূপ নিয়তি অর্থাৎ নিয়ম সঞ্জাত হইয়াছিল যে, মানবগণের পরমায়ু কৃতযুগে চারি শত, ত্রেতায় ত্রিশত, দ্বাপরে দুই শত এবং কলিযুগে এক শত বৎসর ভোগ হইবে। (ইহা মনুর অভিমত বৎসর। বৎসর অনেক প্রকার, তন্মধ্যে জ্যোতিষোক্ত বর্ষ গণনা করিলে অধিক হইয়া থাকে)। এই নিয়তির আবার অবান্তর নিয়তি (নিয়ম) আছে। অর্থাৎ উক্ত পরমায়ুর ন্যূনাতিরেক হওয়াও অন্য নিয়তি। ন্যূনাতিরেক হওয়ার কারণ বলি, শ্রবণ কর[২৮]।

কর্ম্ম, দেশ, কাল, ক্রিয়া এবং দ্রব্যের বিশুদ্ধতা ও অবিশুদ্ধতা মনুষ্যগণের পরমায়ুর ন্যূনাতিরেকের কারণ[২৯]। স্ব স্ব আচর্তব্য কর্ম্মের ও ধর্ম্মের হ্রাস হইলে আয়ুর হ্রাস হয়, বৃদ্ধি হইলে আয়ুর বৃদ্ধি হয় ও সমভাবে থাকিলে আয়ুও সমভাবে থাকে। অর্থাৎ যে যুগের যে আয়ু, সেই আয়ুঃ ভোগ হয়[৩০]। অপিচ, বাল্যমৃত্যুপ্রদ কর্ম্মকলাপের (যে কর্ম্ম করিলে বালককালেই মৃত্যু হয়, সেই কর্ম্মের) দ্বারা বালকগণ, যৌবনমৃত্যুপ্রদ কর্ম্ম দ্বারা যুবকগণ ও বার্দ্ধক্যমৃত্যুপ্রদ কর্ম্ম দ্বারা বৃদ্ধগণ মৃত্যু প্রাপ্ত হয়[৩১]। যে ব্যক্তি শাস্ত্র শাসনের বশবর্ত্তী

হইয়া স্বকর্ম্মে অবস্থিতি করে, সেই শ্রীমান্ ব্যক্তি শাস্ত্রোক্ত পরমায়ু লাভ করিতে সমর্থ হয়[৩২]। আয়ুঃ পরিসমাপ্ত হইলে যখন অন্তিম দশা উপস্থিত হয়, তখন তাহারা স্ব স্ব কর্ম্ম অনুসারে মর্ম্মচ্ছেদিনী বেদনা অনুভব করে[৩৩]।

প্রবুদ্ধ লীলা বলিলেন, হে চন্দ্রসমাননে! আপনি সংক্ষেপে আমার নিকট মরণ বৃত্তান্ত বর্ণন করুন। মরণদুঃখ কিরূপ? তৎকালে সুখ কিছু আছে কি নাই? মরণের পর কি হয়? এই সকল বৃত্তান্ত শুনিতে আমার মনে বড়ই কৌতুক হইতেছে[৩৪]।

দেবী বলিলেন, পুরুষ (মনুষ্য) তিন্ প্রকার। মূর্খ, ধারণাভ্যাসী ও যুক্তিমান্। * এই তিন্ প্রকার মুমূর্ষু নরের মধ্যে ধারণাভ্যাসী ও যুক্তিযুক্ত, দেহ পরিত্যাগ কালে সুখানুভব ব্যতীত দুঃখানুভব করেন না। কিন্তু যাহারা ধারণাভ্যাসী নহে বা যাহারা যুক্তিযুক্ত নহে, সেই সকল বিষয়নিষ্ঠ মূর্খ ব্যক্তিরাই মৃত্যুকালে আত্মবশ্যতা হারা হইয়া দুঃখ ভোগ করে[৩৫।৩৭]। বাসনার বশীভূত অস্বাধীনচিত্ত ব্যক্তিরা মরণ সময়ে ছিন্ন কুসুমের ন্যায় ম্লানি ও পরম দীনতা প্রাপ্ত হয়[৩৮]। যাহাদিগের বুদ্ধি অশাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানে কলুষিত হইয়াছে, যাহারা অসজ্জন সঙ্গে কালযাপন করিয়াছে, তাহারা মৃত্যুকালে অনলদগ্ধের ন্যায় অন্তর্দ্দাহ অনুভব করে[৩৯]। যখন গলায় ঘড়ঘড়ি চাঁপে ও দৃষ্টি বিকৃত হইয়া যায়, তখন সেই অবিবেকী ও অযতাত্মা (মূঢ়বুদ্ধি) পুরুষেরা বিলক্ষণ দীনচেতা হয়[৪০]। তৎকালে তাহারা দিক্ সকলকে আলোকপরিহীন অন্ধকারময় দর্শন করে, দিবসেও তারকার উদয় দেখে, দিঙ্মণ্ডল মেঘাবৃত দেখে, নভোমণ্ডল শ্যামীভূত (কাল) দেখে, মর্ম্মবেদনায় কাতর হয়, এবং তাহাদের দৃষ্টি তখন উদ্ভ্রান্ত হয়। তাহাতে তাহারা পৃথিবীকে আকাশের ন্যায় ও আকাশকে পৃথিবীর ন্যায় দর্শন করে[৪১।৪২]। দিঙ্মণ্ডল সমুদ্রের আবর্ত্তের

* পুরাণে কথিত আছে, প্রাণ বহির্গমন কালে জীব সহস্র বৃশ্চিক দংশনের যন্ত্রণা অনুভব করে। প্রাণ ও মন এই উভয়কে নাভি, হৃদয়, কণ্ঠ, ভ্রূ ও ব্রহ্মরন্ধ্র এই সকল স্থানে ধারণ করা যাহার অভ্যস্ত হইয়া যায়, তিনি ধারণাভ্যাসী। যিনি ইচ্ছামৃত্যুর ও পরশরীর প্রবেশের কৌশল জানেন এবং যিনি অভিমত লোক গমনের সোপানস্বরূপ নাড়ী পথ জ্ঞাত থাকেন, তিনি যুক্তিযুক্ত বা যুক্তিমান্ নামে খ্যাত। যোগশাস্ত্রের দ্বারা ধারণা শিক্ষার কৌশল ও পরশরীর প্রবেশের নাড়ী জ্ঞাত হওয়া যায়।

ন্যায় ঘূর্ণিত, এবং আপনাকে কখন আকাশে নীয়মান, কখন অন্ধ-কূপে নিপতিত, কখন নিদ্রায় অভিভূত, এবং কখন বা প্রান্তর মধ্যে প্রবেশিত বলিয়া অনুভব করে[৪৩]। আপনার ক্লেশ ও অন্তর্দ্দাহ ব্যক্ত করিতে পারে না, বলিতে পারে না, জড়ীভূত (বর্ণোচ্চারণে অসমর্থ) হইয়া ছিন্ন হৃদয়ের ন্যায় হয়[৪৪]। কখন বাত্যাগৃহীত তৃণের ন্যায় আকাশে উৎপতিত, কখন বা আকাশ হইতে নিপতিত, কখন দ্রুতগতি রথে সমারূঢ়, কখন বা আপনাকে তুষারবৎ গলনোন্মুখ বলিয়া অনুভব করে[৪৫]। তখন তাহারা সংসারকে দুঃখসমাকুল মনে করে, কিন্তু অন্যকে বলিতে পারে না। এই সময়ে তাহারা বান্ধবগণের অস্পৃশ্য হইয়া আপনাকে কখন উর্দ্ধে নিক্ষিপ্ত, কখন প্রক্ষিপ্ত, কখন ক্ষেপণযন্ত্রে ভ্রামিত, কখন বাতযন্ত্রে অবস্থিতের ন্যায় অবস্থিত, কখন ভ্রমিযন্ত্রে রজ্জুর দ্বারা ভ্রামিত, কখন জলাবর্ত্তে বিঘূর্ণিত, কখন শস্ত্রযন্ত্রে সমর্পিত, কখন প্রচণ্ড মারুত দ্বারা উহ্যমান তৃণের ন্যায় ইতস্ততো বাহিত, কখন জলরাশি দ্বারা প্রবাহিত হইয়া অর্ণবে নিপতিত, কখন বা অনন্ত আকাশে, কখন শ্বভ্রে (গর্ত্তে) ও কখন চক্রাবর্ত্তে নিক্ষিপ্ত, কখন বা অব্ধির ও উর্ব্বীর বৈপরীত্য অনুভব করে[৪৬।৪৯]। অর্থাৎ পৃথিবীকে সমুদ্র ও সমুদ্রকে পৃথিবী দেখিয়া ভীত হয়। কখন মনে করে, যেন সে অনবরত উর্দ্ধ হইতে নিম্নে নিপতিত হইতেছে এবং তৎ-পরক্ষণে জ্ঞান হয়, যেন সে অনবরত উর্দ্ধে উৎপতিত হইতেছে। অপিচ, আপনার নিঃশ্বাসের গর্জ্জন শুনিতে পায়, পাইয়া ব্যাকুল ও ইন্দ্রিয়গণে ব্রণবেদনা (ফোড়ার মত ব্যথা) অনুভব করে[৫০]।

দিবাকর অস্তমিত হইলে দিঙ্মণ্ডল যেরূপ শ্যামলবর্ণ হয়, সেই মুমূর্ষু ব্যক্তির দৃষ্টি সেইরূপ শ্যামলীকৃত হইয়া যায়। যেমন পশ্চিম সন্ধ্যান্তে অষ্টদিক্ দৃষ্টিগোচর হয় না, তেমনি, স্মৃতিবিলোপ হওয়ায় সে কিছুই অবগত হইতে পারে না। এই সময়ে সে মনের কল্পনাসামর্থ্য রহিত ও বিবেকহীন হইয়া মহামোহে অর্থাৎ উৎকটতর মূর্চ্ছায় অভিভূত হয়[৫১।৫৩]। যে পর্য্যন্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্তব্ধীভূত না হয়, সেই পর্য্যন্ত তাহারা ঈষন্মূর্চ্ছাবস্থায় অবস্থিতি করে, কিন্তু প্রাণবায়ুর সঞ্চালন রহিত হইলেই প্রগাঢ় মোহে অবিভূত (জ্ঞানশূন্য) হইয়া পড়ে[৫৪]। মোহ, পূর্ব্ব-সংস্কার ও অন্যথাপ্রতিভাস অর্থাৎ ভ্রান্তি, অত্যন্ত পুষ্ট হওয়ায় জীবগণ

এই সময়ে অল্পকালের নিমিত্ত পাষাণের ন্যায় জড় অর্থাৎ বিচেতন হইয়া পড়ে[৫৫]।

প্রবুদ্ধ লীলা বলিলেন, দেবি! এই দেহ অষ্টাঙ্গ (শিরঃ, পাণি, পাদ, গুহ্য, নাভি, হৃদয়, চক্ষু ও কর্ণ) শালী হইয়াও কি নিমিত্ত ব্যথা, মোহ, মূর্চ্ছা, ভ্রম, ব্যাধি ও চেতনহীনতার দ্বারা আক্রান্ত হয়?[৫৬]

দেবী বলিলেন, স্পন্দসংবিৎ অর্থাৎ ক্রিয়াশক্তিমান্ পরমেশ্বর সৃজনকালে এইরূপ ক্রিয়ার সঙ্কল্প (সৃজন) করিয়াছিলেন যে, মদভিন্ন-জীবের অমুক সময়ে অমুক প্রকার দুঃখ হউক। অর্থাৎ মৃত্যুকালে অমুকপ্রকার, বাল্যকালে অমুকপ্রকার, যৌবনে অমুকপ্রকার, বার্দ্ধক্যে অন্যপ্রকার সুখ দুঃখাদি হইবেক। সত্যসঙ্কল্প ভগবানের ঐ সঙ্কল্প স্বভাব ও নিয়তি নামে উক্ত হয়। যেমন স্বকল্পিত তরুগুল্মাদি স্বকীয় দুঃখাদি অনুভবের হেতু হয়, তেমনি, সেই হিরণ্যগর্ব্ভের সঙ্কল্পজাত উপাধিতে (দেহে) অনুপ্রবিষ্ট হিরণ্যগর্ব্ভ জীবভাবে বিরাজিত থাকাতেই উপাধি ঘটিত দুঃখাদি তদীয় দুঃখাদির ন্যায় প্রথিত হইয়া থাকে। অতএব, ঐ বিষয়ে চিতের (চৈতন্যের) বিজৃম্ভণ ব্যতীত অন্য কোন কারণ নাই[৫৭।৫৮]।

এক্ষণে প্রস্তাবিত কথা শ্রবণ কর। যে সময়ে দুর্নির্ব্বার্য্য যন্ত্রণা হয় তখন মৃত্যুযন্ত্রণার প্রতাপে পিত্তাদিরসপ্রপূরিত নাড়ী সকল সঙ্কোচ বিকাশ দ্বারা ভুক্তান্ন পানাদির রস অসমান রূপে গ্রহণ করে। সমান বায়ু তখন আপনার সমীকরণ কার্য্য পরিত্যাগ করেন[৫৯]। যখন বায়ু নাড়ী পথে দেহপ্রবিষ্ট হইয়া আর নির্গত না হয় এবং নির্গত হইয়া আর দেহপ্রবিষ্ট না হয়, অর্থাৎ নিঃশ্বাস প্রশ্বাস স্থগিত হয়, তখন নাড়ীর কার্য্য বন্ধ হইয়া যাওয়ায় বিনাড়ী ও চক্ষুরাদি নিশ্চল নিস্পন্দ হইয়া যায় সুতরাং এই সময়ে ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞান থাকে না। কেবল পূর্ব্বার্জ্জিত জ্ঞানের অস্ফুট সংস্কার মাত্র অন্তরে বিরাজিত থাকে[৬০]। যখন আর অপান বায়ু দেহে প্রবেশ করে না, প্রাণবায়ুও মুখ নাসিকার দ্বারা নির্গত হয় না, এবং নাড়ীস্পন্দন রহিত হয়, তখন তাহাকে "মরিয়াছে" বলে[৬১]। পৌর্ব্বকালিক চিৎসঙ্কল্পরূপ নিয়তিই উক্তপ্রকার মরণের কারণ। মৃত্যু-নিয়তির সংক্ষেপ বিবরণ এই যে, "আমি জন্মিব ও এত কালের পর মরিব" ইত্যাদি[৬২] ও "আমি অমুক স্থানে অমুক প্রকারে অমুক হইব"

ইত্যাদি প্রকার চিৎসংকল্প। যাহা আদি সৃষ্টিকালে প্রকটিত হইয়াছিল, সেই সংকল্প মায়াশক্তির অবিনাশী স্বভাব। তাহার নাশও হয় না, বিশ্লেষও হয় না। অর্থাৎ নিয়তির নিয়ম ভঙ্গ হইবার নহে। আদিসর্গসমুদ্ভূত সম্বিদ্‌নামক জ্ঞান স্বভাব হইতে ভিন্ন নহে এবং স্বভাবরূপ সম্বিদ্ হইতে জন্ম ও মৃত্যু উভয়ে ভিন্ন নহে[৬৩।৬৪]। অতএব, যাবৎ না মুক্তি হয়, তাবৎ জন্মের ও মরণের নিবৃত্তি নাই। যেমন প্রবাহশালী নদীজল কখন কলুষিত (মলিন), কখন নির্ম্মল, কখন অস্থির ও কখন সুস্থির, তেমনি, জীবচৈতন্যও (জীবচৈতন্য=জীবাত্মা) কখন সাধনাদির দ্বারা নির্ম্মল ও কখন জীবধর্ম্ম রাগদ্বেষাদির দ্বারা কলুষিত হইতেছে[৬৫]। যেমন লতাদি উদ্ভিদের মধ্যে মধ্যে গ্রন্থি দেখা যায়, তেমনি, চেতনসত্তারও অর্থাৎ জীবচৈতন্যেরও জন্ম ও মৃত্যুরূপ গ্রন্থি (গাঁইট) উৎপন্ন হইয়া থাকে। যাহা যাহা বলিলাম সমস্তই অজ্ঞানীর নিয়তি। পরন্তু মুক্ত পুরুষ দিগের দর্শনে ঐ সকল মিথ্যা ও অবিদ্যাকল্পিত বলিয়া প্রতিভাত হয়। তাঁহারা জানেন যে, চিদাত্মা কোনও কালে জন্মেন না ও মরেন না। জন্ম মৃত্যু এই দুই কাল্পনিক ভাব তিনি মধ্যে মধ্যে স্বপ্নের ন্যায় অনুভব করেন মাত্র[৬৬।৬৭]। পুরুষ কি? (পুরুষ এস্থলে আত্মা) চেতনা পদার্থ-ই পুরুষ। তাহার বিনাশ হয় না। কোনও কালে বিনাশ হয় না। চেতনা ছাড়া আর কাহাকে তুমি পুরুষ (আত্মা) সংজ্ঞা দিতে পার? অর্থাৎ শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, ইহারা পুরুষ নহে। কারণ, উহারা জড়। জড়, দৃশ্যপ্রকাশে বা দৃশ্য অনুভবে অসমর্থ[৬৮]। অতএব, সাক্ষীর (যে জানে সে সাক্ষী) অভাবে চেতনের মরণ অসিদ্ধ। বল দেখি, এই অনাদি সংসারে এ পর্য্যন্ত কোন্ ব্যক্তি চৈতন্যের মৃত্যু দর্শন করিয়াছে? লক্ষ লক্ষ দেহই মৃত হইতেছে, কিন্তু চৈতন্য অক্ষয়রূপে অবস্থিতি করিতেছে[৬৯]। মরা বাঁচা কি? মরা বাঁচা বাসনার বৈচিত্র্য ব্যতীত অন্য কিছু নহে। সুতরাং কোনও জীবের বাস্তব মৃত্যু ও বাস্তব জন্ম হয় না। তাহারা কেবল স্ব স্ব বাসনার অনুরূপ স্বকল্পিত গর্ত্তে পুনঃ পুনঃ লুণ্ঠিত হয় মাত্র[৭০।৭২]। * দৃঢ় বিচার দ্বারা দৃশ্য বস্তুর অত্যন্ত

---

* ভাবার্থ এই যে, শরীর, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত, এ সকলের কোনওটী পুরুষ নহে। কেন না ঐ সকল গুলিই জড়। উহারা বস্তু প্রকাশ করে না ও স্বয়ং ভোগ বা অনুভব করে না। কাযেই মানিতে হয়, চেতনাই পুরুষ (আত্মা)। কেননা, চৈতন্যই সর্ব্ব

অসম্ভব বোধ সমুদিত হইলে বাসনা সকল বিনাশ প্রাপ্ত হয়। বাসনার বিনাশ হইলে তখন আর দৃশ্যসত্যতা দৃশ্যদর্শন থাকে না। জীব গুরূপদেশ শ্রবণাদি ও অভ্যাস বৈরাগ্যাদির দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া এই মিথ্যা সমুদিত জগৎপ্রবন্ধকে অনুদিত মনে করিয়া দ্বৈতবাসনা-বিহীন হন, অনন্তর ভবভয় হইতে মুক্ত হন৭৩।৭৪।

সাক্ষী। সুতরাং "চেতন মরে" এ সিদ্ধান্ত অসাক্ষীক। অর্থাৎ প্রমাণাভাব। চেতনা শরীর-মরণেরই সাক্ষ্যদাত্রী, চেতনা মরণের সাক্ষ্যদাত্রী নহে। কবে কে কোথায় চেতনা মরিতে দেখিয়াছে? মরণ কি? বিনাশের নাম মরণ? কি দেহান্তর প্রাপ্তির নাম মরণ? বিনাশ পক্ষে চেতনার স্বতঃ বিনাশ ও পরতঃ বিনাশ উভয়ই অসঙ্গত। দেহান্তর প্রাপ্তি পক্ষও চেতনার অমরত্ব ব্যতীত অসম্ভব হইবে। প্রতি দেহে চেতনা বিভিন্ন, এ পক্ষে বিশিষ্ট প্রমাণ না থাকায় একচৈতন্য পক্ষে শ্রৌত প্রমাণ থাকায়, চৈতন্যের মরণ পক্ষে, একের মরণে সকলের মরণ না হয় কেন? ইত্যাদি আপত্তি হয়। যেহেতু একের মরণে সর্ব্ব মরণ নিষ্পন্ন হয় না সেইহেতু, পুরুষের মরণ নহে, দেহাদিরই মরণ, পুরুষের কল্পনামাত্র।

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ।

প্রবুদ্ধ লীলা বলিলেন, হে দেবেশি! জন্তু যে প্রকারে মরে ও যে প্রকারে জন্মে, এই দুইটী বিষয় আমার বোধবৃদ্ধির নিমিত্ত পুনর্ব্বার বলুন[১]।

দেবী বলিলেন, বৎসে! শ্রবণ কর। নাড়ীপ্রবাহ (নাড়ীর গতি) রুদ্ধ হইলে জন্তুগণ যখন প্রাণবায়ুর প্রশান্তি প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ যখন প্রাণবায়ু আর স্বকীয় চলনস্বভাবে থাকে না, তখন তদনুগত চেতনাও উপশান্তপ্রায় পরিদৃষ্ট হয়। চেতনার অভিব্যঞ্জক অন্তঃকরণাদি তখন বিনষ্ট হইয়া যায়, সেই কারণে প্রতীত হয়, যেন চেতনাও বিনষ্ট হইয়াছে। ফলতঃ যাহা চেতনা তাহা শুদ্ধস্বভাব ও নিত্য। তাহা উৎপন্ন ও বিনষ্ট, উদিত বা দৃশ্য হয় না। তাহা স্থাবর, জঙ্গম, আকাশ, শৈল ও অগ্নি প্রভৃতি সকল পদার্থে অবস্থিতি করিতেছে[২।৩]। শরীরে শারীর বায়ুর অবরোধ হইলেই শরীরের স্পন্দনাদি প্রশান্ত হয়। সেই প্রশান্তির নাম 'মরণ[৪]। শরীর তখন যে জড় সেই জড় হয় এবং শব নামে অভিহিত হয়। প্রাণবায়ু ঐরূপে মহাবায়ুতে বিলীন হইলে এবং দেহ শবীভূত হইয়া পৃথক্ নিপতিত হইলে, জীবচেতনা তখন পূর্ব্বোপার্জ্জিত বাসনাসংশ্লিষ্ট পরমাত্মায় অবস্থান করে[৫]। জীবচেতনা পৃথক্ পদার্থ না হইলেও জন্মবীজ বাসনা যুক্ত হওয়ায় পৃথকের ন্যায় ব্যবহার গোচর হয়। সেইজন্য তদবচ্ছিন্ন (বাসনাবিশিষ্ট) চেতনাকে জীব বলা যায়। এই জীব স্বস্থানে থাকিয়াই বাসনার দ্বারা পরলোক গমনাগমন অনুভব করে, বাস্তব গমনাগমন করে না। তাহার দৃষ্টান্ত—যেমন সেই শবগৃহের আকাশে তোমার সেই ভর্ত্তৃজীব সেই বাসগৃহে অবস্থিত থাকিয়াও বাসনা অনুসারে পরলোক গমনাদি অনুভব করিতেছে।

অনন্তর সেই তৎশরীরাভিমানত্যাগী জীব ব্যবহারিগণ কর্ত্তৃক প্রেত ও মৃত শব্দে অভিহিত হয়। যে প্রকার বায়ুতে সুগন্ধ থাকে, সেই প্রকার, চেতনে জীববাসনা বিদ্যমান থাকে[৬।৭]। * জীব যে সময়ে

* পুষ্পাদির সহিত বায়ুসংযুক্ত হওয়ায় পুষ্পাদির গন্ধ বায়ুতে মিলিত হয়। চেতনাও

এতদ্দৃশ্যের দর্শন (পূর্ব্বদেহাদির অভিমান) পরিত্যাগ করিয়া অন্য দৃশ্য দর্শনে (অন্য দেহাদি অনুভবে) প্রবৃত্ত হয়, সেই সময়েই সে আপনিই আপনাতে আপনার বাসনানুরূপ কল্পিত পরলোক ও সে লোকের ভোগ্যাদি দেখিতে পায়[৮]। অপিচ, সেই জীব আবার সেই লোকান্তরে তজ্জন্মের সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া পুনর্ব্বার মৃতিমূর্চ্ছা অনুভব করতঃ অন্য শরীর অনুভব করিয়া থাকে[৯]। এই অসীম আকাশ, অথবা এই আকাশ ও পৃথিবী, কিংবা চন্দ্রসূর্য্যগ্রহনক্ষত্রাদি কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড, সমস্তই মায়ার প্রভাবে আত্মায় সংঘট্টিত অর্থাৎ চিত্রিত হইয়া রহিয়াছে বটে; পরন্তু আকাশ ও পৃথিবী অথবা সমুদায় বিশ্ব মৃত পুরুষের আত্মায় আকাশে মেঘঘটার ন্যায় দৃষ্ট হইয়া থাকে। অন্য লোক তাহা দেখিতে পায় না। অন্য লোক কেবল গৃহাকাশই দেখে[১০]।

লীলে! প্রেত ছয় প্রকার। আমি সেই ষড়্বিধ প্রেতের ভেদ বর্ণন করি, শ্রবণ কর। সামান্য পাপী, মধ্যপাপী, স্থূলপাপী, সামান্যধার্ম্মিক, মধ্যধার্ম্মিক ও উত্তমধর্ম্মবান্। এই ষড়্বিধ প্রেতের মধ্যে কোন কোন প্রেত আরও দুই তিন বিভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে[১১।১২]। পাপাত্মা গণের মধ্যে কোন কোন মহাপাতকী এক বৎসর পর্য্যন্ত মরণমূর্চ্ছায় পাষাণের ন্যায় জড়ীভূত হইয়া থাকে। অনন্তর যথাকালে জাগরিত হয়, হইযা বাসনার জঠরে অবস্থান করতঃ অসংখ্য নরকদুঃখ অনুভব ও শত শত যোনিতে জন্মগ্রহণ ও নানাপ্রকার দুঃসহ যন্ত্রণা অনুভব ও সহ্য করিতে থাকে। পরে কাল কালান্তরে ভোগাবসানে কদাচিৎ কাহার সংসাররূপ স্বপ্ন বা বিভ্রম শমতা প্রাপ্ত হয়[১৩।১৫]। কোন কোন পাতকী মরণমূর্চ্ছার পরক্ষণেই হৃদয়ে জড়দুঃখসমাবিষ্ট বৃক্ষাদিভাব অনুভব করে। অনন্তর বাসনানুরূপ দুঃখপরম্পরা অনুভব করতঃ নরক ভোগান্তে দীর্ঘকালের পর পুনর্ব্বার ভূতলে জন্মগ্রহণ করে[১৬।১৭]।

ষড়্বিধ প্রেতের মধ্যে যাহারা মধ্যপাপী, তাহারা মরণমোহের পর কিঞ্চিৎকাল শিলাজঠরের ন্যায় জাড্য (মূর্চ্ছা) অনুভব করতঃ পরে পুনর্ব্বার চৈতন্য লাভ করে। করিয়া তির্য্যগাদি যোনিতে জন্ম গ্রহণ করতঃ সংসার ক্লেশ অনুভব করিতে থাকে[১৮।১৯]। যাহারা সামান্য পাতকী, তাহারা মৃত হইয়াই স্বপ্নের ও সঙ্কল্পের ন্যায় মনুষ্যদেহ অনুভব

অন্তঃকরণরূপ উপাধিতে অভ্যন্তররূপে মিলিত থাকায় অন্তঃকরণস্থ বাসনাবিশিষ্টের ন্যায় হন।

করতঃ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে জন্ম, মরণ ও ভোগ্যাদি স্মরণ করিতে থাকে[২০]।[২১]। যাহারা মহাপুণ্যশীল, তাহারা মৃতিমোহের পর স্মৃতির দ্বারা স্বর্গস্থিত-বিদ্যাধরীগণের অন্তঃপুর অনুভব করিতে থাকে[২২]; অনন্তর সেই সেই স্বর্গ শরীর লাভ করতঃ কর্ম্মানুযায়ী ফলভোগ করতঃ পুনর্ব্বার মনুষ্যলোকে সজ্জনাস্পদে শ্রীসম্পন্ন হইয়া জন্মগ্রহণ করে[২৩]। যাঁহারা মধ্যমধার্ম্মিক, তাঁহারা মরণানন্তর ওষধিপ্রধান স্থানে অর্থাৎ সুন্দর নন্দন কাননাদিতে কিন্নরাদি জন্ম লাভ করেন এবং তত্রস্থ ফলভোগ অবসানে তথা হইতে প্রচ্যুত হইয়া খাদ্যের সংশ্লেষে রেতঃশালী ব্রাহ্মণাদি নরগণের হৃদয়ে প্রবেশ পূর্ব্বক কিছুকাল অবস্থান করতঃ যথাকালে তাহাদিগের স্ত্রীগণের ক্রমোপচিত গর্ভে জন্মগ্রহণ করে[২৪]।[২৫]। মৃতব্যক্তিগণ সকলেই উক্তপ্রকারে স্ব স্ব জ্ঞানকর্ম্ম সংস্কারের অনুরূপ গতি প্রাপ্ত হয়, ইহা অবগত হও। ষড়্‌বিধ প্রেতের মধ্যে চতুর্থ প্রেতের গতিও ঐ ব্যবস্থার অনুরূপ। অর্থাৎ সকলেই মরণ মূর্চ্ছার অব্যবহিত পরে চেতনা লাভের পর অন্তঃকরণ মধ্যে ক্রমে ও অক্রমে ভবিষ্যৎ দেহ ও ভোগ্যাদি স্বপ্নের ও সঙ্কল্পের ন্যায় অনুভব করিতে থাকে, পরে তদনুরূপ স্থান ও দেহাদি লাভ করিয়া পরিপুষ্ট ভোগ প্রাপ্ত হয়[২৬]। তাহারা মরণের পর, পর পর যে প্রকার অনুভব করে তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। তাহারা মূর্চ্ছা ভঙ্গের পর প্রথমে মনে করে, আমরা মরিয়াছি। পরে দাহ কার্য্যের পর পুত্রাদি কর্ত্তৃক পিণ্ড প্রদানাদি কার্য্য সমাপিত হইলে অনুভব করে, আমার শরীর হইয়াছে। তৎপরে যমালয় গমন অনুভব করিতে থাকে। যেন কালপাশ সমন্বিত যমদূতেরা তাহাকে যমরাজ সকাশে লইয়া যাইতেছে। ক্রমে তাহারা পাথেয় শ্রাদ্ধের (পথে সম্বল স্বরূপ মাসিক শ্রাদ্ধের) দ্বারা তর্পিত হইয়া এক বৎসরে যমালয় প্রাপ্ত হয়[২৭]।[২৮]। উত্তম পুণ্যবান্ প্রেতগণ স্বীয় উত্তম কর্ম্মের প্রভাবে পথিমধ্যে সুন্দর উদ্যান সকল ও সুশোভন বিমানরাজি অনুভব করে এবং মহাপাতকিগণ স্বীয় দুষ্কৃত কর্ম্মের প্রভাবে হিম, তপ্তবালুকা, কণ্টক, শ্বভ্র (গর্ত্তাদি) ও শস্ত্রসঙ্কুল অরণ্যাদি দর্শন করে এবং মধ্যমপুণ্যশীলেরা "এই আমার সুশীতল নব নব তৃণসমাচ্ছাদিত পদগমন যোগ্য ও সুখপ্রদ পন্থা ও স্নিগ্ধচ্ছায়াসম্পন্ন বাপিকা সম্মুখে সংস্থাপিত রহিয়াছে; আমি এই যমপুরে আগমন করিয়াছি; এই আমার সম্মুখবর্ত্তী লোকপ্রসিদ্ধ যম, এই সভায় চিত্রগুপ্তাদির দ্বারা

আমার প্রাক্তন কর্ম্মের বিচার হইতেছে।" ইত্যাদি প্রকার অনুভব করে[২৯।৩২]। মরণের পর যে পারলৌকিক অনুভব হয়, তাহা সকলের সমান নহে। প্রতি পুরুষে বিভিন্ন। কর্ম্মানুসারে যাহার যেরূপ প্রতীতি উৎপন্ন হয় সে তদনুরূপ সংসারগতি অনুভব করে ও পরে জন্মাদি প্রাপ্ত হয়। পরন্তু সকলেই এই অশেষপদার্থাচারসম্পন্ন বিশাল সংসার খণ্ডকে সত্য বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে। তাহাদের যদি স্বরূপ দৃষ্টি (আত্মজ্ঞান) থাকিত, তাহা হইলে তাহারা বুঝিতে পারিত—এক মাত্র আকাশসদৃশ অমূর্ত্ত অদ্বয় আত্মাই প্রবুদ্ধ রহিয়াছেন এবং দেশ, কাল, ক্রিয়া ও হ্রস্বদীর্ঘাদি আকার বিশিষ্ট দৃশ্য সমূহ অর্থাৎ জগৎ প্রপঞ্চ সত্য নহে[৩৩।৩৪]।

অনন্তর তাহারা "আমি যমরাজ কর্ত্তৃক স্বকর্ম্মফলভোগার্থ আদিষ্ট হইয়াছি" "আমি এখন এই যমসভা হইতে স্বর্গে অথবা নরকে চলিলাম।" "আমি যমরাজনির্দ্দিষ্ট সুখজনক স্বর্গ বা দুঃখজনক নরক ভোগ করিতেছি।" "আমি যমরাজের আজ্ঞায় স্বর্গ অথবা নরক ভোগের উপযুক্ত যোনিজন্ম প্রাপ্ত হইলাম।" "পুনর্ব্বার আমি মানবীয় সংসারে প্রাদুর্ভূত হইতেছি।" এই পর্য্যন্ত অনুভবের পর মেঘনির্ম্মুক্ত জলাদির সহিত পৃথিবীতে আইসে ও শস্যাদিমধ্যে প্রবেশ করে। তখন, "আমি ব্রীহ্যাদিগত হইয়াছি" "অঙ্কুরস্থ হইলাম।" "ক্রমে ফলমধ্যগত হইলাম।" "এখন আমি ফলে অবস্থিতি করিতেছি।" এ সকল ঘটনা স্মরণ করিতে পারে না। কারণ, বোধ শক্তি তখন লুপ্তকল্প হইয়া যায়। তৎকালে ঐ সকল ঘটনার বিস্পষ্ট জ্ঞান না থাকিলেও উত্তরকালীন মনুষ্য শরীরে শ্রুতি পুরাণাদি শ্রবণ জন্য বোধ প্রাপ্ত হইলে তখন ঐ সকল ক্রম স্মরণ করিতে পারে। যখন ব্রীহ্যাদিতে অবস্থিতি করে তখন ঐ সকল বোধ লুপ্ত থাকে। কারণ এই যে, ইন্দ্রিয়গণ লুপ্ত বা মূর্চ্ছিত থাকায় সে (জীব) তখন আপনার শস্যাদিভাব প্রাপ্তি বুঝিতে পারে না। তৎপরে ভুক্তান্নপানের দ্বারা পিতৃশরীরে প্রবেশ করে, ক্রমে তৎশরীরে রেতোভাব প্রাপ্ত হয়। সেই রেতঃ যোনি পথে মাতৃশরীরে গিয়া গর্ভভাব ধারণ করে[৩৫।৩৮]। অনন্তর সেই গর্ভ পূর্ব্বকর্ম্মানুসারে সুখসৌভাগ্যাদিসম্পন্ন সাধুচরিত্র অথবা তদ্বিপরীত বালকরূপে প্রসূত হয়[৩৯]। তদনন্তর তাহার চন্দ্রপ্রভার ন্যায় উপচয় অপচয় হইতে থাকে ও শীঘ্র শীঘ্রই ক্ষয়শীল ও চঞ্চল যৌবন কাল সমাগত হয়। অনন্তর পদ্মমুখে

হিম নিপাতের ন্যায় সেই দেহ আবার জরাকর্তৃক আক্রান্ত হয়। তৎপরে বিবিধ ব্যাধি কর্তৃক আক্রান্ত হয়। আবার মরণমূর্চ্ছা অনুভব করতঃ আবার বন্ধুদত্ত ঔর্দ্ধদেহিক পিণ্ডাদির দ্বারা ভোগ দেহ ধারণ করতঃ পুনর্ব্বার যমলোকে গমন করে। মরণের পর পিণ্ডদানাদির দ্বারা যে দেহ হয়, সে দেহ অস্থিচর্ম্মাদি নির্ম্মিত স্থূল দেহ নহে; তাহা বাসনাময় বা ভাবময় আতিবাহিক অর্থাৎ সূক্ষ্ম দেহ।

জীব ঐ প্রকারে নানা যোনিতে পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইয়া ভূয়োভূয় ঐরূপ অসংখ্য ভ্রমপরম্পরা অনুভব করিয়া থাকে। ব্যোমরূপী জীব যাবৎ মুক্ত না হয় তাবৎ চিদ্ব্যোমে সে পুনঃ পুনঃ ঐরূপ ঐরূপ পরিবর্ত্তন অনুভব করিতে থাকে[৪০।৪৩]।

প্রবুদ্ধ লীলা বলিলেন, হে দেবি! সৃষ্টির আদিতে যে প্রকারে আদি (প্রথম) ভ্রম প্রবর্ত্তিত হয়, আপনি প্রসন্ন হইয়া তাহা আমার বোধ বৃদ্ধির নিমিত্ত কীর্ত্তন করুন[৪৪]। দেবী বলিলেন, শৈল, দ্রুম, পৃথিবী, আকাশ, এ সমস্তই পরমার্থঘন অর্থাৎ বিশুদ্ধ চৈতন্য। বিশুদ্ধ চৈতন্যেই এই সকল মায়িক প্রতিভাস মায়ার প্রভাবে উদিত হয়। চেতনাপ্রচুর ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী। তিনি যখন যে স্থানে যে আকারে উদিত হন তখন সেই আকারেই প্রথিত হন। তিনি স্বপ্ন অথবা সঙ্কল্পবান্ পুরুষের ন্যায় জীবসমষ্টিরূপ প্রজাপতি হইয়া সৃজ্যসঙ্কল্পবান্ হন, হইয়া সপ্তলোকাকারে বিবর্ত্তিত হন। * তাঁহার সৃষ্টিকালের সেই সংকল্প অদ্যাপি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। ঈশ্বরের (মায়াসমন্বিত ব্রহ্মের) প্রথম সাঙ্কল্পিক রূপ প্রজাপতি। ইনি ঈশ্বরেরই প্রতিবিম্বস্বরূপ। তাদৃশ প্রজাপতি হইতে যাহা কিছু বিবর্ত্তিত হইয়াছে সে সমস্তই অদ্যাপি বিদ্যমান আছে[৪৫।৪৮]। স্থাবর জঙ্গম আর কিছুই নহে; যাহারা দেহস্থিত বাতযন্ত্রগত অনিল কর্তৃক পরিস্পন্দিত হয়, তাঁহাদিগকে জঙ্গম বলা যায় এবং যাহারা নিস্পন্দ, তাহা দিগকে স্থাবর নাম দেওয়া যায়। বৃক্ষ প্রভৃতি স্থাবরেরা চেতনাবান্ হইলেও স্পন্দরহিত বলিয়া প্রথমাবধিই স্থাবর ও অচেতন নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে[৪৯।৫০]। সেই পরাৎপর পরমেশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্টির আদিতে কথিত প্রকারের চেতনাচেতন বিভাগ নির্দ্দিষ্ট

* বিবর্ত্তন—যাহা ভ্রান্তি জ্ঞানে দেখা যায়। রজ্জুতে যে সর্প দেখা যায়, তাহা বিবর্ত্তন। যেমন রজ্জু সর্পাকারে বিবর্ত্তিত হয়, তেমনি, প্রজাপতি ও সৃষ্টির আকারে বিবর্ত্তিত হন।

হইয়াছিল। যে চিদাকাশ ঐরূপ জীব ও অজীব এই দুই বিভাগ কল্পনা করিয়াছেন এবং তিনি আপনার যে অংশে জীবনামক বিভাগ কল্পনা করিয়াছেন, সেই চিদাকাশই এতৎশাস্ত্রের সম্বিদ্। সম্বিদ্ কোনও কালে ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না[৫১]। সেই বুদ্ধ্যনুপ্রবিষ্ট চিদাকাশ ঔপাধিক নরশরীররূপ পুর প্রাপ্তির অনন্তর চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সকল প্রাপ্ত হইয়া চক্ষুরাদিজনিত বৃত্তির দ্বারা বাহ্যজ্ঞান প্রকাশিত করিতেছেন। সেইজন্য চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় স্বয়ং চেতন নহে[৫২]। অতএব, বুঝিতে হইবে যে, সর্ব্ববস্তু ব্যবস্থাপক চিৎসঙ্কল্পই এই বিশ্বশৃঙ্খলার কারণ। শূন্যাকার চিৎসঙ্কল্পই আকাশ, ভূম্যাকার চিৎসঙ্কল্পই ভূমি, এবং জলশক্তিসম্পন্ন চিৎকল্পই জল। তিনিই জঙ্গমসঙ্কল্প দ্বারা জঙ্গম ও স্থাবর সঙ্কল্প দ্বারা স্থাবর। চিৎশক্তি এবম্প্রকারে বৃক্ষ ও শিলা প্রভৃতি মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন। চিৎশক্তি যখন যেরূপ সঙ্কল্প করেন, তখন সেইরূপেই অবস্থিতি করেন[৫৩।৫৪]। অতএব, পৃথক্ জড় অথবা পৃথক্ চেতন নাই এবং আদিসৃষ্টি হইতেই জড়ের সহিত চেতনের সত্তাসামান্যের (অস্তিতার) অভেদ রহিয়াছে[৫৫।৫৭]। এই বৃক্ষ, এই শৈল, এ সকল অন্তঃসম্বিদ্ বুদ্ধ্যাদির দ্বারাই বিহিত অর্থাৎ পরিকল্পিত এবং উহাদের নাম ও রূপাদি, সমস্তই তৎকৃত অর্থাৎ তাহারই কল্পনা প্রসূত। সম্বিদন্তর্গত তথাবিধ স্থাবরাদির বৃক্ষ, শৈল, ইত্যাদি নাম, সঙ্কেত ব্যতীত অন্য কিছু নহে[৫৮।৫৯]। স্ব স্ব অন্তঃসম্বিদ্-ই বুদ্ধি এবং তাদৃশী বুদ্ধিই বিকার ভেদে কীট, পতঙ্গ, ইত্যাদি নামোল্লেখীনী হইয়া বিরাজ করিতেছে[৬০]। বস্তুতঃ ঐ সমুদয় পদার্থান্তর নহে। যেমন কেহ না জানাইয়া দিলে উত্তরসমুদ্রতীরবাসীরা দক্ষিণসমুদ্রতীরবাসী দিগের স্থিতি জানিতে পারে না, তেমনি, এই সমস্ত স্থাবর ও জঙ্গম সম্বিৎ ব্যতীত সত্তাস্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয় না। সকলেই আপন আপন চৈতন্যসাক্ষিক জ্ঞান লইয়াই অবস্থিত সুতরাং অন্যবুদ্ধির কল্পনা অবগত নহে। এই উদাহরণের দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, সমুদায় ব্যবহারই পরস্পর পরস্পরের বুদ্ধিসঙ্কেত সাপেক্ষ[৬১।৬২]। আরও বুঝিতে হইবে যে, সচ্চিদ্রূপ পরব্রহ্মে বায়ু প্রভৃতি জড়পদার্থের বাস্তব সত্তা না থাকিলেও ঐ সকল কাল্পনিক সত্তায় অনুস্যূত এবং তাহা প্রোক্ত কারণে অসম্ভব নহে। যেমন প্রস্তরমধ্যবর্ত্তী ভেক * ও তদ্বহিস্থ ভেক পরস্পর পরস্পরের কল্পনায় অন্তঃসম্বেদনশূন্য ও

* পাথরের মধ্যে ও বৃক্ষের গুঁড়ির মধ্যে ভেক থাকিতে দেখা যায়। সে সকল ভেক

জড়, স্থিতিশীল সমুদায় পদার্থ সম্বন্ধে সেইরূপ জানিবে[৬৩]। মহাপ্রলয়ে মায়ার অন্তরে বিলীন সর্ব্বাত্মক সর্ব্বগত সমষ্টি চিত্ত, যাহা এই জগতের সূক্ষ্মাবস্থা, পুনঃ সৃষ্টির প্রারম্ভে তাহা প্রত্যক্‌চৈতন্যনামক চিদাকাশ দ্বারা যেরূপে ও যে যে ভাবে চেতিত হইয়াছিল তাহা অদ্যাপি সেইরূপে ও সেই ভাবে চেতিত (অনুভূত) হইয়া আসিতেছে। সৃষ্টারম্ভে যাহা স্পন্দনাত্মা বায়ুরূপে চেতিত বা বিস্তৃত হইয়াছিল, এখনও তাহা বায়ুরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। যাহা সুষির ভাবে (সুষির=ফাঁক) চেতিত (বিস্তৃত) হইয়াছিল, তাহা এখনও আকাশ নামে ব্যবহৃত হইতেছে। এই আকাশে স্পন্দাত্মা মারুত অদ্যাপি অবস্থিতি করিতেছে। যেমন সর্ব্বব্যাপী সদাগতি (চলনশীল বায়ু) সর্ব্বত্র থাকিলেও তদ্দ্বারা শুষ্ক তৃণাদি লঘু পদার্থ ব্যতীত অলঘু পদার্থ সকল স্পন্দিত হয় না, অর্থাৎ প্রস্তররাশি স্পন্দিত হয় না, তেমনি, চিত্তও সর্ব্বগামী বা সর্ব্বত্রাবস্থিত থাকিলেও শারীর বায়ুর প্রচলন ও অপ্রচলন হেতু স্থাবর ও জঙ্গম এই দুই বিশেষ ভাব ধারণ করিয়াছে। * বায়ুর স্পন্দন স্থাবরে নাই[৬৪।৬৫]। † এইরূপে সেই সম্বিৎ চৈতন্যে ভ্রমময় বিশ্বের যে যে পদার্থ কিরণের ন্যায় আদিসৃষ্টি কালে যে যে রূপে স্ফুরিত হইয়াছিল, সেই সেই প্রস্ফুরণ অদ্যাপি চলিতেছে[৬৭]। লীলে! দৃশ্য বিশ্ব স্বভাবের বিলাস ও মিথ্যা হইলেও যে প্রকারে সত্যের ন্যায় অনুভূত হয় তাহা তোমার নিকট বর্ণন করিলাম। এখন দেখ, রাজা বিদূরথ মরণোন্মুখ হইয়াছেন। ঐ দেখ, তিনি মৃত হইয়া সেই পুষ্পমালাসমাচ্ছাদিত শবীভূত তোমার সেই ভর্ত্তা পদ্মনৃপতির হৃদ্‌পদ্মে যাইবার উপক্রম করিতেছেন[৬৮।৬৯]।

কূপস্থিত ভেক দিগকে জানে না এবং কূপের ভেকেরাও প্রস্তরমধ্যবাসী ভেক দিগকে জানে না। সুতরাং তাহারা ঐ বিষয়ে সম্বেদন শূন্য অর্থাৎ জড়। এ উদাহরণের তাৎপর্য্য—বুদ্ধি যাহা কল্পনা করে তাহাই তাহার নিকট আছে এবং যাহা কল্পনা করে না, তাহা তাহার বোধে নাই বলিয়া স্থির থাকে। এ অনুসারে সমুদায় দৃশ্যই বৌদ্ধ অর্থাৎ বুদ্ধির কল্পনা সুতরাং অসৎ।

* বৃক্ষাদি স্থাবর জীবে জীবত্ব আছে অর্থাৎ চৈতন্য আছে। কেবল প্রাণ নাই। অর্থাৎ স্থাবর দেহে প্রাণ ও অন্তঃকরণ প্রভৃতির কার্য্য করিবার যন্ত্র নাই। সেইজন্য পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন, প্রস্তরাদিতেও চৈতন্য আছে, পরন্তু সে চৈতন্য উপযুক্ত আধারের অভাবে অব্যক্ত।

† বায়ু শব্দের অর্থ অধ্যাত্মবায়ু অর্থাৎ শরীরস্থ প্রাণবায়ু। স্থাবরে প্রাণযন্ত্রের অভাব বশতঃ বায়ুর স্পন্দন সামর্থ্য অবরুদ্ধ আছে।

প্রবুদ্ধ লীলা কহিলেন, দেবেশ্বরি! আসুন, ইনি কোন্ পথ দিয়া শবগৃহে গমন করেন, তাহা আমরা উভয়ে শীঘ্র গিয়া দর্শন করি[১০]। দেবী বলিলেন, ঐ চিন্ময় জীব অন্তরস্থ বাসনাময় দেহ ও পথ অবলম্বন করিয়া যাইতেছেন। ভাবিতেছেন, "আমি দূরস্থ অপর লোকে গমন করিতেছি।" আইস, আমরাও ঐ পথ দিয়া গমন করি। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। ইচ্ছাবিচ্ছেদ হইলে পরস্পরের সৌহার্দ্দ বন্ধন ছিন্ন হইতে পারে[১১।১২]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রামচন্দ্র! শ্রবণ কর। সরস্বতীর ঐরূপ বাক্য-পরম্পরার দ্বারা লীলার নির্ম্মল অন্তঃস্থ সকল সন্তাপ তিরোহিত ও বিরোধরূপ সূর্য্য (বিরোধ অর্থাৎ আশঙ্কা) অস্তমিত হইল। ঐ অবসরে নৃপতি বিদূরথ বিগলিতচিত্ত, মূর্চ্ছিত ও বিচেতন হইয়া পড়িলেন[১৩]।

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

ষট্পঞ্চাশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, অনন্তর রাজা বিদূরথ ক্রমে সংজ্ঞাশূন্য হইলেন এবং তাঁহার চক্ষুঃ স্পন্দরহিত হইল। অধর রাগহীন, শরীর শুষ্ক, জীর্ণ ও শুষ্ক পত্রের ন্যায় আভাবিশিষ্ট ও মুখ পাণ্ডুরবর্ণ হইল। কেবল প্রাণমাত্র অবশিষ্ট আছে, আর কিছু নাই। প্রাণবায়ু এখনও ভৃঙ্গ-কূজনের ন্যায় ধ্বনি সহকারে প্রবাহিত হইতেছে১।২। (ভৃঙ্গকূজন= ভ্রমরের শব্দ) কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি মরণমূর্চ্ছায় আক্রান্ত হইয়া আপনাকে অন্ধকূপে নিমগ্নের ন্যায় বোধ করিতে লাগিলেন। তন্মুহূর্ত্তেই দেখা গেল, রাজার সমুদায় ইন্দ্রিয় বৃত্তিবিরহিত ও অন্তর্ব্বিলীন হইয়া গিয়াছে। এখন তিনি অচেতন ও চিত্রন্যস্ত আকৃতির ন্যায় অথবা প্রস্তরে উৎকীর্ণ মূর্ত্তির ন্যায় নিশ্চল ও নিষ্পন্দ৩।৪। অধিক কি বলিব, প্রাণবায়ু এখন অতি সূক্ষ্ম ছিদ্র পথে সেই রাজশরীর হইতে উৎক্রান্ত হইয়াছে। পক্ষী যেমন নিজ বাসবৃক্ষে যাইবার ইচ্ছায় আকাশে উৎপতিত হয়, উড্ডয়ন করে, রাজার প্রাণবায়ুসম্বলিত জীব সেইরূপে নভোগত হইল৫। সেই দুই ললনা সেই নভোগত প্রাণময়ী জীবসম্বিদ্‌কে স্ব স্ব দিব্য দৃষ্টির দ্বারা অবলোকন করিলেন। দেখিলেন, যেমন বায়ুতে সূক্ষ্ম পরিমল (সুগন্ধ) অবস্থিতি করে, সেইরূপে সেই জীব সংবিৎ নিতান্ত সূক্ষ্ম ও আকাশে অবস্থিত হইয়াছে৬। অনন্তর সেই 'জীবসম্বিদ্ আকাশে বায়ুর সহিত মিলিত হইয়া বাসনাস্বরূপ দূরতর আকাশপথে গমন করিতে আরম্ভ করিল৭। যেমন ভ্রমরীযুগল বাতসংলগ্ন গন্ধলেশের অনুসরণ করে, তাহার ন্যায় সেই রমণীদ্বয় সেই জীবসম্বিদের অনুসারিণী হইলেন৮। অনন্তর বায়ুবাহিত গন্ধলেখার ন্যায় বায়ুবাহিত সেই জীবসম্বিদ্ মুহূর্ত্তমধ্যে মরণমূর্চ্ছা অবসান হওয়ায় স্বপ্নের তুল্য বোধ (জ্ঞান) প্রাপ্ত হইলেন। (যেমন স্বপ্ন দেখা যায়, ঠিক্ সেইরূপ দেখিতে লাগিলেন)। তিনি দেখিলেন, কতকগুলি যমদূত কর্ত্তৃক তিনি নীত হইতেছেন, এবং বন্ধুদত্ত পিণ্ডাদির দ্বারা যেন তাঁহার শরীর উৎপন্ন হইয়াছে৯।১০। অনন্তর সেই জীবসম্বিদ্ দক্ষিণ মার্গের

অতিদূরে অবস্থিত প্রাণিগণের কৃত কর্ম্মের বিচার স্থান ও বিচার্য্য জীবে পরিপূর্ণ যমপুরী প্রাপ্ত হইলেন[১১]। বৈবস্বত পুরী প্রাপ্ত হইলে যমরাজ দূত দিগকে আদেশ প্রদান করিলেন, ইহার কর্ম্ম অনুসন্ধান কর। তাহারা অনুসন্ধান করিয়া দেখিল, এবং বলিল, ইহার কিছুমাত্র পাপ নাই। কেননা, ইনি প্রতিদিন লোভাদি দোষ রহিত হইয়া অকলুষিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন এবং ভগবতী সরস্বতীর বরে সংবর্দ্ধিত হইয়াছেন[১২।১৩]। ইহার শবীভূত প্রাক্তন দেহ তদ্‌গৃহাকাশে কুসুমসমাচ্ছাদিত রহিয়াছে। অনন্তর যমরাজ আজ্ঞা প্রদান করিলেন, আমার এই দূতেরা এই বিদূরথ জীবকে পরিত্যাগ করুক[১৪]। (এ দিকে লীলা ও সরস্বতী যমরাজের অলক্ষ্যে অথবা যমভবনের বাহিরে থাকিয়া বিদূরথ জীবের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন)।

অনন্তর যেমন ক্ষেপণী যন্ত্র হইতে উপলখণ্ড পরিত্যক্ত হয়, তেমনি, যমদূতগণ কর্ত্তৃক সেই জীবকলা (অর্থাৎ নিতান্ত সূক্ষ্ম জীব) নভোমার্গে পরিত্যক্ত হইল। অনন্তর সেই বিদূরথ জীব নভঃপথে গমন করিতে লাগিল, সরস্বতী ও প্রবুদ্ধ লীলা তাহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। রূপসম্পন্না দুইটী রমণী পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে, বিদূরথ জীব তাহা দেখিতে পাইল না। উক্ত রমণীদ্বয় বিদূরথ জীবের অনুসরণ করতঃ নভস্তল উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক লোকান্তর অতিক্রম করিয়া সে জগৎ হইতে নির্গত হইলেন। তৎপরে অন্য এক জগৎ প্রাপ্ত হইলেন। বিদূরথজীব এই জগতে আসিয়া ভূমণ্ডল প্রাপ্ত হইলেন[১৫।১৭]। তখন সেই সঙ্কল্পরূপিণী দুইটী রমণী সেই বিদূরথজীবের সহিত পদ্মরাজ পুর প্রাপ্ত হইয়া তন্মধ্যস্থ লীলার অন্তঃপুর মণ্ডপে বাতলেখার অম্বুজ প্রবেশের ন্যায়, রবিকরের অম্ভোজ প্রবেশের ন্যায়, ও সুরভির পবন প্রবেশের ন্যায় প্রবেশ করিলেন[১৮।১৯]।

এই সময়ে শ্রীরামচন্দ্র বশিষ্ঠদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি ইতঃপূর্ব্বে বলিয়াছেন যে, বিদূরথপত্নী লীলাকে তদীয় কুমারী (কন্যা) পথ দেখাইয়া আনিয়া ছিলেন, কিন্তু বিদূরথজীবের পথ পরিজ্ঞানের কথা বলেন নাই। সেইজন্য জানিতে ইচ্ছা হইতেছে যে, বিদূরথ-জীব কি প্রকারে সেই পদ্মভূপতির শবগৃহের নিকটবর্ত্তী হইল? কি প্রকারে সে পথ চিনিয়া আসিল? এবং কি প্রকারেই বা সেই মৃতশরীর সজীব

হইল ?[২০] বশিষ্টদেব বলিলেন রাঘব! সেই জীবের অন্তঃস্থ বাসনায় পদ্ম-শরীরের অভিমান বিদ্যমান ছিল এবং তাহাতেই তাহার বুদ্ধিতে পথ প্রভৃতি সমস্তই প্রস্ফুরিত হইয়াছিল। তাই সে পরিচিত প্রদেশে গমনের ন্যায় সেই শবগৃহে যাইতে সমর্থ হইয়াছিল[২১]। কে না দেখিয়াছে যে, সজীব বটবীজ সকল অঙ্কুরের কারণ (মৃত্তিকাদি) প্রাপ্ত হইলে আপনাকে অঙ্কুরিত বটবৃক্ষভাবে অবলোকন করে ? অথবা অনুভব করে ? যেমন বটবীজ আপনার অন্তঃস্থ সূক্ষ্মাকারে অবস্থিত বটবৃক্ষকে যথাকালে ও কারণসংযোগে পরিপুষ্ট দর্শন করে, তেমনি, জীবের উপাধি সূক্ষ্মতম অন্তঃকরণে বাসনাময় অসংখ্য ভ্রান্তিনির্ম্মিত সূক্ষ্ম জগৎ অবস্থিত থাকে, তন্মধ্যে উদ্বোধক দ্বারা যাহা যখন পরিপুষ্ট হয় তাহাই তখন সে বিদিত হয় বা অনুভব করে[২২]। যেমন সজীব বীজ স্বীয় অন্তরে অঙ্কুর অনুভব করে, তেমনি, চিৎকণা জীবও স্বীয় হৃদয়ে (বুদ্ধিতে) সংস্কারীভূত ত্রৈলোক্য অনুভব করে[২৩]। যেমন কোন এক প্রদেশস্থিত নর আপনার দূরদেশস্থ বাসস্থান মনোমধ্যে দর্শন করে, সেইরূপ, জীবও শত শত জন্ম পরিবর্ত্তিত হইয়া গেলেও স্বকীয় বাসনায় অবস্থিত ইষ্টানিষ্ট সকল সত্যবৎ অবলোকন করিয়া থাকে[২৪।২৫]।

রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! যে সমস্ত জীব পিণ্ড প্রাপ্ত না হয়, তাহারা কিরূপে শরীর প্রাপ্ত হয় তাহা বলুন[২৬]। বশিষ্ঠ বলিলেন, বন্ধু ব্যক্তিরা (পুত্রাদি) পিণ্ড প্রদান করুক বা না করুক, প্রেতের বুদ্ধিতে যদি "আমি পিণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি" এতদ্রূপ বাসনা উদিত হয়, তাহা হইলে সেই বাসনাই তাহার শরীর সম্পাদন করে। পিণ্ডপ্রদানের শাস্ত্র, "বন্ধুজনের পিণ্ডপ্রদান কর্ত্তব্য" এতাবন্মাত্রের বোধক। * ফল কল্পে ঐ কার্য্যের দ্বারা পুত্রাদি, পিতৃ ঋণ হইতে মুক্ত হয়, এবং প্রেতবাসনারও অল্প কিছু উপকার ঘটনা হয়[২৭]। ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণের অনুভব এই যে, চিত্ত যেরূপ, জীবও তদাকৃতি অর্থাৎ তন্ময়। কি জীবিত ও কি মৃত, কোনও সময়ে ঐ নিয়মের অন্যথা হয় না[২৮]। পিণ্ডবিহীন ব্যক্তিরাও "আমি সপিণ্ড হইয়াছি" এই প্রকার সম্বিদ্ দ্বারা সপিণ্ড অর্থাৎ ভোগদেহসম্পন্ন হইয়া থাকে। আবার "আমি নিষ্পিণ্ড"

* এ বিষয়ে শাস্ত্রকারগণের অভিপ্রায় এই যে, বন্ধুগণ যথাসময়ে যথাশাস্ত্র পিণ্ডপ্রদানাদি করিলে মৃত ব্যক্তির পিণ্ডদান বাসনা উদিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা থাকে।

এইরূপ সম্বিদ্ দ্বারা সপিণ্ড ব্যক্তিও নিষ্পিণ্ড হইয়া থাকে[২৯]। ইহা-নিশ্চয় জানিবে যে, পদার্থের সত্যতা ভাবনার অনুগামী এবং ভাবনা সেই সেই কারণীভূত পদার্থের কারণ হইতে সমুদিত হয়[৩০]। যেমন ভাবনার দ্বারা বিষ অমৃত হয়, অসত্যও সত্যরূপে অনুভূত হয়, তেমনি, পদার্থও ভাবনার দ্বারা তত্তৎভাবে সমুৎপাদিত হয়[৩১]।* আবার ইহাও নিশ্চয় জানিবে যে, কারণের উদ্রেক ব্যতীত কোনও প্রকার ভাবনা সমুদিত হয় না[৩২]। নিত্যোদিত একাদ্বয় ব্রহ্ম (চৈতন্য) ব্যতীত আর আর কার্য্য পদার্থ সকল সৃষ্টির আদি হইতে মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত বিনা কারণে সমুদিত হইতে দেখা যায় নাই[৩৩]। পণ্ডিতগণ দ্বারা ইহাই স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, সেই বিশুদ্ধ চিৎ পদার্থ-ই বাসনার ও স্বপ্নের ন্যায় কার্য্য ও কারণভাব প্রাপ্ত হইয়া ভ্রান্তির দ্বারাই জগদাকারে প্রতিপ্রকাশিত হইতেছে[৩৪]।

রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! যদি বন্ধুবর্গ ভূরি ভূরি ধর্ম্মোপার্জ্জন করিয়া ধর্ম্মবিহীন প্রেতকে অর্পণ করে; তাহা হইলে তাঁহার সেই সকল ধর্ম্ম নিষ্ফল হইবে? কি সফল হইবে? যে প্রেত জানে "আমার ধর্ম্ম নাই" তদ্বাসনাসমন্বিত সেই প্রেতের উদ্দেশে তদ্বন্ধুরা যদি "আমি ধর্ম্ম সমর্পণ করিলাম" ইত্যাকার দৃঢ় সত্য বাসনান্বিত হয়, তাহা হইলে সেই ধর্ম্মপ্রদাতা প্রেতবন্ধুর সেই বাসনা ফলবতী হইবে? কি নিষ্ফল হইবে? বলবতী হইবে? কি দুর্ব্বলা হইবে?[৩৫।৩৬] বশিষ্ঠ বলিলেন, শাস্ত্রোক্ত দেশ, কাল, ক্রিয়া ও দ্রব্যাদি অর্থাৎ তদুপলক্ষিত অনুষ্ঠানাদির দ্বারা তদ্বন্ধুগণের যে বাসনা সমুদিত হয়, সে বাসনা প্রেতবাসনা অপেক্ষা প্রবল। কেননা, শাস্ত্রানুসারী ফলজনক কার্য্য ও লৌকিক কার্য্য উভয়ের মধ্যে শাস্ত্রানুসারী ফলজনক কার্য্যই সমধিক বলবান্ হইতে দেখা যায়। অতএব যে বিষয়ের উদ্দেশে যে বাসনা সমুদিত হয়, সেই বিষয়ে সেই বাসনার জয় হইয়া থাকে[৩৭]। ধর্ম্মদাতার ধর্ম্মদান-বাসনার দ্বারা প্রেতের যে "আমি ধার্ম্মিক" ইত্যাকার বাসনা জন্মে, তাহা শাস্ত্রবাক্যের প্রামাণ্যে অনুমান করিবে। এই স্থলে বুঝিতে হইবে যে, বন্ধুরবাসনার দ্বারাও প্রেতের বাসনা সমুদ্রেক হয়। বন্ধুগণ (পুত্রাদি) পিণ্ডদানাদির দ্বারা

* গরুড় উপাসকেরা সঙ্কল্পের দ্বারা বিষকে অমৃত করিতে পারে এবং যোগীরাও ভাবনার দ্বারা এক পদার্থকে অন্য পদার্থ করিতে পারে।

প্রেতের উপকার হয় বটে ; প্রেত যদি বেদবিদ্বেষ্টা নাস্তিক পাষণ্ডমতি না হয়। তাদৃশ (সেরূপ পাষণ্ড) প্রেতের (মৃত ব্যক্তির) নিকট বন্ধু-বাসনা অতীব দুর্ব্বলা[৩৮]। প্রবল দুর্ব্বলের মধ্যে প্রবলেরই জয় হইয়া থাকে এবং সেই কারণে আমি বলিয়া আসিয়াছি, যত্নপূর্ব্বক শুভাভ্যাসই করিবেক, অশুভ চিন্তা করিবেক না[৩৯]।

রামচন্দ্র বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! যদি দেশকালাদির উৎকর্ষেই বাসনা সমুদিত হয়, তাহা হইলে মহাকল্পান্তে অর্থাৎ সৃষ্টির আদিতে দেশ-কালাদি থাকার সম্ভব কি? কি প্রকারে ও কোথা হইতে প্রথম সৃষ্টির কারণীভূত বাসনা উদ্রিক্ত হইয়াছিল? যদি এই সকল দৃশ্য বাসনা-কার্য্যই হয়, এবং ইহা যদি দেশকালাদি সহকারী কারণ দ্বারা সমুদিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তৎকালে ঐ সকল সহকারী কারণ না থাকায় বাসনার অবস্থান কোথায় ও কি প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে?[৪০।৪১]

বশিষ্ঠ বলিলেন, মহাবাহো! তুমি যাহা বলিতেছ, তাহাই সত্য। মহাপ্রলয়ের পর সৃষ্ট্যারম্ভ কালের পূর্ব্বে দেশকালাদি কিছুই থাকে না এবং সহকারী কারণের অভাব নিবন্ধন দৃশ্যবিলাসেরও বিদ্যমানতা থাকে না। অর্থাৎ কোন কিছু উৎপন্নও হয় না, প্রস্ফুরিতও হয় না। যেহেতু দৃশ্য বস্তু অভাবশালী, সেই হেতু যাহা কিছু দৃষ্ট হয়, সমস্তই অনাময় ব্রহ্ম, অন্য কিছু নহে[৪২।৪৪]। এই বিষয়টী অগ্রে যাইয়া আমি তোমাকে শত শত যুক্তি দিয়া বুঝাইয়া দিব। এখন তুমি প্রযত্ন সহকারে প্রস্তাবিত বিষয়ে প্রণিহিত হও[৪৫]।

লীলা ও সরস্বতী উক্তপ্রকারে পদ্মনগরে গমন করতঃ পদ্মনৃপতির মনোহর মন্দির অবলোকন করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, সেই শীতল ও গুণযুক্ত মন্দিরটী পুষ্পসম্ভারে আকীর্ণ হওয়ায় যেন বসন্তকালীন শোভা ধারণ করিয়াছে[৪৬]। উহা রাজকার্য্যসংরম্ভযুক্ত রাজধানী* সমন্বিত এবং তন্মধ্যে মন্দারকুন্দমাল্যাদির দ্বারা সমাচ্ছাদিত পদ্মনৃপতির শব সংস্থাপিত রহিয়াছে। শবের শিরোভাগে মঙ্গল সূচক পূর্ণ কুম্ভাদি সংস্থাপিত রহিয়াছে[৪৭।৪৮]। মন্দিরের গবাক্ষ সকল ও দ্বার অনাবৃত রহিয়াছে। দীপালোক ক্ষীণতা প্রাপ্ত হওয়ায় উহার নির্ম্মল ভিত্তি শ্যামলবর্ণ হইয়াছে। মন্দিরের এক পার্শ্বে সংসুপ্ত জনগণের শ্বাস নিঃসরণ

শব্দ সমভাবে নির্গত হইতেছে। মন্দিরটী পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় কান্তি-সম্পন্ন ও সৌন্দর্য্য গুণে পুরন্দরমন্দিরকে ও বিরিঞ্চির অধিষ্ঠানভূত পদ্ম-মুকুলান্তর্গত চারু শোভাকে নির্জ্জিত করিতেছে। এই ইন্দুকান্তি সদৃশ মনোহর মন্দির নিঃশব্দ হেতুক মুকবৎ অবস্থিতি করিতেছে৪৭।৫০।

ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, অনন্তর প্রবুদ্ধ লীলা ও সরস্বতী সেই অন্তঃপুর মণ্ডপে গমন করতঃ দেখিলেন, তাঁহাদিগের পূর্ব্বে সমাগতা ও ভর্ত্তৃ মরণের পূর্ব্বে মৃতা সেই বিদূরথমহিষী অপ্রবুদ্ধ লীলা অবিকল সেই পূর্ব্বদৃষ্ট আকারে সেই বেশে সেই দেহে সেই চরিত্রে সেই বস্ত্রে সেইরূপ রূপে, গুণে, বয়সে, ভূষণে ও সৌন্দর্য্যে পদ্মনৃপতির শবগৃহে অবস্থান করিতেছেন এবং শবপার্শ্বে উপবিষ্টা হইয়া চামর গ্রহণ করতঃ নৃপতি পদ্মের শব-শরীর বীজন করিতেছেন। ইহাকে দেখিলেই মনে হয়, যেন নভোভূষণ তরুণ শশধর তত্রস্থ মহীতলে উদিত হইয়াছে[১]।[৪]। তাঁহার বেশ, বয়স, আচার, আকার, দেহ, বস্ত্র, অঙ্গসৌন্দর্য্য, রূপ, লাবণ্য, অবয়বস্পন্দন, বস্ত্র পরিধান ও ভূষণ প্রভৃতি সমস্তই পূর্ব্ব সদৃশ। কেবল বিশেষ এই যে, তিনি প্রাক্তন ভবন (বিদূরথ গৃহ) পরিত্যাগ পূর্ব্বক পদ্মভবনে অবস্থিতি করিতেছেন। এই মনোহররূপ-সম্পন্না রমণী বামকরতলে বদনেন্দু নতভাবে বিন্যস্ত করতঃ মৌনা হইয়া রহিয়াছেন এবং ইহার অঙ্গ ও অঙ্গভূষণ হইতে স্নিগ্ধ শুভ্র ও নির্ম্মল কিরণাবলি ছুরিত হইতেছে। দেখিবা মাত্র বোধ হয়, যেন এক সুন্দর বনস্থলীতে বিকসিত কুসুমা সর্ব্বলোকমনোহরা লতিকা সুষমা বিতরণ করিতেছে[৫]। এই লীলা যখন যে দিকে নেত্র পরিচালন করিতেছেন সেই দিকেই যেন মালতী অথবা উৎপল বর্ষণ হইতেছে এবং তাঁহার অঙ্গলাবণ্য যেন ক্ষণে ক্ষণে শত শত চন্দ্রের সৃষ্টি করিতেছে[৬]। এই লাবণ্যবতী লীলা যেন পুষ্পসম্ভার সমুদিত লক্ষ্মীর ন্যায় নরপাল রূপ বিষ্ণুর ভবনে অবস্থিতি করিতেছেন[৭]। ইহার দৃষ্টি ভর্ত্তৃবদনে স্থাপিত, যেন কিছু নিপুণা হইয়া নিরীক্ষণ করিতেছেন। ইহার মুখ ম্লান, সুতরাং ম্লানচন্দ্র নিশার ন্যায় অল্পান্ধকার বিশিষ্ট[৮]।

সত্যসঙ্কল্পা প্রবুদ্ধ লীলা ও সরস্বতী উভয়ে অপ্রবুদ্ধ লীলাকে তাদৃশী অবস্থান্বিতা দেখিলেন, কিন্তু বালিকা অপ্রবুদ্ধ লীলা সত্যসঙ্কল্পতার অভাবে উক্ত উভয়কে দেখিতে পাইলেন না[৯]।

এই অবসরে রামচন্দ্র মহর্ষি বশিষ্ঠদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহর্ষে! আপনি বর্ণন করিয়াছেন যে, পূর্ব্বলীলা পদ্মভবনের অন্তঃপুর মণ্ডপে দেহ রাখিয়া ধ্যানযোগে জ্ঞপ্তি দেবীর সহিত বিদূরথ ভবনে গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন বলিতেছেন, তিনি সরস্বতীসহ বিদূরথভবন হইতে পদ্মভবনে আগমন করিয়া অপ্রবুদ্ধ লীলাকে অগ্রে সমাগতা দেখিলেন। তাঁহার দেহ প্রাপ্তির কথা আর বলিলেন না। অতএব, তাঁহার সেই দেহ কি হইল, কোথায় গেল, তাহা এখনও আছে কি নাই, লীলা আপনার শরীর আছে কি নাই, তাহা দেখিলেন না, না দেখিয়াই সমাগতা লীলাকে দেখিতে লাগিলেন, ইহার কারণ কি আমার নিকট ব্যক্ত করিয়া বলুন[১০।১১]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রামচন্দ্র! লীলার সে শরীর কোথায়? তাহা কি সত্য বস্তু? সত্যবস্তু নহে। দেহ প্রভৃতির জ্ঞান মরুভূমিতে জলবুদ্ধির ন্যায় ভ্রান্তিমূলক। তাহা অর্থাৎ সে ভ্রান্তি বিদূরিত হওয়ায় লীলা আপনার পরিত্যক্ত শরীর অন্বেষণ করেন নাই। যাহা নাই তাহার আবার অন্বেষণ কি?[১২] বৎস রাম! এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড সমস্তই আত্মা। এ রহস্য যে জানিয়াছে, তাহার আবার দেহাদি কোথায়? তুমিও যাহা যাহা দেখিতেছ, সমস্তই সেই চিন্মাত্রবপুঃ ব্রহ্ম[১৩]। লীলার বোধ যেমন যেমন উত্তরোত্তর পরিপক্ব হইয়াছে তাহার দেহও তেমনি তেমনি হিমবৎ বিগলিত অর্থাৎ বাধিত (নাই বলিয়া অবধৃত) হইয়া গিয়াছে[১৪]। লীলা যে এখন আতিবাহিক দেহে আপনার পরিকল্পিত দৃশ্য দেখিতেছেন অর্থাৎ "সমস্তই মনঃকল্পিত" এই ভাবে দেখিতেছেন, তাহা কে জানিতেছে? জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বে ইহার ভ্রান্তিতে এই সমস্তই ভূম্যাদি নামে অবস্থিত ছিল। অর্থাৎ এক্ষণকার আধ্যাত্মিক ভাবই পূর্ব্বে আধিভৌতিক ভ্রান্তিতে বিদ্যমান ছিল[১৫]। বস্তুতঃ আধিভৌতিক অর্থাৎ বাহ্যিক কিছুই নাই। শব্দ বল, আর অর্থ বল, কোনও কিছু বাস্তব নাই। এ সমস্তই শশশৃঙ্গের ন্যায় অসত্য[১৬]। আতিবাহিকের উপর "আমি আধিভৌতিক" এইরূপ ভ্রম দৃঢ়ীভূত হইলে, তাহার আর, আমি আধিভৌতিক কি আতিবাহিক সে বিচার থাকে না। স্বপ্নকালে "যে পুরুষের আমি মৃগ" এইরূপ মতি উদিত হয়, যাবৎ স্বপ্ন থাকে তাবৎ কি সে আপনার মৃগত্ব পরীক্ষার নিমিত্ত

অন্য মৃগ অন্বেষণ করে? তাহা করে না[১৭]। যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম তিরোহিত হইলে, "এই সর্পজ্ঞান ভ্রান্তিমাত্র" এইরূপ বোধ সমুদিত হয়, তেমনি, ভ্রান্ত জনগণের ভ্রম বিদূরিত হইলে, যাহা সত্য তাহাই তাহাদের জ্ঞানে স্ফুরিত হয়[১৮]। অধিক কি বলিব, এই সমুদায় আধিভৌতিক প্রপঞ্চ অপ্রবুদ্ধ জীবের মনঃকল্পিত। সমুদায় অজ্ঞ জীব স্বপ্ন সন্দর্শনের অনুরূপে জগৎস্থৌল্য দর্শন করিতেছে। বালক যেমন নৌকাবিঘূর্ণনে ভ্রমণ অনুভব করে, সেইরূপ, প্রত্যেক অজ্ঞ জীব দেহান্তর প্রাপ্তি অনুভব করে[১৯।২০]। * আত্মজ্ঞান হইলে তখন তাহার সেই আধিভৌতিক দেহ বাধিত হইয়া যায়। সেইজন্য যোগীদিগের দেহ আতিবাহিক।

রামচন্দ্র বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি বলিলেন, আতিবাহিক দেহ অদৃশ্য ও অবিনশ্বর, যদি তাহাই হয়, তবে, কেন তাহা লোকের দৃষ্টিগোচর হয়? কেনই বা তাহাদের মরণ দেখা যায়? এবং কি নিমিত্ত মৃত্যুর পর আতিবাহিকতা প্রাপ্ত দেহ মোক্ষকালেও বিদ্যমান থাকে?[২১]

বশিষ্ঠ বলিলেন, যেরূপ স্বপ্নাবস্থায় দেহ বিনষ্ট না হইলেও "বিনষ্ট হইয়াছে" এইরূপ জ্ঞান সমুদিত হয়, সেইরূপ, যোগীদিগেরও বিনা পূর্ব্ব দেহের বিনাশে সেই আতিবাহিক দেহেই দেহান্তর ধারণের কল্পনা উদিত হয়। † অপিচ, যেমন সূর্য্যের আলোকে হিমকণা ও শরৎকালের আকাশে শুভ্র মেঘ দৃষ্ট হইলেও বস্তুতঃ অদৃশ্য, তেমনি, যোগিদেহ দৃষ্ট হইলেও বস্তুতঃ তাহা অদৃশ্য। ফলিতার্থ—শরদাকাশে কিঞ্চিৎ-কালের নিমিত্ত মেঘাস্তিত্ব দর্শনের ভ্রম হয়[২২।২৩]। "শরীর এখনই যাউক, অদৃশ্য হউক" এইরূপ দৃঢ় সঙ্কল্পের দ্বারা কোন কোন যোগীর দেহ এত শীঘ্র অদৃশ্য হইয়া যায় যে, সাধারণ লোকের কথা দূরে থাকুক, যোগীরাও তাহা দেখিতে পান না। খগেরা যেমন উড্ডীন হইয়া শীঘ্র

* আমি মরিলাম, পুনর্ব্বার জন্মিলাম, এ সকল জ্ঞান পরকীয় মিথ্যা জ্ঞানের বিবর্ত্তন। জাতিস্মর দিগের ঐ সকল জ্ঞানও নিরূঢ় (অনাদি) ভ্রান্তির মহিমা।

† ভাবার্থ এই যে, যোগী দিগের মরণ দ্বিবিধ। এক প্রারব্ধ ভোগের নিমিত্ত ঐচ্ছিক, অপর প্রারব্ধ বিনাশে দেহপরিত্যাগ। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত মরণে পূর্ব্ব দেহের অবাধে দেহান্তরের প্রাপ্তি কল্পনা এবং শেষোক্ত মরণে দেহের আত্যন্তিক অভাব হইয়া থাকে। প্রথমোক্ত মরণ বুঝাইবার দৃষ্টান্ত স্বপ্ন এবং দ্বিতীয় মরণ বুঝাইবার দৃষ্টান্ত শরৎকালের মেঘ।

আকাশে অদৃশ্য হয়, সেইরূপ[২৪]। তাঁহারা যে জীবদ্দশায় জনগণ কর্তৃক দৃষ্ট হন তাহা তাঁহাদের সত্যসঙ্কল্পতার প্রভাব। অর্থাৎ "ইহারা এইরূপে দেখুক" এইরূপ ইচ্ছা করেন বলিয়া লোকে তাঁহাদিগকে দেখিতে পায়। কোন কোন ব্যক্তি যে স্বীয় সম্মুখে "এই যোগী মৃত, এই যোগী জীবিত" এইরূপে যোগিদেহ দর্শন করেন, সে কেবল সেই সেই দর্শকের বাসনানুরূপ বিভ্রম[২৫]। বস্তুতঃ যোগিদেহ কোনও কালে আধিভৌতিক নহে। যেমন সর্পজ্ঞান বিনষ্ট হইলে রজ্জুজ্ঞান সমুদিত হয়, তেমনি, ভ্রান্ত জনগণের জ্ঞানোদয় হইলে পূর্ব্বের দেহদর্শন ভ্রম বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকে[২৬]। তখন অবধারণা হয় যে, দেহই বা কি, তাহার বিদ্যমানতাই বা কোথায়, এবং তাহার নাশই বা কি? সমস্তই অলীক, সমস্তই ভ্রান্তি। যাহা ছিল তাহাই রহিয়াছে; কেবল অবোধতাই বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে[২৭]।

রামচন্দ্র বলিলেন, প্রভো! এই আধিভৌতিক দেহই কি যোগের সামর্থ্যে আতিবাহিকতা প্রাপ্ত হয়? কি তাহা পৃথক্? বশিষ্ঠ বলিলেন, আমি তোমাকে ঐ বিষয়টী অনেকবার বলিয়াছি; কিন্তু তুমি গ্রহণ করিতেছ না। অর্থাৎ বুঝিতে পারিতেছ না। বৎস! একমাত্র আতিবাহিকই আছে, আধিভৌতিক নাই[২৮।২৯]। অধ্যাস দ্বারাই আতিবাহিকে আধিভৌতিকী মতি সমুদিত হয় এবং তাহার অর্থাৎ অধ্যাসের উপশম হইলে পুনর্ব্বার প্রাক্তন আতিবাহিকতার উদয় হয়[৩০]। যেমন, প্রবুদ্ধ হইলে তখন আর স্বপ্নদৃষ্ট নগরের কাঠিন্যাদি থাকে না, তাহার কাঠিন্যাদি জ্ঞান তিরোহিত হইয়া যায়, তেমনি, আতিবাহিক জ্ঞান সমুদিত হইলেও তখন আর এতদ্দেহের গুরুত্ব ও কাঠিন্য প্রভৃতি থাকে না, শমতা প্রাপ্ত হইয়া যায়[৩১]। যেমন "স্বপ্নে ইহা স্বপ্ন" এইরূপ জ্ঞান হইলে স্বপ্নদৃষ্ট স্বপ্নের বাধ হইয়া যায়, সেইরূপ, আতিবাহিক বোধ সমুদিত হইলেই আধিভৌতিকত্বের বাধ হয় এবং আধিভৌতিকের বাধ হইলে যোগী দিগের দেহ তূলবৎ লঘুতা প্রাপ্ত হয়[৩২]। জীব যেমন স্বপ্নে "আমি স্থূল নহি, ভারি নহি, আমি ইচ্ছা করিলে আকাশে সঞ্চরণ করিতে পারি" এই জ্ঞান হওয়ার পর স্বপ্নে আকাশ সঞ্চরণাদি করে, তেমনি, যোগীরাও প্রকৃষ্ট জ্ঞানের উদয়ে তূলবৎ লঘু হইয়া আকাশগমনযোগ্য হন[৩৩]। যাঁহারা দীর্ঘকাল তাদৃশ সঙ্কল্পময়

দেহে অবস্থান করেন, তাঁহাদিগের স্থূল দেহ শবীভূত হউক, আর ভস্মীভূত হউক; সকল অবস্থাতেই তাঁহারা আতিবাহিক দেহে অবস্থিতি করিবেন, সন্দেহ নাই[৩৪]। যোগীরা প্রবোধের আতিশয্য দ্বারা জীবিত অবস্থাতেই ঐ প্রকার সূক্ষ্ম দেহ লাভে সমর্থ হন[৩৫]। "আমি সঙ্কল্পাত্মা, স্থূল নহি" এইরূপ স্মৃতি সমুদিত হওয়ায় তাঁহাদিগের স্থূল দেহও আকাশবিহারযোগ্য হয়[৩৬]। রজ্জুতে সর্প ভ্রমের ন্যায় স্থূল ভ্রান্তি নিরন্তর প্রতিভাত হইতেছে বটে; পরন্তু ভাবিয়া দেখা উচিত যে, রজ্জুতে সর্প ভ্রম সমুদিত হয় বটে; পরন্তু রজ্জু কি তাহাতে সত্য সত্যই সর্পত্ব প্রাপ্ত হয়? তাহা হয় না। অধিকন্তু দেখা যায়, ভ্রম বিনষ্ট হইলে তখন আর সে সর্প থাকে না। তাহা তখন কোথায় বিলীন হইয়া যায়। অতএব, যে বস্তু যেরূপ, তাহাতে ভ্রম সমুদিত হউক, বা না হউক, তাহা তদ্রূপেই অবস্থিত থাকে। সদ্বস্তুর বাস্তব অন্যথা হয় না[৩৭]।

রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! পূর্ব্বলীলা ও সমাগতা লীলা প্রভৃতি পদ্মভবনে গমন করিলে তদ্ভবনবাসীরা আতিবাহিক দেহধারিণী লীলাকে দর্শন করিতে অশক্ত হইলেও, লীলার "এই সমস্ত জনগণ আমাকে দর্শন করুক" এতদ্রূপ সত্য সঙ্কল্প দ্বারা তাঁহারা যদি তাঁহাকে দর্শন করেন, তাহা হইলে তাঁহারা তাঁহাকে কি বোধ করিবেন?[৩৮] *

বশিষ্ঠ বলিলেন, তত্রস্থ জনগণ "ইনিই সেই রাজমহিষী, দুঃখিতা হইয়া এই স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন এবং এই রমণী (দ্বিতীয়া লীলা) ইঁহার বয়স্যা, কোন এক স্থানে সখিত্ব প্রাপ্তা এবং সম্প্রতি ইঁহার সহিত মিলিতা হইয়াছেন, এইরূপ বোধ করিবেন[৩৯]।

হে রামচন্দ্র! এ বিষয়ে সন্দেহ হইবার কারণ নাই। পশুগণ যেমন দৃষ্ট অনুসারে কার্য্য নির্ব্বাহ করে, তেমনি, অবিবেকী মানবেরাও দৃষ্টানুসারে ব্যবহার কার্য্য নির্ব্বাহ করে[৪০]। লোষ্ট্র বৃক্ষাদিতে নিক্ষিপ্ত হইলে বৃক্ষাদির মধ্যে প্রবেশ করে না, অধিকন্তু তাহা বৃক্ষেই বিশীর্ণ (ধূলিভাবপ্রাপ্ত, গুঁড়া হইয়া যাওয়া) হইয়া যায়, সেইরূপ, বিচারণাও পশুতুল্য অজ্ঞান ব্যক্তিদিগের অন্তঃপ্রবিষ্ট হয় না, সেইজন্য তাহাদের শরীর ও

---

* পদ্মভবনবাসিগণ কি তাঁহারে ইনিই সেই এখানকার লীলা এই রূপ বোধ করিবেন? কি ইনি কোন অপূর্ব্বা দেবী, এইরূপ বোধ করতঃ জ্যেষ্ঠশর্ম্মাদির ন্যায় বিস্ময় প্রাপ্ত হইবেন? তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। (জ্যেষ্ঠশর্ম্মা প্রবুদ্ধ লীলার পুত্র। পূর্ব্বে ইহার কথা অনেকবার বলা হইয়াছে।)

কাম কর্ম্ম বাসনাদি পূর্ব্ববৎ অবস্থিত থাকে[৪১]। যেমন জাগরিত হইলে স্বাপ্ন শরীর কোথায় যায় তাহা জানা যায় না, তেমনি, তত্ত্ববোধ উদিত হইলে আধিভৌতিকতাবোধ কোথায় পলায়ন করে, তাহা স্থির করা যায় না[৪২]।

রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! জাগ্রৎ উপস্থিত হইলে স্বপ্নদৃষ্ট পর্ব্বত কোথায় যায় তাহা আমাকে বলুন। ঐ বিষয়ে আমার বিশেষ সন্দেহ আছে[৪৩]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, স্পন্দন যেমন বায়ুতেই লীন হয়, তেমনি, স্বপ্ন দৃষ্ট ও সঙ্কল্পদৃষ্ট পর্ব্বতাদি সম্বিদে (আত্মচৈতন্যে) মিলিত হইয়া থাকে[৪৪]। যেমন অস্পন্দ বায়ুতে সম্পন্দ বায়ু (স্থির বায়ুতে ঝটিকা বায়ু) প্রবেশ করে, সেইরূপ, বাস্তব-অস্তিত্ব-শূন্য স্বাপ্ন পদার্থ ও নির্ম্মলস্বভাব সম্বিদে প্রবিষ্ট হয়[৪৫]। একমাত্র সম্বিদই সেই সেই পদার্থের আকারে অবভাসিত ও প্রস্ফুরিত হইতেছে। যে দিন তাহা না হইবে সেই দিন সম্বিদের স্বভাবসুলভ অদ্বয়তা (একত্ব) প্রতিষ্ঠিত হইবে[৪৬]। জল যেমন দ্রবত্বের ও স্পন্দন যেমন বায়ুর সহিত অভিন্ন, তেমনি, স্বপ্নার্থও সম্বিদের সহিত অভিন্ন। সম্বিৎ ও স্বপ্নদৃষ্ট নানা সম্বেদ্য, উভয়ের বাস্তব পার্থক্য কোনও কালে ও কোনও ব্যক্তি কর্ত্তৃক উপলব্ধ হয় নাই এবং হইবেও না[৪৭]। যেন তাহা পৃথক, যেন তাহা ভিন্ন, (জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই দুই যেন এক নহে, কিন্তু ভিন্ন) এই ভাবটীই অজ্ঞান নামের নামী এবং তাদৃশ অজ্ঞানই সংসার। সম্বিদই উক্ত অজ্ঞানের আকারে বিবর্ত্তিত হইয়া সংসার আখ্যা প্রাপ্ত হইতেছে[৪৮]। সহকারী কারণ না থাকায় স্বাপ্ন সৃষ্টি মিথ্যা, সুতরাং ঐ সকল দ্বৈত পণ্ডদ্বৈত (পণ্ড=অলীক বা তুচ্ছ)[৪৯]। স্বপ্ন যেমন অসৎ, জাগ্রৎও সেইরূপ অসৎ। এ বিষয়ে অল্পমাত্রও সন্দেহ করিও না। কেননা স্বপ্নদৃষ্ট পুরনগরাদি সহকারিকারণের অভাবে অসৎ। যেমন স্বপ্নদৃষ্ট পুরনগরাদি অসৎ, তেমনি, সৃষ্টির আদিতে একমাত্র অজ্ঞানোপহিত হিরণ্যগর্ভ-সম্বিদের অতিরিক্ত অন্য কোন সহকারিকারণ না থাকায় তদুদ্ভূত সৃষ্টিও অসৎ[৫০]। স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ কোনও ক্রমে সত্য নহে। একমাত্র সম্বিদ্ই নিত্য সত্য, তদতিরিক্ত যে কিছু, সমস্তই অসত্য[৫১]। যেমন জাগরিত হইলে স্বাপ্নপর্ব্বতাদি তৎক্ষণাৎ নাস্তিতা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ নাই

হইয়া যায়, সেইরূপ, শীঘ্র হউক, বিলম্বে হউক, অথবা ক্রমে হউক, তত্ত্বজ্ঞানাভ্যাস দ্বারা এই আধিভৌতিক জগৎ শূন্যতায় পর্য্যবসিত হইয়া থাকে[৫২]। নিকটস্থ লোকেরা যে "এই ব্যক্তি মৃত" ও এই ব্যক্তি উড্ডীন" এইরূপ দর্শন করে, তাহা তাহারা স্বস্বরূপানভিজ্ঞ আধিভৌতিকাভিমানী বলিয়াই করে। অর্থাৎ সেইপ্রকার দর্শন করে[৫৩]। এই সকল সৃষ্টি মিথ্যাজ্ঞানের প্রভাবে প্রকটিত ও মোহের প্রেরণায় অবস্থিত। এই ঐন্দ্রজালিকীবৎ দৃষ্টিভ্রান্তি স্বপ্নানুভূতির ন্যায় নিঃস্বরূপ। অনাদিভ্রমপ্রবাহ নিপতিত পুরুষ মরণমূর্চ্ছার পূর্ব্বক্ষণে আতিবাহিক দেহে ভ্রান্তি ক্রমে ভবিষ্যৎ ভোগের উপযুক্ত সৃষ্টিপ্রতিভাস অনুভব করে এবং যাহা যাহা অনুভব করে সে সমস্তই তাহাদের মনোমধ্যে। পরন্তু ভ্রান্তির মহিমায় সে সকলকে বহিঃস্থ বিবেচনা করে[৫৪।৫৫]।

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, প্রবুদ্ধ লীলা পদ্মশবপার্শ্বস্থিতা দ্বিতীয় লীলাকে ঐ প্রকারে দেখিতেছেন, ইত্যবসরে যোগীরা যেমন ইচ্ছার দ্বারা মনের স্পন্দন নিরুদ্ধ করেন, সেইরূপ, সত্যসঙ্কল্পা জ্ঞপ্তিদেবী সঙ্কল্পের দ্বারা সেই বিদূরথ-জীবকে নিরুদ্ধ করিলেন। অর্থাৎ শব-শরীরে প্রবিষ্ট হইতে দিলেন না। এই সময়ে লীলা ভগবতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবি! এই মন্দিরে মহীপাল পদ্ম শবীভূত ও আমি সমাধি লীনা হইলে, কত কাল গত হইয়াছে তাহা আমাকে বলুন[১।২]। দেবী বলিলেন, লীলে! অদ্য এক মাস অতিক্রান্ত হইল, এই ক্ষুদ্র বাস গৃহে এই দুই দাসী তোমার দেহ রক্ষার্থ অবস্থিতি করিয়া এক্ষণে নিদ্রা যাইতেছে[৩]। হে বরবর্ণিনি! তোমার দেহ কি হইল, তাহাও বলিতেছি শ্রবণ কর। তুমি সমাধি লীনা হইলে তোমার দেহ পঞ্চদশ দিবসের পর ক্লিন্ন ও তাহার জলভাগ বাষ্পত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। * যেমন শুষ্ক কাষ্ঠ ভূপৃষ্ঠে নিপতিত থাকে, তেমনি, তোমার সেই নির্জীব দেহও ভূপৃষ্ঠে নিপতিত ছিল। তৎকালে তোমার সেই শবীভূত দেহ কাষ্ঠ কুড্যের ন্যায় কঠিন ও হিমানীর ন্যায় শীতল হইয়াছিল[৪।৫]। অনন্তর মন্ত্রিগণ তোমার দেহের তাদৃশী অবস্থা দেখিয়া অর্থাৎ পচিতেছে দেখিয়া স্থির করিলেন, ইনি মৃতা হইয়াছেন। তখন তাঁহারা তোমার সেই দেহকে গৃহ হইতে নিষ্কাশিত করিলেন[৬]। এ বিষয়ে অধিক কি বলিব, তোমার সেই শবীভূত দেহকে তাঁহারা চিতায় নিক্ষেপ করিয়া ঘৃত ও চন্দন-কাষ্ঠাদির দ্বারা দগ্ধ করিয়াছেন। অনন্তর তোমার পরিবারগণ "হায়! আমাদের রাজ্ঞীও মৃতা হইলেন" এই বলিয়া উচ্চস্বরে রোদন করিয়া

* এস্থলে এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, লীলার তত্ত্বজ্ঞান জন্মিয়াছে, তাই তাঁহার স্থূল দেহ বিষয়ক জ্ঞান রজ্জুতত্ত্ব জ্ঞানের উদয়ে সর্পজ্ঞানের পলায়নের ন্যায় পলায়ন করিয়াছে। সেই জন্য তিনি আর পরিত্যক্ত স্থূলদেহের অনুসন্ধান করেন নাই। সরস্বতীও সে বিষয়ের প্রসঙ্গ করেন নাই। পরন্তু অন্য অজ্ঞানীর দৃষ্টিতে লীলাদেহের যে অবস্থা ঘটনা হইয়াছিল তাহা বলা উচিত বিবেচনায় সরস্বতী তাহাই লীলার নিকট বর্ণন করিলেন।

তোমার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সমাপ্ত করিয়াছেন[৮]। * বৎসে! এখন যদি তোমাকে অত্রত্য জনগণ এই স্থানে সশরীরে সমাগতা দেখে, তাহা হইলে ইহারা তোমাকে, পরলোক হইতে সমাগতা ভাবিয়া চমকিয়া উঠিবে[৯]। হে সুতে! তুমি এক্ষণে আতিবাহিকদেহা সুতরাং মনুষ্যগণের অদৃশ্যা হইলেও তদীয় সত্যসঙ্কল্পের প্রভাবে জনগণ তোমার এই স্বচ্ছ আতিবাহিক দেহ দর্শন করিয়াও পরমাশ্চর্য্য হইবেক[১০]। বালে! তোমার প্রাক্তন দেহের প্রতি যাদৃশী বাসনা সমুদিতা হইয়াছিল, তুমি তাদৃশ রূপলাবণ্যসম্পন্ন দেহ প্রাপ্ত হইয়াছ[১১]। কেবল তুমি নহ, সংসারের সকল ব্যক্তিই স্ব স্ব বাসনানুসারে বাস্ত দর্শন করিয়া থাকে। বালকের বেতাল দর্শন তাহার পুষ্কল দৃষ্টান্ত। (বালকেরা যে ভূত দেখে, তাহা তাহাদের অমূলক সংস্কারের প্রভাব)[১২]। সুন্দরি! তুমি ইদানীং আতিবাহিকশরীরিণী, ব্রহ্মসম্পন্না সুতরাং সিদ্ধা হইয়াছ। তুমি প্রাক্তন অশুভবাসনাসম্পন্ন আধিভৌতিক দেহ বিস্মৃতা হইয়াছ[১৩]। আতিবাহিক জ্ঞান দৃঢ়ীভূত হওয়াতে তোমার আধিভৌতিক জ্ঞান এককালে উপশম প্রাপ্ত হইয়াছে। আধিভৌতিক দেহ অন্য কর্তৃক দৃশ্যমান হইলেও প্রবুদ্ধ ব্যক্তিগণের দৃষ্টিতে তাহা শরদাকাশে শুভ্র মেঘের ন্যায় ক্ষণদৃশ্য[১৪]। আতিবাহিকভাব বদ্ধমূল হইলে সে দেহ তখন জলহীন জলদের ও গন্ধহীন কুসুমের সহিত উপমিত হয়[১৫]। অপিচ, আতিবাহিক সম্বিদ্ (জ্ঞান) অবিচলিত হইলে, সদ্বাসনাশালী গণও যৌবনে বাল্য বিস্মরণের ন্যায় আধিভৌতিকদেহ বিস্মৃত হইয়া যান[১৬]। হে বরবর্ণিনি! আজ একত্রিংশ দিবসে আমরা এই মন্দিরাকাশ প্রাপ্ত হইয়াছি। অদ্য প্রভাতে আমরা এই স্থানে সমুপস্থিত হইলে এই সমস্ত ভৃত্যগণ আমার ইচ্ছায় এখন নিদ্রায় অভিভূত রহিয়াছে। লীলে! আইস, এই সময়ে আমরা সত্যসঙ্কল্পতার খেলা দেখাইয়া এই অপ্রবুদ্ধ লীলাকে দর্শন প্রদান করি ও মানবোচিত ব্যবহারে প্রবৃত্ত হই[১৭।১৮]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রামচন্দ্র! অনন্তর জ্ঞপ্তিদেবী "এই অপ্রবুদ্ধ লীলা আমাদিগকে দর্শন করুক" এইরূপ চিন্তা করিবামাত্র জ্ঞপ্তি ও প্রবুদ্ধ

* লীলার দেহ পচিয়া গেল; আর রাজার দেহ থাকিল, এ বিষয়ে ব্যাখ্যাকার বলেন, সত্যসঙ্কল্পা সরস্বতীর সঙ্কল্পের প্রভাবে রাজার দেহ জীবিতের ন্যায় ছিল, নষ্ট হয় নাই।

লীলা প্রদীপ্তভাবে প্রকাশমানা হইলেন[১৯]। অনন্তর বিদূরথমহিষী অপ্রবুদ্ধ লীলা গৃহের অভ্যন্তর ভাগ তেজঃপুঞ্জে ভাস্বর হইল দেখিয়া চঞ্চলনয়না হইলেন এবং সত্বর গৃহমধ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতঃ দেখিলেন, যেন চন্দ্রে খোদাই করা অথবা ছাঁচে গড়া দ্রবশীতল প্রভাময়ী দুইটী রমণী তাঁহার পুরোভাগে অবস্থিতি করিতেছে। ইঁহাদের অঙ্গপ্রভায় গৃহভিত্তি সুবর্ণ-দ্রবলিপ্তের ন্যায় (সোনালী গিল্ট করার মত) দেখাইতেছে[২০]।[২১]। লীলা স্বীয় সম্মুখে তদ্রূপরূপিণী জ্ঞপ্তিদেবীকে ও প্রবুদ্ধ লীলাকে দেখিবামাত্র সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মানা হইয়া তাঁহাদিগের চরণে নিপতিতা হইলেন এবং কহিলেন, হে জীবনপ্রদ দেবিদ্বয়! আপনাদিগের জয় হউক। আপনারা আমার মঙ্গলের নিমিত্তই এই স্থানে আগমন করিয়াছেন; সন্দেহ নাই। আমি আপনাদিগের পরিচারিকা হইয়া পূর্ব্বেই এই স্থানে উপনীতা হইয়াছি[২২]।[২৩]। লীলা এইরূপ কহিলে সেই বহুমানার্হ ও মত্তযৌবন (পূর্ণ-যৌবন) রমণীদ্বয় সুমেরুশিখরস্থ লতিকাদ্বয়ের ন্যায় উচ্চ আসনোপরি উপবিষ্টা হইলেন[২৪]। পরে জ্ঞপ্তিদেবী বলিলেন, সুতে! তুমি কোন্ পথ দিয়া কি কি আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিতে দেখিতে ও কি প্রকারে এই দেশে আসিয়াছ?[২৫] বিদূরথ-লীলা বলিলেন, দেবি! আমি প্রথমতঃ সেই বিদূরথের গৃহে সেই সময়ে দ্বিতীয়া তিথির চন্দ্রকলার ন্যায় সূক্ষ্মা ও প্রলয়াগ্নি মধ্যপতিতার ন্যায় হইয়া মূর্চ্ছা প্রাপ্তা হইলাম[২৬]। পরমেশ্বরি! সে সময়ে আমার সম বিষম, কোনও জ্ঞান ছিলনা। এবং আমার চঞ্চল পক্ষ্মান্তর্গত লোচন নিমীলিত হইয়া গিয়াছিল[২৭]। পরে আমার তাদৃশী মরণমূর্চ্ছা ভাঙ্গিয়া গেলে, জাগরিত হইয়া দেখিলাম, আমি গগনোদরে আপ্লুত হইতেছি[২৮]। পরে বায়ুরূপ রথে আরোহণ করিলাম। তৎপরে বায়ু যেমন সুগন্ধ বহন করে, সেইরূপ, সেই বায়ুরথ আমাকে এই স্থানে বহন করিয়া আনিল[২৯]। দেবি! আমি এই স্থানে উপনীতা হইয়া দেখিলাম, এই গৃহ মদীয় নায়কে অলঙ্কৃত, দীপ্তদীপে সুশোভিত ও মহামূল্য শয্যায় সমন্বিত রহিয়াছে[৩০]। অনন্তর আমি এই পতির প্রতি দৃষ্টিপাত করতঃ দেখিলাম, ইনি পুষ্পগুপ্তাঙ্গ হইয়া শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। দেখিয়া আমি ভাবিলাম, ইনি ঘোরতর সংগ্রাম-সংরম্ভ দ্বারা শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া নিদ্রিত হইয়াছেন। নিদ্রিত রহিয়াছেন মনে করিয়া, আমি ইঁহার নিদ্রাভঙ্গ করি নাই। এবং তৎপরে

আপনারা এই স্থানে আগমন করিয়াছেন। হে দেবি! এক্ষণে আমি যথানুভূত সমুদয় বৃত্তান্ত মদনুগ্রহকারিণী ভবদীয়সমীপে নিবেদন করিয়া কৃতার্থা হইলাম[৩১।৩৩]।

অতঃপর জ্ঞপ্তি দেবী সহাস্য আস্যে উভয় লীলাকে নিকটে আহ্বান করতঃ কহিলেন; লোহিতলোচনে লীলাদ্বয়! আমি এই শয্যাশায়ী নৃপতিকে উত্থাপিত করিতেছি, অবলোকন কর[৩৪]। অনন্তর ভগবতী জ্ঞপ্তিদেবী ঐরূপ কহিয়া, পদ্মিনী যেমন সুগন্ধ পরিত্যাগ করে, সেই-রূপ, সেই নৃপতির অবরুদ্ধ জীবকে ছাড়িয়া দিলেন। তখন সেই নৃপজীব নৃপতির নাসার নিকট গমন করতঃ অনিলের বংশরন্ধ্র প্রবে-শের ন্যায় সত্বর তদীয় নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইল[৩৫।৩৬]। অমনি মহীপতি পদ্ম, সমুদ্র যেমন স্বকীয় অন্তরে রত্ন ধারণ করেন, তাহার ন্যায় শত শত বাসনা স্বকীয় অন্তরে ধারণ করিলেন। বৃষ্টির অভাবে ম্লানি প্রাপ্ত পদ্ম যেমন বৃষ্টি প্রাপ্তে পুনঃ পরম শোভা প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ, জীবের সমাগমে নৃপতি পদ্মের মুখপদ্মে পূর্ব্ববৎ কান্তি আগমন করিল[৩৭]।

যেমন লতা সকল বসন্তের সমাগমে সরল ও সৌন্দর্য্যগুণান্বিত হয়, তেমনি; জীবসমাগমে ভূপতির অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল অল্পে অল্পে সরস ও সৌন্দর্য্যগুণান্বিত হইতে লাগিল[৩৮]। এবং মুখমণ্ডলে পূর্ণিমা তিথির চন্দ্রের ন্যায় কান্তি আগমন করিল[৩৯]। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল স্ফুরিত ও পল্লবে বসন্ত সমাগমে কান্তি আগমনের ন্যায় সে সকলেও কান্তি আগমন করিল[৪০]। অনন্তর, যেমন ভুবনাত্মা বিরাট, (ভগবানের বিশ্বমূর্ত্তি) স্বীয় চন্দ্রসূর্য্য-স্বরূপ নেত্রতারকা উন্মীলন করেন, সেইরূপ, মহীপতি এখন সৌভাগ্য-লক্ষণসম্পন্ন সর্ব্বমনোহর নেত্রদ্বয় উন্মীলিত করিলেন[৪১]। তদনন্তর বুদ্ধিমান্ বিন্ধ্যাচলের ন্যায় উত্থিত হইয়া মেঘের ন্যায় গভীর নিস্বনে কহিলেন "কে এ স্থানে বিদ্যমান আছ?"[৪২] এই সময় উভয় লীলা তাঁহার সম্মুখবর্ত্তিনী হইয়া বলিলেন "কি করিতে হইবে, আদেশ করুন।" রাজা স্বীয় সম্মুখে আকারে, প্রকারে, রূপে, গুণে, বাক্যে ও স্বরে, কার্য্যে ও কার্য্যোদ্যোগে সর্ব্বাংশে সমান উভয় লীলাকে দেখিতে পাইলেন। অনন্তর বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে? ইনিই বা কে? তোমরা কোথা হইতে আগমন করিয়াছ?"

প্রবুদ্ধ লীলা তাঁহার পুরোবর্ত্তিনী হইয়া বলিলেন, * দেব! ভবদীয় আদেশানুসারে তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন[৪৩।৪৫]। হে প্রভো! আমি আপনার সেই পূর্ব্বমহিষী লীলা। অর্থ যেমন বাক্যের সহিত মিলিয়া থাকে, সেইরূপ, আমিই আপনার সহিত চিরমিলিত আছি। ইনিও আপনার মহিলা, ইঁহারও নাম লীলা, আপনার-নিমিত্ত আমিই আমার প্রতিবিম্বরূপা ইঁহাকে অর্জ্জন (উৎপাদন) করিয়াছি। আর যিনি আপনার শিরোভাগে হৈম মহাসনে উপবিষ্টা রহিয়াছেন, ইনি সেই ত্রৈলোক্যজননী কল্যাণদায়িনী সরস্বতী দেবী। হে মহারাজ! আমরা বহুপুণ্যবলে এই দেবীর দর্শন প্রাপ্তা ও ইঁহার দ্বারা লোকান্তর হইতে এই স্থানে আনীতা হইয়াছি[৪৬।৪৯]।

অনন্তর রাজীবলোচন নরপতি লীলাপ্রমুখাৎ ঐরূপ বাক্য শ্রবণ করতঃ সসম্ভ্রমে শয্যা হইতে উত্থিত হইলেন এবং ভগবতীর চরণযুগলে নিপতিত হইয়া কহিলেন, হে সর্ব্বহিতপ্রদে দেবি! হে সরস্বতি! আমি তোমাকে নমস্কার করি। হে বরদে! আমাকে এইরূপ বরপ্রদান করুন যে, যেন আমি পরমার্থবুদ্ধিশালী, দীর্ঘায়ু ও ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন হই। নৃপতি ঐরূপ বর প্রার্থনা করিলে, ভগবতী তাঁহাকে স্বীয় করে স্পর্শ করিলেন। বলিলেন, পুত্র! তুমি তোমার প্রার্থনানুসারে দীর্ঘায়ু ও ধনাঢ্য হও[৫০।৫২]। তোমার সর্ব্বপ্রকার আপদ, দুষ্কৃতদৃষ্টি ও পাপ বুদ্ধ্যাদি বিনষ্ট হউক। তুমি অনন্ত সুখে অবস্থান কর এবং তোমার এই রাষ্ট্রে জনতা সর্ব্বদা হৃষ্টপুষ্ট থাকুক ও ত্বদীয় রাজলক্ষ্মী নিশ্চলা হইয়া অবস্থান পূর্ব্বক তদীয় ভবনে বিলাস করুন[৫৩]।

* প্রবুদ্ধ লীলার স্থূল শরীর ছিলনা দগ্ধ হইয়াছিল, সে কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এক্ষণে ইনি সঙ্কল্পের দ্বারা স্থূল শরীর রচনা করিয়া থাকিলেন। দ্বিতীয় লীলা সরস্বতীর বরে স্থূল শরীরেই পদ্মভবনে আসিয়াছেন। পদ্মরাজার স্থূল শরীর মৃত ও পুষ্পে ঢাকা ছিল। তাহা এখন বিদূরথের জীব প্রবেশ করায় পুনর্জ্জীবিত হইল। বিদূরথের স্থূলদেহ সেই রাজ্যে তদীয় বন্ধুগণের দ্বারা ভস্মীকৃত হইয়াছে।

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

একোনষষ্টি সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, সরস্বতী ঐ প্রকার বর দান করিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিতা হইলেন। ক্রমে প্রভাতকাল উপস্থিত হইল। তখন পঙ্কজগণের সহিত জনগণ প্রবুদ্ধ হইল[১]। নৃপতি স্বীয় মহিষী লীলাকে আনন্দভরে পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করিলেন, এবং লীলাও পুনর্জ্জীবিত পতিকে মহানন্দসহকারে পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করিলেন[২]। এদিকে রাজভবন আনন্দোন্মত্ত জনগণে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। সর্ব্বত্রই গীত ও বাদ্য, জয় ও মঙ্গলাদি পুণ্য বাক্য, মহাকোলাহলে নির্ঘুষ্ট (ঘোষণার বিষয়) হইতে লাগিল। অচিরাৎ হৃষ্টপুষ্ট জনগণ দ্বারা রাজবাটী সমাকীর্ণ হইয়া উঠিল। প্রাঙ্গনভূমি অনুচরবর্গ ও পৌরজনগণ প্রভৃতি রাজলোকে পরিপূর্ণ হইল[৩।৪]। সেই রাজসদনে সিদ্ধ ও বিদ্যাধরগণ আনন্দ সহকারে পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মৃদঙ্গ, মুরজ, কাহল, শঙ্খ ও দুন্দুভি প্রভৃতি বাদিত হইতে লাগিল[৫]। হস্তিবৃন্দ আনন্দভরে শুণ্ড উর্দ্ধীকৃত করতঃ বৃংহিত অর্থাৎ চীৎকার ধ্বনি করিতে লাগিল। নর্ত্তকীগণ নৃত্য করতঃ প্রাঙ্গন ভূমির অন্যান্য উল্লাস বৃদ্ধি করিতে লাগিল[৬]। জনগণের আনীত উপঢৌকন সকল পরস্পর সঙ্ঘট্টিত হইয়া ভূমি পতিত হইতে লাগিল। প্রচুর পরিমাণে ঔৎসবিক পুষ্প বহনকারী মনুষ্যের সঞ্চারে রাজসদন পরম শোভা ধারণ করিল[৭]। মন্ত্রী, সামন্ত ও নাগরিক গণ মঙ্গলসূচক পুষ্প, লাজা ও মুক্তাদি চতুর্দ্দিকে বর্ষণ করিতে লাগিলেন। চত্বরাকাশ নর্ত্তকীগণের ভুজ নিকরে আচিত হইয়া সমৃণাল রক্তপদ্মশতশোভিত সরোবরের শোভা ধারণ করিল[৮]। আনন্দোন্মত্তা স্ত্রীগণের গ্রীবাদেশ বিলাসের সহিত সঞ্চালিত হওয়ায় তাহাদের কর্ণদেশস্থ রত্নকুণ্ডলের দোদুল্যমানতা যুবকগণের নয়ন মুগ্ধ করিতে লাগিল। অনবরত পাদসম্পাতে, নিপতিত কুসুমরাজি মর্দ্দিত হওয়ায় রাজপথ পুষ্পরস কর্দ্দমে পিচ্ছিল হইয়া উঠিল[৯]। শরন্মেঘসদৃশ বিস্তৃত ও পট্টবস্ত্র বিনির্ম্মিত চন্দ্রাতপ দ্বারা সুশোভিত বিস্তৃত প্রাঙ্গণ ভূমিতে বরাঙ্গনাগণের বদন দৃষ্টে দর্শকগণের মনে হইতে লাগিল, যেন

চন্দ্র শতমূর্ত্তিতে পৃথিবীতে অবতরণ করতঃ নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছেন[১০]। "আমাদিগের রাজ্ঞী (দ্বিতীয়া লীলা) ও মহারাজ উভয়ে পরলোক হইতে আগমন করিয়াছেন" এইরূপ বাক্য গাথার ন্যায় ক্রমক্রমে শত শত জন প্রমুখাৎ দেশদেশান্তরে গমন করিতে লাগিল[১১]। এদিকে পদ্মভূপাল সংক্ষেপে বর্ণিত স্বীয়মরণ ও পরলোক গমন সম্বন্ধীয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, পরে সমানীত চতুঃসাগর জলে স্নান করিলেন[১২]। অনন্তর অমরগণ যেমন অমরেন্দ্রকে অভিষেক করেন, তেমনি, আজ্ ব্রাহ্মণ, মন্ত্রী ও অন্যান্য রাজগণ সমবেত হইয়া সেই রাজার অভিষেক কার্য্য সম্পাদন করিলেন[১৩]। পরে লীলা, দ্বিতীয় লীলা ও মহারাজ পদ্ম, এই তিন ব্যক্তি সরস্বতীদেবীর কৃপায় জীবন্মুক্ত হইয়া অমৃতসদৃশ স্ব স্ব প্রাক্তন বৃত্তান্ত কথোপকথন করতঃ আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন[১৪]। এই প্রকারে সেই মহীভুজ পদ্ম স্বীয় পৌরুষ বলে ও সরস্বতীর বরপ্রভাবে শুভজনক ত্রৈলোক্য প্রাপ্ত ও জ্ঞপ্তিদেবীপ্রদত্ত তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা প্রবুদ্ধ ও লীলাদ্বয় সমন্বিত হইয়া অষ্ট অযুত বর্ষ পর্য্যন্ত রাজ্য ভোগ করিয়াছিলেন[১৫।১৬]। তাঁহারা প্রজাদিগের নিত্য অভ্যুদয় সাধন দ্বারা সর্ব্বপ্রকারদোষরহিত, পাণ্ডিত্য সমাচার দ্বারা যশ, ধর্ম্ম ও সৌভাগ্যাদি পরিবর্দ্ধিত করতঃ প্রজানুরঞ্জন দ্বারা জনগণের সন্তোষপ্রদ রাজ্য বহুদিবস পালন করতঃ জীবন্মুক্ত হইয়া সিদ্ধসম্বিদ্ (পরিনিষ্ঠিত প্রবোধ প্রাপ্ত) ও বিদেহ মুক্ত হইয়াছিলেন[১৭।১৮]।

মণ্ডপোপাখ্যান সমাপ্ত।

একোনষষ্টি সর্গ সমাপ্ত।

ষষ্টিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন. রামচন্দ্র! পূর্ব্বে যে আমি "দৃশ্য নাই, সমস্তই মিথ্যা, এইরূপ বোধ দৃঢ় হইলে মন তখন আর দৃশ্য দর্শন করে না, দৃশ্য সকল মন হইতে উন্মার্জ্জিত হইলে তখন পরমা শান্তি প্রতিষ্ঠিতা হয়।" এইরূপ বলিয়া ছিলাম, সেই কথা সমর্থনার্থ আমি তোমার নিকট পাপনাশক মণ্ডপোপাখ্যান (লীলোপাখ্যান) বলিলাম। তুমি ইহা পরিজ্ঞাত হইয়া এই অসৎ জগতে সত্যতা বোধ পরিত্যাগ কর[১]। এইজন্য বলি, যে, দৃশ্যসত্তার সত্যতা বুদ্ধি ত্যাগ বা অপগত করা ব্যতীত দৃশ্যমার্জ্জনের অন্য উপায় নাই। যাহা সৎ অর্থাৎ বস্তুতঃ আছে, তাহারই উন্মার্জ্জন ক্লেশকর, কিন্তু যাহা নাই, তাহার উন্মার্জ্জনে ক্লেশ কি? অর্থাৎ জগতের মিথ্যাত্ব বুদ্ধ্যারোহ করিতে অল্পমাত্রও ক্লেশ স্বীকার করিতে হয় না[২]। তত্ত্বজ্ঞগণ আকাশের ন্যায় নিরাকার ও সর্ব্বব্যাপী জ্ঞানে দৃশ্য প্রপঞ্চকে মায়িক ভাসমানতা মাত্র মনে করেন এবং তদ্‌ভেদে এক অখণ্ড জ্ঞান লাভ করিয়া আকাশের ন্যায় নিত্য অদ্বয় ভাবে অবস্থিতি করেন[৩]। পৃথ্যাদিরহিত চিন্মাত্র বপুঃ স্বয়ম্ভু আপনাতে যে কিছু বিবর্ত্ত সৃষ্টি করিয়াছেন, সে সমস্তই সেই চিন্মাত্রস্বভাব পরমাত্মার মায়িক আভাস[৪]। সেই চৈতন্যরূপী স্বয়ম্ভু যখন যে প্রকার যত্ন করেন তখন সেই প্রকারই হন। সৃষ্টিবিৎ স্বয়ম্ভুর সৃষ্টিযত্নে সৃষ্টি, স্থিতিযত্নে স্থিতি এবং লয়যত্নে প্রলয় হইয়া থাকে, তাহার অন্যথা হয় না[৫]। যদিও ব্রহ্মাত্মরূপ নির্ম্মল চিদাকাশে এই জগৎ আভাসিত এবং তদনুসারে জগৎ ব্রহ্মসৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়, তথাপি, সে বোধ পরমার্থতঃ অপরিচ্ছিন্নভাবে (ব্রহ্মবস্তুতে) স্থান প্রাপ্ত হয় না। সে বোধ বৌদ্ধ বলিয়া অর্থাৎ বুদ্ধিবিকার বলিয়া, বুদ্ধিপরিচ্ছিন্ন বা বুদ্ধ্যুপাধিক জীবে অবস্থিতি করিতেছে। সুতরাং তাহাতে এই নিষ্কর্ষ হইতেছে যে, বুদ্ধিপরিচ্ছিন্ন জীবের প্রযত্ন বিশেষে তাহাদিগেরই উপভোগার্থ ব্রহ্মে এতাদৃশ সৃষ্টির আরোপ হইয়াছে[৬]। সেই জন্যই বলিয়াছি, দৃশ্য নাই, এই জ্ঞান দৃঢ় হইলে তখন আর দৃশ্য

দর্শন হইবে না। যাহা কেবল ভ্রান্তি, তাহার আবার সত্তা কি? বাসনা কি? আস্থা কি? নিয়তি কি? এবং অবশ্যম্ভাবিতাই বা কি?[৭] মায়িক সৃষ্টির ব্যবস্থা এই যে, দৃক্‌পথে থাকিলেও অর্থাৎ দৃষ্ট হইলেও তাহা পরমার্থ দৃষ্টিতে নাই। যাহা মায়ার কার্য্য, তাহা কেবল মায়া, অন্য কিছু নহে[৮]।

রামচন্দ্র বলিলেন, হে ভগবন্! আমি আপনার নিকট যার পর নাই উত্তম জ্ঞান লাভ করিলাম। এই জ্ঞান তৃণের দাহদোষ (উদ্ভিজ্জ দিগের শুষ্কতা) নিবারক চন্দ্রামৃতের ন্যায় সংসারসন্তপ্ত জনগণের শান্তি-বিধায়ক[৯]। কি আশ্চর্য্য! আমি আজ্ বহু দিনের পর অক্ষত জ্ঞাতব্য পরিজ্ঞাত হইলাম। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমি এখন শ্রুত দৃষ্টান্তাদি অবলম্বনে জগত্তত্ত্ব বিচার করিয়া শান্ত নির্ব্বাণ নামক পরম পদ প্রাপ্তের ন্যায় হইলাম[১০।১১]। কিন্তু হে ভগবন্! আপনি সর্ব্বজ্ঞ, সেই কারণে পুনর্ব্বার আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, সম্প্রতি আপনি আমার বক্ষ্যমাণ সংশয় বিনষ্ট করিলে আমার আর কোনও জ্ঞাতব্য অবশেষ থাকিবেক না। আমি আমার শ্রোত্ররূপ পাত্রের দ্বারা আপনার বচনামৃত পুনঃ পুনঃ পান করিয়াও পরিতৃপ্ত হইতেছি না[১২]। হে মহর্ষে! লীলাপতির বাশিষ্ঠ, পাদ্ম ও বিদূরথ, এই তিন সৃষ্টিতে কত কাল অতিক্রান্ত হইয়াছে, তাহা আমি জানিতে ইচ্ছুক। তাহা কি এক অহোরাত্রাত্মক? কি মাসমাত্রক, কি বহুবর্ষাত্মক?[১৩] অপর সংশয় এই যে, সেই কাল কাহার জ্ঞানে অত্যন্ত দীর্ঘ কি না? এবং কাহার জ্ঞানে ক্ষণমাত্র কি না? কাহার জ্ঞানে বহু বর্ষ কি না? এবং কাহার জ্ঞানে অপূর্ণ বৎসর ও পূর্ণ বৎসর কি না?[১৪] ভগবন্! অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই বিষয় আমার নিকট পুনর্ব্বার আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করুন। কেননা, শুষ্ক মৃৎপিণ্ডে এক বিন্দু জল নিপতিত হইলে তাহা তাহার উপকারে আইসেনা[১৫]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, অনঘ রামচন্দ্র! যে যে বিষয়কে যে প্রকারে জানে, সে বিষয় তাহার জ্ঞানে সেই প্রকারে সমুদিত হয়। অর্থাৎ তাহাই তাহার সম্বন্ধে সত্য হইয়া দাঁড়ায়[১৬]। তাহার দৃষ্টান্ত—সর্ব্বদা অমৃত ভাবনায় ভাবিত হইলে বিষও অমৃত হয়, * এবং মিত্রসম্বেদনে

* গরুড় উপাসকেরা বিষ খাইলেও মরে না। তাহার কারণ, তাহাদের ভাবনার অর্থাৎ আন্তরিক ভাবের (চিন্তার) সামর্থ্য অত্যধিক। তাহারা বিষকে অমৃত জ্ঞানের জের করিয়া

পরিভাবিত হইলে শত্রুও মিত্রতা প্রাপ্ত হয়[১৭]। পদার্থ সকল যে ভাবে ও যে আকারে পরিভাবিত হয়, ভাবনার অভ্যাস ও প্রভাব বশতঃ সে সকল সেই ভাবে ও সেই আকারে নিয়তির বশ্য হয়[১৮]। স্ফুরণ-স্বভাব সম্বিৎ চিত্তসঙ্কল্পের দ্বারা যে প্রকারে ও যাদৃশভাবে প্রস্ফুরিত হয়, সেই ভাব ও সেই আকার তদনুসারী অর্থক্রিয়াকারীও হয়[১৯]। তাহার দৃষ্টান্ত—যদি নিমেষ পরিমিত কালকে বহুকল্প বলিয়া জ্ঞান হয়, তাহা হইলে, সেই নিমেষই বহুকল্পের কার্য্য করিবে। আবার সেই বহুকল্প কাহার কাহার ভাবনায় নিমেষ বলিয়া জ্ঞাত হইয়া থাকে। তৎপ্রতি কারণ, সেইরূপই চিৎশক্তির স্বভাব। অর্থাৎ সঙ্কল্পানুসারী হইয়া প্রকাশ পাওয়াই চিৎশক্তির স্বভাব[২০।২১]। তাহার দৃষ্টান্ত, দুঃখিতের রাত্রি কল্পতুল্য ও সুখের কল্পও ক্ষণতুল্য হইয়া অতিবাহিত হইয়া থাকে। অপিচ, স্বপ্নে ক্ষণও কল্প হয়, আবার কল্পও ক্ষণ হয়[২২]। স্বপ্নে "আমি মরিয়াছি, আবার জন্মিয়াছি, বালক ছিলাম, এখন যুবা, দীর্ঘকাল দেশ ভ্রমণ করিয়াছি, শত যোজন পথ পর্য্যটম করিয়াছি" এরূপ অনুভবও হইয়া থাকে; পরন্তু সে সকল এক ক্ষণের অতিরিক্ত নহে[২৩]। রাজা হরিশ্চন্দ্র এক রাত্রিকে দ্বাদশ বর্ষ অনুভব করিয়াছিলেন; লবণ নামে এক রাজা এক রাত্রে শতবর্ষ পরমায়ুর ভোগ সমাপ্ত করিয়াছিলেন[২৪]। যাহা প্রজাপতি ব্রহ্মার মুহূর্ত্ত, তাহা মনুর পরমায়ু। যাহা বিরিঞ্চির পরমায়ুঃ, তাহা বিষ্ণুর এক দিন[২৫]। যাহা বিষ্ণুর পরমায়ু, তাহা বৃষভধ্বজ শিবের এক দিন। যাহাদের চিত্ত ধ্যান-পরিপাকে লয় প্রাপ্ত হইয়াছে, অর্থাৎ যাহারা সমাধিলীন, তাহাদের দিবাও নাই, রাত্রিও নাই, দৃশ্য পদার্থও নাই এবং জগৎও নাই। তাহাদের কেবল সত্য আত্মাই থাকে; অন্য কিছু থাকে না। যদি তুমি কটু ভাবে চিন্তা কর, তাহা হইলে মধুর রসও কটু হইবে[২৬।২৭]। মাধুর্য্য চিন্তা করিলে কটুও মধুর হইয়া থাকে। ঐরূপে শত্রুও মিত্র ও মিত্রও শত্রু হয়[২৮]। * জপ, উপাসনা ও শাস্ত্র শ্রবণাদি বিষয়েও

অমৃতশক্তি সম্পন্ন করে, তাই তাহারা বিষ ভক্ষণে মরে না। বিষের মারকতা শক্তি অবষ্টব্ধ হইয়া যায়।

* এই যে চিন্তার কথা বলা হইতেছে, এ চিন্তা সামান্য চিন্তা নহে। দীর্ঘকাল প্রগাঢ় চিন্তা প্রবাহের ন্যায় ছুটাইতে পারিলে তবে তৎপরিপাকদশায় সেই সেই বিষয়ে সম্প্রজ্ঞাত

ঐ নিয়ম অব্যভিচরিত। অর্থাৎ জপ ও উপাসনাদি অতি অভ্যস্ত হইলে জপ্য (যাহা জপ করা যায় তাহা জপ্য) ও উপাসিততব্য চিন্তারই অনুরূপ হইয়া থাকে। অতএব, যেরূপ সম্বেদন, পদার্থও সেইরূপ। ভ্রান্তিসম্বেদন দ্বারাই নৌকাযায়িগণ, ভ্রমিপীড়িত ও রোগার্ত্তগণ ভূম্যাদির প্রচলন অনুভব করে[২৯।৩০]। কিন্তু যাহাদের ভ্রমসম্বেদন নাই, তাহারা পৃথিব্যাদির প্রচলন অনুভব করে না। সম্বেদনের প্রভাবে শূন্যও আকীর্ণ, নীলও পীত এবং শুক্লবর্ণও রক্তবর্ণ স্বপ্নের ন্যায় দৃষ্ট ও অনুভূত হইয়া থাকে। অপিচ, আপদ্‌ও উৎসব এবং উৎসবও আপদ্ (যথাক্রমে সুখও দুঃখপ্রদ এবং দুঃখও সুখপ্রদ) হয়, ইহা বালক দিগের মধ্যে প্রসিদ্ধ। বালকেরা মোহ বশতঃ ঐ ঐ প্রকার অনুভব করে[৩১।৩২]। যক্ষ (ভূতাদি) নাই অথচ তাহা (যক্ষাদি) বিমূঢ়চিত্ত বালকগণের প্রাণবিনাশক হয় এবং স্বপ্নভাবিত মিথ্যা বনিতাও কখন কখন রতিপ্রদায়িনী হয়। আবার কখন কখন কুড্যও আকাশের ন্যায় দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব, যাহা যে আকারে চৈতন্যে ভাসমান হয়, তাহা সেই আকারেই স্থিরতা প্রাপ্ত হয়[৩৩।৩৪]। সম্বেদনও অসৎ, তথাপি তাহা আকাশসম। তাদৃশ সম্বেদনই চিদাকাশে মেঘের শতহস্ত পরিমিত ছায়ার ন্যায় ও মিথ্যা নটের নর্ত্তনের ন্যায় জগদ্ভাবে বিস্তৃত রহিয়াছে[৩৫]। এই জগৎ কেবল মনের স্পন্দন (কল্পনা) এবং উক্ত চিদ্গগনে বিস্ফুরিত। সুতরাং ইহা পৃথক্ বস্তু নহে। ইহা মিথ্যা জ্ঞানরূপ পিশাচের প্রস্পন্দে আকৃতিমানের ন্যায় দেখা যায়[৩৬]। সুতরাং বুঝিতে হইবে, ইহা কেবল মায়া—কেবল মায়া। যেহেতু মায়া, সেইহেতু ইহা ভিত্তিশূন্য ও অরোধক। ইহা সুপ্ত ব্যক্তির অপূর্ব্ব স্বপ্ন দর্শনের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে মাত্র[৩৭]।

বৎস রাম! যেমন ব্যাপার রহিত স্তম্ভ, আপনাতে শালভঞ্জিকা (খোদাই করা পুত্তলিকা) ধারণ করে, তেমনি, পরমার্থরূপ মহা-স্তম্ভ স্বয়ং ব্যাপার রহিত হইয়াও আপনাতে সৃষ্টি ধারণ করিতেছেন। যদ্রূপ মনুষ্য স্বপ্নে আপনাকে মহাযোদ্ধা কর্ত্তৃক বদ্ধ দর্শন করে, সেই মহাযোদ্ধা যেমন সৌষুপ্ত অজ্ঞান ব্যতীত অন্য কিছু নহে, তদ্রূপ, ব্রহ্মের সৃষ্টিও তদীয় অজ্ঞান ব্যতীত অন্য কিছু নহে। যেমন শিশি-

---

সমাধি হওয়ার পর চিন্তিতব্য পদার্থ সেই সেই আকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। পাতঞ্জলাদি যোগশাস্ত্রে এই সকল বিষয়ের বিশেষ বিবরণ আছে।

রান্তে অর্থাৎ বসন্তে মার্ত্তিক্য রসই পল্লবপুষ্পাদিস্বরূপে আবির্ভূত হয়, তেমনি, সৃষ্টির আদিতে এই সর্গও সেই পরম পদ হইতে আবির্ভূত হইয়াছিল। যেরূপ কনকের অন্তরে দ্রবত্ব অপ্রকাশিত ভাবে অবস্থিত থাকে,[৩৮।৪১] পরে অগ্নিসংযোগে তাহা প্রকটিত হয়, সেইরূপ, এই সৃষ্টিও সূক্ষ্মরূপে উক্ত পরম পদে অবস্থিত ছিল, জীবের অদৃষ্টযোগে তাহা প্রকটিত হইয়াছে। যদ্রূপ দেহীর অবয়ব সংস্থান দেহী হইতে ভিন্ন নহে, সেইরূপ, এই জগৎও পরব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে। যেমন কোন ব্যক্তি স্বপ্নাবস্থায় অন্য নরের সহিত স্বীয় যুদ্ধ সৎস্বরূপে দর্শন করে, আত্মস্বরূপ এই মায়িক জগৎও সেইরূপ সৎস্বরূপে প্রতীয়মান হইতেছে। অতএব, এই জগৎ, সৃষ্টির প্রারম্ভ অবধি মহাকল্পান্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বদা চিৎস্বভাবান্বিত, ইহাই বিদিত হইবে[৪২।৪৪]। ভাবিয়া দেখ, যেমন এতৎকল্পীয় হিরণ্যগর্ভের পূর্ব্বকল্পীয় বাসনায় এতৎ জগৎ প্রতিভাসিত হইয়াছে, তেমনি, তৎপূর্ব্ব কল্পীয় হিরণ্যগর্ভেরও তৎ পূর্ব্বকল্পীয় বাসনা সঞ্চিত ছিল। সৃষ্টিপ্রবাহ উক্ত ক্রমে অনাদি এবং সকল সৃষ্টিই চিৎসত্তায় অধিষ্ঠিত[৪৫]।

রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! বিদূরথের এই পৌরগণ ও মন্ত্রিবর্গ, সকলে সমান আকারে প্রতিভাসিত হইবার কারণ কি তাহা বলুন [৪৬]। বশিষ্ঠ বলিলেন, যেরূপ সামান্য বাতলেখা প্রবল বাত্যা হইতে উৎপন্ন হয়, সেইরূপ, সর্ব্বপ্রকার সম্বিদ্ই এক প্রধানতম মুখ্যচিত্ত হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। সেই চিত্তের অন্য নাম নিয়তি। অর্থাৎ তাহা সংস্কারপক্ষপাতী জীবচৈতন্য। তাদৃশ জীবচৈতন্য ঐরূপ প্রজাপালক, প্রজা, পুরবাসী ও মন্ত্রী প্রভৃতিরূপে পরম্পরানুসারে সমরূপে প্রস্ফুরিত হইয়াছিল, সেই কারণে উক্ত রাজকুলোদ্ভব, রাজা ও সেই সমস্ত বৈদূরথ পুরস্থিত জনগণ, সকলেই ঐ প্রকারেও ঐ বৈদূরথ পুরে প্রস্ফুরিত হইয়াছে[৪৭।৪৯]। চিন্তামণিনামক রত্ন অভীপ্সিতপ্রদস্বভাব কেন? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে কেহই সমর্থ নহে। স্বভাবের কারণ অন্বেষণ অনর্থক। এ স্থলে এইমাত্র বুঝিতে হইবে যে, যেমন চিন্তামণিরত্ন চিন্তকের মনোরথানুযায়ী স্বভাবে আবির্ভূত হয়, তেমনি, চিত্তসম্পন্ন জীবচৈতন্যও চিত্তসঙ্কল্পের অনুরূপ স্বভাবে সমুদিত হয়। রাজা বিদূরথ পূর্ব্বে "আমি অমুকপ্রকার কুলাচারাদিসম্পন্ন রাজা হইব"

এইরূপ চিন্তা করিয়াছিলেন, সেইজন্য তাঁহার তৎসংস্কারসম্পন্ন সম্বিদ্ সেইরূপে উদিত হইয়াছিল[৫০।৫১]। বিদূরথ! কেন, যে যে জীব যে যে সৃষ্টিতে যে যে সময়ে যে যে প্রকারে সমুদিত হয়, তাহারা সকলেই চিৎ-বিধাতার সর্ব্বব্যাপিতা কারণে সর্ব্বত্র স্বচিত্ত সংস্কারের অনুরূপেই সমুদিত হয়। যদি ব্রহ্মাকারা সম্বিৎ তীব্রবেগশালিনী হয় এবং যদি তাহা বিষয় দোষে অকম্পিত ও মোক্ষ না হওয়া পর্য্যন্ত একরূপে বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে সেই সম্বিদ্ই পরম উৎকৃষ্ট স্থৈর্য্য অর্থাৎ মোক্ষ দর্শন করায়[৫২।৫৩]। ব্রহ্মাকারা সম্বিৎ ও জগদাকারা সম্বিৎ এই দুএর মধ্যে যাহার বল অধিক হইবে তাহারই জয় হইবে[৫৪]। যদি বল, জগদ্জ্ঞানই চিরাভ্যস্ত, সেজন্য ব্রহ্মজ্ঞান দুর্লভ, বস্তুতঃ তাহা নহে। কেননা, ইহাও দেখা যায়, অযত্নজ বেগ অপেক্ষা যত্নজ বেগ অধিক বলশালী এবং সত্য বিজ্ঞানের নিকট মিথ্যা বিজ্ঞান অতীব দুর্ব্বল। অতএব, যদি অত্যধিক যত্নের সহিত ব্রহ্মসম্বিৎ উত্থাপন করা যায়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহার বেগ অযত্নসুলভ জগৎসম্বিদের বেগকে জয় করিবেই করিবে। অপিচ, ব্রহ্মসম্বিৎ বা ব্রহ্মজ্ঞান সত্য এবং জগৎসম্বিদ্ মিথ্যা। সে কারণেও ব্রহ্মসম্বিৎ জগৎসম্বিৎকে সমুদ্রের নদী গ্রাস করার ন্যায় গ্রাস করিবেক, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই[৫৫]। যদি দেখ, ব্রহ্মাকারা ও জগদাকারা সম্বিৎ সমান ভাবে উদিত হইতেছে, তাহা হইলে তখন এরূপ যত্ন করিবে, যাহাতে বাহ্যসম্বিদ্ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। বাহ্য জ্ঞান, দুর্ব্বল হইলেই তাহা ব্রহ্মজ্ঞানে নিমগ্ন হইয়া যাইবেক[৫৬]। বৎস রামচন্দ্র! যাহা বলিলাম, তাহাই নিয়তির বা চিদ্বিলাসের স্বভাব। পরিচ্ছেদ ভ্রান্তিতে ভ্রান্তিমান জীব সমূহের মধ্যে সকলেই ঐরূপ সম ও বিষম সৃষ্টি আপন আপন সঙ্কল্পের প্রভাবে অনুভব করিয়াছে, করিতেছে ও করিবে। বর্ণিতপ্রকারের সৃষ্টি শত শত ও সহস্র সহস্র অতীত হইয়াছে ও হইবে এবং বর্ত্তমানেও রহিয়াছে[৫৭]। কিন্তু বস্তুতঃ অদ্যাপি কেহ কোথাও যায় নাই, কেহ কিছু নূতন পায় নাই, এবং পাইবেও না। যাহা ছিল তাহাই আছে, বাস্তব কিছু হয় নাই। যে কিছু বলিবে, সমস্তই শান্ত চিদাকাশ[৫৮]। এ সকল স্বপ্নদর্শনের ন্যায় দেখিতে সুশ্রী। স্বপ্ন ভাঙ্গিলে বুঝিবে, যাহা দেখিয়াছিলাম তাহা মিথ্যা। যত্ন কর, অবশ্য এক দিন ভ্রমের আশ্রয় (স্বাত্মরূপ) দেখিতে পাইবে। তখন বুঝিবে, এই

জগত্তত্ত্ব কি প্রকার সূক্ষ্ম[৫৯]। যেমন একই বৃক্ষ পত্র, পুষ্প, ফল ও শাখা প্রশাখাদিরূপে অবস্থিত, তেমনি, সেই অনন্ত ও সর্ব্বশক্তি একই বিভু এই বিচিত্র দৃশ্যাকারে বা বিশ্বাকারে অবস্থিত। (পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহা শুদ্ধ পক্ষে; পরন্তু এখন যাহা বলা হইল তাহা মায়িক পক্ষে) যে মুহূর্ত্তে বোধ হইবে, অর্থাৎ ব্রহ্মদর্শন হইবে, সেই মুহূর্ত্তেই এ সকল বিস্মৃতি সাগরে নিমগ্ন হইয়া যাইবে। তখন প্রকাশ পাইবে, এ সকল কিছুই নহে ও কাহার নহে[৬০।৬১]। মায়িক নানাত্বের দ্বারা বস্তুর বাস্তব নানাত্ব সংঘটন হয় না। সুতরাং এ অবস্থায় দিক্‌কালাদিরূপের অবস্থিতি দেখিলেও ব্রহ্মবস্তু সদা শুদ্ধ অর্থাৎ সদা অবিকৃত। তাহা তমের অর্থাৎ অজ্ঞানের সাক্ষী (সাক্ষী=প্রকাশক)। তাহার উদয় নাই ও অস্ত নাই। তাহা সর্ব্বকালে এক ও অনাদি। তাহার আদি নাই, মধ্য নাই ও অন্তও নাই। যেমন, যাহা জল তাহা স্বচ্ছ। তাহা নিরস্তরঙ্গাদি অবস্থায়ও জল এবং অস্বচ্ছ ও তরঙ্গাদি অবস্থায়ও জল। জল ছাড়া অন্য কিছু নহে। তেমনি, যাহা আত্মা তাহা ব্রহ্ম। তাহা ব্রহ্ম অবস্থাতেও আত্মা, জগৎ অবস্থাতেও আত্মা। আত্মা ছাড়া অন্য কিছু নহে[৬২]। যেমন শূন্যলক্ষণ আকাশের শূন্যতাই তল, মালিন্য, মুক্তা-পঙক্তি, কেশগুচ্ছ ও কটাহাকারাদি আকারে বিজ্ঞাত হয়, তেমনি, শুদ্ধবোধলক্ষণ একাদ্বয় চিদাত্মার স্বরূপনিষ্ঠ অবিদ্যাই তুমি, আমি, ইহা, তাহা, ইত্যাদি ইত্যাদি বিচিত্র বিশ্বাকারে বিজ্ঞাত হইতেছে[৬৩]।

ষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

একষষ্টিতম সর্গ।

রামচন্দ্র বলিলেন, হে মহর্ষে! এই আমি, এবং এই জগৎ, এ ভাব বিনা কারণে সহসা যে প্রকারে উদিত হইয়াছিল (মূলে বা প্রথমে) তাহা পুনর্ব্বার বিশদ করিয়া বলুন[১]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, যত প্রকার ভ্রান্তি হউক, সমস্তই সম্বিদের অর্থাৎ স্বরূপ চৈতন্যের অন্তর্নিবিষ্ট। অপিচ, সমস্তই অন্তরে, বাহিরে নহে। সম্বিৎ সর্ব্বত্র এক। সেইজন্য তাহা সর্ব্বাত্মক ও অজ অর্থাৎ জন্মাদি রহিত। যেহেতু তাহা এক, সেইহেতু জগদ্ভ্রান্তির পৃথক্ কারণ নাই[২]। ঘট, পট ও মঠ প্রভৃতি বিষয়বাচী শব্দ ও সে সকলের অর্থ, অর্থাৎ সেই সকল বিষয়, একই চৈতন্যে অবভাসিত হয়। ঘটজ্ঞান, পটজ্ঞান, ইত্যাদি ব্যবহার দৃষ্টে আপাততঃ মনে হইতে পারে বটে যে, জ্ঞান ভিন্ন ভিন্ন, পরন্তু ঘটাদি বিষয় বাদ দিয়া বুঝিতে হইলে জ্ঞানের (চৈতন্যের) একত্ব অবশ্যই সিদ্ধ হইবে। একই চৈতন্যরূপ আধারে ইহা ঘট, ইহা পট, ইত্যাদি বিবিধ বা বিভিন্ন ভাব উদিত হইতেছে। বস্তুতঃ সে সকল ভেদ, চৈতন্যের নহে কিন্তু মনোবৃত্তির[৩]। আরও সূক্ষ্ম দেখিতে গেলে দেখা যায় যে, ঐ সকল বৃত্তিজ্ঞান বুদ্ধির অনতিরিক্ত। যেমন কটক হেম হইতে ও তরঙ্গ জল হইতে অপৃথক্, সেইরূপ, এই জগৎও ঈশ্বর হইতে অপৃথক্। কটকাদি যেমন হেমাত্মক; অথচ হেমে কটকত্ব নাই, তেমনি, এই জগৎও ব্রহ্মাত্মক; অথচ ঈশ্বরে জগত্ত্ব নাই[৪।৫]। যেমন অবয়বী একই, অবয়ব অনেক, তেমনি, একই নিরাকার চৈতন্যের অনেক আকার। কিন্তু সে সকল আকার বাস্তব নহে। অর্থাৎ মায়িক। কেননা চৈতন্যই সর্ব্বাত্মক[৬]। প্রাণিগণের অন্তঃস্থ অজ্ঞানই এই জগৎ ও এই আমি ইত্যাদি আকারে উক্ত পরব্রহ্মরূপ আধারে প্রতিভাত হইতেছে। যেমন স্ফটিকশিলায় প্রতিবিম্বিত বনশৈলাদি স্ফটিক শিলা হইতে ভিন্ন নহে, তেমনি, অন্তঃস্থ চৈতন্যে আরোপিত "এই জগৎ" "এই আমি" ইত্যাদি প্রতিভাস সেই ঘনচৈতন্য হইতে ভিন্ন নহে[৭।৮]। যেমন সলিলরাশি ও তরঙ্গমালা জলাভিন্ন হইয়া অবস্থিতি করে, তেমনি, অন্তরস্থ-

ভ্রমমান মিথ্যা, সৃষ্টি অর্থাৎ দৃশ্য প্রপঞ্চ উক্ত পরব্রহ্মে অপৃথগ্‌ভাবে অবস্থিতি করিতেছে[৯]। প্রভেদ এই যে, সাবয়ব মহাসলিলে ঐ সাবয়ব তরঙ্গমালা সকল তাহার অবয়বরূপে অবস্থিতি করিতেছে, পরন্তু নিরবয়ব পরব্রহ্মে এই সৃষ্টি তাঁহার অবয়বরূপে অবস্থিতি করিতেছে না। বিস্পষ্ট সাবয়ব জগৎ কি প্রকারে নিরবয়ব ব্রহ্মের অবয়ব হইবে? অতএব, অবয়বরূপে অবস্থিত নহে, কিন্তু মায়িক প্রতিভাস রূপে। জ্ঞানীর দৃষ্টিতে সৃষ্টি পরব্রহ্ম অথবা পরব্রহ্মে সৃষ্টি, দুয়ের কিছুই নহে। তাঁহাদের দৃষ্টিতে একই সত্তা বিদ্যমান, সৃষ্টি সেই সত্তা হইতে অভিন্ন[১০]। বায়ু যেমন আপনিই আপনার স্পন্দনের কারণ হয়, মুখাবস্থিত চক্ষুঃ (দৃষ্টি) যেমন দর্পণপ্রতিহত ও পরাবৃত্ত হইয়া মুখ অবলোকন করে, সেইরূপ, পরমার্থচিদ্রূপ পরব্রহ্মও আপন পারমার্থিক রূপ আপন অজ্ঞানে আবৃত করিয়া আপনার সম্বিত্তির দ্বারা আপনাকে প্রপঞ্চরূপী কল্পনা করেন[১১]। সেই প্রথম কল্পনাকালে, সেই মায়াসম্বলিত পরব্রহ্ম, প্রথম আপনাকে ছিদ্রের ন্যায় (ছিদ্র=ফাঁক)। চেতিত করেন, তাহাতে যে ভাব ব্যক্ত হয়, সেই ভাবকে শাস্ত্রকারেরা শব্দতন্মাত্রের অর্থাৎ আকাশের উৎপত্তি বলিয়া ব্যাখ্যা করেন[১২]। অনন্তর, স্থির পবন যেমন এক এক সময়ে স্পন্দতা অনুভব করে, সেইরূপ, সেই আকাশাভিমানী ব্রহ্মও তৎপরে স্পর্শতন্মাত্রসংস্কার দ্বারা আপনাকে অনিল বলিয়া অনুভব করেন। সেই ক্রমেই ব্রহ্ম অনিল স্বরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। অনন্তর রূপতন্মাত্রসংস্কার দ্বারা তেজঃস্বরূপে প্রকাশিত হন, শাস্ত্রকারেরা সেই প্রকাশ'কে তেজের উৎপত্তি বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন[১৩।১৪]। তদনন্তর রসতন্মাত্রসংস্কার দ্বারা তেজোহভিমানী পরব্রহ্ম আপনাকে সলিল ভাবে অনুভব করেন। সেই ক্রমে দ্রবস্বভাব জলের সৃষ্টি হইয়াছে[১৫]। তদনন্তর সেই সলিলাভিমানী চিদ্‌ব্রহ্ম গন্ধতন্মাত্রসংস্কার দ্বারা আপনাতে ঘনঘন পার্থিব ভাব অনুভব করেন এবং তদনুসারে ব্রহ্মসত্তাত্মিকা পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছে[১৬]। * এস্থলে এমন মনে করিতে পারিবে না যে, যেই চক্ষুর উন্মেষ সেই

---

* এ সকল সংস্কার পূর্ব্বকল্পীয় অনুভবপ্রভব। পূর্ব্বকল্পেও চিন্মাত্ররূপী পরব্রহ্ম আপনাতে ক্রমান্বয়ে আপন মায়ার দ্বারা ঐ ঐ বিকার বা ভাব দেখিয়াছিলেন, অনুভব করিয়াছিলেন, তাই সে সকলের সংস্কার তদীয় মায়ায় অবশেষিত হইয়া ছিল।

জগদ্দর্শন, সুতরাং ঐ প্রকারের ক্রমিক আরোপ কিরূপে সঙ্গত হইবে? এ সম্বন্ধে বোধ হয়, এই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, এক নিমেষের লক্ষভাগের এক ভাগ সময়ের মধ্যে পরব্রহ্মের পূর্ব্বোক্ত তন্মাত্রাদিরূপ প্রকট হইয়াছিল পরন্তু তাহা মায়িক আরোপের প্রভাবে কোটি কোটি কল্প বলিয়া সর্গপরম্পরায় প্রথিত হইয়া আসিতেছে। সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মতম কালে কল্প কল্পান্ত ভ্রম হওয়া অবিরুদ্ধ। কেননা স্বপ্নেও ক্ষণকে কল্প বলিয়া অনুভূত হইতে দেখা যায়[১৭]। বিশুদ্ধ ও সংস্বরূপ অদ্বয় পরব্রহ্মই নিত্য স্বপ্রকাশ, অনাময় ও নিরাধার। তাহাই স্বীয় অন্তঃস্থ দৃশ্য ও এ সকলের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়। সেই সৎই বোধকালে অর্থাৎ ভ্রান্তির অপগমে মুক্ত এবং অবোধ দশায় সৃষ্টি ও প্রলয়[১৮।১৯]। যেহেতু ইনি সর্ব্বশক্তিমতী মায়ার আশ্রয়, সেইহেতু, যে যে মায়িক জীব ইঁহাকে যে যে ভাবে দেখে, তদ্বলে সেই সেই ভাবই ইঁহাতে মায়ার দ্বারা বিবর্ত্তিত হয়, তাহার অন্যথা হয় না[২০]। সেই কারণে বলিতেছি, এই জগৎ সেই ব্রহ্মের বিলাসানুভব ব্যতীত অন্য আর কিছু নহে। মনঃপ্রভৃতি ছয় ইন্দ্রিয় বহির্ম্মুখী বৃত্তির দ্বারা যাহা যাহা দেখে ও শুনে ও অনুভব করে, সে সমস্ত কেবল নাম ও কেবল কল্পনা, সুতরাং অসত্য[২১]। যেমন বায়ুতে গতি, তেমনি, পরব্রহ্মে জগৎ। বায়ু যেমন সঞ্চরণ কালে সত্য অর্থাৎ আছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়, কিন্তু স্থিরভাবে অবস্থিত থাকিলে সত্য বলিয়া অর্থাৎ আছে বলিয়া অনুভূত হয় না, সেইরূপ, এই জগৎও অজ্ঞানতার দ্বারা সত্য অর্থাৎ আছে বলিয়া এবং তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা অসৎ অর্থাৎ নাই বলিয়া প্রতীয়মান হয়[২২]। তেজ'কে আলোক দৃষ্টিতে না দেখিলে (আলোক ভাবিলে) তাহা অসত্য এবং তেজ ও আলোক অভিন্ন, এ ভাবে দেখিলে তাহা সত্য। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, ভেদভাবে দেখিলে ভিন্ন, অভেদ দৃষ্টিতে দেখিলে অভিন্ন। যেমন তেজঃপদার্থের প্রকার ভেদ আলোক, তেমনি, চিদ্ব্রহ্মের প্রকারভেদ এই বিশ্ব। অতএব, বিশ্ব দৃষ্টিভেদে সত্য ও অসত্য উভয়রূপে প্রতীয়মান হয়[২৩]। যেমন মৃত্তিকায় ও কাষ্ঠে পুত্তলিকা ও মসীতে বর্ণ অনুৎকীর্ণ অবস্থাতেও অবস্থিত থাকে, সেইরূপ, এই জগৎও এক সময়ে পরব্রহ্মে (সৃষ্টির পূর্ব্বে) অব্যক্ত অবস্থায় স্থিত ছিল[২৪]। ইদানীং সেই পরব্রহ্মরূপ মরুভূমিতে এই

ত্রিজগৎরূপ অসত্য মৃগতৃষ্ণিকা সত্যের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে[২৫]। সেই ব্রহ্ম চিন্ময়তা প্রযুক্ত কখন সৃষ্টিপ্রপঞ্চাকারে প্রকাশিত হন, কখন বা বীজে বৃক্ষাবস্থানের ন্যায় ইহাকে আপনাতে প্রলীন রাখেন[২৬]। যেমন ক্ষীরে মাধুর্য্য, মরীচে তীক্ষ্ণতা, জলে দ্রবত্ব ও বায়ুতে স্পন্দন অনন্যরূপে অবস্থিতি করে, সেইরূপ, পরমাত্মাতেও এ সকল অভিন্নরূপে বিদ্যমান আছে। সুতরাং এই সৃষ্টি চিৎস্বরূপ পরমাত্মারই বিবর্ত্তিত রূপ[২৭।২৮]। যাহা জগৎ, তাহা ব্রহ্মরত্নেরই প্রকাশ। যেহেতু ইহা ব্রহ্মের অনতিরিক্ত, সেইহেতু ইহা অকারণ অর্থাৎ উৎপত্তি-বর্জ্জিত[২৯]। বাসনাময়চিত্তের দ্বারাই ইহার উদয় হইয়াছে, সুতরাং পুরুষকার দ্বারা (সমাধি ভাবনাদির দ্বারা) উক্ত বাসনাময় মনকে বিনষ্ট (ব্রহ্মে বিলীন) করিতে পারিলে আর ইহার উদয় হইবে না[৩০]। বস্তুতঃই এই জগৎ কোনও কালে উদিত বা অস্তমিত হয় না। কেননা ইহা সেই কেবল শান্ত অজ ব্রহ্ম[৩১]। যত দিন চিত্ত থাকিবে তত দিনই চিত্ত হইতে চিৎকণাত্মক জীবের জ্ঞানে সহস্র সহস্র সৃষ্টি প্রতিভাত হইবে। বিনা মায়ায় এরূপ সৃষ্টির সম্ভাবনা কি?[৩২] যেমন ঊর্ম্মী বল আর বুদ্বুদ বল জলের বা সলিলের অন্তরে গুপ্ত ও প্রকাশ্য উভয় ভাবেই অবস্থিতি করে, তেমনি, জীবের অন্তরে এই জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্ত্যাদিপরম্পরারূপিণী সৃষ্টি, প্রকাশ্য ও গুপ্ত উভয় ভাবে স্থিতি করিতেছে[৩৩]। জীবগণের যদি বিষয়ভোগে অল্পমাত্রও অরতি জন্মে, তাহা হইলে সেই অরতি ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইয়া অবশেষে তাহাকে উক্ত পরম পদ প্রাপ্ত করায়[৩৪]। স্পষ্টই দেখা যায়, জীব যাহাতে যাহাতে বিরক্ত হয়, তাহা তাহা হইতেই বিমুক্ত হয়। এতদ্দৃষ্টান্তে জ্ঞান ও বৈরাগ্যের দৃঢ়তা করিয়া তদ্দ্বারা দেহাদি বিস্মৃত হইলে ও অহম্ভাবের প্রতি বিরক্ত হইলে অবশ্যই জীব অহম্ভাব হইতে বিমুক্তি লাভ করিতে পারে। অহম্ভাব বিমুক্ত হইলে তখন আর কে জন্মমরণ ভ্রান্তি প্রাপ্ত হইবে? বা অনুভব করিবে?[৩৫] যাহা ঈশ্বরচৈতন্যাত্মিকা, জীবচৈতন্যাত্মিকা, অরূপিকা, অনামিকা ও নিকৃষ্টোপাধিশূন্যা চিৎ, তাহাকে যিনি আত্ম-অভেদে অবগত হইতে পারেন, তিনিই জয়লাভে সমর্থ হন[৩৬।৩৭]। এই বিশ্ব পদ্মজ ব্রহ্মার অহংময়ীভাবনাবিশিষ্ট চিৎসঙ্কল্প হইতে বিস্তৃত হইয়াছে। আশ্চর্য্য এই যে, বিষ্ণুর এক নিমেষ বিধাতার দ্বিসপ্ততি সহস্র সংখ্যক যুগান্ত কাল। অহো! মায়া কি বিচিত্রপ্রভাব সম্পন্না[৩৮]।

দ্বিষষ্টিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, কল্পনার এমনি প্রভাব যে, এক পরমাণুকে ও এক নিমেষকে কল্পনার দ্বারা লক্ষ ভাগ করিলে তাহার একই ভাগে ঈদৃশ সহস্র ব্রহ্মাণ্ড ও সহস্র কল্প সত্যবৎ প্রতীত হইতে পারে। সেই-জন্যই বলিতেছি, এ সমস্তই ভ্রান্তি১।২। যেমন সলিলরাশির অন্তরে প্রবাহ ও আবর্ত্ত, তেমনি, এই বর্ত্তমান ও সেই সেই অনাগত ও অতীত সৃষ্টিপরম্পরা জীবের অন্তরে প্রবাহিত হইতেছে৩। যেমন মরু-তরঙ্গিণী মিথ্যা, তেমনি, সৃষ্টিপরম্পরাও মিথ্যা৪। অধিক কি বলিব, স্বাপ্ন ও ঐন্দ্রজালিক নগরী এবং ঔপন্যাসিক পুরী ও পর্ব্বতাদি এবং সঙ্কল্প-রচিত রাজ্য যেমন অসত্য হইলেও অনুভূতির গোচর হয়, তেমনি, সৃষ্টিপরম্পরা অসত্য হইয়াও অনুভূতিগোচর হইতেছে৫।

রামচন্দ্র বলিলেন, হে তত্ত্ববিদ্‌শ্রেষ্ঠ! জনগণ সম্যক্‌ বিচার দ্বারা ভ্রমপরিশূন্য ও পরমাত্মার সহিত অভিন্ন হইয়া উৎকৃষ্ট নির্ব্বিকল্প বিজ্ঞান লাভ করেন অথচ তাহারা ভ্রমমূলক দেহ ধারণ করেন। তাহার কারণ কি এবং দৈবই বা তাঁহাদের সম্বন্ধে কিরূপ, তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন৬।৭।

বশিষ্ঠ বলিলেন, বৎস! স্পন্দরূপিণী অবশ্যম্ভাবিনী সকলকল্পগামিনী ব্রাহ্মী চিৎশক্তিই আদি মহানিয়তি। * উক্ত মহানিয়তিই আদি সৃষ্টি-কালে মঙ্গলময় অক্ষয় পরব্রহ্মের সঙ্কল্পরূপে উদ্রিক্তা হয়। অর্থাৎ তিনি বহ্নি উষ্ণ ও ঊর্দ্ধজ্বলনস্বভাব হউক, জল দ্রবশীতলস্বভাব হউক, ইত্যাদি আকারের সংকল্প ধারণ করেন৮।৯। অপিচ, উক্ত মহানিয়তি মহাসত্য, মহাচিতি, মহাশক্তি, মহাদৃষ্টি, মহাক্রিয়া, মহোদ্ভব, মহাস্পন্দ ও মহাত্মা

* প্রাণীর অদৃষ্ট, বস্তুর শক্তি, এতদ্দ্বয় সহকৃত ঈশ্বরিক সঙ্কল্পের নাম মহানিয়তি ও মহা-দৈব। তদ্দ্বারা সমস্ত ব্যবহারের অকাট্য ব্যবস্থা নির্ব্বাহ হয়। এবং জ্ঞানীর দেহধারণ করাও উক্ত মহানিয়তির অধীন। নিয়তির অন্তর্গত "প্রারব্ধ কর্ম্ম, ভোগ ব্যতীত ক্ষয় পাইবে না" এই নিয়ম দ্বারা জ্ঞানীর দেহ কিছু কাল বিধৃত থাকে। স্পন্দরূপিণী কথার অর্থ—সর্ব্বজগদ্ব্যবস্থিতি কারক ব্যবহারপরম্পরা। অর্থাৎ নিয়মিত সুশৃঙ্খলায় জগৎ কার্য্য নির্ব্বাহ হওয়া।

ইত্যাদি নামে খ্যাত হইয়া থাকে[১০।১১]। অতএব, সর্ব্বগ ও সর্ব্বাত্মক ব্রহ্ম উক্তনিয়তির দ্বারা দৈত্য, দেব ও নাগাদি এবং তৃণ, বল্লী, তরু ও গুল্মাদির ব্যবস্থা সম্পন্ন করেন এবং সে ব্যবস্থা কল্পান্ত না হওয়া পর্য্যন্ত প্রস্ফুরিত থাকে, কদাচ তাহার অন্যথা হয় না[১২।১৩]।

যদিও কোন অবস্থায় ব্রহ্মসত্তার অন্যথা হয় তথাপি নিয়তির অন্যথা হয় না। আকাশে চিত্রলিপি যদ্রূপ অসম্ভব, নিয়তির অন্যথা তদ্রূপ অসম্ভব। (তত্ত্বজ্ঞানাবস্থায় পরমার্থদৃষ্টি সুতরাং তৎকালে ব্রহ্মাদ্বৈত বা কেবল ব্রহ্মসত্তা। পরন্তু সংসারাবস্থায় ব্যবহার দৃষ্টি, সেজন্য তৎকালে ব্রহ্মসত্তার অন্যথা ভাব। অর্থাৎ ব্যবহার দশায় সৃষ্টির দ্বারা ব্রহ্মসত্তার প্রচ্ছাদন হইয়া থাকে)। ব্রহ্ম অনাদি অমধ্য অসীম ও অচল হইলেও অনভিজ্ঞের মলিন জ্ঞানে সসীম, সাদি ও সমধ্য বলিয়া অবভাসিত হন। কিন্তু বিরিঞ্চি প্রভৃতি আত্মবিৎ জ্ঞানীর জ্ঞানে বর্ণিত প্রকারের সৃষ্টি ও নিয়তি সমস্তই ব্রহ্ম, অন্য কিছু নহে[১৪।১৫]। যেমন স্ফটিকমণির অন্তরস্থ রেখাদি (দাগ বা কলঙ্কাদি) তাহার নিজ স্বচ্ছতার দ্বারা প্রকাশ পায়, তেমনি, সৃষ্টিসংস্কারযুক্তমায়াসমন্বিত প্রজাপতি ব্রহ্মাও স্বমায়ান্তঃস্থ সৃষ্টিনিয়তি বিজ্ঞাত হইয়া তদনুরূপ সৃষ্টি করেন[১৬]। যেমন অঙ্গীর অঙ্গ (সাবয়বীর অবয়ব) দেহেরই অন্তর্ভূত, তেমনি, নিয়তি প্রভৃতিও মায়াসহায় ব্রহ্মের (হিরণ্যগর্ভের) অন্তর্ভূত[১৭]। অপিচ, তাহারও অন্য নাম দৈব এবং তাদৃশ দৈব সর্ব্বকালব্যাপী ও সর্ব্ববস্তুগামী হইয়া শুদ্ধস্বভাব ব্রহ্ম চৈতন্যে অবস্থিতি করিতেছে[১৮]। "অমুকের দ্বারা অমুক প্রকারে অমুক সময়ে অমুক প্রকার হইবে, তাহার অন্যথা হইবে না" ইত্যাকার নিয়মকেও অর্থাৎ অবশ্যম্ভাবিতাকেও দৈব বলা যায়, এবং তাদৃশ দৈব শাস্ত্রবক্তা দিগের নিকট অদৃষ্ট[১৯]। পূর্ব্বোক্ত দৈব ও অনন্তরোক্ত দৈব অর্থাৎ নিয়তি ও অদৃষ্ট পরস্পর পরস্পরের সহায়। সুতরাং বলা যায়, দৈব ও পুরুষকার বিশেষ এবং তাদৃশ দৈবই তৃণ, গুল্ম ও লতা প্রভৃতি। হে রামচন্দ্র! বর্ণিতপ্রকারের নিয়তি উক্ত প্রকারে ভূতগণের আদি এবং এই জগৎ ও কাল প্রভৃতি সমস্তই উক্ত প্রকারের দৈব বা

---

* দৈত্যেরা ক্রূরাদি স্বভাব, দেবতারা সৌম্যমূর্ত্তি প্রভৃতি, নাগেরা সেই সেই প্রকার এবং তৃণাদি জঙ্গমভাবাপন্ন, ইত্যাদি ব্যবস্থা সৃষ্টির প্রারম্ভাবধি মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত সমানরূপে ব্যবস্থিত থাকিবে, ইহাও নিয়তি।

নিয়তি[২০]। অপিচ, যে নিয়তির কথা বলিলাম, সেই নিয়তির দ্বারাই পুরুষকারের ও পুরুষাদৃষ্টের অস্তিত্ব এবং পুরুষকারের ও পুরুষাদৃষ্টের দ্বারা নিয়তির সত্তা অর্থাৎ অবস্থিতি দৃষ্ট বা অনুভূত হইতেছে। যাবৎ ত্রিভুবন তাবৎ ঐরূপ জগদ্ব্যবস্থা এবং মহাপ্রলয়ে অর্থাৎ ত্রিভুবনের অভাব-কালে উক্ত দৈব দ্বয়ের (নিয়তির ও অদৃষ্টের) ব্রহ্মে একাত্মভাব (মেলন বা ঐক্য) সম্পন্ন হয়[২১]। অতএব, নিয়তি (দৈব) ও পৌরুষ (পুরুষকার) উভয়ের সত্তা (অস্তিত্ব) জীবাদৃষ্টমূলক, আবার জীবা-দৃষ্টের ও নিয়তির সদ্ভাব পুরুষকারমূলক। নিয়তি ঐরূপ নিয়মে ও ক্রমে অস্তিতা লাভ করিয়া রহিয়াছে[২২]। হে রাঘব! অধিক কি বলিব, তুমি যে শিষ্য হইয়া আমার উপদেশ গ্রহণ করিতেছ, ইহাও নিয়তিকৃত। দৈব কি? পুরুষকার কি? এই প্রশ্নের সমাধানার্থ যাহা বলিলাম, তুমি তাহা প্রতিপালন করিবে। এ সকল নিয়তি বলিয়া মান্য ও প্রতিপালন করিলে তাহা তোমার পুরুষকার বলিয়া গণ্য হইবে[২৩]। এমন অনেক লোক আছে, যাহারা কেবল দৈবপরায়ণ। তাহারা যে দৈবের উপর নির্ভর করিয়া পুরুষকারত্যাগী হয় (অজগর ব্রত অবলম্বন করে), তাহাও নিয়তিকৃত। অর্থাৎ তাহাও তাহাদের প্রাক্তনকর্ম্মসংস্কারজনিত নিয়তির (অদৃষ্টের) ফল[২৪]। পুরুষ বা জীব যদি পূর্ব্ব হইতেই (কল্পারম্ভ হইতেই) কেবল ও নিষ্ক্রিয় হইত, বা থাকিত, তাহা হইলে বুদ্ধি, বুদ্ধিপ্রযুক্ত কর্ম্ম, তৎপ্রযুক্ত ভূতভৌতিক বিকার অর্থাৎ আকৃতি ও সংস্থান, এ সকল কিছুই হইত না বা থাকিত না। অতএব, কল্পাদি ও কল্পান্ত মধ্যে যে কিছু ব্যবহার ও যে কিছু জগদ্-ব্যবস্থা, সমস্তই পুরুষক্রিয়ামূলক সুতরাং নিয়তির অধীন[২৫]। অধিক কি বলিব, যাঁহারা ঈশ্বর (ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর) তাঁহারাও নিয়তি উল্লঙ্ঘন করিতে সমর্থ নহেন। কেননা নিয়তি অবশ্যম্ভাবিনীরূপিণী। নিয়তি অবশ্যম্ভাবিনী হইলেও তাহার ফলাফল পুরুষকারমূলক। অর্থাৎ যে নিয়তি পুরুষকারে পরিণত হয় সেই নিয়তিরই ফল তদুত্তর কালে দৃষ্ট হয়। অতএব, যাঁহারা বুদ্ধিমান, তাঁহারা "নিয়তি যাহা করিবে তাহাই হইবে" এরূপ ভাবিয়া পুরুষকার পরিত্যাগী হন না[২৬।২৮]। নিয়তি পুরুষকারে পরিণত না হইলে তাহা নিষ্ফল হয় এবং পুরুষকারে পরিণত হইলে তাহা সফল হয়। যদি বল, পুরুষকার রহিত অজগর

বৃত্তি অবলম্বন করিলে তাহাতেও তৃপ্তিফল দেখা যায়, তদুত্তরে আমার বক্তব্য—তাহাতেও গ্রাস গ্রহণরূপ * পুরুষপ্রযত্ন থাকে। যে গ্রাসগ্রহণাদি প্রযত্ন পরিত্যাগ করে সে কদাচ তৃপ্তিফল পায় না। সে যে ক্ষুধা তৃষ্ণা সহ্য করিয়া কিঞ্চিৎকাল জীবিত থাকে, তাহাতেও প্রাণ পরিচালনাত্মক প্রযত্ন বিদ্যমান থাকে[২৯]। যদি এমন বল যে, নির্ব্বিকল্প সমাধিতে প্রাণ প্রচলনও থাকে না, সে অবস্থা সর্ব্ববিশ্রান্তিদায়িনী, তখন সর্ব্বপ্রকার পুরুষকারের বিরাম দৃষ্ট হয়, সে বিষয়ে আমার বক্তব্য—সেই অবস্থাই সর্ব্বপ্রকার পুরুষপ্রযত্নের শেষ ফল অর্থাৎ তাহাই মোক্ষ। যদিও তৎকালে পুরুষকারের বিরাম হয়, তথাপি, তৎপূর্ব্বে তাহাকে প্রাণনিরোধাদি পুরুষকার অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। সেই অত্যুত্তম মোক্ষপদ অপৌরুষেয় নহে। তাহাও প্রাণনিরোধাদি (যোগানুষ্ঠান) রূপ পুরুষকারের ফল[৩০]। অতএব, হে রাঘব! সাধন কালে শাস্ত্রীয় পুরুষকার অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ এবং সিদ্ধি কালে তৎফলস্থানীয় অত্যন্ত নিষ্কর্ম্মাত্মক মোক্ষ পরম শ্রেয়ঃ। সাধ্য ও সাধন এই দুই অবস্থার মধ্যে যাহা জ্ঞানীদিগের অবস্থা তাহা অত্যন্ত প্রবল। অর্থাৎ মহাত্মাদিগের সেই সিদ্ধিরূপ নিয়তি নির্দ্দুঃখা (যে নিয়তিতে দুঃখের লেশ পর্য্যন্তও নাই বা থাকে না তাহা নির্দ্দুঃখা) এবং অবিদ্যাবিনাশিনী বলিয়া প্রবলা[৩১]। তাদৃশী নির্দ্দুঃখা নিয়তি কি? তাহা ব্রহ্মসত্তারই স্ফূর্ত্তিবিশেষ। যদি যত্নের দ্বারা অর্থাৎ শাস্ত্রীয় পুরুষকার দ্বারা নির্দ্দুঃখা নিয়তি স্থায়ী করিতে পারা যায়, তাহা হইলে যার পর নাই পরিশুদ্ধ পরম পদ বা পরমা-গতি সুসম্পন্না হয়[৩২]। বৎস রাম! বর্ণিত প্রকারের নিয়তি বিভাগ ব্রহ্মেরই বিলাস। অর্থাৎ ব্রহ্মই সেই সেই প্রকারে স্ফুরিত হইতেছেন। যেমন তৃণ বল, লতা বল, গুল্ম বল, সমস্তই পার্থিব রসের বিস্ফুরণ, তেমনি, নিয়তি কেন, সমুদায় জগৎসত্তা সেই পরব্রহ্মের মায়িক প্রস্ফুরণ[৩৩]।

দ্বিষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

* অজাগর সর্প চুপ করিয়া থাকে। সম্মুখে কিছু আসিলে তখন তাহা গ্রাস করিয়া ফেলে। গ্রাস করা প্রযত্ন বা মুখব্যাদানাদি চেষ্টা ব্যতীত হয় না। সুতরাং অজগর ব্রতেও কিছু না কিছু পুরুষকার বিদ্যমান থাকে।

ত্রিষষ্টিতম সর্গ

বশিষ্ঠ বলিলেন, প্রস্তাবিত ব্রহ্মতত্ত্বের বিবরণ এই যে, তাহাই এই নানাপ্রকার, তাহাই সর্ব্বকালে ও সর্ব্বত্র বিরাজিত। তিনি সর্ব্বাকার, সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বগ ও সর্ব্বস্বরূপ[১]। যিনি ব্রহ্ম তিনিই আত্মা। এই আত্মা সর্ব্বশক্তিত্ব প্রযুক্ত কোথাও চিৎশক্তি, কোথাও বা জড়শক্তি এবং কোন আধারে উল্লাসশক্তি স্বরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। আবার কোথাও বা কোনওপ্রকার স্বরূপ প্রকাশ করিতেছেন না[২]। তিনি যখন যে প্রকার ভাবনা করেন; তখন সেই প্রকার দেখেন বা সেই প্রকারে দৃষ্ট হন[৩]। বস্তুতঃ, সর্ব্বশক্তি পরব্রহ্মের যে যে শক্তি যে যে প্রকারে সমুদিত হয় তিনি সেই সেই প্রকারই হন[৪]। তাঁহার যে নানারূপিণী শক্তি আছে, তাহা স্বভাবতঃ তদভিন্না হইলেও ভেদ কল্পনা পূর্ব্বক ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়াছে। অর্থাৎ ব্যবহার দৃষ্টিতে তদীয় সেই শক্তি নানারূপিণী; পরন্তু পরমার্থ দর্শনে তাহা একই[৫]। ভেদকল্পনা ব্যবহারাশ্রিত। সেজন্য তাহা পরমাত্মায় অনবস্থিত[৬]। যেমন জলে ও তরঙ্গে, জলে ও সাগরে, অলঙ্কারে ও সুবর্ণে, অবয়বে ও অবয়বীতে ভেদ অবাস্তব, একতাই বাস্তব, তেমনি, ব্রহ্মে ও ব্রহ্মশক্তিতে ভেদ অবাস্তব এবং অভেদই বাস্তব[৭]। যাহা যে প্রকারে চেতিত হয় অর্থাৎ বুদ্ধি যে প্রকারে পরিণাম প্রাপ্ত হয়, ব্রহ্ম সেই প্রকারই হন বটে; পরন্তু তাহা রজ্জুর সর্প হওয়ার অনুরূপ[৮]। তিনি সর্ব্বাত্মা বলিয়া সর্ব্বসাক্ষী অর্থাৎ সর্ব্বদর্শী[৯]। ব্রহ্মই এই বিশ্বের আকারে বিস্তৃত রহিয়াছেন। সৃষ্টিশক্তি ও স্রষ্টা বিভিন্ন, এ সকল অজ্ঞানীর কল্পনা, পারমার্থিক নহে[১০]। অনাদি অনন্ত শক্তি মিথ্যাজ্ঞান সাধু বা অসাধু যাহা কিছু কর্ত্তব্য বলিয়া আলোচনা করে, তদুপহিত চিৎ তাহাই করেন ও ভবিষ্যতে তাহার ফল দর্শন করেন। অতএব, ব্রহ্মচৈতন্যই প্রকাশমান আছে, অন্য কিছু নাই[১১]।

ত্রিষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

চতুঃষষ্টিতম সর্গ।

বশিষ্ঠদেব বলিলেন, রাঘব! পরমাত্মাই মহেশ্বর। তিনি সর্ব্বব্যাপী, আদ্যন্তবিবর্জ্জিত, স্বচ্ছ, স্বপ্রকাশ ও আনন্দস্বরূপ। সেই শুদ্ধচিন্মাত্র পরমাত্মা হইতে চিত্তশালী জীব (ব্রহ্মা) সমুৎপন্ন ও তাহার চিত্ত হইতে জগৎ সমুদ্ভূত হইয়াছে[১।২]।

রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! কি প্রকারে স্বপ্রকাশ অখণ্ড অদ্বিতীয় ব্রহ্মে জীবের পৃথক সত্তা উৎপন্ন হয়?[৩] বশিষ্ঠ বলিলেন, চিন্ময় আনন্দস্বরূপ অব্যয় একমাত্র ব্রহ্মই নিত্যাবস্থিত। সেই শুদ্ধ শান্ত পরম পদ পণ্ডিতগণেরও অনির্দ্দেশ্য। তাদৃশ পরব্রহ্মের, যে রূপ সম্বিদাত্মক প্রাণধারণাত্মক ও চলনশক্তিযুক্ত, * সেই রূপ মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত জীব নামের নামী। সেই চিদ্ব্যোমস্বরূপ পরমাদর্শে এই অনুভবাত্মক অসংখ্য জগৎ প্রতিবিম্বিত হইতেছে[৪।৭]। হে রাঘব! যেমন বায়ুশূন্য সমুদ্রের ও দীপের যৎকিঞ্চিৎ প্রচলন, তেমনি, ব্রহ্মের যৎকিঞ্চিৎ প্রস্ফুরণ জীব[৮]। অঙ্গ! নির্ম্মল নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মের নিষ্ক্রিয়ত্ব প্রচ্ছাদিত হইলে যে অল্পসম্বেদন অর্থাৎ পরিচ্ছেদ ভ্রান্তি (অহং) উদিত হয়, জীবকে তুমি তদাত্মক বলিয়া জানিবে। সেই জীবরূপ পরিচ্ছেদ ব্রহ্মের স্বাভাবিক প্রস্ফুরণ[৯]। যেমন বায়ুর চঞ্চলতা, কৃশানুর উষ্ণতা ও তুষারের শীতলতা স্বভাবসিদ্ধ, আত্মার জীবভাবও সেইরূপ স্বভাবসিদ্ধ[১০]। সেই চিৎস্বরূপ আত্মতত্ত্বের স্বাভাবিক সম্বেদনভাবই জীব[১১]। অগ্নিকণা যেরূপ ইন্ধনাদির আধিক্য দ্বারা উদ্দীপিত হয়, সেইরূপ, বাসনাদার্ঢ্যের দ্বারা পরব্রহ্ম পরম হইলেও অহন্তাবত্ব প্রাপ্ত হন[১২]। দর্শকের চক্ষুঃ আকাশের যে পর্য্যন্ত গমন করে, অর্থাৎ দৃষ্টি যে পর্য্যন্ত বিষয় করে, সেই পর্য্যন্ত আকাশকে সে নির্ম্মল নিরাকার দেখে। পরন্ত দর্শকের

* যে রূপ অবিদ্যাংশ সত্ত্ব গুণের উদ্রেক নিবন্ধন উদ্ভবের ন্যায় প্রকটিত হয়, অর্থাৎ বুদ্ধির আবির্ভাবে পরব্রহ্মের পরমত্ব প্রচ্ছাদন ও পরিচ্ছিন্নপ্রায়তা ঘটনা হয়, ব্রহ্মের সেই আবির্ভূত রূপটী জীব নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সুতরাং তাহা অবিদ্যাদ উদ্রেক ব্যতীত অন্য কিছু নহে।

দৃষ্টি আকাশের যে ভাগ বিষয় করিতে অসমর্থ হয়, সে ভাগে মালিন্য না থাকিলেও দর্শক সে ভাগকে ভ্রান্তিক্রমে মলিন দেখে। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, অহম্ভাবশূন্য জীবও স্বাত্মদর্শনের অভাবে আপনাতে অহম্ভাব ভাবনা করে[১৩]। সে অহম্ভাব পূর্ব্বসঙ্কল্পসংস্কার দ্বারা উদিত হয়, কারণান্তরে নহে। অপিচ, সেই অহম্ভাব বাতস্পন্দের ন্যায় দেশকালাদিরূপে প্রস্ফুরিত ও চিত্ত, জীব, মন, মায়া ও প্রকৃতি নামে অভিহিত হইয়া থাকে[১৪।১৬]। তাদৃশ চিত্তের সঙ্কল্পাত্মক চিত্ত ভূততন্মাত্রা কল্পনা করতঃ পঞ্চতা প্রাপ্ত এবং সেই পঞ্চতাপ্রাপ্ত চিত্ত সঙ্কল্প দ্বারা বীজের অঙ্কুরত্ব প্রাপ্তির ন্যায় ক্রমশঃ তেজস্কণত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। (তেজঃকণ=সূক্ষ্ম বা দুর্লক্ষ্য চেতন)। অনন্তর সেই তেজস্কণ জলের ঘনত্ব প্রাপ্তির ন্যায় কল্পনা দ্বারা কখন অণ্ডতা প্রাপ্ত, কখন দিব্যদেহভাবনা করতঃ শীঘ্র দেবাদিদেহত্ব, কখন সঙ্কল্পানুসারে দেবত্ব ও গন্ধর্ব্বত্ব, কখন স্থাবরত্ব, কখন জঙ্গমত্ব, কখন বা আকাশচর পক্ষিত্ব ও রাক্ষসত্ব, এবং কখন পিশাচাদিত্ব প্রাপ্ত হয়[১৭।২২]। যিনি অভিহিত প্রকারে অবস্থিত, তাঁহা হইতেই সৃষ্টির আদিতে প্রজাপতির উৎপত্তি ও প্রজাপতি হইতে এই জগৎ নির্ম্মিত হইয়াছে[২৩]। প্রজাপতি যাহা সঙ্কল্প করেন, তৎক্ষণাৎ তিনি তৎস্বরূপে পরিণত হন। সুতরাং তিনি চিৎস্বরূপতা প্রযুক্ত সর্ব্বকারণত্ব ও ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হন। অনন্তর সংসারের কারণ হইয়া কার্য্যনির্ম্মাণে অবস্থিত হন[২৪।২৫]। যেমন জল স্বকীয় স্বভাবের বশে ফেনরূপে প্রকাশ পায়, তেমনি, স্বভাবের প্রভাবে চিৎ হইতেই চিত্তের প্রস্ফুরণ হয়। জলে কোন কিছু আবদ্ধ হয় না, কিন্তু জলোদ্ভব ফেনে নৌকাদির বদ্ধতা হয়, তেমনি, স্বতঃবদ্ধ স্বভাব না হইলেও তিনি কর্ম্মরূপ রজ্জুর দ্বারা বদ্ধ হন[২৬]। চিৎ বদ্ধ হয় না, কিন্তু চিত্ত বদ্ধভাব ধারণ করে। আমরা যেমন প্রথমে নিঃসঙ্কল্প থাকি, পরে সঙ্কল্প দ্বারা অন্তরে ঘটপটাদি রচনা করি, পশ্চাৎ তাহাই বাহিরে নির্ম্মাণ করি, তেমনি, জীবও নিষ্ক্রিয়ভাব হইতে উত্থিত হইয়া সঙ্কল্প কল্পনা করেন, পশ্চাৎ কর্ম্মকলাপ বিস্তৃত করেন[২৭]। যেমন বীজের অন্তরে অঙ্কুর প্রথমতঃ সূক্ষ্মভাবে থাকে, পশ্চাৎ তাহাই পরিবর্দ্ধিত হইয়া পত্র, অঙ্কুর, কাণ্ড, শাখা, পল্লব ও পুষ্পফলাদির আকারে পরিণত হয়, তেমনি, হিরণ্যগর্ভ জীবের অন্তরেও জীব সকল সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত ছিল, পরে তাহারা

তদীয় সঙ্কল্পে এতদ্রূপে বিস্তৃত হইয়াছে। সেই সমস্ত ব্যক্ত জীব আবার স্ব স্ব বাসনা দ্বারা স্ব স্ব দেহাদি আকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে। এ স্থানে বুঝিতে হইল যে, হিরণ্যগর্ভ জীবই সঙ্কল্প দ্বারা ভূতগণের আশ্রয় স্বরূপ দেহ ভাব প্রাপ্ত হন, পরে আবার স্ব কর্ম্মানুসারে জন্মমৃতির কারণতা প্রাপ্ত হন। কর্ম্ম কি? কর্ম্ম চিৎস্পন্দন ব্যতীত অন্য কিছু নহে[২৮।৩০]। ফলতঃ যাহা কর্ম্ম তাহাই চিৎস্পন্দ, তাহাই দৈব ও তাহাই শুভাশুভলক্ষণ চিত্ত। হে রাম! কথিত প্রকারে, বৃক্ষ হইতে কুসুমরাজি আবির্ভাবের ন্যায় প্রজাপতি হইতে ভুবন সমূহ পুনঃ পুনঃ আবির্ভূত হইতেছে[৩১]।

চতুঃষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, সেই পরম কারণ হইতে প্রথমে মনের উৎপত্তি হয়। যে কিছু ভোগ্য, সমস্তই তদাত্মক অর্থাৎ মনোময়। যে কিছু দৃশ্য, সে সমুদায়ের স্থিতি মনে এবং মনও স্বকারণের অনতিরিক্ত। যেমন দোলা বামে ও দক্ষিণে পরিবর্ত্তিত হয়, তেমনি, মনও, ইহা এইরূপ তাহা এরূপ নহে, এবম্প্রকারে পরিবর্ত্তিত হয়[১।২]। অতএব, রাম! যে কিছু ভেদ, সমস্তই মনঃকল্পিত। যেহেতু মনঃকল্পিত, সেইহেতু মনের অপগমে এ সকলের বা ভেদের অপগম ও একের প্রতিষ্ঠা হয়। যখন মনের বিলয়ে একাদ্বয় আত্মা অবস্থিতি করেন, তখন কোনও প্রকার ভেদ থাকে না। তখন ব্রহ্ম (ব্রহ্মা), জীব, মন, মায়া, কর্ত্তা, কর্ম্ম, জগৎ, এ সকল ভেদ লোপ প্রাপ্ত হয়[৩]। আত্মা স্বয়ং সম্বিদ্রূপ সলিলসঙ্কুল চিদর্ণবে নিমগ্ন রহিয়াছেন। অস্থিরতাপ্রযুক্ত অসত্য ও প্রতিভাসত্ব হেতুক সত্যবৎ এই সদসদাত্মক জগৎ ও চিত্ত উভয়ই স্বপ্নের ন্যায় মিথ্যা বা অলীক[৪।৫]। সেইজন্য বলা যায়, চিত্তের জগদ্দর্শন এক প্রকারে সৎ এবং অন্য প্রকারে অসৎ। মনের দ্বারাই এই সংসাররূপ দীর্ঘকালস্থায়ী বৃথা স্বপ্ন অবস্থিত রহিয়াছে। যেমন অসম্যক্‌দর্শী স্থাণুতে পুরুষ দর্শন করে, তেমনি, মনঃও পরমাত্মদর্শনের অভাবে মিথ্যা জগদ্দর্শন করিতেছে[৬।৭]। সেই আধ্যারহিত সর্ব্বশান্তিরূপ আত্মার চেত্যোন্মুখতা * প্রযুক্ত চিত্ত, পরে চিত্ত হইতে জীবত্ব, জীবত্ব হইতে অহম্ভাব, অহম্ভাব হইতে চিত্ততা, (চিত্ততা=চিত্তের বিষয় তন্মাত্রা) হইতে ইন্দ্রিয়াদি, ইন্দ্রিয়াদি হইতে দেহাদি, দেহাদি হইতে দেহাদিগত মোহ, এবং তন্মাত্র হইতে বীজাঙ্কুরের ন্যায় আরম্ভসংরূঢ় (নানা কার্য্য পটু) দেহ, কর্ম্ম ও কর্ম্মানুযায়ী বন্ধন, মোক্ষ, স্বর্গ ও নরকাদি বিস্তৃত হইয়াছে[৮।১১]। যেমন চিদাত্মা, ব্রহ্ম, জীব, এ তিনের বাস্তব প্রভেদ নাই, সেইরূপ, জীব ও চিত্ত, এ উভয়েরও প্রভেদ নাই। যেমন জীব ও চিত্ত অভিন্ন, সেইরূপ,

* চেত্যোন্মুখতা—সৃষ্টির উদ্রেক। প্রাকৃতিকগুণের সাম্যভঙ্গ।

দেহ ও কর্ম্ম পরস্পর অভিন্ন। বস্তুতঃ কর্ম্মই দেহ। কর্ম্ম ভিন্ন অর্থাৎ ব্যতীত পৃথক্ সত্তাবিশিষ্ট দেহ নাই। সুতরাং সেই কর্ম্মই চিত্ত, সেই চিত্তই অহম্ভাববিশিষ্ট জীব এবং সেই জীবই আধাধ্র চিৎ ও মঙ্গল-স্বরূপ[১২।১৩]।

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাঘব! যেমন একই দীপ বহুদীপ হয়, তেমনি, সেই একই পরম বস্তু নানারূপে প্রজাত হন। সুতরাং যদি বিচার-চক্ষে তাঁহার অনারোপিত রূপ দেখা যায়, তাহা হইলে আর অনু-শোচনা করিতে হয় না। চিত্ত কর্ত্তৃক জীবত্বকল্পনা ও বন্ধন এবং তত্ত্ব-বোধে অর্থাৎ জীবত্বের মিথ্যাত্ব বোধে মোক্ষ হইয়া থাকে। কারণ, আত্মতত্ত্ব নামরূপ বর্জ্জিত[১।২]। জীব কি? চিত্তই জীব। যদি বিচার দ্বারা চিত্তের উপশম (অদর্শন) হয় তাহা হইলে এই চিত্তদৃশ্য জগৎ শান্ত হইয়া যায়। যাহার দুই পা চর্ম্ম পাদুকায় আবৃত, সে পৃথিবীকে চর্ম্ম-আচ্ছাদিত ভাবে[৩]। কদলীতরু কতকগুলি পত্র ভিন্ন অন্য কিছু নহে। সেইরূপ জগৎ ভ্রম ভিন্ন অন্য কিছু নহে[৪]। চিত্তই ভ্রম বশতঃ আপ-নিই আপনার "জন্ম, বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্য, মরণ, স্বর্গগমন, নরক-গমন" ইত্যাদিবিধ নৃত্য দর্শন করিতেছে[৫]। যেমন সুরার (মদ্যের) নিরা-কার আকাশে পরস্পর সংশ্লিষ্ট অসংখ্য বুদ্বুদ পরম্পরা দেখাইবার সামর্থ্য আছে, তেমনি, চিত্তেরও বিচিত্র সৃষ্টি দেখাইবার সামর্থ্য আছে[৬]। যদ্রূপ পিত্তাদিদোষদূষিত অক্ষি শঙ্খের পীতত্ব ও শশাঙ্কাদির দ্বিত্ব সন্দর্শন করে, তদ্রূপ, চিত্তসমাক্রান্তা (চিত্তে উপহিত) চিৎ ঈদৃশী সংসারভ্রান্তি দর্শন করি-তেছে[৭]। যেমন মদিরোন্মত্ত ব্যক্তি মত্ততার দ্বারা পাদপের ভ্রমণ অবলোকন করে, তেমনি চিৎও (চিৎ=আত্মচৈতন্য) চিত্তসমাক্রান্ত হইয়া সংসার অবলোকন করে[৮]। বালকগণ যেমন ভ্রমণক্রীড়া দ্বারা জগৎকে কুলাল-চক্রের ন্যায় ভ্রমণশীল দর্শন করে, তেমনি, চিত্তের দ্বারাই এই সকল দৃশ্য অনুভূত হইয়া থাকে[৯]। বৎস রামচন্দ্র! চিৎ যখন দ্বিত্ব অনুভব করে, তখনই একত্বে দ্বিত্বভ্রম সমুৎপন্ন হয়, কিন্তু সেই চিৎ যখন দ্বিত্ব অনুভব না করে, তখন এই দ্বৈতপ্রপঞ্চ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া যায়। দ্বৈতক্ষয় হইলেই এক অবশেষ থাকে, তাহা বলা বাহুল্য[১০]। হে রাঘব! বহ্নি যেমন ইন্ধনের অভাবে নির্ব্বাপিত হয়, তেমনি, অভ্যাস বশতঃ চিত্তও বিষয় দর্শনের অভাবে উপশান্ত হইয়া যায়। চেত্য নাই,

অর্থাৎ চিত্তের অতিরিক্ত কিছুই নাই, এই জ্ঞান ও তাহার দৃঢ়তা কারক যোগ (সমাধি) অভ্যস্ত হইলে তদ্দ্বারা চিত্তের বিষয় দর্শন লুপ্ত হইয়া যায়[১১]। জীব যখন যখন তাদৃশ জ্ঞানী ও যোগী হয়, অর্থাৎ যখন যখন নির্ব্বিকল্প সমাধি সাক্ষাৎকার করে, তখন তখনি তিনি ব্যবহার রত থাকুন বা না থাকুন, "মুক্ত পুরুষ" এই আখ্যায় অভিহিত হন[১২]। মনুষ্য যেমন অল্প মত্ততায় (অল্প নেশায়) চিত্তের বিক্ষোভ ও অত্যন্ত মত্ততায় নিশ্চেষ্ট বা নির্ব্যাপার (জড়বৎ নিপতিত, হতজ্ঞান) হয়, তেমনি, চৈতন্যের অল্প প্রকাশেই চিত্তের চেত্য দর্শন ও চৈতন্যের নিবিড়তায় চেত্য দর্শনের উপশম হইয়া থাকে। চৈতন্যের ঘনতা নির্ব্বিকল্প সমাধির সুসাধ্য[১৩]। ঘনতাপন্ন নিবিড় চৈতন্যই পরম পদ। সে পদে আরূঢ় হইলে চিত্ত তখন না থাকার ন্যায় হয় ও নির্ব্বিষয় হইয়া থাকে[১৪]।

চিৎই চিত্তের দ্বারা চেত্যভাব * প্রাপ্ত হইয়া "আমি, আমি জাত, আমি জীবিত, আমি মৃত, আমি দর্শন করিতেছি, আমি স্মরণ করিতেছি" এইরূপ ভ্রমপরম্পরা সত্যবৎ অনুভব করে[১৫]। বায়ু যেমন, স্পন্দ ব্যতীত নহে, তেমনি, চিত্তও চেত্যের অতিরিক্ত নহে। যেমন উষ্ণতা অপগত হইলে বহ্নিও যায়, থাকে না, তেমনি, চেত্য দর্শন অভাবগ্রস্ত হইলে চিত্তও থাকে না[১৬]। চিৎ যাহা অনুভব করে বা দেখে তাহাই চেত্য। পরন্তু সে দর্শন রজ্জুতে সর্প দর্শনের অনুরূপ। যেমন রজ্জুতে সর্প দর্শন অবিদ্যাভ্রম বা আবিদ্যক অর্থাৎ এক প্রকার মিথ্যা জ্ঞান, তেমনি, চিত্তের চেত্য দর্শনও আবিদ্যক বা ভ্রমবিশেষ[১৭]। এই যে সংসারনামা ব্যাধি, এ ব্যাধির এক মাত্র ঔষধ সম্বিৎ। অর্থাৎ সংসারের মিথ্যাত্ব ও আত্মার সত্যত্ব অববোধ। ঐ বোধ অর্জ্জন করিতে চিত্তের ক্রিয়া (যোগ বা সমাধি) ব্যতীত অন্য প্রকার উপায় স্বীকার করিতে হয় না[১৮]। রাম! যদি তুমি বাহিরে দৃশ্য দর্শন পরিত্যাগ ও অন্তরে বাসনা পরিত্যাগ করিয়া থাক, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ এই ক্ষণেই মুক্ত হইবে[১৯]। যেমন সম্যক্ দর্শন দ্বারা রজ্জুবিষয়ক সর্পবোধ তিরোহিত হয়, তেমনি, সম্বিৎ (তত্ত্বজ্ঞান) দ্বারাও এই সংসার ভ্রান্তি

---

* চিৎ আত্মা বা শুদ্ধ চৈতন্য। চিত্ত বুদ্ধিতত্ত্ববিশেষ। চেত্য—দৃশ্য সমুদায়। অর্থাৎ অনুভবের বিষয়।

তিরোহিত হয়[২০]। অঙ্গ! যদি বিষয়াভিলাষ ত্যাগ করিয়া অবস্থিতি করা যায়, তাহা হইলে নিশ্চয় মোক্ষ লাভ করা যায়। সুতরাং মোক্ষ অধিক দুষ্কর নহে[২১]। যাহাতে অভিলাষ, তাহার জন্য যখন প্রিয়তম প্রাণকেও তৃণবৎ পরিত্যাগ করিতে কষ্ট বোধ কর না, তখন অভিলাষ মাত্র ত্যাগের জন্য কৃপণ হইবার কারণ কি?[২২] তুমি যদি অভিলষনীয় ও অভিলাষ উভয় পরিত্যাগী হইয়া নিশ্চল নিষ্কম্প নির্বিকার চিত্তে অবস্থান কর, তাহা হইলে তন্মুহূর্ত্তে কৃতার্থ হইতে পার[২৩]। সেই পরমাত্মার অজত্বাদি (জন্মাদিবিকারশূন্যতা) করতলস্থিত বিল্ব ফলের ন্যায়, সম্মুখবর্ত্তী অট্টালিকার ন্যায় ও পুরোবর্ত্তী পর্ব্বতের ন্যায় প্রত্যক্ষ[২৪]। যেমন একই অপ্রমেয় সমুদ্র তরঙ্গভেদ দ্বারা বিভিন্নাকারে প্রতিভাত হয়, তেমনি, অজ্ঞদিগের দৃষ্টিতে এক পরমাত্মাই জগৎস্বরূপে প্রতিভাত হইতেছেন। পরমাত্মা পরিজ্ঞাত হইলেই মোক্ষ ও সিদ্ধি লাভ করস্থ হয়, কিন্তু তাঁহাকে না জানিতে পারিলে সংসারবন্ধনজনিত যন্ত্রণা দুষ্পরিহার্য্য হয়[২৫]।

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তষষ্টিতম সর্গ।

রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! মন-উপাধিক জীব পরমাত্মার কে? তাদৃশ জীবের সহিত পরমাত্মার কি সম্বন্ধ? কি প্রকারেই বা জীব পরমাত্মায় উৎপন্ন হইয়াছে এবং জীবই বা কি? এই সকল কথা পুনর্ব্বার আমার নিকট বিশদ করিয়া বলুন[১]। *

বশিষ্ঠ বলিলেন, মায়াসমাশ্রিত সুতরাং সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন ব্রহ্ম যখন যে শক্তিতে প্রস্ফুরিত হন, তখন তিনি আপনাকে সেই শক্তি সম্পন্ন দেখেন[২]। সর্ব্বাত্মা ব্রহ্ম অনাদি কাল হইতে যে চেতনরূপিণী শক্তি (জীবশক্তি) পরিজ্ঞাত হইয়াছেন সেই চেতনশক্তি এক্ষণে জীব শব্দের অভিধেয়। সে শক্তি সঙ্কল্পরূপিণী[৩]। সেই চিত্তসংস্কারময়ী চিৎশক্তি † স্বভাব বশতঃ সঙ্কল্পের উদ্রেক হেতু সদ্বয়ত্ব প্রাপ্ত হন, পরে জননমরণাদি নানা ভাব প্রাপ্ত হন[৪]।

রামচন্দ্র বলিলেন, মুনে! যদি তাহাই হয়, তবে, দৈব, কর্ম্ম ও কারণ, এ সকল কথার অর্থ কি? বশিষ্ঠ বলিলেন, বৎস! যেমন আকাশে স্পন্দাস্পন্দ স্বভাব বায়ু ব্যতীত অন্য কিছুই নাই, তেমনি, এই দৃশ্য বিশ্বে স্পন্দাস্পন্দ স্বভাবযুক্ত চিৎ ব্যতীত অন্য কিছু নাই। যখন স্পন্দস্বভাব প্রকটিত[৫] হয় তখন তিনি সৃষ্ট্যুন্মুখী হন, অন্যথা তিনি শান্ত বা শুদ্ধ থাকেন[৬]।[৭]। চিৎ যে আপনার স্বাভাবিক চিদ্ভাবকে স্বাশ্রিত ও স্ববিষয়ক অনির্ব্বাচ্য অজ্ঞান দ্বারা চিত্ত (মন) বলিয়া কল্পনা করেন,

---

* এবার রামচন্দ্রের জিজ্ঞাস্য—জীব কি পরমাত্মার অংশ? কি পরমাত্মার কার্য্য (যত্নোৎপন্ন)? কি পরমাত্মাই? যদি পরমাত্মাই জীব, তবে পরমাত্মায় জীবের উৎপত্তি, এ কথা অসঙ্গত। যদি উৎপত্তি পক্ষ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য হয়, তবে জিজ্ঞাস্য—পরিণাম ক্রমে? কি বিবর্ত্ত ক্রমে? জীবকে যদি পরমাত্মার অতিরিক্ত বলেন, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য—জীব পরমাত্মার সজাতীয়? কি বিজাতীয়? এই কয়েকটী প্রশ্ন উপরোক্ত কথায় উদ্ভাবিত করিতে হইবে।

† মন যাহা করে তাহার সংস্কার তাহাতে সংলগ্ন হয়। সেই সংস্কারে যে আত্মচৈতন্য প্রতিবিম্বিত হইতেছে, সেই প্রতিবিম্ব চৈতন্যকে চিত্তসংস্কারময়ী চিচ্ছক্তি বলা হইল।

অর্থাৎ আপনিই আপনার দৃশ্য হন, তাহাই পণ্ডিতগণের মতে চিৎস্পন্দ। অন্যথা তিনি অস্পন্দ অর্থাৎ শান্ত ব্রহ্ম। আরও স্পষ্ট কথা—চিতের তাদৃশ স্পন্দনই সংসার ও অস্পন্দন শাশ্বত (নিত্য) ব্রহ্ম। অপিচ জীব, কারণ, কর্ম্ম, এ সকল চিৎস্পন্দের প্রভেদ ও ভিন্ন ভিন্ন নাম ব্যতীত অন্য কিছু নহে[৭।৮]। * ফলতঃ যিনিই সাক্ষাৎ অনুভূতির অনধীন চৈতন্য, তিনিই কথিত প্রকারের চিৎস্পন্দ। সেই চিৎস্পন্দ জীবাদি নামে কথিত ও সংসারের বীজ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে[৯]। চিতের আভাস (স্বীয় অবিদ্যায় স্বপ্রতিবিম্ব) স্ফুরিত হওয়ায় যে দ্বৈত, সেই দ্বৈত অর্থাৎ তাদৃশ দ্বিভাব হইতে শাস্ত্রোক্ত ক্রমে দেহাদির উৎপত্তি হয়। সুতরাং চিৎস্পন্দই স্বনিষ্ঠ সঙ্কল্প দ্বারা সৃষ্টির আদিতে বিবিধাকার প্রাপ্ত হন, পরে সঙ্কল্পানুসারে নানা যোনি প্রাপ্তও হইয়া থাকেন। সেই সকল যোনির মধ্যে কোন কোন চিৎস্পন্দ (জীব) বহুকাল পরে মুক্ত হয়, কোন কোন চিৎস্পন্দ জন্মসহস্রে মুক্ত হয় এবং কেহ বা এক জন্মেই মুক্ত হইয়া থাকে[১০।১১]। যে উপাধির সহিত সংসৃষ্ট হয়, সেই উপাধির আকারে আকারিত হওয়াই চিতের স্বভাব। সেই কারণে চিৎ স্বোৎপন্ন দেহকারণের (দেহকারণ=ভূতসূক্ষ্ম) সহিত একতা প্রাপ্ত হইয়া পিতৃশরীর হইতে শুক্রাদি রূপে নির্গত হয়, পরে স্বর্গ, অপবর্গ, নরক ও বন্ধের কারণ স্বরূপ দেহবিশেষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে[১২]। অতএব, ইনি পিতা, ইনি পুত্র, এ প্রভেদ উপাধিকৃত। চিতের উপাধি শরীর ও তাহা বিভিন্ন বলিয়া ভিন্নের ন্যায় হইয়া প্রতীত হয়। নচেৎ চৈতন্য একই অর্থাৎ অভিন্ন। যেমন সুবর্ণাংশে ভেদ না থাকিলেও আকারগত প্রভেদ দ্বারা ইহা বলয়, ইহা কেয়ূর, ইত্যাদি প্রভেদ প্রতীত হয়, সেইরূপ, চৈতন্যাংশে অভেদ থাকিলেও চৈতন্যাশ্রিত দেহের প্রভেদে চৈতন্যপ্রভেদের ভ্রম হইয়া থাকে। দেহের উপাদান মহাভূত, তাহার নানা বিকার, তদনুসারে প্রভেদও অসংখ্য[১৩]। চিৎ বস্তুতঃ অজাত হইলেও উক্ত কারণে "আমি জাত, আমি অবস্থিত, আমি মৃত" ইত্যাদি প্রকার ভ্রান্তি অনুভব করে। যেমন ভ্রমার্ত্ত ব্যক্তি আপনার মিথ্যা পতন অনুভব করে, সেইরূপ, অহং-মম-ভ্রান্তিযুক্ত চিত্তও বিবিধ আশাপাশে নিয়ন্ত্রিত হইয়া সেই সেই

---

* অভিপ্রায় এই যে, প্রাণস্পন্দনঘটিত নাম জীব, স্বান্তর্গত কার্য্যের আবির্ভাব উপলক্ষে নাম কারণ, শরীর পরিচালনাদি বিবক্ষায় কর্ম্ম, এবং তাহারই সূক্ষ্মাবস্থার নাম দৈব।

মিথ্যা' দর্শন বা ভাব অনুভব করে[১৪]।[১৫]। যেমন মথুরাধিপতির শ্বপচভ্রম (শ্বপচ=চণ্ডাল) হইয়াছিল, * তাহার ন্যায় চিত্তও ভ্রমবশতঃ জগৎস্থিতি অনুভব করিতেছে[১৬]। হে রামচন্দ্র! এ সমস্তই মনোময়, সুতরাং ভ্রান্তির উল্লাস। মনই জলতরঙ্গের ন্যায় জগদাকারে প্রস্ফুরিত হইতেছে[১৭]। যেমন সৌম্য অর্থাৎ নিস্তরঙ্গ (স্থির) জলধি হইতে প্রথমে অল্প স্পন্দ অর্থাৎ স্বল্প তরঙ্গ প্রকটিত হয়, তেমনি, সেই মঙ্গলময় পূর্ব্বকারণ পরমাত্মা হইতে চেতনোন্মুখী (সৃষ্ট্যুন্মুখী) চিৎ সমুদিত হইয়া থাকে[১৮]। সেই চিৎস্বরূপ বারি ব্রহ্মরূপ জলধিতে জীবরূপ আবর্ত্ত, চিত্তরূপ উর্ম্মি ও স্বর্গাদিরূপ বুদ্বুদের উৎপত্তি করে[১৯]। হে সৌম্য রামচন্দ্র! সেই মায়া-বন্ধন বিনাশক অচিন্ত্যশক্তি পরব্রহ্মের যে স্বতনিষ্ঠ মায়িক বিজৃম্ভণ, যাহা জীবরূপে অবস্থিত, তাহাই প্রকারান্তরে বিষয়রূপে অর্থাৎ দৃশ্যরূপে প্রকটিত ও ব্যবহৃত হইতেছে[২০]। সুতরাং সেই চিৎই সম্বিদ দ্বারা বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার, মায়া, ইত্যাদি অভিধাযুক্ত ও জীবসঙ্কল্পাত্মক মন নামে খ্যাত[২১]। মনই তন্মাত্রাদিকল্পনাপূর্ব্বক গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায় অসত্য অথচ সত্যসঙ্কাশ জগৎ বিস্তার করিয়াছে[২২]। সর্ব্বশূন্য আকাশে মিথ্যা মুক্তাবলী দর্শন ও স্বপ্নে ভ্রান্তি দর্শন যদ্রূপ, চিত্তের সংসার দর্শন তদ্রূপ[২৩]। নির্দ্দোষ নির্ব্বিকার নিত্য তৃপ্ত আত্মা শান্ত, সমস্থিত ও সত্য। তিনি কিছু দেখেন না, দেখিবারও কিছু নাই সত্য, তথাপি, তিনি স্বমায়া-রচিত এই চিত্তনামক স্বপ্ন বা বিভ্রম অনুভব করিতেছেন[২৪]। রাঘব! সেইজন্য বলিতেছি, তুমি এই সংসারদর্শনকে জাগ্রৎ, অহঙ্কারকে স্বপ্ন, চিত্তকে সুষুপ্তি ও চিন্মাত্রকে তূর্য্য অর্থাৎ অবস্থাত্রিতয়ের অতীত বলিয়া জানিবে[২৫]। যাহা অত্যন্ত শুদ্ধ, তন্মাত্র ও নিরাময়, তাহাই অবস্থাত্রয়াতীত পরম পদ। সেই পদে অবস্থিত হইলে শোকের মূলোচ্ছেদ হয়, আর কখন শোক করিতে হয় না[২৬]। এই দৃশ্যমান জগৎ সেই তূর্য্য পদে নির্ম্মল নভোমণ্ডলে অসৎ মুক্তাবলীর ন্যায় সমুদিত হয় আবার তাহাতেই বিলীন হইয়া যায়। যেমন মুক্তাবলী নিজেও নাই, আকাশেও নাই, তেমনি,

* মথুরার রাজপুত্র শৈশবে চৌর কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়া চণ্ডাল সকাশে বিক্রীত ও চণ্ডাল কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়াছিল। সেই কারণে উক্ত রাজপুত্র যৌবনেও "আমি চণ্ডাল" এইরূপে আপনাকে বিদিত হইত। পরে অন্বেষণ দ্বারা তদীয় অমাত্যগণ সে বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া উক্ত রাজপুত্রকে গৃহানীত করিয়া, তুমি চণ্ডাল নহ, রাজপুত্র, এইরূপে প্রতিবোধিত করিয়াছিল।

ইঁহাও নিজে নাই এবং তাঁহাতেও ইহা নাই[২৭]। আকাশ, বৃক্ষের বৃদ্ধি করে না, বৃক্ষকে বাড়ায় না, মাত্র, বৃদ্ধির অনিবারক হয়। তাই লোকে ও শাস্ত্রে আকাশকে বৃক্ষোন্নতির কারণ বলে। তেমনি, চিদ্রূপী পরমাত্মা কোন কিছু না করিলেও অনিবারকত্ব প্রযুক্ত এই মায়াকৃত সর্গের (সৃষ্টির) কর্ত্তা বলিয়া অভিহিত হন[২৮]। যেমন সন্নিধান মাত্র কারণে আদর্শকে প্রতিবিম্বের কারণ বলা হয়, তেমনি, সন্নিধান মাত্র কারণে আত্মচৈতন্যকে এই সকল অর্থবেদনের (জ্ঞানের) কারণ বলা যায়[২৯]। বীজ যেমন অঙ্কুর ও পত্রাদিক্রমে ফলের উৎপাদক হয়, সেইরূপ, চিৎও চিত্ত ও জীবাদি ক্রমে মনের উৎপাদক হয়[৩০]। যেমন জীবসংযুক্ত বৃষ্টিজলবিন্দু বৃক্ষ-শস্যাদিতে প্রবেশ করে * ও পুনর্ব্বার বীজত্ব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ, জীববাসনাবাসিত (জীব ধর্ম্মের সংস্কারে প্রলিপ্ত) চিৎও প্রলায়ান্তে পুনর্ব্বার চিত্ত চেত্যাদি সৃষ্টির আকারে বিবর্ত্তিত না হইয়া থাকিতে পারে না[৩১]। যদিও বীজের বৃক্ষজনন শক্তি ও ব্রহ্মের জগৎজনন শক্তি একাংশে সম-দৃষ্টান্ত, তথাপি, উক্ত উভয়ের মধ্যে শক্তিভেদের অস্তিত্ব দৃষ্ট হয়। মনে কর, বীজই বৃক্ষ, এই জ্ঞানে অদ্বয় সত্য ব্রহ্ম অভিব্যক্ত হন না। কিন্তু ব্রহ্মই বিশ্ব, এই জ্ঞান সাক্ষাৎকৃত হইলে দীপে রূপাভিব্যক্তি হওয়ার ন্যায় ব্রহ্মতত্ত্বের অভিব্যক্তি হয়[৩২।৩৩]। ভূমির যে স্থানে খুঁড়িবে সেই স্থানেই আকাশ দৃষ্ট হইবে। সেইরূপ যে যে দৃশ্য বিচারারূঢ় করিবে সেই সেই দৃশ্যই একে একে চৈতন্যমাত্রে পর্য্যবসিত হইবে[৩৪]। স্ফটিকের উদরে (মধ্যে) বনের প্রতিবিম্ব, যে তাহা না জানে, সে বনই দেখে। সেইরূপ অজ্ঞ দর্শকেরা শুদ্ধ ব্রহ্মের উদরে মিথ্যা জগৎ দেখিতেছে[৩৫]। যেমন স্ফটিক পিণ্ড (স্ফটিক=স্বচ্ছ নির্ম্মল প্রস্তর বিশেষ। পিণ্ড=খণ্ড) বনভূমি না হই-লেও ফল, পত্র, লতা, গুল্ম ও সে সকলের আধার মৃত্তিকাদির আকারে প্রতিভাত হয়, তেমনি, ব্রহ্মও দৃশ্য জগদাকারে প্রতিভাত হইতেছেন[৩৬]।

রামচন্দ্র বলিলেন, অহো! কি অদ্ভুত! জগৎ অসত্য হইয়াও সত্য-বৎ প্রতীত হইতেছে। গুরো! জগৎ যে প্রকারে বৃহৎ, যে প্রকারে

* শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, জীব যখন সুকৃতভোগান্তে পৃথিবীতে আইসে, তখন আকাশ, মেঘ, বৃষ্টি, এই সকল অবলম্বন করিয়া পৃথিবী প্রাপ্ত হয়। বৃষ্টিজলের সঙ্গে মৃত্তিকায় আগত, তথা হইতে শস্য মধ্যে প্রবেশ, পরে তদ্ভক্ষণকারী জীবের শুক্র শোণিতস্থ হয়। তাহাই জীবের বীজ ভাব প্রাপ্তি।

স্বচ্ছ, যে প্রকারে প্রস্ফুট ও যে প্রকারে সূক্ষ্ম তাহা শুনিলাম। যে প্রকারে পরব্রহ্মে এই প্রতিভাসাত্মা নীহারকণসদৃশ তন্মাত্রগুণসম্পন্ন * গোল অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড প্রস্ফুরিত হইতেছে তাহা বিদিত হইলাম। এক্ষণে যে প্রকারে বৈপুল্য অর্থাৎ সমষ্টি ও ব্যষ্টি দেহ জন্মে ও যে প্রকারে আত্মভূ অর্থাৎ সমষ্টি-ব্যষ্টি-স্থূলদেহাভিমানী বৈশ্বানর ও বিশ্ব (বিরাট্ ও এক একটী দেহী) উৎপন্ন হন, তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন[৩৭।৩৯]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, যেমন বেতাল নিরাকার হইলেও বালকের হৃদয়ে আকার বিশিষ্টের ন্যায় প্রকাশ পায়, তেমনি, জীবের রূপ অত্যন্ত অসম্ভব হইলেও তাহা সর্ব্বাগ্রে পরব্রহ্মে প্রকাশতা প্রাপ্ত হয়[৪০]। পূর্ব্ব-কল্পীয় জীববাসনার সংস্কার বা সম্পর্ক উক্ত জীবভাব প্রকাশের কারণ সুতরাং জীব বাসনোদ্ভব, অথচ শুদ্ধ, সত্য অথচ অসত্য, ভিন্ন অথচ অভিন্ন ও পরব্রহ্মের প্রস্ফুরণ বিশেষ[৪১।৪২]। ব্রহ্ম যেমন জীবকল্পনার দ্বারা আশু জীবভাব প্রাপ্ত হন, তেমনি, জীবও মননবেদনাদির দ্বারা † আশু মনোরূপে সমুদিত হন[৪৩]। অনন্তর সেই মন তন্মাত্র বিষয়ক মনন করিয়া আপনাকে তন্মাত্রারূপে আবির্ভূত দেখেন। পরে সেই অবিচ্ছিন্ন চৈতন্যরূপ বায়বীয় পরমাণু অপেক্ষাও সূক্ষ্ম তন্মাত্রাত্মক মন চিদাকাশে স্ফূর্ত্তি পায়। যেমন আকাশে অসংখ্য নীহারকণা সূর্য্যের আলোকে ভাসমান হয়, তেমনি, পূর্ব্বোক্ত চিত্তে (সমষ্টিমনোরূপ হিরণ্যগর্ভে) অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড ও তদন্তর্গত সূক্ষ্ম দেহাদি অঙ্কিতের ন্যায় প্রকাশ পায়[৪৪।৪৫]। তাই তিনি তখন তাদৃশ সাকারতায় আপনার বিশেষ পরিচয় পান না। না পাওয়ায়, "অহং কিং? আমি কি?" ইত্যাকার সম্বিদ অর্থাৎ সম্মুগ্ধ জ্ঞান অনুভব করেন। পরে পুরুষার্থ-বিচার সহিত প্রাক্তন সংস্কারের উদ্বোধে তাহাতে জগত্তত্ত্বশব্দার্থ ও তত্তদ্বিষয়ক অস্ফুট জ্ঞানের উদয় হয়[৪৬।৪৭]। পরে তাদৃশ অস্ফুট অহম্ভাব দেহোপরি প্রস্ফুট হওয়ায় বাহিরে রসের ও মুখবিলাদি প্রদেশে রসগ্রাহক ইন্দ্রিয়ের (জিহ্বার) উৎপত্তি হওয়া অনুভব করেন। ঐ রূপে বাহিরে রূপ ও শরীরে রূপগ্রাহক চক্ষুঃ হওয়া দর্শন করেন ও সেই সেই প্রকারে

* তন্মাত্রগুণসম্পন্ন—রূপরসাদির উদ্ভব যুক্ত। জীব, মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহংকার, এই পাঁচ সূক্ষ্ম অর্থাৎ দুর্ব্বোধ তথ্যের পদার্থে পরিব্যাপ্ত।

† মননবেদন অর্থাৎ সংকল্প বিকল্প। সংস্কারের উদ্রেক ও তাহার অনুগুণ অনুভব।

গন্ধ ও গন্ধগ্রাহক ইন্দ্রিয় হওয়া অনুভব করেন। জীব যাবৎ কাল ঐরূপে শ্রোত্রাদিভাবে অবস্থিত থাকেন, তাবৎ কাল শব্দাদি দৃশ্য পদার্থ সকল ঐরূপে উপভোগ করিতে বাধ্য হন[৪৮।৪৯]। উক্তবিধ জীবাত্মা ঐ প্রকারে কাকতালীয় ন্যায়ে অল্পে অল্পে বাসনানুরূপ সন্নিবেশ অর্থাৎ আপনার দেহিত্ব অনুভব করেন[৫০]। অতঃপর সেই জীবমূল অসত্য হইলেও সত্যের ন্যায় সম্পন্ন হয় এবং সেই সমস্ত ইন্দ্রিয়াদিঘটিত সন্নিবেশের শব্দভাবৈকদেশকে শ্রবণার্থ স্বরূপে, স্পর্শভাবৈকদেশকে ত্বক্‌-শব্দার্থরূপে, রসভাবৈকদেশকে রসনার্থরূপে, রূপভাবৈকদেশকে নেত্রার্থরূপে এবং গন্ধভাবৈকদেশকে নাসিকার্থরূপে গ্রহণ (আমার বলিয়া জ্ঞান বা কল্পনা) করেন এবং ঐ প্রকার ভাবময় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভাবময় দেহকে বাহ্যার্থসত্তাপ্রকাশকরণযোগ্য ইন্দ্রিয়নামক রন্ধ্র সম্পন্ন অবলোকন করেন[৫১।৫৪]। রাম! কথিত প্রকারে আদিজীবের অর্থাৎ জীবঘন ব্রহ্মার ও অদ্যতন জীবের অর্থাৎ ব্যষ্টিজীবের প্রতিভাসময় (ভাবময়) আতিবাহিক দেহ সমুৎপন্ন হয়[৫৫]। আখ্যারহিত পরা সত্তাই (ব্রহ্মবস্তুই) কথিত প্রকারে অজ্ঞানাবৃত হইয়া আতিবাহিকতা প্রাপ্তের ন্যায় হন এবং জ্ঞান হইলে আর তাহার প্রসঙ্গও থাকে না[৫৬।৫৭]। সত্য সত্যই সেই পরা সত্তা "ব্রহ্ম" ইত্যাকার জ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত ও পৃথক্‌ জ্ঞান দ্বারা পৃথগভাবে অর্থাৎ জীবাদিভাবে ব্যবস্থিত হন[৫৮]।

রামচন্দ্র বলিলেন, প্রভো! চিন্মাত্র পরব্রহ্মে অজ্ঞানাবস্থানের সম্ভাবনা কি? তাহা সর্ব্বথা অসম্ভব। সুতরাং ব্রহ্মাদ্বয়তা অসিদ্ধ নাই, প্রত্যুত সিদ্ধই আছে। যদি তাহাই থাকে, তবে মোক্ষ, মোক্ষপ্রাপক বিচার ও তদুপযোগী জীবাদিকল্পনা, এ সমস্তই ব্যর্থ বলিয়া মনে হইতেছে[৫৯]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! তোমার প্রশ্ন সিদ্ধান্তকালেরই উপযুক্ত, অন্য সময়ের নহে। যেমন অকালজাত কুসুমের মাল্য শোভাপূর্ণ হইলেও অমঙ্গলজনক বলিয়া শোভমান হয় না, তেমনি, অসাময়িক প্রশ্নও ফলপ্রদ হয় না। বস্তু সকল যোগ্য কালেই শোভা প্রাপ্ত হয়, অযোগ্য কালে নহে। অকাল পুষ্পের মালা তাৎকালিক উপভোগ-সাধন-সমর্থ হইলেও ভবিষ্যৎ অনিষ্টের আশঙ্কায় হর্ষোৎপাদিকা না হওয়ায় নিরর্থক হইয়াই থাকে[৬০]। সুতরাং কালেই সকল পদার্থের

শোভমানতা মনুষ্যগণের স্বীকার্য্য হইয়া থাকে[৬১।৬২]। জীব উপর্যুক্ত কালে আপনাতে পিতামহত্ব অনুভব করতঃ উপাসনার ফলস্বরূপ হিরণ্যগর্ভরূপে আবির্ভূত হয়[৬৩]। সেই হিরণ্যগর্ভ প্রণব উচ্চারণ ও প্রণবার্থ সম্বেদন পূর্ব্বক (প্রণবের অর্থ=জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ইত্যাদি) এই মনোরাজ্য বিস্তৃত করিয়াছেন। সেই শূন্যরূপী সমষ্টিমনোরাজ্য, পরমাত্মায় যে প্রকার অসৎ, ব্যষ্টিমনোরাজ্যরূপ শূন্যাত্মক মেরু প্রভৃতি উচ্চাকৃতি পর্ব্বতবিশিষ্ট এই জগৎও চিদাকাশে তদ্রূপ অসৎ[৬৪।৬৫]। এই জগতে বাস্তবতঃ কিছুই জাত বা বিনষ্ট হয় না। কেবল একমাত্র ব্রহ্মই গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায় মিথ্যা জগদাকারে প্রস্ফুরিত হইতেছেন[৬৬]। পদ্মজের সত্তা যদ্রূপ সদসন্ময়ী, দেবগণ, ও সামান্য ক্ষুদ্র জন্তু গণের সত্তাও তদ্রূপ সদসন্ময়ী[৬৭]। এ সকল উৎপন্ন হইলেও রজ্জু-সর্পের ন্যায় সম্বিদ্বিভ্রম ব্যতীত অন্য কিছু নহে। সুতরাং অসৎ অর্থাৎ মিথ্যা। মিথ্যা বলিয়াই সম্যক্ জ্ঞানের উদয়ে ব্রহ্মা হইতে কীট পর্য্যন্ত দৃশ্যের বিলোপ দৃষ্ট হইয়া থাকে[৬৮]। উৎপত্তি, ব্রহ্মার ও কীটের সমান; তবে প্রভেদ এই যে, কীট ভৌতিক মালিন্যের প্রচ্ছাদনে তুচ্ছকর্ম্মকারী, পরন্তু ব্রহ্মা নির্ম্মল সত্ত্বের প্রাবল্যে তদ্বিপরীত[৬৯]। যেমন উপাধি, তেমনি জীব। এবং তাহার পৌরুষও সেইরূপ। আবার যেমন পৌরুষ, তেমনি কর্ম্ম, এবং তাহাদের ফলানুভবও সেইরূপ[৭০]। সুকৃতের ফলে ব্রহ্মার ও দুষ্কৃতের ফলে কীটের উৎপত্তি হইয়া থাকে। সুকৃতের পরম উৎকর্ষ ব্রহ্মত্ব ও দুষ্কৃতের চরম ফল কীটত্ব। যতই বিভিন্ন ফলাফল দৃষ্ট হউক, সমস্তই চিন্মাত্রতা পরিজ্ঞানের অভাবের প্রভাব। অর্থাৎ স্বাত্মভ্রান্তি মূলক। সেইজন্য তত্ত্বজ্ঞানে ঐ ভ্রান্তির ক্ষয় হয়[৭১]। বিশুদ্ধ চিদ্রূপ পরব্রহ্মে জ্ঞাতৃত্ব, জ্ঞানত্ব ও জ্ঞেয়ত্ব অবতৃরণ করে না। সুতরাং দ্বৈত ও অদ্বৈত উভয়ই শশবিষাণের ও আকাশপদ্মের সহিত সমান। অর্থাৎ যাবৎ পর্য্যন্ত জ্ঞাতা (জীব) ভেদ জ্ঞানের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞেয় দর্শন করে, তাবৎ দ্বৈত বিদ্যমান থাকে[৭২]। যেমন কোশকার কৃমি আপনারই লালাদার্ঢ্যে আপন বন্ধন অনুভব করে, তেমনি, আনন্দ ব্রহ্মই ভুবনাদি ভাবের নিবিড়তায় ভ্রান্ত হইয়া দ্বৈত অনুভব করিতেছেন[৭৩।৭৪]। সমষ্টিমনোরূপ আদি প্রজাপতি ব্যষ্টি ভোক্তার (জীবের) অদৃষ্টানুসারে যে বস্তুকে যে প্রকারে সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করেন, সে বস্তু সেই প্রকারই হয়,

তাহার অন্যথা হয় না। ইহাই নিয়তির ব্যবস্থা[৭৫]। * সুতরাং যাহা যাহা উৎপন্ন তাহা তাহাই অবস্তু অর্থাৎ অলীক। উৎপত্তিও অলীক, বৃদ্ধিও অলীক, বিলয়ও অলীক, ভোগও অলীক[৭৬]। অতএব, পরমার্থ দর্শনে ইহাই স্থির হয় যে, শুদ্ধ, সর্ব্বগত, আনন্দময় অদ্বিতীয় ব্রহ্মই স্বাত্মাববোধের বিপর্য্যয়ে অশুদ্ধ, অসৎ, অনেক ও অসর্ব্বগরূপে বিবেচিত হইতেছেন[৭৭]। "জল ও তরঙ্গ ভিন্ন" এই ভেদ যেমন অজ্ঞমতির কুকল্পনা-কল্পিত ব্যতীত অন্য কিছু নহে, সেইরূপ, অসম্যগ্-দর্শীরাই রজ্জুতে সর্পকল্পনার ন্যায় এই সকল ভেদ পরিকল্পিত করিতেছে। সুতরাং ঐ ভেদ বাস্তব ভেদ নহে। যেমন একই ব্যক্তিতে পরস্পরবিরুদ্ধ শত্রুতা ও মিত্রতা অসম্ভব হয় না, সম্বন্ধ ভেদে সম্ভবই হয়, তেমনি, ব্রহ্মেও ঐরূপ ভেদাভেদ শক্তির অবস্থান সম্ভব হয়[৭৮]। যেহেতু অসম্ভব নহে, সেই হেতু ব্রহ্ম স্বনিষ্ঠ ভেদাভেদাত্মক শক্তির দ্বারা অদ্বয় ও সদ্বয় ভাবে অবিস্তৃত ও বিস্তৃত হন। যেমন সলিলে তরঙ্গকল্পনা করিবা মাত্র সলিল ও তরঙ্গ পৃথক্ রূপে প্রস্ফুরিত হয়, যেমন সুবর্ণে বলয় ভাবনা করিবা মাত্র সুবর্ণ ও বলয় ভিন্নভাবে প্রথিত হয়, সেইরূপ, তিনিও আত্মা অনাত্মা বা অপৃথক্ ও পৃথক্ রূপে স্ফুরিত হন। প্রথমে আত্মাই মন, পরে মন হইতেই অহং। প্রথম মন নির্ব্বিকল্প প্রত্যক্ষের অনুরূপ। পরে তাহাই অহম্ভাব কল্পনার প্রভাবে অহং[৭৯,৮০]। সেই অহংসম্বলিত মন স্মৃতি (পূর্ব্বানুভূত বস্তুর স্ফুরণ) অনুভব করে। তদনন্তর মন ও অহঙ্কার পূর্ব্বানুভূত স্মরণের দ্বারা তন্মাত্রা সৃজন করেন। ঐরূপে তন্মাত্র কল্পনার পর চিত্তাত্মা জীব কাকতালীয় ন্যায়ে ব্রহ্মে জগৎ দর্শন করিতে থাকেন। বস্তুতঃ চিত্ত দীর্ঘকাল যাহা সৎ বলিয়া পরিভাবিত করে, তাহা সৎ হউক, বা অসৎ হউক, ভাবনার দৃঢ়তায় সৎস্বরূপেই দৃষ্ট হইয়া থাকে[৮১,৮২]।

* বটবীজে বটবৃক্ষই হয়, কুটজবৃক্ষ হয় না। বুদ্বুদ এক নিমেষ মাত্র থাকে, অধিক কাল থাকে না। ব্রহ্মাও কল্পান্ত পর্য্যন্ত স্থায়ী হন, তাহার অন্যথা হয় না। এ সমস্তই পূর্ব্বোক্ত নিয়তির নিয়ম বা ব্যবস্থা। তুমি আমি ইচ্ছা করিয়া কোন কিছু কল্পনা করিলে নিয়তি তাহার বাধক হয়৮.

সপ্তষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টষষ্টিতম সর্গ।

কর্কটী রাক্ষসীর ইতিহাস।

বশিষ্ঠ বলিলেন, আমি তোমার নিকট রাক্ষসীর কথিত জটিল প্রশ্ন সমন্বিত এক পুরাতন ইতিহাস আদ্যোপান্ত বর্ণন করি; অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর[১]।

হিমালয়ের উত্তর পার্শ্বে এক অতিভয়ঙ্করী রাক্ষসী বাস করিত। এই রাক্ষসীর এক নাম কর্কটী ও অপর নাম বিষূচিকা। কেহ কেহ ইহাকে অন্যায়বাধিকা নামেও উল্লেখ করিত। (অন্যায়বাধিকা= আচারবিহীন মনুষ্যের পীড়া দায়িনী) ইহার বর্ণ ও মূর্ত্তি যেন কজ্জলকর্দ্দমের দ্বারা চিত্রিত ও নির্ম্মিত এবং কার্য্যও তদনুরূপ ভীষণ। রাক্ষসী কৃশকায় হওয়ায় দেখিতে এরূপ হইয়াছিল, যেন অতিবিস্তীর্ণ বিন্ধ্যারণ্য কোন অনির্ব্বাচ্য কারণে শুষ্ক হইয়া অতিভয়ঙ্কর আকারে রহিয়াছে[২।৩]। ইহার বল অসামান্য, চক্ষুঃ প্রদীপ্তহুতাশনের ন্যায়, বর্ণ কৃষ্ণ এবং বস্ত্রও কৃষ্ণবর্ণ। দেখিবা মাত্র বোধ হইত, যেন মূর্ত্তিমতী ঘোর অন্ধকার রাত্রি। ইহার দেহ এত বিস্তীর্ণ যে দেখিলে বোধ হইত, যেন আকাশের এক অর্দ্ধ তদীয় দেহে প্রপূরিত হইয়া রহিয়াছে[৪]। ইহার উত্তরীয় বস্ত্র দেখিলে সজল জলদ বলিয়া ভ্রম জন্মিত। এই রাক্ষসী লম্বমান মেঘবিম্বের ন্যায় সর্ব্বদা উল্লসিতা থাকিত। ইহার ঊর্দ্ধ শিরোরুহ তিমিরবর্ণ, চক্ষুর্দ্বয় বিদ্যুতের ন্যায় সমুজ্জ্বল, জানুদ্বয় তমাল তরুর ন্যায় বিশাল, নখ বৈদূর্য্য প্রস্তর সদৃশ প্রদীপ্ত ও শূর্পাগ্র অপেক্ষাও বিস্তির্ণ। হাস্য কালে তাহার বিকট বদন হইতে যেন ভস্ম, নীহার অথবা ধূম্ররাশি নির্গত হইত[৫।৬]। রাক্ষসী সর্ব্বদাই নরকঙ্কাল মালায় বিভূষিতা থাকিত। এই রাক্ষসী যখন বেতালগণের সহিত নৃত্য করিত তখন তাহার ভীষণ কঙ্কালকুণ্ডল এরূপ আন্দোলিত হইত, যেন প্রলয় মারুতে মন্দরাচল দোলায়িত হইতেছে। ইহার ঊর্দ্ধীকৃত ভুজদ্বয় দেখিলে মনে হইত, রাক্ষসী যেন সূর্য্যগ্রহ গ্রাস করিবার জন্যই হস্তোদ্যম করিতেছে[৭।৮]। এই বিপুলদেহা ভীষণা রাক্ষসীর দুরোদর ভরণের উপযোগী আহার দুর্ল্লভ হও-

য়াতে তদীয় জঠরানল সর্ব্বদা অর্ণবলেখার ন্যায় বাড়বানলের ন্যায়) অতৃপ্ত থাকিত[৯]। বাড়বানল যেমন ভক্ষণে তৃপ্ত হয় না, তেমনি, এই মহোদরা রাক্ষসী এক দিনের জন্যও আহারে পরিতৃপ্ত হইত না।

রাক্ষসী একদা ক্ষুধার্ত্তা হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল, সমুদ্র যেমন অসংখ্য নদ নদী গ্রাস করে, তদ্রূপ, যদি আমি অনবরত এই জম্বুদ্বীপস্থিত সমস্ত জীব জন্তু এক নিশ্বাসে ও এক কবলে গ্রাস করি, তাহা হইলে আমার এই দুঃসহ ক্ষুধাযন্ত্রণা কথঞ্চিৎ নিবৃত্ত হইতে পারে। কিন্তু যুগপৎ সর্ব্ব মনুষ্য ভক্ষণ করার উদ্যম যুক্তিসিদ্ধ কি না তাহা বিবেচনা করা উচিত। এ বিষয়ে এমন কোন যুক্তি উদ্ভাবন আবশ্যক, যাহা অবলম্বন করিলে বিপদ কালেও জীবন রক্ষা পাইতে পারে[১০,১২]। কিন্তু এক দিনে সর্ব্বমনুষ্যভক্ষণ যুক্তি বাধিত বলিয়া বোধ হইতেছে। কারণ, এই সমস্ত জনগণের অনেকেই মন্ত্র, ঔষধ, নীতি, দান ও দেবপূজাদির দ্বারা সর্ব্বদা সুরক্ষিত। সুতরাং ইহাদিগকে যুগপৎ ভক্ষণ করা দুষ্কর ব্যতীত সুকর নহে[১৩]। যাহাই হউক, যাহাতে আমি এই সমস্ত জনগণকে যুগপৎ গ্রাস করিতে পারি, এরূপ উপায় লাভের নিমিত্ত অখিন্নচিত্তে উগ্রতম তপস্যার অনুষ্ঠান করিব। শুনিয়াছি, মহোগ্র তপস্যার দ্বারা অত্যন্ত দুর্ল্লভও সুলভ হইয়া থাকে[১৪]।

রাক্ষসী ঐরূপ চিন্তা করিয়া সর্ব্বজন্তু জিঘাংসায় দুর্গম হিমাচলে তপস্যার্থ গমন করিল। তড়িল্লোচনা, কৃষ্ণবর্ণ মেঘমণ্ডলীর ন্যায় কৃষ্ণবর্ণা, বিশাল হস্তপদাদিসম্পন্না, দীর্ঘদেহশালিনী, চন্দ্রসূর্য্যসদৃশপ্রদীপ্তলোচনা রাক্ষসী হিমপর্ব্বতে গমন করতঃ তাঁহার শিখরদেশে আরোহণ করিল। পরে স্নান সঙ্কল্পাদি করিয়া তপস্যা করিতে প্রবৃত্তা হইল। রাক্ষসী এক পদে দণ্ডায়মানা হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল এবং তাহার চন্দ্র সূর্য্যসদৃশ দুই চক্ষু তখন নিশ্চল নিস্পন্দ হইল। পর্ব্বত যেমন শীত বাত আতপ সহ্য করে, রাক্ষসী সেইরূপ সে সকল সহ্য করিতে লাগিল। ক্রমে দিবস, পক্ষ ও মাস প্রভৃতি একে একে গত হইতে লাগিল[১৫,১৮]। ঊর্দ্ধ-কৃষ্ণবর্ণ-কেশ-সমন্বিতা রাক্ষসীও নিশ্চল মেঘের ন্যায় স্তিমিতাকৃতি হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল। তাহার সেই ঊর্দ্ধীকৃত বিশাল দেহ দেখিলে বোধ হইত, রাক্ষসী যেন আকাশ গ্রাসে উদ্যতা হইতেছে[১৯]।

অনন্তর হংসবাহন ব্রহ্মা দেখিলেন যে, শীত ও রুক্ষ বায়ুর দ্বারা

রাক্ষসীর কলেবর জর্জ্জরিত হইয়াছে। তাহার কৃশাঙ্গে ত্বক্ লম্বমান হইয়া বল্কলের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। এই সময় সেই আকাশের অর্দ্ধভাগপ্রপূরণী রাক্ষসীর কজ্জলসদৃশ কৃষ্ণবর্ণ পবনকম্পিত ঊর্দ্ধগ শিরোরুহ সকল তারানিকরের নিকটবর্ত্তী হওয়ায় বোধ হইয়াছিল, যেন সেই সমস্ত কেশকলাপ মুক্তামালায় বিভূষিত। বিরাটাত্মা ভগবান্ ব্রহ্মা রাক্ষসীর তথাবিধ অবস্থা অবলোকন করিয়া দয়াপরতন্ত্র হইলেন এবং বরদানের নিমিত্ত তথায় সমাগত হইলেন[২০]।

অষ্টষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

একোনসপ্ততিতম সর্গ

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাক্ষসীর সেই কঠোর তপস্যায় সহস্র বর্ষ অতিক্রান্ত হইলে পিতামহ ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইয়া দুর্ব্বৃত্তাকে বর প্রদান করিতে তথায় আগমন করিলেন। ব্রহ্মা দুর্ব্বৃত্তার তপস্যায় প্রসন্ন হইবেন, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কেন-না, যখন তপোবলে বিষাগ্নিও শীতল হয়, তখন আর রাক্ষসীর ব্রহ্মপ্রসাদ লাভের অসম্ভাবনা কি? শাস্ত্রকারেরাও বলিয়া থাকেন, তপস্যার অসাধ্য কার্য্য নাই১।

অনন্তর রাক্ষসী ভূতভবেশ ব্রহ্মাকে অবলোকন করতঃ মনে মনে তাঁহাকে প্রণাম করিল। এবং মৌনা হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল। ভাবিতে লাগিল, কিরূপ বর গ্রহণ করিলে আমার দুঃসহ ক্ষুধার শান্তি হইতে পারে। কিয়ৎক্ষণ পরে সে স্থির করিল, এক্ষণে আমি বিভুর নিকট এইরূপ বর প্রার্থনা করি যে, যেন আমি আয়সী ও অনায়সী সূচী হই। (অনায়সী=ব্যাধিরূপিণী জীবসূচী। অর্থাৎ সূক্ষ্ম বিসূচিকা কীট। আর আয়সী লৌহময়ী সূচী। যাহাকে সূচ বলে, যাহার দ্বারা সীবন কার্য্য সম্পন্ন হয়, তাহা)২।৩। ঐরূপ বর প্রাপ্ত হইলে আমি জনগণের অলক্ষ্যে বা অজ্ঞাতসারে ঘ্রাণাকৃষ্ট সুগন্ধ যেমন জনগণের হৃদয়প্রবেশ করে সেইরূপে আমি সর্ব্বপ্রাণীর হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া ইচ্ছানুসারে ক্রমে সকল জগৎ গ্রাস করিতে পারিব। এবং তৎক্রমে আমার এই দুঃসহ ক্ষুধার শান্তি হইতে পারিবে। ক্ষুধা নিবারণ হওয়াই পরম সুখ৪।৫।

রাক্ষসী মনে মনে ঐরূপ চিন্তা করিতেছে, অন্তর্যামী কমলাসন ব্রহ্মা তাহা জানিতে পারিলেন। শম, দম ও দয়া প্রভৃতিই তপস্বীদিগের ধর্ম্ম, পরন্তু রাক্ষসী তাহার বিরুদ্ধে লোকহিংসায় অভিলাষিণী হইয়াছে। জানিয়াও তিনি মেঘগর্জ্জনের ন্যায় গলধ্বনিকারিণী রাক্ষসীকে প্রশংসা করতঃ বলিতে লাগিলেন, হে পুত্রি! হে রাক্ষসকুলরূপপর্ব্বতের মেঘমালা! হে কর্কটিকে! তুমি গাত্র উত্থাপিত কর। তোমার তপস্যায় আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে অভিলষিত বর গ্রহণ কর৬।৭।

কর্কটী কহিল, হে ভগবন্! হে বিধে! হে ভূতভব্যেশ! যদি আপনি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, আর আমাকে বর প্রদান করেন, তাহা হইলে আমাকে এই বর প্রদান করুন যে, আমি যেন অয়স্মী ও অনায়সী দ্বিবিধ সূচিকা হই৮।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রামচন্দ্র! ভগবান্ পিতামহ ব্রহ্মা সেই রাক্ষসীকে 'তাহাই হউক' বলিয়া বর প্রদান করতঃ বলিলেন, তুমি নানা উপসর্গ সমন্বিতা বিসূচিকা (ব্যাধি) হইবে। তুমি দুর্লক্ষ্য সূক্ষ্ম মায়া অবলম্বন পূর্ব্বক অপরিমিতভোজী, দুর্দ্দেশবাসী, অশুদ্ধদ্রব্যাদি ভক্ষণকারী, মূর্খ, দুষ্ক্রিয়ারত ও অশাস্ত্রীয়ব্যবহারপরায়ণ জনগণকে হিংসা করিবে। তুমি বায়বীয়পরমাণুতুল্য হইয়া জীবের প্রাণবায়ু (শ্বাস প্রশ্বাস) অবলম্বনে জনগণের অপান দেশ হইতে হৃদয় পর্য্যন্ত অধিকার (আক্রমণ) করতঃ তাহাদিগের হৃৎপদ্মসন্নিহিত প্লীহা, যকৃৎ ও বস্তিশিরাদির পীড়া উৎপাদন করতঃ তাহাদিগকে হিংসা করিবে। তুমি বাতলেখাত্মিকা বিসূচিকা ব্যাধি হইয়া কি সগুণ কি নির্গুণ সকল ব্যক্তিকেই অলক্ষ্যভাবে আক্রমণ করিতে সমর্থ হইবে। পরন্তু সগুণ জনগণের (সদাচারী ব্যক্তি দিগের) চিকিৎসার্থ এই মহামন্ত্র কহিতেছি, তাহারা তদ্দ্বারা তোমার আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ পাইবে।

ওঁ হ্রীং হ্রাং রীং রাং বিষ্ণুশক্তয়ে নমঃ।
ওঁ নমোভগবতি বিষ্ণুশক্তিমেনাং।
ওঁ হর হর নয় নয় পচ পচ মথ মথ
উৎসাদয় উৎসাদয় দূরে কুরু স্বাহা।
হিমবন্তং গচ্ছ জীব সঃ সঃ সঃ।
চন্দ্রমণ্ডলগতোঽসি স্বাহা।"

মন্ত্রের অর্থ এইরূপ।—ওঁকারাদিবীজস্বরূপা বিষ্ণুশক্তিকে আমি নমস্কার করি। হে ভগবতি! বিষ্ণুশক্তে! তোমার অংশস্বরূপা এই রোগাত্মিকা বিষ্ণু শক্তিকে তুমি হরণ কর, হরণ কর, গ্রহণ কর, গ্রহণ কর, পচন কর, পচন কর, মন্থন কর, মন্থন কর, উৎসাদন কর, উৎসাদন কর, দূর কর। হে স্বাহারূপিণি রোগশক্তে! তুমি তোমার স্বস্থান হিমালয়ে গমন কর। *

* ইহা উক্ত মন্ত্রের সংক্ষিপ্ত অর্থ। বিস্তৃতার্থ এইরূপ—বৈষ্ণবী শক্তি দ্বিবিধা। প্রথম মায়া-

মন্ত্রবান্ ব্যক্তি পীড়িত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করতঃ "তুমি মদীয় ভাবনার প্রভাবে চন্দ্রমণ্ডল-প্রাপ্ত হইলে।" এইরূপ চিন্তা করিবেন। পরে আপনার বামকরতলে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র লিখিয়া সংযতচিত্তে সেই হস্তের দ্বারা রোগীর গাত্র পরিমার্জ্জন করিবেন এবং দৃঢ় চিত্ত হইয়া ভাবিবেন, কর্কটী নাম্নী বিসূচিকারূপিণী রাক্ষসী উক্ত মন্ত্রমুদ্গরে মর্দ্দিত হইয়া রোদন করিতে করিতে হিমশৈলাভিমুখে পলায়ন করিল ও রোগী চন্দ্রমণ্ডলস্থ অমৃতে নিক্ষিপ্ত হওয়ায় জরা মরণ বর্জ্জিত ও সর্ব্বপ্রকার আধি-ব্যাধিবিমুক্ত হইয়াছে। মন্ত্রবান্ সাধক আচমনাদির দ্বারা পবিত্র হইয়া উপরি উক্ত মন্ত্রের দ্বারা রোগরূপিণী বিসূচিকা রাক্ষসীকে ক্ষয় করিতে পারিবেন। ত্রিলোকনাথ ব্রহ্মা এইরূপ কহিয়া গগনে গমন করতঃ গগন-বিহারী সিদ্ধগণ কর্তৃক অভিবাদিত হইলেন এবং তথায় কার্য্যান্তর-সিদ্ধ্যর্থ সমাগত পুরন্দরকে উক্ত বিসূচিকা মন্ত্র প্রদান করিয়া তৎকর্তৃক বন্দিত হইয়া নিজপুরে গমন করিলেন[১]।১৮।

শক্তি। অন্যান্য শক্তি যে মায়া শক্তির অধীন সেই শক্তি। দ্বিতীয়া মায়াশক্তির অধীন বস্তুশক্তি। বস্তুশক্তি প্রত্যেক বস্তুতে অনুগতরূপে বিরাজমান এবং তাহা সাত্ত্বিকী রাজসী তামসী ভেদে নানা প্রকার। তন্মধ্যে যে শক্তি প্রাণিগণের দুষ্কর্ম্মের ফল উৎপাদন করে, সে শক্তির অন্যতম কার্য্য রোগ। তাহা তামসী সংহার শক্তির অংশ। তাহারই উপশমার্থ আদ্যা মায়া শক্তিকে ওঁ হ্রীং হ্রাং রীং রাং এই পাঁচ রহস্য বীজ দ্বারা সংবোধিত করতঃ নমস্কার করা হইয়াছে। পরে ওঁ নমঃ অর্থাৎ পরব্রহ্মাত্মিকায়ৈ নমঃ, এই বলিয়া নমস্কার করা হইয়াছে। ভগশব্দের অর্থ মাহাত্ম্য অর্থাৎ সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব শক্তি। অর্থ—হে আদ্যবিষ্ণুশক্তে। তুমি এনাং বিষ্ণুশক্তিং—তোমারই অংশস্বরূপা এই রোগরূপা দ্বিতীয়া বিষ্ণুশক্তিকে ওঁ অর্থাৎ সর্ব্বকারণ পরমেশ্বরে উপসংহার কর—উপসংহার কর। নয় নয় অর্থাৎ যথাগত স্থানে লইয়া যাও। পচ পচ অর্থাৎ পরিপাকের দ্বারা ইহার উগ্রতা বিনাশ কর। মথ মথ অর্থাৎ বিলোড়ন কর। উৎসাদয় উৎসাদয় অর্থাৎ এ স্থান হইতে স্থানান্তরে নিক্ষেপ কর। অথবা অন্য কোন প্রকারে ইহাকে দূর কর। অতঃপর আদ্যাশক্তির অধীন রোগশক্তিকে বলা হইতেছে। তুমি স্বস্থান হিমালয়ে গমন কর। পরে রোগীকে বলা হইতেছে। দুষ্কর্ম্মে অভিভূত তুমি রোগাভিভূত তুমি ও মৃত্যুকরাক্রান্ত তুমি মন্ত্রের সামর্থ্যে ও আমার ভাবনার প্রভাবে মৃত-সঞ্জীবনসমর্থ অমৃতে পরিপূর্ণ চন্দ্রমণ্ডলে গমন করিলে। এইরূপ ভাবিয়া ও ঐরূপ বলিয়া মন্ত্রী অনন্যচিত্তে ভাবিবেন যে, হোতা যেমন প্রদীপ্ত অগ্নিতে আহুতি নিক্ষেপ করে, সেইরূপ, মন্ত্রপূত রোগীকে চন্দ্রমণ্ডলে নিক্ষেপ করিলাম। বলা বাহুল্য যে, এই কার্য্য শুচি হইয়া আচমনাদি বৈধ কার্য্য করিয়া এক মনে এক চিত্তে নির্ব্বাহ করা কর্ত্তব্য।

একোনসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

সপ্ততিতম সর্গ।

বশিষ্ঠদেব বলিলেন, অনন্তর সেই কৃষ্ণবর্ণা পর্ব্বতাকারকায়াধারিণী রাক্ষসী কজ্জলের ন্যায় ও অম্বুদলেখার ন্যায় ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে লাগিল[১]। (কজ্জল=সুর্ম্মা। অনুক্ষণ একটু একটু গ্রহণ করিলে এক কৌটা সুর্ম্মা যেমন শীঘ্র কমিয়া যায়, সে সেইরূপ কমিয়া গেল)। প্রথমতঃ মেঘখণ্ডের ন্যায়, তদন্তর বৃক্ষশাখার ন্যায়, তদনন্তর পুরুষ-প্রমাণ, তদনন্তর হস্তপ্রমাণ, তদনন্তর প্রাদেশপরিমাণ, তদনন্তর অঙ্গুলি-প্রমাণ, তদনন্তর মাষশিম্বীসদৃশ হইল। তৎপরে স্থূল সূচীর, তৎপরে কৌষেয়-সীবন-যোগ্য সূক্ষ্মতম সূচীর আকার ধারণ করিল। পদ্মের সূক্ষ্ম কিঞ্জল্করেণু যদ্রূপ, রাক্ষসী তখন দেখিতে তদ্রূপ হইল। যেমন মনঃ-কল্পিত পর্ব্বত শীঘ্র দুর্লক্ষ্যতা প্রাপ্ত হয়, তেমনি, এই পর্ব্বতাকার রাক্ষসীও শীঘ্র পরমাণুর ন্যায় দুর্লক্ষ্য হইয়া গেল[২।৪]। রাক্ষসী ঐরূপে কৃষ্ণকায়া লৌহসূচী ও রোগরূপা জীবসূচী, দ্বিবিধ সূচীর আকারে বিরাজিতা, আকাশচরী ও আকাশবাসিনী হইল এবং পূর্য্যষ্টক * সহ গতিবিধি করিতে লাগিল[৫]।

রামচন্দ্র! রাক্ষসীর সূচীত্ব প্রাপ্তি দৃশ্যভ্রান্তি ব্যতীত বাস্তব নহে। লৌহসূচীর ন্যায় দৃশ্যমানা হইলেও তাহাতে লৌহের সংস্পর্শও ছিল না। † ইহা সহস্র সহস্র সম্বিৎভ্রমের অন্যতম ভ্রম, সুতরাং বাস্তব নহে[৬]। রাক্ষসী এখন রশ্মিরেখার ন্যায় ও রত্নসূচীর ন্যায় মসৃণা, বৈদূর্য্যসম নির্ম্মলা, পরমসুন্দরী ও সর্ব্বমনোহারিণী অদ্ভুততম রূপে প্রতীয়মানা হইতে লাগিল[৭]। অপিচ, বায়ু যে কৃষ্ণবর্ণ মেঘপিণ্ডের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণা বহন করে, উড়ায়, রাক্ষসী এক্ষণে তাহার ন্যায় আকারবতী হইল। দিব্য দৃষ্টি

---

* পূর্য্যষ্টক=মহাভূত, কর্ম্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয়, প্রাণ, অন্তঃকরণ, কাম ও কর্ম্ম, দেহ এতৎ-সমুদায়াত্মক। তাহার সহিত। মর্ম্ম=তত সূক্ষ্ম হইলেও তাহার ঐ সকল ছিল। অথবা মনুষ্যের ঐ সকল আক্রম করিত।

† ভাবার্থ এই যে,প্রকৃত লৌহ সূচ নহে, রক্তক্ষয় সূচীবেধ ও কণ্টকবেধ প্রভৃতি ক্লেশ।

থাকিলে দেখা যায়, তাহার মস্তকাংশে তদনুরূপ সূক্ষ্মছিদ্রের অভ্যন্তরে তাহার উজ্জল কৃষ্ণবর্ণ নেত্র তারকা বিরাজ করিতেছে[৮]। ইহার মুখ সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মতম। তৎকালে আরও দেখা গেল, পুচ্ছাগ্রভাগ পরমাণু অপেক্ষা সূক্ষ্ম। সূচী তাদৃশসূক্ষ্মপুচ্ছাগ্রাদিবিশিষ্ট সূক্ষ্মশরীর গ্রহণার্থ স্বীয় দেহবৈপুল্যের বিপর্য্যয়ে প্রসন্নমনে তপস্যাচরণ করিয়াছিল। পূর্ব্বে ইহার সমুজ্জ্বল নয়নদ্বয় দূর হইতে দুইটী প্রজ্জ্বলিত দীপের ন্যায় দৃষ্ট হইত, কিন্তু এক্ষণে সূচীভাব প্রাপ্ত হওয়ায় তাহা শূন্যসম অদৃশ্য হইয়া গেল। রাক্ষসী যখন লব্ধবরা হইয়া ক্রমে সূক্ষ্ম হইতেছিল, তখন তাহার দেহের অন্তর্গত আকাশ, দেহের সূক্ষ্মতা নিবন্ধন ক্রমেই যেন বাহিরে বিস্তৃত হইতে লাগিল। তৎকালে এরূপ বোধ হইতে লাগিল, রাক্ষসী যেন বর প্রাপ্ত হইয়া প্রসন্নবদনে আকাশ উদ্গীরণ করিতেছে[১০]। এক্ষণে সে দূরপ্রসৃত দীপ শিখার ন্যায় (বিরলাবয়ব রশ্মিরেখার ন্যায়) সূক্ষ্মা ও সদ্যোজাত বালকের কেশের ন্যায় কোমলা হইল[১১]। মৃণাল ভাঙ্গিলে তন্মধ্য হইতে যেমন সূক্ষ্ম তন্তু নির্গত হয়, এবং সুষুম্না নাম্নী সূক্ষ্মা নাড়ী যেমন মূলকন্দ (মূলাধার) হইতে উদ্গত হইয়া ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া সূর্য্যমণ্ডলের অভিমুখে গমন করে, রাক্ষসী এখন ঠিক্ তদনুরূপ রূপধারিণী হইল[১২]। তাহার তাদৃশ সূক্ষ্ম শরীর হইলেও তাহারই মধ্যে যথাযথ স্থানে যথাযোগ্য চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সকল এবং জীবনও যথাযথ বিদ্যমান রহিল। রাক্ষসী ঐরূপে সজীব অনায়সী সূচীভাব প্রাপ্ত হইয়া বৌদ্ধগণের ও তার্কিকদিগের বিজ্ঞানের ন্যায় জনগণের অলক্ষিত হইয়া গেল[১৩]। * অধিক কি বলিব, এই অনায়সী সূচী শূন্যবাদী বৌদ্ধের শূন্য পদার্থের অনুরূপা। আয়সী সূচী এই অনায়সী জীবসূচীর আশ্রিতা। ইহার রূপ আকাশের নীলিমার ন্যায়। ইহার অধীন যে জীবসূচী, তাহাও মনোবৃত্তিতে প্রতিফলিত চিদাভাসের অনুরূপ। যেমন বিনশ্যদবস্থাপন্ন সূক্ষ্ম দীপের কিরণ দৃষ্টিগোচর হয় না

* বৌদ্ধেরা আলয় বিজ্ঞানকে (একটী মূলীভূত অবিচ্ছিন্ন অহং অহং—আমি আমি, এতদ্রূপ জ্ঞানধারাকে) আত্মা বলে। তাদৃশ আত্মা কেবল তাহারাই বুঝে, অন্য কোন পণ্ডিত বুঝেন না। তার্কিকেরাও অর্থাৎ অপর এক বৌদ্ধেরাও তাদৃশ জ্ঞানধারার অস্তিত্ব সাধক দ্রষ্টা বা সাক্ষী থাকা স্বীকার করেন না। সেজন্য তাহাও অন্যের অবোধ্য। ফলিতার্থ— বৌদ্ধের ও তার্কিকের মতের আত্মা যদ্রূপ দুর্লক্ষ্য, এই সূচীও তদ্রূপ দুর্লক্ষ্য।

অথচ তাহার অন্তরে তীক্ষ্ণ দাহিকা শক্তি অস্পষ্ট ভাবে অবস্থিতি করে, তেমনি, এই সূচীভাবাপন্না রাক্ষসী নিতান্ত অদৃশ্যা হইলেও তাহার অন্তরে যথাযথ বাসনাদি বিদ্যমান ছিল[১৪।১৫]। দুঃখের বিষয় এই যে, রাক্ষসী ভক্ষণতৃপ্তি লাভার্থ সূচী হইল বটে, পরন্তু উদর না থাকায় তাহাতে তাহার সুবিধাবোধ হইল না। এখন সে মনে মনে ভাবিতে লাগিল, আমি এই উদরবিহীন সূচীত্ব পরিগ্রহ করিয়া কি মূর্খতার কার্য্যই করিয়াছি![১৬] এইরূপ ও অন্যান্যবিধ চিন্তা করিয়া সে তুচ্ছ গ্রাস চিন্তাকে ও স্বীয় গ্রাসচেষ্টিত চিত্তকে নিরর্থক মনে করিতে লাগিল[১৭]। অনর্থবুদ্ধি জীবের চিত্তে পূর্ব্বাপর বিচারণার স্ফূর্ত্তি হয় না। তাহার দৃষ্টান্ত দেখ, মূঢ়মতি রাক্ষসী অবিচারপরায়ণা হইয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক বৃথা সূচী ভাব গ্রহণ করিল[১৮]। কোন এক বিষয়ে অতি নির্ব্বন্ধ ভাল নহে। তাহাতে অভিমত পদার্থের অন্যথা হইয়া যায়, সুতরাং উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয় না। দর্পণকে অতিরাগে পুনঃ পুনঃ সম্মুখবর্ত্তী করিতে গেলে নিঃশ্বাসে তাহা মলিন হইয়া যায়, প্রতিবিম্বদর্শন দূর-পরাহত হইয়া যায়[১৯]। রাক্ষসী পীবরদেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সূচীত্ব প্রাপ্ত হইয়া মহৎ দুঃখ প্রাপ্ত হইলেও তাহা সুখবৎ সহ্য করিতে বাধ্য হইল[২০]। কি আশ্চর্য্য! যাহারা এক বস্তুর প্রতি অতি অনুরাগী, তাহাদের দুর্গতি ব্যতীত সুগতি হয় না। তাহার দৃষ্টান্ত—রাক্ষসী আহারের প্রতি অতি অনুরাগিনী হইয়া আপনার বৃহৎ শরীর তৃণবৎ পরিত্যাগ করিল[২১]। জীব এক বস্তুর অত্যাস্বাদে অন্যান্য সম্বিদ্ (জ্ঞান) হারা হইয়া যায়। তাহার দৃষ্টান্ত—রাক্ষসী অতি ভোজনের আস্বাদে আপনার দেহ বিনাশ ভাবনা করিল না[২২]। এক বস্তুর অনুরাগী অজ্ঞ লোকেরা বিনাশকেও সুখ জ্ঞান করে। তাহার নিদর্শন—রাক্ষসী আহারের অনুরাগে সূচী হইল, বিদেহ হইল, তথাপি সে তাহাতেও অসুখী হইল না, প্রত্যুত সুখী মনে করিতে লাগিল[২৩]। রামচন্দ্র! কর্কটী রাক্ষসী যে জীববিসূচিকারূপিণী অর্থাৎ ব্যাধিবিশেষরূপিণী হইল, তাহার বিবরণ এইরূপ—ব্যোমাত্মিকা সুতরাং নিরাকারা। তাহার লিঙ্গদেহও আকাশের তুল্য। যেমন সূক্ষ্ম তেজঃপ্রবাহ সেইরূপ। কুণ্ডলিনীশক্তির যে আকার, জীববিসূচিকারও সেই আকার। এই জীববিসূচিকা সূক্ষ্ম সূর্য্যকিরণের কিংবা চন্দ্রকিরণের ন্যায় সুন্দরবর্ণা[২৪।২৫]। ইহার মনোবৃত্তি পাপময়ী ও ক্রূরা

এবং অয়ঃসূচী অপেক্ষাও তীক্ষ্ণা। যেমন ফুলের গন্ধ নিশ্বাসযোগে হৃদয়ে প্রবেশ করে, তেমনি, এই পাপীয়সী পরমাণু অপেক্ষাও সূক্ষ্মা হইয়া বায়ুভরে প্রাণিদেহে প্রবেশ করতঃ লীনা হইত ও অতিচতুরতার সহিত হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিত। পাপীয়সী পরের প্রাণ অর্থাৎ নিশ্বাস মাত্র অবলম্বন করিয়া পরকীয় দেহে প্রবিষ্টা হইত ও নিজ মনোরথ সিদ্ধি করিত[২৬।২৭]। হে রঘুনাথ! রাক্ষসী অভিহিত প্রকারে কার্পাসাংশুসদৃশসূক্ষ্মা সূচীদ্বয়মুখী ও নীহারকণসদৃশী তরলা, হইয়া সূক্ষ্ম দেহদ্বয় গ্রহণ করতঃ নরগণের হৃদয়ে প্রবেশ করতঃ তাহাদিগকে হিংসা করতঃ দশ দিকে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল[২৮।২৯]।

হে রাঘব! বস্তু সকল স্বীয় সঙ্কল্পের প্রভাবেই গুরু অথবা লঘু হইয়া থাকে। তাহারই দৃষ্টান্ত—কর্কটী স্বীয় সঙ্কল্পের দ্বারা বিশালদেহ পরিত্যাগ করিয়া সূক্ষ্ম সূচীত্ব প্রাপ্ত হইল[৩০]। অতি তুচ্ছ বস্তুও দুর্ব্বুদ্ধি জীবের প্রার্থনীয় হয়। তাহার উদাহরণ—রাক্ষসী তপস্যা করিয়া সূচারূপে পৈশাচী বৃত্তি উপার্জ্জন করিল[৩১]। পুণ্য অর্জ্জনে প্রবৃত্তা হইয়াও যাহার যাহার জাতীয় কুস্বভাব শমতা প্রাপ্ত হয় না। তাহার দৃষ্টান্ত দেখ—তপস্যার দ্বারা পূতশরীরা হইয়াও রাক্ষসীর জাতীয় স্বভাব পরিত্যাগ হইল না। রাক্ষসী কেবল পরপীড়নার্থই তপস্যার দ্বারা সূচীদেহ উপার্জ্জন করিল[৩২]।

অনন্তর কর্কটীর সেই বৃহৎ শরীর প্রচণ্ডবাতবিশীর্ণ শরদভ্রের ন্যায় বিগলিত হইলে সে সূক্ষ্ম সূচীদেহ প্রাপ্ত হইয়া দিগ্‌দিগন্ত পরিভ্রমণে প্রবৃত্তা হইল। সেই জীবসূচী তখন বায়ুকণার ন্যায় স্বীয় অদৃশ্য সূক্ষ্ম শরীর দ্বারা বিবশাঙ্গ, ক্ষীণাঙ্গ ও বিপুলাঙ্গ জনগণের হৃদয়ে প্রবেশ করতঃ বিসূচিকাব্যাধিরূপে ও কৃশকায় স্বস্থ ও সুখী দিগের অন্তরে গমন করতঃ দুর্লক্ষ্য দুর্ব্বুদ্ধিরূপা অন্তর্ব্বিসূচিকারূপে প্রবেশ করতঃ স্বমনোরথ সিদ্ধ করিতে প্রবৃত্তা হইল। সেই সূচিকা উক্ত প্রকারে জনগণের হৃদয়ে প্রবেশ করতঃ কখন পরিতৃপ্ত হইতে লাগিল এবং কখন বা পুণ্য, মন্ত্র, ঔষধ ও তপস্যাদির দ্বারা নিবারিত হইতেও লাগিল[৩৩।৩৬]।

অনন্তর সেই সূচী বর্ণিতপ্রকারের দেহ গ্রহণ করতঃ কখন আকাশে কখন বা ভূমিতলে বহুবর্ষ পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করিল[৩৭]। ভূতলে ধূলি-

কণার দ্বারা, আকাশে প্রভার দ্বারা, হস্তে অঙ্গুলির দ্বারা, বস্ত্রে সূত্রের দ্বারা তিরোহিত থাকিত। এবং জনগণের স্নায়ুতে, ব্যভিচারাদি দোষদুষ্ট উপস্থেন্দ্রিয়ে, হস্তপদাদির রূক্ষ রেখায়, সূক্ষ্ম রোমকূপে, নষ্ট সৌন্দর্য্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গে, সত্ত্বাবশূন্য ও সৌভাগ্যবিহীন নষ্টকান্তি জনগণের অন্তরে, রুগ্ন ব্যক্তির নিশ্বাসে, মক্ষিকাদি কীট দুষ্ট ও রূক্ষ দুর্গন্ধ বায়ুযুক্ত তৃণাদ্যাবৃত প্রদেশে, শ্রীবৃক্ষ বর্জ্জিত প্রদেশে, * দুর্গন্ধবায়ুযুক্ত হরিদ্বর্ণ তৃণক্ষেত্রে,[৩৮।৪০] পশুনরাদির অস্থিবলিত (পরিব্যাপ্ত) প্রদেশে, সর্ব্বদা প্রবলরূপে বহমান বায়ুযুক্ত স্থানে, সাধু সজ্জন বর্জ্জিত প্রদেশে, অপবিত্রবসন ব্যক্তিগণের আবসথে অর্থাৎ নীচবৃত্তি ম্লেচ্ছ চণ্ডালাদির সঞ্চার স্থানে,[৪১] কীটক্ষতবৃক্ষকোঠরবাসী বায়সাদি পক্ষীতে, শীতাধিক্য দ্বারা রূক্ষ ও শব্দায়মান বায়ু যুক্ত স্থানে, ঘনীভূতনীহারপটলসঞ্চার-স্থানে, ব্রণরোগীর ক্ষুদ্র (অল্পায়তন) বাস স্থানে, পুরুষপদাৰ্চাহ্নিত প্রদেশে, বল্মীক মধ্যে, পর্ব্বতে, মরুভূমিতে, ভল্লুক, ব্যাঘ্র ও অজগরাদি সমাকীর্ণ ভীষণ অরণ্যে, জীর্ণপর্ণসমাকীর্ণ শুষ্কবিরূপ দুর্গন্ধ পল্বল মধ্যে, শীতল সমীরণ বিশিষ্ট দুর্গন্ধজল গর্ত্তে, কুল্যাদিপরিবৃত প্রদেশে ও বহুল নিশ্বাস যুক্ত পান্থশালায়, ছারপোকা ও মশা প্রভৃতি নররক্তপায়ী কীট পরিব্যাপ্ত স্থানে গমনাগমন করিতে লাগিল[৪২।৪৬]। হয়হস্ত্যাদি পরিপূর্ণ নগরে ও পথিক গণের বিশ্রাম স্থানে গতায়াত করিতে লাগিল। অহে কুলপাবন রাম! সেই সূচিকা ঐরূপে বহুকাল পর্য্যটন করিয়া সাতিশয় পরিশ্রান্তা হইল[৪৭]। নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে রথ্যানিক্ষিপ্ত ছিন্ন বস্ত্রাদি অবলম্বন করতঃ, বলীবর্দ্দ যেমন অরণ্যমধ্যে শৃঙ্গ দ্বারা বল্মীক প্রভৃতি মৃত্তিকাস্তূপ বিদীর্ণ করে, তেমনি সে জনগণের জরাতপ্ত কলেবর বিদীর্ণ করিতে লাগিল[৪৮]। কোন কোন লোক তাহাকে সীবন কার্য্যের নিমিত্ত গ্রহণ করিয়াছিল। তাহাতে সে যখন সীবন কার্য্যে ব্যাপৃতা হইয়া অত্যন্ত পরিশ্রান্তা হইত, তখন সে বিশ্রামের নিমিত্ত সীবনকারীর হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া ভূতলে নিপতিত ও অদৃশ্য হইত[৪৯]। সূচী, বেধন-স্বভাব হইলেও কৌতুক কারণে সীবন কারীর হস্তাদি বিদ্ধ করিত না।

---

* শ্রীবৃক্ষ=বিল্ববৃক্ষ ও তুলসীবৃক্ষ। অথবা শ্রীবৃদ্ধিকারী বাস্তবৃক্ষ। যে স্থলে তুলসী বা বিল্ববৃক্ষাদি না থাকে সে স্থল রোগরূপিণী বিসূচিকা পরিভ্রমণ করিতে ভালবাসিত। এ কথার অর্থ—ঐ সকল বিসূচিকা কীটের নাশক।

এবং কার্য্য হইতে অপসৃত হইলেও স্বীয় ক্রূর স্বভাব প্রকাশ করিতে সমর্থ হইত না[৮]। সে মুখ দ্বারা পরপ্রযুক্ত সূত্রপ্রান্ত গ্রাস করিত; সুতরাং পরপ্রযুক্ত অর্থাৎ পরাধীন উদর পূরোণোদ্যম দ্বারা তাহাকে সুস্থচিত্ত থাকিতে হইত। রামচন্দ্র! অভিহিত লক্ষণাক্রান্তা অয়ঃসূচী ঐরূপে জীবসূচীর সহিত দিক্‌বিদিক্ সর্ব্বত্রই পরিভ্রমণ করিতে লাগিল[১]। যেমন বায়ুর দ্বারা তুষকণা ভ্রামিত হয়, সেইরূপ, সূচীও দিগ্‌দিগন্তে ভ্রমণ করিত। দুর্ম্মতি কর্কটী পূর্ব্বে সূচীত্ব পরিগ্রহের নিমিত্ত প্রফুল্লচিত্তে উৎকট তপঃক্লেশ সহ্য করিয়াও পরহিংসার দ্বারা উদর পূরণের অভিলাষ করিয়াছিল, এক্ষণে সে সূচীত্ব পরিগ্রহ পূর্ব্বক মাত্র পরপ্রযুক্ত সূত্রপ্রান্ত বদনে ধারণ করিয়া সমুচিত প্রতিফল প্রাপ্ত হইয়াছে। এই ক্রূরবুদ্ধি রাক্ষসী ক্ষীণ দিগকেও নির্দ্দয়ভাবে বেধন করিত। তাহার দৃষ্টান্ত—বস্ত্রসকল অত্যন্ত জীর্ণ হইলেও তাহাদিগকে সীবন করিতে ক্ষান্ত থাকিত না। এই দুঃশীলা রাক্ষসী অনল্প তপস্যার দ্বারা সূচীদেহ উপার্জ্জন করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই পরপ্রযুক্ত সূত্রাগ্রদ্বারা উদরপূরণ করা অযোগ্য অর্থাৎ অনুচিত বিবেচনা করিয়াছিল এবং সেই ক্ষীণোদরকারী তপঃকর্ম্মের নিমিত্ত অনুতপ্তা হইয়াছিল। মনোমধ্যে অনুতাপ ধারণ করিলেও সে স্বীয় রাক্ষসীস্বভাব ত্যাগ করিতে পারে নাই। সেইজন্য সে সর্ব্বদা বেধন কার্য্যেই ব্যাপৃত থাকিত[২।৮]। যেমন জীবের মরণকালে বিষয়বাসনারূপ সুদীর্ঘ তন্তু (সুতা) উদ্ভূত বা আবির্ভূত হইয়া জীবচেতনাকে তদনুরূপ শরীরে সঞ্চারিত করে, তেমনি, সেই বেধনচতুরা সূচী বস্ত্রে সূত্র সঞ্চারিত করিত[৯]। সে সীবনকার (ওস্তাগর) কর্ত্তৃক সীবন কার্য্যে নিযুক্ত হইলে সে স্বীয় মুখ যেন বস্ত্রদ্বারা গোপন করিয়াই তন্তুবেধন কার্য্যে ব্যাপৃত হইত। যাহারা দুর্জ্জন—তাহারা অপ্রকাশ্য মুখেই (আড়ালে থাকিয়াই) জনগণের মর্ম্ম ভেদ করিয়া থাকে[৩০]। এই নির্দ্দয়া রাক্ষসী কখন নারীগণের কণ্ঠলগ্ন উত্তরীয় বসনে নিবদ্ধ হইয়া (ওড়্‌নায় ফুটিয়া থাকিয়া) স্বীয় ছিদ্ররূপ নেত্রদ্বারা তাহাদিগের বদন নিরীক্ষণ করতঃ " হায়! আমি ইহাদিগকে কি প্রকারে বিদ্ধ করিব " এইরূপ চিন্তা করিত। যাহারা ক্রূর ও দুর্জ্জন—তাহারা ঐরূপেই পরহিংসা করিয়া থাকে[৩১]। কি মৃদুকোমল কৌশেয় বস্ত্র, কি রূক্ষ দৃঢ় ও কঠিন বল্কলাদি, সকল

স্থানেই তাহার স্বভাব সমভাবে কার্য্য করিত। যাহারা মুর্খ—তাহারা দ্রব্যের গুণাগুণ বিচার করে না৬২। সীবনকারের অঙ্গুষ্ঠনিপীড়িতা দীর্ঘসূত্রধারিণী সেই সূচীকা যখন সীবনকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিত—তখন তাহাকে দেখিলে মনে হইত, যেন সে স্বীয় উদর হইতে অন্ত্র সকল উদ্গীরণ (পেট দিয়া নাড়ী বাহির) করিছে৬৩। তীক্ষ্ণা হইলেও হৃদয় না থাকায় তাহার সরস নীরস জ্ঞান ছিল না; সুতরাং সে রসাস্বাদ-বিহীনা হওয়ায় সূত্রনিরুদ্ধ হইয়া সকল পদার্থেই প্রবেশ করিত৬৪। হায়! সূচীর কি দুর্দ্দশা! সূচী নিষ্ঠুরভাষিণী নহে, অথচ ইহার বদন সূত্রদ্বারা আবদ্ধ। কাহাকেও সন্তাপিত করে না, অথচ সে সন্তপ্তা হয়। শরীরে ছিদ্র আছে, অথচ উদর নাই। যেমন কোন কোন রাজপুত্রী বুদ্ধিদোষে দুর্ভগা হয়, সেইরূপ, সূচীও বুদ্ধিদোষে দুর্ভাগ্য-শালিনী হইয়াছে৬৫। সূচী সচ্ছিদ্রা। সূচী পূর্ব্বে নিরপরাধী জনগণের সংহার বাসনা করিয়াছিল, এক্ষণে সে তাহারই প্রতিফলস্বরূপ সূত্র-নিবদ্ধ হইয়া কর্ম্মপাশে প্রলম্বিতা হইতে লাগিল৬৬। হে রামচন্দ্র! সূচী সীবক হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া কখন কখন অদূরে নিপতিত হইত; কখন বা উৎসঙ্গাদিতে (উৎসঙ্গ=ক্রোড়) নিপতিত হইয়া তত্রত্য কৃষ্ণবর্ণ কুৎসিত রোমরাজিকে মিত্রজ্ঞান করতঃ তৎসমীপে শয়ন করিত। আরও দেখাগিয়াছে, সেই রাক্ষসী সমভাব মূঢ়চিত্ত দিগেরই সহিত অবস্থান করিত। কে আপনার তুল্য সঙ্গতি পরি-ত্যাগ করে৬৭।৬৮? সে, কখন কখন লৌহকার দিগের কার্য্যে নিযুক্ত হইত, তন্নিবন্ধন সে কখন বা অগ্নিতে সন্তাপিত হইত ও ভস্ত্রাবাত-দ্বারা বিচলিত হইয়া গগনে উদ্গমন করিত। কখন প্রাণ ও অপান বায়ুর প্রবাহে অবস্থান করতঃ জনগণের হৃৎপদ্মে গিয়া বিচরণ করিত। এইরূপে সেই দুঃখপ্রদায়িনী ঘোরা দুঃখশক্তিস্বরূপা সূচিকা জীবশক্তিরূপে আবির্ভূত হইয়া কখন সমান, উদান ও ব্যান বায়ুর প্রবাহে অবস্থান করতঃ জনগণের ব্যাধি উৎপাদন ও সর্ব্বাঙ্গে দোষ সঞ্চারণ করিত। কখন বা শূলরোগাত্মক বায়ুতে প্রবেশ করতঃ জনগণের হৃৎকণ্ঠে গমন পূর্ব্বক তাহাদিগের বৈবর্ণ্য উৎপাদন করিত ও কখন বা উন্মত্ত করিত। কখন লৌহসূচী হইয়া কম্বলাদি সীবন-কালে মেষপালকের হস্তে অবস্থান করতঃ ঊর্ণাকোটরে নিদ্রা যাইত।

কখন বালকগণের হস্তাঙ্গুলিরূপ শয্যা বিদ্ধ করতঃ ক্রীড়া করিত। কখন জনগণের পাদপ্রবিষ্টা হইয়া রুধির পান করিত। কখন পুষ্পমালা গ্রথনে নিযুক্ত হইয়া যৎসামান্য পুষ্পগুচ্ছ ভোজনেই পরিতৃপ্তা হইত। কখন চিরকালের নিমিত্ত কর্দ্দমকোষে অধোমুখে শয়ন করিয়া থাকিত; এবং যদৃচ্ছাক্রমে সমাগত ব্যক্তিগণ দ্বারা গৃহীত হইয়া তাহাদিগের আলয়ে গমন করিত৬৯।৭৫।

হে লম্বিতভুজ! পরহিংসাদ্বারা রাক্ষসীর কোন প্রকার স্বার্থসাধন না হইলেও সে নিরর্থক পরপ্রাণ বিনাশ করতঃ স্বীয় আত্মাকে ক্রূরতা দোষে দূষিত করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিল। যাহারা নীচাশয়, কলহ তাহাদিগের উৎসব অপেক্ষা অধিক সুখপ্রদ হয়। রাক্ষসী কণামাত্র রক্ত লাভের নিমিত্ত সন্তুষ্টচিত্তে পরপ্রাণ হিংসা করিত। যাহারা কৃপণ, তাহারা অর্দ্ধ-কপর্দ্দককেও বহুমূল্য জ্ঞান করিয়া থাকে। তাহার রাক্ষসকুলোচিত পর-হিংসাভিমান দুরুচ্ছেদ্য ছিল। সর্ব্বদাই দেখা যায়, জনগণের অভিমান নিতান্ত দুরুচ্ছেদ্য৭৬।৭৭। মূঢ়মতি রাক্ষসী সূচীত্ব লাভ করিয়া মোহের বশবর্ত্তিনী ও সর্ব্বজন বিনাশের নিমিত্ত বৃথা অভিলাষিণী হইয়াছিল। অহো! যাহারা মূঢ়চেতা, তাহারা স্বার্থসাধক জ্ঞানে অস্বার্থ বিষয়ে অর্থাৎ নিজের অনিষ্টকর বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়। "আমি বস্ত্রতন্তু বেধন দ্বারা শীঘ্র পরহিংসাবৃত্তি অভ্যাস করিতে পারিব" এইরূপ মনে করিয়া সে সন্তুষ্ট থাকিত৭৮।৭৯। হায়! সূচীর কি দুর্দ্দশা! যেমন কোন প্রসিদ্ধ সূচী স্থাপিত (কার্য্য বিরত) থাকিলে ঘর্ষণের অভাবে মলিন হইয়া যায়, তেমনি, এ সূচীও অন্যের অনপরাধে দুঃখ প্রাপ্তা হইয়া-ছিল। সেই সূক্ষ্মা অদৃশ্যা বেধনকরী তীক্ষ্ণা ক্রূরা ও উৎপাতরূপা সূচী ক্ষণে ক্ষণে আত্মবিস্মৃতা হইত এবং অন্য সময়ে জনগণের মর্ম্মস্থান বিদ্ধ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিত। যাহারা দুর্জ্জন হয়, তাহারা যে কোন প্রকারে হউক, পরহিংসা করিতে পারিলেই সন্তুষ্ট হয়৮০।৮২।

হে মহাবাহো রামচন্দ্র! সেই রাক্ষসী অভিহিত প্রকারের দেহদ্বয় গ্রহণ করিয়া কখন পল্বলাদির পঙ্কে নিমগ্ন থাকিত, কখন আকাশে গমন করিত, কখন আকাশীয় বায়ুর সহিত দিকতটে বিহার করিত, কখন পাংশুরাশি মধ্যে, কখন ভূমিতলে, কখন অরণ্যে, কখন পর্য্যঙ্কে, কখন গৃহে, কখন অন্তঃপুরে, কখন হস্তে এবং কখন বা জনগণের

কর্ণস্থ পদ্মপুষ্পে শয়ন করিত। কখন মৃত্তিকা ও কাষ্ঠ নির্ম্মিত কুড্যাদির সূক্ষ্ম ছিদ্রে অবস্থান করিত। কখন বা মনুষ্যাদির হৃদয়ে বসতি করিত। সূচিকা পূর্ব্বোক্ত সেই সেই আকারে ও সেই প্রকারে মন্ত্রসিদ্ধ ও দ্রব্যশক্তিসম্পন্ন মায়াবী জনের ও যোগিগণের ন্যায় সকল স্থানেই গমনাগমন করিত[৮৩]।

বাল্মীকি বলিলেন, হে বুদ্ধিমন্! বশিষ্ঠদেব এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন; এমন সময়ে ভগবান্ মরীচিমালী অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলেন। তখন সভাস্থজনগণ পরস্পর পরস্পরকে অভিবাদন করিয়া সায়ন্তন কার্য্য সাধনার্থ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। পরদিন প্রভাতকালে সেইসমস্ত জনগণ পুনর্ব্বার সেই সভায় আগমন করতঃ স্ব স্ব স্থানে ও আসনে আসিয়া উপবেশন করিলেন[৮৪]।

সপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

একসপ্ততিতম সর্গ

বশিষ্ঠ বলিলেন, সূচীরূপা কর্কটী ঐরূপে বহুকাল নরমাংসাদির আস্বাদ গ্রহণ করিল অথচ পরিতৃপ্তা হইল না। তাহার সুদুর্জ্জয়া ক্ষুধা অল্প রুধিরে উপশমিত হইবার নহে[১।২]। অনন্তর রাক্ষসী তাদৃশী দুর্দ্দশা প্রাপ্ত হইয়া একদা চিন্তা করিতে লাগিল—হায়! আমি কি অকার্য্যই করিয়াছি! ওঃ আমার কি কষ্ট! উঃ কি দুঃখ! কেন আমি ইচ্ছা করিয়া সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত ও হতশক্তি হইলাম! আমার ভক্ষণ শক্তি এত অল্প হইয়াছে যে, আমার উদরে এক গ্রাসেরও স্থান নাই[৩]। আমার সেই পূর্ব্বতন বিশাল অঙ্গ এক্ষণে কোথায় গেল? আমার সেই মেঘকান্তি বিশাল দেহ এক্ষণে নাই, তাহা জীর্ণ পর্ণের ন্যায় বিশীর্ণ হইয়াছে[৪]। আমি কি দুর্ব্বুদ্ধি! কি হতভাগিনী! সম্প্রতি বসাসুবাসিত রক্ত মাংস প্রভৃতি সুস্বাদু ভক্ষ্য সকল অতিমাত্র অল্প হইলেও আমার নিকট অপরিমিত বলিয়া অনুভূত হইতেছে[৫]। আমি এখন জনগণের পদদ্বারা আহত, পঙ্কান্তরে নিমগ্ন, ভূতলে নিপতিত ও শুক্রধাতুতে নিমগ্না হইতেছি[৬]। * হায়! হায়! আমি এখন হতা ও অনাথা! এমন বন্ধু নাই যে, আমাকে আশ্বাস দেয় ও আশ্রয় দান করে। আমি সূচী হইয়া এক সঙ্কট হইতে অন্য এক ঘোর সঙ্কটে পড়িয়াছি এবং ক্ষুদ্র দুঃখ হইতে দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি[৭]। হায়! হায়! আমি এখন এমন দুঃখিনী যে, আমার সখী, দাসী, মাতা, পিতা, বন্ধু, ভৃত্য, ভ্রাতা, সন্তান, দেহ, স্থান, অধিক কি, এখন আমার কোন প্রকার উপজীব্য, কিছুই নাই। আমার নির্দ্দিষ্ট বাসস্থানও নাই। এখন আমি সর্ব্বদা অরণ্যে নিপতিত ও শুষ্ক পত্রের ন্যায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছি[৮।৯]। আমি আপদ্ সমূহের সম্মুখে অবস্থান করিতেছি, নিদারুণ বিষয়ে নিবিষ্ট হইয়াছি, সর্ব্বদা মরণাভিলাষ করিতেছি, তথাপি মৃত্যু আমাকে গ্রাস করিতেছে না[১০]। আমি কি

* বিসূচিকা কীট প্রায়ই শুক্রধাতু দূষিত ও আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়।

মূঢ়মতি! মূঢ় ব্যক্তিরাই কাচ বলিয়া হস্তগত চিন্তামণি পরিত্যাগ করে। তাহাদের ন্যায় আমিও মূঢ়চেতনা হইয়া দেহ পরিত্যাগ করিয়াছি[১১]। এখন বুঝিলাম, আমার মনই এই মহৎ দুঃখের হেতু। মোহগ্রস্ত মনই দুর্ব্বুদ্ধিরূপ আপদ্ বিস্তার করতঃ দুঃখপরম্পরা বিস্তার করে[১২]। কি দুঃখ! কি বিষাদ! আমি যে এখন, কখন ধূমে অবস্থিত, কখন পথি মধ্যে খরোষ্ট্রাদি জন্তুগণ দ্বারা মর্দ্দিত এবং কখন বা তৃণাদিতে প্রক্ষিপ্ত হইতেছি, ইহা অপেক্ষা আর কি অধিক দুঃখের অবস্থা হইতে পারে? আমি এখন নিত্য পরপ্রচালিত ও পরসঞ্চারিত হইতেছি। হায়! আমি এখন যার পর নাই দৈন্যতা প্রাপ্তা ও পরের বশবর্ত্তিনী হইয়াছি[১৩।১৪]। আমার সেই রক্তমাংসাদির আস্বাদ লালসা এখন কেবল মাত্র পরপীড়াদায়িনী হইয়াছে! (উদর ও জিহ্বা না থাকায় স্বাদ গ্রহণে বঞ্চিত হইয়াছি, সুতরাং কেবল পরপীড়া প্রদানই আমার সার হইয়াছে) আমি নিতান্তই হতভাগিনী। কেননা, সূচী হওয়ায় আমার দুর্ভাগ্যের পরিসীমা রহিল না[১৫]। আমি তপস্যার দ্বারা যাহার শান্তি করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম, আমার ভাগ্যে তাহাই আমার সর্ব্বনাশের কারণ হইয়াছে। কেন আমি আমার আত্মবিনাশ আনয়ন করিলাম! আমার এ ঘটনা, ভূত ছাড়াইতে ভূতে পাওয়ার অনুরূপ[১৬]। কেন আমি আমার তাদৃশ বিশাল দেহ পরিত্যাগ করিলাম। কেনই বা আমার দেহবিনাশকারিণী অশুভা মতি সমুদিত হইয়াছিল? এখন বুঝিলাম, বিনাশের পূর্ব্বে জীবের দুর্ব্বুদ্ধি উপস্থিত হইয়া থাকে[১৭]। এক্ষণে আমি কীটাণু হইতেও সূক্ষ্মা। এখন পাংশুচ্ছন্ন প্রদেশে নিপতিত আমাকে কে উদ্ধার করিবে? মানবগণ উদ্ধার করিতে পারেন বটে; কিন্তু দেখিতে না পাওয়ায় তাঁহারাও আমাকে মুক্ত করিতে সমর্থ হইবেন না[১৮]। সূক্ষ্মদর্শী যোগীরাই আমার উদ্ধারে সমর্থ, কিন্তু মাদৃশ হতাশয়গণ কি প্রকারে সেই গিরিবাসী বিবিক্তমনা উদাসীন যোগিগণের অন্তরে স্থান প্রাপ্ত হইবে[১৯]? আমি অজ্ঞতারূপ মহাসমুদ্রে অবস্থান করিতেছি, আর আমার অভ্যুদয়ের প্রত্যাশা নাই। যাহারা অন্ধ, তাহারা কি কখন নখদর্পণদর্শী জনগণের ন্যায় দর্শনশক্তি প্রাপ্ত হয়[২০]? হায়! হায়! আমি যে আর কত কাল এরূপ আপদ্ সমূহে পরিবেষ্টিত ও নিশ্চেষ্ট হইয়া এই আপদ্‌পরিপূর্ণ গর্ত্তে

লুণ্ঠিত হইব, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না[২১]। আর কি আমি সেই অঞ্জনমহাশৈলের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ বিশাল দেহ ধারণ করতঃ গগনতলস্পর্শী স্তম্ভের ন্যায় অবস্থান করতঃ প্রাণিসংহারে প্রবৃত্ত হইতে পারিব? আর কি আমি সেই জলধরপটল সন্দর্শনে নর্ত্তনশীলা শিখণ্ডিনীর ন্যায় নিশ্বাসপবন দ্বারা নর্ত্তিত ও লোলায়িত স্তনদ্বয় বিশিষ্ট শ্যামবর্ণ লম্বোদর দেহ প্রাপ্ত হইব? আর কি আমি আকাশের-মানদণ্ড (মাপের বাঁশ) স্বরূপ অত্যুচ্চকেশকলাপসম্পন্ন, মেঘবিম্বসদৃশ দীর্ঘভুজ-দ্বয়শালিনী ও বিদ্যুৎসদৃশ নয়ন সম্পন্না হইতে পারিব[২২।২৪]? আর কি আমি হাস্যবিনির্গত তেজঃশিখারদ্বারাদগ্ধ অরণ্যের ভস্মরাশির দ্বারা সূর্য্যমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করতঃ কৃতান্তের ন্যায় সকল প্রাণী গ্রাসে উদ্‌যোগিনী হইতে পারিব? আর কি আমি সেই ভীষণ আকার লাভ করিতে পারিব? আর কি আমি জলন্ত উলূখল সদৃশ নয়ন সম্পন্ন ও সর্পমালারূপ স্রগ্‌দাম (হার) ভূষিত হইয়া পর্ব্বতশৃঙ্গে ভ্রমণ করিতে পারিব[২৫।২৬]। আর কি আমি গিরিগুহোপম ভাস্বর মহোদর বিশিষ্টা শরন্মেঘোপম স্নিগ্ধনখরাবলী সম্পন্না রক্ষঃকুল বিদ্রাবণ কারিণী হইয়া হাস্য সহকারে মহারণ্যে আনন্দে স্ফিগ্‌বাদ্য করতঃ (স্ফিক্= নিতম্বপার্শ্ব, পাছা।) নৃত্য করিয়া বেড়াইতে পারিব? আর কি আমি মদিরাকুম্ভ ও মৃতমাংসাস্থিসমূহের দ্বারা আমার সেই দুরোদর পূর্ণ করিতে সমর্থা হইব? আর কি আমি তাদৃশ পীতবর্ণাভ আরক্ত প্রান্ত নয়ন প্রাপ্ত হইব? আর কি আমি সেইরূপ হৃষ্টা পুষ্টা প্রদীপ্তা থাকিয়া সুখনিদ্রা লাভ করিতে সমর্থা হইব[২৭।৩০]?

হায়! কি নিমিত্ত আমি অশুভফলপ্রদ তপস্যারূপ প্রজ্জলিত হুতাশনে সেই উগ্র মহাবপু ভস্মীভূত করিলাম? কি নিমিত্ত আমি সেই সুবর্ণরূপ মহাশরীর পরিত্যাগ করিয়া লৌহরূপ অয়ঃসূচীত্ব গ্রহণ করিলাম[৩১]? অহো ভাগ্য! আমার কি দুর্ব্বুদ্ধি! আমার সেই দিক্‌-পরিব্যাপ্ত অঞ্জনশৈলসঙ্কাশ (অঞ্জনশৈল=কজ্জলেরপর্ব্বত) বিশাল মহাদেহ এখন কোথায় গেল? আমার সেই তাদৃশ মহাদেহই বা কোথায়? আর এই ডাঁশ পোকার পাদাগ্র অপেক্ষাও সূক্ষ্ম সূচীদেহই বা কোথায়[৩২]? ভ্রান্তির বশবর্ত্তিনী হইয়াই আমি এই সূচীত্ব লাভের নিমিত্ত তাদৃশ ভাস্বর মহাবপুরূপ কনকাঙ্গদকে মৃত্তিকা জ্ঞান করিয়া

পরিত্যাগ করিয়াছি[৩৩]! হায়! আমার সেই বিশাল দেহ এখন কোথায় রহিল? হে মদীয় বিন্ধ্যাচলগুহোপম মহোদর! কি নিমিত্ত তুমি করিবিঘাতী সিংহরূপে আবির্ভূত হইয়া অদ্য ত্বদীয় বিয়োগ-দুঃখরূপ হস্তীকে সংহার করিতেছ না[৩৪]? হে মদীয় নির্ভিন্নগিরি-শিখরোপম বিশাল ভুজদ্বয়! তোমরা কি কারণে আজ চন্দ্রসদৃশ নখরপংক্তির দ্বারা উদিত চন্দ্রকে দেবভোগ্য পুরোডাশ জ্ঞানে বাধা প্রদান করিতেছ না[৩৫] (বিদীর্ণ করিতেছ না?) হে বৈদূর্য্যপংক্তি-পরিশোভিতগিরীন্দ্রতটসদৃশসুন্দর বিশাল বক্ষঃ? কি নিমিত্ত তুমি যূক-রূপ সিংহাদিপরিবৃত রোমবন (যূক=মৎকুণ ছারপোকা বা উকুন। রোমবন=লোমসমূহ) ধারণ করিতেছ না[৩৬]? হে মদীয় কৃষ্ণপক্ষীয় রজনীর অন্ধকাররূপ ও শুষ্কেন্ধনপ্রোদ্দীপনকারী অনলসদৃশ নেত্রদ্বয়! তোমরাই বা কেন আজ দৃগ্‌জ্বালা (জ্বলিত দৃষ্টি) বিস্তার করিয়া চতুর্দ্দিক বিভূষিত করিতেছ না[৩৭]?

অহে স্কন্ধ! তুমিও কি এই হতভাগিনী কর্ত্তৃক মহীতলে পরিত্যক্ত হইয়া কালকর্ত্তৃক বিনিষ্পিষ্ট, শিলাতলে নিঘৃষ্ট ও বিনষ্ট হইয়াছ[৩৮]? অহে মদীয় মুখচন্দ্র! তুমিও কি মদীয় কু-তপস্যারূপ হুতাশনে দগ্ধ হইয়া কল্পান্তাগ্নিবিদগ্ধ শশাঙ্কবিম্বের ন্যায় মলিনতা প্রাপ্ত হইলে[৩৯]? অহে সুদীর্ঘ লম্বমান ভুজদ্বয়! তোমরা এখন কোথায় গেলে? হায়! আমি কি হতভাগিনী! আমি তাদৃশ বিশাল শরীর পরিত্যাগ করিয়া এখন কিনা মক্ষিকার খুরাগ্রসদৃশ সূক্ষ্ম সূচীদেহ গ্রহণ করিলাম! হায়! আমার সেই পূর্ব্বতন বিন্ধ্যপর্ব্বতের গভির গহ্বরের ন্যায় পায়ুগর্ত্তযুক্ত (পায়ুগর্ত্ত=মলদ্বার) ও স্থূলবৃক্ষমূলযুক্ত হ্রদের ন্যায় যোনিছিদ্রযুক্ত নিতম্বদেশ এখন কোথায় গেল? আমার সেই গগনস্পর্শী বিপুল দেহই বা কোথায়, আর এই তুচ্ছ সূচী দেহই বা কোথায়? রোদোরন্ধ্র (স্বর্গের ও মর্ত্তের মধ্য ভাগ) সদৃশ বদন কুহরই বা কোথায়, আর এই সূক্ষ্ম সূচীমুখই বা কোথায়? প্রভূত মাংসসম্ভার-বহুল ভোজনই বা কোথায়, আর এই সূক্ষ্মসূচীমুখ দ্বারা কণামাত্র রক্তভোজনই বা কোথায়? হায়! হায়! আমি কেবল আত্মক্ষয়ের নিমিত্তই তপস্যা করিয়াছিলাম এবং এইরূপ সূক্ষ্ম সূচীত্ব গ্রহণ করিয়াছিলাম[৪০।৪২]।

একসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিসপ্ততিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, মূঢ়মতি সূচী প্রাক্তন দেহের নিমিত্ত ঐরূপ ঐরূপ বিলাপ ও অনুতাপ করতঃ অবশেষে মৌনা হইয়া একাগ্র চিত্তে নিশ্চলভাবে চিন্তা করিতে লাগিল[১]। অনন্তর স্থির করিল যে, আমি পূর্ব্বতন দেহ লাভের নিমিত্ত অবিলম্বে পুনর্ব্বার তপস্যার্থ গমন করিব। সূচী ঐরূপ দৃঢ় নিশ্চয় করিয়া জনবিনাশবৃত্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক পুনর্ব্বার সেই হিমালয় শৃঙ্গে গমন করিল এবং তপস্যায় প্রবৃত্তা হইল[২]। সে প্রথমে আপনার মনঃকল্পিত সূচীত্ব অনুভব করিল, পরে প্রাণবায়ুময়ী জীবসূচীকে কল্পনার দ্বারা কল্পিত লৌহসূচীতে প্রবিষ্ট করিল। অর্থাৎ জীবসূচী ভাবান্বিত আপনাতে সেই লৌহসূচী ভাব সমারোপিত করিল। রাঘব! সেই প্রকারে সেই কর্কটী প্রাণবায়ুর সহিত অভিন্নশরীরা হইয়া ক্রিয়াশক্তি লাভ করতঃ হিমাচলশৃঙ্গে গমন করিয়াছিল।

* অভিপ্রায় এই যে, আত্মা নিষ্ক্রিয়, সে জন্য তাঁহার গমন অসম্ভব, সূচীও নিরিন্দ্রিয় সে জন্য তাহাতেও ক্রিয়া শক্তি নাই। সুতরাং সূচীর হিমালয় যাত্রা সর্ব্বথা অসম্ভব। তাই বশিষ্ঠ বলিলেন, লৌহসূচী ও জীবসূচী উভয় সূচীই কর্কটীর মানস ভ্রান্তি। এক্ষণে উক্ত ভ্রমময় সূচীদ্বয় অন্য বিভ্রম দ্বারা পরস্পর একীভাব ভাবনায় ভাবিত হইয়া যাওয়ায় প্রাণবায়ুরূপিণী জীবসূচীর ক্রিয়াশক্তি তাহাকে গতিশক্তি সম্পন্না করাইল। অর্থাৎ সে ভাবিল, আমি হিমালয়ে গেলাম। অথবা শরীরস্থ ক্রিয়াশক্তিমান্ প্রাণবায়ুই শরীরকে এখানে সেখানে লইয়া যায়, তাই আরোপ ক্রমে লোকে বলে, অমুক অমুক স্থানে গিয়াছে। বস্তুতঃ আত্মার গমনাগমন না থাকিলেও শরীরের গমনে তাঁহারও গমন লোক ব্যবহারে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এ বিষয়ের ক্রম বা প্রণালী এই যে, কর্কটী, আমি সূচী হইয়া কষ্ট পাইতেছি এইরূপ মনে করিয়াছিল। তাই এক্ষণে সে কল্পনার দ্বারা জীবসূচী, লৌহসূচী, প্রাণবায়ু ও মন, এ সকল প্রভেদ বর্জ্জিত হইয়া, মনের দ্বারা সুতরাং প্রাণবায়ুযুক্ত জীব শরীর দ্বারা, হিমালয় গামী হইলাম, এইরূপ ভাবনায় ভাবিত হইতে লাগিল। প্রাণবায়ু ও মন জীবশরীরের পরিচালক। বশিষ্ঠদেব এই কথা অগ্রে যাইয়া স্পষ্ট করিয়া বলিবেন। অগ্রে যাইয়া আরও বলিয়াছেন যে, সূচী এক গৃধ্রশরীরে প্রবেশ করিয়া হিমাচলে গিয়াছিল।

অনন্তর সেই ইন্দ্রনীলশিলাভা, দৃঢ়ব্রতপরায়ণা সূচী হিমগিরিশৃঙ্গে গমন করতঃ মরুভূমিতে অকস্মাৎ সঞ্জাত তৃণাঙ্কুরের ন্যায় তত্রস্থ সর্ব্বভূতবিবর্জ্জিত, দাবানল দগ্ধ, আতপতাপরূক্ষ, পাংশুবিধূসর, নিস্তৃণ বিপুল স্থলভাগে গিয়া আবির্ভূতা হইল৩।৬। সেই সূক্ষ্মা একপদী সূচীর সম্বিদই (জ্ঞানই) কল্পনার দ্বারা পদদ্বয়ে বিভক্তা কৃত হইল, অনন্তর সে সেই কল্পিত ভাগদ্বয়ের অগ্রার্দ্ধভাগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপরার্দ্ধ ভাগ দ্বারা ভূতল আশ্রয় করতঃ একপদী হইয়া তপস্যায় প্রবৃত্তা হইল৭। * সূচী আপনার সুসূক্ষ্ম পাদাগ্রভাগ বসুধারেণুতে বিদ্ধ করতঃ পার্শ্ব, পশ্চাৎ, ও সম্মুখ না দেখিয়া ঊর্দ্ধমুখে ও এক দৃষ্টিতে অবস্থিতি করিতে লাগিল৮। †

সে তখন কৃষ্ণবর্ণ বদন দ্বারা পবন গ্রাসের নিমিত্তই যেন ঊর্দ্ধমুখী হইয়াছিল এবং ধূলিকণা ও উপলখণ্ডাদি সমাকীর্ণ সঙ্কট স্থানে যেন তাহার সেই একমাত্র পদ যত্ন সহকারে সুস্থির রাখিয়াছিল৯। যেমন জলৌকাগণ ক্ষুধার্ত্ত হইয়া দূরস্থিত আহার দর্শনের নিমিত্ত মুখোত্তোলন করতঃ দেহের নিম্নভাগদ্বারা তৃণপর্ণাদির অগ্রভাগে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান থাকে, সেইরূপ, সূচীও বায়ু ভক্ষণের নিমিত্ত ঊর্দ্ধমুখে ও একপদে সুস্থির ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া তপস্যা করিতে লাগিল১০। তাহার মুখরন্ধ্রবিনির্গত সূচীর ন্যায় আকার সম্পন্ন ভাস্করদীধিতি তাহার সখীত্ব গ্রহণ করতঃ তাহার পশ্চাদ্ভাগ রক্ষা করিতে লাগিল১১। ‡ অহো! নীচ ব্যক্তি সজ্জনকল্প হইলে, তাহার প্রতিও মহতের স্নেহ ভাব জন্মে। অধিক কি বলিব, সূচীর ছায়াও সেই অরণ্যমধ্যে

* ভাবার্থ এই যে, মনুষ্যতপস্বীরাই একপায়ে দাঁড়াইয়া কঠোর তপস্যা করে; পরন্তু সূচী মনুষ্যের ন্যায় দ্বিপদ নহে। তবে কি প্রকারে সে এক পায়ে দাঁড়াইবে? তাই বশিষ্ঠদেব বলিলেন; সূচী আপন সম্বিদের (কল্পনার) দ্বারা আপনাকে দ্বিপদ ভাবনায় ভাবিত করিয়াছিল, অথবা আপনার অগ্রভাগের লেশমাত্র ভূমিস্পৃষ্ঠ করিয়া খাড়া হইয়াছিল, এবং তাহারই রূপক বা উৎপ্রেক্ষা এক পদে তপস্যা।

† ভাবার্থ এই যে, সূচী বিষয় দৃষ্টি ত্যাগ করিয়া সমাধিস্থা হইল।

‡ ইহাতে এইরূপ বলা হইল যে, সূচীর সূক্ষ্মছিদ্র প্রদেশে যে সূর্য্যরশ্মি প্রতিফলিত হইতেছিল, সেই প্রতিফলনকে বলা হইল, ঠিক্ যেন আর একটী সূচী এবং সে সূচী যেন এ সূচীর সখী। সর্ব্বদা সঙ্গে থাকায় সখী।

তাহার সখী ও দ্বিতীয়া তাপসী হইয়াছিল। সূচিরূপিণী মলিনা ছায়া স্বীয় সখীর পশ্চাদ্ভাগে অবস্থান করতঃ তাহার পৃষ্ঠ রক্ষা করিতে লাগিল[১২।১৩]। অনন্তর সূচীরন্ধ্র নির্গতা সূর্য্যদীধিতিরূপা সূচী সখী ছায়াসূচীতে নিপতিত হইয়া তাহার চক্ষুঃস্বরূপ হইল এবং সেই ছায়াও দীধিতিসখীকে ধারণ করতঃ তাহার মূল স্বরূপ হইল। এইরূপে তাহারা পরস্পর পরস্পরের সাহায্য দ্বারা স্ব স্ব বল সংরক্ষণ ও দৃঢ় করিতে লাগিল। রাঘব! সূচীর এতাদৃশ তপস্যার প্রভাবে সম্মুখস্থ দ্রুমলতাদিরাও সদ্বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ছিল। সেই সমস্ত লতাদ্রুমাদি স্বস্বকুসুমসুবাসিত অনিলদ্বারা মহাতপস্বিনী সূচীর বায়ুভোজন কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিল[১৪।১৬]। অপিচ, তপোবিষয়ে তাহার উৎসাহ বর্দ্ধন করিবার নিমিত্ত স্বস্বপ্রসূত সুগন্ধি কুসুমনিকর ও পুষ্প-রজোরাজি দেবতাদিগকে ও অন্য কাহাকে প্রদান না করিয়া সমস্তই তাহাকে সমর্পণ করিতে লাগিল[১৭]। সূচীর তপোবিঘ্ন সাধনের নিমিত্ত বাসব কর্ত্তৃক যে সকল আমিষাদি ও অপবিত্র রজোরাজি বায়ুর দ্বারা প্রেরিত হইয়া তাহার ছিদ্ররূপ বদনকুহরে প্রবিষ্ট হইত, তপঃপরায়ণা সূচী অপবিত্র জ্ঞান করিয়া তাহা ভক্ষণ করিত না। কারণ, অন্তরে সারভাগ সমুদিত হইলে অত্যন্ত লঘুচেতারাও স্বীয় কর্ত্তব্য কার্য্য রক্ষা করিতে তৎপর হয়[১৮।১৯]। সেই রাক্ষসী সেই সমস্ত অপবিত্র রজোরাজি ভক্ষণ করিল না দেখিয়া মহেন্দ্রপ্রেরিত পবন, লোকে সুমেরু উন্মূলিত দেখিলে যদ্রূপ বিস্মিত হয়, তদপেক্ষা অধিক বিস্মিত হইলেন[২০]। তপস্যায় লীনচেতসী তপস্বিনী সূচী পঙ্কে আপাদ মস্তক নিমগ্না, মহা অশনির দ্বারা প্রপীড়িতা, প্রচণ্ডানিল দ্বারা বিকম্পিতা, বনবহ্নির দ্বারা দগ্ধা, অশনিপতন দ্বারা বিশীর্ণা, তড়িৎ ও ভূকম্পাদির দ্বারা বিভ্রামিতা, জলদপটল দ্বারা উদ্বেজিতা ও ভীষণ মেঘগর্জ্জন দ্বারা বিক্ষোভিতা হইলেও সহস্রবর্ষ পর্য্যন্ত মূর্চ্ছাসুপ্ত জনগণের ন্যায় নিস্পন্দ থাকিল, পাদাগ্রভাগও বিচলিত করিল নাই[২১।২৩]।

ঐরূপে সেই স্পন্দরহিত সূচিকা তপস্বিনীর সেই স্থানে ক্রমে বহুকাল গত হইল। বহুকাল তপস্যার পর তাহার হৃদয়ে জ্ঞানালোক সমুদিত হইল। তখন সেই কর্কটী পরাবরদর্শিনী ও নির্ম্মলা হইল। (পরাবরদর্শিনী=সগুণ-নির্গুণ-ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারবতী। নির্ম্মলা=অজ্ঞান

মালিন্য বর্জ্জিতা।) সেই দুর্ব্বুদ্ধি কর্কটী এখন তপস্যার দ্বারা বিদিত-বেদ্যা হইয়া স্বীয় দুঃখদ সূচীদেহকে অধুনা সুখপ্রদ বলিয়াই বিবেচনা করিল[২২।২৩]।

সূচী এক্ষণে উক্তপ্রকারে উর্দ্ধমুখে সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত ভুবনসন্তাপ-কারিণী দারুণ তপস্যা করিতে লাগিল। তাহার সেই ভীষণ তপস্যারূপ অগ্নিতে সেই মহাগিরি ও জগৎ প্রজ্বলিত প্রায় হইয়া উঠিল[২৭]। এই অবস্থায় বাসব দেবর্ষি নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবর্ষে! কোন্ ব্যক্তির উগ্রতর তপস্যায় এই জগৎ সূর্য্যবৎ জ্বলিত হইতেছে[২৮।২৯]?

নারদ বলিলেন, হে মহাবিজ্ঞানসম্পন্ন বাসব! ইহা সূচীর তপস্যার প্রভাব। সূচী সপ্তসহস্রবর্ষব্যাপিনী সুদীর্ঘ তপস্যায় প্রবৃত্তা হইয়াছে। তাহার সেই ক্ষয়মায়াসদৃশী (ক্ষয়মায়া=জগৎসংহারিণী রুদ্রশক্তি) ভয়ংকরী তপস্যার দ্বারাই এই জগৎ প্রজ্বলিত, নাগনিচয় নিশ্বসিত, নগগণ বিচলিত, বৈমানিক সমূহ অধঃপতিত, জলধি ও জলধর শুষ্কপ্রায় হইয়াছে এবং দিক্‌সকল দিক্‌প্রকাশক সূর্য্যের সহিত মলিনীকৃত হইয়াছে[৩০।৩১]।

দ্বিসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে অনঘ! দেবরাজ ইন্দ্র নারদ সকাশে সূচীর সেই ভয়াবহ তপোবৃত্তান্ত শ্রবণ করতঃ তাহার ভোগ প্রকারাদি (উদ্দেশ্য বিবরণ) শ্রবণ করিবার নিমিত্ত সাতিশয় কুতূকাক্রান্ত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন—দেবর্ষে! জড়বুদ্ধি কর্কটীর ন্যায় তুচ্ছবিষয়ভোগচপলা আর নাই। যাহাই হউক, কর্কটী তপস্যার দ্বারা সূচীত্ব উপার্জ্জন করিয়া কি কি প্রকার ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়াছিল তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন[১।২]।

নারদ বলিলেন, সুররাজ! কর্কটী তপস্যার দ্বারা অদৃশ্যস্বভাব পিশাচীর ন্যায় অলক্ষ্যস্বভাব সূক্ষ্ম জীবসূচীত্ব উপার্জ্জন করিলে, কৃষ্ণবর্ণা আয়সী সূচী (আয়সী=লোহময়ী) তাহার সমবল ও আশ্রয় হইয়াছিল। পরে সে সেই আশ্রয়স্বরূপা আয়সী সূচীকে পরিত্যাগ করতঃ পক্ষিণীর ন্যায় নভোমার্গে সমুড্ডীন হইত ও আকাশীয়বায়ুরূপ রথে আরোহণ করতঃ জীবগণের প্রাণবায়ুর (নিশ্বাস প্রশ্বাসের) দ্বারা তাহাদের শরীরমধ্যে প্রবেশ করিত[৩।৪]। জীবসূচী সেই প্রকারে পাপাত্মগণের দেহে প্রবিষ্ট হইয়া তত্রস্থ আন্ত্রতন্ত্রীসমূহের রন্ধ্রভাগ দ্বারা (নাড়ীছিদ্র দিয়া) গমন করতঃ দেহান্তর্নিলীন স্নায়ু, মেদ, বসা ও শোণিতাদিতে ও যাহাতে রোগের আশ্রয়স্বরূপ দুষ্টবায়ু প্রবাহিত হয়, সেই সমস্ত নাড়ীতে অবস্থান পূর্ব্বক অত্যুগ্র অগ্নিপিণ্ড বিদাহের ন্যায় দাহ ও শূল (বেদনা) উৎপাদন করিত এবং তথায় অবস্থান করিয়া সেই সমস্ত প্রাণিগণের ভোজনোচিত পদার্থসমুদয় ও প্রভূত নরমাংসাদি ভোজন করিত[৫।৭]।

হে শক্র! এই জীবসূচী কান্ত-বক্ষ-ন্যস্ত-কপোলা, মুগ্ধা ও কান্তাশ্লেষামোদিতা, স্রগ্‌দামবিভূষিতা কামিনীগণের শরীরে তাহাদের অজ্ঞাতসারে প্রবেশ করতঃ তাহাদিগের ভোগ্যজাত ভোগ করিত[৮]। বিহঙ্গমগণের দেহে প্রবিষ্ট হইয়া কল্পদ্রুমরাজির সুগন্ধ মকরন্দ হইতেও দ্বিগুণতর সুরভিসম্পন্ন শোকাপনোদনকারী কমলবন-বীথিতে বিহার করিত[৯]।

ভ্রমরী শরীরে অবস্থান করতঃ মন্দারবনে সুগন্ধ মকরন্দকণাসব পান ও ভ্রমরগণের সহিত এলাবনে ক্রীড়া করিত[১০]। বৃদ্ধা গৃধ্রীগণের দেহে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগের সহিত রন্ধ্রীকৃত শবদেহ চর্ব্বণ করিত এবং খড়্গাধারে অবস্থান করতঃ সংগ্রামে বীরদেহ সকল ছিন্নভিন্ন করিত[১১]। শক্র! বায়ুলেখা যেমন অবাধে দিক্‌বিদিক্ পরিভ্রমণ করে, সূচী তাহার ন্যায় দেহীর দেহান্তরাকাশে, নাড়ীতে ও নীলবর্ণ ব্যোম-বীথিতে পরিভ্রমণ করিত[১২]। যেমন বিরাটাত্মা পিতামহের (ব্রহ্মার) হৃদয়ে সমষ্টি প্রাণবায়ুস্পন্দ সচ্ছন্দে প্রস্ফুরিত হয়, তেমনি, এই জীবসূচী প্রতিদেহেই প্রস্ফুরিত হইত। যেমন সমুদায় প্রাণিদেহে চিৎশক্তি প্রতিভাত হয়, তাহার ন্যায় এই সূচীও প্রতিদেহে প্রতিভাত হইত[১৩।১৪]। সূচী বারিতে দ্রবশক্তির ন্যায় জীবরুধিরে লীন ও অব্ধিতে আবর্ত্তের ন্যায় জঠরমধ্যে বল্‌গিত হইত, এবং ও অনন্তাঙ্গে (অনন্ত=শেষনাগ) বিষ্ণুর ন্যায় মেদোমধ্যে অবস্থিতি করিত[১৫।১৬]। অপিচ, এই রোগাত্মিকা সূচী বায়ুরূপিণী হইয়া দেহিগণের অন্তরে প্রবেশ করতঃ তাহাদিগের শরীরস্থ অশুক্র রস (রক্ত) ভক্ষণ করিত[১৭]। ইতঃপূর্ব্বে সে ঐ সব করিত কিন্তু এখন সে তপস্যায় স্থাণুবৎ নিশ্চলভাবে অবস্থান করতঃ পবিত্রা সর্ব্বপাপরহিতা পরমতাপসী হইয়াছে[১৮]।

হে মহেন্দ্র! এই জীবসূচীই পূর্ব্বে অদৃশ্যভাবে মারুতরূপ তুরঙ্গে আরোহণ করিয়া অয়ঃসূচীর দ্বারা চতুর্দ্দিকে প্রধাবিতা হইত। এই জীবসূচীই ইতিপূর্ব্বে অসংখ্য প্রাণিদেহে অবস্থান করিয়া সেই সমস্ত প্রাণিগণের সহিত অদৃশ্যভাবে পান, ভোজন, বিলাস, দান, ক্রীড়া, আহরণ, নর্ত্তন, গান, শায়ন ও হিংসা প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই করিয়াছে[১৯।২০]। এই আকাশরূপিণী অদৃশ্যশরীরা সূচী স্বীয় মন ও পবনদেহ দ্বারা যাহা না করিয়াছে, তাহা কাহারও দ্বারা কৃত হয় নাই। এই জীবময়ী সূচী সর্ব্বপ্রাণিবিনাশে সমর্থা হইলেও আলাননিবদ্ধ করিণীর অল্পস্থান পরিভ্রমণের ন্যায় মাংস রক্তাদি অন্বেষণার্থ কতিপয় প্রাণিদেহেই বিচরণ করিয়াছিল[২১।২২]। এই ভোগপ্রমত্তা সূচী প্রাণিগণের দেহরূপ প্রত্যক্ষ নদীতে বেগদ্বারা বৈকল্য উৎপাদন করতঃ বহুল কল্লোল সমুৎপন্ন করিয়াছিল[২৩]। এই সূচী প্রভূত মেদোমাংসাদি নিগীরণ (উদরে অর্পণ) করিতে অসমর্থ হইয়া, বহুল

অনেক ভোজনে অসমর্থ, বহুল ধনসম্পন্ন, ভোজনলোলুপ বৃদ্ধ ও আতুর গণের ন্যায় ক্রন্দন করিয়াছিল[২৩]। যেমন অঙ্গন্যস্ত বলয় ও অঙ্গদ প্রভৃতি অলঙ্কার রঙ্গভূমিস্থিতা নর্ত্তনশীলা নর্ত্তকীগণের অঙ্গে নৃত্য করে, তাহার ন্যায় এই রোগাত্মিকাসূচী অজ, উষ্ট্র, মৃগ, হস্তী, অশ্ব, সিংহ, ভল্লুক ও ব্যাঘ্র প্রভৃতি জন্তুগণের দেহে অবস্থান করতঃ নৃত্য করিয়াছিল[২৫]। এই রোগশক্তিরূপা সূচী, গন্ধলেখার ন্যায় (লেখা=লেশ) বাহ্য ও আন্তর বায়ুর সহিত মিশ্রিতা ও বায়ুগতির বশীভূতা হইয়া প্রাণিগণের অন্তরে প্রবেশ ও অবস্থান করিত[২৬]। সূচী এবম্বিধা রোগরূপিণী হইয়া প্রাণিদেহে অবস্থান করিতে আরম্ভ করিলে, রোগাক্রান্ত কোন কোন ব্যক্তি মন্ত্র, ঔষধ, তপস্যা, দান ও দেবপূজাদির দ্বারা তাহাকে বিতাড়িত করিত[২৭]। তাহাতে সে তথা হইতে তাড়িতা হইয়া গিরিনদীর উত্তুঙ্গ তরঙ্গ যেমন স্বীয় আশ্রয়ে (নদীবক্ষে) লীন হয়, তাহার ন্যায় সে তাহাদের দেহ হইতে বহির্ভাগে পলায়ন করিয়া স্বায়অন্তর্দ্ধান শক্তির দ্বারা অদৃশ্যভাবে স্বীয় আশ্রয় অয়ঃসূচীতে গিয়া প্রবিষ্ট হইত এবং তথায় লীনভাবে অবস্থান করতঃ আতুরীর ন্যায় বিশ্রাম-সুখ অনুভব করিত। হে দেবেন্দ্র! * সকল ব্যক্তিই স্বীয় বাসনানুরূপ আস্পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সুতরাং রাক্ষসীও আপন বাসনানুসারে তাহার সেই সূচীভাবের আস্পদ বা আশ্রয় সূচীত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। যেমন দুর্ব্বুদ্ধি লোক দিক্ সকল পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে আপদে আপন আস্পদ (বাসস্থান) গ্রহণ করে, তাহার ন্যায়, এই জীবসূচীও সকল স্থলে পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে লৌহসূচীতে আস্পদ (স্থান) গ্রহণ করিয়াছিল[২৮।৩০]।

হে শক্র! ভোগচেষ্টাপরায়ণা জীবসূচী অভিহিত প্রকারে দশ দিকে পরিভ্রমণ করিয়া ভোগবিষয়ে কথঞ্চিৎ মানসিকী তৃপ্তি লাভ করিলেও কিছুমাত্র শারীরিকী তৃপ্তি লাভ করিতে পারে নাই[৩১]। কেননা, দেহধারী জীবেরাই দৈহিকী তৃপ্তিলাভে সমর্থ হইয়া থাকে। অসতী নারীরা কি কখন সতী রমণীর ধর্ম্ম ও সুখ অনুভব করিতে সমর্থা হয়[৩২]

* যেখানে যেখানে ইন্দ্রের সম্বোধন দেখিবে, সেই সেই স্থানে বুঝিতে হইবে, নারদ ইন্দ্রকে বলিতেছেন।

অনন্তর, একদা সেই দৈহিকসুখভোগবিহীনা সূচীর প্রাক্তন বৃহৎ দেহের কথা স্মরণ হইল। তখন সে পূর্ব্বের ভোজনপরিতৃপ্ত রাক্ষস-দেহের নিমিত্ত অতীব দুঃখিতা হইল। মনে মনে অবধারণ করিল, আমি সেই পূর্ব্বের বিশাল দেহের নিমিত্ত পুনর্ব্বার উগ্রতম তপস্যা করিব। অনন্তর সে তপস্যার নিমিত্ত স্থান নির্ণয় করিল এবং অনতিবিলম্বে প্রাণমারুত-মার্গ অবলম্বন (নিশ্বাস বায়ু অবলম্বন) করিয়া পক্ষিণীর নীড় প্রবেশের ন্যায় এক আকাশবিহারী তরুণ গৃধ্রের হৃদয়ে প্রবেশ করতঃ রোগসূচী হইয়া তাহার অন্তরে অবস্থান করিতে লাগিল। গৃধ্র তখন বাধ্য হইয়া স্বশরীরপ্রবিষ্টা রোগরূপিণী সূচীর অভিলাষানুরূপ কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং অবিলম্বে একটি লৌহসূচী গ্রহণ করিয়া অন্তরস্থা রোগসূচীর অভিলষিত পর্ব্বতাভিমুখে গমন করিল[৩৬।৩৭]। পরে সেই রোগরূপা পিশাচীর প্রেরণীয় সেই তরুণ গৃধ্র তাহাকে (গৃহীত লৌহসূচীকে) তৎপর্ব্বতস্থ নির্জ্জন মহারণ্যে নিক্ষেপ করিল[৩৮]। যেমন যোগিগণ পরম পদে চেতনা সমর্পণ করেন, তেমনি, সূচীও সেই অদ্রিশিখরস্থ নির্জ্জন মহারণ্যে লৌহসূচীকে সমর্পণ করিল ও অবিলম্বে তাহাকে তথায় প্রতিমার ন্যায় স্থাপন করিল[৩৯]। তখন সেই লৌহসূচী অন্তঃসূচীরূপ পিশাচীর বশীভূতা ও গৃধ্রকর্ত্তৃক হিমাচলশিখরে প্রতিষ্ঠিতা হইয়া স্বীয় সূক্ষ্মতম পদৈকপ্রান্তভাগ দ্বারা রজঃকণার উপরি ভাগে শিখীর ন্যায় (শিখী = ময়ুর) ঊর্দ্ধগ্রীব হইয়া নিস্পন্দভাবে অবস্থান করিতে লাগিল। ইত্যবসরে সেই খগহৃদয়প্রবিষ্টা রোগরূপা জীবসূচী লৌহসূচীকে অভিলষিত অদ্রিশিখরে গৃধ্রকর্ত্তৃক তদ্রূপে প্রতিষ্ঠিত অবলোকন করতঃ খগদেহ হইতে বহির্গমনোন্মুখী হইল[৪০।৪১]। অনন্তর অনিল হইতে গন্ধলেখার ন্যায় খগদেহ হইতে বহির্গমন পূর্ব্বক লৌহসূচীকে আশ্রয় করিল। জীবসূচীর অনুপ্রবেশে লৌহসূচী তখন চেতনোন্মুখী হইল, এবং গৃধ্রও নির্ব্যাধি জনের ন্যায় স্বস্থ হইয়া ভার পরিত্যক্ত ভারিকের ন্যায় সূচীভার পরিত্যাগ করতঃ স্বস্থানে প্রতিগমন করিল[৪২।৪৩]।

হে মহেন্দ্র! সদৃশ ব্যক্তির সহিত সদৃশ ব্যক্তির সংমিলন শোভনতা প্রাপ্ত হয়। জীবসূচী আজ সেই কারণে লৌহসূচীকে আধার স্বরূপে কল্পনা করিয়াছিল। ঈশ্বরও আধার ব্যতিরেকে কার্য্য সাধন করিতে

সমর্থ হন না; তাই জীবসূচী আজ লৌহসূচীকে আধার স্বরূপে গ্রহণ করতঃ একনিষ্ঠ হইয়া তপশ্চরণে প্রবৃত্তা হইয়াছিল[৪৪।৪৫]।

অনন্তর সে শিংশপাবৃক্ষে পিশাচীর ন্যায় এবং বায়ুতে গন্ধলেখার ন্যায় লৌহসূচীতে পরিলীন হইয়া সুদীর্ঘ তপশ্চর্য্যায় প্রবৃত্তা হইল[৪৬]। সেই অবধি অদ্য যাবৎ সে তপস্যায় বহু বর্ষ অতিক্রান্ত করিয়াছে এবং সে এখনও সেই নির্জ্জন মহারণ্যে উক্তপ্রকারে অবস্থান করতঃ তপস্যা করিতেছে। হে কর্ত্তব্য-কোবিদ বাসব! এখন আপনি তাহাকে বরদানার্থ যত্নবান্ হউন্। (অর্থাৎ তাহাকে কোন এক তুচ্ছ বর দিয়া নিবৃত্তা করিবার চেষ্টা করুন) নচেৎ তাহার তপস্যা পরিবর্দ্ধিত হইয়া সকল লোক গ্রাস করিবে[৪৭।৪৮]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, বাসব নারদের এবম্বিধ বচনপরম্পরা শ্রবণ করতঃ সূচীর অন্বেষণার্থ মারুতকে দশ দিকে গমন করিতে আদেশ করিলেন[৪৯]। দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন মারুত (বায়ু) দেবরাজ কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া সূচীদর্শনের নিমিত্ত দশ দিকে গমন করিল। মারুত নভোমণ্ডল হইতে ভূতলে অবরোহণ পূর্ব্বক দিক্ বিদিক্ পরিভ্রমণ করতঃ সূচীর অন্বেষণ করিতে লাগিল। ভ্রমণপরায়ণা সর্ব্বত্রগামিনী ত্বরাবতী মারুতসম্বিদ্ (বায়ুদেবতা) প্রথমতঃ দেখিতে পাইল, সপ্তসমুদ্রান্তে লোকালোকপর্ব্বতযুক্ত বিপুল কাঞ্চনী ভূমি রহিয়াছে[৫০।৫১]। ঐ ভূমি মণিময় বলয়ের আকার সম্পন্ন স্বাদূদক সমুদ্রের দ্বারা পরিবেষ্টিত। তৎপরে বলয়াকার পুষ্করদ্বীপ দেখিল। এই দ্বীপ সুরাসমুদ্রে পরিবেষ্টিত। তৎপরে দেখিল, ইক্ষুরসসমুদ্রে পরিবেষ্টিত বলয়াকার গোমেদক দ্বীপ। তদনন্তর দেখিল, বলয়াকার ক্ষীরসমুদ্রে পরিবেষ্টিত উপদ্রবশূন্য ক্রৌঞ্চ দ্বীপ। তৎপরে দেখিল, ঘৃতোদক সমুদ্রে পরিবেষ্টিত শ্বেতদ্বীপ। তৎপরে দেখিল, বলয়াকার কুশদ্বীপ। তদনন্তর দেখিল, দধি সমুদ্রে পরিবেষ্টিত বলয়াকার শাক দ্বীপ অবস্থিত রহিয়াছে। তৎপরে জম্বুদ্বীপ প্রাপ্ত হইল। এই দ্বীপের চতুর্দ্দিকে লবণসমুদ্র বলয়াকারে পরিবেষ্টিত রহিয়াছে[৫২।৫৫]।

সেই বায়ুসম্বিদ্ এই কুলপর্ব্বতসঙ্কুল মহামেরুবিশিষ্ট জম্বুদ্বীপ দর্শন করতঃ বাতমণ্ডল হইতে তথায় বায়ুরূপে অবতীর্ণ হইল। বেগে গমন পূর্ব্বক যে স্থানে সেই তপস্বিনী সূচী তপস্যা করিতেছিল, সেই

হিমাচলশিখর-স্থিত মহারণ্য প্রাপ্ত হইল[৬।৬০]। এই গিরিস্থল দ্বিতীয় আকাশের ন্যায় বিস্তৃত ও সূর্য্যসন্নিহিত প্রযুক্ত প্রাণিসঞ্চার বর্জ্জিত, অসঞ্জাততৃণ ও রজোময়। রজোগুণবিকারীভূত এই গিরিস্থল, সংসার রচনার ন্যায় বিস্তৃত ও রজঃপরিপূর্ণ। শত শত অর্থাৎ অসংখ্য ইন্দ্রধনুশঙ্কাশ মৃগতৃষ্ণিকা নদী প্রবাহিত হওয়াতে এইস্থল যেন মৃগ-তৃষ্ণিকানদী সমূহের স্বার্থপরিপূরক সমুদ্র হইয়া রহিয়াছে। এই গিরি-শৃঙ্গস্থ মহাভূমি, পবনকর্ত্তৃক কুণ্ডলাকারে প্রবাহিত, ধূলিপটলরূপ কুণ্ডলে বিভূষিত, সূর্য্যকিরণরূপ কুঙ্কুমে পরিলিপ্ত, চন্দ্রাংশুরূপ চন্দনে চর্চ্চিত ও বায়ুরূপ কান্তের মুখ চুম্বনে শব্দায়মান হওয়ায় ব্যোমবিলা-সিনী রমণীর অনুকরণ করিতেছে[৬১।৬৬]।

দিগ্‌দিগন্ত ভ্রমণকারী পবন ক্লান্ত হইয়া সপ্তদ্বীপ ও সপ্তসমুদ্র পরি-লাঞ্ছিত সমস্ত ভূমণ্ডল পরিভ্রমণ করতঃ অবশেষে এই গগনস্পর্শী অত্যুচ্চ গিরিস্থল প্রাপ্ত হইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল[৬৭]।

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

চতুঃসপ্ততিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, বায়ু সেই অদ্রিশৃঙ্গস্থিত মহারণ্যে সূচীকে মধ্যমা অগ্নিশিখার ন্যায় প্রোথিত দেখিলেন। তিনি দেখিলেন, সূচী এক-পদে দণ্ডায়মানা হইয়া তপস্যা করিতেছেন[১]। উষ্ণকিরণে তাঁহার শিরোদেশ শুষ্ক হইয়াছে, ও উদরত্বক্ পিণ্ডীভূত হইয়াছে। যেন তিনি একবার একবার মাত্র আস্য বিস্তার করিয়া আতপানিল গ্রহণ ও পরিত্যাগ করিতেছেন। প্রচণ্ডসূর্য্যকিরণযুক্ত বনবায়ুদ্বারা তাঁহার দেহ জর্জ্জরী ভূত হইয়াছে। তিনি স্বস্থান হইতে অবিচলিত ও চন্দ্রকিরণে স্নাপিত (ধৌত) হইতেছেন[২।৪]। তাঁহার মস্তক রজোরাশির (ধূলিরাশির) দ্বারা সমাচ্ছন্ন। যেন তিনি রজোগুণকে আশ্রয় প্রদান না করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিয়াছেন[৫]।

অনন্তর পবন সেই সূচীকে তাদৃশী ও তদ্ভাবাপন্না দেখিয়া বিস্ময়াকুললোচনে ও ভীতচিত্তে সমাগত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করি-লেন। কিন্তু সূচীর তেজঃপ্রভাবে সঙ্কুচিত হইয়া কি নিমিত্ত তিনি কঠোর তপোনুষ্ঠান করিতেছেন তাহা জিজ্ঞাসা করিতে সমর্থ হইলেন না[৬।৮]। পবন "অহো! ভগবতী সূচী কি মহা তপস্যা করিতে-ছেন" মনে মনে কেবল এই মাত্র চিন্তা করিয়াই আকাশে গমন করিলেন. এবং সত্বর অভ্রমার্গ উল্লঙ্ঘন, সিদ্ধলোকে উত্তরণ ও বায়ুমণ্ডল অতিক্রমণ করতঃ সূর্য্যমণ্ডলে গমন করিলেন।। অনন্তর নক্ষত্র-মণ্ডল অতিক্রমণ করতঃ শক্রপুরে উপনীত হইলেন। অনন্তর সেই সূচীদর্শনপবিত্রাত্মা বায়ু পুরন্দর কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত ও জিজ্ঞাসিত হই-লেন। বায়ু তখন যথাদৃষ্ট সমস্ত বিষয় নিবেদন করিতে লাগিলেন, এবং দেবগণ সহ দেবরাজ তাহা শুনিতে লাগিলেন[৯।১২]।

মহাত্মা বায়ু বলিতেছেন, দেবরাজ! জম্বুদ্বীপে হিমবান্ নামে এক অত্যুন্নত শৈলেন্দ্র আছে। তাহার হিমালয় নাম।, সর্ব্ববিদিত ভগবান্ শশিশেখর মহেশ্বর তাঁহার যামাতা[১৩]। এই হিমাচলের উত্তর মহাশৃঙ্গের

পৃষ্ঠভাগে মহাতেজস্বিনী তপস্বিনী সূচী অবস্থিতি করতঃ অতি কঠোর তপস্যা করিতেছেন[১৪]। অধিক আর কি বলিব, বায়ু ভক্ষণও না করিতে হয়, এই অভিপ্রায়ে সূচী স্বীয় উদরকোটর পিণ্ডাকার করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন[১৫]। তাঁহার আস্যদেশ স্বভাবতঃ বিকসিত হইলেও শীতবাতাশন নিবৃত্তির নিমিত্ত তিনি রজোরাশির দ্বারা তাহা সঙ্কুচিত করিয়াছেন[১৬]। হে দেব! তুহিনাকর মহাশৈল হিমবান্ তাহার তীব্রতপঃপ্রভাবে তুহিনাকরত্ব পরিহার পূর্ব্বক অনলসদৃশ বা তপ্তায়ঃপিণ্ডের ন্যায় আকার ধারণ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি নিতান্ত অপরিসেব্য হইয়াছেন[১৭]। অতএব, এখন যদি কোন উপায় না করা হয়, তাহা হইলে তাঁহার সেই সুমহত্তপস্যা অনর্থসংঘটনের হেতু হইবে। সেই জন্য বলিতেছি, আসুন, আমরা তাঁহাকে বর প্রদানার্থ পিতামহের নিকট গিয়া অনুরোধ করি[১৮]। অনন্তর দেবরাজ বায়ুকর্ত্তৃক ঐরূপ অভিহিত হইয়া দেবগণ সমভিব্যাহারে ব্রহ্মলোকে গমন করতঃ বিভু পিতামহের নিকট "সূচীকে বর প্রদান করুন" এইরূপ প্রার্থনা করিলেন। পিতামহ ব্রহ্মা "অদ্যই আমি সূচীকে বর দিতে হিমালয়শৃঙ্গে গমন করিব" এই বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলে, দেবরাজ উদ্বেগ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিলেন[১৯।২০]।

এ দিকে সূচী তপোরূপ তাপ দ্বারা অমরমন্দির সন্তাপিত করতঃ সপ্তসহস্র বর্ষ তপস্যা করিয়া পরম পবিত্রা হইল[২১]। বিজৃম্ভিতবদনা সূচীর মুখরন্ধ্রে রবিকিরণ প্রবিষ্ট হওয়ায়, সে দৃশ্য তখন এইরূপে উপমিত হইতে লাগিল যে, যেন সেই সূচী নয়নশালিনী হইয়া স্বীয় তপস্যার সঙ্কল্পিত বস্তু অবলোকন করিতেছেন[২২]। অপিচ, সেরু ভূধর তাঁহার স্থৈর্য্যগুণে নির্জ্জিত ও লজ্জিত হইয়া অম্বুনিধিতে নিমগ্ন হইতেছে কি না, তাহা দেখিবার নিমিত্তই যেন সেই সূচীর ছায়া প্রাতে ও সায়াহ্নে দীর্ঘাকার হইত এবং অন্যান্য সময়ে যেন তাঁহার গৌরববর্দ্ধনের নিমিত্তই সেই ছায়া সূচী তাঁহাকে দূর হইতে অবলোকন করিত। সঙ্কটে নিপতিত হইলে জনগণের গৌরবরক্ষারূপ সৎক্রিয়া বিস্মৃত হইতে হয়, সেই ভাব প্রদর্শনার্থই যেন মধ্যাহ্ন কালে সেই সুতীক্ষ্ণা ছায়া সন্তাপ ভয়ে ভীতা হইয়া সূচীর প্রাণবায়ুতে প্রবিষ্টা হইত[২৩।২৪]। অসী, বরুণা ও গঙ্গা, এতত্রিতয়ের অন্তরালস্থিত পবিত্রা বারাণসীর

ন্যায় সেই ছায়া, সূচী ও লৌহসূচী, এতত্ত্রিতয়ের অন্তরালস্থিত ত্রিকোণ-সম্পন্ন স্থান তপস্যার দ্বারা অতীব পবিত্র হইয়াছিল। এমন কি তত্রত্য বায়ু ও পাংশু প্রভৃতি সমস্তই মোক্ষলাভের অধিকারী হইয়াছিল। হে রামচন্দ্র! জীবসূচী কেবল একাদ্বয় প্রত্যগাত্মচেতনসম্বিদের বিচার দ্বারাই পরমকারণ পরব্রহ্ম পরিজ্ঞাত হইয়াছিল[২৫।২৮]।

চতুঃসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।
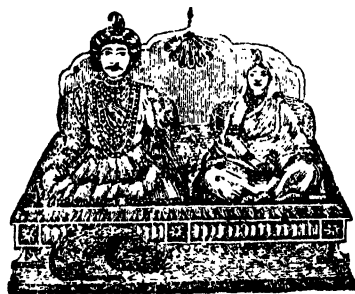
পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ

বশিষ্ঠ বলিলেন, সহস্র বর্ষ অতিক্রান্ত হইলে পিতামহ ব্রহ্মা সেই তপস্বিনীর নিকট আগমন করতঃ কহিলেন, পুত্রি ! বর গ্রহণ কর[1]। কিন্তু সেই জীবাংশরূপিণী জীবসূচী কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অভাব (কর্ম্মেন্দ্রিয়=বাগিন্দ্রিয়.) নিবন্ধন কোন কিছু বলিতে পারিল না। সে সমষ্টিমনোবপু ব্রহ্মাকে বাক্যের দ্বারা কিছু বলিতে পারিল না বটে, কিন্তু মন থাকায় মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিল[2]।

আমি আর বর গ্রহণ করিয়া কি করিব ! আমি পূর্ণা ও বিগত-সর্ব্ব সন্দেহা হইয়া পরমা শান্তি (নির্ব্বাণ) প্রাপ্ত হইয়াছি। এখন আমি পরমানন্দ লাভ করিয়াছি। সকল সন্দেহ উপশান্ত হওয়ায় আমার জ্ঞাতব্য জানা শেষ হইয়াছে। আমার বিবেক সম্পূর্ণ বিকসিত হইয়াছে। এখন আর আমার বরে প্রয়োজন কি[3]।[4] ? আমি যে প্রকারে অবস্থান করিতেছি, চিরকাল এই প্রকারে অবস্থিত থাকিব। সত্য পরিত্যাগ করিয়া মিথ্যা বর গ্রহণে আর আমার প্রয়োজন নাই[5]। যেমন বালিকাগণ স্বীয় সঙ্কল্প সমুদিত বেতাল কর্ত্তৃক আক্রান্তা হয়, তেমনি, মদীয় সঙ্কল্প সমুদিত অবিবেকই এতাবৎ কাল আমাকে বিভীষিকা দেখাইয়া ছিল। অধুনা আত্মবিচারদ্বারা সে স্বয়ং শমতা প্রাপ্ত হইয়াছে। এখন আর আমার ঈপ্সিত বা অনীপ্সিত কোন কিছুতে প্রয়োজন নাই এবং কোন কিছুতে আর আমার ইষ্টানিষ্ট সংঘটন হইবে না[6]।[7]।

সূচী এবম্প্রকার চিন্তা করতঃ তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে, নিয়তি-সহকৃত ব্রহ্মা সেই কর্ম্মেন্দ্রিয়বিহীনা চিন্তাপরায়ণা বীতরাগা প্রসন্নবুদ্ধি জীবসূচীর তাদৃশ অবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন, পুত্রি ! বর গ্রহণ কর। তুমি এই অবনীমণ্ডলে কিছুকাল ভোগ্য ভোগ কর, পশ্চাৎ পরম পদ প্রাপ্ত হইবে। যাহা বলিতেছি, তাহাই সর্ব্ব ভূতের অনিবার্য্য নিয়তির নিয়ম[8]।[11]। হে উত্তমে ! এই তপস্যার

দ্বারা তোমার সঙ্কল্প সফল হউক। পুত্রি! তুমি যে পূর্ব্বে জলদ-সদৃশ ভীষণ রাক্ষস দেহ পরিত্যাগ করিয়াছিলে, তুমি পুনর্ব্বার সেই দেহ গ্রহণ কর। হে পুত্রি! বীজের অন্তর্গত অঙ্কুর যেমন বৃক্ষতা প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ, তুমি, যে বিশাল দেহ হইতে বিযুক্ত হইয়াছ, পুনর্ব্বার তুমি সেই দেহে সংযুক্ত হও। তুমি রাক্ষসশরীর প্রাপ্ত হইলেও বিদিতবেদ্যতা প্রযুক্ত (তত্ত্বজ্ঞান হওয়ায়) কাহাকেও বাধা প্রদান করিবে না। কেবল অন্তঃশুদ্ধা হইয়া শারদীয় অভ্রমণ্ডলীর ন্যায় মাত্র স্পন্দনশীলা হইবে[১২।১৪]। তুমি সর্ব্বাত্মধ্যানরূপিণী হইয়া অবিশ্রান্ত ধ্যানপরায়ণা হইবে এবং ব্যবহারাত্মক ধ্যানধারণার আধার স্বরূপিণী হইয়া বায়ুস্বভাবের ন্যায় মাত্র দেহপরিস্পন্দন দ্বারা বিলাস করিবে। হে পুত্রি! তুমি সর্ব্বাত্মধ্যানে নিরত হইবে এবং যদি কদাচিৎ নির্ব্বিকল্প সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হও—তাহা হইলে ত্বদীয় রাক্ষসোচিত অশাস্ত্রীয় হিংসা প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র ক্ষুধা নিবৃত্তির নিমিত্ত ন্যায়ানুসারে প্রাণিহিংসা করিবে। তুমি স্বয়ং অর্থাৎ অন্যের অননুরোধে ন্যায়বৃত্তির অনুসারিণী হইয়া অন্যায়পথবর্ত্তী জনগণের হিংসাসাধন পূর্ব্বক জীবন্মুক্ত হইয়া স্বদেহে প্রাপ্ত বস্তু বিবেককে প্রতিপালন করিবে[১৫।১৮]।

পিতামহ ব্রহ্মা সূচীকে এবম্প্রকার বর প্রদান করিয়া গগনমণ্ডলে গমন করিলেন। সূচী মনে মনে চিন্তা করিলেন, অব্জজ ব্রহ্মার বাক্যে আমার ক্ষতি কি? তাঁহার বচনার্থ নিবারণেই বা আমার প্রয়োজন কি? অনন্তর চিন্তাপরায়ণা সূচী দেখিতে দেখিতে পরিবর্দ্ধিত হইয়া রাক্ষস দেহ প্রাপ্ত হইল[১৯]। সেই অত্যন্ত সূক্ষ্মা সূচী প্রথমে প্রাদেশ, পরে হস্ত, অনন্তর ব্যাম ও তদনন্তর বিটপ প্রমাণ দেহ প্রাপ্ত হইল। দেখিতে দেখিতে নিমেষ মধ্যে স্বীয় অভ্রমালা-সদৃশ বিস্তৃত সর্ব্বাবয়ব সম্পন্ন বৃহৎ রাক্ষস দেহ প্রাপ্ত হইল। এই-রূপে সেই সূচী স্বীয় সঙ্কল্পদ্রুম কণিকা হইতে অঙ্কুরাদিক্রমে দেহলতাত্ব প্রাপ্ত হইয়া সঙ্কল্পদ্রুমবন-পুষ্পের ন্যায় পূর্ব্বতিরোহিত শক্তিসম্পন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয়াদি সমস্তই অবিকল রূপে প্রাপ্ত হইল[২০।২১]।

পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

ষট্‌সপ্ততিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, যেমন যৎপরোনাস্তি সূক্ষ্ম মেঘ বর্ষাকাল আগতে স্থূল অর্থাৎ বৈপুল্য প্রাপ্ত হয়, তেমনি, সেই সূক্ষ্মা সূচী স্থূলত্ব প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্ব পরিত্যক্ত রাক্ষসদেহ পুনঃ প্রাপ্ত হইল[১]। রাক্ষস দেহ পাইল বটে; পরন্তু রাক্ষসোচিত ভাব (মনোবৃত্তি) পাইল না। সে স্বাত্মভূত ব্রহ্মাকাশ লাভে প্রমুদিতা হওয়ায় ব্রহ্মসাক্ষাৎকার প্রভাবে রাক্ষসভাব কঞ্চুকবৎ (কঞ্চুক=খোলস) পরিত্যাগ করিল[২]। বদ্ধপদ্মাসনা ও ধ্যানপরায়ণা হইয়া একমাত্র বিশুদ্ধ সম্বিদ্ অবলম্বন করতঃ সেই পর্ব্বতশৃঙ্গে শৃঙ্গবৎ নিশ্চলভাবে অবস্থান করিতে লাগিল[৩]। প্রাবৃট্‌-কাল আগতে জলদমণ্ডলের ভীষণ নিনাদ শ্রবণে শিখণ্ডিনী যেমন কাম কর্ত্তৃক উত্থাপিতা হয়, সেইরূপ, সমাধিযোগে ছয় মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর তপস্বিনী সূচী প্রবুদ্ধা হইল, ও সাতিশয় ক্ষুধাকাতরা সুতরাং বাহ্যবৃত্তিসম্পন্না হইল। দেহ ও দেহাভিমান যত কাল থাকে, তত কাল ক্ষুধাদিস্বভাবের নিবৃত্তি হয় না[৪।৫]।

রাক্ষসী ক্ষুৎপরায়ণা হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল, আমি এখন কি গ্রাস করি! অন্যায়ে পরজীব ভক্ষণ করা কোন প্রকারেই কর্ত্তব্য নহে[৬]। যাহা আর্য্যজনগর্হিত ও অন্যায়ে উপার্জ্জিত, তাহা ভক্ষণ করা অপেক্ষা অনাহারে মৃত্যু শ্রেয়স্কর[৭]। অনাহারে প্রাণ ত্যাগ হয় সেও ভাল তথাপি অন্যায় ভক্ষণ স্বীকার করিব না। কেননা, অন্যায় ভোজন গরলস্বরূপ। যাহা লোকপরম্পরায় অপ্রচলিত, সে ভোজনে আমার প্রয়োজন কি? আমার জীবনে ও মরণে কিছুই ইষ্টানিষ্ট দেখি না[৮।৯]। আমি কে? দেখিতেছি, আমি ব্যতীত অন্য কিছু নাই। এই যে, মনোদেহাদি, ইহা ভ্রমের বিলাস ব্যতীত অন্য কিছু নহে। আত্মবোধ দ্বারা ভ্রম বিনষ্ট হইলে দেহাদির সারত্ব কোথায় থাকিবে[১০]? বশিষ্ঠ বলিলেন, রাক্ষসী ঐ প্রকারে দেহাদির অভিমান পরিত্যাগ করিয়া সন্তুষ্ট হইল এবং মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থিতি

করিতে লাগিল। সেই সময়ে সে গগনমণ্ডল হইতে বায়ুর বক্ষ্যমাণ বচন পরম্পরা শ্রবণ করিল[১১]।

"হে কর্কটিকে! তুমি যাও—তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা বিমূঢ় দিগকে গিয়া প্রবোধিত কর। কেননা, মূঢ় উদ্ধার করাই তত্ত্ববিদ্‌গণের স্বভাব[১২]। যে সমস্ত মূঢ় তোমাকর্তৃক প্রবোধিত হইয়াও প্রবুদ্ধ না হইবে, নিশ্চই তাহারা আত্মবিনাশের নিমিত্ত ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং তাহারাই তোমার ন্যায়ানুসারী ভক্ষ্য হইবে"[১৩]।

কর্কটী ঐরূপ আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া প্রত্যুত্তর করিল, "আমি আপনার দ্বারা অনুগৃহীত হইলাম"। অনন্তর সে সেই রাত্রে হিমাচল-শিখর হইতে ধীরে ধীরে অবতরণ করিল। সেই অঞ্জনশৈলাভা নিশাচরী সেই অচলের অধিত্যকা অতিক্রম করতঃ উপত্যকাতটে আগমন পূর্ব্বক তথা হইতে সেই অচলের নিম্নভাগস্থ অন্ন, পশু, লোক, শস্য, ওষধি, আমিষ, মূল, পান, মৃগ, কীট ও খগ প্রভৃতি বহুবিধ প্রাণীতে, বহুবিধ দ্রব্যে ও বহুল উদ্ভিজ্জে পরিপূর্ণ কিরাত-জনপদে প্রবেশ করিল[১৪।১৭]।

ষট্‌সপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তসপ্ততিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাক্ষসীর প্রবেশে তথায় তখন অতি ভয়ঙ্করী কৃষ্ণা নিশা উপস্থিত হইল। ঐ রাত্রের সে অন্ধকার যেন হস্তগ্রাহ্য হইল[১]। (এত গাঢ়, যেন হাতে ধরা যায়)। সুধাকর যেন অমৃত-লুণ্ঠন ভয়ে পলায়ন করিয়াছেন, তাই যেন আজ্ গগন ইন্দুবিহীন হইয়াছে। (চন্দ্রের সর্ব্বস্ব অমৃত, রাক্ষসী যেন তাহা কাড়িয়া লইবে, সেই ভয়ে যেন চন্দ্র পলায়ন করিয়াছেন, তাই আজ্ গগনে চন্দ্র নাই।) সেই পরিপুষ্টকলেবরা গাঢ়ান্ধকারযুক্তা রজনী অতি নিবিড় তমাল বনের সহিত উপমিত হইতে পারে। যেন সর্ব্বদিকে কৃষ্ণা বিভাবরীর নেত্রকজ্জল প্রলিপ্ত হইয়াছে। ঐ রজনীতে অন্ধকার যেন মূর্ত্তি পরি-গ্রহ করিয়া গিরিগ্রামকোটরে অতি মন্থরভাবে গমন করিতেছে। গৃহে গৃহে ও চত্বরে চত্বরে দীপালোক সঞ্চারিত হইতে লাগিল। সে দৃশ্য নবযৌবনা কৃষ্ণা যুবতীর বিলাস সঞ্চরণের অনুকারী। গবাক্ষাদি হইতে বিনির্গত দীপালোক সে শোভার বৃদ্ধি করিতে লাগিল। এই অতি-ভীষণা তামসী নিশা যেন কর্কটীর বয়স্যা—কর্কটীর সঙ্গীভূতা। এই নিস্তব্ধা রজনী যেন ভূত প্রেত পিশাচ গণের নৃত্যাদি ব্যাপার দেখিয়া ভয়ে মৌনা হইয়া রহিয়াছে[২।৫]। সুষুপ্ত মৃগাদি প্রাণীর দেহের ও সুনিবিড় নীহারের দ্বারা যেন এই রজনী অনন্তকায়া হইয়াছে[৬]। ভেক সকল সরোবরে ও কাকাদি পক্ষী সকল বৃক্ষের আশ্রয় লই-য়াছে। অন্তঃপুর সকল নায়ক নায়িকার মধুরালাপে রণিত হইতেছে। জঙ্গল সমুদায় যেন প্রলয়ানলে প্রজ্বলিত হইতেছে। * নভোমণ্ডলে শত শত নয়নসদৃশ সমুজ্জ্বল নক্ষত্রবৃন্দ সমুদিত হইয়াছে। সঞ্চরমাণ পবন অরণ্যস্থিত দ্রুম হইতে পুষ্প ও ফল নিপাতিত করিতে লাগিল[৭।৯]। বৃক্ষকোটরস্থ বায়সগণ যেন কৌশিকের (এক প্রকারনিশাচর পক্ষীর)

* অন্ধকার নিশায় বনৌষধি হইতে আলোক প্রকটিত হয়। দূরস্থ দর্শকেরা মনে করে, বনে আগুণ লাগিয়াছে। অথবা কেহ অগ্নিকাণ্ড করিয়াছে।

রব শ্রবণ করিয়া ভয়ে নিঃশব্দভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিল। কোন কোন গ্রামবাসী, তস্কর কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ায় কর্কশ ক্রন্দন ধ্বনি করিতে লাগিল[১]। বন সকল ঈষৎ মৌন, * নগর নিস্তব্ধ, সমীরণ সঞ্চারিত ও পক্ষিগণ স্ব স্ব নীড়ে নিদ্রিত, এবং সিংহগণ পর্ব্বত গুহায় ও শ্বাপদগণ বনকুঞ্জে শয়িত। দেখিবামাত্র মনে হয়, কজ্জলজলদসঙ্কাশা তিমিরমাংসলা পঙ্কপিণ্ডসদৃশী নিবিড়া † ও তদ্বিধা রজনী যেন আকাশে ও বিপিন মধ্যে মৌনভাবে বিচরণ করিতেছে। এই ভয়ঙ্করী অসিতা বিভাবরী একার্ণবের ও পর্ব্বতগুহার ন্যায় স্নিগ্ধকলেবরা ও অঙ্গারকোটরের ন্যায় ও মহাপঙ্কের ন্যায় নিবিড়া ও ভৃঙ্গগণের পৃষ্ঠপক্ষসদৃশ শ্যামলা হইয়া বিরাজ করিতেছে[১১।১৫]।

ঈদৃশ রজনীতে কিরাত রাজ্যের কোন এক মহাতেজস্বী রাজা মন্ত্রিসমবেত হইয়া তস্করাদিবধচর্য্যার নিমিত্ত বহির্গত হইলেন। অনন্তর তাঁহারা নগর হইতে নির্গত হইয়া অদূরবর্ত্তী বিক্রম নামক ভীষণ অটবী মধ্যে প্রবেশ করিলেন[১৬।১৭]। নিশাচরী কর্কটী সেই রাত্রে বেতালদর্শনোন্মুখী ‡ ধৈর্য্যশালী ধৃতাস্ত্র সমন্ত্রী কিরাতরাজকে অটবী-মধ্যে পরিভ্রমণ করিতে দেখিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, ভাগ্যক্রমে আমি আজ্ ভক্ষ্য প্রাপ্ত হইলাম। এই দুই ব্যক্তি নিশ্চই আত্মজ্ঞানবিহীন সুতরাং মূঢ়। ইহাদের দেহ অবশ্যই ইহাদের দুর্ব্বহ-ভারস্থানীয়। মূঢ়লোকেরা ইহলোকে আত্মবিনাশের নিমিত্ত ও পরলোকে দুঃখ ভোগের নিমিত্ত জীবন ধারণ করে। সুতরাং তাহারাই আমার ভক্ষ্য ও বিনাশ্য। আত্মজ্ঞানবিহীন মূঢ়দিগের জীবন অপেক্ষা মরণ শ্রেয়স্কর। কেননা, মৃত্যু হইলে তাহাদের পাপ উপার্জ্জনের বিরাম হয়। কিন্তু জীবিত থাকিলে তাহাদের পাপপঙ্ক দিন দিন বাড়িতেই

* বনসকল ঈষৎ মৌন অর্থাৎ অল্পশব্দ যুক্ত। অর্থাৎ দুই একটী রাত্রিচর জীবের শব্দ মাত্র শুনা যাইতেছে।

† কজ্জলজলদ=কাজলের মেঘ। তিমিরমাংসল=অন্ধকারের স্থূলতা। পঙ্কপিণ্ড=পাঁক। তাহার ন্যায় নিবিড় অর্থাৎ ঘন।

‡ গ্রামের বহির্ভাগে যে সকল গ্রাম্য দেবতার ও অমানব জীবের গমনাগমন স্থান থাকে, রাজা ও তদীয় মন্ত্রী সেই সেই স্থানে গমন করিয়া তাঁহাদের দর্শন লাভ করিতে ইচ্ছুক।

থাকে[১৮।২১]। সেইজন্য আদিসৃষ্টিকালে পদ্মজ ব্রহ্মা কর্তৃক আত্মজ্ঞানবিহীন মূঢ়চেতাগণ হিংস্র জীবগণের ভক্ষ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে[২২]। অতএব, বোধ হয় অদ্য এই দুই ব্যক্তি মদীয় ভক্ষ্যভূত হইয়া আগমন করিয়াছে। বোধ হয় কেন? সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অতএব, আমি আজ্ এই দুই ব্যক্তিকে ভক্ষণ করিব। এ বিষয়ে উপেক্ষা বা আলস্য করা পণ্ডিতোচিত কার্য্য নহে। যাহারা ভাগ্যমান নহে তাহারাই নির্দ্দোষ অর্থ * উপেক্ষা করিয়া থাকে[২৩]।" রাক্ষসী এই রূপ আলোচনা করিয়া পুনর্ব্বার চিন্তা করিতে লাগিল, না—পরীক্ষা না করিয়া ভক্ষণ করা উচিত নহে। কেননা, ইহারা গুণযুক্ত মহাশয় ব্যক্তি হইলেও হইতে পারেন। যদি ইহারা গুণসম্পন্ন মহাশয় ব্যক্তি হন, তাহা হইলে আমার অভক্ষ্য। তাদৃশ ব্যক্তির বিনাশে আমার অভিরুচি নাই[২৪]। আগে ইহাদিগকে পরীক্ষা করিয়া দেখি; যদি ইহারা তাদৃশ গুণান্বিত হন, তাহা হইলে ভক্ষণ করিব না। পণ্ডিতেরাও বলিয়া থাকেন, গুণিগণকে কখনই হিংসা করিবেক না[২৫]। অকৃত্রিম সুখ, কীর্ত্তি, আয়ু ও বাঞ্ছিত দ্রব্য ত্যাগ করিয়াও গুণিগণের পূজা করিবেক। অতএব, বরং দেহ পরিত্যাগ করিব, তথাপি গুণবান্ ব্যক্তি ভক্ষণ করিব না। আপনার জীবন্ অপেক্ষা সাধুদিগের চিত্ত অধিক সুখপ্রদ[২৬।২৭]। পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, জীবন পর্য্যন্ত প্রদান করিয়াও গুণিগণকে পূজা করিবেক। কেননা, গুণিগণের সংসর্গরূপ বশীকরণ ঔষধ দ্বারা মৃত্যুও মিত্রত্ব প্রাপ্ত হয়[২৮]। আমি যখন রাক্ষসী হইয়াও গুণশালিগণের রক্ষার্থ প্রস্তুত হইয়াছি, তখন আর কোন্ মূঢ় গুণিগণকে অলঙ্কাররূপে হৃদয়ে ধারণ না করিবে[২৯]? গুণযুক্তদেহিগণ স্বীয় সঙ্গতির দ্বারা এই ভূমণ্ডলকে চন্দ্রমার ন্যায় সুশীতলকরিয়া থাকেন[৩০]। গুণিগণের তিরস্কারই (তিরস্কার=বধ অথবা নির্যাতন) দেহিগণের মৃত্যু এবং গুণিগণের সংশ্রয়ই দেহী দিগের জীবন। গুণিগণের সংসর্গ, স্বর্গ ও অপবর্গ হইতেও সমধিক শুভপ্রদ[৩১]। অতএব, এই কমলনয়ন ব্যক্তিদ্বয় কিরূপ জ্ঞানবান্, কতগুলি প্রশ্নলীলার দ্বারা তাহা আগে পরীক্ষা করিয়া দেখিব, পরে যথা কর্ত্তব্য করিব। এ বিষয়ে শাস্ত্রীয়

* নির্দ্দোষ অর্থ=অনায়াসলভ্য ও ন্যায়ানুসারে লভ্য প্রয়োজনীয় বস্তু

অনুশাসন এই যে, জনগণ অগ্রে ব্যক্তিগণের গুণাগুণ পরীক্ষা করিবেক, পশ্চাৎ যদি তাহারা গুণহীন হয়, তাহা হইলে শাস্ত্রোপপত্তির (উপপত্তি=যুক্তি,) বশীভূত হইয়া সেই নির্গুণ দণ্ডার্হ ব্যক্তিকে যথাবিধি দণ্ড প্রদান করিবেক। কিন্তু যদি তাহারা স্বগুণ হইতে অধিকতর গুণ সম্পন্ন হয়, তাহা হইলে সেই গুণযুক্ত ব্যক্তিকে দণ্ড করা সর্ব্বথা অবিধেয়[৩২।৩৩]।

সপ্তসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টসপ্ততিতম সর্গ

বশিষ্ঠ বলিলেন, অতঃপর রাক্ষসকুল কাননের মঞ্জরী স্বরূপ সেই রাক্ষসী ঐ প্রকার চিন্তা করিয়া সেই ভীষণ অন্ধকারে মেঘগর্জ্জনের ন্যায় গম্ভীর নিনাদ করিয়া উঠিল[১]। যেমন গর্জ্জনের পর বজ্রপতন ধ্বনি সমুৎপন্ন হয়, সেইরূপ, রাক্ষসীও হুঙ্কার-ধ্বনির অন্তে বক্ষ্যমাণ পরুষ বাক্য সকল বলিতে লাগিল[২]। যথা—ভো! এতদরণ্যরূপ আকাশের চন্দ্রসূর্য্যস্বরূপ ও মহামায়ান্ধকাররূপ শিলাকোটরের ক্ষুদ্র কীট: স্বরূপ ব্যক্তিদ্বয়! তোমরা কে! তোমরা কি মহাবুদ্ধিসম্পন্ন? অথবা অতিদুর্ব্বুদ্ধি? তোমরা কি এই মুহূর্ত্তে মদীয় গ্রাসে নিপতিত হইয়া মরণ প্রাপ্ত হইবে?[৩।৪]

রাজা প্রত্যুত্তর করিলেন, ওহে অদৃশ্য কুৎসিতপ্রাণিন্! তুমি কে? তোমার ক্ষুদ্র দেহ কোথায় অবস্থান করিতেছে? আমাদিগের দর্শন পথে আগমন কর। ভৃঙ্গধ্বনি (ভৃঙ্গ=ভ্রমর) সদৃশী তোমার উচ্চারিত ধ্বনিতে কে ভয় প্রাপ্ত হয়[৫]? অর্থিগণ অর্থোপরি সিংহবৎ মহাবেগে নিপতিত হইয়া থাকে। অতএব হে অর্থিনি! তুমি বাহ্য সংরম্ভ (ক্রোধের উদ্যোগ) পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনার সামর্থ্য প্রদর্শন কর। হে সুব্রত অর্থাৎ হে জ্ঞানী জীব! তোমার অভিলাষ কি, তাহা ব্যক্ত কর। আমি তোমাকে তোমার অভিলষিত প্রদান করিব। তুমি কি সংরম্ভ ও শব্দ করিয়া সত্য সত্যই আমাদিগকে ভয় দেখাইতেছ? অথবা নিজে ভীত হইয়াছ? ভয় কি! শীঘ্র তুমি তোমার শরীর ও শব্দের সহিত আমাদিগের সম্মুখীন হও। দীর্ঘসূত্রী (যাহারা এখন হবে তখন হবে করিয়া কাল কাটায় তাহারা দীর্ঘসূত্রী) হওয়া ভাল নহে। দীর্ঘসূত্রিগণের আত্মক্ষয় ব্যতীত অন্য কিছু সুসিদ্ধ হয় না[৬।৮]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রঘুনাথ! রাক্ষসী কিরাতাধিপতির তদ্বিধ বচনপরম্পরা শ্রবণ করিয়া তুষ্টা হইল। "এ ব্যক্তি মনোরম বাক্যই বলি-

য়াছে” এইরূপ চিন্তা করিয়া, যেন আত্মপ্রকাশের নিমিত্ত অধৈর্য্য হইল। পরে ভীষণ নিনাদ ও বিকট হাস্য করিতে লাগিল। নৃপতি ও মন্ত্রিবর সেই বিকট হাস্যধ্বনি শ্রবণ করিয়া চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিতে লাগিলেন। তন্মুহূর্ত্তে দেখিলেন, সম্মুখে এক বিরূটাকৃতি রাক্ষসী ভীষণ শব্দ দ্বারা দশ দিক্ পরিপূর্ণ করিতেছে। প্রলয়জলদ-নির্ম্মুক্ত অশনির দ্বারা নিষ্পিষ্ট অদ্রিতটের ন্যায় তাহার বৃহৎ শরীর তদীয় অট্টহাসসমলঙ্কৃত দশনপ্রভার দ্বারা প্রকাশীকৃত হইতেছে। তদীয়-নেত্ররূপ বিদ্যুদ্দ্বয়ের ও শংখবলয়রূপ বলাকার দ্বারা তত্রস্থ নভোমণ্ডল সমুজ্জ্বলিত হইয়াছে[৯।১১]। নিশাচরী যেন সেই ভীষণ অন্ধকাররূপ অপার মহার্ণব মধ্যে বাড়বানল জ্বালায় পরিবৃত হইয়া অবস্থান করিতেছে। আরও দেখিলেন, চৌর, ব্যাঘ্র ও জম্বুক প্রভৃতি রাত্রিঞ্চর সেই স্নিগ্ধ-ঘনঘটার ন্যায় গর্জ্জনশীলা বলদর্পগর্জ্জিতা পীবর-কলেবরা অসিতকন্ধর-সম্পন্না রাক্ষসীর কটকটায়মান দশনসংরম্ভ দ্বারা নিতান্ত ভীত হইয়া পলায়ন করিতেছে। সেই ঊর্দ্ধকেশী শিরাপরিবৃতাঙ্গী (সর্ব্বাঙ্গে শিরা উঠিয়াছে) কপিলনয়না তমোময়ী ও যক্ষ, রক্ষঃ, পিশাচগণের ভয়প্রদায়িনী রাক্ষসী স্বর্গমর্ত্ত্যপরিব্যাপ্ত কজ্জলবর্ণ স্তম্ভ স্বরূপে অবস্থান করিতেছে এবং তদীয় দেহরন্ধ্র (ছিদ্র) মধ্যে প্রবিষ্ট নিশ্বাসপবনের ভীষণ ভাঙ্কার ধ্বনি সমুত্থিত হইতেছে। বজ্রবিদীর্ণ বৈদূর্য্যশিখর স্থলীর ন্যায় বিস্তৃতদেহিনী অট্টহাসিনী তমোময়ী রাক্ষসী মুসল, উলূখল, দগ্ধকাষ্ঠ, হল ও ছিন্নসূর্প সমূহ মস্তকে আভরণ রূপে ধারণ করতঃ অট্টহাসিনী দানবঘাতিনী কালরাত্রির ন্যায় ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে[১২।১৫]। মহাজলদজালসদৃশদেহিনী, গাঢ় তমস্বিনীরূপিণী রাক্ষসী সেই অটবীরূপ ভীষণ আকাশে শরদভ্রের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতেছে। তাহার ইন্দ্রনীল-সদৃশ মহাকৃষ্ণবর্ণ বক্ষে লম্বমান অভ্রযুগলোপম কৃষ্ণবর্ণ স্তনদ্বয় উলূখলাদিগ্রথিত হারজালে ভূষিত রহিয়াছে এবং তদীয় মহাতনু অঙ্গারকাষ্ঠ দ্বারা খচিত রহিয়াছে[১৬।২০]।

রাম! বিবেকবিকসিতচিত্ত উক্ত বীরদ্বয় শিরাপরিবৃতদীর্ঘভুজদ্বয়সম্পন্না রাক্ষসীর তথাবিধ ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি অবলোকন করিয়াও পূর্ব্ববৎ অক্ষুব্ধভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। বস্তুতঃই অবনীমণ্ডলে এমন ভয়ঙ্কর কিছুই নাই, যাহা বিবেকিগণের চিত্তে মোহ বা ভয় উৎপাদনে সমর্থ হয়[২১]।

অনন্তর মন্ত্রী কহিলেন, হে মহারাক্ষসি! তুমি কি মহাত্মা? যদি তুমি মহাত্মা হও, তাহা হইলে এরূপ সংরম্ভ (কোপ), শোভার বিষয় নহে। যাঁহারা বুদ্ধিমান্ তাঁহারা অত্যল্প কার্য্যের নিমিত্ত এরূপ মহা আড়ম্বর করেন না। (অভিপ্রায় এই যে, যদি তোমার আহারের প্রয়োজন হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা বাক্যব্যয় করিলেই অর্থাৎ একটা কথা বলিলেই পাইতে পার। তাহারজন্য এত সংরম্ভ কেন?) যদি তুমি ক্ষুদ্র হও, তবে সে পক্ষেও সংরম্ভের প্রয়োজন দেখি না। কোন্ মহাত্মা ক্ষুদ্র সত্বের (জীবের) কোপে ভীত হয়? অতএব হে রাক্ষসি! তুমি এই তুচ্ছ ক্রোধ পরিত্যাগ কর। তোমার পক্ষে এতাদৃশ নিষ্ফল সংরম্ভ উপযুক্ত নহে। স্বার্থসাধক ধীসম্পন্ন ব্যক্তিগণ সংরম্ভ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন[২২।২৩]। হে অবলে! তোমার ন্যায় সহস্র সহস্র মশক আমাদিগের ধীরতারূপ প্রচণ্ড মারুত দ্বারা শুষ্কতৃণপর্ণবৎ নিরস্ত হইয়াছে[২৪]। সেই জন্যই বলিতেছি, তুমি ক্রোধ পরিত্যাগ কর এবং ধীরতা অবলম্বন কর। প্রাজ্ঞগণ, সংরম্ভ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বস্থ ও স্থিরবুদ্ধি হইয়া ব্যবহারোচিত যুক্তির দ্বারা স্বার্থ সংসাধন করিয়া থাকেন। যোগ্য ব্যবহার দ্বারা কার্য্যসিদ্ধ হউক বা না হউক, ভ্রমাত্মক সংরম্ভের বশ্য হওয়া উচিত নহে[২৫।২৬]। কেননা, কার্য্যের সিদ্ধি ও অসিদ্ধি মহানিয়তিরই অধীন। হে অর্থিনি! তুমি সংরম্ভ পরিত্যাগ করতঃ এই মুহূর্ত্তেই অভিমত প্রার্থনা কর। ইহা নিশ্চয় জানিবে, স্বপ্নেও আমাদিগের পুরোগত অর্থী অলব্ধস্বার্থ হইয়া গমন করে নাই[২৭]।

অনন্তর রাক্ষসী মন্ত্রিবরের এবম্বিধ বাক্যপরম্পরা শ্রবণ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল "এই পুরুষসিংহদ্বয়ের আচার ও স্বত্ত্ব (ধৈর্য্য বা মনের বল) অতি অদ্ভুত! ভাবে বোধ হইতেছে, ইহারা সামান্য ব্যক্তি নহেন। ইহাদিগের বাক্য, বক্ত্র ও নয়ন, এই তিন যেন একমত হইয়া ইহাদের মনোগত ভাব ব্যক্ত করিতেছে। যেরূপ সরিৎ সমূহের জলরাশি সঙ্গমদ্বারা একীভূত হইয়া যায়, তদ্রূপ, মহাত্মা দিগেরও বাক্য, বক্ত্র ও নয়ন দ্বারা তাহাদের আশয় (অন্তরস্থ ভাব) একীভূত হইয়া থাকে। (একাম্বয় তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়)। ইহারা আমার মনোগত অভিপ্রায় পরিজ্ঞাত হইয়াছেন এবং আমিও ইহাদের

অভিপ্রায় অবগত হইয়াছি। ইহারা অবিনাশিস্বভাব আত্মা; সুতরাং আমার বিনাশ্য নহেন। অনুমান হয়, ইহারা আত্মজ্ঞ হইবেন। কেননা, আত্মজ্ঞান ব্যতিরেকে সদসদ্ভাবরূপ জীবনমরণপ্রত্যয় (আমি মরিব, আমি বাঁচিব, ইত্যাদিবিধ মিথ্যা জ্ঞান) অস্তমিত হয় না। এক্ষণে আমি ইহাদিগের নিকট আমার সমুদিত সন্দেহের বিষয় কিঞ্চিৎ জিজ্ঞাসা করিব। কারণ, যাহারা প্রাজ্ঞ ব্যক্তি প্রাপ্ত হইয়া সন্দেহাদির বিষয় জিজ্ঞাসা না করে, তাহারা অধম জীব”[২৮।৩৩]।

রাক্ষসী ঐরূপ চিন্তা করিয়া স্বীয় অভিপ্রেত জিজ্ঞাসার নিমিত্ত হাস্য সংযমন করিয়া তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, হে অনঘদ্বয়! ধীরমানবসদৃশ তোমরা কে? তাহা আমাকে শীঘ্র বল। মন্ত্রী বলিলেন, নিশাচরি! ইনি কিরাতগণের অধিপতি, আমি ইহার মন্ত্রী। আমরা তোমার ন্যায় হিংস্র জনগণের নিগ্রহার্থ রাত্রিবিচরণে উদ্যত হইয়াছি। দিবারাত্র দুষ্ট প্রাণিগণকে বিনিগ্রহ করাই রাজার প্রধান ধর্ম্ম। যে রাজা রাজধর্ম্মপরিত্যাগী হয় তাহার প্রজ্বলিত অনলে দেহ পরিত্যাগ করাই শ্রেয়স্কর[৩৪।৩৭]।

রাক্ষসী বলিল, হে রাজন! তুমি দুর্ম্মন্ত্রী (যাহার মন্ত্রী দুর্ব্বুদ্ধি বিশিষ্ট সে দুর্ম্মন্ত্রী)। যে দুর্ম্মন্ত্রী, সে রাজা নহে, সে দস্যু। রাজার সন্মন্ত্রী সহায় হওয়াই উচিত। কেননা, রাজা বিবেচনা সহকারে সৎ মন্ত্রী নিয়োগ করিলে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারেন এবং তদীয় প্রজাগণও রাজার ন্যায় আর্য্যভাব প্রাপ্ত হইতে পারে[৩৯]। হে রাজন্! গুণসমূহের মধ্যে অধ্যাত্মজ্ঞানই উৎকৃষ্ট, এবং যে রাজা অধ্যাত্মজ্ঞানবিৎ সেই রাজাই যথার্থ রাজা। অপিচ, যে মন্ত্রী বিচাররহস্যবিৎ (সৎ অসৎ অবধারণে সক্ষম) সেই মন্ত্রীই যথার্থ মন্ত্রী। যে রাজা ও যে মন্ত্রী আত্মবিদ্যার দ্বারা প্রভুত্ব ও সমদৃষ্টিত্ব অবগত নহে, সে রাজা রাজা নহে, এবং সে মন্ত্রীও মন্ত্রী নহে। যদি তোমরা ঐ রহস্য পরিজ্ঞাত থাক, তাহা হইলে শ্রেয়োলাভ করিবে; নচেৎ তোমরা আমার ভক্ষ্য হইবে[৪০।৪২]। অতএব, হে অজ্ঞদ্বয়! তোমাদিগের পরিত্রাণের এই একমাত্র উপায় আছে যে, যদি তোমরা আমার প্রশ্নরূপ পিঞ্জর (খাঁচা) স্ব স্ব বুদ্ধির দ্বারা বিদীর্ণ করিয়া মদীয় প্রীতি বর্দ্ধন করিতে পার, তাহা হইলে পরিত্রাণ পাইবে[৪৩]। হে কিরাতপতে! বক্ষ্যমাণ প্রশ্নজাল বিচার করতঃ

শীঘ্রপ্রত্যুত্তর প্রদান কর। অথবা হে মন্ত্রিন্! তুমিই আমার বক্ষ্যমাণ প্রশ্ন সমূহের অর্থ নির্দ্দেশ কর। আমি ঐ বিষয়েই তোমাদিগের নিকট নিতান্ত অর্থিনী। তোমরা আমার ঐ অর্থ (প্রার্থনীয়) পরিপূরণ কর। রাজন্! অবনীমণ্ডলে এমন কোনও ব্যক্তি বিদ্যমান নাই যে, অঙ্গীকৃত অর্থ প্রদান না করিলে ক্ষয়কর দোষে সমাশ্লিষ্ট না হয়[৪৪]।

অষ্টসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

একোনাশীতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাক্ষসী ঐরূপ কহিলে, কিরাতাধিপতি তাহাকে প্রশ্ন করণার্থ অনুমতি প্রদান করিলেন। রাক্ষসী রাজার অনুজ্ঞা লাভ করিয়া বক্ষ্যমাণ প্রশ্নাবলী কহিতে আরম্ভ করিল। হে রাঘব! অবধান পূর্ব্বক সেই সমস্ত মহাপ্রশ্ন শ্রবণ কর[১]।

রাক্ষসী কহিল, হে রাজন্! এক অথচ অনেক, এরূপ কোন্ পরমাণুর (যার পর নাই সূক্ষ্ম পদার্থের) উদরে লক্ষ লক্ষ ব্রহ্মাণ্ড, সমুদ্রে বুদ্বুদের ন্যায় লয় প্রাপ্ত হইতেছে? (১) আকাশ অথচ আকাশ নহে, এরূপ কি বা কোন্ বস্তু? (২) কি কিঞ্চিৎ ও অকিঞ্চিৎ? (৩) আমি কে তুমিই বা কে[২]? (৪) কে গমনশীল অথচ গমন করে না? (৫) কে অবস্থান না করিয়াও অবস্থিত? (৬) কে চেতনস্বরূপ হইয়াও পাষাণবৎ অচেতন? (৭) আকাশে কোন্ ব্যক্তি বিচিত্র চিত্র উৎপাদন করে[৩।৪]? (৮) বহ্নি কে? কোন্ বহ্নি অদাহক? কোন্ অবহ্নি হইতে নিরন্তর বহ্নি সমুৎপন্ন হইতেছে[৫]? (৯) অহে প্রাজ্ঞ! কে চন্দ্র, অর্ক, অগ্নি ও তারকাদি না হইয়াও চন্দ্র অর্ক ও অগ্ন্যাদির অবিনাশী প্রকাশক? (১০) ইন্দ্রিয়ের অগোচর এমন কোন্ নিরিন্দ্রিয় বস্তু হইতে প্রকাশ প্রবর্ত্তিত (উৎপন্ন) হইয়াছে[৬]? (১১) জন্মান্ধ লতা, গুল্ম ও অঙ্কুরাদি ও অন্যান্য বস্তু সমুদয়ের উত্তম আলোক কি[৭]? (১২) কে আকাশাদির জনক? (১৩) সত্তার স্বভাবপ্রদ কে? (১৪) জগৎরত্নের কোষ কি? জগৎ কোন্ মণির কোষ[৮]? (১৫)। পরম সূক্ষ্ম কি? কে প্রকাশ ও তমঃ? কেইবা অস্তি ও নাস্তি হয়? (১৬) কোন্ অণু দূরে অদূরে অবস্থান করিতেছে? (১৭) কে সূক্ষ্মতম অণু হইয়াও মহাপর্ব্বতস্বরূপ[৯]? (১৮) কে নিমেষস্বরূপ হইয়াও মহাকল্প? (১৯) কে কল্পস্বরূপ হইয়াও নিমেষ? (২০) কোন্ প্রত্যক্ষ অসদ্রূপ? (২১) কোন্ চেতন চেতন নহে[১০]? (২২) কে বায়ু হইয়াও অবায়ু? (২৩) শব্দ কে ও অশব্দই বা কে? (২৪) কে সর্ব্বস্বরূপ হইয়াও কিছুই নহে? (২৫) কে অহং হইয়াও অনহং[১১]? (২৬) হে রাজন্! কোন্ বস্তু বহুজন্মে লব্ধ

থাকিয়াও অলব্ধপ্রায় থাকায় প্রযত্নশতলভ্য এবং কোন্ বস্তু পূর্ণ অথচ পাওয়া দুর্লভ[১২]? (২৭) কে স্বস্থ ও জীবিত থাকিয়া আত্মহারা হইয়াছে? (২৮) কোন্ অণু সুমেরুপর্ব্বতকে, এমন কি ত্রিভুবনকে, তৃণবৎ ক্রোড়ীকৃত করিয়াছে[১৩]? (২৯) কোন্ অণুর দ্বারা শত যোজন পরিপূর্ণ হয়? (৩০) অণু অথচ যোজনশতমধ্যে পর্য্যাপ্ত হয় না, এমন বস্তু কি আছে[১৪]? (৩১) কাহার কটাক্ষে জগৎরূপ বালক নৃত্য করিতেছে? (৩২) কোন্ অণুর উদরে সমগ্র ভূধরসহ ভূমণ্ডল অবস্থিত রহিয়াছে[১৫]? (৩৩) কোন্ অণু সুমেরু অপেক্ষাও অধিক স্থূলতা ধারণ করিয়াও অণুত্ব পরিত্যাগ করে নাই? (৩৪) কোন্ অণু কেশাগ্রশত ভাগের ভাগৈকস্বরূপ হইয়াও বৃহৎ পর্ব্বতের ন্যায় অত্যুচ্চ[১৬]? (৩৫) কোন্ অণু প্রকাশের ও অন্ধকারের প্রকাশক? (৩৬) অসংখ্য জ্ঞানকণা (বৃত্তিজ্ঞান) কোন্ অণুর উদরে অবস্থিত[১৭]? (৩৭) কোন্ অণু নিঃস্বাদ হইয়াও মধুরাদি রস আস্বাদন করে? (৩৮) সমগ্র জগৎ কোন্ সর্ব্বত্যাগী অণুর আশ্রিত[১৮]? (৩৯) কোন্ অণু আপনাকে আচ্ছাদন করিতে অশক্ত অথচ সকল জগৎ আচ্ছাদন করে? (৪০) প্রলয়কালে এই জগৎ কোন্ অণুর অন্তরে সজীবভাবে অবস্থান করে[১৯]? (৪১) কোন্ অণু জাতশরীর না হইয়াও সহস্রকরলোচন? (৪২) কোন্ নিমেষ মহাকল্প ও কল্পকোটীশত স্বরূপ[২০]? (৪৩) বীজ মধ্যে বৃক্ষের অবস্থিতির ন্যায় এই জগৎ প্রলয়কালে কোন্ অণুর মধ্যে অবস্থিতি করে? (৪৪) বস্তুতঃ অনুদিত স্বভাব হইলেও এই ত্রিজগৎ সৃষ্টিকালে কোন্ অণুতে পরিস্ফুটভাবে উদিত বা প্রকাশিত হয়[২১]? (৪৫) কোন্ অণুর নিমেষের মধ্যে মহাকল্প-বীজমধ্যে অঙ্কুরের অবস্থিতির ন্যায় অবস্থিতি করে? (৪৬) কে কারক সমূহ ব্যাপারিত করেনা, অথচ কর্ত্তা[২২]? (৪৭) কোন্ নেত্রহীন দ্রষ্টা দৃশ্য দর্শন নিমিত্ত আপনাকেই দৃশ্যরূপে দর্শন করে[২৩]? (৪৮) কেইবা আপনার জ্ঞানে আপনাকে অখণ্ডিত দর্শন করিয়া দৃশ্য দর্শনে পরাঙ্মুখ হয়[২৪]? (৪৯) কে আপনাকে দৃশ্য ও দর্শন উভয়রূপে প্রকাশিত করে? (৫০) কোন্ ব্যক্তি সুবর্ণে বলয়াদি আরোপের ন্যায় আপনাতে দৃশ্য, দ্রষ্টা ও দর্শন, এই তিন্ প্রকারে আরোপিত করিতেছে[২৫]? (৫১) যেমন তরঙ্গমালা সলিলরাশি হইতে অপৃথক্, তেমনি, কোন্ পদার্থ হইতে এ সমুদায় অপৃথক্?

(৫২) কাঁহার ইচ্ছায় সলিলরাশি হইতে উর্ম্মির (উর্ম্মি=তরঙ্গ) ন্যায় এ সকল পৃথক্ বলিয়া অনুভূত হয়[২৬]? (৫৩) কোন্ এক অদ্বয় বস্তু দিক্কালাদিতে অনবচ্ছিন্ন ও অসতের (মিথ্যার) সৎ অর্থাৎ প্রকাশক? (৫৪) দ্বৈতই বা কাহা হইতে সলিলরাশি হইতে তরঙ্গের ন্যায় অপৃথক্[২৭]? (৫৫) কোন্ ত্রিকালগামী দ্রষ্টা, দর্শন, দৃশ্য, প্রকাশাবস্থা ও তিরোহিতাবস্থার সহিত জগৎকে স্বকীয় অন্তরে ধারণ করতঃ অবস্থিতি করিতেছে[২৮]? (৫৬) যেমন বীজের অন্তরে বৃক্ষ থাকে, তেমনি, কাহার অন্তরে ভূত, ভবিষৎ ও বর্ত্তমান জগদ্বৃন্দরূপ বৃহদ্ভ্রম অবস্থিতি করিতেছে? (৫৭) কে অনুদিত স্বভাব হইয়াও ক্রম হইতে বীজের ও বীজ হইতে ক্রমের ন্যায় উদিত হয় অথচ আপনার একরূপতা ত্যাগ করে না[২৯।৩০]? (৫৮) অহে রাজন্! মেরুভূধর কাহার নিকট মৃণাল তন্তু অপেক্ষাও সূক্ষ্ম অথবা কাহার ইচ্ছায় মৃণাল তন্তু সুমেরু অপেক্ষাও সুদৃঢ় এবং এমন কি আছে যে, যাহার উদরে তদ্রূপ বহুসংখ্য মেরু-মন্দরাদি অচলবৃন্দ অবস্থিত রহিয়াছে[৩১]? (৫৯) কাহার দ্বারাই বা এই বিশ্ব বিস্তৃত হইয়াছে? (৬০) অপিচ, তুমি কোন্ সারে সারবান্ হইয়া ব্যবহার কার্য্য সম্পাদন ও প্রজাপুঞ্জ শাসন এবং পালন করিতেছ? (৬১) কাহার দর্শনে তুমি শান্তিদায়িনী নির্ম্মলা দৃষ্টি প্রাপ্ত হইয়াছ[৩২]? (৬২) এই সমস্ত প্রশ্নের প্রত্যুত্তর তুমি স্বমরণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বিশেষ করিয়া বল। চন্দ্রের কলাকলঙ্করূপ আবরণের ন্যায় মদীয় চিত্তের সংশয়রূপ আবরণ শীঘ্রই বিগলিত হউক। যাহার দ্বারা আমার এই সংশয় উন্মূলিত না হইবে সে পণ্ডিত শব্দের বাচ্য নহে[৩৩]। অহে সুবুদ্ধি পুরুষদ্বয়! যদি তোমরা আমার ক্রমোক্ত প্রশ্নের প্রত্যুত্তর দিয়া মদীয় চিত্তগত সংশয় শীঘ্র উচ্ছেদ করিতে না পার, তাহা হইলে অচিরাৎ তোমরা রাক্ষসজঠরহুতাশনের ইন্ধনত্ব প্রাপ্ত হইবে এবং তোমার এই জনপদও আমার উদরসাৎ হইবে। আমার বিবেচনা হয়, তোমরা মদীয় প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদানে অযোগ্য হইলে তোমার রাজ্যাদি থাকিবেক না। কেননা, মূর্খদিগের রাজ্য নিশ্চিত আত্মক্ষয়ের কারণ হয়[৩৪।৩৫]।

অনন্তর সেই বিকটাকৃতি রাক্ষসী উল্লসিতচিত্তে মেঘগম্ভীর-নিস্বনে ঐসকল কথা কহিয়া শরৎকালীন সুনির্ম্মল মেঘমণ্ডলের ন্যায় তুষ্ণীম্ভাব ধারণ করিল[৩৬]।

একোনাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

অশীতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, সেই মহারণ্যমধ্যে সেই মহানিশায় সেই মহারাক্ষসী ঐ সকল মহাপ্রশ্ন উত্থাপিত করিলে মন্ত্রী সে সকলের প্রত্যুত্তর করিতে প্রবৃত্ত হইলেন[১]। মন্ত্রী ধীরভাবে বলিতে লাগিলেন, অয়ে তোয়দসঙ্কাশে! কেশরী যেমন মত্ত গজরাজকে বিদীর্ণ করে, তেমনি, আমিও তোমার ক্রমোক্ত প্রশ্নজাল ভেদ (মর্ম্মব্যাখ্যা) করিব, শ্রবণ কর[২]। হে পিঙ্গল-নয়নে! তোমার বাগ্‌ভঙ্গীর দ্বারা বুঝা গেল, তুমি পরমাত্মার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ[৩]। নামবর্জ্জিত, মনের, বুদ্ধির ও ইন্দ্রিয়ের অগোচর বলিয়া চিন্মাত্র পরমাত্মাই যথার্থ অণু এবং আকাশ অপেক্ষাও সুসূক্ষ্ম[৪]। যেমন বীজের মধ্যে বৃক্ষের অবস্থিতি, সেইরূপ, পরমসূক্ষ্ম চিন্ময় পরমাত্মায় এই জগৎ সৎস্বরূপে ও অসৎস্বরূপে প্রস্ফুরিত হইতেছে। (প্রলয়কালে অসৎ (অবিদ্যমান) স্বরূপে এবং সৃষ্টিকালে সৎ (বিদ্যমান) স্বরূপে[৫]। সেই যে অণু সর্ব্বাত্মক পরমাত্মা, তাহাই স্বভাবতঃ সৎস্বরূপ। এবং তদীয় সত্তার অধীনে এতজ্জগৎ সত্তা প্রাপ্ত হইয়াছে। ভাবার্থ এই যে, জগতের সত্তা (অস্তিত্ব) সাক্ষাৎ অনুভবাত্মক চিৎসত্তার অধীন। চিৎ-সত্তাই সত্তা। জগতে যে সত্তার (অস্তি, আছে, এতদ্রূপ ভাবের) উপলব্ধি হয়, সে উপলব্ধি আত্মচৈতন্যমূলক[৬]) (উঃ ১) সেই অণু বাহ্য-শূন্যত্বপ্রযুক্ত আকাশ এবং চিৎস্বরূপতাপ্রযুক্ত অনাকাশ (উঃ ২)। সেই অণু ইন্দ্রিয়ের অতীত সুতরাং সে ভাবে তাহা কিছুই নহে। অথচ সেই অণু অনন্ত বা অপরিচ্ছিন্ন স্বরূপ[৭]। সর্ব্বাত্মকত্ব প্রযুক্ত সেই চিদণু কর্তৃক সকল বস্তু ভুক্ত হয় এবং সে সকল নিগীর্ণ হইলে সেই চিৎ-নামক যৎকিঞ্চিৎ অবশেষিত থাকে। সুবর্ণে অসত্য বলয়াদির ন্যায় সেই একাদ্বয় চিদণুর প্রতিভাস অনেক উপাধিতে অনেকস্বরূপে উদিত হইয়া থাকে[৮]। এই অণুই সূক্ষ্মতানিবন্ধন অলক্ষিত ও এই অণুই পরমাকাশ। এই অণু সর্ব্বাত্মক হইয়াও মনের ও ইন্দ্রিয়ের অতীত[৯]। যেহেতু সর্ব্বাত্মক সেই হেতু তাহা শূন্য নহে। সুতরাং নাস্তিত্ব কথা আত্মাণুতে বাধিত অর্থাৎ বাস্তব নহে বা মিথ্যা। সেই আত্মাণুই বক্তা ও মন্তা[১০]।

যেমন কর্পূর লুক্কায়িত থাকে না, তেমনি, সতের সত্তাও অপ্রকট থাকে না[১১]।

সেই চিন্মাত্রাণুই মনোরূপে অবস্থিত। সে কারণ তাহা সর্ব্বস্বরূপ। চিদণু সর্ব্বস্বরূপ হইলেও ইন্দ্রিয়াতীত। সে ভাবে তাহা অতি নির্ম্মল[১২]। সেই অণুই এক ও সর্ব্বভূতের আত্মবেদন (অহংজ্ঞানের জ্ঞেয়) বলিয়া অনেক। তিনি এই ত্রিজগৎ ধারণ করিতেছেন, সে নিমিত্ত তিনি জগৎ-রত্নের কোষ[১৩]। অহে নিশাচরি! কিন্তু ত্রিজগৎ চিত্তরূপ মহাসমুদ্রের বীচী ব্যতীত অন্য কিছু নহে। সুতরাং এই জগত্রয় চিত্ত হইতে পৃথক্ নহে। যেমন দ্রবত্ব হেতু সমুদ্রে আবর্ত্তের উদয় হয়, তেমনি, চিদ্বিশিষ্টতা হেতু চিত্ত হইতেই প্রজ্ঞা ও প্রজ্ঞানুরূপ (প্রজ্ঞা=বাসনা) জগৎ উদ্ভূত হয়। সেই কারণে প্রজ্ঞার দ্বারা এই জগৎ পৃথক্ রূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে[১৪]। সেই অণু ব্যোমরূপী হইয়াও স্বীয় সম্বেদন (আত্মতত্ত্বজ্ঞান) দ্বারা লভ্য সুতরাং অশূন্য[১৫]। (উঃ ৩) তিনিই দ্বৈত সম্বেদন দ্বারা তুমি ও আমি ইত্যাদি রূপে সমুদিত হন। কিন্তু তাঁহার বোধরূপ বৃহদ্বপু উদিত হইলে তিনি আর তখন তুমি-আমি-রূপে প্রকাশিত হন না[১৬,১৭]। (উঃ ৪) এই অণু সম্বিদদ্বারা যোজন শত গমন করেন, স্বতন্ত্র ভাবে গমন করেন না। অথচ, সেই অণুর অন্তরে শত শত যোজন অবস্থিত[১৮]। দেশকালাদি সেই অণুর সত্তাস্বরূপ। সুতরাং সেই অণু দেশকালাদিরূপ স্বীয় সত্তা-কাশকোশে অবস্থান করিয়াও অনবস্থিত এবং কোথাও গমন না করিয়াও সর্ব্বত্র গত বা প্রাপ্ত[১৯]। গমনদ্বারা প্রাপ্তব্য দেশান্তর যাহার শরীরস্থ, বা এক দেশস্থ, তিনি আর কোথায় গমন করিবেন? মাতার কুচকোটরগত পুত্র, মাতা ব্যতীত আর কি দর্শন করে[২০]? যে সর্ব্বকর্ত্তা, সমস্তই যাহার অন্তঃস্থ, সে আবার কোথায় যাইবে[২১]? কুম্ভকে স্থানা-ন্তরিত করিলে যেমন আকাশের গমন উপচরিত হয়, তেমনি, আত্মাণুর গমনাগমন উপচার ব্যতীত বাস্তব নহে[২২]। তিনি জগতের সহিত একাত্মভাব প্রাপ্ত হইলেই জড়, নচেৎ চেতন। সুতরাং উভই তিনি[২৩]। (উঃ ৫-৬) অহে রাক্ষসি! যখন সেই চিদ্বপু পাষাণ সত্তা অবলম্বন করেন, তখন তিনি পাষাণভাব প্রাপ্ত হন[২৪]। (উঃ ৭) আদ্যন্ত বিব-র্জ্জিত পরমাকাশে সেই চিদ্বপুঃ পরমাত্মা কর্ত্তৃক এই বিচিত্র জগৎ চিত্রিত হইয়াছে। এই জগৎ-চিত্র মিথ্যাজ্ঞানের বিস্তৃতি সুতরাং

অকৃত[২৫]। (উঃ ৮) সংবিৎরূপ পরমাত্মাই প্রসিদ্ধ বহ্নির অস্তিত্ব সাধক (জনক)। পরমাত্মরূপ বহ্নি সর্ব্বব্যাপী অথচ অদাহক। বহ্নি যেমন প্রকাশক হয়, তেমনি, আত্মসম্বিত্তিও (চৈতন্য) সর্ব্বপ্রকাশক। সেই জন্য তাহা অদাহক বহ্নি[২৬]। (উঃ ৯) অতিনির্ম্মল ও অতিজ্বলন্ত চেতনাত্মা হইতে অগ্নি সমুৎপন্ন হয় এবং সেই একমাত্র সম্বেদনই (চেতন পরমাত্মাই) সূর্য্য চন্দ্রাদির অবিনাশী প্রকাশক। পরমাত্মার প্রভা (মহিমা,) এই জগৎ) মহাপ্রলয়পয়োদমণ্ডলীর দ্বারাও অনাবরণীয়[২৭,২৮]। (উঃ ১০) চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অতীত, হৃদয়রূপ গৃহের প্রদীপ, সমুদায় পদার্থের সত্তাপ্রদ, অনন্ত ও যৎপরোনাস্তি উৎকৃষ্টপ্রকাশ অর্থাৎ স্বয়ংজ্যোতি আত্মা। এই ইন্দ্রিয়াতিগ আত্মাণু হইতে আলোক প্রবর্ত্তিত হইয়াছে[২৯,৩০]। (উঃ ১১) যিনি লতা, গুল্ম, অঙ্কুর ও অন্যান্য নিরিন্দ্রিয় বস্তুর পুষ্টি সাধন করেন, সেই অনুভবাত্মক পরমাত্মা লতা গুল্মাদিরও উত্তম আলোক[৩১]। (উঃ ১২) কাল, আকাশ, ক্রিয়া, সত্তা, জগৎ, সমস্তই আত্মবেদনে (চৈতন্যে) অবস্থিত ও বিজ্ঞাত। সুতরাং আত্মবেদনই স্বামী, কর্ত্তা, পিতা (জনক) ও ভোক্তা[৩২]। (উঃ ১৩) যেহেতু সমস্তই আত্মা, সেই হেতু ঐ আকাশাদির অর্থাৎ সত্তার সমুদায় জগতের স্বাভাবিক অস্তিত্বের হেতু। (উঃ ১৪) সেই পরমাত্মারূপ অণু স্বীয় অণুত্ব (সূক্ষ্মতা বা দুর্লক্ষ্যতা) পরিত্যাগ না করিয়াই জগৎ রত্নের সমুদ্গক (পেটরা) বৎ হইয়াছেন[৩৩]। যেহেতু তিনি জগৎরূপ সম্পুটকে অবস্থিতি করেন, প্রতীত হন, সেইহেতু এই জগৎ সেই পরমাত্ম-মণির এবং পরমাত্মমণি এই জগতের কোষ[৩৪]। (আবরক বা আধার) (উঃ ১৫) তিনি নিতান্ত দুর্ব্বোধ্য সুতরাং তিনিই পরম সূক্ষ্ম। পরমাত্মা দুর্ব্বোধ বলিয়া তমঃ এবং চিন্মাত্র বলিয়া প্রকাশ। যেহেতু সম্বিৎরূপী, সেই হেতু তিনি আছেন। এবং যেহেতু তিনি ইন্দ্রিয়ের অলভ্য, সেই হেতু তিনি নাই[৩৫]। (উঃ ১৬) তিনিই দূরে ও নিকটে অবস্থান করেন। তিনি ইন্দ্রিয়ের অলভ্য, সুতরাং দূরে অবস্থিত। তিনি চিদ্রূপ, সুতরাং সমীপে—অতিসমীপে (হৃদয়ে) অবস্থিত[৩৬]। (উঃ ১৭) তিনি অণু হইয়াও সর্ব্বসম্বেদনতা বিধায় মহাশৈলস্বরূপ। সকলেই তাঁহাকে অহং—আমি ইত্যাকার জ্ঞানে পুরোবর্ত্তিরূপে মহাশৈলের ন্যায় জ্ঞাত হয়। এই প্রকাশমান জগৎ তাঁহারই সম্বিত্তি সুতরাং তাহারই মধ্যে (সম্বি-

ত্তির অর্থাৎ জ্ঞানের মধ্যে) সুমেরু প্রভৃতির বিদ্যমানতা অনুভূত হয়। যেহেতু পরম সূক্ষ্ম (নিতান্ত দুর্ব্বোধ্য) আত্মচৈতন্যের একাংশে মেরু মন্দরাদির বিদ্যমানতা অনুভূত হয়, সেই হেতু পরমসূক্ষ্ম পরমাত্মা অণু হইয়াও মহামেরু (মহা স্থূল) বলিয়া গণ্য[৩৭]। (উঃ ১৮) তিনি যখন নিমেষরূপে প্রতিভাসিত হন, তখন তিনি নিমেষ। যখন কল্পরূপে প্রতিভাসিত হন, তখন তিনি কল্প[৩৮]। যেমন মনোমধ্যে কোটীযোজন বিস্তৃত মহাপুর দেখা যায়, তেমনি, মনোমধ্যেই কল্পব্যাপিনী কালক্রিয়ার বিলাসও নিমেষরূপে অনুভূত হয়। যেমন অল্পায়তন মুকুর মধ্যে মহানগর প্রতিভাসিত হয়, তেমনি, নিমেষজঠরেও কল্প সমুদিত বা প্রতিভাসিত হয়[৩৯।৪০]। নিমেষ, কল্প, পর্ব্বত, নগর, সমস্তই যখন দুর্ব্বিজ্ঞেয় স্বভাব চৈতন্যের অন্তঃস্থ, তখন আর দ্বৈতই বা কি? একতাই বা কি? অর্থাৎ সমস্তই ভ্রান্তির বিজৃম্ভণ[৪১]। মনে উদিত হইলে সত্যও অসত্য এবং অসত্যও সত্য হয়। সুতরাং নিমেষও কল্প হয় এবং কল্পও নিমেষরূপে প্রতিভাত হয়। ইহার দৃষ্টান্ত স্বপ্ন[৪২]। বস্তুতঃ কাল দুঃখে সুদীর্ঘ ও সুখে অত্যন্ত অল্প বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকে। তাহার দৃষ্টান্ত—রাজা হরিশ্চন্দ্রের এক রাত্রে দ্বাদশবর্ষ অনুভূত হইয়াছিল[৪৩]। সুতরাং বুঝা উচিত যে নিমেষ, কল্প, অদূর ও দূর, এ সকল বাস্তবতঃ নাই। সমস্তই চিদণুর প্রতিভাস। সুবর্ণে হার কেয়ূরাদির ন্যায় ঐ সকল সেই সত্যাত্মায় বিরাজিত[৪৪।৪৫]। যে ভাবে চিৎ ও দেহ পরস্পর অভিন্ন, সেই ভাবে আলোক ও অন্ধকার, দূর ও অদূর এবং ক্ষণ ও কল্প অভেদ[৪৬]। (উঃ ১৯-২০) তিনি ইন্দ্রিয়গণের সার, সুতরাং তিনিই প্রকৃত প্রত্যক্ষ। তিনিই দৃষ্টির অবিষয়ীভূত সুতরাং তিনি সে ভাবে অপ্রত্যক্ষ বা অসদ্রূপ। অথবা তিনিই দৃশ্যরূপে সমুদিত হন বলিয়া প্রত্যক্ষ[৪৭]। যেমন, যাবৎ কটক জ্ঞান বিদ্যমান থাকে, তাবৎ হেম জ্ঞান থাকে না, তেমনি, যাবৎ দৃশ্যজ্ঞান থাকে, তাবৎ দর্শন (আত্মচৈতন্য) জ্ঞান থাকে না[৪৮]। যেমন কটক জ্ঞান তিরোহিত হইলেই সুবর্ণ জ্ঞান স্থায়ী হয়, তেমনি, কল্পিত দৃশ্যজালের জ্ঞান তিরোহিত হইলেই সেই একাদ্বয় পরম নির্ম্মল প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত হন[৪৯]। তিনি সর্ব্বত্বহেতুক সদ্রূপ এবং দুর্লক্ষ্যত্ব প্রযুক্ত অসদ্রূপ। (উঃ ২১) সেই আত্মা আত্মত্বরূপে চেতন এবং জগদ্রূপতা প্রযুক্ত চেতন নহেন অর্থাৎ অচেতন[৫০]। (উঃ ২২) এই বায়ুসমান চঞ্চল জগৎ চৈতন্য ব্যতীত অন্য

কিছু নহে[৫১]। যেমন প্রচণ্ড আতপের বিস্ফুরণ মৃগতৃষ্ণা, তেমনি, চৈতন্যের প্রাচুর্য্য অদ্বৈত এবং চৈতন্যের প্রচ্ছাদন জগৎ[৫২]। সূর্য্য-কিরণ যে কাঞ্চনকণা নির্ম্মাণ করে, তাহাতে যেমন অস্তি নাস্তি দ্বিভাব বিরাজিত, তেমনি, ব্রহ্মে সৃষ্টিও অস্তি নাস্তি এই দ্বিভাবে পরিচিত[৫৩]। অনেক সময়ে আকাশে কিরণ কণিকা সকলকে সুবর্ণ কণিকা বলিয়া ভ্রান্তি জন্মিতে দেখা যায়। সে ভ্রান্তির মূল অজ্ঞান। তদনুরূপে চিন্ময় আত্মাতে অজ্ঞানের বিলাসে ভ্রান্তির মহিমারূপ সৃষ্টিদর্শন হইতেছে[৫৪]।

অহে রাক্ষসি! এই জগৎ স্বপ্নদৃষ্ট, গন্ধর্ব্বনগর ও সঙ্কল্পপুরীর ন্যায় অসৎ। ইহা এক প্রকার দীর্ঘ ভ্রম ব্যতীত অন্য কিছু নহে[৫৫]। যে সকল মহাত্মা জগৎ মিথ্যাত্ব উপপাদক যুক্তিবিষয়ে পটু, পরিভাবিত ও অভ্যস্ত, সেই সকল মহাপুরুষ নির্ম্মলান্তঃকরণ হইয়া সর্ব্বত্র ব্রহ্ম দর্শন করেন[৫৬]। অজ্ঞান বিনষ্ট হওয়ায় তাঁহাদের চিদাকাশে আর মিথ্যা সৃষ্টি উদিত হয় না। যুক্তিপরিস্কৃতচিত্ত তত্বজ্ঞদিগের দৃষ্টিতে সৃষ্টি আদৌ হয় নাই এবং তাহার স্থিতিও নাই।

দৃশ্যই দর্শনের (জ্ঞানের) ভেদক। যখন দৃশ্য জ্ঞান লুপ্ত থাকে, তখন কুড্য ও আকাশ অভিন্ন হইয়া যায়। ইহা ব্রহ্মা হইতে সামান্য তৃণ পর্য্যন্ত সমুদায় জীবের অনুভূতিগম্য[৫৭,৫৮]। যেমন বীজের অন্তর্গত বৃক্ষ অতিসূক্ষ্মতা নিবন্ধন ব্যোমসদৃশ, তদ্রূপ, ব্রহ্মের অন্তর্গত জগৎও চিদেকরূপতা বিধায়ে ব্রহ্মসদৃশ সূক্ষ্ম, ইহা উক্ত সেই সেই দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝিতে হইবে[৫৯,৬১]।

অহে নিশাচরি! সেই শান্ত সর্ব্বময় অজ অনাদি ও অনন্ত দ্বন্দ্ব রহিত একমাত্র আত্মাই আভাসরূপে সর্ব্বত্র সর্ব্বপ্রকারে প্রকাশমান রহিয়াছেন। তিনি ভিন্ন আর কিছু নাই[৬২]।

* মন্ত্রী এই পর্য্যন্ত বলিয়া বিরত হইলেন। মন্ত্রীর অভিপ্রায়, রাজা অবশিষ্ট প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদান করিবেন। কেননা, রাজমর্য্যাদা রক্ষা করা মন্ত্রীর অবশ্য কর্ত্তব্য।

অশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

একাশীতিতম সর্গ।

রাক্ষসী বলিল, মন্ত্রিন্! তোমার কথিত আশ্চর্য্য পরমার্থ বাক্য শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে রাজীবলোচন রাজা অবশিষ্ট প্রশ্নের প্রত্যুত্তর দান করুন[১]।

রাজা বলিলেন, নিশাচরি! পণ্ডিতেরা যাহাকে জগৎপ্রত্যয়নিবৃত্তিরূপী উৎকৃষ্ণপ্রত্যয় (তত্ত্বজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান) বলেন * এবং যাহা সর্ব্বসঙ্কল্পপরিত্যাগরূপী বা সর্ব্বসংকল্পের বিরাম স্থল, এবং যাহা তন্মাত্রনিষ্ঠতারূপ চিত্ত পরিগ্রহের (চিত্তসংযমের) ফলস্বরূপ[২], যাঁহার মায়িক সঙ্কোচ ও বিকাশ দ্বারা জগতের প্রলয় ও সৃষ্টি সম্পাদিত হইতেছে, যিনি বাক্যের অগোচর, অথচ বেদান্ত বাক্যের নিষ্ঠা (তাৎপর্য্য), যিনি অস্তি নাস্তি উভয়ের মধ্যবর্ত্তী অথচ উক্ত উভয় যাহার স্বরূপে সন্নিবিষ্ট, এই চরাচর জগৎ যাঁহার চিত্তময়ী লীলা এবং বিশ্বাত্মা হইলেও যাঁহার অপরিছিন্নতা অলুপ্ত, আমি মনে করিতেছি, তুমি সেই শাশ্বত ব্রহ্মের কথাই বলিতেছ[৩।৫]। হে ভদ্রে! উক্ত শাশ্বত ব্রহ্ম পরম সূক্ষ্ম বলিয়া অণু। এবং উক্ত ব্রহ্মাণু আপনাকে বায়ুভাবে দর্শন করিয়া মায়ার বিবর্ত্তনে বায়ু হইয়াছেন। সেইজন্য তাহা অন্যথাগ্রহরূপ (গ্রহ=জ্ঞান) ভ্রান্তির মহিমা। সুতরাং পরমার্থ দর্শনে তিনি অবায়ু ও ভ্রান্তিদর্শনে তিনি বায়ু। যাহা বায়ু, বস্তুতঃ তাহা শুদ্ধ চেতন ব্যতীত বস্ত্বন্তর নহে[৬]। (উঃ ২৩) সেইরূপ, তিনিই শব্দসংবেদন দ্বারা শব্দ এবং তাহা ভ্রান্তিদর্শনমূলক বলিয়া শব্দ নহে। অর্থাৎ পরমার্থ দর্শনে তিনি অশব্দ। অশব্দ অর্থাৎ শব্দের দ্বারা অবোধ্য। (উঃ ২৪) অপিচ, সেই

* জগৎপ্রত্যয়=জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, এই অবস্থাত্রিতয় বিষয়ক বোধ। অর্থাৎ দ্বৈত বিজ্ঞান। তাহার নিবৃত্তি=তত্ত্ববোধ বা তত্ত্বজ্ঞান। অথবা অদ্বয় আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার। এই অদ্বয়াত্মসাক্ষাৎকার শাস্ত্রে পরপ্রত্যয় ও উৎকৃষ্টপ্রত্যয় প্রভৃতি নামে পরিভাষিত হইয়াছে। অপিচ, তাহাই এতন্মতের ব্রহ্মতত্ত্ব এবং তাহাই সর্ব্বসঙ্কল্পের তিরোধানের পর অর্থাৎ সমুদায় চিত্তবৃত্তি নিরোধের পর প্রতিষ্ঠিত হয়।

অণু সর্ব্বস্বরূপ অথচ তাহা কিছুই নহে। কিছুই নহে কথার অর্থ—ভেদ-বর্জ্জিত, অথবা অদ্বৈত। (উঃ ২৫) ঐরূপ, অহম্ভাবতা নিবন্ধন তিনি অহং এবং অহম্ভাববিহীনতাপ্রযুক্ত তিনি নাহং। (উঃ ২৬) অপিচ তিনিই বাস্তব ও অবাস্তব বৈচিত্র্যের কারণ ও সর্ব্বশক্তিমান। তাঁহারই আবিদ্যাক ভ্রান্তিপ্রতিভা অবাস্তবের ও স্বাভাবিকপ্রতিভা বাস্তবের কারণ[৭,৮]। সেই আত্মা যত্নশতদ্বারা প্রাপ্য, এবং তিনি অহংরূপে লব্ধ থাকিয়াও প্রকৃত পক্ষে অলব্ধ। তাঁহাকে লাভ করিলেও উক্তরূপে লাভ করা লাভ না করা বলিয়া গণ্য হয়[৯] *। (উঃ ২৭) যাবৎ না মূলাজ্ঞাননাশক বোধ উদিত হয় তাবৎ জন্ম বসন্ত ও সংসার লতা বিকশিত হইবেই হইবে। যে অণু-ব্রহ্মের আকার চিৎসত্তা বলিলাম, সে অণু সাকারভাব প্রাপ্তির পর দৃশ্যতুল্য হইয়াছে। সেই জন্য বলা যায়, তিনি স্বস্থ ও জীবিত থাকিয়াও আত্মহারা[১০,১১]। (উঃ ২৮) এই সম্বিদাণুই (সূক্ষ্ম চিদ্ব্রহ্মই) ত্রিভুবনকে তৃণতুল্য ও সুমেরুকে ক্রোড়ীকৃত করিয়াছেন। (উঃ ২৯) সেই বিমল সংবিদ্ বাহ্যে ও অন্তরে আপনাকে মায়াময়রূপে অবলোকন করেন[১২]। বস্তুতঃই চিদণুর অন্তরে যে যে দৃশ্য বিদ্যমান, বাহিরেও সেই সেই দৃশ্য বিদ্যমান। ইহার দৃষ্টান্ত—অনুরাগীদিগের সাঙ্কল্পিক অঙ্গনালিঙ্গন[১৩]। সৃষ্টির আদিতে সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন নিত্য চিৎ যেরূপে সমুদিত হন, উদয়ের পরেও তিনি তদ্রূপেই পরিদৃষ্ট অথবা পরিলক্ষিত হন। তাঁহার সেই প্রাথমিক সংকল্প নিয়তি নামে খ্যাত[১৪]। চিৎ যখন যে ভাবে আবির্ভূত হন তিনি তখনই সেই বিষয়ই দেখেন, তাহার অন্যথা হয় না। শিশুদিগের মনঃ উক্ত বিষয়ের অন্যতম উদাহরণ[১৫]। সূক্ষ্মতম চিদণুর দ্বারা শতযোজনের কথা দূরে থাকুক, সমস্ত বিশ্ব পরিপূরিত হইয়া আছে[১৬]। (উঃ ৩০) উক্ত অণু সর্ব্বগামী, অনাদি ও রূপাদি বিহীন, অথচ তাহা লক্ষ লক্ষ যোজনেও মিত হয় না। অর্থাৎ ধরে না[১৭]। (উঃ ৩১) যেমন ধূর্ত্ত লম্পট পুরুষেরা অপাঙ্গবিক্ষেপণাদির দ্বারা যুবতী দিগকে বশীভূত করে, তেমনি, শুদ্ধ চিদালোক (চিদাত্মা) উপাধিচেষ্টানুসারে (উপাধি=মন ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি তদ্দ্বারা) এই পর্ব্বতাদি

* কেননা, উক্ত প্রকারের লাভ মোক্ষ কারণ নহে। জ্ঞান দ্বারা মোক্ষ কারণ অদ্বৈত লাভ করা অত্যন্ত দুষ্কর। আত্মাদ্বৈত সাক্ষাৎকার ব্যতীত মোক্ষ নাই। সুতরাং ব্রহ্ম আছেন, এই মাত্র জানা না জানার সহিত সমান।

ও তৃণাদি শালী জগৎকে নর্ত্তিত করিতেছে[১৮।১৯]। (উঃ ৩২) সেই অনন্ত অণু ব্রহ্ম (সূক্ষ্ম অর্থাৎ দুর্বিজ্ঞেয় পরমাত্মা) স্বীয় সম্বিদ্ দ্বারা বস্ত্রের ন্যায় মেরু প্রভৃতিকে বেষ্টন করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন[২০]। (উঃ ৩৩) * এই অণু দিক্কালাদির দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, সুতরাং সুমেরু মহা শৈল অপেক্ষাও বৃহৎ এবং মনোরূপী বা জীবরূপী বলিয়া সূক্ষ্ম। (উঃ ৩৪) তিনি উক্তপ্রকারে বৃহৎ বলিয়া স্থূলতরাকৃতি ও উচ্চ এবং জীব বলিয়া কেশাগ্রের শত ভাগের এক ভাগ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম। অর্থাৎ দুর্লক্ষ্য[২১]।

হে রাক্ষসি! যেমন মেরুর সহিত সর্ষপের তুলনা হয় না, তেমনি, সেই শুদ্ধ সংবেদন স্বরূপ আকাশাত্মা পরমাত্মার সহিত পরমাণু তুলিত হইতে পারে না। তবে যে, তাঁহাতে অণু ও পরমাণু শব্দের প্রয়োগ করা হয়, তাহা গৌণ প্রয়োগ, মুখ্য নহে। পরমাণু নিতান্ত দুর্লক্ষ্য, পরমাত্মাও নিতান্ত দুর্লক্ষ্য। সেই ভাবে অপরিচ্ছিন্ন পরমাত্মায় পরিচ্ছিন্নতম পরমাণু ও অণু শব্দ প্রয়োজিত হয়[২২]। মায়াই পরমাত্মায় অণুত্ব সৃজন করিয়াছে। মায়ার তাদৃশী সৃষ্টি অবিরুদ্ধ। যেমন সুবর্ণে বলয়ের সৃষ্টি, তেমনি, পরমাত্মায় নানাত্বের সৃষ্টি[২৩]। (উঃ ৩৫) অভিহিত পরমাত্মদীপ আলোক অন্ধকার উভয়েরই প্রকাশক। কেননা, আত্মা ব্যতীত অন্য কাহারও স্বাতন্ত্র্যে প্রকাশসামর্থ্য নাই। অপিচ, কোনও কালে আত্মপ্রকাশের অভাব নাই। আছে বলিতে গেলে "আমি নাই" বলিতে হয়। চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি, সমস্তই জড়, সুতরাং আত্মার অভাবে সমুদায় পদার্থের নাস্তিত্ব ও আত্মার অস্তিত্বে সমুদায়ের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করিতে হয়। পরন্তু আত্মার অভাব প্রমাণ ও অনুভব উভয় বিরুদ্ধ। যাহা শুদ্ধ ও কেবল সৎ, তাহাই আত্মা। তাহাতে যে চিত্ত অবস্থিতি করিতেছে, আত্মা তাহারই দ্বারা অন্তরে ও বাহিরে আলোক ও অন্ধকারের কল্পনা করেন[২৪।২৬]। সূর্য্যের, চন্দ্রের ও বহ্নির তেজ তেজস্বে ভিন্ন নহে। ভিন্নতা বর্ণে। অর্থাৎ রঙ্গের প্রভেদ[২৭]। অপিচ, উহারা সকলেই জড় সুতরাং উহারা কোন কিছুর প্রকাশক নহে। কজ্জল বর্ণ নিবিড় নীহার (বাষ্প)ই মেঘ। অতএব, মেঘের ও নীহারের যদ্রূপ প্রভেদ,

* বস্ত্র ঘটিত করিয়া তন্মাত্রে পর্ব্বত চিত্রিত করে। সেই চিত্রিত পর্ব্বতকে বস্ত্র বেষ্টিত বলা যাইতে পারে। বস্ত্র গুটাইলে তন্মধ্যে চিত্রিত পর্ব্বত অবস্থিতি করে। চিত্রিত পর্ব্বত যেমন মিথ্যা, আত্মচৈতন্যে চিত্রিত জগৎব্রহ্মাণ্ডও তদ্রূপ মিথ্যা।

আলোকের ও অন্ধকারের বস্তুতঃ সেই রূপই প্রভেদ। অধিক কি বলিব, সমুদায় জড়ের উপলব্ধির অর্থাৎ প্রকাশের নিমিত্ত একমাত্র চিদ্রূপ মহান্ সূর্য্য নিত্য বিদ্যমান রহিয়াছেন। তিনিই ঐ সকলের অস্তিত্বাদি প্রমাণিত করিতেছেন। তিনি না থাকিলে ঐ সকল থাকিত না[২৮।২৯]। সেই চিৎস্বরূপ আদিত্য আলস্য পরিহীন হইয়া দিবারাত্র সমান সর্ব্বত্র এমন কি প্রস্তর মধ্যেও আলোক প্রদান করিতেছেন[৩০]। তাঁহারই কর্ত্তৃক ত্রিলোক প্রকাশিত হইতেছে। চৈতন্যের প্রকাশ সর্ব্বত্র বিদ্যমান। এখনও তাহা দুর্লভ নহে। এমন কি, শিলোচ্চয়ের অভ্যন্তরেও তদীয় প্রকাশ বিদ্যমান রহিয়াছে। এই দেহ যৎপরোনাস্তি তমঃ। অথচ চৈতন্যালোক ইহাকে বিনাশ করেনা, অধিকন্তু গ্রহণ অর্থাৎ প্রকাশ করে। প্রথমে ইহাকে (দেহকে), পরে জগৎকে প্রকাশ করে। যদ্রূপ প্রতাপশালী সূর্য্য কর্ত্তৃক পদ্ম ও উৎপল প্রকাশিত (বিকশিত) হয়, তদ্রূপ, চিত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ ও তমঃ উভয়ই প্রকাশিত হয় (আছে বলিয়া অবধারিত হয়)। সূর্য্য অহোরাত্র সৃজন করিয়া স্বীয় আকৃতি প্রদর্শন করেন, সেইরূপ চিৎসূর্য্যও সৎ ও অসৎ অবভাসিত করিয়া স্বকীয় স্বরূপ (আকৃতি) প্রদর্শন করেন[৩১।৩৪]। (উঃ ৩৬) যেমন বসন্তশ্রীর (বাসন্তী শোভার) মধ্যে পত্রফলপুষ্পাদির শোভা নিবিষ্ট থাকে, তেমনি, প্রোক্ত চিদণুর অন্তরেই সমস্ত অনুভব (জ্ঞানকণা বা বৃত্তিজ্ঞান) বিদ্যমান রহিয়াছে। (উঃ ৩৭) যেমন বসন্ত ঋতুর উদয়ে সৌন্দর্য্যপরম্পরা সমুদিত হয়, সেইরূপ, সমস্ত অনুভবই চিদণু হইতে সমুদিত হয়[৩৫।৩৬]। সেই পরমাত্মাণু রসাদি বিহীন, সুতরাং নিঃস্বাদু, অথচ তাহা হইতে সমগ্র স্বাদুসত্তার আবির্ভাব হয়। সুতরাং তিনি স্বয়ং নিঃস্বাদু হইয়াও স্বাদ গ্রহণ করেন বা স্বাদ বিজ্ঞাত হন[৩৭]। যে কোন রস, সমস্তই জলে অবস্থিত। সুতরাং জলই রসস্বরূপ। তাদৃশ জল আবার আত্মমূলক; সুতরাং মূল রস আত্মা (উঃ ৩৮) সেই চিৎপরমাণু সর্ব্বত্যাগী অথচ সকল পদার্থে অবস্থিত। সেই জন্য বলা যায়, সমগ্র জগৎ তাঁহারই আশ্রিত। তাঁহার অস্ফুরণে জগতের অভাব এবং স্ফুরণে জগতের ভাব পরিত্যাগ হয়। সুতরাং তাঁহারই স্ফুরণ সকল পদার্থের আশ্রয়[৩৮।৩৯]। (উঃ ৩৯) তিনি আপনাকে গোপন করিতে অসমর্থ হইয়া চিত্তরূপ অণু বিস্তার করতঃ তদ্দ্বারা এই জগৎ আচ্ছাদন করিয়া

রাখিয়াছেন। যদ্রূপ হস্তী দূর্ব্বাক্ষেত্রে আত্মগোপন করিতে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ, আকাশাত্মা পরব্রহ্মও কোনও স্থলে আত্মগোপন করিতে সমর্থ নহেন[৩৭।৪১]। (উঃ ৪০) যদ্রূপ বাসন্তী রসের উদ্বোধে বনাবলী বিচিত্র শ্রীসম্পন্ন হয়, তদ্রূপ, এই জগৎ প্রলয়পরিলীন হইলেও সেই চিৎপরমাণু অবলম্বনে সজীব (পুনরুত্থানযোগ্য) থাকে। বস্তুতঃই বসন্ত-রসোদ্বোধে বনখণ্ডের উল্লাসের ন্যায় একমাত্র চিত্তসত্ত্বা দ্বারা জগৎ সর্ব্বদা সমুদিত হইয়া থাকে। যেমন পল্লব ও গুল্ম বসন্তকালীন রস হইতে ভিন্ন নহে, তদ্রূপ, এই জগৎকে তুমি সেই চিন্ময় হইতে অভিন্ন বলিয়া জানিবে[৪২।৪৫]। (উঃ ৪১) চিদ্বপুঃ পরমাত্মা সর্ব্বভূতের (প্রাণীর) সার (আত্মা) বলিয়া সহস্রকরলোচন, এবং যৎপরোনাস্তি সূক্ষ্ম বলিয়া অন-বয়ব[৪৬]। (উঃ ৪২) সেই চিদণু নিমেষও বটে এবং কল্পও বটে। স্বপ্নদৃষ্ট বার্দ্ধক্য ও বাল্য যদ্রূপ, নিমেষ, মহাকল্প, ও কোটীকল্প তদ্রূপ[৪৭]। * অভুক্ত ব্যক্তির "আমি ভোজন করিয়াছি" এতদ্রূপ ব্যর্থ জ্ঞানের ন্যায় এবং ভোজন না করিয়াও "আমি ভোজন করিলাম" এতদ্রূপ জ্ঞান-শালীর জ্ঞানের ন্যায় এবং স্বপ্নানুভূত মরণ জ্ঞানের ন্যায় নিমেষকেও কল্প বলিয়া অবধারণ হইয়া থাকে[৪৮।৫০]। (উঃ ৪৩) প্রলয়কালে এই জগজ্জাল চিদাত্মরূপ পরমাণুতে অবস্থিত থাকে। বীজে বৃক্ষাবস্থানের ন্যায় সমুদায় জগৎ সেই চিৎ পরমাণুতে অবস্থান করে। যাহাতে যাহা থাকে, তাহা হইতেই তাহা আবির্ভূত হয়। বিকার (বিকৃতি) সাবয়ব পদার্থেই দৃষ্ট হয়, নিরাকার বা নিরবয়ব পদার্থে নহে[৫১]। (উঃ৪৪) এই সমুদায় ভূত (যাহা হয় তাহা ভূত) বৃক্ষ যেমন বীজে অবস্থান করে, সেইরূপ, চিৎ পরমাণু মধ্যে ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই কালত্রয় বিশিষ্ট জগৎ অবস্থিতি করে[৫২,৫৩]। তণ্ডুল যেমন তুষ দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে, তেমনি, নিমেষ ও কল্প, উভয়ই অণু আত্মার এক-দেশ আশ্রয় করতঃ তদ্বেষ্টিত রূপে অবস্থিত রহিয়াছে[৫৪]। (উঃ ৪৫-৪৬) আত্মাণু উদাসীনবৎ অবস্থান করেন কিছুতেই সংস্পৃষ্ট হন না, অথচ স্বমায়ায় ভোক্তৃত্ব ও কর্তৃত্ব অর্জ্জন করতঃ সর্ব্বজগতের কর্ত্তা হন[৫৫]। আত্মরূপ পরমাণু হইতেই জগৎ সমুদিত হয় পরন্তু যাহা বিশুদ্ধ চিৎ

* লীলোপাখ্যানে এই বিষয় উত্তম রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।

তাহা ভোগসম্বন্ধরহিত হইয়াই অবস্থিতি করে। ফলতঃ পরমার্থ দৃষ্টিতে তিনি জগতের কর্ত্তা ও ভোক্তা নহেন। অপিচ, ইহার কিছু মাত্র বিলীন হয় না। ইহা সেই চিতের ব্যবহার দৃষ্টি * মাত্র। (উঃ ৪৭) হে নিশাচরি! জগত্ব হেতুক তিনি "ঘনচিৎ" এই উপশব্দে (নামে) ব্যবহৃত হন। সেই চিদণু দৃশ্যভোগসিদ্ধির নিমিত্ত স্বসংস্থিত আন্তরিক চিচ্চমৎকৃতিকে বাহ্যরূপে ধারণ পূর্ব্বক নেত্র বিহীন হইয়াও তাহা দর্শন করিয়া থাকেন[৫৬।৫৯]। (উঃ ৪৮)

হে রাক্ষসি! ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছু না থাকিলেও সাধক দিগের শিক্ষার নিমিত্ত "অন্তঃস্থ" "বহিষ্ঠ" ইত্যাদি ইত্যাদি কথা পরিকল্পিত হয়[৬০]। বস্তুতঃ পূর্ণস্বভাব পরমাত্মায় পদার্থান্তরের অবস্থান অসম্ভব। সুতরাং বুঝা উচিত যে, তিনিই দ্রষ্টা এবং তিনিই দৃশ্য। অর্থাৎ আপনিই আপনাকে দর্শন করিতেছেন অথচ নিজে অখণ্ডিত অর্থাৎ অপরিছিন্ন। (উঃ ৪৯) হে নিশাচরি, পরমাত্মাতে কিছুই বিস্তৃত হয় না। সুতরাং তিনি বাস্তব দ্রষ্টৃত্ব ও দৃশ্যত্ব প্রাপ্ত হন না[৬১।৬২]। আত্মচৈতন্যই প্রকৃত লোচন, চক্ষুঃ তাহার দ্বার মাত্র। সেই চেতনরূপ দৃষ্টি বাসনা-ভাররহিত স্বায় বপুকে দৃশ্যরূপে কল্পনা করতঃ দ্রষ্টৃরূপে সমুদিত হন[৬৩]। যেমন পুত্র ব্যতিরেকে পিতৃতা ও দ্বিত্ব ব্যতিরেকে একত্ব সম্ভাবিত হয় না, তেমনি, দ্রষ্টৃতা ব্যতিরেকে দৃশ্যতা কদাচ সম্ভাবিত হয় না। যেমন পিতা ব্যতিরকে পুত্র ও ভোক্তা ব্যতিরেকে ভোগ্য সম্ভাবিত নহে, তেমনি, দ্রষ্টৃতা ব্যতিরেকে দৃশ্যতাও সম্ভাবিত নহে[৬৪।৬৫]। (উঃ ৫০) সুবর্ণ শক্তির দ্বারা বিনির্ম্মিত কটকাদির ন্যায় চিৎ শক্তির দ্বারা দ্রষ্টা ও দৃশ্য পরিনির্ম্মিত হয়। সুবর্ণই কটক নির্ম্মাণ করে, কটক সুবর্ণ নির্ম্মাণ করে না[৬৬]। দৃশ্য সকল জড়ত্ব হেতু দ্রষ্টৃ নির্ম্মাণে সমর্থ নহে। যেমন সুবর্ণে কটকভ্রম হয়, তেমনি, চিৎই জগদ্ভাব প্রকাশন-সমর্থতা প্রযুক্ত মোহের কারণীভূত অসৎ দৃশ্যকে সৎস্বরূপে আরোপিত অর্থাৎ কল্পনা করিয়া থাকে। কটকতা অবভাসিত হইলে যেমন হেমের হেমত্ব থাকে না, তদ্রূপ, দৃশ্যতা অবভাসিত হইলে দ্রষ্টৃবপুঃ প্রকাশিত হয়

---

* চিৎচমৎকৃতি—অর্থাৎ চৈতন্যব্যাপ্ত মায়া শক্তি। সেই মায়া শক্তি বাহ্যিকরূপে অর্থাৎ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডরূপে বিস্তৃত হইয়াছে। ঐন্দ্রজালিক ব্যাপারের ন্যায় প্রতিভাসিত হইতেছে। ফলিতার্থ—দৃশ্যপ্রপঞ্চ স্বপ্ন ভ্রান্তির ন্যায় মায়িক ভ্রান্তির মহিমা মাত্র।

না। কিন্তু কটকসংবিত্তিকালেও কাঞ্চন কাঞ্চনভাবেই অবস্থিতি করে, এবং দ্রষ্টার দৃশ্যভাবে অবস্থান কালেও তাঁহার দ্রষ্টৃভাব বিদ্যমান থাকে। বস্তুতঃ দ্রষ্টা ও দৃশ্য এই দুই সত্তার অন্যতর সত্তা অবভাসিত হইলে তৎকালে কদাচ উভয়সত্তা প্রতিভাসিত হয় না। যেমন পুরুষজ্ঞান নিশ্চয় হইলে তৎকালে তাহাতে আর পশুজ্ঞানের সম্ভাবনা থাকে না[৭।১১], সেইরূপ, যৎকালে বলয়জ্ঞান না থাকে, তৎকালে হেমের অকটকতা অর্থাৎ কেবল হেমত্ব প্রতিভাসিত হয়। উক্ত দৃষ্টান্ত অগ্রসর করিয়া বুঝিতে হইবে যে, দৃশ্যবোধ বিগলিত হইলে দ্রষ্টৃসত্তাই ভাসমান থাকে[১২।১৩]। সেই চিদ্বপুঃ আত্মা দ্রষ্টা হইয়া দৃশ্য দর্শন করেন। দৃষ্টৃত্ব কালে দৃশ্যতা দর্শন অবশ্যম্ভাবী। অপিচ, দৃশ্য সকল দ্রষ্টাতেই অব-ভাসিত হয়। যদি দৃশ্যজ্ঞান বিগলিত হয় তবে অহং দ্রষ্টা—আমি দেখি-তেছি, এ জ্ঞানও বিলুপ্ত হয় এবং অহং দ্রষ্টা, এ জ্ঞান লুপ্ত হইলেও ইহা আমি দেখিতেছি, এ জ্ঞানও বাধিত হয়। অর্থাৎ লুপ্ত হয়। যে কালে দৃশ্য ও দ্রষ্টৃজ্ঞান তিরোহিত হয়, সে কালে (সমাধিকালে) বাক্য পথাতীত স্বস্থতত্ত্ব অবশেষিত হয়। অর্থাৎ মাত্র তাহাই থাকে। দীপ যেমন স্ব-পরপ্রকাশক, অর্থাৎ আপনাকে ও দৃশ্য বস্তুকে প্রকাশ করে, তেমনি, সেই চিদ্বপুঃ পরমাত্মাও আপনাকে, স্বনিষ্ঠদৃষ্টৃত্বজ্ঞানকে ও দৃশ্যকে অবভাসিত করিতেছেন। অধিক কি বলিব, সেই চিন্ময় আত্মাণু কর্ত্তৃক এ সমস্তই সুসম্পন্ন হইতেছে[১৪।১৬]। প্রমাতৃত্ব, প্রমাণত্ব ও প্রমেয়ত্ব, এই তিনই অসৎ ও আগন্তুক। সেইজন্য তত্ত্বজ্ঞান ঐ তিন জ্ঞানকে (প্রভেদবিজ্ঞানকে) গ্রাস করে[১৭]। যেমন কোনও ভৌতিক পদার্থ জলভূম্যাদি পদার্থ হইতে ব্যতিরিক্ত নহে, সেইরূপ, সেই স্বতঃসিদ্ধ অণু (আত্মা) হইতে কোনও পদার্থ ব্যতিরিক্ত নহে[১৮]। যে হেতু তিনি সর্ব্বগামী ও সর্ব্বানুভবরূপী, সেই হেতু একত্বানুভবরূপ যুক্তিতে আত্মা-দ্বৈত নিরূঢ় হইয়া থাকে[১৯]। (উঃ ৫১) তাঁহারই ইচ্ছায় ইচ্ছানুরূপ প্রভেদ সম্পন্ন হইতেছে। তরঙ্গ যেমন জলরাশি হইতে অপৃথক্, তেমনি, এ সমস্তই তদীয় ইচ্ছা হইতে অপৃথক্। (উঃ ৫২) এবং তাঁহারই ইচ্ছায় অর্থাৎ মায়ার দ্বারা এ সকল সলিল রাশি হইতে তরঙ্গ মালার পার্থক্যের ন্যায় পৃথক্ বলিয়া প্রতীত হয়[৮০]। (উঃ ৫৩) কেবল অর্থাৎ অনবচ্ছিন্ন এক পরমাত্মাই আছেন। এবং তিনি সকলের আত্মা ও

স্বতঃসিদ্ধ ও সাক্ষাৎ অনুভূতি[৮১]। তিনি সর্ব্বভূতের চেতন ও দর্শনের (চক্ষুরাদির) অগোচর এই নিমিত্ত তিনি সৎ ও অসৎ। চেতন ভাবে সৎ এবং ইন্দ্রিয়াগোচরভাবে অসৎ। চিদ্রূপী বলিয়া তিনিই অসতের প্রকাশক। (উঃ ৫৪) অপিচ, উক্ত মহান্ আত্মায় দ্বিত্ব ও একত্ব উভয়ই উক্ত প্রকারে বিদ্যমান। পরন্তু বিবেচ্য এই যে, যদি দ্বিতীয় থাকে, তবে একত্ব সিদ্ধ হয়। কেননা, দ্বিত্ব ও একত্ব আতপ ও ছায়ার ন্যায় পরস্পর পরস্পরের সাধক[৮২।৮৩]। উক্ত নিয়মের ফল এই যে, যখন দ্বিত্ব নাই তখন একত্বও নাই। অপিচ, একত্বের অসিদ্ধিতে উভয়ের অসিদ্ধতা সর্ব্ববাদিসিদ্ধ। যাহা তত্ত্ব তাহা দ্বৈত ও অদ্বৈত উভয় ধর্ম্ম বিবর্জ্জিত। যাহা উক্ত উভয় ধর্ম্ম বিবর্জ্জিত হইয়াও উক্ত উভয় ধর্ম্মীর ন্যায় অবস্থিত আছে, তাহা তদবভাসিত দ্বৈতাদ্বৈত হইতে অপৃথক্। যেমন দ্রবত্ব জল হইতে অপৃথক্, সেইরূপ[৮৪।৮৫]। (উঃ ৫৫) যেমন বীজের মধ্যে বৃক্ষের অবস্থিতি, তেমনি, ব্রহ্মের অন্তরে (একাংশে) ত্রিজগতের অবস্থিতি[৮৬]। বলয় যেভাবে সুবর্ণ হইতে পৃথক্, দ্বৈতও সেই ভাবে অদ্বৈত হইতে পৃথক্। তত্ত্ববোধ উদিত হইলে দ্বৈতভাব সৎ বলিয়া অনুভূত হয় না[৮৭]। বস্তুতঃ, যেমন দ্রবতা সলিল হইতে, স্পন্দন বায়ু হইতে ও শূন্য ব্যোম হইতে পৃথক্ নহে, তেমনি, দ্বৈতও অদ্বয় ঈশ্বর হইতে ভিন্ন নহে[৮৮]। ইহা দ্বৈত ইহা অদ্বৈত এতদ্রূপ জ্ঞান দুঃখের প্রকৃত কারণ। যাহা উভয়ভাববর্জ্জিত সুতরাং কেবল সত্তা, শাস্ত্রকারেরা তাহাকেই পরম বলেন[৮৯]। উক্ত পরম ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এই তিন কালের কোনও কালে অনবস্থিত নহেন। তাদৃশ সর্ব্বসাক্ষিচিদাত্মরূপ পরমাণুতে দ্রষ্টা, দর্শন, ও দৃশ্য, সমস্তই কল্পিত জানিবে। যেমন, পবনাঙ্গে স্পন্দন, তেমনি, এই জগৎরূপ অণু (ক্ষুদ্র পদার্থ) পরমাত্মাণুর অঙ্গে (একাংশে) বিস্তৃত এবং উপসংহৃত হইতেছে[৯০।৯১]। (উঃ ৫৬) অহো! মায়া কি ভীষণা! মায়ার কি আশ্চর্য্য শক্তি! পরমাণুর (সূক্ষ্ম চৈতন্যের) অন্তরে ত্রিজগৎ, ইহা সামান্য আশ্চর্য্যের বিষয় নহে[৯২]। অহো! আশ্চর্য্য! বাস্তব সত্তা না থাকিলেও চিৎপরমাণুতে জগতের অবস্থান। অথবা অসম্ভব নহে। মায়ার দ্বারা সমস্তই সুসম্ভব হয়। ত্রিজগৎ কি? ত্রিজগৎ এক প্রকার বৃহৎ ভ্রম। এমন কিছুই নাই, যাহা ভ্রমের অপ্রদর্শনীয়। (উঃ ৫৭) যেমন ভাণ্ডস্থ বীজে বৃহৎ বৃক্ষের

অবস্থান, তেমনি, চিদণুর অন্তরে জগতের অবস্থান[৯৩।৯৪]। বৃক্ষ যেমন বীজকোটরে শাখা, পল্লব, ফল ও পুষ্প সহ বৃক্ষে অবস্থিতি করে, তদ্রূপ, চিদণুর উদরে জগৎ অবস্থিতি করিতেছে[৯৫]। সেই জন্য তাহা কেবল যোগিদিগেরই দৃষ্টি গোচর হয়। বৃক্ষ আপনার পত্র পুষ্পাদি সমন্বিত বপুঃ পরিত্যাগ না করিয়া বীজমধ্যে অবস্থিতি করে, জগৎও আপনার দ্বৈতাদ্বৈতরূপ অপরিত্যাগে চিৎপরমাণুর অন্তরে অবস্থিতি করে[৯৬]। (উঃ ৫৮) চিৎপরমাণুর অন্তরস্থিত দ্বৈতরূপ জগৎকে যিনি অদ্বৈতরূপে দেখেন, তিনিই যথার্থ দেখেন[৯৭]। বস্তুতঃ দ্বৈত বা অদ্বৈত দুএর কিছুই তত্ত্ব নহে। ইহা জাতও নহে, অজাতও নহে[৯৮]। ইহার বিদ্যমানতাও নাই, অবিদ্যমানতাও নাই। ইহা প্রশান্তও নহে, ক্ষুব্ধও নহে। আকাশ ও বায়ু প্রভৃতি জগৎ চিদণুর অন্তরে বিদ্যমান নাই[৯৯]। একমাত্র শুভ চিৎই বিদ্যমান আছে, আর সব তুচ্ছ অর্থাৎ নাই। সর্ব্বাত্মিকা চিৎ যখন যেখানে যেরূপ সৃষ্টিপ্রভার দ্বারা সমুদিতা হন, তখন সেস্থানে তিনি সেই রূপেই ব্যবহার প্রাপ্ত হন[১০০]। এই পরমাত্মারূপ পরমাণু অনুদিতস্বভাব হইয়াও প্রতিভাসক্রমে (মায়িক প্রচ্ছাদনে বা প্রতিবিম্বনে) সৃষ্টিস্বরূপে উদিত হইয়া থাকেন। ইনি প্রপঞ্চরহিত ও একাত্মা হইয়াও সর্ব্বাত্মকস্বরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। সেই পরম তত্ত্বই এই জগৎ রূপে সমুদিত হইয়া জন্মমরণাদির বশীভূত হইতেছেন। হে নিশাচরপুত্রি! সেই পরম তত্ত্ব এই জগৎভঙ্গীতে প্রকটিত। সে তত্ত্ব ত্যাগাত্যাগরূপী। অসঙ্গস্বভাব বলিয়া সর্ব্বত্যাগী এবং সর্ব্বগত বলিয়া সর্ব্ব অত্যাগী। সে তত্ত্ব স্বভাবতঃ নির্ব্বিকার[১০১।১০৩]। পরমাণুর নিকট মৃণালতন্তু মহামেরু। কেননা, মৃণাল তন্তু দেখা যায়, পরমাণু দেখা যায় না। সুতরাং সেভাবে তাহা মহামেরু। আবার আত্মার নিকট পরমাণু মহামেরু। কেননা, পরমাণু দৃষ্টির অগোচর থাকিলেও বুদ্ধিগম্য; কিন্তু পরমাত্মা সেরূপ নহেন। পরমাণু অপেক্ষা সুদুর্লক্ষ্য পরমাত্মারূপ পরমাণু মধ্যে শত শত মেরু মন্দরাদি ভূধর অবস্থিত রহিয়াছে[১০৪।১০৫]।

হে রাক্ষসি! একমাত্র সেই শ্রেষ্ঠ পরমাণুই সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন, এবং তৎকর্তৃক এই জগৎ বিস্তৃত, বিরচিত, কৃত ও তাহা হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে। এই বিরচিত বিশ্বপ্রপঞ্চ আকাশে গন্ধর্ব্ব

নগরের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। ইহা বিবিধ বিচিত্র হইলেও শূন্য ব্যতীত অন্য কিছু নহে। সচ্চিদানন্দ সুন্দর দ্বৈতহীন ক্ষুদ্র জগৎ উক্ত প্রকারে পরমার্থপিণ্ডরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে১০৩।১০৭।

একাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

দ্ব্যশীতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, নিশাচরী কর্কটী কিরাতরাজ সকাশে আপন প্রশ্নের সদুত্তর পাইয়া ব্রহ্মপদপ্রচ্যুতিকারক সংসার চাপল্য পরিত্যাগ করিল[১]। এবং সন্তাপশূন্যা হইয়া যেমন বর্ষাগমে ময়ূর ও কৌমুদীসমাগমে কুমুদ্বতী অন্তঃশীতলতা প্রাপ্ত হয় সেইরূপ অন্তঃশীতলতা ও পরম বিশ্রান্তি পদ লাভ করিল[২]। যেমন মেঘরব শ্রবণে বকীর আনন্দোদয় হয়, রাজার তদ্বিধ বচনপরম্পরা শ্রবণে নিশাচরীর সেইরূপ আনন্দোদয় হইল[৩]। তখন সে কহিল, হে ধীরদ্বয়! এখন বুঝিলাম, আপনাদিগের বুদ্ধি অতি পবিত্র ও সারসম্পন্ন জ্ঞানার্কে উদ্ভাসিত[৪]। যেমন নির্ম্মল শশিমণ্ডল হইতে শুভ্র সুশীতল জ্যোৎস্না প্রসৃত হয়, সেইরূপ, ভবদীয় বিশুদ্ধ বুদ্ধিতত্ত্ব হইতে বিবেকামৃত প্রসৃত হইয়া আমাকে সুশীতল করিয়াছে। আমার মনে হইতেছে, ভবাদৃশ বিবেকিগণ পরম পূজ্য ও সেবনীয়। যেহেতু, কুমুদ্বতী যেমন চন্দ্রসংসর্গে বিকাশ প্রাপ্ত হয়, আমি আজ্ সেইরূপ আপনাদের সংসর্গে পরম প্রফুল্লতা লাভ করিলাম[৫।৬]। যেমন কুসুম সংসর্গে সৌরভ লাভ হয়, সেইরূপ, সাধুসংসর্গে শুভ লাভ হইয়া থাকে। যেমন অর্ক সংসর্গে পদ্মিনীর ম্লানতা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ, মহতের সংসর্গে দুঃখ সংযোগের বিনাশ হইয়া থাকে। প্রজ্বলিত দীপ হস্তে থাকিলে কোন্ ব্যক্তি অন্ধকারে অভিভূত হয়[৭।৮]? আমি আজ্ জঙ্গলমধ্যে ভূভাস্করসদৃশ আপনাদিগকে প্রাপ্ত হইয়াছি। আপনারা আমার সৎকারার্হ। সেজন্য আমার ইচ্ছা—আমি বর প্রদান দ্বারা আপনাদিগের সৎকার করি। অতএব হে নরবরদ্বয়! আপনাদিগের বাঞ্ছিত কি, তাহা শীঘ্র বলুন[৯]।

রাজা বলিলেন, হে রাক্ষসকুলকাননমঞ্জরি! এই জনপদে জনগণ বিষূচিকা পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া সাতিশয় সন্তাপ ভোগ করে। সেই হৃদয়শূলন রোগ ঔষধে শমতা প্রাপ্ত হয় না দেখিয়া আমি রাত্রিচর্য্যায় বহির্গত হইয়াছি। আমাদিগের অভিপ্রায়—ভবদ্বিধ ব্যক্তির নিকট মন্ত্র (মন্ত্রণা) লাভ করি। যাহারা তোমার ন্যায় অজ্ঞলোকবিনাশী, তাহাদিগকে দমন করিব। ইহাও আমাদের অন্যতম বাসনা। হে শুভে!

এক্ষণে তোমার নিকট আমাদের প্রার্থনা এই যে, তুমি যেন আর প্রাণিহিংসা না কর। সম্প্রতি আমাদের প্রার্থনা পূরণে অঙ্গীকার করিলে আমরা কৃতকৃতার্থ হই[১০।১৪]।

রাক্ষসী হৃষ্টা হইয়া বলিল, রাজন্! আমি সত্য বলিতেছি, অদ্য-প্রভৃতি আর প্রাণিহিংসা করিব না[১৫]।

রাজা বলিলেন, হে ফুল্লপদ্মাক্ষি! পর দেহ ভক্ষণ করাই তোমার একমাত্র জীবিকা। সেজন্য আমার আশঙ্কা—যদি তুমি পরশরীর ভক্ষণ না কর, তাহা হইলে মৎসমীহিত অহিংসা ব্রত গ্রহণ করিলে কিরূপে তোমার দেহ রক্ষা হইবে[১৬]? রাক্ষসী কহিল রাজন্! আমি এই পর্ব্বতে ছয় মাস সমাধিস্থা ছিলাম। সম্প্রতি সমাধি হইতে উত্থিতা হওয়ায় আমার ভোজনবাসনা হইয়াছিল। এক্ষণে পুনর্ব্বার পর্ব্বতশিখরে গমন পূর্ব্বক সমাধি গ্রহণ করিয়া যত কাল ইচ্ছা, শালভঞ্জিকার ন্যায় নিশ্চল-ভাবে সুখে অবস্থিতি করিব[১৭।১৮]। আমি স্থির করিতেছি যে, আমি ধ্যানাবলম্বন করতঃ যত দিন ইচ্ছা, দেহ ধারণ করিব, পরে যথা কালে দেহ পরিত্যাগ করিব। মহারাজ! যত দিন শরীর ধারণ করিব, তত দিন আর আমি পরপ্রাণ বিনাশ করিব না। এক্ষণে আমি যাহা বলি, তাহা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর[১৯]।

উত্তর দিকে হিমবান্ নামে এক উন্নত মহাশৈল অবস্থিত রহিয়াছে। ঐ শৈল জ্যোৎস্নাসদৃশ সুশুভ্র ও পূর্ব্ব ও পশ্চিম সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত। আমি সেই মহাশৈলের হেমশৃঙ্গ নামক শৃঙ্গে তত্রস্থ দরীরূপ গৃহে (দরী=পর্ব্বতের গুহা) আয়সী (লৌহসূচী) হইয়া মেঘলেখার ন্যায় বাস করিতাম। আমি রাক্ষসকুলসম্ভূত এবং আমার নাম কর্কটী[২০।২২]। একদা আমি জনবিনাশ বাসনায় ব্রহ্মার আরাধনা করিলে, তিনি আমার তপস্যায় বশীভূত হইয়া আমার প্রার্থনানুসারে আমাকে প্রাণঘাতিনী সূচী ও বিসূচী হওয়ার বর প্রদান করিলেন[২৩]। আমি বর প্রাপ্তা হইয়া বহু বর্ষ পর্য্যন্ত বিসূচিকারূপে অসংখ্য প্রাণি ভক্ষণ করিয়াছি। পরন্তু আমি তাঁহারই নিয়মানুসারে তৎপ্রকাশিত মহামন্ত্রের বশবর্ত্তিনী হওয়ায় গুণবান্ ব্যক্তিকে হিংসা করিতে সমর্থ হই না[২৪।২৫]। হে রাজন্! আপনি সেই মহামন্ত্র গ্রহণ করুন। তাহাতে সর্ব্বপ্রকার হৃদয়শূলন উপ-শান্ত হইবে। পূর্ব্বে আমি জনগণের হৃদয় আক্রমণ করতঃ শোণিত

শোষণ করিলে তাহাদের নাড়ী সকল বিকল (রক্তশূন্য) হইয়া যাইত। আমি রক্ত মাংস ভক্ষণ করিয়া যে সমস্ত জনগণকে পরিত্যাগ করিতাম, সেই সুদুর্ব্বলনাড়ী ব্যক্তি হইতে যাহারা জন্ম গ্রহণ করিত, তাহারাও তদনুরূপ বিকলনাড়ী (রক্তশূন্য) হইত। পরিষ্কার কথা এই যে, মদীয় আক্রমণ সাংঘাতিক; পরন্তু যদি দৈবাৎ মদীয় আক্রমণ হইতে মুক্তি পাইত, তাহা হইলে তাহাদের সন্তান পরম্পরা রুগ্ন ভুগ্ন বিকলেন্দ্রিয় হইয়া জন্মগ্রহণ করিত[২৩।২৮]।

হে রাজন্! সত্ত্বশালী জনগণের অসাধ্য কিছুই নাই। অতএব, আপনি সেই বিসূচিকা মন্ত্র অবশ্যই প্রাপ্ত হইবেন। হে নরপতে! নাড়ীকোশস্থিত শূলের পরিশান্তির নিমিত্ত ভগবান্ ব্রহ্মা যে মন্ত্র কহিয়াছিলেন, আপনি শীঘ্র তাহা গ্রহণ করুন। হে ভূমিপাল! আসুন, আমরা নদীতীরে গমন করি; কৃতাচমন ও সংযত হই, পরে আপনি আমার নিকট সেই মহামন্ত্র গ্রহণ করুন[২৯।৩১]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, সেই রাত্রে সেই রাক্ষসী সেই মন্ত্রী ও ভূপতির সহিত মিলিত হইয়া পরস্পর সুহৃদ্ভাবে নদীতীরে গমন করিল[৩২]। রাজা ও মন্ত্রী রাক্ষসীর সৌহৃদ্য অবগত হইয়া তাহার শিষ্য হইলেন[৩৩]। পরে রাক্ষসী ব্রহ্মার নিকট প্রাপ্ত সেই বিসূচিকামন্ত্র তাঁহাদিগকে প্রদান করিলেন। অনন্তর নিশাচরী সুহৃদ্ভাবাপন্ন রাজাকে ও রাজমন্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া গমনোদ্যতা হইলে, রাজা তাহাকে কহিলেন, হে মহাদেহশালিনি! আপনি আমাদিগের গুরু ও বয়স্যা। অতএব, হে সুন্দরি! আমরা প্রযত্নসহকারে আপনাকে ভোজনার্থ নিমন্ত্রণ করিতেছি; আপনি কদাচ আমাদিগের প্রণয় মিথ্যা করিবেন না। আমরা জানি, সুজনের সৌহার্দ্দ, দর্শন মাত্রেই পরিবর্দ্ধিত হয়। তাই আমাদের প্রার্থনা—আপনি স্বীয় শরীরকে অল্পমাত্র অলঙ্কারাদি দ্বারা সুশোভিত করিয়া আমার গৃহে আগমন পূর্ব্বক যথাসুখে অবস্থিতি করুন[৩৪।৩৮]।

রাক্ষসী বলিল, রাজন্! আমি মানবী রূপ ধারণ করিলে আপনি আমাকে মনুষ্যোচিত ভোজন পানাদি দানে সমর্থ হইবেন। যদি রাক্ষসী মূর্ত্তিতে থাকি, তাহা হইলে কি দিয়া আমার তৃপ্তিসাধন করিবেন? রাক্ষসদিগের ভক্ষ্য বস্তু আমার তৃপ্তিজনক হইতে পারিবে, পরন্তু সামান্য জনগণের খাদ্যে আমার তৃপ্তিসাধন হইবে না। কেননা, যাবৎ দেহ,

তাবৎ পূর্ব্বসিদ্ধ স্বভাব নিবৃত্ত হয় না[৩৯]।[৪০]

রাজা বলিলেন, হে অনিন্দিতে! তুমি কিছুদিন মানবস্ত্রীরূপ ধারণ করতঃ মাল্যধারিণী হইয়া ইচ্ছানুসারে আমার গৃহে বাস কর। পরে শত শত পাপাচারপরায়ণ চৌর ও অন্যান্য বধার্হ ব্যক্তি রাজ্য হইতে আনয়ন পূর্ব্বক তোমাকে সুভোজন প্রদান করিব। তুমি তখন মানবীরূপ পরিত্যাগ ও রাক্ষসীরূপ গ্রহণ পূর্ব্বক সেই সমস্ত গ্রহণ করতঃ হিমালয়শৃঙ্গে গমন করিয়া যথাসুখে ভক্ষণ করিবে। যাহারা মহাভোজী, নির্জনে ভোজন করা তাহাদের সুখের হেতু। ঐরূপে, তৃপ্তিলাভ করিয়া কিঞ্চিৎ কাল নিদ্রাসুখ অনুভব করিবে। পরে পুনর্ব্বার সমাধিস্থা হইবে। সমাধি হইতে বিরতা হইয়া পুনর্ব্বার আগমন পূর্ব্বক অন্যান্য বধ্য জনগণ লইয়া যাইবে। এরূপ হিংসা তোমার অধর্ম্মজনক হইবে না। ধর্ম্মবিৎগণের নির্ণয়—ধর্ম্মানুসারে হিংসা করুণার সদৃশ। ভদ্রে! ভরসা করি, তুমি সমাধি বিরতা হইলে অবশ্যই আমার নিকট আগমন করিবে। আমরা জানি—অসৎদিগেরও বদ্ধমূল সৌহৃদ্য নিবৃত্ত হয় না[৪১]।[৪৭]।

রাক্ষসী কহিল, রাজন্! আপনি উপযুক্ত বাক্য বলিয়াছেন। অবশ্যই আমি আপনার বাক্য প্রতিপালন করিব। কোন্ ব্যক্তি সুহৃদ্-বাক্য অবহেলন করে[৪৮]?

বশিষ্ঠ বলিলেন, অতঃপর সেই রজনীতে রাক্ষসী হার, কেয়ূর, কটক ও স্রগ্দাম্ ধারিণী বিলাসপরায়ণা রমণী হইয়া "মহারাজ! আগমন করুন" এই বাক্য কহিয়া সেই গমনশীল ভূপতির ও মন্ত্রীর অনুগামিনী হইল[৪৯]।[৫০]। পরে রাজসদন প্রাপ্ত হইয়া এক রমণীয় গৃহে গমন করতঃ তাহারা পরস্পর কথোপকথন দ্বারা সেই রজনী অতিবাহিত করিল। পরে রাক্ষসী প্রভাতকালাবধি স্ত্রীরূপে অন্তঃপুরে অবস্থিতি করিতে লাগিল এবং রাজা ও মন্ত্রী ইঁহারা জনপালন ও বধ্য বধ প্রভৃতি স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন[৫১]।[৫২]।

অনন্তর ছয় দিবসের মধ্যে রাজা স্বরাজ্য ও পররাজ্য হইতে তিন সহস্র বধ্য সংগ্রহ করিয়া রাক্ষসীকে প্রদান করিলেন। তখন সে নিশাকালে কৃষ্ণবর্ণা ভীষণা রাক্ষসী হইয়া রাজার অনুমতিক্রমে দরিদ্রলব্ধ হেমের ন্যায় সেই তিন সহস্র লোককে ভুজমণ্ডলে গ্রহণ পূর্ব্বক হিমা-

চলশৃঙ্গে গমন করিল[৫৩।৫৬]। পরে সেই সমস্ত লোক ভক্ষণ পূর্ব্বক তৃপ্তি লাভ করতঃ দিনত্রয় সুখনিদ্রায় অতিবাহিত করিয়া পুনর্ব্বার সমাধিস্থা হইল। রাক্ষসী সেই প্রকারে চারি বা পাঁচ বৎসর অন্তর প্রবুদ্ধ হইয়া পুনর্ব্বার সেই রাজসভায় গমন পূর্ব্বক বিশ্রম্ভালাপ দ্বারা কিঞ্চিংকাল অতিবাহিত করিয়া পুনর্ব্বার বধ্য গ্রহণ করতঃ পূর্ব্ববৎ ভক্ষণ করিত[৫৭।৫৯]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রামচন্দ্র! অদ্যাপি সেই রাক্ষসী জীবন্মুক্ত হইয়া সেই গিরিস্থিত অরণ্যে ধ্যানপরায়ণা হইয়া অবস্থিতি করে এবং সমাধি হইতে উত্থিতা হইয়া সৌহৃদ্য বশতঃ সেই কিরাতরাজসমীপে আগমন পূর্ব্বক বধ্য সংগ্রহ করিয়া ভক্ষণ করিয়া থাকে[৬০]।

দ্ব্যশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

ত্র্যশীতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, তদবধি সেই কিরাতরাজ্যে যে সমস্ত ভূপাল জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগের সহিত সেই রাক্ষসীর মিত্রতা জন্মিয়া থাকে[১]। রাক্ষসী তদবধি সেই কিরাতরাজ্যের পিশাচভয় প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার মহোৎপাত ও সর্ব্বপ্রকার রোগ নিবারণ করে[২]। রাক্ষসী বহুবর্ষ পর্য্যন্ত ধ্যাননিরতা থাকে, ধ্যান ভঙ্গের পর কিরাতমণ্ডলে গমনপূর্ব্বক রাজ-সঞ্চিত বধ্যদিগকে গ্রহণ করে[৩]। অদ্যাপি তত্রত্য মহীপালগণ সুহৃদের সম্মান রক্ষার্থ বধ্য সংগ্রহ করিয়া থাকেন[৪]। সেই রাক্ষসী কিরাত-জনপদে "কন্দরা" ও "মঙ্গলা" এই দুই নামে প্রতিষ্ঠাপিত হইয়া তত্রত্য গগনস্পর্শী প্রাসাদোদরে অবস্থিত রহিয়াছেন। তদবধি তথায় যিনি ভূপালপদে অধিরূঢ় হন, ভগবতী কন্দরার প্রতিমা নষ্ট হইলে তিনি অন্যপ্রতিমা নির্ম্মাণ করতঃ পুনঃ প্রতিষ্ঠাপিত করেন[৫।৭]। যে নৃপাধম ভগবতী কন্দরা দেবীর প্রতিষ্ঠা না করে, কন্দরা তাহার সমস্ত প্রজা বিনষ্ট করেন[৮]। তাঁহার পূজা করিলে জনগণের বাসনা পূর্ণ হয় এবং তাঁহার পূজা না করিলে কাহার কোন প্রকার বাসনা পূর্ণ হয় না। অধিক কি বলিব, সেই ব্যক্তি বহুবিধ অনর্থপরম্পরার ভাজন হয়[৯]। সেই দেবী বধ্যলোকোপহারদ্বারা পূজিত হইয়া থাকেন। অদ্যাপি তথায় তাঁহার ফলদায়িনী চিত্রস্থা প্রতিমা বিদ্যমান রহিয়াছে। তিনি সর্ব্বপ্রকারে বালবৎসগণের মঙ্গল বিধান করেন এবং পরমবোধবতী সেই রাক্ষসী কিরাতমণ্ডলের দেবতা হইয়া জয়যুক্তা হইতেছেন[১০।১১]।

ত্র্যশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

চতুরশীতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রঘুনাথ! আমি হিমপর্ব্বত স্থিতা কর্কটী রাক্ষসীর মনোহর উপাখ্যান তোমার নিকট আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিলাম[১]। রামচন্দ্র বলিলেন, প্রভো! হিমালয়গহ্বর-স্থিতা রাক্ষসী কিরূপে কৃষ্ণবর্ণত্ব প্রাপ্ত হইল? এবং তাহার কর্কটী নাম হইবারই বা কারণ কি? আমার নিকট তাহা বর্ণন করুন[২]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাক্ষসদিগের কুল (বংশ) অসংখ্য। তাহারা স্বভাবতঃ কেহ শুক্ল, কেহ কৃষ্ণ, কেহ হরিত এবং কেহবা উজ্জ্বল বর্ণ[৩]। এই রাক্ষসীর কৃষ্ণবর্ণতা কুলানুরূপ এবং কর্কটপ্রাণিসদৃশ কর্কট নামক রাক্ষস হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া কর্কটী আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল[৪]। ইহারও আকৃতি কর্কটের সদৃশ (কাঁকড়ার ন্যায় দীর্ঘ হস্তপদাদি[৫]) ছিল। রাঘব! আমি বিশ্বরূপ (ব্রহ্ম) নিরূপণোদ্দেশে ও অধ্যাত্মকথা প্রসঙ্গে কর্কটীর প্রশ্ন স্মরণ করতঃ সেই পরমার্থনিরূপিকা আখ্যায়িকা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম[৫]।

এই আদ্যন্তরহিত অসম্পন্ন জগৎ সেই একমাত্র পরম কারণ হইতে সম্পন্নবৎ প্রকাশ পাইতেছে[৬]। যদ্রূপ বারিমধ্যে অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান অসংখ্য তরঙ্গ অবস্থিতি করে সেইরূপ এই সৃষ্টিপরম্পরাও সেই পরম পদে অবস্থিত রহিয়াছে[৭]। যেমন কাষ্ঠমধ্যগত বহ্নি অপ্রজ্বলিত অবস্থাতেও মর্কটাদির শীত নিবারণ করে, তেমনি, ব্রহ্ম, নানা কর্ত্তার ন্যায় হইয়া নানাপ্রকার জগৎ সৃষ্টি করেন অথচ তাঁহার স্বাভাবিক সৌম্যতা পরিত্যাগ হয় না[৮।৯]। যেমন কাষ্ঠে বৃথা শালভঞ্জিকা (প্রতিমা) বুদ্ধি উদিত হয়, তেমনি, এই জগৎ, সৃষ্ট না হইলেও সৃষ্টরূপে অনুভূত হয়[১০]। অঙ্কুর ও বীজ অভিন্ন অর্থাৎ একই বস্তু, অথচ তদ্দ্বয় মনোমধ্যে ভিন্ন প্রকারে সমুদিত হয়। সেইরূপ চিত্ত ও চেত্য (চিত্তের জগৎ দর্শন শক্তি) অভিন্ন বা এক, অথচ তদ্দ্বয় ভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হয়[১১।১২]। ভেদ অবিচার মূলক। সুতরাং তাহা বাস্তব নহে। ভেদের অবাস্তবতা এইজন্য বলা যায় যে; সদ্বিচার উদিত হইলে তখন

আর ভেদ থাকে না[১৩]। হে রঘুনাথ! এ ভ্রান্তি যেস্থান হইতে আসিয়াছে, সেই স্থানেই গমন করুক। অথবা তুমি প্রকৃষ্টরূপে ব্রহ্ম অবগত হইয়া এই ভ্রান্তি পরিত্যাগ কর[১৪]। মদীয় বাক্যরূপ অস্ত্রদ্বারা তোমার ভ্রান্তিগ্রন্থি ছিন্ন হইলে, তুমি অভেদ বুদ্ধির দ্বারা সেই পরম বস্তু অবগত হইতে পারিবে। অবশ্যই তুমি মদীয় বাক্য শ্রবণ করিয়া এই চিৎসমুৎপন্ন অনর্থশ্রী ও ইহার মূল কারণ অবিদ্যা বিনষ্ট করিতে পারিবে। তুমি আমার বাক্যাবলম্বনে প্রবুদ্ধ হইলে "জগৎ ব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন, সুতরাং সমস্তই ব্রহ্ম" এই সম্যক্ বোধ প্রাপ্ত হইবে সন্দেহ নাই[১৫।১৭]।

রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! ভিন্নরূপে পরিদৃশ্যমান এই পাঞ্চভৌতিক জগৎ কি প্রকারে সেই পরম পদ হইতে অভিন্ন? বশিষ্ঠ বলিলেন, অভিন্নতাই বাস্তব; ভিন্নতা কাল্পনিক। কেবল উপদেশের নিমিত্তই অর্থাৎ শিষ্যদিগকে বুঝাইবার নিমিত্তই ভেদ বোধক শব্দরাশি সৃষ্ট হইয়াছে। অতএব, পরমাত্মার সহিত জগতের যে ভেদ দৃষ্ট হইতেছে, ইহা ব্যবহারিক মাত্র। বাস্তবিক নহে। যেমন বালকের উপদেশ উদ্দেশে উপদেশকগণ বেতালাদির কল্পনা করেন, সেইরূপ[১৮।২০]। ফলতঃ যাহাতে দ্বিত্ব বা একত্ব কিছুই নাই, তাহাতে সঙ্কল্প বিকল্পের সম্ভাবনা কি? অজ্ঞানীরাই ভেদ জ্ঞান বহন করতঃ বহুবিধ বিবাদ করে। কারণ-কার্য্য, স্বত্ব-স্বামিত্ব, হেতু-হেতুমান্, অবয়ব-অবয়বী, ব্যতিরেক-অব্যতিরেক, পরিণাম-অপরিণাম, বিদ্যা-অবিদ্যা, সুখ-দুঃখ ইত্যাদি ইত্যাদি যে কিছু ভেদ ব্যবহার সমস্তই অজ্ঞদিগের মিথ্যাময়ী কল্পনা ও অনভিজ্ঞবোধার্থ অনুবাদ। যাহা বস্তু তাহাতে কোনও প্রকার ভেদ নাই। তাহা এক অখণ্ড অদ্বৈত। তত্ত্ব জ্ঞান হইলে অদ্বৈতই অবশেষিত হয়[২১।২৫]। রাম! যখন তোমার তত্ত্ব বোধ উদিত হইবে তখন তুমি বুঝিবে যে, আদ্যন্তবর্জ্জিত, বিভাগরহিত এবং এক অখণ্ডিত পরমাত্মাই সর্ব্বময় এবং তিনি ভিন্ন আর কিছুই নাই[২৩]। হে রঘুনাথ! যাহারা বুদ্ধ নহে, তাহারাই আপন আপন বিকল্প জ্ঞানের (শব্দশ্রবণজনিত মিথ্যা ভেদজ্ঞানের) প্রশ্রয়ে ঐরূপ ঐরূপ বিবাদ করে পরন্তু যাহারা বুদ্ধ, বোধপ্রাপ্ত, তাহাদের দ্বিধাভাব থাকে না, অস্তমিত হইয়া যায়। দ্বৈত মিথ্যা হইলেও তাহা ব্যবহার দশায় অর্থাৎ তত্ত্ব বোধের পূর্ব্বে প্রয়োজনীয় অর্থাৎ উপদেশের নিমিত্ত গৃহীত হয়। যেমন মিথ্যা রজ্জুসর্প দর্শনে সত্য ভয়কম্পাদি

ফল উদ্ভুত হয়, তেমনি, মিথ্যা দ্বৈতের অনুবাদ করিয়া উপদেষ্টৃগণ সত্য ব্রহ্ম বুঝাইয়া থাকেন। ব্যবহারসিদ্ধ দ্বৈত অবলম্বন না করিলে অদ্বৈত বুঝান যায় না। যাহার শব্দশক্তির গ্রহ (জ্ঞান) নাই অর্থাৎ অমুক শব্দ অমুক বস্তুর বাচক, অমুক বস্তু অমুক শব্দের বাচ্য, ইত্যাদি-বিধ বোধ নাই, সে ব্যক্তিকে কোন কিছু বুঝান যায় না। সেইজন্য ব্যবহার সিদ্ধ দ্বৈত গ্রহণীয় হয়। নচেৎ বিচার দৃষ্টির অগ্রে দ্বৈতের অবস্থান অসিদ্ধ[২৭।২৮]। অতএব, হে রাঘব! তুমি শব্দজনিত ভেদ অনাদর করিয়া, মিথ্যা বিবেচনা করিয়া, বুদ্ধিকে মহাবাক্যার্থে নিমগ্ন করতঃ অর্থাৎ চিত্তকে এক অখণ্ডাদ্বৈতাকার করিয়া, আমার বাক্য সকল শ্রবণ করিবে। তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে, এই জগৎ এক অখণ্ড মৌন অর্থাৎ অদ্বৈত অবশেষিত হইয়াছে[২৯]। এই জগৎ গন্ধর্ব্ব পুর পত্তনের ন্যায় ভ্রান্তিমাত্র। হে অনঘ! যে প্রকারে এই জগদ্রূপিণী মায়া বিস্তৃত হইয়াছে, তাহা আমি দৃষ্টান্ত সহ তোমার নিকট কীর্ত্তন করি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। শ্রবণের দ্বারা ইহার ভ্রান্তিময়তা অবধারণ করিতে পারিলে নিশ্চয়ই তোমার বাসনারাশি বিনষ্ট হইবে[৩০।৩২]। এই ত্রিজগৎ মনের মনন (কল্পনা) দ্বারা নির্ম্মিত। ইহা পরিত্যাগ করিতে পারিলে তুমি শান্তাত্মা হইবে ও আপনি আপনাতেই থাকিবে[৩৩]। রাম! মনোরূপ ব্যাধির চিকিৎসার্থ মদীয় বাক্যে মনঃসংযোগ করিবে ও বিবেকরূপ ঔষধের প্রতি যত্নবান্ হইবে[৩৪]। তুমি বক্ষ্যমাণ আখ্যায়িকা শ্রবণ করতঃ তদনুসারে অবস্থিত হইতে পারিলে; জানিতে পারিবে, সংসারে একমাত্র চিত্তই প্রকাশমান আছে, তদ্ব্যতীত অন্য কিছু নাই। এমন কি, শরীরাদিও নাই। বস্তুতঃ রাগদ্বেষদূষিত চিত্তই সংসার; তাহা হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইতে পারিলে সংসারমুক্ত হওয়া যায়[৩৫।৩৬]। চিত্তই সাধ্য, পালনীয়, বিচারণীয়, আহরণীয়, ব্যবহরণীয়, সঞ্চারণীয় ও ধারণীয়। * আকাশসদৃশ (অশরীরী) চিত্ত স্বীয় অন্তরে ত্রিজগৎ (দৃশ্য-

---

* যাহা সিদ্ধ হয় নাই, তাহা সাধনপ্রয়োগে সাধ্য হয়। যাহা সিদ্ধ হইয়াছে তাহা পালনীয় অর্থাৎ রক্ষণীয় হয়। অসিদ্ধ সাধনের নানা পথ বা নানা উপায় থাকিলে কোন্ উপায় সুগম্? তাহা বিবেচনা করার নাম বিচার। যাহা তদযোগ্য তাহা বিচারণীয়। দেশান্তরে বা সময়ান্তরে সিদ্ধ আছে, কিন্তু তাহা নিকটে বা বর্ত্তমানে অসিদ্ধ আছে, সেরূপ হইলে উপায় প্রয়োগে নিকটস্থ ও বর্ত্তমান করা

জাল)। ধারণ করিতেছে। চিত্তই অহম্ভাবরূপে দেহাদিতে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে[৩৭।৩৮]। যাহা চিত্তের চিদ্‌ভাগ (চৈতন্যভাগ) তাহাই সর্ব্বপ্রকার কল্পনার বা কল্পনাশক্তির বীজ। যাহা জড়ভাগ তাহাই ভ্রমাত্মক জগৎ[৩৯]। সৃষ্টির পূর্ব্বে এ সমস্ত যখন অবিদ্যমান বা অস্পষ্ট ছিল তখন ব্রহ্মা এ সকল স্বপ্নের ন্যায় দেখিয়াও দেখিতেন না। পরে তিনি কালে সংবিদ্‌-দ্বারা সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়; জড়সংবিদ্‌দ্বারা (জড়ভাবের বুদ্ধি) শৈলাদি ও সূক্ষ্মসংবিদ্‌দ্বারা লিঙ্গসমষ্টিরূপাত্মক সূক্ষ্ম হিরণ্য গর্ভ, এই ত্রিবিধ দেহ অনুভব করেন[৪০।৪১]। অথচ উক্ত দেহত্রয় শূন্যস্বরূপ; সুতরাং বাস্তব নহে। সেই মনোময় আত্মবপু সর্ব্বগামী সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন। চিত্তরূপ বালক অবোধতা প্রযুক্তই জগৎকে যক্ষস্বরূপে (অপূর্ব্ব বস্তু) অবলোকন করিতেছে। আবার প্রবুদ্ধ হইলে ইহাকে নিরাময় আত্মা-রূপে দর্শন করিবে। আত্মা যে প্রকারে দ্বিত্ব ও ভ্রমদায়ক রূপে দৃষ্ট হন, আমি বক্ষ্যমাণ বাক্যাবলির দ্বারা তোমার নিকট তাহা ব্যক্ত করি, তুমি প্রণিহিত হও[৪২।৪৪]। আমি যুক্তি সমবেত মধুর পদপদার্থ যুক্ত, ঐন্দবোপাখ্যান কীর্ত্তন করিব, তুমি তাহা মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করিবে। সে উপাখ্যান শ্রবণ করিলে শ্রোতার হৃদয় সুশীতল হয়। হে অনঘ! এক মাত্র স্বাত্মভ্রান্তিই আপনাকে জগৎ স্বরূপে বিস্তৃত করিয়াছে। যেরূপে জগন্মায়া বিস্তৃত হইয়াছে, তাহা আমি তোমার নিকট কীর্ত্তন করি, শ্রবণ কর[৪৫।৪৭]।

হইলে তাহা আহরণ নাম প্রাপ্ত হয়। আয়ত্তাধীন বস্তুকে যথেচ্ছ বিনিয়োগ করার নাম ব্যবহার। তদ্‌যোগ্য করার নাম ব্যবহরণীয়। ব্যবহার্য্য বস্তুর মধ্যে অশ্বাদি সঞ্চা-রণীয় এবং ভূষণাদি স্থাবর বস্তু ধারণীয়। এই কয়েকটী সংজ্ঞায় জগতের সর্ব্বপ্রকার পদার্থ নিবিষ্ট আছে।

চতুরশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চাশীতিতম সর্গ।

ঐন্দবোপাখ্যান।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে অনঘ! পূর্ব্বে আমি ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আমাকে এই জগৎ সম্বন্ধীয় কথা যাহা বলিয়াছিলেন, তৎসমুদায় আমি তোমার নিকট বর্ণন করি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে আমি একদা পিতামহ ব্রহ্মাকে "ভগবন্! এই সমুদায় দৃশ্য কি প্রকারে সমুৎপন্ন হইয়াছে" এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আমার নিকট এক বৃহৎ ঐন্দবোপাখ্যান কীর্ত্তন করিয়াছিলেন১।৩।

ব্রহ্মা বলিলেন, বৎস! যেমন জলাশয়ের জল বিচিত্র আবর্ত্তাকারে প্রস্ফুরিত হয়, তেমনি, একমাত্র জগৎশক্তিসম্পন্ন মনই দৃশ্য জগদ্রূপে প্রস্ফুরিত হইতেছে৪। পূর্ব্বকালে আমি কোন এক কল্পের আদিতে প্রবুদ্ধ হইয়া জগৎ সৃষ্টির অভিলাষ করিলে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর৫।

একদা আমি দিবাবসানে নিখিল সৃষ্টি পরম্পরা সংহার করিয়া স্বস্থ ও একাগ্র চিত্ত হইয়া যামিনী যাপন করিলাম৬। * অনন্তর নিশাবসানে প্রবুদ্ধ হইয়া যথাবিধি সন্ধ্যাদি প্রাতঃকৃত্য সমাপন করতঃ প্রজাসৃষ্টির নিমিত্ত বিস্তৃত নভোমণ্ডলে নয়নদ্বয় সংযোজিত করিলাম৭। দেখিলাম, কেবল মাত্র অসীম আকাশ বিস্তৃত রহিয়াছে। তাহাতে আলোক ও অন্ধকার দুএর কিছুই নাই৮। অনন্তর আমি মনে করিলাম, এই গগনে আমি সৃষ্টি অনুসন্ধান করিব। পরে ঐরূপ দৃঢ় সংকল্প করিয়া আমি একাগ্র চিত্তে স্রষ্টব্য বস্তু সকল পর্য্যালোচনা বা অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম্। কিয়ৎক্ষণ পরে আমি মনের দ্বারা সেই বিস্তৃত অব্যক্তাকাশে পৃথক্ পৃথক্ সৃষ্টি অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড দেখিতে পাইলাম। সে সকল ব্যাঘাত

* ব্রহ্মার দিনে সৃষ্টি এবং রাত্রিতে মহাপ্রলয়। তাঁহার এক দিনে আমাদের এক কল্প। কল্পের আদি ও সৃষ্ট্যারম্ভ সমান কথা। এস্থলে আকাশ ও নভোমণ্ডল প্রভৃতি শব্দের অর্থ মায়াশক্তি।

রহিত অর্থাৎ বিশেষ সুশৃঙ্খল, ও মহারম্ভযুক্ত[৮।১০]। আরও দেখিলাম, সেই ব্রহ্মাণ্ডে দশ ব্রহ্মা অবস্থান করিতেছেন। তাহারা সকলেই অবিকল আমার ন্যায় এবং সকলেই আমার ন্যায় পদ্মকোষনিবাসী ও রাজহংস সমারূঢ়[১১]। সে সকল সৃষ্টি (ব্রহ্মাণ্ড) বিষ্ণু প্রভৃতির দ্বারা পালনাদি ব্যবস্থায় নিরর্গল অর্থাৎ নির্ব্বিঘ্নে নির্ব্বাহিত হইতেছে। সে সকল ব্রহ্মাণ্ডেও স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ, অণ্ডজ ও জরায়ুজ, এই চতুর্ব্বিধ প্রাণী, ও বর্ষণকারী মেঘ রহিয়াছে এবং সে সমস্তই অনাবৃষ্ট্যাদিদোষরহিত। সে সকল ব্রহ্মাণ্ডেও নদী প্রবাহিত হইতেছে, সূর্য্য উষ্ণস্পর্শ মরীচিমালা বিস্তার করিতেছে, নভোমণ্ডলে সমীরণ প্রস্ফুরিত হইতেছে[১২।১৩]। স্বর্গে দেবগণ ও ভূতলে মানবগণ ক্রীড়া করিতেছে, পাতালে দানব ও ভোগীগণ (সর্পগণ) বিচরণ করিতেছে[১৪], কালচক্র স্থাপিত রহিয়াছে; শীতগ্রীষ্মাদি ঋতু শীতাতপ প্রদান করিতেছে, কালানুসারে ফল পুষ্পাদি উদ্ভূত হইয়া মহীমণ্ডল বিভূষিত করিতেছে[১৫]। সর্ব্বত্রই বিহিত ও নিষিদ্ধ আচার প্রতিষ্ঠিত। সর্ব্বত্র তদ্বোধক স্মৃত্যাদি গ্রন্থ, এবং সর্ব্বত্রই ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় রহিয়াছে। তত্রস্থ প্রাণিগণ ভোগমোক্ষফলার্থী হইয়া তাহা লাভের নিমিত্ত স্বেচ্ছানুসারে কালে কালে প্রযত্ন করিতেছে ও তাহারা স্বর্গ নরকাদিফলভোগও করিতেছে[১৬।১৭]। সর্ব্বত্রই প্রলয় পর্য্যন্ত স্থায়ী সপ্ত লোক, সপ্ত দ্বীপ, সপ্ত সমুদ্র ও অষ্ট কুলাচল প্রস্ফুরিত হইতেছে[১৮]। তমঃপুঞ্জ কোন স্থানে ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে, কোন স্থানে স্থিরভাবে অবস্থান করিতেছে এবং কুঞ্জাদিতে (লতার ঝোপ্‌কে কুঞ্জ বলে) যেন সস্নেহে তেজের সহিত সংমিলিত হইতেছে[১৯]। তারকানিকররূপ-কেশরসম্পন্ন-নীলবর্ণনভোরূপনীলোৎপলে অভ্রখণ্ডরূপ ভ্রমররাজি পরিভ্রমণ করিতেছে[২০]। যেমন সুশুভ্র শাল্মলীর তুলা তদীয় অষ্ঠীলায় (ফলকর্পরে কর্পর=আবরণ ছাল।) অবস্থিত থাকে, তেমনি, হিমালয়ের গুহাদি প্রদেশে ঘনীভূত সুশুভ্র নীহার রাশি অবস্থিত রহিয়াছে[২১]। লোকালোক পর্ব্বত যাহার মেখলা, অর্ণবের ঘোর গর্জ্জন যাহার অলঙ্কার ধ্বনি, তমঃখণ্ড যাহার ইন্দ্রনীলমণিপ্রভা, যিনি অন্তর্গত [illegible] রত্নসম্পন্ন, ধান্যাদি শস্য সকল যাহার অধরসুধা, প্রাণিগণের বাক্যালাপ যাহার বাক্‌বিলাস, তাদৃশী পৃথিবী দেবী সেই সেই ব্রহ্মাণ্ডে অন্তঃপুরাঙ্গনার ন্যায় অবস্থিত রহিয়াছেন[২২।২৩]। সমুদায়

ব্রহ্মাণ্ডেই সম্বৎসরলক্ষ্মী (শ্রী) শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষীয় রজনীর দ্বারা রঞ্জিত হইয়া উৎপলমালাধারিণীর ন্যায় দৃষ্ট হইতেছেন[২৪]। অহো! অন্তরালে অন্তরালে ভিন্ন ভিন্ন লোক সকল সন্নিবিষ্ট থাকায় ব্রহ্মাণ্ডগণ তদালোকে আলোকিত দাড়িম ফলের ন্যায় আরক্ত দৃষ্ট হইতে লাগিল[২৫]। ত্রিপ্রবাহা ও ত্রিপথগা গঙ্গানদী জগতের উর্দ্ধ অধঃ মধ্য এই ত্রিস্থানে বিরাজিত থাকিয়া যজ্ঞোপবীতের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছেন[২৬]। দিকরূপ লতানিকুরে তড়িতরূপ পুষ্পসমন্বিত মেঘরূপ পল্লব সকল বায়ুকর্তৃক বিতাড়িত ও ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতেছে[২৭]। মদ্দৃষ্ট এবম্বিধ জগৎ, যাহাতে সমুদ্র, ভূমি ও আকাশ, এই তিনের সমাবেশ, তাহা গন্ধর্ব্ব-নগরীয় উদ্যানে অবস্থিত লতার অনুরূপ অনুভূত হইল। * ভুবনান্তরালে দেব, অসুর, নর ও উরগগণ উড়ুম্বরমধ্য স্থিত মশকের ন্যায় ঘুমঘুম রব করতঃ অবস্থিত রহিয়াছে। অতর্কিত সর্ব্বনাশ প্রতীক্ষাকারী কাল যুগ, কল্প, ক্ষণ, কলা ও কাষ্ঠাদিরূপে নিরন্তর বহমান হইতেছে[২৮।৩০]।

বৎস! আমি স্বীয় বিশুদ্ধ চিত্তের দ্বারা এই সমস্ত অবলোকন করিয়া সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলাম। ভাবিলাম, ইহা কি! কি দেখিলাম! আমি মাংসময় চক্ষুর্দ্বারা যাহা কখন দেখি নাই সেই মায়িক সৃষ্টি আজ আমি চিত্তাকাশে দর্শন করিলাম! কি আশ্চর্য্য! [৩১।৩২]।

পরে আমি আকাশস্থিত সেই সকল জগৎ হইতে এক সূর্য্যকে সমাহ্বান করিলাম। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে দেবদেব! হে ভাস্কর! হে মহাদ্যুতে! আসুন, আপনার মঙ্গল হউক। আমি জানিতে চাহি, তুমি কে? তোমার সম্বন্ধীয় এই জগৎ এবং অন্যান্য জগৎ কাহার দ্বারা সৃষ্ট? হে অনঘ! যদি তুমি অবগত থাক, তাহা হইলে আমার নিকট কীর্ত্তন কর[৩৩।৩৫]।

তাঁহাকে ঐরূপ কহিলে তিনি আমাকে অবলোকন পূর্ব্বক পরিজ্ঞাত হইলেন। অনন্তর নমস্কার পূর্ব্বক আমাকে উদার বাক্যে পশ্চাদুক্ত কথা বলিলেন। বলিলেন, হে ঈশ্বর! আপনি সমুদায় দৃশ্য প্রপঞ্চের

---

* গন্ধর্ব্বনগর=ভ্রমক্রমে আকাশে পরিদৃষ্ট পুর। মেঘবিশেষের সংস্থান অনুসারে আকাশে কখন কখন ক্ষণিক দৃষ্টিবিভ্রম হইয়া থাকে। হটাৎ বোধ হয়, যেন একটা নগর। তাদৃশ নগর গন্ধর্ব্বনগর। তত্রস্থ উদ্যান, ও তন্মধ্যবর্ত্তী লতা। সমস্তই মিথ্যার বা ভ্রান্তির বিলাস। তাহার ন্যায় বর্ণিত জগৎও ভ্রান্তির বিলাস।

কারণ; অথচ আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন; ইহা সমধিক আশ্চর্য্যের বিষয়। যদি জানিয়াও মদুক্তি শ্রবণে আপনার কৌতূহল জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে আমি আমার অচিন্তিত উৎপত্তির বিষয় কীর্ত্তন করি, শ্রবণ করুন[৩৬।৩৮]। হে মহাত্মন্! হে ঈশ্বরাত্মন্! আপনি ইহাই জানুন যে, যাহা নিরন্তরিত জগদ্রচনাশক্তিশালিনী, যাহা কখন কোথাও সৎ ও কখন কোথাও অসৎ বলিয়া প্রতীত হয়, সুতরাং যাহাকে সৎ কি অসৎ নির্দ্দিষ্ট প্রকারে জানা সুকঠিন, অতএব, ব্যামোহ (ভ্রান্তি) দায়িনী, এবং যাহাতে কাল দেশাদির দ্বারা পরিচ্ছিন্ন জগৎসত্তা প্রদর্শনের কৌশল নিহিত আছে, তাহার দ্বারা এই দৃশ্য (অনির্ব্বাচ্য) বিস্তৃত হইয়াছে সত্য; পরন্তু এ সমস্তই মন বা মনের বিলাস ব্যতীত অন্য কিছু নহে[৩৯]।

ষড়শীতিতম সর্গ।

অতঃপর সূর্য্য বলিলেন, হে মহাদেব! আপনার কল্পনামক পূর্ব্ব দিবসে (এতৎকল্পের পূর্ব্বকল্পে) জম্বুদ্বীপের এক কোণে কৈলাস নামক যে শৈল আছে তাহার সমতল প্রদেশে স্বুবর্ণজটনামে প্রসিদ্ধ এক স্থান আছে। সেই স্থানে আপনার মরীচি প্রভৃতি পুণ্যবান্ তনয়গণ প্রজা (নিজ সন্তান পরম্পরার) নিবাসার্থ উৎকৃষ্ট ও সুখপ্রদ মণ্ডল (বাসযোগ্য ভূমি বা স্থান) কল্পনা করিয়া ছিলেন[১।২]। সেই মণ্ডলে (বাসভূমে) কশ্যপকুলোদ্ভব ধর্ম্মপরায়ণ বেদবিদ্‌শ্রেষ্ঠ শান্তস্বভাব ইন্দু নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন[৩]। মহাত্মা ইন্দু সেই সর্ব্বসুখপ্রদ মণ্ডলে (রাজ্যে) বাস করিতেন এবং তাঁহার অপরিজ্ঞাতনামা প্রাণসমা ভার্য্যাও তৎসঙ্গে বাস করিতেন[৪]। যেমন মরুভূমিতে তৃণের উৎপত্তি হয় না, তেমনি, সেই ভার্য্যাতে তাঁহার সন্তানোৎপন্ন হইল না। শর-লতা (তৃণগুচ্ছ) যেমন পত্র পুষ্প, ফল বিহীন বলিয়া শোভা প্রাপ্ত হয় না, সেইরূপ, তদীয় ভার্য্যা ঋজু, গৌরী ও বিশুদ্ধচরিত্রা হইলেও অপুত্রতানিবন্ধন শোভা প্রাপ্ত হইল না।

তদনন্তর, অপুত্রতা নিবন্ধন খিন্নমনা সেই বিপ্রদম্পতী তপস্যার্থ কৈলাস ভূধরের কোন এক প্রদেশে অধিরূঢ় হইলেন এবং তথায় জনশূন্য অনাবৃত প্রদেশে গিয়া মহীরুহের ন্যায় স্থিরভাবে অবস্থিতি করতঃ সলিলমাত্র ভক্ষণ করিয়া ঘোরতর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা দিবাবসানে কেবলমাত্র এক গণ্ডুষ জল পান করিতেন, অবশিষ্ট কাল বৃক্ষবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক (বৃক্ষবৃত্তি=বৃক্ষের ন্যায় নিশ্চল নিষ্পন্দ হইয়া থাকা) তপস্যা করিতেন। যাবৎ ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের অবসান না হইয়াছিল, তাবৎ তাঁহারা তপস্যায় নিমগ্ন ছিলেন। অনন্তর ইন্দু যেমন কুমুদের প্রতি প্রসন্ন হন, সেইরূপ, শশিকলাধর মহেশ, সেই আতপ-তাপিত বিপ্রদম্পতীর প্রতি পরিতুষ্ট হইলেন। এবং যে স্থানে তাঁহারা তপস্যা করিতেছিলেন, তন্নিকটস্থ লতাপাদপসমাচ্ছন্নপ্রদেশে সাক্ষাৎ বসন্তের ন্যায় আবির্ভূত হইলেন। তখন বিপ্রদম্পতী সেই তুষারধবল

বৃষভারূঢ় সোমার্দ্ধশেখর সোমদেবকে দর্শন করিয়া দণ্ডবৎ প্রণিপাত করিলেন।১৩। কুমুদ যেমন কৌমুদী দর্শনে পুলকিত হয়, বিপ্রদম্পতি ইষ্টদেব দর্শনে সেইরূপ পুলকিত হইলেন। যেমন পূর্ণ চন্দ্রের উদয়ে পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ সুপ্রসন্ন হয়, বিপ্রদম্পতি সেইরূপ প্রসন্নমনা হইলেন।

অনন্তর মহাদেব লাবণ্যপূর্ণ মুখমণ্ডলে মৃদুমধুর হাস্য প্রকট করতঃ সুমধুর বাক্যে কহিলেন, বিপ্র! আমি তোমার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়াছি। তুমি অভিলষিত বর গ্রহণ করিয়া বসন্তানুগৃহীত বৃক্ষের ন্যায় প্রমুদিত হও। ব্রাহ্মণ বলিলেন, হে দেবদেবেশ! হে ভগবন্! যাহাদের দ্বারা আমি পুনঃ শোকাক্রান্ত না হই, এরূপ কল্যাণগুণাচারশালী মহাধীসম্পন্ন দশ পুত্র আমার হউক।

ভানু বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! অনন্তর মহাবপু মহেশ্বর "তাহাই হউক" বলিয়া আকাশে অন্তর্হিত হইলেন। তখন সেই উমামহেশ্বরসদৃশ বিপ্রদম্পতী মহাদেবের নিকট বর লাভ করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। কিছুকাল গৃহে থাকিলে ব্রাহ্মণী গর্ভিণী হইলেন১৪।১৯। দেখিতে দেখিতে তিনি পূর্ণগর্ভা হইলেন এবং বারির দ্বারা মেঘলেখার ন্যায় শ্যামকলেবর ধারণ করিলেন। তদনন্তর সেই বিপ্রভার্য্যা যথাকালে পরম সুন্দর প্রতিপচ্চন্দ্রলেখার ন্যায় সুশোভন দশ পুত্র প্রসব করিলেন। অনন্তর সেই ব্রাহ্মণ অল্পকাল মধ্যেই তনয়গণের ব্রাহ্মণোচিত জাত কর্ম্মাদি সংস্কার সকল সমাপিত করিলেন। বিপ্রতনয়গণ দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল এবং ক্রমে তাহারা সপ্তম বর্ষ অতিবাহিত করিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সপ্তম বর্ষ বয়ঃক্রম কালেই তাঁহারা বেদাদি সমস্ত শাস্ত্র অবগত হইলেন এবং স্ব স্ব তেজঃপ্রভাবে নভোমণ্ডলস্থিত নির্ম্মল গ্রহের ন্যায় শোভমান হইতে লাগিলেন।

কিয়ৎকাল পরে সেই তনয় গণের ব্রহ্মকোবিদ পিতা মাতা দেহ পরিত্যাগ করতঃ পরমগতি প্রাপ্ত হইলেন। তখন সেই দশজন ব্রাহ্মণ পিতৃ মাতৃ বিহীন হইয়া সাতিশয় দুঃখিত চিত্তে স্বগৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৈলাসাচলে গমন করিলেন। তথায় সেই বান্ধববিহীন ব্রাহ্মণগণ উদ্বিগ্ন চিত্ত হইয়া "এখন আমাদিগের শ্রেয়ঃ কি" এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন যে, হে ভ্রাতৃগণ! এখানে আমাদিগের সমুচিত কর্ত্তব্য কি? কিই বা পরিণামে অদুঃখ-

দায়ক? আমিই বা কি? তুমিই বা কি? এই সমস্ত জনগণের ঐশ্বর্য্যই বা কি? ইহাদের অপেক্ষা সামন্তগণ অধিক ঐশ্বর্য্যশালী কি না? সামন্তগণ অপেক্ষা রাজগণ, রাজগণ অপেক্ষা সম্রাট ও সম্রাট অপেক্ষা ইন্দ্র সমধিক ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন দেখা যাইতেছে। আবার ইহাও দেখা যায়, ইন্দ্রত্ব পদ প্রজাপতির এক মুহূর্ত্তমাত্র স্থায়ী। অতএব ইহাদের (জনগণের) ঐশ্বর্য্য কি? যাহা কল্পান্তেও বিনষ্ট হয় না, ইহ জগতে এমন কোন্ বস্তু বিদ্যমান আছে তাহা বিচারের দ্বারা বিজ্ঞাত হওয়া উচিত[২০।২৯]?

ভ্রাতৃগণ পরস্পর ঐরূপ বলাবলি করিতেছেন, এমন সময় তাঁহাদিগের মহামতি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গম্ভীর স্বরে কহিয়া উঠিলেন, হে ভ্রাতৃগণ! আমার বিবেচনায় সর্ব্বপ্রকার ঐশ্বর্য্যের মধ্যে ব্রাহ্ম-ঐশ্বর্য্যই শ্রেষ্ঠ। কেননা, ব্রহ্মা ব্যতিরেকে কল্পান্তে আর কিছুই অবিনাশী থাকে না। জ্যেষ্ঠ ঐরূপ কহিলে, অন্যান্য ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান ও পরম সৎকার করতঃ কহিলেন, হে তাত! আমরা কি প্রকারে সর্ব্বদুঃখবিনাশন জগৎপূজ্য পদ্মাসন বিরিঞ্চির পদ প্রাপ্ত হইব[৩০।৩৩]? তখন জ্যেষ্ঠ পুনর্ব্বার বলিলেন, হে ভ্রাতৃগণ! আমিই সেই পদ্মাসন সমারূঢ় পরমতেজঃসম্পন্ন ব্রহ্মা। আমিই চিত্তদ্বারা সৃষ্টি ও সংহার করিয়া থাকি। তোমাদের অন্তরে এইরূপ জ্ঞান বদ্ধমূল হউক[৩৪।৩৫]।

তখন অন্যান্য ভ্রাতৃগণ জ্যেষ্ঠের বাক্য অঙ্গীকার করিয়া তাঁহার সহিত ধ্যানাবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থিতি করতঃ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। "আমিই সকল জগতের স্রষ্টা, কর্ত্তা, ভোক্তা ও মহেশ্বর। যজ্ঞমূর্ত্তি যাজকগণ, মহর্ষিগণ, শিক্ষাকল্পাদি বেদাঙ্গ, ও পুরাণাদি, সুরস্বতী ও গায়ত্রীযুক্ত বেদ, নরগণ, এ সমস্তই আমার অন্তরে অবস্থিত রহিয়াছে। লোকপাল ও সঞ্চরমান সিদ্ধমণ্ডল পরিপূর্ণ এই শোভমান স্বর্গ, পর্ব্বত, দ্বীপ, কানন ও জলধিসমলঙ্কৃত ত্রিলোকীর কুণ্ডলস্বরূপ এই ভূমণ্ডল, দৈত্য দানব প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ পাতালকুহর, অমরস্ত্রীগণ পূর্ণ গৃহসম্পন্ন গগনরাজ্য (অমরাবতী), যিনি সকল রাজার শ্রেষ্ঠ ও যিনি একাকী এই লোকত্রয় পালন করিতেছেন, সেই পবিত্র যজ্ঞভোজী মহাবাহু ইন্দ্র, যিনি স্বীয় কান্তিরূপ পাশদ্বারা দিক্ সকলকে বন্ধন করিয়াই যেন সন্তাপিত করিতেছেন সেই প্রভূতকিরণশালী দ্বাদশ আদিত্য, গোপালগণের গোযূথ রক্ষার ন্যায় যাঁহারা বিশুদ্ধ মর্য্যাদা দ্বারা

লোক সকলকে রক্ষা করিতেছেন, সেই সমস্ত লোকপালগণ আমাতেই অবস্থিত রহিয়াছে[৩৬।৪৫]। এই সমস্ত প্রজাগণ সলিলতরঙ্গের ন্যায় আমাতে আবির্ভূত, আমাতেই তিরোহিত, আমার দ্বারা বিরাজিত ও আমাতে নিপতিত হইতেছে। আমিই সৃষ্টি বিস্তার ও সংহার করিয়া থাকি। আমি আপনাতে অবস্থিত ও আপনাতে বিলীন হইতেছি। যে আত্মা সম্বৎসররূপে জাত ও যুগরূপে পরিণত হইতেছে, যাহা সৃষ্টি ও সংহারের কাল এবং যাহা ব্রহ্মার কল্প (দিন) এবং রাত্রি স্বরূপ, আমি সেই পূর্ণাত্মা পরমেশ্বর"[৪৬।৪৯]।

ইন্দুতনয়গণ একাগ্রচিত্তে দৃঢ়বদ্ধাসনে উপবিষ্ট ও চিত্রার্পিত পুত্তলিকার ন্যায় হইয়া মনে মনে ঐরূপ চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহাদিগের অন্তঃকরণ হইতে ইতর বৃত্তি সকল বিগলিত হইল। তখন তাঁহারা কমলাসনবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক স্ব স্ব কুশাসনকে পঙ্কজাসন কল্পনা করতঃ বিরাজমান হইতে লাগিলেন[৫০।৫১]।

ষড়শীতিতম সর্গ সমাপ্ত।
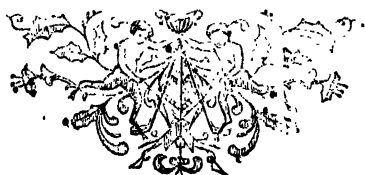
সপ্তাশীতিতম সর্গ।

ভানু বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি যেমন সৃষ্টিকর্ত্তার পদে আধিরূঢ় থাকিয়া সৃষ্টি কার্য্যে ব্যাসক্তচিত্ত আছেন, সেইরূপ, সেই দশ ইন্দুপুত্র উপাসনায় সিদ্ধ হইয়া পিতামহ ব্রহ্মার পদে অবস্থান করতঃ ভাবময় সৃষ্ট্যাদি কার্য্যে অর্থাৎ মনে মনে জগৎ রচনা কার্য্যে ব্যাসক্তচিত্ত থাকিলেন। যাবৎ তাঁহাদের দেহ বিগলিত না হইয়াছিল তাবৎ তাঁহারা ঐ কার্য্যে অবস্থিত ছিলেন। অনন্তর তাঁহাদের দেহ যথাকালে শীর্ণ পর্ণবৎ বিগলিত হইলে বনবাসী ক্রব্যাদগণ তাঁহাদিগের সেই দেহ ভক্ষণ করিল। তাঁহাদের বাহ্যবস্তুবিষয়ক জ্ঞান আত্যন্তিক রূপে নিবৃত্ত হইল। এবং ব্রহ্মভাবে ভাবিত হইয়া কল্প শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত অবস্থিত থাকিলেন। অনন্তর কল্প শেষ হইলে দ্বাদশ আদিত্য সমুদিত, পুষ্করাবর্ত্ত মেঘের ঘর্ঘর রবে দিঙ্‌মণ্ডল পরিপূর্ণ, কল্পান্তবায়ু প্রবাহিত ও জগৎ একার্ণবীকৃত এবং সমুদায় ভূত বিনাশ প্রাপ্ত হইল। কিন্তু ইন্দুসন্তানগণ সেই ভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন[১,৬]। হে ভবগন্! আপনি যখন আপনার রাত্র্যাগমে সর্ব্ব সংসার সংহার করতঃ যোগনিদ্রায় অবস্থিত করিতে ছিলেন, তখনও তাঁহারা সেই ভাবে (মানসিক সৃষ্টি কার্য্যে ব্যাপৃত) অবস্থিত ছিলেন[৭]। আজ্ আপনি নিদ্রোত্থিত হইয়া পুনঃ সংসার সৃজন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা সেইরূপ ব্যবস্থায় অবস্থিত আছেন[৮]। হে ব্রহ্মন্! হে ভগবন্! সেই দশ জন ব্রাহ্মণরূপ ব্রহ্মার দশ সংসার (জগৎ) তাঁহাদের চিত্তাকাশে অবস্থিত রহিয়াছে। হে বিভো! আমি সেই দশ সংসারের একতমের ছিদ্রভূত আকাশে তৎসংসারের ভানু হইয়া কালবিভাগকার্য্যে নিয়োজিত রহিয়াছি[১০]। হে পদ্মজ! আমি আকাশস্থিত দশ সর্গের বিবরণ আপনার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে আপনার যাহা ইচ্ছা, তাহা করিতে পারেন। এই মহাড়ম্বর সম্পন্ন জগৎ ঐ দশ জন ব্রহ্মার চিত্তের কল্পনা ব্যতীত অন্য কিছু নহে[১১,১২]।

সপ্তাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টাশীতিতম সর্গ।

ব্রহ্মা বশিষ্ঠকে সম্বোধন করতঃ কহিলেন, হে ব্রহ্মবিদ্‌শ্রেষ্ঠ! ভানুদেব ব্রহ্মাকে সম্বোধন সহকারে "সেই দশ ব্রাহ্মণই দশ ব্রহ্মা" এই কথা বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন[১]। অনন্তর ব্রহ্মা কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, হে ভানো! এক্ষণে আমি আর কি সৃষ্টি করিব তাহা শীঘ্র বল[২।৩]। হে ভাস্কর! যেখানে দশ জন ব্রহ্মা বিদ্যমান রহিয়াছেন, সেখানে আর আমার স্রষ্টব্য কি? ব্রহ্মা ঐরূপ বলিলে ভানুদেব ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া ব্রহ্মাকে বলিলেন[৪], প্রভো! আপনি নিরীহ ও নিরিচ্ছ। সুতরাং আপনার সৃষ্টি কার্য্যে কোন প্রয়োজন নাই। হে জগৎপতে! সৃষ্টি কেবল আপনার বিনোদমাত্র (লীলা)[৫]। হে মহামতে! যেমন সূর্য্য হইতে জলে প্রতিবিম্বাত্মক সূর্য্যের উদ্ভব হয়, তেমনি, কামনাবিহীন আপনা হইতে সৃষ্টি সমুৎপন্ন হয়[৬]। আপনি যখন শরীর-বিষয়েও নিষ্কাম, অর্থাৎ তাহার ত্যাগ ও অহং-অভিমান স্থাপন দ্বারা তাহার গ্রহণ, এই দুই দুষ্পরিহার্য্য বিষয়েও আপনি উদাসীন, তখন আর আপনার সৃষ্টিবিষয়ক নিষ্কামতার কথা কি বলিব? হে দেব! হে ভূতপতে! তবে যে আপনি সৃজন করেন, তাহা বিনোদ ব্যতীত অন্য কিছু নহে। যেমন দিনপতি, বিনা স্বপ্রয়োজনে দিন সৃজন করেন, তেমনি, আপনিও বিনা স্বপ্রয়োজনে এই সকল সংহার করেন, করিয়া পুনর্ব্বার সৃজন করেন। আপনি উদ্যম ও ইচ্ছা পূর্ব্বক কোন কিছু করেন না। দিবাকরের দিবাসৃষ্টির ন্যায় কেবল বিনোদের নিমিত্তই জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকেন। হে মহেশ! আপনি যদি সৃষ্টি না করেন, তাহা হইলে নিত্যকর্ম্ম অর্থাৎ আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম পরিত্যাগ করা হয়। কর্ত্তব্য পরিত্যাগেই বা আপনি অন্য কি ফল পাইবেন[৭।১০]? শাস্ত্রের শাসন এই যে, সদা আসক্তিশূন্য হইয়া কর্ম্ম করিবেক। সে ভাবে কর্ম্ম করিলে যে ফলসংসর্গ হয় তাহা নির্ম্মল মুকুরে প্রতিবিম্ব পাতের সমান। অর্থাৎ প্রতিবিম্ব যেমন স্বীয় আধরকে লিপ্ত করে না সেইরূপ কর্ম্মফলও তদ্রূপ কর্ত্তায় লিপ্ত হয় না[১১]।

জ্ঞানী ব্যক্তিরা কর্ম্মকরণে যদ্রূপ অনাসক্ত, কর্ম্ম পরিত্যাগেও তদ্রূপ অনাসক্ত অর্থাৎ কামনা বিহীন[১২]। আপনি সুষুপ্তিতুল্য নিষ্কাম বুদ্ধি অবলম্বন করতঃ কার্য্য করণের ন্যায় যথোচিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করুন[১৩]। হে সুরেশ্বর! যদি ইন্দুতনয়গণের সৃষ্টির দ্বারা আপনার সন্তোষ সাধন হয়, তাহা হইলে, তাঁহারাও সৃষ্টির দ্বারা আপনার সন্তোষ সাধন করিবেন[১৪]। আপনি ইন্দুতনয়গণের সৃষ্টি চিত্তনেত্রের দ্বারাই দর্শন করিতেছেন, নয়নদ্বারা নহে। যিনি যাহা সৃজন করেন, তিনিই তাহা চক্ষে দর্শন করিতে সমর্থ হন। অন্যের মানসী সৃষ্টিতে অন্যের পরোক্ষ-জ্ঞান হইলেও অপরোক্ষ জ্ঞান হয় না। কিন্তু নিজ মনের সৃষ্টিতে নিজের অপরোক্ষানুভব হইয়া থাকে। ভাবার্থ—ইন্দুপুত্রগণের সৃষ্টিতে আপনার যে পরোক্ষ জ্ঞান হইতেছে তাহাও বিনোদ বিশেষ। কারণ এই যে, মনের দ্বারা যিনি যাহা নির্ম্মাণ করেন, তিনিই তাহা মাংসময় চক্ষুতেও দর্শন করিতে সমর্থ হন। অন্যে তাহা নেত্রদ্বারা দর্শন করিতে সমর্থ নহে[১৫।১৬]। ঐ দশ ব্রহ্মার দশ সর্গ কেহ বিনাশ করিতেও সমর্থ নহে। যাহা কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা কৃত হয়, তাহাই বিনাশনীয়। যাহা চিত্তদ্বারা কৃত হয়, তাহা কেহ বিনাশ করিতে সমর্থ নহে[১৭]। হে ব্রহ্মন্! যাহার মনে যাহা নিশ্চয়রূপে বদ্ধমূল হয়, তাহা, সেই ব্যক্তি ভিন্ন অন্যে নিবারণ করিতে সমর্থ নহে। যাহা বহুকালের অভ্যস্ত ও দৃঢ়মূল, মহাত্মাদিগের অভিশাপেও তাহা বিনষ্ট হয় না। শরীর বিনষ্ট হইবে তথাপি তাহার মানস রচনা বিনষ্ট হইবেক না। মনে যাহা নিশ্চয়রূপে বদ্ধমূল হয়, পুরুষ বা আত্মা সেইরূপই হইয়া থাকে। সেই বদ্ধমূল বোধের বৈপরীত্য করিবার নিমিত্ত ইতর উপায় অবলম্বন বা চেষ্টা করিলে তাহা অঙ্কুরোৎপাদনার্থ উপলখণ্ডে সলিল সেকের ন্যায় বৃথা হয়[১৮।২১]।

ইন্দুপুত্রগণের উপাখ্যান সমাপ্ত।

অষ্টাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

একোননবতিতম সর্গ

ইন্দ্র ও অহল্যার ইতিবৃত্ত।

ভানু বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! মনই জগতের কর্তা এবং মনই পরম পুরুষ। যাহা কিছু কৃত হয়, সমস্তই মনের দ্বারা, শরীর দ্বারা নহে[১]। দেখুন, ইন্দুতনয়গণ ব্রাহ্মণ হইয়াও ভাবনার দ্বারা (মানসিক উপাসনায়) ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন[২]। মনের দ্বারা দেহ ভাব ভাবনা করিলে দেহ প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং দেহ ভাবনা না করিলে দেহধর্ম্ম (জন্ম-মরণাদি) হইতে মুক্ত হওয়া যায়[৩]। যাহারা বাহ্যদর্শী তাহারা নিরন্তর সুখদুঃখ অনুভব করে। যাহারা বাহ্যদৃষ্টিবিহীন অর্থাৎ অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন-যোগী, তাহারা দেহে প্রিয় অপ্রিয় কিছুই অনুভব করে না[৪]। হে ব্রহ্মন্! মনই এই ভ্রমময় জগতের মূল কারণ। ইন্দ্র ও অহল্যার সংবাদ তাহার পুষ্কল দৃষ্টান্ত[৫]।

ব্রহ্মা বলিলেন, হে ভানো! যাহাদিগের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে মন পবিত্র হয় সেই অহল্যা ও ইন্দ্র কে? ভানু বলিলেন, হে দেব! শ্রবণ করিয়াছি, পূর্ব্বকালে মগধরাজ্যে ইন্দ্রদ্যুম্নসদৃশ ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে এক মহীপতি বাস করিতেন[৬।৭]। শশাঙ্কের রোহিণীর ন্যায় সেই মহী-পতির ইন্দুবিম্বপ্রতিমা কমললোচনা অহল্যা নাম্নী ভার্য্যা ছিল[৮]। সেই রাজপুরে কামশাস্ত্রবিশারদ কামুকপ্রধান ইন্দ্র নামে অপর এক ব্রাহ্মণ-কুমার বাস করিতেন[৯]। একদা রাজমহিষী অহল্যা কথাপ্রসঙ্গে পূর্ব্বে গৌতমপত্নী অহল্যা যে দেবরাজ ইন্দ্রের পরম প্রণয়িনী হইয়াছিলেন, ইহা শ্রবণ করতঃ তদবধি সেই পুরবরস্থিত ইন্দ্রের প্রতি সাতিশয় অনুরাগিণী হইলেন। এবং সেই ব্রাহ্মণকুমার ইন্দ্রও তাঁহার প্রতি অত্যা-সক্ত হন; ইন্দ্র অন্য কোন স্থানে গমন না করেন, সে নিমিত্ত অহল্যা একান্ত সমুৎসুকা হইলেন[১০।১১]। অহল্যা ইন্দ্রের জন্য এত সন্তপ্তা হইল যে, মৃণালশয্যা ও কদলীপল্লবাস্তরণ তাহার দাহ পীড়ার হ্রাস করিতে অসমর্থ হইল[১২]। ভূপতির তত ঐশ্বর্য্য, তথাপি সে, নিদাঘ-তপ্তসলিলস্থিত মৎসীর ন্যায় খেদ প্রাপ্ত হইতে লাগিল[১৩]। অহল্যা

সর্ব্বদাই "এই ইন্দ্র, এই ইন্দ্র" এইরূপ প্রলাপ বাক্য উচ্চারণ করতঃ লজ্জা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অধীরা হইয়া উঠিল[১৪]। অনন্তর তাহার কোন বয়স্যা তাহাকে তদ্রূপ কাতরা দেখিয়া কহিল, সখি! আমি শীঘ্রই ইন্দ্রকে তোমার নিকটে নির্ব্বিঘ্নে আনয়ন করিব, তুমি উৎকণ্ঠা পরিত্যাগ কর। সে ঐ কথা শুনিয়া এক নলিনী যেমন অন্য নলিনীর মূলদেশে নিপতিত হয়, তেমনিই অহল্যা প্রিয়বয়স্যার পদতলে নিপতিত হইল[১৫,১৬]।

অনন্তর দিবা অবসান ও রাত্রি সমাগত হইলে সেই বয়স্যা সেই ইন্দ্রনামক দ্বিজকুমার সমীপে গমন পূর্ব্বক সমুচিত প্রবোধ প্রদান করতঃ তাঁহাকে সেই রজনীতে অহল্যার নিকট আনয়ন করিল[১৭,১৮]। যুবতী অহল্যা মনোহর মাল্য, হার ও অঙ্গদাদিদ্বারা বিভূষিতা, চন্দনাদি বিলেপিতা ও মন্মথের একান্ত বশীভূতা হইয়া কোন গোপনীয় গৃহে সেই কামুক ইন্দ্রের সহিত রতিক্রীড়া সমাপন করিল। অহল্যা ক্রমেই ইন্দ্রের প্রতি অধিক অনুরাগিণী হইতে লাগিল এবং জগৎকে তন্ময় জ্ঞান করিতে লাগিল। সুতরাং তখন সে সেই বহুগুণসম্পন্ন ভর্ত্তাকে (রাজাকে) আর গুণশালী বলিয়া জ্ঞান করিতে পারিল না[১৯,২১]।

কিয়ৎকাল অতিক্রান্ত হইলে রাজা তাহার অনুরাগের বিষয় অবগত হইলেন। অহল্যা যতক্ষণ মনে মনে ইন্দ্রকে ভাবিতেন, ততক্ষণ তাহার মুখ প্রফুল্ল কৈরবের ন্যায় বিরাজ করিত[২২,২৩]। ইন্দ্রও অহল্যার প্রতি এত অনুরক্ত হইয়াছিল যে, ক্ষণকালও অহল্যাদর্শন বর্জ্জিত হইয়া থাকিতে পারিত না[২৪]। তাহাদিগের তাদৃশ দৃঢ়ানুরাগ ও অপ্রচ্ছন্নচেষ্টাজনিত দুর্নীতি রাজার বিশেষ পীড়াদায়ক হইয়া উঠিল[২৫]। ভূপতি তখন বহুবিধ দণ্ডদ্বারা তাহাদিগকে পীড়ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই তাহারা ক্লেশ বোধ করিল না। হিমকালে জলাশয়ে নিক্ষেপ করিতেন কিন্তু তাহারা কিছুমাত্র ক্ষুণ্নচিত্ত হইত না প্রত্যুত হৃষ্ট হইয়া রাজাকে উপহাস করিত[২৬,২৭]। রাজা সেই সলিলনিক্ষিপ্ত দুর্ম্মতিদ্বয়ের দুঃখী না হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তাহারা জল হইতে সমুদ্ধৃত হইয়া বলিতে লাগিল। "আমরা পরস্পর পরস্পরের মুখকান্তি স্মরণ করতঃ ভাবে নিমগ্ন থাকি, শরীর কি হইয়াছে না হইয়াছে তাহা জানি না[২৮,২৯]। আমাদিগের পরস্পরের মন নিতান্ত নিঃশঙ্ক। সেইজন্য আমরা আপনার শাসনে শঙ্কিত না হইয়া বরং

হৃষ্ট হই। হে মহীপাল! আমাদিগের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কাটিয়া ফেলিলেও ক্লেশ বোধ করি না৩০।

তাহারা উত্তপ্ত ভর্জ্জনপাত্রে নিক্ষিপ্ত, গজপাদে মর্দ্দিত ও কশার (কশা=চর্ম্মরজ্জু, চাবুক) দ্বারা সন্তাড়িত হইয়াও কিছুমাত্র খেদ প্রাপ্ত হইত না। রাজা তাহাদিগকে অদুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা পূর্ব্বোক্ত কারণই নির্দ্দেশ করিত। রাজা অন্য প্রকার শাসন করিলেও তাহারা উদ্ধার লাভ করতঃ রাজা কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া পুনঃ পুনঃ হর্ষের পূর্ব্বোক্ত কারণই নির্দ্দেশ করিত। অবশেষে ইন্দ্র মহীপালকে কহিল, হে ভূপাল! আমি সমুদায় জগৎকে আমার দয়িতাময় বলিয়া জ্ঞান করিতেছি। অধিক কি বলিব, আমি বিনাশ দুঃখেও কাতর নহি। রাজন্! আমার এই দয়িতাও এই জগৎকে মন্ময় অবলোকন করিতেছেন। সেই হেতু শাসন দ্বারা আমাদিগের কিছুমাত্র দুঃখ হয় না। মহারাজ! আমি কি? আমি মনোমাত্র। মনই পুরুষ অর্থাৎ জীব৩১।৩৬। এই দেহ মনেরই কাল্পনিক প্রতিচ্ছায়া ব্যতীত অন্য কিছু নহে। বহু দণ্ড প্রয়োগ করিলেও বীররূপ মনকে আপনি অল্পমাত্রও ভেদ করিতে সমর্থ হইবেন না। কে মনকে বাহ্যিক দণ্ডের দ্বারা ভেদ করিতে সমর্থ হয়? দেহ শীর্ণ বিশীর্ণ হউক, অপর অবস্থান্তর প্রাপ্ত হউক, পরন্তু মন সমভাবে অবস্থিতি করিবে। দৃঢ়নিশ্চয়বান্ মনকে ভেদ করিবার জন্য কাহার কি শক্তি আছে? হে নৃপ! মন যদি কোন প্রকার বাঞ্ছিত বিষয়ে একান্ত সমাবিষ্ট ও তদ্গত ভাব প্রাপ্ত হইয়া যায় তাহা হইলে তখন শরীরস্থ ভাব ও অভাব সমুদায়ই বাধিত হইয়া যায়। হে মহীপতে! তীব্রবেগে মনে যাহা চিন্তা করা যায়, তাহাই স্থিরভাবে দৃষ্ট হইয়া থাকে। শারীরিক চেষ্টার ফল সেরূপ নহে। হে রাজন্! বর ও শাপ প্রভৃতি কোন প্রকার ক্রিয়া বাঞ্ছিত বিষয়ে দৃঢ়াভিনিবিষ্ট মনকে বিচলিত করিতে সমর্থ হয় না। মৃগ যেমন মহাশৈলকে বিচলিত করিতে সমর্থ হয় না, তেমনি, মনুষ্যগণও বাঞ্ছিত বিষয়ে দৃঢ় নিবিষ্ট মনকে বিচলিত করিতে সমর্থ হয় না। হে ভূপতে! এই অসিতাপাঙ্গী রমণী দেবগৃহে প্রতিষ্ঠিতা দেবীর ন্যায় আমার মনঃকোষে প্রতিষ্ঠিতা রহিয়াছে৩৭।৪৫। মেঘমালা বেষ্টিত গিরি যেমন গ্রীষ্মদাহ অনুভব করে না, তেমনি, আমিও জীবিতেশ্বরী প্রিয়ার সহিত মিলিত থাকিয়া কোন প্রকার দুঃখ অনুভব করি

না। হে নরপতে! আমি যেখানে যেখানে অবস্থিতি করি, সেই সেই স্থানে বাঞ্ছিতার্থ লাভ ব্যতীত অন্য কিছু অনুভব করি না। (বাঞ্ছিতার্থলাভ=প্রিয়াপ্রীতি অনুভব) আমি আমার দয়িতা অহল্যার মনঃস্বরূপ[৪৬।৪৭]। ইহাতে আমি এরূপ আসক্ত হইয়াছি যে, যন্ত্রশতদ্বারাও বিচলিত হইতে সমর্থ নহি। হে ভূপতে! ইহা নিশ্চয় জানিবেন যে, সুমেরু যেমন শত বজ্রপাতেও বিচলিত হয় না, সেইরূপ, ধীর ব্যক্তির একাগ্রতাপন্ন চিত্তকে বিচলিত করিতে পারা যায় না। হে মহারাজ! বর ও অভিশাপ শরীরের অন্যথা করিতে পারে, মনের কিছুই করিতে পারে না। মন বিজিগীষুর ন্যায় সতেজে অবস্থান করে[৪৮।৪৯]। হে রাজন্! এই যে জীবশরীর দৃষ্ট হইতেছে, এ সকল মনেরই কল্পনা বিশেষ। শরীর মনের উৎপাদক নহে; কিন্তু মনঃ শরীরের উৎপাদক। অর্থাৎ এই সকল শরীর মনোভ্রান্তির দ্বারা নির্ম্মিত। জল যেমন বৃক্ষলতাদিরসের কারণ, সেইরূপ, চিত্তকে আপনি এই সমস্ত শরীরের কারণ বলিয়া জানিবেন[৫০]। হে মহাত্মন্! মনঃই আত্মার প্রথম শরীর অর্থাৎ প্রথম ভোগায়তন। প্রথমে "অহং" এই অভিমান দ্বারা তাহার আবির্ভাব হয়। সুতরাং তাহা মানস সংকল্পের ফল ব্যতীত অন্য কিছু নহে[৫১]। মন জগতের প্রথম অঙ্কুর। সেই মনোরূপ অঙ্কুর হইতে ফলপল্লবাদিশালী দেহতরু বিস্তৃত হইয়া থাকে। অঙ্কুর বিনষ্ট হইলে পল্লবশ্রী সমুদিত হয় না; কিন্তু পল্লব বিনষ্ট হইলে পুনর্ব্বার পল্লব হয়; এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, দেহ বিনষ্ট হইলে চিত্ত অভিনব দেহ বিস্তৃত করিতে পারে, কিন্তু চিত্ত বিনষ্ট হইলে তখন সর্ব্বাভাব ঘটনা হয়। অতএব হে মহারাজ! আপনি সর্ব্বতোভাবে চিত্তরত্ন পরিপালন করুন।

হে মহারাজ! আমি তন্মনস্ক হইয়া সর্ব্বদিক্কে এই হরিণনয়না যুবতীকে দর্শন করতঃ পরমানন্দ অনুভব করিতেছি। সেইজন্য আপনার ভৃত্য প্রভৃতি পুরবাসীরা আমাকে শস্ত্রাদিদ্বারা ক্লেশ প্রদান করিতে পারে না। করিলেও আমার ক্লেশানুভব হয় না। কারণ, আমি ক্ষণকালের নিমিত্ত ভৃত্যাদির কথা দূরে থাকুক, প্রেয়সী ব্যতীত অন্য কোন কিছু দেখিতে পাই না[৫২।৫৩]।

একোননবতিতম সর্গ সমাপ্ত

নবতিতম সর্গ।

ভাসুদেব বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! অনন্তর রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন ঐরূপ উক্ত হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী ভরত নামক মুনিকে বলিলেন, ভগবন্! আমার দারাপহারী এই দুরাত্মা ইন্দ্র বহুবিধ কটুবাক্য প্রয়োগ করিতেছে। হে মহামুনে! অবধ্য ব্যক্তির বধ ও বধ্য ব্যক্তি পরিত্যাগ করিলে যে পাপ হয়, তদনুরূপ পাপপরায়ণ এই দুরাত্মাকে অভিশাপ প্রদান করুন১।৩।

মহামুনি ভরত রাজশার্দ্দূল কর্ত্তৃক ঐরূপে অভিহিত হইয়া দুরাত্মার পাপ বিচার করতঃ "রে দুর্ব্বুদ্ধে! তুই এই ভর্ত্তৃদ্রোহকারিণী দুর্ভাগিনী অহল্যার সহিত বিনাশ প্রাপ্ত হ" এই বলিয়া শাপ প্রদান করিলেন৪।৫। তৎশ্রবণে ইন্দ্র ও অহল্যা রাজাকে ও ভরতকে বলিলেন, তোমরা নিতান্ত দুর্ম্মতি। যাহারা দুশ্চর তপস্যা বৃথা ক্ষয় করে, তাহাদের শাপে আমাদের কিছুই হইবে না। কারণ, আমাদের দেহ নাই, পূর্ব্বেই বিনষ্ট হইয়াছে। আমরা উভয়ে এখন কেবল মন। সুতরাং আমরা সূক্ষ্ম, চিন্ময় ও দুর্লক্ষ্য। কে ঈদৃশ আমাদিগকে বিনষ্ট করিতে সমর্থ হয়৬।৮?

ভানু বলিলেন, অনন্তর প্রগাঢ়স্নেহসম্বন্ধ ও পরস্পরতন্মনস্কচিত্ত অহল্যা ও ইন্দ্র মহামুনি ভরতের শাপে বৃক্ষবিচ্যুত পল্লবের ন্যায় ভূতলে পতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল৯। পরে তাহারা সুদৃঢ় বিষয়ানুরাগ বশতঃ মৃগযোনি, তদনন্তর বিহঙ্গমযোনি প্রাপ্ত হইল। সে যোনিতেও তাহারা পরস্পরানুরক্ত দম্পতীভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল১০। তদনন্তর তাহারা বহু জন্মের পর আমাদিগের এই সৃষ্টিতে তপঃপরায়ণ পুণ্যশীল ব্রাহ্মণদম্পতী হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন১১। সে সময়ে ভরতের শাপ তাহাদের শরীর মাত্র আক্রমণে সমর্থ হইয়াছিল, মন আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় নাই১২। তাহারা মোহের বশীভূত হইয়া যে যে যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল, সেই সেই যোনিতেই তাহারা দম্পতীভাবে অবস্থিতি করিয়াছিল১৩। অন্যের কথা দূরে থাকুক, তাহাদের অকৃত্রিমপ্রেম-রসসম্বন্ধ স্নেহ দর্শনে বৃক্ষেরাও প্রেমরসানুবিদ্ধ হইয়া শৃঙ্গারচেষ্টাকুলিত হইয়াছিল১৪।

ইতিহাস সমাপ্ত।

নবতিতম সর্গ সমাপ্ত।

একনবতিতম সর্গ।

ভানু বলিলেন, হে ভগবন্! আমি ইন্দ্র অহল্যার ইতিবৃত্ত স্মরণ করিয়া বলিতেছি যে, মন বড়ই দুরাসদ। মন শাপাদির দ্বারা নিগ্রাহ্য বা ভিন্ন হইবার নহে[১]। হে ব্রহ্মন্! আপনি উক্ত কারণে ইন্দুসন্তান-গণের সৃষ্টি বিনাশ করিতে সমর্থ নহেন। বিশেষতঃ সেরূপ চেষ্টা বা ইচ্ছা মহাত্মাদিগের পক্ষে নিতান্ত অসমুচিত। হে নাথ! এই জগতে অথবা অন্যান্য জগতে এমন কোন্ বস্তু বিদ্যমান আছে, যাহা আপনার খেদের কারণ হইতে পারে[২।৩]? হে ব্রহ্মন্! মনঃই জগতের কর্ত্তা এবং মনঃই পুরুষ। মন যাহা নিশ্চয় করে, সৃজন করে, তাহা দ্রব্য, ওষধি ও দণ্ডদ্বারা বিনিবৃত্ত হয় না। যেমন কেহ মণিস্থ প্রাতিবিম্বিক দেহ ভেদ করিতে সমর্থ হয় না, তেমনি, মানস সৃষ্টিও কেহ নাশ করিতে পারক হয় না। সেই কারণে বলিতেছি, ইন্দুতনয়গণ স্বীয় সৃষ্টি-ভ্রান্তিতে অবস্থিতি করুন, তাহাতে আপনার ক্ষতি হইবেক না[৪।৫]। হে জগৎপতে! আপনিও প্রজা সৃষ্টি করতঃ অবস্থিতি করুন। যদি বলেন, কোথায় করিব? তদুত্তরে বলিতেছি, চিত্তাকাশ, চিদাকাশ এবং পরমাকাশ অনন্ত। আপনি স্বীয় চিত্তাকাশে এক, দুই বা বহু সৃষ্টি রচনা করতঃ স্বেচ্ছানুসারে অবস্থিতি করুন। ইন্দুতনয়গণ আপনার কোন কিছু গ্রহণ করে নাই[৬।৭]।

ব্রহ্মা বলিলেন, হে মহামুনে! ভানু ঐরূপ কহিলে আমি কিয়ৎ-কাল চিন্তা করিলাম। পশ্চে বলিলাম, ভানো! তুমি যোগ্য কথাই বলিয়াছ। এই আকাশ, মন ও চিদাকাশ, বিস্তৃত রহিয়াছে। আমি ইহাতেই অভিমত সৃষ্টি স্থাপন করিয়া নিত্যকর্ম্ম সাধন করিব[৮।১০]। হে ভাস্কর! আমি শীঘ্রই বহুপ্রকার ভূতজাল কল্পনা করিব। কিন্তু হে ভগবন্! এক্ষণে আপনি মৎকৃত সৃষ্টির প্রথম (স্বায়ম্ভুব) মনু হউন এবং আমার অভিমত কার্য্যের অনুষ্ঠান করুন।

অনন্তর মহাতেজা ভাস্কর মদীয় বাক্য অঙ্গীকার করিয়া আপনাকে দ্বিধা বিভক্ত করতঃ এক ভাগের দ্বারা ঐন্দবসর্গে সূর্য্যত্ব পদে অধিরূঢ়

হইলেন ও আকাশমার্গে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক দিবসাবলি বিস্তার করিতে লাগিলেন এবং স্বীয় দ্বিতীয় অংশে মনু হইয়া মনুর কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন ও মদীয় অভিপ্রেত সৃষ্টি বিস্তৃত করিতে লাগিলেন[১৪।১৫]।

হে বশিষ্ঠ! হে মুনে! এই আমি তোমার নিকট মনের স্বরূপ, কার্য্য ও শক্তি কীর্ত্তন করিলাম[১৬]। যে যে রূপে চিত্তের প্রতিভাস সমুদিত হয়, চিত্ত সেই সেই রূপেই প্রকাশিত ও দর্শিত হয়[১৭]। তাহার উদাহরণ দেখ, ইন্দুতনয়গণ সামান্য ব্রাহ্মণ হইয়া চিত্ত প্রতিভাস বলে ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়াছিল[১৮]। যেমন ঐন্দবজীবগণ চৈতন্য ভাব হইতে চিত্তভাব ও চিত্তভাব হইতে ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ হইয়াছিল, তেমনি, আমরাও প্রোক্ত প্রণালীতে ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি[১৯]। প্রতিভাসস্বভাব চিত্তের যে প্রতিভাস, তাহাই দেহাদিরূপে প্রতিভাত হয়। চিত্ত ব্যতীত আর কেহ দেহদ্রষ্টা নাই[২০]। চিত্তই কামকর্ম্মাদিবাসনার অনুসারী হইয়া আত্মাতে চমৎকারিত্ব বিস্তার করে[২১]। চিত্তময় আতিবাহিকনামক সূক্ষ্ম দেহও সুনিবিড় ভ্রান্তির ফল। আবার তাহাই অত্যন্ত স্থূল ভ্রান্তির যোগে জীব এবং ভ্রান্তিবিগমে ব্রহ্ম[২২।২৩]। হে বশিষ্ঠ! চিত্ত ব্যতিরেকে আমি বা দেহশালী অন্য কিছু নাই। এই যে দেহাদি দেখিতেছ, এ সকল ঐন্দবসম্বিদের ন্যায় অসৎ[২৪]। ইন্দুসন্তানগণের ব্রহ্মত্বও মদীয় চিত্তের একাংশ। অর্থাৎ তাহাও মদীয় চিত্তের কল্পনা[২৫]। আমি যে এখানে ব্রহ্মা হইয়া অবস্থিতি করিতেছি, ইহাও চিত্তের অন্য এক প্রকার বিলাস। পরমাত্মাই, সর্ব্বপ্রপঞ্চশূন্য শূন্যরূপী অন্যাকাশ হইতে যেন পৃথক্ হইয়া দেহাদি আকারে অবস্থিত রহিয়াছেন[২৬]। যাহা বিশুদ্ধ চিৎ তাহাই পরম এবং তাহাই স্বমোহের প্রচ্ছাদনে জীব। সেই জীব মন হইয়া বৃথা দেহাদিভাব অনুভব করে। চিদ্বপু পরমাত্মাই সর্ব্বাত্মা এবং তিনিই ঐন্দব সৃষ্টির ন্যায় মদীয় সৃষ্টির আকারে প্রতিভাত হইতেছেন। অপিচ, তিনি আপন মায়া শক্তিতে এতদ্রূপ (ব্রহ্মাণ্ডরূপ) দীর্ঘ স্বপ্ন অনুভব করিতেছেন। যেমন ইন্দুপুত্রগণের বিশ্ব দ্বিচন্দ্রাদিদর্শনের ন্যায় ভ্রান্তিবিশেষ, সেইরূপ, মদীয় বিশ্বও ভ্রান্তি বিশেষ অর্থাৎ চিত্তময় ও চিত্তপরিকল্পিত[২৭।২৯]। ইহা সৎ ও অসৎ দুএর বহির্ভূত। কেননা উপলব্ধি কালে সৎ ও অনুপলব্ধি কালে অসৎ বলিয়া অবধারিত হয়[৩০]। সেই সংকল্পাত্মা বৃহদ্বপু মন জড়ও বটে, অজড়ও বটে। যেহেতু দৃশ্য, সেই

হেতু জড়, এবং যে হেতু ব্রহ্ম, সেই হেতু অজড়[৩১]। মন দৃশ্যানুভব-কালে দৃশ্যের ন্যায় এবং ব্রহ্মানুভব কালে ব্রহ্মের সমান হয়। যেমন সুবর্ণে সুবর্ণত্ব ও কটকত্ব অবিরুদ্ধ, তেমনি, মনে জড়াজড়ত্ব অবিরুদ্ধ[৩২]। ব্রহ্ম সর্ব্বময়; সে ভাবে সমস্তই জড় ও সমস্তই চেতন। বলিতে কি, আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত সমুদায় জগৎ বস্তুতঃ জড়াজড়ধর্ম্মবর্জ্জিত। যুক্তি চক্ষে দেখিতে গেলে একের উক্ত উভয়বিধতা অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় সত্য; পরন্তু পরমার্থ দর্শনে তাহা নির্থক। অর্থাৎ পরমতত্ত্বে জড়ত্ব ও চেতনত্ব কোনও ধর্ম্মের অবস্থান সিদ্ধ হয় না[৩৩]। যদি বৃক্ষাদি পদার্থ চিন্ময় না হইত, তাহা হইলে ইহ জগতে উপলব্ধি কথা প্রসিদ্ধ থাকিত না। (চৈতন্যোপাদানক) উপলব্ধি ব্যবস্থার নিয়ম এই যে, চৈতন্যে চৈতন্যে সমান হইলে তবে তাহা (উপলব্ধি) প্রসিদ্ধ হয়[৩৪]। * যাহা উপলব্ধির বিষয় হয়, বস্তুতঃ তাহাও জড় নহে; কিন্তু অজড়। সুতরাং বুঝিতে হইবেক, সমস্তই অজড় এবং চিত্তের রূপ[৩৫]। † অতএব, ইহা জড় ইহা অজড়, এ সকল কথার কোন বাস্তব অর্থ নাই, কেবল মাত্র কথা ব্যবহার আছে। সে পদ অর্থাৎ ব্রহ্মপদ অনির্দ্দিশ্য; তাহাতে মরুভূমে লতাদির অসম্ভবের ন্যায় ইত্থম্প্রকারে নির্দ্দেশ অসম্ভব[৩৬]। চিত্তের চেত্যাকার হওয়াই মনত্ব এবং তাহাতেই জড়াজড় বিভাগের ব্যবস্থা। তাঁহার স্ফূর্ত্তিভাগ (চেতনাংশ) অজড় এবং অস্ফূর্ত্তিভাগ চেত্য বা জড়[৩৭]। যাহাকে অববোধ শব্দে বলা যায় তাহা চিদ্ভাগ এবং যাহাকে চেত্য (চিত্তে ভাসমান) বলা যায় তাহা জড়ভাগ। জীব উক্ত প্রণালীক্রমে জগদ্ভ্রান্তি অনুভব করতঃ তাহাতে লোল (অপৃথক ভাব প্রাপ্ত) হইতেছে[৩৮]। অতএব, যাহা শুদ্ধ চৈতন্য, তাহাই উক্ত ক্রমে চিত্ত ও জগৎ এই দ্বিধা আকারে অবস্থান করিতেছে। সুতরাং সমুদায় জগৎ চিদ্বুদ্ধিতে দেখিলে চিন্ময় (চিৎ পদার্থ ছাড়া নহে), এবং দ্বৈত বুদ্ধিতে দেখিলেও চিন্ময় (চিৎ ছাড়া অন্য

* দর্শন গ্রন্থে লিখিত আছে, বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্য ও মনোবৃত্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্য ইন্দ্রিয় দ্বারা অভেদ অর্থাৎ অপৃথক্ হইলেই প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মে। যে বস্তু দূরে থাকে, ইন্দ্রিয়ের অগোচরে থাকে, অনুমানাদির দ্বারা সে বস্তুর জ্ঞান হইলেও তাহা পরোক্ষ, থাকে। প্রত্যক্ষ হয় না। এইখানে সেই কথাই বলা হইয়াছে।

† অভিপ্রায় এই যে, সর্ব্বত্র সর্ব্বব্যাপী চৈতন্য বিদ্যমান, তদাশ্রয়ে চিত্তের যে ভিন্ন ভিন্ন পরিণাম হয়, সেই সকল পরিণাম বিষয় বা ব্যবহার্য্য বস্তু নামে প্রসিদ্ধ।

কিছু নহে)[৩৯]। ফলিতার্থ—চিৎই ভ্রান্ত ব্যক্তির ন্যায় আপনিই আপনাকে অন্যাকারে দেখিতেছে[৪০]। আবার ইহাও বুঝিতে হইবে যে, পরমার্থ পদে ভ্রান্তি নাই সুতরাং ভ্রান্ত আত্মাও নাই। যেমন জলপূর্ণ সমুদ্রে জল ব্যতীত পদার্থান্তর নাই, তেমনি, পূর্ণস্বভাব চিদ্বস্তুতেও পদার্থান্তর নাই[৪১]। চিত্তের রূপ সমুদায় জড় নামে প্রখ্যাত হইলেও চিতের অতিরিক্ত নহে। কেননা, সেই জড়ভাবেও চিতের ভাব অনুভূত হয়। চিদ্ভাব না থাকিলে স্ফূর্তি পায় না এবং স্ফূর্তি প্রাপ্ত না হইলেও "ইহা জড়" এরূপ অবধারণ হয় না। অতএব, যেমন জড়ে বোধের সত্তা, তেমনি, বোধেও জড়ের প্রতিভাস। যাহা বোধ (চৈতন্য) তাহা চিদ্ভাগ এবং তাহাতে যে অহংএর উদয় হয় তাহা জড়ভাগ[৪২]। বস্তুতঃ পরমার্থদর্শনে (জ্ঞানদৃষ্টিতে) পরতত্ত্ব ব্রহ্মে অল্পমাত্রও অহংমমভাবের স্থিতি নাই। যাহা পরতত্ত্ব তাহা সংবিৎসার অর্থাৎ কেবল সংবিৎ (মুখ্যজ্ঞান)। তাহাতে অন্য কোন কিছু নাই[৪৩]। তাহাতে যে চেত্যের উদয় দেখা যায়, যাহা অহং বুদ্ধির দ্বারা দৃষ্ট হয়, তাহা মৃগতৃষ্ণিকার অনুরূপ[৪৪]। যাহাকে অহং বৃত্তির আস্পদ বলিয়া মনে হয়, তাহাকে তুমি নিরাময় পদ বলিয়া জানিবে। অর্থাৎ তাহা বস্তুতঃ অহংএর আস্পদ বা আশ্রয় নহে। লোকে যেমন ঘনীভূত শৈত্যকে হিম বলিয়া জানে, তেমনি, ঘনীভূত বাসনাবিশিষ্ট চিৎকে অহং বলিয়া জানিতেছে[৪৫]। চিৎ আপনিই আপনাতে স্বপ্নে স্বমরণ অনুভবের অনুরূপে জাড্য দর্শন করে। চিৎ যে আপনার বিচিত্রা শক্তি প্রদর্শন করিতেছে, বিস্তার করিতেছে, তাহা জ্ঞানের দৃঢ়তা ব্যতীত উপশান্ত হইবে না[৪৬]। নানাশক্ত্যাত্মক চিত্তরূপ দেহই আতিবাহিক দেহ। তাহা আকাশের ন্যায় বিশদ (স্বচ্ছ)। এবং মনঃপ্রভৃতি পদার্থ তাহারই বিজৃম্ভণ[৪৭]। অতএব, স্থূল সূক্ষ্মাদি দেহ বিস্মৃত হইয়া চিত্তের দ্বারাই চিত্তের বিচার (স্বরূপ, শক্তি ও স্বভাবাদি পরীক্ষা) করা কর্তব্য[৪৮]। যদি চিত্তরূপ তাম্র (তামা) শোধিত হইয়া (রসায়ন দ্বারা) পরমার্থরূপ সুবর্ণে পরিণত হয়, তাহা হইলে অকৃত্রিম পরমানন্দ লব্ধ হয়। তখন আর দেহরূপ প্রস্তরখণ্ডে প্রয়োজন থাকে না[৪৯]। আরও দেখ, যাহা থাকে বা আছে, তাহারই শোধন কর্তব্য। যাহা নাই তাহার আবার শোধন কি? যেমন আকাশে বৃক্ষ নাই, তেমনি, আত্মায় দেহাদিও নাই। "ইহা দেহ" এ প্রতীতি কেবল

মিথ্যাজ্ঞানের প্রকারভেদ। যদি তাহা সৎ হইত তাহা হইলে উৎপ্রতি আগ্রহ করিতে (আমার বলিয়া অভিমান করিতে) আপত্তি উত্থাপিত হইত না[৬০]। যাহারা অসৎ দেহাদিতে বৃথা অহং মম (আমি ও আমার ইত্যাকার) অভিমান ধারণ করিতেছে তাহারাই আত্মাদি শব্দ সমূহকে দেহবাচী বলিয়া উপদেশ করে[৬১]। মূর্ত্তিরহিত চিত্ত দৃঢ় ভাবনার প্রভাবে মূর্ত্তের ন্যায় হইয়া থাকে। তাহার নিদর্শন—পূর্ব্বোক্ত ইন্দ্র, অহল্যা এবং ইন্দুপুত্রগণ। তাহারা দৃঢ় ভাবনার প্রভাবে সেই সেই প্রকার হইয়াছিল[৬২]। চিত্ত যখন যে ভাবে স্ফূর্ত্তি পায় তখন তাহাই হয়। সুতরাং বুঝা উচিত যে, বাস্তব পক্ষে দেহও নাই, অহংও নাই। কেবল এক অখণ্ড বিজ্ঞান মাত্র আছে, তাহা বিজ্ঞাত হইয়া তুমি ইচ্ছাবিহীন হইয়া সুখে অবস্থান কর[৬৩]। বালক যেমন ভূতের কল্পনা করিয়া ভীত হয়, আবার কল্পনা পরিত্যাগ করিলে নির্ভয় হয়, তেমনি, "এই আমার দেহ" ইত্যাকার কল্পনা করিলে সংসারভয় ও ঐ কল্পনা পরিহার করিলে নির্ভয় হইতে পারা যায়[৬৪]।

একনবতিতম সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিনবতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রঘুনাথ! সেই ভগবান্ ব্রহ্মা আমাকে ঐরূপ কহিলে পুনর্ব্বার আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। বলিলাম, হে ভগবন্! আপনি বলিলেন, শাপ মন্ত্রাদির শক্তি সমুদায় অমোঘ, অথচ সে সকলও ব্যর্থ হয়। কেন ব্যর্থ হয়? তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন। অপিচ, শাপ ও মন্ত্রের প্রভাবে জন্তুগণের মন, বুদ্ধি ও অন্যান্য ইন্দ্রিয় সকল বিমূঢ় হইতে দেখা যায়। যেমন পবন ও স্পন্দন এবং তিল ও তৈল পরস্পর অভিন্ন; দেহ ও মন কি তদ্রূপ অভিন্ন? অথবা দেহ নাই? আপনার উপদেশ শ্রবণে আমার যে প্রকার জ্ঞান হইয়াছে তাহাতে মনে হয়, দেহ বিনষ্ট হইলে মনও ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। আবার মনে হইতেছে, চিত্তই স্বপ্নের ও মৃগতৃষ্ণিকার ন্যায় বৃথা দেহভাব অনুভব করিতেছে। ঐ সকল বিচার করিয়া আমার এই সন্দেহ জন্মিতেছে যে, দেহ এবং মন, উভয়ের মধ্যে একের নাশ হইলে উভয় বিনষ্ট হয় কি না। অতএব, হে প্রভো! মন কেনইবা শাপাদির দ্বারা আক্রান্ত হয়? আবার কেনইবা শাপাদির দ্বারা আক্রান্ত হয় না? যাহা এই বিষয়ের গূঢ় রহস্য, তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন[১।৭]। ব্রহ্মা বলিলেন, হে মহামতে! এই জগৎকোশে এমন কিছুই নাই, যাহা শুভকর্ম্মানুপাতী পুরুষকারের দ্বারা না পাওয়া যায়[৮]। এই জগতে ব্রহ্মা হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত সমুদায় দেহধারী দ্বিশরীরী[৯]। এক শরীর মনোময়, অপর শরীর মাংসময়। মনোময় শরীর অতিচঞ্চল এবং অতিক্ষিপ্রকারী। মাংসময় শরীর স্থূল এবং নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর[১০]। সেইজন্য এই মাংসময় শরীর শাপ, অভিচার, বিদ্যা, শস্ত্র ও বিষাদির দ্বারা অভিভূত হয়[১১]। এ শরীর মূক, অশক্ত, দীন, ক্ষণভঙ্গুর ও পদ্মপত্রস্থ সলিলের ন্যায় চপল এবং দৈব, বাক্য ও প্রভু প্রভৃতির বশ্য হয়[১২]। শরীরীদিগের মনঃশরীর ভূতগণের আয়ত্তও বটে, অনায়ত্তও বটে[১৩]। পৌরুষ ও ধৈর্য্য অবলম্বন করিলেও ঐ অনিন্দিত শরীরকে অনেক সময়ে আক্রমণ করা যায় না[১৪]। নিয়তির নিয়ম এই যে, দেহীদিগের মনোরূপ দেহ যে

প্রকার যত্নপরায়ণ হয় সেই প্রকারই হয়। কারণ, এই শরীরই আপন নিশ্চয়ের ফলভাগী[১৫]। মাংসদেহের চেষ্টা সফল হয় না, কিন্তু মনোময় দেহের সমুদায় চেষ্টা সফল হইয়া থাকে[১৬]। যে চিত্ত সর্ব্বদা পবিত্র বিষয়ের স্মরণ করে, অভিশাপাদি সে চিত্তে শিলানিক্ষিপ্ত সায়কের ন্যায় বিফল হয়[১৭]। মাংসশরীর জলমগ্ন, বহ্নিপ্রবিষ্ট বা কর্দ্দমপতিত হইলেও তাহার প্রাপ্তি অপ্রাপ্তি মনের অনুসন্ধান অনুসারেই হইয়া থাকে[১৮]। হে মহামুনে! পুরুষকারান্বিত মন সর্ব্ববস্তু উপমর্দ্দন করিয়া ফলপ্রদ হয়[১৯]। স্মরণ কর, ইন্দ্র পুরুষকার দ্বারা চিত্তকে প্রিয়াময় করিয়া ক্লেশকে ক্লেশ বলিয়া অনুভব করে নাই[২০]। মাণ্ডব্য মুনিও পৌরুষ প্রযত্নে মনকে রাগবিহীন ও বিগত-সন্তাপ করিয়া শূলপ্রান্তে অবস্থিতি করিয়াও দুস্তরতর ক্লেশকে পরাজিত করিয়াছিলেন[২১]। দীর্ঘতপা নামে এক মহর্ষি কূপে নিপতিত হইয়া তথায় মানসিক যজ্ঞ করিয়া বিবুধপদ (দেবত্ব) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন[২২]। ইন্দুতনয়গণ নর হইয়াও ধ্যানরূপ পুরুষকারের দৃঢ়তায় ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল[২৩]। অন্যান্য অনেক ধীর মহর্ষিগণ ও দেবগণ চিত্ত হইতে স্বীয় অনুসন্ধান (ব্রহ্মাত্ম-উপাসনা) পরিত্যাগ করেন নাই[২৪]। যেমন শিলা, পদ্মের আঘাতে দ্বিখণ্ডিত হয় না, তেমনি, সর্ব্বপ্রকার আধি, ব্যাধি, শাপ, রাক্ষস ও পিশাচাদি, চিত্তকে খণ্ডিত করিতে সমর্থ হয় না। যাহারা শাপাদির দ্বারা বিচলিত হয়, বুঝিতে হইবে, তাহাদিগের মনোবিবেকের অক্ষমতাই তাহার কারণ[২৫।২৬]। যাহারা সাবধান চিত্ত, তাহারা এই সংসারে কি স্বপ্ন, কি জাগ্রৎ, কোনও অবস্থায় দোষজালে জড়িত হয় না[২৭]। রামচন্দ্র! সেইজন্য ঋষিদিগের উপদেশ—পুরুষ পুরুষকার সহকৃত মনের দ্বারা আপনিই আপনাকে পবিত্র পদে নিয়োজিত করিবেন[২৮]। মনে কোনও বিষয় অল্পমাত্র প্রতিভাত হইলে তৎক্ষণাৎ তাহা নিরূঢ় ও স্থূলত্ব প্রাপ্ত হইয়া উপভোগক্ষম হয়[২৯]। যেমন কুম্ভকারের ব্যাপারের পর মৃৎপিণ্ড পিণ্ডভাব পরিত্যাগ করিয়া ঘটভাব ধারণ করে, সেইরূপ, পুরুষের দৃঢ় ভাবনার দ্বারা তদীয় প্রাক্তনভাব বিনষ্ট হইয়া পরবর্ত্তী ভাব নিরূঢ় হয়[৩০]। হে মুনে! সলিল যেমন স্পন্দন মাত্রে তরঙ্গতা প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ, মনঃও ক্ষণমধ্যে ভাবনার দ্বারা অভিনব ভাব্যের প্রতিভাসত্ব প্রাপ্ত হয় এবং প্রাক্তন ভাব পরিত্যাগ করে[৩১]। মন কেবল মাত্র ভাবনার দ্বারা

সূর্য্যবিম্বে যামিনী ও চন্দ্রবিম্বে বিম্ব দর্শন করে। (দিবসে অন্ধকার দেখে এবং রাত্রেও চন্দ্রদ্বয় দর্শন করে।)[৩২]। চিত্ত ভাবনার দ্বারা চন্দ্রমণ্ডলকে শত শত অগ্নিশিখা সম্পন্ন দর্শন করে ও তৎকর্ত্তৃক দাহ অনুভব করে (বিরহী ব্যক্তি তাহার নিদর্শন। বিরহীরা জ্যোৎস্নার আলোকেও গাত্রদাহ অনুভব করে)[৩৩,৩৪]। চিত্ত প্রতিভার অনুগামী হইয়া লবণ রসকে মধুর জ্ঞানে পান করিয়া তৃপ্তি লাভ করে[৩৫]। চিত্ত কখন কখন নভোমণ্ডলে মহাবন অবলোকন করে ও তাহা ছেদন করিয়া তাহাতে উৎপল রোপণ করে। মন এবম্প্রকারে ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় কল্পনাজাল বিস্তার করিয়া সে সকল দর্শন করিয়া কখন হৃষ্ট, কখন তুষ্ট, কখন পুষ্ট, কখন রুষ্ট, কখন সুখী, কখন দুঃখী হয়। হে তাত! তুমি এই জগৎকে সৎ ও অসৎ দুএর বহির্ভূত বিবেচনা করতঃ ভেদ বুদ্ধি পরিত্যাগ করিবে[৩৬,৩৭]।

দ্বিনবতিতম সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিনবতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, পূর্ব্বে ভগবান্ ব্রহ্মা আমাকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা বর্ণন করিলাম[১]। অব্যক্তনামরূপ পরব্রহ্ম হইতে প্রথমতঃ নামোল্লেখের অযোগ্য (নিতান্ত সূক্ষ্ম বলিয়া নামোল্লেখের অযোগ্য) স্পন্দাত্মক ও নির্ব্বিকল্পজ্ঞান সদৃশ সর্ব্বপ্রপঞ্চবীজ উৎপন্ন হয়। কাল্পিক (কাল্পিক = কল্পারম্ভ সম্বন্ধীয়) পরিণামে তাহা স্বয়ং (আপনা আপনি) ঘনতা প্রাপ্ত হইয়া (নিবিড় হইয়া) সংকল্পবিকল্পশক্তিমৎ মনোরূপে উৎপন্ন হয়[২]। অনন্তর সেই মন আপনাতে সূক্ষ্ম ভূতের কল্পনা করে এবং তৎপরে তদ্দ্বারা আপনার স্বাপ্নশরীরের ন্যায় বাসনাময় শরীর কল্পনা করে। সেই তেজঃপ্রধান সমষ্টিসূক্ষ্মশরীর উপাধানে উৎপন্ন তৈজস পুরুষ (আত্মা) আপনার "পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা" এই নাম নির্দ্দেশ বা কল্পনা করেন[৩]। সুতরাং হে রামচন্দ্র! যিনি ব্রহ্মা তিনিই মন[৪]। এই মনস্তত্ত্বাকার ব্রহ্মা সঙ্কল্পময়ত্বহেতু যাহা সংকল্প করেন তাহাই দেখিতে পান[৫]। এই মন কর্ত্তৃক অনাত্মায় আত্মাভিমানরূপিণী অবিদ্যা পরিকল্পিত হইয়াছে। ব্রহ্মা তাদৃশী অবিদ্যার দ্বারা যথানুক্রমে এই গিরি, তৃণ ও জলধি সমন্বিত জগৎ রচনা করিয়াছেন[৬]। উক্ত প্রকারে, ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মতত্ত্ব হইতে এই জগৎ সমাগত হইলেও বুদ্ধিমোহ বশতঃ তার্কিকগণ ইহাকে কেহ প্রধান কেহ বা পরমাণু প্রভৃতি হইতে সমাগত বিবেচনা করেন[৭]। কিন্তু রাঘব! অর্ণবে তরঙ্গোৎপত্তির ন্যায় এই লোকত্রয় সেই ব্রহ্মেই সমুৎপন্ন হইয়াছে[৮]। পরমার্থতঃ অনুৎপন্ন এই জগতে ব্রহ্মার যে মনোরূপা চিৎ (চৈতন্য), তাহা সমষ্ট্যহংকাররূপ উপাধিতে আবিষ্ট হইয়া পরমেষ্ঠিতা (ব্রহ্মতা) প্রাপ্ত হয়[৯]। যাহা ব্যষ্ট্যহঙ্কারোপহিত অবান্তর চিৎশক্তি অর্থাৎ প্রতিবিম্বরূপা চিচ্ছক্তি এবং যাহা পিতামহরূপ মনোদ্বারা সমুল্লসিত হয়, সেই সকল পৃথক্ পৃথক্ চিদাভাস উপাধির অসংখ্যতায় অসংখ্য ও সংসরণশীল জীব[১০।১১]। তাহারা চিদাকাশ হইতে সমুৎপন্ন ও মায়াকাশে ভূতোপাধির সহিত মিলিত হইয়া আকাশস্থ বাতস্কন্ধের অন্তর্ব্বর্ত্তী চতুর্দ্দশ ভুবনের মধ্যে, যে ভূতজাতিতে যেরূপ

বাসনায় ও যেরূপ কর্ম্মে অভিনিবিষ্ট হয়, পরে সেই ভূত জাতির সাহায্যে প্রাণশক্তিদ্বারা হয় স্থাবর না হয় জঙ্গম শরীরে প্রবেশ করতঃ শুক্রশোণিতাদিরূপ বীজতা প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে তাহা হইতে জন্মগ্রহণ করে[১৩]। অনন্তর তাহারা বাসনানুরূপ কর্ম্মকারী ও তৎফলভাগী হয়[১৪]। পরে তাহারা বাসনানুযায়ী কর্ম্মরজ্জুর দ্বারা আবদ্ধ হইয়া কখন ভ্রান্ত, কখন উর্দ্ধগামী ও কখন অধোগামী হইতে থাকে[১৫]। কর্ম্ম ও কর্ম্ম-বাসনার বীজ ইচ্ছা অর্থাৎ কাম বা রাগ[১৬।১৭]। ঐ সকল জীবের মধ্যে কেহ কেহ, যাবৎ না পরম তত্ত্ববোধ হয় তাবৎ, সহস্র সহস্র জন্মকর্ম্মরূপ বায়ুর দ্বারা পরিভ্রান্ত হইয়া বনপর্ণবৎ বিলুণ্ঠিত হইতে থাকে। কেহ বা অজ্ঞানবিমোহিত হইয়া এই সংসারে বহুশত কল্প উত্তমাধমভাবে অব-স্থিতি করতঃ অসংখ্য জন্মপরম্পরা ভোগ করে। কোন কোন জীব কতিপয় অশুভ জন্ম অতিক্রম করতঃ শুভকর্ম্মপরায়ণ হইয়া এই জগতে উত্তম জন্ম লাভ করতঃ বিহার করে[১৮।১৯]। বাতোদ্ধৃত জলপরমাণু যেমন জলমধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ, কেহ কেহ পরমাত্মবিজ্ঞান লাভ করিয়া পরমাত্মায় বিলীন হয়[২০]। সেই অনাদি ব্রহ্মপদ হইতে এইরূপে জীব সমুদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে। এ উৎপত্তি রজ্জুতে সর্পোৎপত্তির ন্যায় অসত্য। এই সারশূন্যা অসত্যা সৃষ্টি বাসনাবিষধারিণী, জ্বর-কারিণী, অনন্তসঙ্কটজননী, এবং অনর্থকার্য্যের সংকারকারিণী। ইহা নানা দিক, নানা দেশ ও নানা কাল যুক্তা ও নানাপ্রকার শৈলকন্দরাদি-ধারিণী, আবির্ভাব ও তিরোভাবময়ী এবং অতীব বিচিত্রা[২১।২৩]।

হে রামভদ্র! এই মনোময় জগৎরূপা জীর্ণবল্লী তত্ত্বজ্ঞানরূপ কুঠার দ্বারা ছিন্না হইলে পুনর্ব্বার আর সমুৎপন্ন হয় না[২৪]।

ত্রিনবতিতম সর্গ সমাপ্ত।

চতুনবতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! এক্ষণে তোমার নিকট আমি উত্তম, মধ্যম, ও অধম প্রাণি-নিবহের উৎপত্তি কীর্ত্তন করিব, প্রণিহিত হও[১]। যে জীব পূর্ব্বকল্পীয় শেষ জন্মে শমদমাদি সাধন সম্পন্ন হইয়াও গুরুর অলাভে কিম্বা অন্য প্রতিবন্ধক বশতঃ তত্ত্বজ্ঞান লাভে অসমর্থ হইয়া মৃত হয়, সেই জীব এতৎ কল্পের প্রথম জন্মেই জ্ঞান লাভের যোগ্য হইয়া উৎপন্ন হয়। এই শ্রেণীর জীবের তাদৃশ জন্ম প্রথম নামে বিখ্যাত। এ প্রথমতা পূর্ব্বকল্পীয় শুভাভ্যাসের ফল। প্রথম অর্থাৎ উত্তম। এরূপ উত্তম জন্ম পাইলে সে, সেই জন্মেই সংসারমুক্ত হয়। সে যদি বৈরাগ্যের অল্পতা বশতঃ শুভলোক প্রাপ্তির ইচ্ছায় উপাসনাদি করিয়া থাকে, এবং তৎপ্রযুক্ত তাহার বিচিত্র সংসার বাসনা সঞ্চিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে, পর পর কতিপয় শুভ জন্ম গ্রহণ করিয়া বাসনা ক্ষয় করে এবং বাসনা ক্ষয়ের পর সংসারমুক্ত হয়। তাদৃশ জন্ম মধ্যম ও গুণপীবর নামে অভিহিত হয়। আর যে জন্ম তাদৃশ তাদৃশ অর্থাৎ সেই সেই সুখ-দুঃখফলপ্রদানসমর্থ দুর্ব্বাসনা ও দুষ্কর্ম্ম বহুল, সে জন্ম অধমসত্ত্ব নামে-খ্যাত। যে জন্ম বিচিত্র সংসারবাসনাযুক্ত ও সহস্র সহস্র জন্মের পর জ্ঞানপ্রদ হয়, সে জন্ম ধর্ম্মানুমানদ নামের যোগ্য। সেইজন্য তাহা অধমসত্ত্ব নামে প্রসিদ্ধ। যে জন্ম অত্যন্তশাস্ত্রাদিবহির্ম্মুখতা উৎপাদন করে, আর যদি অসংখ্য জন্ম ভোগের পরেও মোক্ষ লাভ সন্দিগ্ধ হয়, সে জন্ম অত্যন্ত তামস। পূর্ব্বকল্পীয় বাসনা অনুসারে এতৎ কল্পে যে জন্ম হয়, এবং যদি তাহাতে তাহার সর্গ নরক প্রাপক চরিত্রাদি দৃষ্ট হয়, তবে তাদৃশ মনুষ্যরূপ জন্মকে রাজসজন্ম বলিয়া জানিবে[২]। রাজসজন্মোচিত দুঃখানুভবের পর বৈরাগ্যাদিসম্পন্ন হইয়া জন্ম পরিগ্রহ করিলে মুমুক্ষুগণ সেরূপ জন্মকে মোক্ষলাভের উপযুক্ত বলেন। পরন্তু আমি সেই উৎপত্তিকে রাজসসাত্ত্বিক বলিয়া অনুমান করি। আর যদি যক্ষ গন্ধর্ব্বাদি কতিপয় জন্মের পর মানব জন্ম লাভ ও তজ্জন্মে জ্ঞান-

প্রাপ্তিক্রমে মোক্ষলাভ হয়, তবে, সে জন্ম আমার মতে রাজস-রাজস (রাজস=রজোগুণপ্রধান)। যেরূপ জন্মই হউক, শত শত জন্মের পরে চিরাভিলষিত মোক্ষ পদ উপস্থিত হইলে সাধুগণ সেরূপ জন্মকে রাজস-তামস বলেন। সহস্র সহস্র জন্মের পরেও যদি মোক্ষলাভ সন্দিগ্ধ হয় (সন্দেহ যুক্ত। মোক্ষ হয় কি না হয়, এরূপ মনে হয়) তাহা হইলে সে উৎপত্তি রাজসাত্যন্ততামস বলিয়া খ্যাত। যে উৎপত্তিতে সহস্র সহস্র জন্ম ভোগ হয় অথচ মোক্ষ পথে মতি হয় না, সে উৎপত্তিকে মহর্ষিগণ তামস জন্ম বলেন। তামস জন্মের প্রথমেই যদি মোক্ষ পথ দৃষ্ট হয় তাহা হইলে তাদৃশ জন্মকে তত্ত্বজ্ঞগণ তামস-সত্ব নাম প্রদান করেন। যদি কতিপয় জন্মের পরেই মোক্ষাধিকারী হইয়া উৎপন্ন হওয়া যায় তাহা হইলে সেই রজস্তমোগুণবহুলা উৎপত্তি তমোরাজস আখ্যা প্রাপ্ত হয়। পূর্ব্ব সহস্র জন্ম ও আগামী শত জন্ম ভোগের পরে যদি মোক্ষের উপযুক্ত হওয়া যায় তাহা হইলে সে উৎপত্তিকে তামস-তামস (তামস=তমোগুণবহুল) বলিয়া জানিবে। পূর্ব্বলক্ষজন্ম ও আগামী লক্ষজন্ম অতিক্রম করিলেও যদি মোক্ষ সন্দিগ্ধ (মোক্ষ কখনও হইবে কি না এরূপ সন্দেহ) হয়, তাহা হইলে তাদৃশ জন্ম অত্যন্ত তামস বলিয়া জানিবে। যত প্রকার জন্মের কথা বলিলাম, সমস্তই সেই ব্রহ্ম হইতে পয়োরাশি হইতে উর্ম্মিমালার ন্যায় সমাগত হয় বলিয়া জানিবে[১০।২০]। সমুদায় জীব তেজোময় ও স্পন্দনস্বভাব দীপ হইতে রশ্মিমালা নির্গমের ন্যায় ব্রহ্ম হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইতেছে। দৃশ্যমান ভূতপংক্তি প্রজ্জ্বলিত অনল হইতে স্ফুলিঙ্গ বিনির্গমের ন্যায় ব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে। দৃষ্টদৃষ্টি মাত্রেই চন্দ্রবিম্ব হইতে অংশু সমূহের ন্যায় ব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে[২১।২৩]। কনক হইতে কটক ও অঙ্গদ কেয়ূরাদির উৎপত্তির ন্যায় এই সকল জীব ব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে। নির্ম্মল নির্ঝর সলিল হইতে বিন্দু (জলকণা) উদ্ভবনের ন্যায় এই নিখিল ভূত সেই অনাময় ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। যেরূপ সলিল হইতে শীকর, আবর্ত্ত, লহরী ও বিন্দুসমূহের উৎপত্তি হয়, তদ্রূপ, এই ক্ষুদ্র ও বৃহৎ দৃষ্টদৃষ্টি ব্রহ্ম হইতেই সমুৎপন্ন হইয়াছে। যেমন মৃগতৃষ্ণাতরঙ্গিণী মরুনিপতিত ভাস্করতেজ হইতে ভিন্ন নহে, যেমন শীতরশ্মির আলোক চান্দ্র তেজ হইতে ভিন্ন নহে, সেইরূপ, এই ভূতজাতি যাহা হইতে সমাগত

তাহা হইতে ভিন্ন নহে। এ সমস্তই তাঁহাতে উৎপন্ন ও তাঁহাতেই পবিলীন হইতেছে।

হে রামচন্দ্র! পাবক হইতে স্ফুলিঙ্গরাশি উৎপত্তির ন্যায় এই ব্যবহারশালিনী শ্রী, (সংসার রূপ দৃশ্য সম্পত্তি) ভগবান্ ব্রহ্মার, ইচ্ছায় বিবিধ জগতে সমাগত, নিপতিত, উৎপতিত ও জাত হইতেছে[২০।৩২]।

চতুনবতিতম সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চনবতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, যদ্রূপ তরু হইতে যুগপৎ (অভিন্ন সময়ে) পুষ্প ও গন্ধ সমুৎপন্ন হয় বলিয়া অভিন্ন, তেমনি, সেই পরম পদ হইতে যুগপৎ প্রকাশিত কর্ত্তা ও কর্ম্ম অভিন্ন[১]। যদ্রূপ অনভিজ্ঞের দৃষ্টিতে নির্ম্মল নভোমণ্ডলে নীলিমা প্রস্ফুরিত হয়, তদ্রূপ, নির্ম্মল ব্রহ্মে জীব-ভাবের প্রস্ফুরণ হইতেছে[২]। হে রঘুনাথ! অল্প বিবেক দৃষ্টি পরিচালন করিলেই দেখা যায়, যে অবস্থায় অজ্ঞসম্মত ব্যবহারের প্রচলন, সেই অবস্থার কথা—জীব ব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন। কিন্তু ঐ কথা তত্ত্বজ্ঞগণের ব্যবহারে অশোভন অর্থাৎ যুক্তিবহির্ভূত। যুক্তিপক্ষ বা জ্ঞানিপক্ষ এই যে, যাহা ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন তাহা বাস্তব উৎপন্ন নহে। উৎপন্ন না হইলেও, যাবৎ না দ্বৈতকল্পনা অপনীত হয়, তাবৎ উপদেশ্য, উপদেশক ও উপদেশ কার্য্যকারী হইয়া থাকে। অতএব, ভেদদর্শী দিগের প্রতি "জীব নিশ্চয়ই ব্রহ্ম" এরূপ উপদেশ অনুপযুক্ত নহে, প্রত্যুত উপযুক্ত[৩।৪]। জ্ঞানচক্ষুঃ বিকশিত হইলে স্পষ্টই দেখা যায়, এই জগৎ অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বস্তু হইতে জলে তরঙ্গোৎপত্তির অনুরূপে উৎপন্ন হইয়াছে সুতরাং ইহা তাঁহা হইতে পৃথক্ নহে। পরন্তু ভ্রান্তি বশতঃ পৃথক্ বলিয়া অনুভূত হইতেছে[৭]। এ পর্য্যন্ত অনেক পর্ব্বতাকার জীবদেহ উক্ত পরম পদ হইতে উৎপন্ন হইয়া পুনঃ তাহাতে বিলীন হইয়াছে এবং অদ্যাপিও হইতেছে[৮]। যদ্রূপ নিকুঞ্জস্থ পাদপে পল্লবের উৎপত্তি ও অবস্থিতি, সেইরূপ, ব্রহ্মেই অশেষ জীব রাশির উৎপত্তি ও অবস্থিতি[৯]। যেমন বসন্তকাল আগতে নূতন নূতন অঙ্কুরের উদ্ভব হয় ও গ্রীষ্ম সমাগমে সে সকল লয় প্রাপ্ত হয়, তেমনি, সৃষ্টিকালে জীব সংখ্যার উৎপত্তি ও প্রলয় কালে সে সংখ্যার বিলয় হইয়া থাকে[১০]। এ সকল, সে সকল ও অন্যান্য জীব সকল (যাহারা ভবিষ্যতে প্রকট প্রাপ্ত হইবে তাহারা) সমস্তই সেই পরম তত্ত্বে উৎপন্ন, স্থিত ও প্রলীন হয়[১১]। হে রামচন্দ্র! যেমন পুষ্প ও তদ্‌গন্ধ পৃথক্ নহে, তেমনি, পুরুষ ও কর্ম্ম পৃথক্ নহে। কেননা, উক্ত উভয়ই সেই পরমেশ হইতে সমাগত ও পরমেশে বিলীন

হয়[১২]। দৈত্য, উরগ, সুর ও অমরগণ বস্তুতঃ উৎপন্ন না হইলেও ভাবতঃ অর্থাৎ বাসনা প্রবাহের দ্বারা উৎপন্নপ্রায় ও স্থিত হইতেছে[১৩]। হে সাধো! ঐরূপ উৎপত্ত্যাদির প্রতি আত্মবিস্মৃতি ব্যতীত কারণান্তর দৃষ্ট হয় না[১৪]।

রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! ধর্ম্ম বিষয়ে (ব্রহ্ম বিষয়েও বটে) শ্রুতি ব্যতীত প্রমাণান্তর নাই। একমাত্র শ্রুতিই উক্ত উভয়ের অস্তিত্বাদি সাধক প্রমাণ। যাঁহাদের জ্ঞান তৎপ্রসূত, তাঁহারা প্রামাণিক এবং তাঁহাদের দৃষ্টি প্রামাণিকদৃষ্টি নামে প্রসিদ্ধ। রাগদ্বেষাদিবিহীন প্রামাণিকদৃষ্টি মন্বাদি ঋষিগণ ধর্ম্মব্রহ্ম বিষয়ে অবিসম্বাদিনী। তাঁহারা শ্রুতিমূলা যুক্তির দ্বারা যাহা নির্ণয় ও নিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাই এক্ষণে শাস্ত্রসংজ্ঞায় অবস্থিত। আর যাঁহারা বিশুদ্ধসত্ত্বগুণোপেত রাগদ্বেষাদিবিহীন ও নিরতিশয়ানন্দব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারী তাঁহারা সাধু সংজ্ঞায় পরিগণিত। সাধুদিগের আচার ও শাস্ত্র এই দুইটী ধর্ম্মব্রহ্ম দেখিবার দৃষ্টি অর্থাৎ চক্ষুঃ। যাহারা অবোধ, কার্য্য সংসাধনের নিমিত্ত তাহাদের ঐ দুই চক্ষুর (সদাচারের ও শাস্ত্রের) অনুগামী হওয়া উচিত[১৫।১৭]। যে ব্যক্তি স্বর্গের ও মোক্ষের উপায়ীভূত তাদৃশ শাস্ত্রের ও সদাচারের অনুবর্ত্তী না হয়, সে, ইহলোকে শিষ্টগণ কর্ত্তৃক বহিষ্কৃত ও পরলোকে মহাদুঃখে নিপতিত হয়, ইহা সাধুগণের ও সৎশাস্ত্রের ঘোষণা। তাদৃশ শাস্ত্রে ও সাধু দিগের সমবায়ে (সমাজে) এ কথাও নিরূঢ় আছে যে, কর্ত্তা ও কর্ম্ম পরস্পর পর্য্যায়ক্রমে সংগত অর্থাৎ হেতু-ফল-ভাবে অবস্থিত। ফলিতার্থ এই যে, কখন কর্ম্মের ফল কর্ত্তা এবং কখন বা কর্ত্তার কর্ত্তৃত্বের ফল কর্ম্ম। কেননা, কর্ম্ম দ্বারা কর্ত্তা উৎপন্ন হন এবং কর্ত্তা কর্ত্তৃক কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয়। আরও বিশদ কথা—জন্তুগণ বীজ হইতে অঙ্কুরের ন্যায় কর্ম্ম হইতে এবং অঙ্কুর হইতে বীজের ন্যায় জন্তুগণ হইতে কর্ম্ম উৎপন্ন হইয়া থাকে[১৮।২১]। জন্তুগণ যেরূপ বাসনা লইয়া ভবপিঞ্জরে জন্ম গ্রহণ করে, জন্মের পর তাহারই অনুরূপ ফল অনুভব করে[২২]। হে ব্রহ্মন্! যদি এই সিদ্ধান্তই খাঁটি হয়, তাহা হইলে আপনি যে জন্মবীজ কর্ম্মের কথা না বলিয়া ব্রহ্মপদ হইতে ভূতগণের উৎপত্তি হওয়ার কথা বলিলেন, তাহা কি প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে[২৩]? রিক্ত অর্থাৎ কারণপরিশূন্য মায়াশবল ব্রহ্মে আকাশাদি স্থূল দেহান্ত সৃষ্টিরূপ ফল বিদ্যমান আছে এবং স্থূল সূক্ষ্ম

দেহাদিতে ভোগ ও ভোগসামগ্রী (কারণ পক্ষ) সৃষ্টিরূপ ফল প্রসক্ত (সংলগ্ন) আছে, অপিচ, জন্মের সহিত কর্ম্মের, হেতু-ফল-ভাব নির্দ্ধারিত আছে, আপনার উক্তবিধ কথায় সে নির্দ্ধারণ প্রমার্জ্জিত হইয়া যাই-তেছে। আরও দেখুন, আপনি ঐ দুই সিদ্ধান্তকেও নিরাকৃত করিতেছেন[২৪,২৫]। অপিচ, এই এক বিশেষ দোষ প্রসক্ত হইতেছে যে, যদি কর্ম্মফল না থাকে, তাহা হইলে নরকাদি ভয়ের অভাবে লোক সকল পরস্পর পরস্পরকে হিংসন ভক্ষণাদি করিয়া ও সঙ্কর আতঙ্কে করিয়া অবশেষে বিনষ্ট হইয়া যাওয়াই সুসম্ভব হয়[২৬]। হে বেদবিৎশ্রেষ্ঠ! নিষ্পাদিত কর্ম্ম, ফলে পরিণত হয় কি না, এই বিষয়ে যে আমার সংশয় হইয়াছে, সে বিষয়ের তত্ত্ব কি? রহস্য কি? আপনি তত্তাবৎ বর্ণন করিয়া আমার সংশয়চ্ছেদ করুন[২৭]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাঘব! তুমি অতি উত্তম প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছ। যাহাতে তুমি ঐ বিষয়ে উত্তমরূপ জ্ঞান লাভ করিতে পার, তাহা কীর্ত্তন করি, শ্রবণ কর[২৮]।

যাহা কর্ত্তব্যানুসন্ধানরূপ মানসী ক্রিয়া, মনের বিকাশ, তাহাই কর্ম্ম-বীজ। * কেননা, তাহারই অনন্তর ক্রিয়ানিষ্পত্তিরূপ ফল হইতে দেখা যায়[২৯]। সৃষ্টির আদিতে যে সময়ে পরম পদ হইতে মনোরূপ তত্ত্ব (হিরণ্যগর্ভ) সমুৎপন্ন হইয়াছিল সেই সময় হইতেই জন্তুগণের কর্ম্ম সমুত্থিত হইয়াছে ও তখন হইতেই জীব প্রাক্তন কর্ম্মানুরূপ দেহ ধারণ করিয়া আসিতেছে[৩০]। যেমন পুষ্প ও তদন্তর্গত সৌগন্ধ অভিন্ন ভাবে অবস্থিত, তেমনি, কর্ম্ম ও মন পরস্পর অভিন্ন ভাবে অবস্থিত। বুধগণ স্পন্দনাত্মক ক্রিয়াকেই কর্ম্ম নামে নির্দ্দেশ করেন। (মনে যে কর্ম্মসং-স্কারাত্মিকা ক্রিয়া লুক্কায়িত ভাবে অবস্থিত থাকে তাহারই নাম অদৃষ্ট। সেই অদৃষ্ট যথাকালে দেহাদি ও স্বর্গনরকাদি ফলে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে।) এই যে কর্ম্মের আশ্রয় দেহ, ইহাও পূর্ব্বে মনোরূপে অবস্থিত ছিল। কারণ, মনঃ অগ্রে ভবিষ্যদ্দেহাকারে পরিভাবিত হয়, পরে তাহার তদনুরূপ শরীর নিষ্পন্ন হয়। সুতরাং যাহা চিত্ত নামের নামী তাহাও

* মনে যখন যেরূপ কর্ত্তব্য বিষয়ক ক্রিয়ার উদয় হয়, অর্থাৎ মন যাহা চিন্তা করে, বাক্য তদনুরূপে বহির্গত হয়। এবং বাহিরে হস্তাঙ্ঘ্রির পরিচালনাদিও সেই রূপে নির্ব্বাহিত হয়। সুতরাং মনের তাদৃশ তাদৃশ উন্মেষ, কর্ম্মের (ক্রিয়ার) বীজ বা মূল কারণ।

মনঃ৩২। শৈল, ব্যোম, সমুদ্র, স্বর্গ বা নরক, সমস্তই আত্মকৃত কর্ম্মের ফল, তদতিরিক্ত নহে৩৩। ঐহিক কর্ম্মই হউক, আর প্রাক্তন কর্ম্মই হউক, সমস্তই পৌরুষপ্রযত্ন বিশেষ। সুতরাং তাহা নিষ্ফল হইবার নহে৩৪। যেমন কৃষ্ণতা ক্ষীণ হইলে কজ্জলত্বও ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ, স্পন্দধর্ম্ম প্রাণের স্পন্দন বা কর্ম্ম বিরত হইলে মনও ক্ষীণ হইয়া যায়৩৫। কর্ম্মনাশে মনোনাশ ও মনোনাশে কর্ম্মনাশ অবশ্যম্ভাবী। মনোক্ষয় মূলক অকর্ম্মতা মুক্ত পুরুষে প্রসিদ্ধ। অন্যত্র নহে৩৬। যেমন বহ্নি ও ঔষ্ণ্য সদা সংশ্লিষ্ট অর্থাৎ অপৃথক্, তেমনি, চিত্ত ও কর্ম্ম নিরন্তর সংশ্লিষ্ট সুতরাং একতরের অভাবে অন্যতরের বিলয় অবশ্যম্ভাবী৩৭। চিত্ত সর্ব্বদাই স্পন্দনরূপ বিলাসে সমবেত হইয়া কর্ম্মসিদ্ধ আকারে (বিহিতনিষিদ্ধ নিষ্পাদন দ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্মরূপে বা অদৃষ্টের আকারে) পরিণত হয়, এবং কর্ম্মও চিত্তের ফলভোগানুরূপ স্পন্দাত্মক বিলাসের সহিত মিলিত হইয়া চিত্তরূপে পরিণত হয়। এইরূপে চিত্ত ও কর্ম্ম পরস্পর ধর্ম্ম ও কর্ম্ম নাম প্রাপ্ত হইয়া লোক মধ্যে ধর্ম্ম ও কর্ম্ম শব্দে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে৩৮।

পঞ্চনবতিতম সর্গ সমাপ্ত।

ষণ্ণবতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, মন কি? মন অন্য কিছু নহে, মন ভাবময়। যাহা পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের বিকল্পনা বা বিভাবনা, মন তাতিরিক্ত নহে। সেই বিভাবনা (ভাব বিশেষ) স্পন্দনধর্ম্মের উদয়ে বিহিতনিষিদ্ধ ক্রিয়ায় পরিণতা হয় এবং সেই ক্রিয়া আবার অদৃষ্টতা প্রাপ্ত হইয়া ফলের উৎপত্তি করে। সুতরাং জন্তুগণ তদনুগামী হইয়া তদনুরূপ ফল অনুভব করে[১]।

রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! মন জড় অথচ অজড়ের ন্যায়। তাদৃশ মনের সঙ্কল্পসমারূঢ় রূপ অর্থাৎ আকার সবিস্তরে বর্ণন করুন[২]। বশিষ্ঠ বলিলেন, বৎস! মন, সর্ব্বশক্তি অনন্ত আত্মতত্ত্বের সংকল্প শক্তির রচনা বিশেষ। আছে? কি নাই? এতদ্রূপ পক্ষদ্বয় উপস্থাপিত করিয়া মন যে তদ্দ্বয়ের মধ্যে সঞ্চরণ করে, দোদুল্যমান হয়, অর্থাৎ উভয় পক্ষে অবস্থান করতঃ একত্র অনবস্থিত হয়, তাহাই মনের সংকল্পারূঢ় অবস্থার রূপ[৩,৪]। আত্মা সদা চিদ্রূপ। তথাপি, সর্ব্বদা ভাসমানতা সত্ত্বেও যে "আমি জানি না" এতদ্রূপ প্রত্যয় যাহার দ্বারা উপস্থিত হয়, এবং কর্ত্তা না হইলেও যে অহং কর্ত্তা ইত্যাকার প্রতীতি যাহার দ্বারা উৎপন্ন হয়, তাহাকেই তুমি মন বলিয়া জানিবে[৫]। যেমন গুণী গুণহীন হয় না, তেমনি, মনও কল্পনাত্মিকা কর্ম্মশক্তি বিরহিত হয় না[৬]। যেমন বহ্নি ও ঔষ্ণ্য অভিন্ন, তেমনি, কর্ম্ম ও মন এবং মন ও জীব অভিন্ন[৭]। সেই চিত্তরূপী মন ফলজনক কর্ম্মদ্বারা আপনার সঙ্কল্প শরীরকে নানারূপে বিস্তৃত করিয়া মায়াময় বিশ্বকে অনেকাকারে বিস্তৃত করিতেছে[৮,৯]। যে স্থানে যাহার যে বাসনা উন্মেষিত হয় সেই স্থানেই তাহার সেই বাসনা ফলপ্রসূ হয়[১০]। বাসনা যেন বৃক্ষ, কর্ম্ম তাহার বীজ, মনঃস্পন্দ শরীর, (গুঁড়ি), ক্রিয়া তাহার শাখা, সে সকল (শাখা সকল) বিচিত্র-ফলবিশিষ্ট[১১]। মন যাহা অনুসন্ধান করে, সমুদায় কর্ম্মেন্দ্রিয় তাহা সুসম্পন্ন করে। সে ভাবেও কর্ম্ম মন বলিয়া গণ্য হয়[১২]। বলিতে কি—মন, বুদ্ধি, অহংকার, চিত্ত, কর্ম্ম, কল্পনা, সংস্মৃতি, বাসনা, বিদ্যা, প্রযত্ন, স্মৃতি, ইন্দ্রিয়, প্রকৃতি, মায়া, ক্রিয়া, এ সকল শব্দবৈচিত্র্য ব্যতীত, বস্তুতঃ

অন্য কিছু নহে। ফলতঃ একই মন ঐ সকল ভাবে বিবৃত হইয়াছে। অপিচ, একাধার ব্রহ্মাত্মায় ঐ সমস্তের আরোপ হওয়ায় সুতরাং ঐ সকল, সংসার ভ্রমের কারণ বলিয়া গণ্য হইতেছে[১৩।১৪]। কাকতালীয় যোগে অর্থাৎ আকস্মিক রূপে স্বরূপ বিস্মৃতির পরক্ষণে অপরিচ্ছিন্ন আত্মচৈতন্তে যে বাহ্য বস্তু কল্পনার উন্মেষ বা উদয় হয়, তাহা হইতে ঐ সকল পর্য্যায় (নামসঙ্কেত) কৃত অর্থাৎ সুসম্পন্ন হয়[১৫]।

রামচন্দ্র বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! পরা সম্বিদের (বিশুদ্ধ চিদ্রূপের) কল্পিত ঐ সকল বিচিত্র পর্য্যায় (নাম) কি প্রকারে রূঢ়িতা প্রাপ্ত হইয়াছে? অর্থাৎ লোকে ও শাস্ত্রে উভত্রই প্রসিদ্ধ হইয়াছে? তাহা বলুন[১৬]। বশিষ্ঠ বলিলেন, পরাসম্বিদ যখন স্বাশ্রিত অবিদ্যার দ্বারা কলঙ্কিতপ্রায় হইয়া উন্মেষরূপিণী (বিকারোদ্রেক বিশিষ্ট) হন, হইয়া "ইহা এই, তাহা সেই" ইত্যাদি প্রকার কল্পনা করেন, জানিবে—তখন তিনি মনঃ হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন[১৭]। যখন তিনি বিবিধ কল্পনার মধ্য হইতে কোন এক কল্পনাকে নিশ্চয় করিয়া সুস্থির ভাবে অবস্থিতি করেন, তখন তিনি বুদ্ধি নামে প্রথিত হন। এই বুদ্ধিই ইয়ত্তা অবধারণ করে অর্থাৎ বস্তু-নিশ্চয় করে[১৮]। উক্ত সম্বিৎ যখন মিথ্যাভিমান অবলম্বনে আপনার সত্তা কল্পনা করেন, তখন তিনি অহঙ্কার সংজ্ঞায় প্রথিত হন। এই অহঙ্কার সর্ব্ব প্রকার অনর্থের বীজ ও বন্ধনের কারণ[১৯]। যখন তিনি পূর্ব্বাপর প্রতিসন্ধান ত্যাগ করিয়া বালকের ন্যায় এক বিষয় পরিত্যাগ ও অন্য বিষয়ের স্মরণ করেন, তখন তিনি চিত্ত নামে প্রথিত হন[২০]। সেই সম্বিৎ যখন আবার কর্ত্তাকে স্পন্দগুণে (স্পন্দ=ক্রিয়া) গুণী করেন ও স্পন্দফল প্রাপনার্থ অর্থাৎ শরীর প্রভৃতির দেশান্তর সংযোগ (এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাওয়া) সম্পাদনার্থ প্রধাবিতের ন্যায় হন, তখন তিনি কর্ম্ম নামে উদাহৃত হন[২১]। যখন তিনি কাকতালীয় ন্যায়ে অর্থাৎ অনির্দ্দিষ্ট আকস্মিক কারণে নিজ পূর্ণতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাঞ্ছিত বিষয়ের কল্পনা করেন, তখন তিনি কল্পনা নামে অভিহিত হন[২২]। "ইহা আমার পূর্ব্বদৃষ্ট অথবা ইহা আমি দেখি নাই" এইরূপ আন্তরিক নিশ্চয়চেষ্টার উদ্ভবে তিনি স্মৃতি নামে কথিত হন[২৩]। সেই সম্বিৎ যখন সূক্ষ্ম পদার্থশক্তি রূপে অবস্থিতি করেন, তখন তিনি বাসনা নামে উক্ত হন[২৪]। যখন দেখিবে, তিনি,

কেবল এক বিমল আত্মতত্ত্বই আছে, দ্বৈত এই জগৎ অবিদ্যাকলঙ্কের ফল বা প্রভাব, সুতরাং মিথ্যা, ইত্যাকারে প্রস্ফুরিত হইতেছেন, তখন তিনি বিদ্যানামে উক্ত হন[২৫]। সেই সম্বিদ যখন মিথ্যাবিকল্প কল্পনার দ্বারা আপনার পরমত্ব, অপরিচ্ছিন্নত্ব ও সর্ব্বেশ্বরত্বাদি বিস্মৃত হন, তখন তিনি মনোনামে (মনঃ শব্দে) কথিত হন[২৬]। * এই মনোভূতা সম্বিদ্ শ্রবণ, স্পর্শন, দর্শন, ঘ্রাণ ও ভোজনাদির দ্বারা জীবভাবাপন্ন ইন্দ্রকে অর্থাৎ পরমেশ্বরকে আনন্দিত করেন বলিয়া ইন্দ্রিয় নামে কথিত হন[২৭]। তিনিই স্বয়ং কর্ত্তা এবং উপাদান হইয়া এই দৃশ্য বিশ্ব নির্ম্মাণ করেন বলিয়া প্রকৃতি নামে উক্ত হন[২৮]। তিনি যখন সৎ অসৎ সদসৎ অর্থাৎ অনির্ব্বাচ্য হন, তখন তিনি মায়া নামে কথিত হন[২৯]। তিনি দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, রসন ও ঘ্রাণ প্রভৃতির দ্বারা কার্য্যকারণভাব (সংসারবীজত্ব) প্রাপ্ত হইয়া ক্রিয়া নামে অভিহিত হন[৩০]। একমাত্র পূর্ণস্বভাব চিদ্বস্তু অবিদ্যা কলঙ্কের যোগে উক্ত প্রকারে অনুপাতিনী অর্থাৎ সৃষ্টি কার্য্যে উন্মুখ সুতরাং রূপধর্ম্মী হওয়ায় ঐ সকল পর্য্যায় বৃত্তিতে (পর্য্যায়=নাম। বৃত্তি=তন্নামক অর্থ) রূঢ় হইয়াছে[৩১।৩২]। বিশুদ্ধরূপা চিৎ (পরমাত্মা বা ব্রহ্ম) "অহং অজ্ঞঃ" ইত্যাকার অজ্ঞান মালিন্যের সন্নিধান প্রভাবে অথবা দ্বৈতবাসনা কলঙ্কের সন্নিধান বশতঃ পূর্ণতা বিহীনের ন্যায় হওয়াতেই ঐ সকল চিদ্ভাগ ঐ ঐ রূপে (মন ও বুদ্ধি প্রভৃতির আকারে) প্রস্ফুরিত হয়[৩৩]। সুতরাং সম্বিদ্ই জীব, মন, চিত্ত ও বুদ্ধি নামে কথিত হইতেছেন। অতএব, উক্ত বিষয়টী এইরূপে বুঝা উচিত যে, পরমাত্মপদ হইতে বিচ্যুত অজ্ঞানকলঙ্কযুক্ত একাত্মক সম্বিদেরই ঐরূপ ঐরূপ নানা সঙ্কল্প কল্পনাকে বুধগণ ঐ সকল নাম প্রদান করিয়া থাকেন[৩৪।৩৫]।

রামচন্দ্র বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! মন জড়? কি চেতন? তাহা আমি ভাল রূপ বুঝিতে পারিতেছি না[৩৬]। মন ও জীব অভিন্ন বলায় চেতন বলিয়া মনে হয়, আবার শাস্ত্র প্রসিদ্ধি দেখিলে জড় বলিয়া সংশয়

---

* এখানে যে মনের কথা বলা হইয়াছে তাহা সাঙ্খ্যের মহত্তত্ত্ব অর্থাৎ প্রকৃত প্রমুক্ত বুদ্ধিতত্ত্ব। পুরাণাদি শাস্ত্রে তাহাকে হিরণ্যগর্ভ বলে। এবং এখানে যে মনের উল্লেখ হইবে, এ মন ইন্দ্রিয়াত্মক। অর্থাৎ শরীরস্থ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা অন্তঃকরণ।

হয়। বশিষ্ঠ বলিলেন, রামচন্দ্র। মন জড় নহে, চেতনও নহে, চৈতন্য-ভাব প্রাপ্তও নহে। চিৎ যখন সংসার দশায় আরূঢ় হওয়ায় উপাধি-মালিন্য বহন করেন তখন তিনি মন আখ্যায় অভিহিত হন[৩৭]। মন যেমন চিৎ অচিৎ উভয়বৈলক্ষণ্য যুক্ত, তেমনি, সদসদ্বৈলক্ষণ্য যুক্ত। প্রত্যেক প্রাণীতে অবস্থিত জগৎ কারকের যে আবিল (আবিল—অবিদ্যাগ্রস্ত) রূপ, তাহা চিত্ত নামে কথিত হইয়া থাকে[৩৮]। চিৎ এব অবস্থায় আপনার শাশ্বত ও নিশ্চিত একরূপতা পরিত্যাগ করিয়া অবস্থিতি করে, তাহার সেই অবস্থা অস্মমতে চিত্ত এবং তাহা হইতেই এই জগৎ জাত হইয়াছে[৩৯]। জড় ও অজড় উভয় ভাবের মধ্যগামী বা উভয় ভাবে দোলায়মান চিদ্বস্তু তত্ত্ব শাস্ত্রে মনঃ নামে অভিহিত হয়[৪০]। হে রামভদ্র! সেইজন্য বলিয়াছি, মনঃ জড়ও নহে এবং চিন্ময়ও নহে। তাদৃশ মনের বক্ষ্যমাণ নানা নাম সংকল্পিত হয়। যথা—অহঙ্কার, মন, বুদ্ধি ও জীব প্রভৃতি। মন নটের ন্যায় কর্ম্মভেদে নাম ভেদ ধারণ করেন[৪১।৪২]। নরগণ যেমন কর্ম্মবশতঃ পাচক পাঠক প্রভৃতি নাম ধারণ করে, তেমনি, মনঃও কর্ম্মভেদে নানা উপাধি ধারণ করে[৪৩]। হে রাঘব! আমি চিত্তের যে সকল নাম কীর্ত্তন করিলাম, বাদিগণ কল্পনা দ্বারা তাহার অন্যথা করিয়া থাকেন[৪৪]। তাহারা তর্ক উত্থাপন পূর্ব্বক মনের উপর দ্রব্যত্বাদি বুদ্ধি সমারোপিত করিয়া স্বেচ্ছা-নুসারে মহৎ মনের ভিন্ন ভিন্ন নাম কল্পনা করে[৪৫]। মনঃ কোন কোন বাদীর মতে জড়, কোন কোন বাদীর মতে অজড়, কেহ উহাকে অহঙ্কৃতি এবং কেহ বা উহাকে বুদ্ধি বলিয়া নির্দ্দেশ করে[৪৭]। হে রঘুনন্দন! আমি সঙ্কল্পবিকল্পাদি বৃত্তি অনুসারে একই অন্তঃকরণের মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার নাম প্রদান করিলাম, কিন্তু নৈয়ায়িকগণ, সাংখ্য-বাদিগণ, চার্ব্বাকমতানুসারী নাস্তিকগণ, জৈমিনীয়গণ, বৌদ্ধমতাবলম্বী তার্কিকগণ, আর্হতগণ (আর্হত—জৈন), ও অন্যান্য বাদিগণ (অর্থাৎ বৈষ্ণব পাশুপত প্রভৃতি) স্ব স্ব বুদ্ধি সমুত্থিত তর্কের ব্যামোহে তাহার অন্যথা করিয়া থাকেন[৪৮।৪৯]। করিলেও তাহাদের সকলেরই গন্তব্য—পরম পদ। যেমন পান্থগণ আপন আপন ইচ্ছায় ভিন্ন ভিন্ন পথে গমন করিয়া অবশেষে সকলেই এক লক্ষ্যভূত নির্দ্দিষ্ট পুরে গমন করে, বাদিগণের পক্ষেও সেইরূপ জানিবে[৫০]। তাহারা পরমার্থ পথের অনববোধে ভিন্-

ন্নীত বুদ্ধি যুক্ত হইয়া পরস্পর ইদমিত্থং নেদমিত্থং বলিয়া কলহ করে *
যেমন পথিকগণ আপন আপন বুদ্ধি ও রুচি অনুসারে স্ব স্ব গমনীয়
পথের প্রশংসা করে, তেমনি, তাহারাও স্ব স্ব কল্পিত পক্ষের প্রশংসা
করে। হে রামচন্দ্র! তাহাদের সেই সেই পক্ষ ফলেচ্ছার প্রাবল্যে পরি-
কল্পিত অথবা স্বকপোল রচিত। অর্থাৎ প্রমাণশিরোমণি উপনিষৎ প্রমা-
ণের সম্মত নহে। সেই কারণে সে সকল পক্ষ মুমুক্ষুগণের হেয়[৩১]।
যেমন একই পুরুষ স্নান, দান ও আদানাদি ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া করিয়া
স্নায়ী, দাতা ও গৃহীতা ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন আখ্যা প্রাপ্ত হয়,
সেইরূপ, মনঃও বিচিত্র কার্য্যকারী হয় বলিয়া কার্য্য অনুসারে জীব,
বাসনা ও কর্ম্ম; ইত্যাদি নানা নামে উক্ত হয়[৩৩]। চিত্তই নিখিল
বিশ্ব, এ রহস্য ব্যক্তিমাত্রের অনুভবনীয়। ভাবিয়া দেখ, যাহারা চিত্ত-
বিহীন তাহারা বিশ্ব দর্শনে অসমর্থ। সমনস্ক জীবেরাই শুভাশুভ বিষয়
দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, ভোজন ও ঘ্রাণাদি দ্বারা হর্ষ ও বিশাদ অনুভব
করে[৩৪]। যেমন রূপপ্রতীতির কারণ আলোক, তেমনি, অর্থপ্রতীতির
কারণ মনঃ। মনঃ আপনাকে বদ্ধ বলিয়া নিশ্চয় করিলে বদ্ধ এবং মুক্ত
বলিয়া নিশ্চয় করিলে মুক্ত, মুক্ত বদ্ধ সম্বন্ধে ইহাই ব্যবস্থা[৩৯]। যাহারা
মনকে জড় বলিয়া জানে, মনঃ তাহাদের নিকট জড়। যাহারা চেতন
বলিয়া জানে, তাহাদের নিকট চেতন। পরন্তু তত্ত্বজ্ঞগণ জানেন, মনঃ
অভিহিত প্রকারে সমুত্থিত। মনঃ বস্তুতঃ জড় নহে, চেতনও নহে।
অথচ তাহা হইতে এই সুখ-দুঃখ-চেষ্টা-সমন্বিত বিচিত্র জগৎ সমুত্থিত
হইয়াছে[৪১]। তাদৃশ মনঃ যখন একরূপ হইয়া যায়, অর্থাৎ অদ্বয়
ব্রহ্মে পর্য্যবসন্ন হয়, তখন এ সংসার থাকে না, রজ্জুসর্পের ন্যায় বিলীন
হইয়া যায়। বিলীন হইবার কারণ—অকৃত্রিমসত্ত্বোপহিত চিৎ অজ্ঞানের

* তাহাদের বুদ্ধির বৈচিত্র্য অর্থাৎ প্রভেদ উক্তবিধ কলহের মূল। রুচি ভেদের
মূল দেশকালপাত্রাদির প্রভেদ। কেহ রাজস অর্থাৎ রজোগুণ প্রধান, কেহ তামস—
তমঃপ্রধান, কেহ অতিনমত্বপ্রধান, কেহ বা অর্দ্ধমিশ্রসত্ত্ব প্রধান, ইত্যাদি। বিবাদে
পতিতার কথা এই যে, যে যেমন বুঝে সে তেমনি বলে, ও করে। তন্মধ্যে প্রত্য-
ক্ষাত্মদর্শী নির্ম্মলসত্ত্ব প্রধান প্রধান ঋষিদিগের বৈদিক জ্ঞানে যাহা বিজ্ঞাত হইয়াছে
তাহাই যথার্থ এবং যাহা কেবল স্ববুদ্ধির উৎপ্রেক্ষিত তাহা প্রায়ই ভ্রান্ত, পরন্তু
কাকতালীয় ন্যায়ে কদাচিৎ অভ্রান্ত।

বশবর্ত্তী হওয়ায় এই জগৎ সমুদিত হইয়াছে, ভ্রান্তির অবসানে সুতরাং এ জগৎ মিথ্যায় পর্য্যবসন্ন হয়[৬২]।

হে রামচন্দ্র! অজড় মন সংসারের কারণ নহে এবং প্রস্তরের মত জড় মনঃও বিশ্বের কারণ নহে। * রাম! সেইজন্য বলা যায়, জগৎকে জড় বা চেতন দুএর কোনটাই ঠিক্ নহে। কারণ, ইহা জড় অথবা অজড়, এ প্রতীতি কেবলমাত্র ভ্রমমূলক[৬৩।৬৪]। যখন চিত্ত ব্যতিরেকে কোন কিছুর বিদ্যমানতা প্রমাণিত হয় না, এবং অচিত্তের অথবা জীব চিত্তের নিকট জগতের অস্তিতা অপ্রমাণিত, তখন ইহা অবশ্যই অবধারণীয় যে, চিত্তই জগৎ। জগৎ অন্য কিছু নহে[৬৫]। যেমন কাল, ঋতু বিশেষের আবির্ভাবে বিচিত্রাকার ধারণ করে, তেমনি, মনঃও বিচিত্র কর্ম্মের উদ্রেকে বিচিত্রাকার ধারণ করতঃ বিবিধ নামে প্রথিত হয়[৬৬]। ইন্দ্রিয়াদি যদি বিনা চিত্তের আভোগে শরীরকে ক্ষুভিত করিতে পারিত, তাহা হইলে বলিতে পারিতাম—জীবাদি পদার্থ চিত্তের অতিরিক্ত[৬৭]। ভিন্ন ভিন্ন দর্শনে বাদিগণ তর্কের দ্বারা ঐ সকলের ভিন্নতা প্রচলন করিয়াছেন সত্য; পরন্তু সে সকল কুতর্কপরিকল্পিত; সুতরাং মিথ্যা[৬৮]। তাহাদের মনঃই তাহাদের কুতর্ক উদয়ের কারণ। অজ্ঞানাক্রান্ত ও সাম্প্রদায়িকশিক্ষাশূন্য মানবদিগের কুতর্কোদ্ভাবন সামর্থ্য স্বতঃসিদ্ধ[৬৯]। যে দিন বিশুদ্ধ সম্বিত্তত্ত্বে অজ্ঞান জাড্যের মিথ্যা উদ্রেকে জড় শক্তির উদ্রেক হইয়াছে, সেই দিনই এই জগদ্বৈচিত্র্য সমাগত হইয়াছে[৭০]। যেমন চেতন ঊর্ণনাভ (মাকড়শা) হইতে জড় বা অচেতন তন্তু (সূতা) উৎপন্ন হয়, তেমনি, চেতন ব্রহ্মপুরুষ হইতে অচেতনা প্রকৃতি আবির্ভূতা হইয়াছে। বাদিগণ শ্রুতিপরিজ্ঞানবতি নহেন, তাই তাহারা তাদৃশ অজ্ঞানের বশ হইয়া স্ব স্ব মনোদ্ভাবককে ঠিক বা অকাট্য বিবেচনা করেন। সুতরাং প্রোক্ত কারণে তাহারা ভ্রান্তি ক্রমে চিত্তের নামাদি ভেদ কল্পনা করিয়া পরিতৃপ্ত হন[৭১।৭২]। অতএব, হে রামচন্দ্র! সেই নির্ম্মলা চিৎই জীব, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কৃতি আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া এই জগতে চেতন, চিত্ত, ও জীব ইত্যাদি নামে কথিত হইতেছেন। যাহা সত্য, তাহাতে কোন বিবাদ নাই। কেবল মাত্র নামে ও রূপে কল্পনায় বিবাদ[৭৩]।

* অর্থাৎ ব্রহ্মাবস্থাই আশ্রিত অজ্ঞান জাড্যের আবরণে বিশ্বাকারে বিবর্ত্তিত হইয়াছে।

নবনবতিতম সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তনবতিতম সর্গ।

রামচন্দ্র বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমি এখন ভবদুক্ত বাক্যের অর্থা-বগতি দ্বারা বুঝিলাম, ব্রহ্মাণ্ড মনঃ হইতেই বিস্তৃত হইয়াছে সুতরাং ইহা মনেরই কার্য্য[১]। বশিষ্ঠ বলিলেন, রামচন্দ্র! যেমন তেজের অপ্রতীতি বশতঃ মরুভূমে মৃগতৃষ্ণিকা-জল দৃষ্ট হয়, * তেমনি, পরমার্থ পদের অস্ফুরণ বশতঃ মূঢ়ভাবোপগত মনের দ্বারা পরমার্থ পদে এই বিশ্ব বিস্তৃত হইয়াছে[২]। মনঃই ব্রহ্মভূত জগতের স্থাপয়িতা। মনঃই সুররূপে, নররূপে, দৈত্যরূপে, যক্ষরূপে, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নররূপে উল্লসিত (তত্তদ্‌ভাবে অবস্থিত) হয়[৩।৪]। আমরা মানস্ প্রত্যক্ষে দেখিতে পাই, মনঃই পুরপত্তনাদি বিচিত্র সংস্থানে বিরাজ করিতেছে এবং তৃণ, কাষ্ঠ ও লতা প্রভৃতি শরীরীর আকারে অবস্থিত রহিয়াছে। সুতরাং এ সকল বিচার্য্য নহে; কেবল একমাত্র মনঃই বিচার্য্য[৫।৬]। আমার মত এই যে; মনঃই জগৎ বিস্তৃত করিয়াছে, সুতরাং মনের অভাবে অদ্বয় পরমাত্মা অবশিষ্ট থাকেন[৭]। আত্মা সর্ব্বাতীত, অথচ সর্ব্বগ ও সর্ব্বাশ্রয়। তাঁহারই প্রভাবে মন বিশ্বাকারে ধাবিত বা প্রস্পন্দিত হইতেছে[৮]। মনঃই কর্ম্ম ও শরীর সমুদায়ের কারণ এবং মনঃই জাত ও মৃত হয়। (জাত অর্থাৎ অভিব্যক্ত বা উত্থিত। মৃত অর্থাৎ তিরোভাব প্রাপ্ত বা লয় প্রাপ্ত)। আত্মার ঐ সকল গুণ বা ধর্ম্ম নাই[৯]। আমি জানি, বিচার দ্বারা মন লয় প্রাপ্ত হয় এবং মনের বিলয়ে পরম শ্রেয়ঃ (মুক্তি) লাভ করা যায়[১০]। কর্ম্মানুরক্ত মনঃ জ্ঞানের দ্বারা বিশীর্ণ হইলেই মুক্তি লাভ করে, পুনর্ব্বার আর প্রজাত হয় না[১১]।

রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! আপনি বলিলেন, জীবজন্ম ত্রিবিধ। সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস। অপিচ, সদসদাত্মক মনঃ তাহার মুখ্য কারণ[১২]। কিন্তু হে ভগবন্! বুদ্ধিবিবর্জ্জিত (প্রকৃতিযুক্ত) শুদ্ধচিৎ ব্রহ্মতত্ত্ব হইতে জগচ্চিত্রকর মনঃ কি প্রকারে উত্থিত হইল তাহা আমি জানিতে ইচ্ছা করি[১৩]। বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! বিকৃতোদর চিন্তাকাশ,

---

* প্রচণ্ড সূর্য্যকিরণরূপ তেজঃই জলাকারে দৃষ্ট হয়।

চিদাকাশ ও ভূতাকাশ, এই তিন সর্ব্বকার্য্যসাধারণ, অর্থাৎ জন্য মাত্রের কারণ, সর্ব্বত্র অবস্থিত এবং বিশুদ্ধ চিত্তত্ত্বের সত্তায় (অস্তিতায়) লব্ধসত্ব। অর্থাৎ ঐ তিনই চিদাত্মার প্রতিভাস[১৪।১৫]। যাহা বাহ্যে ও অভ্যন্তরে অবস্থিত, যাহা সত্তা ও অসত্তার অববোধক, যাহা সর্ব্ব ভূতে পরিব্যাপ্ত, তাহা চিদাকাশ নামে উক্ত হয়[১৬]। যাহা সমুদায় প্রাণীর সর্ব্বপ্রকার ব্যবহার নির্ব্বাহের মূল, সর্ব্ববিধ কারণ-কার্য্য-ভাবের নিয়ন্তা, এবং যাহার কল্পনায় এই জগৎ বিস্তৃত হইয়াছে, তাহাই চিত্তাকাশ নামের নামী[১৭]। যে আকাশ দিঙ্মণ্ডল পরিব্যাপ্ত, যাহা পবন ও মেঘাদির আশ্রয়, যাহা ভূমা অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন, সেই এই আকাশ ভূতাকাশ নামে প্রথিত[১৮]। এই ঈদৃশ ভূতাকাশ ও তাদৃশ সেই সর্ব্বমূল চিত্তাকাশ চিদাকাশ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। দিন যেমন সমুদায় কার্য্যের কারণ, তেমনি, চিদাকাশও কার্য্যমাত্রের মূল কারণ[১৯]। চিত্তের যে "আমি জড় অথচ অজড়" এতদ্রূপ অবধারণ বা স্বাত্মপ্রকাশ; তাহা ব্রহ্ম নামক চিতের মালিন্য এবং তাদৃশমালিন্যযুক্ত বা তাদৃশ কালুষ্যযুক্ত চিৎ মনঃসংজ্ঞাক্রান্ত। এই মনঃ তাঁহাতেই আকাশাদির কল্পনা করিয়াছে[২০]। শাস্ত্রে অপ্রবুদ্ধদিগের বোধার্থ ও উপদেশার্থ অভিহিত প্রকারের আকাশত্রয় পরিকল্পিত হইয়াছে, পরন্তু প্রবুদ্ধদিগের জ্ঞানে ঐ সকল বন্ধ্যাপুত্রাদির ন্যায় অলীক বা মিথ্যা[২১]। প্রবুদ্ধদিগের অধিকারে সর্ব্ব প্রকারকল্পনাবর্জ্জিত সর্ব্বব্যাপ্ত এক পরব্রহ্মই বিরাজমান। এবম্বিধ দ্বৈতাদ্বৈতাদিভেদঘটিত বাক্য সন্দর্ভ দ্বারা প্রবুদ্ধগণ উপদিষ্ট হন না, অজ্ঞগণই উপদিষ্ট হন। হে রাম! যাবৎ তুমি অপ্রবুদ্ধ থাকিবে, তাবৎ তোমার বোধার্থ আকাশত্রয় কল্পনা করিয়া তোমাকে উপদেশ প্রদান করিব[২২।২৩]। যদ্রূপ মরুস্থলীনিপতিত দাবানলসদৃশ সূর্য্যকিরণ হইতে ভ্রান্ত দিগের নিকট মিথ্যা জলপ্রবাহ আবির্ভূত হয়, তদ্রূপ, এই আকাশাদি অবিদ্যা কলঙ্কিত চিদাকাশ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে[২৪]। চিৎ-ই অবিদ্যামালিন্যে চিত্ততা প্রাপ্ত হয়, পরে তাহা হইতে এই জগদ্রূপ ইন্দ্রজাল রচিত হয়[২৫]। যেমন ব্যবহারিক লোক (অর্থাৎ যাহাদের তত্ত্বজ্ঞান হয় নাই তাহারা এবং যাহারা শাস্ত্রদর্শী নহে তাহারা) অজ্ঞানের উদ্রেকে শুক্তি খণ্ডে রজত দর্শন করে, তেমনি, অতত্ত্বজ্ঞ লোক, স্বনিষ্ঠ অজ্ঞানের দ্বারা মলিন চিদাত্মতত্ত্বে চিত্তত্ব অনুভব করে। যাহারা তত্ত্বজ্ঞ, তাহাদের

নিকট ঐ ব্যবহার, কেবল ঐ ব্যবহার নহে, সর্ব্বপ্রকার ভেদ ব্যবহার লুপ্ত থাকে। অতএব, নিজ মূর্খতাই বন্ধন; এবং নিজ বোধই (নিজ বোধ অর্থাৎ যাহা আপনার যথার্থতত্ত্ব, তাহা সাক্ষাৎকার করা অর্থাৎ অসন্দিগ্ধ রূপে বুঝা) মোক্ষ[২৭]।

সপ্তনবতিতম সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টনবতিতম সর্গ।

চিত্তোপাখ্যান।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে অনঘ! চিত্ত যাহা হইতে বা যে কোন প্রকারে উৎপন্ন হউক, সে অনুসন্ধান অপ্রয়োজনীয়। ঐ বিষয়ে এইমাত্র প্রয়োজন যে, মোক্ষ কামনায় তাহাকে যত্নপূর্ব্বক পরমাত্মায় যোজিত করিবেক[১]। চিত্ত পরম ব্রহ্মে সংযোজিত হইলে বাসনাহীন, কল্পনাশূন্য ও শুদ্ধতা প্রাপ্ত হয়, অনন্তর ব্রহ্মসাৎ হইয়া যায়[২]। এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ চিত্তের অধীন, সুতরাং বন্ধ ও মোক্ষ দু-ই চিত্তের অধীন[৩]। অভিহিত রহস্য বুদ্ধ্যারোহের নিমিত্ত আমি তোমাকে ব্রহ্মার কথিত বিচিত্র চিত্তাখ্যান বলি, শ্রবণ কর[৪]।

কোন এক দেশে মৃগপক্ষ্যাদিশূন্য সতত অস্থির ও অতিবিস্তৃত এক ভীষণ মহাটবী আছে। শতযোজনবিস্তৃত ভূমি এই অটবীর এক কণিকা[৫]। এই অটবীতে সহস্রকর ও সহস্রলোচন সম্পন্ন পর্য্যাকুলমতি বিস্তৃতশরীর এক পুরুষ অবস্থিতি করেন[৬]। একদা আমি দেখিলাম, উক্ত পুরুষ সহস্রবাহুর দ্বারা বহুসহস্র পরিঘ গ্রহণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা আত্মপৃষ্ঠ আহত করিতেছে আর পলায়ন করিতেছে[৭]। সে আপনি আপনারই প্রহারে ভীত হইয়া শতযোজন দূরে বিদ্রবিত হইতেছে[৮]। এই পলায়নপর পুরুষ কাঁদিতে কাঁদিতে বহু দূরে গমন করিয়া শ্রান্ত, ক্লান্ত ও শীর্ণসর্ব্বাঙ্গ হইয়া অবশেষে এক অন্ধকূপে গিয়া নিপতিত হইল। এই কূপ অতি ভীষণ, অন্ধকারে পরিপূর্ণ ও অতি গভীর[৯।১০]। অনন্তর সে বহুকালের পর অন্ধকূপ হইতে সমুত্থিত হইয়া পুনর্ব্বার আপনি আপনাকে প্রহার করিতে লাগিল ও পুনর্ব্বার বিদ্রবিত হইয়া দূরতর প্রদেশে গমন করতঃ শলভ যেমন অনলমধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তদ্রূপ, এক কণ্টকলতাসমাচ্ছন্ন করঞ্জবন মধ্যে গিয়া প্রবিষ্ট হইল[১১।১২]। সে ক্ষণকাল তথায় অবস্থান করিয়া সেই করঞ্জগহন হইতে বিনির্গত হইয়া পুনর্ব্বার আপনি আপনাকে প্রহার করিতে করিতে অতিবেগে অন্য এক দূরতর প্রদেশে গমন করিল এবং অবিলম্বে হাস্য করিতে করিতে এক শশাঙ্ককিরণ-

সুশীতল কমনীয় কদলী কাননে গিয়া প্রবিষ্ট হইল[১৩।১৪]। ক্ষণকাল পরে কদলী বন হইতে বিনিঃসৃত হইয়া পুনরপি আপনি আপনাকে প্রহার করিতে লাগিল ও পুনর্ব্বার বিদ্রবিত হইয়া অন্য এক সুদূর প্রদেশে গমন করতঃ পুনর্ব্বার সেই অন্ধকূপে গিয়া নিপতিত হইল। ক্ষণমধ্যে সে শীর্ণ কলেবর হইয়া অন্ধকূপ হইতে পুনঃ সমুত্থিত ও পুনঃ কদলীকাননস্থিত গর্ত্তে প্রবিষ্ট হইল। আবার তথা হইতে করঞ্জ-বনে, করঞ্জবন হইতে অন্ধকূপে, এবং অন্ধকূপ হইতে উত্থিত হইয়া পুনর্ব্বার আপনি আপনাকে প্রহার করিতে লাগিল[১৫।১৮]। উক্ত পুরুষকে আমি বহুকাল ঐরূপ কার্য্য করিতে দেখিলাম, পরে যোগবলে তাহাকে পথে অবরুদ্ধ (কিঞ্চিৎ কালের জন্য সুস্থির) করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম। বলিলাম, হে পুরুষপ্রবর! তুমি কে? কি নিমিত্ত তুমি ঐরূপ কার্য্য করিতেছ? কোন্ অভিপ্রায়ে তুমি উক্ত প্রকার কার্য্য করিতেছ?[১৯।২০] হে রঘুনন্দন! অনন্তর তিনি আমা কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিলেন, মুনে! আমি কেহই নহি ও কিছুই করিতেছি না[২১]। আমি তোমা কর্ত্তৃকই আভগ্ন ও মগ্ন হইতেছি, সুতরাং তুমিই আমার পরম শত্রু। আমি তোমা কর্ত্তৃকই সুখ দুঃখে দৃষ্ট, নিপতিত ও নষ্ট হইতেছি[২২]।

অনন্তর পুরুষ আমাকে ঐ কথা বলিয়া আপনার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অবলোকন করতঃ বড়ই অসন্তুষ্ট হইল ও মেঘ যেমন গর্জ্জন ও বর্ষণ করে, তেমনি, সে ধ্বনি সহকারে রোদন ও অশ্রু বর্ষণ আরম্ভ করিল[২৩]। ক্ষণকাল পরে সে রোদনে ক্ষান্ত হইয়া স্বীয় কলেবর দর্শন করতঃ হাস্য ও গর্জ্জন করিতে লাগিল[২৪]। কিয়ৎক্ষণ পরে দেখিলাম, সে আমার সম্মুখে আপনার অঙ্গ সকল ক্রমশঃ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল[২৫]। প্রথমে তাঁহার ভীষণতম মস্তক নিপতিত হইল, তদনন্তর তাঁহার বাহু, তদনন্তর বক্ষঃ, তদনন্তর উদর নিপতিত হইল[২৬]। সে ঐরূপে অঙ্গ সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া নিয়তিশক্তির বশীভূত হইয়া কোন এক অনির্দ্দেশ্য স্থানে গমন করিল[২৭]। আমি অন্য এক নির্জ্জন স্থানে অন্য আর এক নরকে ঐ প্রকার দেখিয়াছি। সেই নরও স্বীয় পীবর বাহুনিকর

---

* তীরস্থবৃক্ষ ঘুরে না। তাহারা যে স্থির সেই স্থিরই থাকে। পরন্তু নৌকাবাসী ভ্রান্ত মনুষ্যেরা ভ্রান্তি ক্রমে তাহাদের ভ্রমণ দেখে, (যেন বৃক্ষেরাই ঘুরিতেছে, মনে করে), তেমনি, তুমিও আমাকে চক্রাকার অর্থাৎ অভিহিত প্রকার দেখিতেছ।

দ্বারা আপনাকে পীড়ন করতঃ পলায়ন করিতেছে ও কূপে নিপতিত ও তাহা হইতে সমুত্থিত হইয়া ধাবমান হইতেছে। পুনর্ব্বার সে অন্ধ-কূপমধ্যে নিপতিত ও তথা হইতে উত্থিত হইয়া অতিকাতর ভাবে পলায়ন করিতেছে[২৮,২৯]। সেও কখন করঞ্জকাননস্থ গর্ত্তে নিপতিত ও তথা হইতে সমুত্থিত হইয়া কদলীবনমধ্যে ধাবমান হইতেছে ও কখন কষ্ট স্বীকার ও কখন সন্তোষ লাভ করিতেছে এবং কখন বা আপনিই আপনাকে প্রহার করিতেছে। তাহাকেও আমি তদ্রূপ ব্যবহার করিতে দেখিয়া বিস্মিত হইলাম, পরে তাহাকেও যোগবলে স্তম্ভিত করিয়া ঐ ব্যবহারের কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। ইনিও পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির ন্যায় প্রথমে আপনার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দর্শন, পরে রোদন, পরে হাস্য করতঃ অবশেষে নিয়তিশক্তি বিচার করিয়া কোথায় গেলেন, আর দেখা গেল না[৩০,৩২]।

আমি অপর এক জনশূন্য প্রদেশে সেইরূপ আরও এক নর দেখিয়াছি। এ নরও পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিদ্বয়ের ন্যায় আপনি আপনাকে হতাহত করতঃ পলায়ন করিতেছিল ও অন্ধকূপে নিমগ্ন হইয়াছিল। সেই ব্যক্তি যাবৎ কূপ হইতে উত্থিত না হইল, তাবৎ আমি তাঁহার প্রতীক্ষায় দীর্ঘকাল সেই স্থানে অবস্থিতি করিয়া ছিলাম। পরে সে উত্থিত হইয়া গমন করিতে আরম্ভ করিলে তাহাকেও আমি যোগবলে সুস্থির করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলাম। কিন্তু সেই পুরুষ আমাকে কর্কশ স্বরে "আঃ পাপ! দুর্ব্বিজ! তুমি কিছুই জান না" এইমাত্র বলিয়া স্ব-ব্যাপারে নিযুক্ত হইল।

রামচন্দ্র! আমি সেই মহারণ্যে তাদৃশ বহু পুরুষ দেখিয়াছি। তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ জিজ্ঞাসিত হইয়া আমার নিকট আগমন করিয়াছিল, কেহ বা আমার বাক্যে অনাদর করিয়াছিল। কেহ কেহ অন্ধকূপে নিপতিত ও তাহা হইতে পুনরায় উত্থিত হইয়া কদলী-বনমধ্যে প্রবেশ করতঃ তথায় দীর্ঘকাল অবস্থিতি করিয়াছিল, কেহ কেহ বিস্তৃত করঞ্জকুঞ্জ মধ্যে অন্তর্হিত হইয়াছিল। আবার কোন কোন ধর্ম্ম পরায়ণ পুরুষ তাহাতে অবস্থিতি করিতে সমর্থ হয় নাই। রঘুনাথ! সেই বিস্তৃত মহাটবী অদ্যাপি বিদ্যমান আছে; পুরুষগণও তাহাতে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অবস্থিতি করিতেছে। রাম! তুমিও সে মহাটবী দেখিয়াছ ও তন্মধ্যে ভ্রমণ করিয়াছ। অনববুদ্ধ বা অপূর্ণজ্ঞান বাল্যাবস্থায়

দেখিয়াছে ও ব্যবহার করিয়াছে বলিয়া স্মরণ হইতেছে না। সেই কণ্টকসঙ্কটাঙ্গী মহাটবী যাহার পর নাই ম...। ভীষণা। তাহা নিতান্ত দুর্গম হইলেও জীবগণ তাহাতে গমনাগমন করে ও নির্ব্বোধতা বশতঃ পুষ্পবাটিকার (উদ্যানের) ন্যায় তাহার সেবা করে৩৩।৩৪।

নবনবতিতম সর্গ।

শ্রীরাম বলিলেন, ভগবন্! আমি কোথায় এবং কবে কোন্ মহাটবী দেখিয়াছি? যে সকল পুরুষের কথা বলিলেন, তাহারা কে? তাহাদের কৃত সেই সমস্ত উদ্যমই বা কি? তাহা আমার নিকট ব্যক্ত করুন[১]। বশিষ্ঠ বলিলেন; হে মহাবাহো রাম! আমি তোমার নিকট সমস্তই বলি, শ্রবণ কর। সে মহাটবী ও সেই সমস্ত নরগণ দূরে অবস্থিত নহে[২]। এই যে সংসার, এই সংসারেই উক্ত মহাটবী। ইহা অপার ও অতিগভীর। পরমার্থ দর্শনে অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানে ইহা তুচ্ছ অর্থাৎ বন্ধ্যাপুত্রসদৃশ মিথ্যা। এই নানাবিকারপরিপূর্ণ মিথ্যা সংসারকেই তুমি মহাটবী বলিয়া জানিবে[৩]। যখন অন্য সম্বন্ধ (বিকারসম্পর্ক) থাকে না, কেবল একাদ্বয় ব্রহ্ম বস্তু নির্ব্বিকার ও পূর্ণ থাকেন, তখন ইহা শূন্য অর্থাৎ নাই হয়। (অভিপ্রায় এই যে, মোক্ষদশায় ইহা থাকে না) ইহার সে অবস্থা বিবেকরূপ আলোকের দ্বারা দেখা যায়[৪]। ইহাতে যে পুরুষগণ পরিভ্রমণ করে বলিয়াছি, সে সকলকে তুমি দুঃখনিমগ্ন মন বলিয়া জানিবে[৫]। মনই দুঃখে নিপতিত হইয়া এই সংসারাটবীতে পরিভ্রমণ করিতেছে। হে মহামতি রামচন্দ্র! আমি তাহাদিগকে দেখিয়াছি, এ কথার অর্থ—বিবেকযুক্ত অহং তাহাদিগকে দেখিয়াছে। অর্থাৎ আমি বিবেককে অহং (আমি) বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। অন্য অর্থাৎ অবিবেক তাহাদিগকে (ঐ সকলকে) দেখিতে পায় না[৬]। যদ্রূপ ভানুদেব স্বীয় প্রকাশে কমল বন প্রবোধিত করেন, তদ্রূপ, বিবেকরূপ আমিও জ্ঞানালোক দ্বারা তাহাদিগকে প্রবোধিত করিয়াছি[৭]। হে মহামতে! সেই সমস্ত মনের মধ্যে কতকগুলি আমার অর্থাৎ বিবেকের প্রসাদে প্রবোধ (তত্ত্বজ্ঞান) প্রাপ্ত ও উপশম লাভ করিয়া পরম হইয়াছে (মনোভাব নাশ হেতু মুক্ত হইয়াছে)[৮]। এবং অপর কতকগুলি মোহাধিক্য বশতঃ আমাকে অর্থাৎ বিবেককে বা বিচারকে উপেক্ষা করতঃ কূপমধ্যে নিপতিত হইয়াছে (অর্থাৎ অধঃপতিত হইয়াছে)[৯]। হে রঘূদ্বহ! পূর্ব্বোক্ত অন্ধকূপ নরক, এবং কদলীকানন স্বর্গ। পূর্ব্বে যে

কদলীকানন প্রবেশের কথা বলিয়াছি, তদর্থে ইহাই বুঝিবে যে, তাহারা স্বর্গরসাস্বাদকারী মনঃ। যাহারা অন্ধকূপে প্রবিষ্ট হইয়া বিনির্গত হইতে পারে নাই বলিয়াছি, তাহাদিগকে তুমি মহাপাতকী বলিয়া জানিবে। আর যাহারা কদলীকানন প্রবেশ করিয়া বিনির্গত হয় নাই বলিয়াছি, তাহাদিগকে তুমি পুণ্যসম্ভারযুক্ত চিত্ত বলিয়া জানিবে। যাহারা করঞ্জবনপ্রবিষ্ট হইয়াছে বলিয়াছি, সেই সমস্ত চিত্তকে তুমি মানুষ্যে পরিণত বলিয়া জানিবে। তন্মধ্যে কোন কেহ লব্ধজ্ঞান হইয়া বন্ধনমুক্ত হইয়াছে[১০।১৪]। এবং কোন কোন বহুরূপ মনঃ (দ্বৈতে অভিনিবিষ্ট চিত্ত) এক যোনি হইতে অন্য যোনিতে জন্ম গ্রহণ অনুভব করিতেছে। তাহারা ঐ রূপে কখন নিপতিত কখন উৎপতিত (অধোগামী ও ঊর্দ্ধগামী) হইতেছে[১৫]। সেই যে করঞ্জগহন, তাহা কলত্র রস। তাহা দুঃখরূপ কণ্টকে সমাকীর্ণ ও বিবিধ এষণায় (ইচ্ছায়) পরিপূর্ণ[১৬]। যে সকল মনঃ করঞ্জবনপ্রবিষ্ট হইয়াছিল, তাহারা মনুষ্যরূপে প্রজাত ও মনুষ্যোচিত চেষ্টায় লোল[১৭]। সেই কদলীকাননের যে শশাঙ্ককিরণ-সম শীতলতা, তাহা আহ্লাদজনক স্বর্গ[১৮]। কোন কোন চিত্ত শাস্ত্রবিহিত পুণ্যকর্ম্ম, দান, তপস্যা, যোগধারণা ও উপাসনা দ্বারা অভ্যুদয়শালী হইয়া দীর্ঘকাল সপ্তর্ষি প্রভৃতি রূপে জগৎ অবলোকন করিতেছে[১৯]। যে সমস্ত চিত্ত দ্বারা আমি (বিবেক) তিরস্কৃত হইয়াছিলাম বলিয়াছি, সে কথার অর্থ—সেই সকল অনাত্মজ্ঞ মনঃ আপন আপন বিবেককে তিরস্কৃত করিয়াছে[২০]। যে পুরুষ বলিয়াছিল, "আমি তোমা কর্তৃক দৃষ্ট ও বিনষ্ট হইলাম, সুতরাং তুমি আমার পরম শত্রু।" সেই নির্ব্বোধ চিত্ত তত্ত্ববোধ হইতে বিশীর্ণ হইয়া ঐরূপে বিলাপ করিয়াছিল[২১]। যে পুরুষ ক্রন্দন করিতে লাগিল বলিয়াছি, বুঝিতে হইবে, তাহা ভোগ পরিত্যাগী অথচ অপ্রাপ্তবিবেক, এরূপ মনের রোদন[২২]। সে অর্দ্ধবিবেকী হইয়াছে, অথচ অমল পদ প্রাপ্ত হয় নাই। তাই ভোগ সমূহ পরিত্যাগে তাহার মহান্ পরিতাপ উপস্থিত হইয়াছে[২৩]। ঐ পুরুষ করুণাপরতন্ত্র হইয়া স্বীয় অঙ্গ সকল দেখিয়াছিল, আর বলিয়াছিল, হায়! এ সকল ত্যাগ করিয়া আমি না জানি কি কষ্টই পাইব! (করুণা=স্ত্রীপুত্রাদি স্নেহ। অঙ্গ=লোভ প্রভৃতি। অল্পবিবেকাবস্থায় স্নেহাদি পরিত্যাগ করিতে গেলে ঐরূপ ঐরূপ পরিতাপ বা

মনের আলোচনা ক্রমে)[২৪]। অমল পদ দর্শন (ব্রহ্মদর্শন) হয় নাই, অথচ অর্দ্ধবিবেকী হইয়াছে, সে অবস্থায় অঙ্গ (স্নেহ লোভাদি) পরিত্যাগ করা বড়ই কষ্টকর; তাহাতে চিত্তের পরিতাপ বৃদ্ধি হয় মাত্র[২৫]। পূর্ব্বে যে হাস্য করিতে লাগিল বলিয়াছি, তাহার অর্থ—সে চিত্ত আমার (বিবেকের) স্ববোধে প্রাপ্তবিবেক হওয়ায় পরিতুষ্ট হইয়াছিল, তাই সে হাসিয়াছিল[২৬]। সর্ব্বতোভাবে প্রাপ্তবিবেক ও সংসারস্থিতি পরিত্যাগী হইলে আনন্দ পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে[২৭]। যে পুরুষ আপনাকে ও আপন অঙ্গ সমূহ দেখিয়া উপহাস ব্যঞ্জক হাস্য করিয়াছিল, সে বুঝিতে পারিয়াছিল, এই গুলিই আমাকে এ পর্য্যন্ত বঞ্চনা করিয়া আসিয়াছে[২৮]। এ সমস্তই মিথ্যা বিকল্পের (ভ্রান্তির) রচনা[২৯]। বিবেকপ্রাপ্ত মনঃ ব্রহ্মপদে বিশ্রান্তি লাভ করে, সুতরাং সে তখন পূর্ব্বোক্ত প্রকার ক্লেশের আধার বিষয় সকলকে দূর হইতে অবলোকন করে এবং হাস্য করে[৩০]। আমি যে অবরুদ্ধ করিয়া যত্নসহকারে জিজ্ঞাসা করিলাম, বলিয়াছি, তাহার অর্থ—বিবেক সহজে চিত্তকে গ্রহণ (স্ববশবর্ত্তী) করিতে পারে না। তাহাতে তাহার বিশেষ বল প্রয়োগের আবশ্যক হয়[৩১]। বিশীর্ণকায় হইয়া অন্তর্দ্ধান প্রাপ্ত হইল, এই কথায় আমি দেখাইয়াছি, বিষয়তৃষ্ণার শান্তি হইলেই চিত্ত বিশীর্ণ হইয়া যায়[৩২]। সহস্রহস্ত ও সহস্রনেত্র ইত্যাদি কথা বলিয়াছি, তাহাতে দেখাইয়াছি, বা বলিয়াছি, চিত্তের আকৃতি (অবস্থা) অনন্ত[৩৩]। বহু পরিঘ দ্বারা আপনি আপনাকে প্রহার করিতেছে এ কথার অর্থ—মনঃ আপনি আপনার কুকল্পনা সমূহের দ্বারা আপনাকে ব্যথিত করিতেছে[৩৪]। আপনি আপনাকে প্রহার করিয়া পলায়ন করিতেছে, এ কথার অর্থ—চিত্ত স্বকীয় বাসনা দ্বারা প্রহার প্রাপ্ত হইয়া (ত্রিতাপদগ্ধ হইয়া) অন্যত্র গমনে প্রবৃত্ত হয় অর্থাৎ তাপ নাশের উপায় অন্বেষণ করে[৩৫]। আপনি আপনার ইচ্ছায় আপনাকে প্রহার করে আবার আপনার ইচ্ছায় পলায়ন করে, এ বর্ণনায় বলা হইয়াছে যে, অজ্ঞানের কার্য্য ঐরূপই[৩৬]। মনঃ স্বকীয় বাসনাগ্নির দ্বারা উপতপ্ত হইলে তখন সে ব্রহ্মপদ গমনে সমুদ্যত ও সংসার হইতে পলায়নপর হয়[৩৭]। মনঃ নিজেই দুঃখ সমূহ বিস্তার করে, আবার তাহাতে খেদান্বিত হয়, হইয়া পলায়ন চেষ্টা করে[৩৮]। গুটিপোকার কীট যেমন আপনারই লালা-

নির্ম্মিত কোশে স্বেচ্ছার দ্বারা বন্ধন প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ, মনঃও স্ব-ইচ্ছায় স্বোপার্জ্জিত সঙ্কল্পবাসনাজাল দ্বারা জড়িত ও বন্ধন প্রাপ্ত হয়[৩৯]। চঞ্চল-স্বভাব মনঃ, ভবিষ্যৎ পর্য্যালোচনা না করিয়া বালকের ন্যায় অনর্থ ক্রীড়ায় সমাসক্ত হয়। যেমন কীলোৎপাটী বানর কাষ্ঠ ছিদ্রস্থ বৃষণের (বৃষণ= অণ্ডকোশ) কাষ্ঠাক্রমণ বুঝিতে না পারায় দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছিল, * সেইরূপ, মনঃও স্বকৃত কার্য্যের ভাবি ফল বুঝিতে না পারিয়া দুঃখে নিমগ্ন হয়[৪০।৪১]। দীর্ঘকাল অসঙ্গাত্মার ধ্যান (যোগ বা সমাধি) ও দীর্ঘকাল তাহার রক্ষা, বা পরিপালন. অভ্যাস দ্বারা দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইলে তখন আর শোক থাকে না[৪২]। প্রমাদ বশতঃই দুঃখপরম্পরা পর্ব্বতের ন্যায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এবং মনের বশ্যতায় দুঃখপরম্পরা সূর্য্যপ্রকাশে হিম বিনাশের ন্যায় বিনষ্ট হইয়া যায়[৪৩]। মনঃ আগে শাস্ত্রসম্মত অনিন্দিত অনুষ্ঠান জনিত সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া রাগ পরিশূন্য হয়, পশ্চাৎ বোধোদয় দ্বারা পরম পবিত্র জন্মাদিবিক্রিয়াশূন্য পূর্ণ শান্ত ব্রহ্মপদ প্রাপ্তে জীবন্মুক্ত হয়। তৎকালে মহা বিপদ্ উপস্থিত হইলেও কম্পিত ও তজ্জনিত শোক অনুভব করিতে হয় না[৪৪]।

* ক্রকচ অস্ত্রে বড় বড় কাষ্ঠ চেরাই করা হয়। চেরাই কালে ক্রকচ সহজে গমনাগমন করিবে, বলিয়া ছুতারেরা বিদারিত কাষ্ঠের মধ্যে কীল (খিল) প্রোথিত করে। কোন এক সময়ে ছুতারেরা একটা বৃহৎ কাষ্ঠ অৰ্দ্ধ বিদীর্ণ করিয়া মধ্যে কীল পুতিয়া রাখিয়া ভোজনার্থ গৃহে গমন করিলে পর এক চঞ্চল মতি বানর ঐ কাষ্ঠের উপরে বসিয়া সেই খিল নাড়িতে ছিল, তাহার অণ্ডকোষ বিদীর্ণ কাষ্ঠ ভাগের মধ্য ফাঁকে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। কীল পুনঃ পুনঃ সঞ্চালিত হইয়া খুলিয়া গেল। তখন দুপাশের দুই খণ্ড কাষ্ঠ সবেগে সংযুক্ত হইয়া গেল এবং তাহার চাপনে বানরের মুষ্ক চাপটা হইয়া গেল ও বানর পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। বানর পূর্ব্বে বুঝিতে পারে নাই যে, আমি কীল খুলিলে মরিব।

শততম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, চিত্ত পরম পদ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। যেমন সাগর সমুৎপন্ন তরঙ্গ একরূপে জলময় ও অন্যরূপে জলময় নহে, সেইরূপ, ব্রহ্মসমুৎপন্ন চিত্তও ব্রহ্মদৃষ্টিতে ব্রহ্মময় ও চিত্তদৃষ্টিতে চিত্ত[১]। হে রামচন্দ্র! যাহারা জলের স্বভাব বিজ্ঞাত আছে, তাহারা যেমন তরঙ্গকে জলের অতিরিক্ত মনে করে না, তেমনি, প্রবুদ্ধব্যক্তিগণও চিত্তকে ব্রহ্মাতিরিক্ত মনে করেন না[২]। অপ্রবুদ্ধ জনের চিত্তই সংসার-ভ্রমণের কারণ, জ্ঞানিচিত্ত সংসারভ্রমণের কারণ নহে[৩]। যাহারা জলের স্বরূপ ও স্বভাবাদি পরিজ্ঞাত আছে, তাহারা কি কখনও তরঙ্গকে জল হইতে পৃথক্ মনে করে? তাহা করে না[৪]। তত্ত্ব এক হইলেও অপ্রবুদ্ধগণের বোধ সৌকর্য্যার্থ বাচ্য, বাচক, সম্বন্ধ, এ সকল কৃত অর্থাৎ কল্পিত হইয়া থাকে। (অভিপ্রায়—শিষ্য দিগকে ইহা বাচক, (বোধক শব্দ) তাহা 'বাচ্য,' এইরূপ কল্পিত ভেদ অবলম্বনে বুঝান হয়)[৫]। এমন কিছুই নাই যাহা সর্ব্বশক্তি, নিত্য, পূর্ণ ও অব্যয় পরব্রহ্মে নাই। সেই জন্য তাঁহাতে সর্ব্বপ্রকার কল্পনা সুসঙ্গত হয়[৬]। যিনি সর্ব্বশক্তি তিনিই ভগবান্ অর্থাৎ ষড়ৈশ্বর্য্যশালী। সেইজন্য তিনি যখন যাহা যেরূপে ইচ্ছা করেন তখন তাহা তদ্রূপে প্রকাশিত হয়[৭]। হে রামচন্দ্র! তাঁহারই চিৎশক্তি ভূতশরীরে, স্পন্দশক্তি বায়ুতে, জড়শক্তি উপলে, দ্রবশক্তি সলিলে, তেজঃশক্তি অনলে, শূন্যশক্তি আকাশে এবং ভাবশক্তি সংসার-স্থিতিতে দৃষ্ট হইতেছে[৮]। তাঁহার সর্ব্বশক্তি সর্ব্বদিক্‌গামিনী। তাঁহার নাশশক্তি নাশে, শোকশক্তি শোকিগণমধ্যে, আনন্দশক্তি হর্ষে, বীর্য্যশক্তি যোদ্ধৃবর্গে, সৃষ্টিশক্তি সৃজ্যবস্তুতে দৃষ্ট হয়[৯,১০]। যদ্রূপ বীজমধ্যে ফল, পুষ্প, লতা, শাখা ও মূলাদিযুক্ত বৃক্ষের অবস্থিতি, তেমনি, ব্রহ্মেও বিচিত্র বিশ্বের অবস্থিতি[১১]। ব্রহ্মের অভ্যন্তরে আকস্মিক প্রতিভাস (আবরণ শক্তির আবির্ভাব) বশতঃ যে চিজ্জড়মধ্যগত চিত্ত সমুদিত হইয়াছে তাহাই এক্ষণে জীব আখ্যা প্রাপ্ত হইতেছে[১২]। যেহেতু এই

বিচিত্র বিশ্ব অজ্ঞাত চিৎতত্ত্বের বিবর্ত্তন, সেই হেতু ইহা (বিশ্ব) সেই নির্ব্বিশেষ চিদ্বস্তুর অতিরিক্ত নহে। (যেমন রজ্জু জ্ঞানের অস্ফুরণ বশতঃ রজ্জুতে সর্প দর্শন হয়, তেমনি, ব্রহ্মতত্ত্বের অস্ফুরণে ব্রহ্মেই এই বিচিত্র বিশ্ব দৃষ্ট হয়)[১৩]। হে রামচন্দ্র! জগৎ ও অহংতত্ত্ব অর্থাৎ জীবতত্ত্ব, সমস্তই সেই সর্ব্বগ নিত্যোদিত মহাবপু ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছু নহে[১৪]। ব্রহ্মই সেই সেই শক্তির উদয়ে সেই সেই নামে খ্যাপিত হইতেছেন। তিনিই মনন শক্তির উদ্রেকে মন নাম প্রাপ্ত হন। ইহা মন, তাহা চিত্ত, তাহা জীব, এ সকল বুদ্ধিপ্রভেদ মাত্র, বস্তুপ্রভেদ নহে। সুতরাং ঐ সকলের প্রতীতি আকাশে পিচ্ছভ্রান্তির (পিচ্ছ=ময়ূরের পালক) এবং সলিলে আবর্ত্তবুদ্ধির অনুরূপ। সুতরাং মন বা জীব আত্মার আংশিক প্রতিভাস ব্যতীত অন্য কিছু নহে। এই যে মননধর্ম্মী মন, ইহাও সেই অনির্ব্বাচ্য ব্রাহ্মী শক্তি। যেহেতু শক্তি ও শক্তিমান্ অভিন্ন, সেই হেতু এ সমস্তই ব্রহ্মাভিন্ন বলিয়া বিজ্ঞাত হও। এই জগৎ, তিনি ব্রহ্ম, এই আমি, এ সকল বিভাগ প্রতিভাস প্রভব অর্থাৎ স্বাপ্নভ্রান্তির কার্য্য[১৫।১৭]। লোকে ও শাস্ত্রে কাম, কর্ম্ম ও অবিদ্যা প্রভৃতিকে মন, জীব, ব্রহ্ম, জগৎ, ইত্যাদি ইত্যাদি ভেদ ভ্রমের পরম কারণ বলিতে দেখা যায় সত্য; পরন্তু তাহাও সর্ব্বশক্তি ব্রহ্মের ব্রহ্মতা। অর্থাৎ মনের আবির্ভাব তিরোভাব বশতঃ যে কিছু সৎ অসৎ (আছে ও নাই) ব্যবহার সম্পন্ন হয় সে সমস্তই মননশক্তিনাম্নী ব্রাহ্মী শক্তি[১৮।১৯]। সমুদায় ঋতুতে সমানরূপে সর্ব্বপুষ্পাদিপ্রসবশক্তি থাকিলেও যেমন প্রদেশ, মৃত্তিকা, বীজ, সংস্কার (চাস) প্রভৃতি অনুসারে সুব্যবস্থায় পুষ্পাদি সমুদ্ভব হয়, সেইরূপ, জীবচেষ্টাও পরব্রহ্মে জীবের বাসনানুগৃহীত চিত্তের দ্বারা সুব্যবস্থায় নির্ব্বাহিত হয়, সাঙ্কর্য্য প্রাপ্ত (এলো থেলো বা বিশৃ-ঙ্খল) হয় না[২০।২১]। উৎপত্তি স্বীকার করিলেও উক্ত প্রকারে জগ-দ্ব্যবস্থার নিয়ম অসঙ্কর হইতে পারে বটে; পরন্তু সে সমস্তই মানস প্রতিভাস (অর্থাৎ মনের বিকল্পনা। যাহা প্রতিভাস তাহা বস্তু নহে; সেজন্য তাহা সত্যাসত্য জন্মে না এবং সত্যরূপে দৃষ্ট হয় না। যে কিছু ভেদ, সমস্তই মনঃকল্পিত বিধায় শব্দের (নামের) অনতিরিক্ত। সেই জন্যই বলিতেছি, তুমি মনঃপ্রসূত জগৎকে ব্রহ্মের অনতিরিক্ত বলিয়া অবধারণ করিবে[২২।২৩]। মনের তন্ময়তা যদ্রূপ, বস্তুদর্শনও তদ্রূপ।

দৃষ্টান্ত—পূর্ব্বোক্ত ইন্দুতনয়গণের সৃষ্টি[১৯]। অক্ষুব্ধ বিমল সলিলে লহরীর উত্থান যদ্রূপ, পরমাত্মায় সংসার কারণ জীবের উৎপত্তি তদ্রূপ। জগতের কথা দূরে থাকুক, জগৎকল্পক জীবও ব্রহ্ম[২০]।

হে রামচন্দ্র! পূর্ণচৈতন্য পরব্রহ্মই বিশ্বাকারে বিবর্ত্তিত। তাহাতে একই সত্তা বিদ্যমান, দ্বিতীয় সত্তা নাই। নাম, রূপ, ক্রিয়া, এ সকল সত্তা তাহাতে জলে তরঙ্গের ন্যায় দৃষ্টি প্রভেদ মাত্র[২১,২২]। জন্মিতেছে, বিনষ্ট হইতেছে, যাইতেছে, স্থিতি করিতেছে, এ সমস্তই ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মে[২৮]। যেমন তীব্র আতপ, বিচিত্র মৃগতৃষ্ণিকা রূপে প্রস্ফুরিত হয়, সেইরূপ, নামরূপাদিরহিত পরমাত্মা বিচিত্র বিশ্বাকারে প্রস্ফুরিত হইতেছেন[২৯]। কারণ, কর্ম্ম, কর্ত্তা, জনন, মরণ ও স্থিতি, এ সমস্তই ব্রহ্ম। লোভ, মোহ, তৃষ্ণা, আহার, আসক্তি, এ সকল কিছুই নহে অর্থাৎ মিথ্যা। * আত্মাতে আত্মার আবার লোভাদি কি[৩০,৩১]? হেম যেমন বলয়াদিরূপে উৎপন্ন হয়, তেমনি, আত্মাও মন ও জগৎ উভয় আকারে উদিত হইয়াছে[৩২]। শাস্ত্রে অবুদ্ধ (অজ্ঞানাবৃত) আত্মাই চিত্ত ও জীব নামে উক্ত হইয়াছে। যেমন জানিতে না পারিলে বদ্ধও অবদ্ধ হয়, তেমনি, জানিতে না পারাতেই (আপনাকে) আত্মা জীব হইয়া আছেন[৩৩]। চিন্ময় আত্মা স্বতঃই স্ব-অজ্ঞানের আবরণে আপনাকে জীব বলিয়া পরিচয় দিতেছেন[৩৪]। যেমন দৃষ্টির দোষে একই চন্দ্র দুই হয়, তেমনি, অজ্ঞানের দোষে আত্মা অনাত্মা রূপে প্রকটিত হন[৩৫]। বন্ধ ও মোক্ষ উভয়ই ব্যামোহমূলক। সুতরাং আত্মা বদ্ধ ও আত্মা মুক্ত, এ সকল কথা কথা মাত্র, বাস্তব নহে[৩৬]। আত্মায় "আমি বদ্ধ" এইরূপ কল্পনা কুকল্পনামাত্র। অপিচ, বন্ধন যখন কাল্পনিক, তখন মোক্ষও কাল্পনিক অর্থাৎ মিথ্যা[৩৭]।

শ্রীরাম বলিলেন, প্রভো! মন যাহা নিশ্চয় করে তাহাই যদি সমুদ্ভূত হয়, বাহিরে দৃষ্ট হয়, তবে মনের অন্তর্গত কল্পনা বন্ধন, তাহা

* ঐ সকল শরীরের ধর্ম্ম, আত্মার নহে। আত্মার কোনরূপ ধর্ম্ম নাই, আত্মা নির্ধর্ম্মক। আত্মা নিত্য নির্ব্বিকার নিরীহ চৈতন্য, সুতরাং তাহাতে কোন ধর্ম্ম বা ক্রিয়া নাই। অপিচ, ঐ সকল শারীর-ধর্ম্ম শরীরের সহিত কল্পিত। আজ কাল কল্পিত হয় নাই, উহা অনাদিকাল হইতে প্রবৃত্ত আছে, এবং প্রবাহের ন্যায় কারণ কার্য্য ভাবে চলিয়া আসিতেছে।

কি নিমিত্ত নাই[৩৮]? বশিষ্ঠ বলিলেন, বৎস! মূর্খদিগেরই বন্ধন কল্পনা সমুপস্থিত হয়। অতএব, পৃথক মোক্ষকল্পনা নিতান্ত অলীক[৩৯]। হে মহামতে! অজ্ঞতা বশতঃই ঐরূপ বন্ধমোক্ষ জ্ঞান সমুপস্থিত হয়[৪০]। যাহা কল্পনা তাহা কোন বস্তু নহে, ইহা প্রবুদ্ধ ব্যক্তি মাত্রেই জানেন। রজ্জুতত্ত্বানভিজ্ঞের নিকটেই রজ্জু সর্পরূপে প্রস্ফুরিত হয়, কিন্তু অভিজ্ঞের নিকট নহে। রাম! সেইজন্য, পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে, প্রাজ্ঞ জনের বন্ধমোক্ষ ব্যামোহ নাই। ঐ সকল ব্যামোহ কেবল অজ্ঞ জীবেই বিরাজ করে[৪১।৪২]। অগ্রে মনঃ, পরে বন্ধমোক্ষজ্ঞান, পশ্চাৎ জগৎ-প্রপঞ্চের রচনা অর্থাৎ ক্রমিক কারণ কার্য্যভাবে পর পর নিরূঢ়-কল্পনায় নিষ্পন্ন হইয়াছে। মিথ্যা রূপকথা যেমন বালকের সত্য বলিয়া প্রতীত হয়, তেমনি, অজ্ঞের নিকট এই মিথ্যা প্রপঞ্চ সত্যস্বরূপে প্রতীত হইতেছে[৪৩]।

একাধিকশততম সর্গ।

বালকোপাখ্যান।

রাম বলিলেন, মুনে! মিথ্যা[১] আখ্যায়িকা বালকের নিকট কিরূপ প্রতীবিষয় হয়? তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন।

বশিষ্ঠ বলিলেন, এক সম্মুগ্ধমতি বালক স্বীয় ধাত্রীকে কহিল, ধাত্রি! তুমি আমার নিকট একটী হর্ষপ্রদ উপন্যাস বল[১।২]। বালক ধাত্রীকে ঐরূপ কহিলে, ধাত্রী বালকের চিত্তবিনোদনার্থ শ্রুতিমধুর আখ্যায়িকা বলিতে লাগিল[৩]।

ধাত্রী কহিল বৎস। পূর্ব্বকালে ধাম্মিক, সুন্দরদর্শন, শৌর্য্যবীর্য্য-সম্পন্ন তিন রাজপুত্র ছিল। তাহারা অতিবিস্তীর্ণ শূন্যনগর রাজ্যের মধ্যে আকাশময় তারকার ন্যায় রাজধানীতে বাস করিত। ঐ তিন রাজপুত্রের দুই জন অজাত; আর এক জন মাতৃগর্ভেও ছিল না[৪।৫]। অনন্তর কোন এক সময়ে তাহারা মরক কারণে মৃতবান্ধব ও দুর্ভিক্ষ কারণে শুষ্কবদন ও শোকসন্তপ্ত হইয়া পরস্পর পরামর্শ করতঃ সেই শূন্যনগর রাজ্য হইতে কোন এক উত্তমনগর রাজ্যের উদ্দেশে আকাশ হইতে বুধ, শুক্র ও শনি গ্রহের ন্যায় বিনির্গত হইল[৬।৭]। সেই শিরীষকুসুমের ন্যায় সুকুমার বালকত্রয় গ্রীষ্মতাপার্ত্ত পল্লবের ন্যায় পথিমধ্যে দিবাকরকিরণে সাতিশয় ম্লান ও বিবর্ণ হইল[৮]। তাহাদিগের সুকোমল চরণতল সিকতাময় মার্গের উত্তপ্ত বালুকারাশির দ্বারা দগ্ধ হইতে লাগিল। তখন তাহারা যূথভ্রষ্ট মৃগকুলের ন্যায় কাতর হইয়া হা তাত! হা তাত! বলিয়া রোদন করিতে লাগিল[৯]। দর্ভাগ্রভাগ দ্বারা তাহাদিগের চরণ বিদ্ধ ও প্রচণ্ডমার্ত্তণ্ডকিরণোত্তাপে শরীর পরিম্লান হইতে লাগিল। অতি কষ্টে তাহারা ধূলিধূষরিত মূর্ত্তিতে অতি দূর পথ অতিক্রম করিয়া পথপ্রান্তে মঞ্জরীজালজটিল, প্রফুল্লপল্লব এবং মৃগপক্ষিকুলের বাসস্থান তিনটী বৃক্ষ দেখিতে পাইল। সেই তিনটী বৃক্ষের মধ্যে দুইটী অজাত; অপর একটী আজও বীজ হইতে বহির্গত হয় নাই[১০।১১]। অনন্তর

সেই রাজপুত্রত্রয় পথপর্য্যটনে সাতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়া স্বর্গস্থিত পারিজাত তলে বিশ্রান্ত ইন্দ্র, যম ও পবনের ন্যায় সেই বৃক্ষত্রিতয়ের অন্যতম বৃক্ষের তলে বিশ্রাম করিতে লাগিল। বিশ্রামের পর সেই বৃক্ষের অমৃতকল্প ফলসমূহ ভক্ষণ, ও তাহার সুস্বাদু রসরাশি পান করিল এবং তাহার পুষ্পগুচ্ছসমূহে মালা গ্রথন করিয়া লইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল[১৩।১৪]।

পরে তথা হইতে বহুদূর গমন করিতে করিতে ক্রমে মধ্যাহ্নকাল সমুপস্থিত হইল। এই সময়ে তাহারা পথিমধ্যে তিনটী বিস্তীর্ণা নদী দেখিতে পাইল। ঐ সকল নদী ভয়ঙ্কর শব্দ সহকারে অত্যুত্তাল তরঙ্গ সকল বিস্তার করিতেছিল[১৫]। ঐ তিন নদীর একটী বহু কাল হইতে পরিশুষ্ক, অপর দুইটীতে অন্ধলোচনের দৃষ্টির ন্যায় কিছুমাত্রও জল ছিল না[১৬]। উক্ত নদীত্রয়ের মধ্যে যেটী চিরশুষ্ক, রাজপুত্রত্রয় ঘর্ম্মার্ত্ত হইয়া সেইটীতেই আদর সহকারে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের গঙ্গাস্নানের ন্যায় স্নান করিলেন[১৭]। তথায় অবগাহন পূর্ব্বক বহুক্ষণ পর্য্যন্ত জলক্রীড়া ও সেই নদীর ক্ষীরোপম সলিলরাশি পান করিয়া প্রহৃষ্ট মনে তথা হইতে প্রস্থান করিল[১৮]।

অনন্তর দিবসের শেষভাগে দিবাকর লম্বমান (অস্তগামী) হইলে, সেই রাজকুমারত্রয় এক নবনির্ম্মিত, পর্ব্বতসম উচ্চ, পতাকালাঞ্ছিত, পদ্মিনীসমূহে পরিব্যাপ্ত, উল্লাসধ্বনিশালী, গীতাসক্ত নগরবাসী জনগণে সঙ্কুল ও অতি মনোহর ভবিষ্যৎ নগর প্রাপ্ত হইল[১৯।২০]। তাহারা তথায় প্রবিষ্ট হইয়া দেখিল যে, নগরটীর মধ্যস্থলে অত্যুচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গের ন্যায় শোভমান এবং মণিকাঞ্চননির্ম্মিত গৃহসমূহে অকীর্ণ তিনটী সৎ (বিদ্যমান) ভবন রহিয়াছে[২১]। সেই তিনটী ভবনের দুইটী কথনও নির্ম্মিত হয় নাই, অপর একটীর ভিত্তিও নাই। অনন্তর সেই বরানন নরত্রয় ভিত্তিশূন্য মনোহর গৃহে প্রবেশ করতঃ তথায় উপবেশন পূর্ব্বক বিহার করিতে লাগিলেন, এবং তথায় দেখিতে পাইলেন, যে, তিনটী কাঞ্চনকল্পিত স্থালী বিদ্যমান রহিয়াছে। তন্মধ্যে দুইটী ভাঙ্গিয়া কর্পরসদৃশ হইয়া গিয়াছে ও অপর একটী চূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। প্রশস্তবুদ্ধি ও বহুভোজী উক্ত বালকত্রয় অন্নপচনের নিমিত্ত সেই চূর্ণস্থালীটী গ্রহণ করিলেন। অনন্তর নবনবতিদ্রোণপরিমিত তণ্ডুল আহরণ করিয়া তন্মধ্য হইতে

শত দ্রোণ তণ্ডুল গ্রহণ পূর্ব্বক উক্ত স্থালীতে পাক করিলেন। অনন্তর ভোজনার্থ তিন জন ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিলেন। সেই তিনটী ব্রাহ্মণের দুইটী ব্রাহ্মণ দেহহীন, অপর এক ব্রাহ্মণের মুখ নাই[২২।২৩]। যিনি নির্ম্মুখ ব্রাহ্মণ তিনি সেই নবনবতি দ্রোণ পরিমিত * তণ্ডুলোৎপন্ন অন্নের দ্রোণশত পরিমিত অন্ন ভক্ষণ করিলেন। অনন্তর সেই কুমারত্রয় তদীয় ভুক্তাবশিষ্টঅন্ন ভোজন করিয়া সাতিশয় পরিতৃপ্ত হইল।

বৎস! পরে সেই তিন্ রাজপুত্র সেই ভবিষ্যন্নগরে মৃগয়াক্রীড়ায় ব্যাসক্ত হইয়া পরম সুখে বাস করিতে লাগিল[২৭।২৮]। হে অনঘ শিশো! আমি তোমার নিকট রমণীয় উপন্যাস কীর্ত্তন করিলাম। তুমি ইহা স্মরণে রাখিবে। ইহা না ভুলিলে তুমি পূর্ণ বয়সে পণ্ডিত হইতে পারিবে[২৯]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! ধাত্রী বালকের নিকট এই মিথ্যা আখ্যায়িকা কীর্ত্তন করিলে, বালক তদুক্ত ঐ আখ্যান শ্রবণ করিয়া, সাতিশয় আনন্দিত হইল এবং সত্য বিবেচনায় তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিল[৩০]। হে কমললোচন রাম! আমি চিত্তাখ্যানকথাপ্রসঙ্গে তোমার নিকট বালকাখ্যান কীর্ত্তন করিলাম[৩১]। রাঘব! এই সংসার উগ্রসঙ্কল্প ও দৃঢ়কল্পনার দ্বারাই রচিত; সুতরাং বালকাখ্যায়িকার ন্যায় রূঢ়িতা প্রাপ্ত। (রূঢ়িতা=আছে বলিয়া মনে হওয়া)। এই কল্পনাজালভাসিত প্রতিভাসাত্মিকা সংসাররচনা বন্ধমোক্ষ প্রভৃতি কল্পনাশত দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে। বস্তুতঃ ইহা সঙ্কল্প ব্যতীত অন্য কিছু নহে। যাহা সঙ্কল্প বশতঃ প্রতিভাত হয়, প্রকাশ পায়, তাহা অকিঞ্চিৎও কিঞ্চিৎ। অকিঞ্চিৎ অর্থাৎ রজ্জুসর্পের ন্যায় মিথ্যা। কিঞ্চিৎ অর্থাৎ ভ্রান্তির আধার ব্রহ্মচৈতন্য। অপিচ, এই পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, পর্ব্বত, সরিৎ ও দিঙ্মণ্ডল প্রভৃতি সকলই সেই সঙ্কল্পময়চিত্তের বৈচিত্র্য সুতরাং স্বপ্নসদৃশ। আখ্যায়িকান্তর্গত ভবিষ্যন্নগর, রাজপুত্র ও নদীত্রয় যদ্রূপ, স্বপ্নের ও সংকল্পের রচনা যদ্রূপ, এবং এই জগৎ স্থিতিও তদ্রূপ। সলিলান্তর্গত চঞ্চল অব্দি যেমন আপনিই আপনাতে প্রস্ফুরিত হয়, তেমনি, এই জগৎও সঙ্কল্পময়চিত্তে প্রস্ফুরিত হইতেছে। এই জগৎ সেই পরমাত্মার প্রথম সঙ্কল্প হইতে সমুদিত হইয়াছিল, পরে ইহা দিবাকরের দিবস নির্ব্বাহের ন্যায় মনুষ্যা-

* দ্রোণ অর্থাৎ আড়ক। ৩২ সেরে ১ দ্রোণ। নবনবতি ৯৯।

দির ব্যাপারে স্ফারতা (বিস্পষ্টভাব) প্রাপ্ত হইয়াছে[৩২।৩৮]। বস্তুতঃই একমাত্র সঙ্কল্পকল্পনা দ্বারা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হইয়াছে। অপিচ, সেই একমাত্র সঙ্কল্পকল্পনা আবার চিতের অন্যতম চিৎবিলাস *। অতএব, হে রাম! তুমি এই সঙ্কল্পজাল (অর্থাৎ কল্পিত জগৎভাব) পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র নির্ব্বিকল্প চিদ্রূপ আশ্রয় করিয়া পরমা শান্তি প্রাপ্ত হও[৩৯]। (জগদ্ভাব বিস্মৃত না হইলে, বিকল্পকল্পনা পরিত্যাগ না করিলে, নিজের বিকার বর্জ্জিত স্বরূপ লাভে সমর্থ হইবে না।)

* চিতের অর্থাৎ চিদাত্মা পরব্রহ্মের। অন্যতম অর্থাৎ বহু প্রকারের মধ্যে এক প্রকার। চিৎ বিলাস অর্থাৎ মায়াশক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্ম চৈতন্যের বিবর্ত্তন রূপ কার্য্য।

একাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত।

দ্ব্যধিকশততম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রামচন্দ্র! মূঢ়েরাই আপন আপন সংকল্পের দ্বারা মোহ প্রাপ্ত হয়, পণ্ডিতেরা নহে। শিশুরাই অক্ষয় পদার্থের অক্ষয়তা না জানিয়া ক্ষয়ের আশঙ্কায় বিমুগ্ধ হইয়া থাকে[১]। রামচন্দ্র বলিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি যে সঙ্কল্পের কথা বলিলেন, সেই বিনশ্বর সঙ্কল্প কি? কেই বা সঙ্কল্প করে? এবং অসৎ সঙ্কল্প কাহাকেইবা কিরূপে মোহিত করে? অর্থাৎ কোন্ মিথ্যার দ্বারা কে সংসারভ্রম প্রাপ্ত হয়[২]? বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! যেমন অজ্ঞ শিশু কর্তৃক মিথ্যা বেতাল (ভূত) কল্পিত হয়, তেমনি, অবিদ্যোপহিত পরমাত্মা পূর্ব্বকল্পীয় জীবভাবাপন্ন অহঙ্কারের সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া এতৎ কল্পে মিথ্যা অহং অভিমানী ও তন্নামধারী হন। অহং আমি, এ ভাব তাঁহারই নিজ অজ্ঞান কর্তৃক কল্পিত, সুতরাং শিশুর বেতাল কল্পনার ন্যায় মিথ্যা[৩]। যখন একই পূর্ণস্বভাব পরম বস্তু ব্যতীত অন্য কিছু নাই, তখন আর কে কোথা হইতে উদিত হইবে? অর্থাৎ পৃথক্ অহঙ্কার কোথা হইতে আসিবে[৪]? যেমন অসম্যগ্দর্শন হেতু পান্থগণের মরীচিকায় অর্থাৎ বালুকাভূমিস্থ সৌরাতপে (সূর্য্যকিরণে) জলভ্রম হয়, তেমনি, স্ব-অজ্ঞান বশতঃই একাদ্বয় পরমাত্মায় মিথ্যা অহঙ্কার সমুদিত হয়। সুতরাং বাস্তব পক্ষে অহঙ্কার নাই[৫]। এবং মনেরই সঙ্কল্প বিশেষ সংসার। অর্থাৎ মনঃই আপনি আপনাকে আশ্রয় করিয়া জগৎরূপে প্রস্ফুরিত হইতেছে। যেমন জলই আবর্ত্ত, তেমনি, মনঃই সংসার[৬]। রাঘব! তুমি অসম্যগ্দর্শন পরিত্যাগ পূর্ব্বক সত্যস্বরূপ আনন্দজনক ও মোক্ষকারণ সম্যগ্দর্শন আশ্রয় কর[৭]। মোহের আড়ম্বর পরিত্যাগ করিয়া বিচারধর্ম্মিণী বুদ্ধি অবলম্বন পূর্ব্বক বিচারপরায়ণ হও। অর্থাৎ যাহা সত্য তাহাই বুদ্ধিস্থ কর এবং যাহা অসৎ তাহা পরিত্যাগ কর[৮]। তুমি বস্তুতঃ অবদ্ধ; অথচ বদ্ধ আছি ভাবিয়া বৃথা শোক করিতেছ। যখন একই আত্মতত্ত্ব অদ্বিতীয় ও অপরিসীম, তখন আর কে কাহার দ্বারা বদ্ধ হইবে[৯]? নানাত্ব অনানাত্ব উভয়ই ব্রহ্মবস্তুতে কল্পিত। কল্পনার পরিহার হইলে যখন বিশুদ্ধ ব্রহ্মতত্ত্ব

বিদ্যমান থাকে, তখন আর কেই বা বদ্ধ থাকিবে? এবং কেই বা মুক্ত হইবে[১০]? আত্মাতে ভেদাভেদ বিকার নাই। সুতরাং দেহ নষ্ট, ক্ষত ও ক্ষীণ হইলে তাহাতে আত্মার ক্ষতি হয় না। ভস্ত্রা (জাঁতা) দগ্ধ হইলে কি কখন ভস্ত্রাপূর (বায়ু) দগ্ধ হয়[১১।১২]? যেমন পুষ্প বিনষ্ট হইলে গন্ধ বিনষ্ট হয় না, তেমনি, এই দেহ পতিত বা উদিত হউক, তাহাতে আত্মার কোন ক্ষতি হয় না[১৩]। এই দেহ পতিত, উৎপতিত, নিপতিত, যাহা হয় হউক, আমি যাহা তাহাই থাকিব এবং সুখ দুঃখাদিও নিজ আধারে (অজ্ঞান বিকার অন্তঃকরণে) থাকিবেক। মেঘের সহিত বায়ুর ও পদ্মের সহিত ভ্রমরের যেরূপ সম্বন্ধ, শরীরের সহিত তোমার সেইরূপ সম্বন্ধ[১৪।১৫]। রাঘব! মনঃই জগতের শরীর অর্থাৎ মনঃই জগতের আকারে দৃষ্ট হইতেছে। সুতরাং মনঃই দৃশ্য জগতের মূল বীজ; এবং আদ্যাশক্তিস্বরূপ। অপিচ, যাহা অধ্যাত্মচিৎ অর্থাৎ শরীরোপহিত চৈতন্য, তাহা কোন কালে বিনষ্ট হয় না[১৭]। হে মহাপ্রাজ্ঞ! আত্মা কদাচ বিনাশ প্রাপ্ত বা কোথাও গতাগত হন না। তুমি বৃথা পরিতাপ করিতেছ[১৮]। যেমন মেঘ বিশীর্ণ হইলে বায়ু, ও পদ্ম শুষ্ক হইলে ষট্পদ আকাশে অবস্থিতি করে, সেইরূপ, দেহ ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে এই উপাধিপরিচ্ছিন্ন জীবাত্মাও অনন্তাত্মায় মিলিত হয়[১৯]। আত্মনাশের কথা দূরে থাকুক, জ্ঞানাগ্নি ব্যতিরেকে সংসারবিহারী মনঃও বিনষ্ট হয় না[২০]। যেমন ঘট ভগ্ন হইলে তদন্তর্গত আকাশ আকাশে একতাপ্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ, স্থূল সূক্ষ্ম দেহ ক্ষয় হইলেও তদভিমানী জীবাত্মা সেই পরমাত্মায় বিলীন হয়। কুণ্ড ও বদর (কুণ্ড=আধার পাত্র। বদর=কুল ফল।) উভয়ের অবস্থিতি যদ্রূপ, ঘট ও আকাশ উভয়ের স্থিতি যদ্রূপ, দেহে আত্মার অবস্থিতিও তদ্রূপ। দেহ বিনাশী এবং আত্মা অবিনাশী। বদর কুণ্ডভঙ্গে হস্তগত বা অন্যাধার গত হয়, আত্মাও দেহ ভঙ্গের পর পরমাত্মগত হয়[২১।২৩]। মনঃই মরণরূপ শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া মুহূর্ত্ত কালের জন্য দেশ কালাদি হইতে তিরোহিত হয় মাত্র। সুতরাং তাহার জন্য আক্রোশ কেন? কেনই বা তাহার জন্য লোকে ভীত ও ত্রস্ত হয়? পক্ষিশাবক যেমন উড্ডয়নোৎসুক হইয়া ভঙ্গপ্রবণ অণ্ড পরিত্যাগ করে, সেইরূপ, তুমিও পরমাকাশ গমনের জন্য অহম্ভাব সম্পন্না বাসনা পরিত্যাগ কর[২৪।২৬]। মনের

তাদৃশী শক্তিই (অহন্তাবই). ইষ্টানিষ্টের কারণ এবং তাহারই সামর্থ্যে ভ্রমপ্রাপ্ত হইয়া জীবগণ বৃথা স্বপ্নতুল্য সংসার দর্শন করিতেছে[২৭]। উহাই অবিদ্যা, উহাই দুরুচ্ছেদ্যা, এবং উহাই দুঃখ প্রদানার্থ. বৃথা পরিবর্দ্ধিত হয়। যে উহাকে না জানে, উহা তাহারই নিকট এই অসুন্দর বিশ্ব বিস্তার করে[২৮]। যেমন কোয়াশা হইলে ভ্রান্ত লোক আকাশকে মলিন অর্থাৎ অনির্ম্মল মনে করে, সেইরূপ, তুচ্ছ মনঃশক্তির প্রচ্ছাদনে ভ্রান্ত জীবেরা আপনাকে অস্বস্থ ও মলিন মনে করে[২৯]। ঐ শক্তির দ্বারাই এই আরম্ভমন্থর (মহা আড়ম্বরযুক্ত) বিশ্ব দীর্ঘস্বপ্নের ন্যায় অসৎ হইয়াও কল্পিত সৎস্বরূপে সমুদিত হইয়াছে[৩০]। মাত্র ভাবনাই ইহার কর্ত্তা এবং তাহার (ভাবনার) জগৎ রচনাও তদ্রূপ। অর্থাৎ ইহার কর্ত্তৃত্বও ভাবনা এবং কার্য্যও ভাবনা। তদতিরিক্ত বাস্তব কর্ত্তৃত্বাদি নাই। যেমন দোষদুষ্ট চক্ষুঃ আকাশে কেশগুচ্ছাদি (এক প্রকার ভ্রান্তি দর্শন। যেন চুলের গুছি) দেখে, তেমনি, অজ্ঞানমলিন আত্মাও আপনাতে জগদ্দর্শন করে[৩১]। হে রামচন্দ্র! যেমন দিবসাধিপ দিবাকর স্বীয় আতপ দ্বারা হিমশিলা (বরফ) বিনষ্ট করেন, তদ্রূপ, তুমিও বিচারদ্বারা ঐ শক্তিকে বিনষ্ট কর[৩২]। যাহারা হিম বিনাশ কামনা করে, তাহারা যেমন সূর্য্যের উদয় প্রার্থনা করে, সেইরূপ, যাহারা মনোবিনাশ প্রার্থী, তাহারা বিচারের উদয় কামনা করুক[৩৩]। অবিদ্যারূপ মেঘ যতদিন না উত্তমরূপে বিজ্ঞাত হইবে তত দিনই সে শম্বরাসুরের ন্যায় বিশ্ব প্রদর্শন রূপ ইন্দ্রজালময় সুবর্ণ বর্ষণ করিবে[৩৪]। (শম্বর=ময় দানবের ন্যায় এক অসুর। এই ব্যক্তি ইন্দ্রজাল বিদ্যার অন্যতম স্রষ্টা) মনঃ স্বরচিত আত্মবধ নাটক দেখিয়া নৃত্য করিতেছে বটে; অর্থাৎ জগতের বিলাস দেখিয়া আমোদ করিতেছে বটে; পরন্তু তাহাই উহার আত্মবিনাশের কারণ। কেননা, যে মুহূর্ত্তে আত্মা উহাকে (বিশ্বকে) দেখিবে অথবা বিশ্ব আত্মাকে দেখিবে, সেই মুহূর্ত্তেই আত্মা সংসার দশা প্রাপ্ত হইবে। (বিশ্ব আত্মাকে দেখিবে, এ কথার অর্থ—বিশ্ব মনের সাহায্যে আত্মায় প্রতিফলিত হইবে) দুর্ব্বুদ্ধি মনঃ জানিতেছে না যে তাহার বিনাশ নিকট—অতি নিকট[৩৫।৩৬]। যাহারা মনোনাশের উপায় অনুসন্ধান করে, তাহারা কেবলমাত্র সঙ্কল্পের দ্বারাই তাহা সিদ্ধ করিতে পারে। সুতরাং তন্নিমিত্ত তপস্যাদি ক্লেশ করিতে হয় না। রাম! তুমিও বিবেক দ্বারা

সঙ্কল্প উত্থাপন করতঃ বিশ্ববিকল্পক মনঃকে জয় কর এবং অধ্যাত্মজ্ঞান উদিত কর[৩৭।৩৮]। হে রাঘব! মনের নাশই মহান্ অভ্যুদয় এবং মনের উদয়ই মহান্ অনর্থের মূল। অতএব, তুমি মনোনাশার্থ যত্নবান্ হও[৩৯]। হে সুভগ! যে মনের বর্ণনা করিলাম, সেই মনঃই এই সুখদুঃখরূপবৃক্ষসমাকীর্ণ কৃতান্তরূপ মহোরগযুক্ত (উরগ=সর্প) সংসাররূপ নিবিড় অরণ্যের প্রভু এবং তত্রত্য অধিবাসিগণের মহাবিপদের হেতু[৪০]।

বাল্মীকি বলিলেন, হে ভরদ্বাজ! মহর্ষি বশিষ্ঠ এই সকল কথা কহিতেছেন, এমন সময়ে দিবা অবসান হইল। দিবাকর যেন সায়ন্তন কার্য্য সমাধা করিবার জন্য অস্তাচল গমন করিলেন। তখন মহর্ষি বশিষ্ঠ সভাস্থ ব্যক্তিবর্গকে যথাযোগ্য সম্ভাষণাদি করিয়া সন্ধ্যাবন্দনাদি সায়ংকালের কর্ত্তব্য কার্য্যের নিমিত্ত গমন করিলেন। অনন্তর রজনী প্রভাতা ও দিবাকর সমুদিত হইলে পুনর্ব্বার সভায় সমাগত হইলেন[৪১]।

দ্ব্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত।

ত্র্যধিকশততম সর্গ।

বশিষ্ঠদেব পুনর্ব্বার বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যেমন অর্ণব সমুত্থিত কল্লোল, তেমনি, পরব্রহ্ম সমুত্থিত মনঃ। চিত্ত বা মনঃ স্ব-স্বভাবে তরঙ্গমালার ন্যায় বিস্তৃতি প্রাপ্ত হয়[১]। এই মনঃ হ্রস্বকে দীর্ঘ এবং দীর্ঘকে হ্রস্ব করে। কখন বা আপনাকে পর ও পরকে আপনার করে[২]। মনঃ প্রাদেশপ্রমাণ বস্তুকে ভাবনার দ্বারা অদ্রির ন্যায় দর্শন করায়[৩]। উল্লাসযুক্ত মনঃ পরমাত্মায় প্রতিষ্ঠা (স্থিতি) লাভ করিয়া নিমেষ মধ্যে সংসারপরম্পরা বিস্তার করে এবং কখন বা সংসার বিস্তৃতি বিষয়ে বিরত থাকে[৪]। এই বহুবস্তুপূর্ণ স্থাবর জঙ্গমাত্মক পরিদৃশ্যমান জগৎ সেই মনঃ হইতেই সমাগত হইয়াছে[৫]। চঞ্চলস্বভাব মনঃ দেশ, কাল, ক্রিয়া ও দ্রব্যশক্তির দ্বারা পর্য্যাকুলীকৃত হইয়া নটের ন্যায় এক ভাব (আকার) হইতে অন্য ভাবে গমন করে[৬]। অপিচ মনঃই সৎকে অসৎ ও অসৎকে সৎ করিতেছে ও তদনুরূপে সুখ দুঃখ প্রদান করিতেছে। যাহা যাহা করিতেছে সে সমস্তই ভাবের দ্বারা করিতেছে[৭]। এই চঞ্চল মনঃ যখনই স্বকর্ম্মোপস্থাপিত ভোগ্যকে যে ভাবে ভাবিত করে অর্থাৎ যে প্রকার কল্পনার অধীন করে, (ফলিতার্থ—ইচ্ছা করে), তখন তাহার কল্পিত হস্তপদাদিমান্ এই দেহ তদনুরূপেই স্পন্দিত অথবা অস্পন্দিত হয়[৮]। এবং সেই সেই সময়েই ক্রিয়ার দ্বারা সে তখন বারিপরিষিক্ত লতার অঙ্কুর গ্রহণের ন্যায় চিত্তসঙ্কল্পিত সুখদুঃখপরম্পরা গ্রহণ করিতে থাকে[৯]। হে রামচন্দ্র! যেমন শিশুগণ আর্দ্র মৃৎপিণ্ড লইয়া বহুবিধ খেলানা নির্ম্মাণ করে, তেমনি, মনঃও স্বান্তঃস্থ ভাব মাত্র লইয়া এই বিচিত্র জগৎ নির্ম্মাণ করে[১০]। মনঃ স্বকল্পিত পদার্থরূপ পঙ্ক দ্বারা যে সকল নরদেহাদিরূপ ক্রীড়নক (খেলনা) প্রস্তুত করিয়াছে, সে সকল কিছুই নহে অর্থাৎ সমস্তই মৃগতৃষ্ণাজলের ন্যায় অলীক বা মিথ্যা[১১]। ঋতুকর কাল যেমন বৃক্ষ দিগের ভিন্নরূপত্ব সম্পাদন করে, তেমনি, মনঃও এই সমস্ত পদার্থের ভিন্নরূপতা সম্পাদন করিতেছে[১২]। মনোরাজ্য, স্বপ্ন ও সঙ্কল্প, এই সকল চিত্তকার্য্য অনুসন্ধান কর, দেখিতে পাইবে, চিত্তেরই লীলায়

বহুযোজনও গোষ্পদের ন্যায় এবং অত্যল্পও বহুযোজনের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। এই বিশ্ব অবিবেকীর দৃষ্টিতে বহুযোজন এবং বিবেকীর দৃষ্টিতে গোষ্পদ[১৩]। অধিক কি, উক্ত মনঃ কল্পকে ক্ষণ এবং ক্ষণকে কল্প করিতে পারে। দেশ, কাল, ক্রিয়াক্রম, সমস্তই মনের আয়ত্ত বা অধীন। পরন্তু তাহার সংযোগাদির অল্পতা ও আধিক্য অনুসারে শীঘ্রতা ও বিলম্বতা ঘটনা হয়। যদ্রূপ বৃক্ষ হইতে পল্লবাদির বিনির্গম দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ মোহ, সংভ্রম, অর্থ, অনর্থ, দেশ, কাল ও গতি অগতি, সমস্তই মনের প্রভাব বা মনঃ হইতে সমাগত[১৪।১৬]। সমুদ্র যেমন জল ব্যতিরেকে ও অনল যেমন উষ্ণতা ব্যতিরেকে পদার্থান্তর নহে, সেইরূপ, এই বিবিধ আরম্ভসম্পন্ন সংসার চিত্ত ব্যতিরেকে বস্বন্তর নহে[১৭]। কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, দ্রষ্টা, দর্শন ও দৃশ্য প্রভৃতি সঙ্কুল এইযে জগৎ, ইহা চিত্তেরই রূপভেদ, বস্বন্তর নহে[১৮]। যেমন কাঞ্চনবুদ্ধিশালী মানবের দৃষ্টিতে কেয়ূরাঙ্গদাদি কল্পিত; এবং তত্রস্থ কল্পনাভাগ পরিত্যাগে হেম মাত্রই লক্ষিত হয়, তেমনি, তত্ত্বদর্শী জনগণের দৃষ্টিতে চিত্তের কল্পিত স্বরূপভেদ হইতে সমুত্থিত এই বন পর্ব্বত ও সমুদ্রাদি সঙ্কুল জগৎও চিত্ত বলিয়া সংলক্ষিত হইয়া থাকে[১৯]।

ত্র্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত।

চতুরধিকশততম সর্গ।

লবণরাজার উপাখ্যান।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাঘব! এই জগদ্রূপ ইন্দ্রজাল যে প্রকারে চিত্তের অধীন, অর্থাৎ চিত্তকল্পনার অনতিরিক্ত, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত আমি এক উত্তম উপাখ্যান বলিতেছি, তুমি অবহিত হইয়া শ্রবণ কর[১]।

এই অবনীমণ্ডলে অরণ্যসঙ্কুল "উত্তরাপাণ্ডব" নামে এক অতি বৃহৎ জনপদ আছে[২]। তাপসগণ তাহার নিবিড় অরণ্যপ্রদেশে বিশ্রান্তচিত্তে অবস্থান করেন এবং বিদ্যাধরীগণ আনন্দ চিত্তে তাহার উপবন বিভাগে দোলায়মান লতাসমূহ আন্দোলিত করতঃ দোলক্রীড়া করিয়া থাকেন[৩]। এই স্থানের ভূধর সকল বায়ুসমাহৃত নিকটস্থ সরোবরজাত সরোজরাশির রজোদ্বারা অর্থাৎ পদ্মপরাগ দ্বারা সর্ব্বদা পীত বা পিঙ্গলবর্ণ হইয়া রহিয়াছে এবং অন্যান্য কুসুমরাজি প্রস্ফুটিত হইয়া অরণ্যশ্রেণীর শিরোভূষণরূপে অবস্থিতি করিতেছে[৪]। গ্রামসন্নিহিত ক্ষুদ্র অরণ্যসমূহও করঞ্জমঞ্জরী, কুঞ্জ ও গুচ্ছ প্রভৃতির দ্বারা পরম শোভা প্রাপ্ত এবং সে সকল স্থান খর্জ্জুর-তরুশ্রেণী পরিবৃত ও মধুমক্ষিকাগণের ঘুণ ঘুণ ধ্বনিতে সমাকুল দৃষ্ট হয়[৫]। অপিচ, তদন্তর্গত হরিদ্বর্ণ ক্ষেত্র সমূহের পিঙ্গলবর্ণ সুপক্ক ওষধি সকল পিঙ্গলবর্ণ মণির ন্যায় শোভমান হইতেছে এবং নীলকণ্ঠবিহঙ্গমগণের ও সারসপক্ষিসমূহের মনোহর কলরব দ্বারা তৎপার্শ্বস্থবর্ত্তী কনকবর্ণ সুদৃশ্য কানন সকল ধ্বনিত হইতেছে[৬]। তদ্জনপদস্থ গিরিগ্রাম সকল তমাল ও পাটলাবৃক্ষে পরিবৃত থাকায় অপূর্ব্ব নীল শোভা ধারণ করিয়া রহিয়াছে[৭]। ঐ সকল বৃক্ষের উপরিভাগে বিচিত্রবর্ণ বিহঙ্গমকুল অব্যক্ত কাকলীধ্বনি করিতেছে। নদীতীরে কুসুমিত পারিভদ্র প্রভৃতি তরুনিকর মনোহর শোভা বিস্তার করিতেছে[৮]। ফলপুষ্পনিপাতনকারী পবন অমন্দবেগে প্রবাহিত হইয়া কুসুমরাজি বিধুত (কম্পিত) করিতেছে এবং গন্ধর্ব্বগণ মধুর স্বরে আনন্দ গান করিতেছে। সে সকল প্রদেশ মৃদুমন্দসঞ্চারী সমীরণের সন সন ধ্বনিতে পরিব্যাপ্ত এবং ধন

ও উপবন দ্বারা সর্ব্বত্র সুষমান্বিত। এই স্বর্গসম মনোহর জনপদ দর্শন মাত্র বোধ হয়, যেন সুমেরুকন্দর নিষ্ক্রান্ত সিদ্ধচারণগণে ও বন্দিগণে পরিবৃত অমর নিবাস স্বর্গ বিধাতা কর্ত্তৃক ভূতলে সমানীত হইয়াছে।[১১]।

তাদৃশ মনোহর উত্তরাপাণ্ডব নামক জনপদে হরিশ্চন্দ্রবংশসম্ভূত পরম ধার্ম্মিক লবণ নামে এক সুবিখ্যাত মহীপাল বাস করিতেন[১২]। তাঁহার যশঃ কুসুমের পরাগরাজির দ্বারা সমীপবর্ত্তী শৈল সকল যেন পাণ্ডরবর্ণ হইয়া বিভূতিভূষিত বৃষভ বাহনের শোভার অনুকার করিতেছে[১৩]। এই রাজার স্বীয় কৃপাণে (তরবারিতে) অরাতিকুল ছিন্ন ভিন্ন ও নিঃশেষিত হইয়াছিল। এমন কি, অরাতিগণ তাঁহার আকৃতি মনে করিয়াই জ্বরাক্রান্ত হইত[১৪]। সজ্জনগণও এই রাজার বিষ্ণুচরিতোপম আর্য্যমনোরঞ্জন উদার চরিত অদ্যাপি স্মৃতিপথে সংস্থাপন করিয়া থাকেন[১৫]। অপ্সরোগণ ইঁহার সদ্গুণ পুলকোল্লাস সহকারে অদ্রীন্দ্র (হিমালয়) শিখরস্থিত অমরসভা সমূহে অনুক্ষণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন[১৬]। তত্রস্থ লোকপালগণ অপ্সরাগণের মুখে এই রাজার গুণগান শ্রবণ করেন এবং বিরিঞ্চিবাহন হংসেরা তাহা অভ্যস্ত করিয়া আত্মচরিতার্থ বোধ করে[১৭]। হে রামচন্দ্র! তাঁহার ন্যায় উদারচরিত অন্য কোন ভূপাল তৎকালে বিদ্যমান ছিলেন না। এমন কি, তাঁহার কোনও রূপ দৈন্যদোষযুক্ত কার্য্য কেহ কখন স্বপ্নেও শ্রুতিগোচর করে নাই[১৮]। কুটিলতা কি তাহা তিনি জানিতেন না। ধৃষ্টতা কি তিনি তাহা বুঝিতেন না। গৃধ্নুতা কি তিনি তাহা জ্ঞাত ছিলেন না। উদারতা কি, তিনি কেবল তাহাই জানিতেন ও বুঝিতেন। যদ্রূপ ব্রহ্মার করে অক্ষমালা নিয়ত অবস্থিত, তদ্রূপ, উদারতা তাঁহার হৃদয়ে নিয়তকাল অবস্থিত থাকিত[১৯]।

একদা দিবসাধিপ সূর্য্য নভোমণ্ডলের যে স্থানে উদিত হইলে ৪ দণ্ড বেলা হয়, সেই স্থানে উদিত হইয়াছেন, এমন সময়ে এই নরপতি রাজকীয় সভায় আগমন করতঃ সিংহাসনারূঢ় হইলেন[২০]। যেমন আকাশে চন্দ্র উদিত হন তাহার ন্যায় এই নরপাল উচ্চ সিংহাসনোপরি সুখোপবিষ্ট হইলেন। সামন্তগণ ও সৈন্যপতিগণ তৎসকাশে সসম্ভ্রমে সমাগত হইলেন। গায়কীগণের গান আরম্ভ হইল, বীণা বেণু প্রভৃতি বাদ্য যন্ত্রের ধ্বনিতে রাজন্যবর্গের চিত্ত বিকসিত হইল, চামরধারিণী

সুন্দরীকুল চামরব্যজন করিতে লাগিল। অনন্তর, সুরগুরু বৃহস্পতির ও অসুরাচার্য্য উশনার ন্যায় মন্ত্রিগণ স্থির ও গম্ভীর চিত্তে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনায় মনোনিবেশ করিলেন[২১]।[২৩]। মন্ত্রীর আদেশ ও নির্দ্দেশ অনুসারে রাজকার্য্য সকল নির্ব্বাহিত হইতেছে, বার্ত্তাবহগণ বার্ত্তা সকল শুনাইতেছে, নানা দেশের ইতিহাস পঠিত হইতেছে, বন্দিগণ বিনয়াবনত মস্তকে পবিত্রভাবে স্তুতি পাঠ করিতেছে, এমন সময়ে মহাড়ম্বরসম্পন্ন মেঘের ন্যায় এক বহ্বাড়ম্বরযুক্ত অপরিচিত ঐন্দ্রজালিক সদর্পে সেই রাজ-সভায় প্রবেশ করিল[২৪]।[২৬]। কপিরাজ যেমন ফলসম্পন্ন বৃক্ষের সম্মুখে গমন করে, তেমনি এই ঐন্দ্রজালিক সেই মহীপালের সম্মুখে সাটোপে গমন করিল। যেমন ফলসম্ভারাক্রান্ত পার্ব্বতীয় তরু (বৃক্ষ) পর্ব্বতের পাদদেশে মস্তক অবনত করে, তেমনি এ ব্যক্তিও কিরীট-মুকুট-ধারী ভূপালের চরণে স্বীয় মস্তক অবনত করিল। ভৃঙ্গ যেমন কমলকে আহ্বান করে, তাহার ন্যায় এই আগন্তুক সিংহাসনগত মহীপালকে মধুর বাক্যে সম্বোধন পূর্ব্বক উৎকন্ধর হইয়া কহিল, হে বিভো! চন্দ্র যেমন আকাশে থাকিয়া পৃথিবী দর্শন করেন, তেমনি, আপনি এই সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকিয়া এক অত্যদ্ভুত মিথ্যা কৌতুকক্রীড়া দর্শন করুন[২৭]।[৩০]। ঐন্দ্রজালিক ঐরূপ সম্ভাষণ করিয়া হস্তস্থিত ভ্রমদায়িনী পিচ্ছিকা (গুচ্ছীকৃত ময়ূরপুচ্ছ) বিঘূর্ণিত করিতে লাগিল। যেমন মায়াশক্তি নানারচনার বীজ, তেমনি, এই পিচ্ছিকাও নানা ভ্রম রচনার বীজ[৩১]। অনন্তর যেমন বিমানারোহী মহেন্দ্র স্বকীয় কার্ম্মুক দর্শন করেন, সেইরূপ, সিংহাসনস্থ মহীপাল দেখিলেন, যেন চতুর্দ্দিকে তেজোরেণু বিরাজিত শক্রধনু (রামধনু) লতাকারে বিরাজ করিতেছে[৩২]। ক্ষণকাল পরে দেখিলেন, সেই সভায় এক অশ্বপাল আগমন করিল[৩৩]। যেমন উচ্চৈঃশ্রবা দেবরাজের অনুগমন করে, তেমনি, এক মনোহর বেগবান্ অশ্ব সেই অশ্বপালের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করিল[৩৪]। ইন্দ্র যেমন ক্ষীরসাগরোত্থিত উচ্চৈঃশ্রবা গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই প্রকার এই অশ্বপালও স্বানুগত সেই অশ্ব গ্রহণ করতঃ ভূপতি লবণকে কহিল, হে রাজন্! মদীয় প্রভু উচ্চৈঃশ্রবা সদৃশ এই হয়রত্ন আপনার নিমিত্ত প্রেরণ করিয়াছেন। কেন না, উত্তম বস্তু উত্তমে সমর্পিত হইলেই শোভমান হয়[৩৫]।[৩৭]।

পরে অশ্বপাল মহীপালকে ঐরূপ কহিয়া মৌনাবলম্বন করিলে সেই

ঐন্দ্রজালিক মহীপতিকে মধুরবাক্যে কহিল, প্রভো! ভগবান্ সহস্ররশ্মি যেমন প্রচণ্ড প্রতাপে মহীমণ্ডল সুশোভিত করতঃ নভোমণ্ডলে বিহার করেন, সেইরূপ আপনিও এই সদশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক প্রচণ্ড প্রতাপে এই মেদিনীমণ্ডলে বিহার করুন৩৮।৩৯। সমাগত ঐন্দ্রজালিক ঐরূপ কহিলে রাজা নির্নিমেষ নয়নে সেই অশ্ব অবলোকন করিতে লাগিলেন। রাজা যে মুহূর্ত্তে অশ্বের প্রতি বদ্ধদৃষ্টি হইলেন, তন্মুহূর্ত্তেই তিনি নিষ্পন্দ ও নিষ্ক্রিয় চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইলেন৪০।৪১। সমুদ্র যেমন এক সময়ে অগস্ত্য মুনিকে দেখিয়া স্বান্তর্গত মীন মকরাদির সহিত স্তম্ভিত হইয়াছিলেন, সেইরূপ, এই মঙ্গলালয় মহীপাল অশ্ব দর্শন মাত্রেই অন্তরে ও বাহ্যে স্তম্ভিত হইয়া ধ্যানাসক্ত মুনির ন্যায় নিশ্চল নিষ্ক্রিয়ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এইরূপে অন্যূন দুই মুহূর্ত্ত অতিবাহিত হইল, তথাপি কাহার এমন সাধ্য হইল না যে, "কি হইয়াছে?" জিজ্ঞাসা করে। সভাস্থ সকলেই চিন্তায় নিমগ্ন, বিস্ময়ে পরিপূর্ণ, ভয়ে ও মোহে স্তম্ভিত, নিরুৎসাহ ও মূকের ন্যায় বাক্যবিবর্জ্জিত হইয়া রহিল। সুন্দরীগণের হস্তস্থিত চন্দ্রাংশুসদৃশ সিত চামর সকল নিষ্পন্দভাব ধারণ করিল।৪২।৪৫ সভাসদ্গণ বিস্ময়পূর্ণ হইয়া নিষ্পন্দভাবে অবস্থান করিতে লাগিল। এই সময়ে অল্পমাত্রও জনকোলাহল রহিল না। মন্ত্রিগণ অসুরসংগ্রামে দেবগণের ন্যায় মহাসন্দেহ সাগরে নিমগ্ন হইয়া মনে মনে "এ কি ঘটনা!" ভাবিতে লাগিলেন৪৬।৪৯।

চতুরধিকশততম সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চাধিকশততম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! দুই মুহূর্ত্ত অতীত হইলে মহীপালের বাহ্যজ্ঞান আগমন করিল। সেই স্তিমিতনয়ন ভূপতি বর্ষাবিনির্মুক্ত অম্ভোধরের ন্যায় প্রবুদ্ধ হইয়া ভূকম্পে পর্ব্বতশৃঙ্গের কম্পনের ন্যায় কাঁপিতে লাগিলেন[১]।[২]। যেমন পাতালস্থ দিগ্‌গজ বিচলিত হইলে কৈলাশ পর্ব্বত কম্পিত হয়, তেমনি, নৃপতি লবণ প্রবুদ্ধ হইয়া আসনোপরি কম্পিত হইতে লাগিলেন[৩]। তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে পতনোন্মুখ হইলে, কুলশৈলগণ যেমন প্রলয়বিক্ষুব্ধ সুমেরুকে তটদ্বারা ধারণ করে, সেইরূপ, পুরোবর্ত্তী জনগণ সেই কম্পিতকলেবর পতনোন্মুখ রাজাকে স্ব স্ব বাহুর দ্বারা ধারণ করিলেন[৪]।[৫]। তখন সেই ব্যাকুলেন্দ্রিয় নৃপতি পুরোবর্ত্তী জনগণ কর্ত্তৃক ধার্য্যমাণ হইয়া জলনিমগ্ন পদ্মকোশ গত ভ্রমরের ন্যায় অস্ফুটবাক্যে কহিলেন, ইহা কোন্ প্রদেশ? এ কাহার সভা?[৫]।৬। তচ্ছ্রবণে সভ্যগণ সাদর বাক্যে বলিতে লাগিলেন, হে দেব! একি! আপনি কি নিমিত্ত এরূপ জিজ্ঞাসা করিতেছেন? পরে অমরগণ যেমন প্রলয়োল্লাসত্রস্ত মার্কণ্ডেয় মুনিকে বলিয়াছিলেন, তেমনি, পুরোবর্ত্তী জনগণ ও মন্ত্রিগণ নৃপতিকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, হে দেব! আপনি তাদৃশ অবস্থা প্রাপ্ত হইলে আমরা অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছিলাম। হে নৃপ! ভবদীয় নির্ম্মল মনঃ অভেদ্য হইয়াও কি নিমিত্ত ভ্রমদ্বারা নির্ভিন্ন হইল?[৭]।৮। আপনার মনঃ কোন্ আপাতরমণীয়[৮] পরিণামবিরস বিকল্প ভোগে লুণ্ঠিত হইয়াছিল?[১০]। হে রাজন্! সম্যক্ সুশীতল ও নির্ম্মল ভবদীয় মনঃ কি নিমিত্ত তাদৃশ মহাভ্রমে নিমগ্ন হইয়াছিল?[১১]। হে দেব! বিষয়ভোগ অতি তুচ্ছ। যাহাদের মনঃ তুচ্ছ বিষয়ভোগে লম্পট, তাহাদেরই মনঃ বিষয়ের বিলয়ে ও শীর্ণতায় ছিন্নভিন্ন বিশীর্ণ ও মুগ্ধতা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যাহাদের মনঃ মহত্ত্বে বিজৃম্ভিত অর্থাৎ বিবেকপরিষ্কৃত, তাহাদের মনঃ কদাচ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয় না[১২]। যাহাদের শারীর মদ অর্থাৎ দেহাভিমান প্রবল, তাহাদেরই মনঃ অবিবেক দশায় ঐ সকল দুর্দ্দশায়

বশতাপন্ন হয়। কেন না, তাহাদের মনে সর্ব্বদাই স্ত্রীপুত্রাদি বিষয়িনী বুদ্ধি উদিত হইয়া তাহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন দুর্দ্দশায় প্রধাবিত করে[১৩]।

হে রাজন্! আপনার মনঃ ত সেরূপ নহে! আপনার মনঃ অতুচ্ছাবলম্বী, ধীর, গম্ভীর, প্রবুদ্ধ ও সদ্‌গুণশালী। তবে কেন আপনার মনঃ সেরূপ হইল? আপনার মনঃ তাদৃশ গুণসম্পন্ন হইলেও আজ কেন বিচ্ছিন্নের ন্যায় দেখিলাম?[১৪]। আমরা জানি, দেশকালের বশবর্ত্তী অনভ্যস্তবিবেক মনঃই মন্ত্রৌষধির বশীভূত হয়, কিন্তু বিবেকবিস্তৃত উদারবৃত্তি মনঃ কদাচ কিছুর বশীভূত হয় না। বিবেকযুক্ত মনঃ কি নিমিত্ত অবসন্ন হইবে? বাত্যার দ্বারা কি কখন সুমেরু শৈল বিকম্পিত হয়?[১৫।১৬]।

স্বজনগণের ঐরূপ ঐরূপ অনুকূল বাক্যে আশ্বাসিত হইলে রাজার মুখমণ্ডল অল্পে অল্পে পূর্ণ শশধরের ন্যায় কান্তি ধারণ করিল[১৭]।

তখন তিনি উন্মীলিতলোচন ও প্রশান্তমুখমণ্ডল হইয়া হিমান্তে বসন্তশোভার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন[১৮]। অনন্তর রাজা লবণ সেই ঐন্দ্রজালিককে নিরীক্ষণ করিয়া অস্তগমনোন্মুখ চন্দ্র যেমন রাহুকে দেখিয়া ভীত কম্পিত ও খেদ প্রাপ্ত হয়, তেমনি, ভয়ে ও বিস্ময়ে এবং মোহকালের ঘটনাবলি স্মরণে খিন্ন, উদ্বিগ্ন ও নির্বিণ্ন হইয়া অভূতপূর্ব্ব মুখশ্রী ধারণ করিলেন[১৯]। পরে সর্পরূপী কঙ্কক যেমন হিংসক নকুলের (বেজীনামক জন্তুর) প্রতি দৃষ্টি পরিচালন করে, সেইরূপ, রাজা সেই ঐন্দ্রজালিকের প্রতি দৃষ্টি স্থাপন করতঃ সহাস্য আস্যে বলিতে লাগিলেন[২০]। বলিলেন, অরে জাল্ম! মায়াবিদ্যার দ্বারা তুই এ কি কার্য্য করিলি? যে কার্য্যে সুস্থির সমুদ্রও অস্থির হইয়াছে?[২১]। যাহার প্রভাবে আমার বিবেকপরিষ্কৃত সুদৃঢ় চিত্তও মোহে নিমগ্ন হইল, সে শক্তি বা সে বস্তুশক্তি না জানি কি অদ্ভুত![২২]। কোথায় আমরা লোক ব্যবহারের রহস্যবেত্তা পণ্ডিত এবং কোথায় সেই আপদ অর্থাৎ মোহকালানুভূত দুর্গতি![২৩]। আমি এখন বুঝিলাম, মন মহাজ্ঞানে অভ্যস্ত হইলেও যাবৎ দেহে থাকে তাবৎ কোন না কোন সময়ে মোহকালুষ্য গ্রহণ করে, সন্দেহ নাই[২৪]। অহে সভাসদগণ! এই শাম্বরিক (মায়াবী) মুহূর্ত্ত মধ্যে যাহা করিয়াছে বা যাহা আমাকে দেখাইয়াছে তাহা বলিতে গেলে এক দীর্ঘ উপাখ্যান হয় এবং তাহা যার পর নাই অদ্ভুত বলিয়া গণ্য হয়! আমি তাহা আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করি তোমরা অবহিত হইয়া শ্রবণ কর[২৫]। আমি

এই স্থানে থাকিয়াই মুহূর্ত্তকাল মধ্যে বলি কর্ত্তৃক প্রার্থিত ব্রহ্মার অধ্যস্ত ইন্দ্র-সৃষ্টি (মায়া কৌতুক) প্রদর্শনের ন্যায় শত শত ক্ষণিক কার্য্যদশা অনুভব (কর্ম্মফল ভোগ) করিয়াছি২৬। * অনন্তর নরনাথ লবণ ঐ কথা বলিলে, তত্রত্য সমস্ত লোক শ্রবণ লালসায় উন্মুখ হইল। নরনাথ লবণ স্মিত মুখে স্বানুভূত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজা বলিলেন, শুন,—বিবিধ পদার্থ সংকুল হ্রদ নদ জনপদ বন পর্ব্বত কুলপর্ব্বত ও সমুদ্র যুক্ত পৃথিবীর মধ্যে আমার এই প্রদেশ—২৭।২৮। (এইরূপে কথারম্ভ করিয়া অল্পক্ষণ মৌন রহিলেন, পরে পুনঃ কথারম্ভ করিলেন।)

* অধ্যস্ত শক্রসৃষ্টি কথাটী একটী পৌরাণিক আখ্যায়িকার দ্বারা বুঝিতে হয়। পুরাণে লিখিত আছে যে, শক্র অর্থাৎ ইন্দ্র কোন এক সময়ে বলিকে একাকী দেখিয়া ধৃত করিবার অভিপ্রায়ে মায়া বিস্তার করতঃ অসংখ্য মায়িক সৈন্য সৃজন করতঃ তাহাদের দ্বারা ধৃত ও পাশ দ্বারা বদ্ধ করেন। বলি তখন বন্ধন মোচন কামনায় ব্রহ্মার স্তব স্তুতি করেন। ব্রহ্মা বলি সকাশে আসিয়া দেখিলেন, সমস্তই ইন্দ্রের মায়া। অনন্তর ব্রহ্মা বলির প্রার্থনায় সেই শক্রসৃষ্ট মায়াসৈন্য ধ্বংস করিলেন। বলি তাহা মুহূর্ত্তমাত্র অনুভব করিয়াছিলেন, পরে মায়াবিমুক্ত হইয়া স্বগৃহে প্রত্যাগত হন।

পঞ্চাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত।

ষড়ধিকশততম সর্গ

রাজা বলিলেন, শ্রবণ কর। নানাপদার্থসঙ্কুল, নদী, হ্রদ, বন, উপবন ও পত্তন সমূহে পরিব্যাপ্ত এবং পর্ব্বত ও সমুদ্রে পরিবৃত বসুধা মণ্ডলের অনুজ সদৃশ এই দেশ, ইহা বিস্তৃত ও নানাবিভবশালী। ইহাতে আমি পৌরগণের অভিমত বুদ্ধিমান্ রাজা। রসাতল হইতে অভ্যুদিত মূর্ত্তিমতী মায়ার ন্যায় যাবৎ এই শাম্বরিক দূর প্রদেশ হইতে এই সভায় সমাগত না হইয়াছিল, তাবৎ আমি স্বর্গমধ্যে মহেন্দ্রের ন্যায় এই মহাসভা মধ্যে উপবিষ্ট ছিলাম১।৩। পরে এই মায়াবী সভায় সমাগত হইয়া কল্পান্ত-বাতবিধূত মেঘমণ্ডলের ন্যায় অথবা ভ্রামিত ইন্দ্রধনুর ন্যায় তেজোময়ী ভ্রমদায়িনী পিচ্ছিকা বিঘূর্ণিত করিলে৪, আমি এই মায়াবীর প্রেরিত অশ্বের পুরোভাগে অবস্থান করিয়া এবং সেই বিলোল তেজঃপুঞ্জ পিচ্ছিকা দর্শন করিয়া, এরূপ ভ্রান্তচিত্ত হইয়াছিলাম যে যেন আমি উহারই প্ররোচনায় একাকী সেই অশ্বে আরোহণ করিলাম৫। অনন্তর পুষ্কর ও আবর্ত্ত নামক মেঘরাজ যেমন প্রলয়কালে পর্ব্বতরাজকে সঞ্চালিত করে, তদ্রূপ, আমি সেই অতি বেগশালী তুরঙ্গম কর্ত্তৃক বাহিত হইয়া অতিবেগে মৃগয়া গমনে প্রবৃত্ত হইলাম৬।৭। পরে সেই অনিলসদৃশ তরস্বী ও লোলস্বভাব তুরগেন্দ্র কর্ত্তৃক বহুদূরে নীত হইয়া প্রলয়দগ্ধ ব্রহ্মাণ্ডের ন্যায় এক ভীষণ ও বিস্তীর্ণ অরণ্য প্রাপ্ত হইলাম৮। ঐ অরণ্য পশুপক্ষিবিবর্জ্জিত, নীহারপ্রধান, জল-বৃক্ষাদি রহিত এবং অসীম। এই শুষ্ক অরণ্য তত্ত্বজ্ঞজনগণের চেতনার ন্যায় ও দিক্‌ ও আকাশেরও অষ্টম সমুদ্রের ন্যায়, বিস্তৃত এবং অজ্ঞজনগণের ক্রোধের ন্যায় অতীব ভীষণ। ইহার পুরোভাগস্থ দিঙ্মুখ সকল যেন মরীচিকা সলিল দ্বারা সতত আপ্লুত রহিয়াছে।

আমি সেই জনসঞ্চারবিহীন অজাততৃণপল্লব জীববাস বিবর্জ্জিত অরণ্য প্রাপ্ত হইলে, আমার সেই বাহন সাতিশয় পরিশ্রান্ত এবং আমার মনঃও, অনন্নদারিদ্রদশা প্রাপ্ত কুল-ললনার ন্যায় খেদ প্রাপ্ত হইল৯।১০। কি করি, অতি কষ্টে আমি সেই গহন বনে ধৈর্য্য সহকারে সূর্য্যাস্তকাল পর্য্যন্ত পর্য্যটন করিলাম১১।১২। অনন্তর যখন দিবাকর ভুবন ভ্রমণে পরিশ্রান্ত হইয়া

গগনপথে অস্তাচল শিখরে গমন করিলেন, তখন আমার অশ্বও তাঁহার ন্যায় পথপর্য্যটনে সাতিশয় শ্রান্ত হইয়া গগনপথে গমন করতঃ কচিৎ কচিৎ জম্বুকদম্বপ্রভৃতি বৃক্ষসঙ্কুল অপর এক মহা অরণ্য প্রাপ্ত হইল। এই অরণ্যে পান্থগণের বান্ধবস্বরূপ পক্ষিগণের অস্ফুট কোলাহল শ্রুতিগোচর হইল।[১৬।১৭] অধার্ম্মিকের হৃদয়ে আনন্দবৃত্তি যদ্রূপ বিরল, এই অরণ্যের তৃণশ্রেণী তদ্রূপ বিরলভাবে ব্যবস্থিত[১৮]। পূর্ব্বপ্রাপ্ত অরণ্য অপেক্ষা এ অরণ্য অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ সুখাবহ। যেমন অত্যন্তদুঃখ মরণ অপেক্ষা ব্যাধিত জীবন কিঞ্চিৎ সুখাবহ, সেইরূপ[১৯]। অনন্তর, মার্কণ্ডেয় যেমন প্রলয়ার্ণব পরিভ্রমণ করিতে করিতে নগেন্দ্রশিখর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ, আমিও সেই অরণ্য পরিভ্রমণ করিতে করিতে এক জম্বীরবৃক্ষ প্রাপ্ত হইলাম। পরে তাপতপ্ত ভূভৃৎ যেমন নীলবর্ণ জলদমালা ধারণ করে, সেইরূপ, আমি সেই পাদপ স্কন্ধাবলম্বিনী এক লতা অবলম্বন করিলাম। তখন গঙ্গাবলম্বী হইলে যেমন জনগণের পাপরাশি দূরে পলায়ন করে, সেইরূপ, আমি সেই লতা ধারণ করিলে, আমার সেই তুরঙ্গম পলায়ন করিল[২০।২২]।

ঐ সময়ে দিনমণি যেন দীর্ঘকাল অবনীভ্রমণে পরিশ্রান্ত হইয়া দৈবসিক ব্যবহারের সহিত বিশ্রামার্থ অস্তাচল ক্রোড়ে গমন করিলেন। এবং পর্য্যটনশ্রান্ত আমিও সেই বৃক্ষের তলদেশে বিশ্রামার্থ উপবেশন করিলাম[২৩]। ক্রমে অন্ধকার সমুপস্থিত হইয়া যেন সমস্ত ভূমণ্ডল গ্রাস করিল। তখন সেই অরণ্যানীমধ্যে রাত্রিঞ্চর বিহার প্রবর্ত্তিত হইল[২৪।২৫]। পক্ষী যেমন স্বনীড়ে নিলীন হয়, তেমনি, আমি তথা অনন্য উপায় হইয়া সেই তরুর কোটরে লীনভাবে অবস্থান করিতে লাগিলাম[২৬]। ঐরূপে আমি বিষমূর্চ্ছিতের ন্যায়, মুমূর্ষুর ন্যায়, বিক্রীত ভৃত্যের ন্যায়, অন্ধকূপে নিমগ্নের ন্যায় ও একার্ণবে উহ্যমান মার্কণ্ডেয় মুনির ন্যায় আতিষ্ঠিত সেই কল্পসমা যামিনী অতিবাহিত করিলাম[২৭।২৮]। কি স্নান, কি দেবার্চ্চনা, কি ভোজনাদি, কিছুই করা হইল না। একে সেই আপদবহুল রাত্রি, তাহাতে আবার সেই ভয়াবহ স্থান। কি করি, অগত্যা সেই রাত্রি উক্ত বিধ অবস্থায় অতিবাহিত করিতে হইল[২৯]। নিদ্রাহীন ও অধৈর্য্য হইয়া বৃক্ষপল্লবের সহিত ভয়ে বিকম্পিতকলেবর হইয়া কোনরূপে সেই সুদীর্ঘ শর্ব্বরী যাপন করিলাম[৩০]।

অতঃপর বোধ হইল, যেন উষঃকাল নিকট। এই সময়ে দেখিলাম,

সেই মহারণ্যে দুঃসহ শীতনিপীড়িত জন্তুগণের কটকটায়মান দন্তসংঘট্টন ধ্বনি এবং বেতাল ও সিংহব্যাঘ্রাদি গণের ক্ষেড়ারব স্থগিত হইয়াছে, এবং ভীষণ তামসী যামিনী তারা, ইন্দু ও কৈরবগণের সহিত প্রশান্ত হইয়াছে। সেই সময়ে আমি অজ্ঞ ব্যক্তির অকস্মাৎ জ্ঞান প্রাপ্তির ন্যায় ও দরিদ্রের কাঞ্চন প্রাপ্তির ন্যায় অরুণিত পূর্ব্বদিক্ দেখিয়া সুখী হইলাম। আমার বোধ হইল, যেন ঐ দিগঙ্গনা মধুপানে অরুণবর্ণা হইয়া ও নিতান্ত নিপীড়িত আমাকে দেখিয়া হাস্য করিতেছেন এবং ভগবান্ সহস্ররশ্মি যেন পূর্ব্বদিগ্ গজে (ঐরাবতে) আরোহণোন্মুখ হইয়াছেন[৩১]।[৩৪] তখন আমি আহ্লাদ সহকারে সেই বৃক্ষকোটর হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইয়া আস্তরণ বস্ত্র আস্ফোটন করতঃ পুনর্ব্বার সেই অরণ্য মধ্যে পর্য্যটন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম[৩৫]।[৩৬]। যেমন মূর্খশরীরে গুণের লেশও দৃষ্ট হয় না, তেমনি, বহুক্ষণ বিচরণ করিয়াও আমি একটীও লোক বা প্রাণী দেখিতে পাইলাম না[৩৭]। দেখিলাম, ঐ জঙ্গলে কেবল বাত-আন্দোলিত তৃণ ও অস্ফুটকোলাহলধ্বনিকারী শিতাশঙ্ক বিহঙ্গ বিচরণ করিতেছে[৩৮]।

ক্রমে বেলা দুই প্রহর অতীত হইল। দিনমণি মধ্যাম্বরসীমা অতিক্রম করিয়া প্রখর কিরণ বিস্তার করিতেছেন, তখনও আমি ভ্রমণ করিতেছি, পরন্তু ক্ষুধায় ও পরিশ্রমে নিতান্তকাতর হইয়াছি। ভ্রমণ করিতে করিতে ঐ অবস্থায় সহসা এক অন্নাত্রধারিণী কামিনী দেখিতে পাইলাম। [৩৯]।[৪০]। এই রমণী অতি কৃষ্ণবর্ণা ও লোলনয়না। তাহার সেই কৃষ্ণবর্ণ দেহ অতি কুৎসিত মলিনবস্ত্রে অর্দ্ধাবৃত। চন্দ্রের অন্ধকারের নিকটগামী হওয়া যেরূপ, সেইরূপ আমি তাহার নিকটগামী হইয়া বলিলাম, বালে! তুমি অন্ন বিতরণ পূর্ব্বক শীঘ্র আমাকে এই বিপদ্ সময়ে কিঞ্চিৎ অন্ন প্রদান কর। জনগণের বিপদ্ ভঞ্জন করিলে সম্পদ স্বার্থক ও বর্দ্ধিত হইয়া থাকে[৪১]।[৪২]। হে বালে! আমি ক্ষুধার দ্বারা নিতান্ত প্রপীড়িত হইয়াছি। এই মহতী দুঃসহ ক্ষুধা ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইয়া আমার অন্তর দগ্ধ করিতেছে। আর ক্ষণকাল অন্ন না পাইলে আমার প্রাণ দেহবিযুক্ত হইবে[৪৩]।

আমি সেই রমণীর নিকট উক্ত প্রকারে অন্ন প্রার্থনা করিলাম, কিন্তু লক্ষ্মী যেমন যত্নসহকারে অর্চ্চিত হইলেও দুষ্কৃত ব্যক্তিকে ধন প্রদান করেন না, তেমনি, উক্ত কামিনী আমাকে কিঞ্চিন্মাত্রও অন্ন প্রদান করিল না[৪৪]।

তথাপি আমি অন্নলাভ লালসায় ছায়ার ন্যায় হইয়া বহুক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার অনুগমন করতঃ বন হইতে বনান্তর প্রাপ্ত হইলাম[৫৫]। আমি অন্নপ্রার্থী হইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছি দেখিয়া সেই রমণী আমাকে কহিল, "ওহে হারকেয়ূরধারিন্! আমি পুরুষ, অশ্ব ও গজ প্রভৃতি ভক্ষণকারিণী ক্রূরা রাক্ষসীর ন্যায় ক্রূরস্বভাবা চণ্ডালী[৫৬]। অতএব হে সুন্দর! তুমি আমার নিকট কেবল প্রার্থনায় ভোজনান্ন প্রাপ্ত হইবে না। চণ্ডালী এই বলিয়া পদে পদে লীলাভাব প্রকাশ করত গমন করিতে লাগিল, এবং অনতিবিলম্বে এক লতামণ্ডপতুল্য বনভাগে প্রবেশ করিয়া লীলাবনত হইয়া আমাকে বলিল, হে সুন্দর! যদি তুমি আমার ভর্ত্তা হইতে স্বীকার কর, তাহা হইলে আমি তোমাকে কিঞ্চিৎ অন্ন প্রদান করি। সামান্য জনগণ বিনা স্বার্থে উপকার করে না[৫৭]। ৫৯। আমার পিতা ধূলিধূষরিত ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া শ্মশানস্থিত বেতালের ন্যায় এই অরণ্যের নিকটবর্ত্তী শস্য ক্ষেত্রে বৃষভদ্বয় বাহন করিতেছেন। আমি তাঁহারই নিমিত্ত এই অন্ন লইয়া যাইতেছি। কিন্তু যদি তুমি আমার স্বামী হইতে স্বীকার কর তাহা হইলে আমি তোমাকে ইহার কিয়দংশ প্রদান করিব; কেন না, স্বামী প্রাণদ্বারাও রক্ষণীয় ও পূজ্য[৬০]। চণ্ডালী ঐরূপ কহিলে, তখন আমি অগত্যা তাহাকে কহিলাম, সুব্রতে! আমি তোমার ভর্ত্তা হইলাম, শীঘ্র অন্নপ্রদান কর। অহো! বিপদ্ সময়ে কোন্ ব্যক্তি বর্ণ, ধর্ম্ম, জাতি ও কুলক্রম বিচার করিতে সমর্থ হয়?[৬১।৬২] ঐরূপ অঙ্গীকার করিলে তখন সেই চণ্ডালী সেই অন্নের এক অর্দ্ধ ভাগ আমাকে প্রদান করিল[৬৩]। মোহোপহতচিত্ত আমিও সেই চণ্ডালী প্রদত্ত পক্বান্ন ভোজন ও জম্বুফলের রস পান করিলাম। পান ভোজনে শ্রান্তিদূর হইলে, বর্ষাকালের কাল মেঘ যেমন সূর্য্যকে আচ্ছন্ন (প্রচ্ছাদিত) করে, তদ্রূপ, সেই কৃষ্ণবর্ণা চাণ্ডালী আমাকে বৈন্ন অভিভূত করিয়া হস্ত দ্বারা বহিঃস্থিত প্রাণের ন্যায় গ্রহণ করতঃ যাতনা (পাপ) যেমন জীবকে অবীচি-নামক নরকে লইয়া যায়, তেমনি, সে আমাকে স্বীয় ভয়ঙ্কর দুরাচার কদর্য্যাকৃতি পীবরকায় পিতার নিকট লইয়া গেল[৬৪]। ৬৫। মদনুসঙ্গিনী সেই চাণ্ডালী পিতৃ সন্নিধানে উপনীতা হইয়া তাহার কাণে কাণে আপনার স্বার্থ কথা বলিল। বলিল, "পিতঃ! যদি আপনার মত হয় তাহা হইলে ইনি আমার ভর্ত্তা হইবেন।" চণ্ডাল তথাস্তু বলিয়া, কন্যাকে সমাশ্বাসিত করিল ও তৎপ্রদত্ত অন্নার্দ্ধ ভক্ষণ করিল[৬৭]। ৬৮।

ঐ সময় সায়ংকাল সমাগত হইতেছিল। যম যেমন পাশবদ্ধ অপরাধী দূত দিগকে বন্ধনমুক্ত করেন, তেমনি, সেই চণ্ডাল এখন হলবাহী বৃষভদ্বয়কে হলবন্ধন হইতে মুক্ত করিল। এ দিকে দিঙ্মণ্ডল নীহারাবলিত মেঘমালার ন্যায় পিঙ্গলবর্ণে রঞ্জিত হইল এবং সমুড্ডীন ধূলিপটলে নিবিড়িত (দর্শনের অযোগ্য) হইল। আমরাও সমবেত হইয়া শ্মশান হইতে শ্মশানান্তরে বেতাল-গণের গমনের ন্যায় সেই বেতালসঙ্কুল অরণ্য হইতে বহিরাগত হইয়া অল্প-কাল মধ্যে চণ্ডালপুরে উপস্থিত হইলাম[৫৯।৬০]। দেখিলাম, সেই চণ্ডাল-পল্লীর গৃহস্থেরা কপি, কুক্কুট ও বায়স প্রভৃতি ছেদন করিয়া তৎসমুদয়ের মাংসাদি বিভাগ করিতেছে। মক্ষিকাগণ তত্রত্য শোণিতসিক্ত ভূভাগে ভণ ভণ রবে ভ্রমণ করিতেছে[৬১]। মাংসাদ শ্বাপদ ও পক্ষিগণ ইতস্ততোনিক্ষিপ্ত শোণিতার্দ্র অন্ত্রজালে নিপতিত হইতেছে। ছোট ছোট ঘরের নিকটবর্ত্তী বৃক্ষের শিখরে পক্ষিগণ কাকলী রব করিতেছে[৬২]। বিহগগণ ও কুক্কুরগণ শুষ্কবসাপূর্ণ বহির্দ্বারপ্রকোষ্ঠে উল্লাস সহকারে বিচরণ করিতেছে। শোণিতাক্ত চর্ম্ম হইতে বিন্দু বিন্দু শোণিত নিপতিত হইতেছে। মক্ষিকাগণ দলে দলে বালকগণের হস্তস্থিত মাংসপিণ্ডে আসিয়া উপবিষ্ট হইতেছে, তাহারা বহুযত্নে তাহাদিগকে বিতাড়িত করিতেছে। বৃদ্ধ চণ্ডালেরা বালকদিগকে তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া শাসনাধীন করিতেছে[৬৪]। যেমন মহাপ্রলয়ে সর্ব্বপ্রাণী বিনষ্ট হইলে কৃতান্তের অনুচরেরা ভীষণ জগৎরূপ গৃহে প্রবেশ করে, তেমনি, আমরা সেই রক্ত মাংস শিরা ও অন্ত্রসমূহে সমাকীর্ণ সেই ভীষণ চণ্ডালগৃহে প্রবিষ্ট হইলাম[৬৫]। প্রবিষ্ট হইবামাত্র গৃহস্থিত লোকেরা আমাকে দর্শন করিয়া সম্ভ্রম সহকারে ও পরম সমাদরে কদলীত্বকের এক আসন আনয়ন পূর্ব্বক আমাকে প্রদান করিল। আমিও সেই অভিনব শ্বশুর গৃহে গমন করিয়া সেই আসনে উপবিষ্ট হইলাম[৬৬]। তখন সেই লোহিতনেত্র চণ্ডাল, মদীয় কেকর নয়না (ট্যারা) শ্বশ্রূকে "ইনি জামতা" এইরূপ কহিলে, সেই কেকরাক্ষী ভাবভঙ্গীর দ্বারা অনেক আনন্দ প্রকাশ করিল[৬৭]।

ঐরূপে আমি কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া, পাপিষ্ঠগণ যেমন সঞ্চিত দুষ্কৃতের ফলভোগ করে, সেইরূপ, আমিও সেই অজিনাসনসঞ্চিত চণ্ডাল-ভক্ষ্য ভোজন করিলাম এবং অনন্ত দুঃখের বীজস্বরূপ অশুভদায়ক প্রণয় বাক্য সকল শ্রবণ করিলাম[৬৮।৬৯]।

অনন্তর নক্ষত্রপরিপূর্ণ ও নির্ম্মল কোন এক দিবসে সেই চণ্ডাল বৈবাহিক

উৎসবে প্রবৃত্ত হইয়া, দুষ্কৃত যেমন যাতনা প্রদান করে, তাহার ন্যায়, প্রচুর মদ্যমাংসাদি দ্রব্য আয়োজন করতঃ ঘোর সংরম্ভ সহকারে আমাকে চণ্ডাল-ব্যবহার্য্য বস্ত্র ও বিভবের সহিত সেই কৃষ্ণবর্ণা ভয়দায়িনী কুমারী সমর্পণ করিল। সাক্ষাৎ বা মূর্ত্তিমান্ ব্রহ্মহত্যাদি পাপের ন্যায় চণ্ডালগণ এই বিবাহোৎসবে মদিরা পানে উন্মত্ত হইয়া পটহ বাদন পূর্ব্বক বিলাস সহকারে আমার চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিতে লাগিল১০। ১২।

ষড়ধিকশততম সর্গ সমাপ্ত।
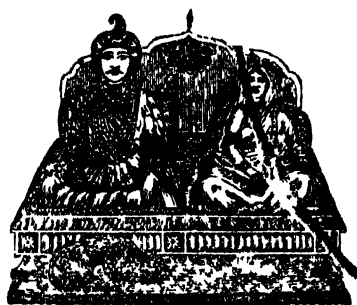
সপ্তাধিকশততম সর্গ।

রাজা বলিলেন, হে সভাসদ্গণ! অধিক আর কি বলিব, আমি সেই বিবাহোৎসবে বশীভূতচিত্ত হইলাম এবং সেই দিন হইতে আমি এক জন, হৃষ্টপুষ্ট ভাল চণ্ডাল হইলাম। আমার সেই বিবাহোৎসব অবিচ্ছেদে সাতদিন পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। পরে বহু চণ্ডাল পরিবৃত হইয়া তথায় ক্রমে আট মাস ক্ষেপণ করিলাম। আট মাসের পর আমার সেই ভার্য্যা ঋতুমতী ও গর্ভবতী হইল। পরে, বিপদ্ যেমন দুঃখ প্রসব করে, তাহার ন্যায় আমার সেই চণ্ডালী ভার্য্যা এক দুঃখদা কন্যা প্রসব করিল। সে কন্যা মূর্খ দিগের চিন্তার ন্যায় শীঘ্র শীঘ্র বর্দ্ধিতা হইতে লাগিল[১]। ৩। বর্ষত্রয় অতিক্রান্ত হইলে, পুনর্ব্বার সেই চণ্ডালী দুর্ব্বুদ্ধি যেমন অনর্থ প্রসব করে, তাহার ন্যায় এক অশোভন পুত্র প্রসব করিল[৪]। ঐরূপে আমার সেই পুক্কশীভার্য্যা পুনর্ব্বার এক কন্যা ও তৎপরে আর এক পুত্র প্রসব করিল। তখন আমি সেই বনে পুত্রকলত্রসম্পন্ন বৃদ্ধ পুক্কশ হইয়া, ব্রহ্মঘ্ন যেমন চিন্তার সহিত বহুযাতনা ভোগ করে, তেমনি, আমিও সেই পুক্কশী ভার্য্যার সহিত বহুবর্ষ দুঃখপরম্পরা অনুভব করিলাম[৫]।৬ কর্দ্দমপূর্ণ পল্বলে বৃদ্ধ কচ্ছপের ন্যায় সেই বনস্থ চণ্ডাল গৃহে আমি শীত, বাত ও আতপ প্রভৃতি ক্লেশ পরম্পরা দ্বারা বিবশীকৃত হইয়া বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিলাম। এবং পুত্রকলত্রাদির জন্য প্রবল চিন্তায় আমার মন নিরন্তর আহত ও দগ্ধ হইতে লাগিল। এই সময়ে আমি সমস্ত দিঙ্মণ্ডল প্রজ্বলিত ও কষ্টসংরম্ভময় বোধ করিতে লাগিলাম[৭]। ৮।

হে অমাত্যগণ! আমি বহুকালের জীর্ণ অতসীত্বকের বস্ত্র পরিধান ও মস্তকে চেণ্ডক নামক শিরস্ত্রাণ (ভাষা নাম আট্‌লা ও বিড়া) বাঁধিয়া মূর্ত্তিমান্ দুষ্কৃতের ন্যায় বনে বনে কাষ্ঠভার বহন করিয়াছি। যূকসমাকীর্ণ জীর্ণ শীর্ণ ক্লিন্ন ও দুর্গন্ধ কৌপীন পরিয়া চণ্ডালপল্লী ভ্রমণ করিয়াছি। ভার বহনে পরিশ্রান্ত হইয়া ধবলিক বৃক্ষের মূলে বিশ্রাম করিয়াছি[৯]।১০। কোন কোন দিন পুত্রকলত্রগণের ভরণপোষণোৎকণ্ঠায় ও শীত বাত প্রভৃতির দ্বারা জর্জ্জরদেহ হইয়া দুরন্ত হেমন্তকালে দর্দ্দুরের ন্যায় বনকোটরে বিলীন হইয়া

থাকিতাম[১১]। কত দিন আমি নানা কলহে ও মনস্তাপে তপ্ত হইয়া অশ্রু বর্জ্জন ছলে নেত্রদ্বারা রক্ত বর্ষণ করিয়াছি[১২]। (অর্থাৎ চক্ষুর কোণ ভাগ-দিয়া অনেক সময়ে রক্তস্রাব হইত। ইহা একপ্রকার মদ্যপায়ীদিগের রোগবিশেষ)। দিবসে বনে বনে কোলফলাদি ও রাত্রিকালে গৃহে আসিয়া বরাহ মাংস ভক্ষণ করিতাম। বর্ষাকালে শৈলপার্শ্ববর্ত্তী কুটীর কোষে জীমূতের উপদ্রব সহ্য করতঃ সেই পয়োদ-ঘন-গম্ভীর বর্ষাকাল অতি-ক্রম করিতাম[১৩]। কতদিন বান্ধবগণের সহিত অসৌহার্দ্দপ্রযুক্ত নানা কলহ সম্পাত দ্বারা সাতশঙ্কে ও দুঃখিতচিত্তে অতিবাহন করিয়াছি এবং কতদিন মুখর চণ্ডালবালক গণের সহিত অতি কষ্টে অবস্থান করিয়াছি[১৪]। [১৫]। চন্দ্র যেমন রাহুর দশনে নিষ্পিষ্ট ও জর্জ্জরিত হয়, সেইরূপ, আমিও চাণ্ডালিনী দিগের কলহে সমুদ্বিগ্ন হইতাম। প্রচণ্ড চণ্ডালদিগের ভীষণ তর্জ্জন গর্জ্জনে আমার মুখ ম্লান ও বিবর্ণ হইয়া যাইত[১৬]। এবং নরক হইতে আনীত ও নারকীর নিকট বিক্রীত নরকে নারকীরা যেমন অন্ত্ররজ্জু চর্ব্বণ করে, তেমনি, আমাকেও অতিকষ্টে ব্যাঘ্রাদির মাংসাদি চর্ব্বণ করিতে হইত[১৭]। হিমকালে হিমালয়কন্দরসমুদ্গীর্ণ প্রচণ্ড তুষার (বরফ) আমাকে বস্ত্রবিহীন দেহে মুক্তানির্মুক্ত বাণের ন্যায় সহ্য করিতে হইয়াছে। প্রবল জরায় আক্রান্ত হইয়াও উদর ভরণের নিমিত্ত আমাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষের মূল সমুৎপাটন করিতে হইত। আমি কু-কলত্র-যুক্ত ও সাধুজনের অস্পৃশ্য হইয়া বনমধ্যে শ[illegible]বে সমানীত চণ্ডালপক মাংস অতি আদরের সহিত ভোজন করিতাম। নারকীরা যেমন নরকমধ্যে নারক ভক্ষ্য ক্রয় ও বিক্রয় করে, তেমনি, আমিও সেই বিপিনমধ্যে মৃগমাংস ও মেষমাংস অন্যান্য চণ্ডালের নিকট ক্রয় ও [illegible] করিতাম এবং সেই সমস্ত মাংস খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন ও লৌহ শলা[illegible] সংস্থাপন পূর্ব্বক অগ্নিসংস্কার করতঃ অধিকতর লাভের প্রত্যাশায় বিক্রয় করি[illegible]। যাহা বিক্রয় না হইত তাহা শুষ্ক করিবার নিমিত্ত সেই অতিজুগুপ্সিত মলমূত্রসঙ্কুল চণ্ডালগণের আরাম ভূমিতে পরিব্যাপ্ত করিতাম। উপার্জ্জনের বিঘ্নপ্রদ সন্ধ্যাকাল সমুপস্থিত হইলে আমি মাংস বিক্রয়ে ক্ষান্ত হইয়া সেই বিন্ধ্যাচলের গুল্মনিচয়ের আশ্রয়ে কুদ্দাল ধারণ করিতাম। (অর্থাৎ রাত্রিকালে আমাকে কৃষকের কার্য্য করিতে হইত)[১৮]। [২৪]। আমি চণ্ডাল দেহ ধারণ করিয়া তথায় রৌরবনিপতিত নারকিগণের ন্যায় ঈদৃশ

দুর্দ্দশাপ্রাপ্ত হইয়াছিলাম যে, লগুড় হস্তে কুক্কুরের দৌরাত্ম্য নিবারণ-পূর্ব্বক কুগ্রামবাসী অন্ধগণের ভোজনোচিত অতি যৎসামান্য কোদ্রবকণা ও তিলকল্ক প্রভৃতি কুৎসিত অন্নদ্বারা আমার সেই দৈবসমর্পিত স্ত্রীপুত্র-গণের তৃপ্তিসাধন করিতাম। আমি শীতকালে শব্দায়মান শুষ্কতালতরুতলে বন্য বানরগণের সহিত শীতদ্বারা রণিতদন্ত হইয়া যামিনী যাপন করি-তাম। তৎকালে আমার শরীরের লোম সকল সূচীর ন্যায় আকার ধারণ করিত[২৭।২৮]। আমি বর্ষাকালে জলদনিঃসৃত বারিবিন্দু সকল মুক্তাফলের ন্যায় অঙ্গে ধারণ করিতাম। সেই বনমধ্যে আমি প্রচণ্ড শীতে সমাক্রান্ত, রণিতদন্ত, কেকরাক্ষ ও ক্ষুধায় কাতর হইয়া পুত্রকলত্র গণের সহিত তুচ্ছ মাংসখণ্ডের নিমিত্ত কলহ করিতাম[২৯।৩০]। কৃতান্ত যেমন প্রলয়কালে প্রাণিবিনাশের নিমিত্ত পাশহস্ত হইয়া জগজ্জঙ্গলে ভ্রমণ করেন, সেই-রূপ, আমিও মসীমলিন দেহ ও বড়শধারী হইয়া মৎস্যবধার্থ বেতা-লের ন্যায় নদীতীরে ভ্রমণ করিতাম। দু পাঁচ দিন খাওয়া হইল না, উপবাসে কাল হরণ হইল, এমত অবস্থায় এক এক দিন শরদ্বারা মৃগের বক্ষঃস্থল ছিন্ন করতঃ তদ্‌বিনিঃসৃত উষ্ণ রুধির মাতৃস্তন-নিঃসৃত দুগ্ধধারার ন্যায় পরম সমাদরে পান করিতাম। আমি যখন মৃগ শোণিতে সিক্ত-কলেবর হইয়া শ্মশানে পরিভ্রমণ করিতাম, তখন বনবেতালগণ আমার সেই রুধিররঞ্জিত ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া ভীত হইয়া দূরে পলায়ন করিত। আশা যেমন বিস্তৃত হয় তেমনি বিপিন মধ্যে আমি পক্ষিবন্ধনার্থ বাগুরা বিস্তার করিতাম[৩১।৩৫]। বিহগকুল আমার সেই প্রসারিত জালে বদ্ধ হইয়া মায়াজাল জড়িত জনগণের ন্যায় জর্জ্জরিত হইত।

ওঃ! কি ভয়ঙ্কর! আমি আমার মনকে ঈদৃশ পাপ কর্ম্মে রত করি-য়াছিলাম। আমার সেই সেই পাপপিপাসা তখন বর্ষাকালের তরঙ্গীর ন্যায় প্রসারিত হইয়াছিল। সর্পাশনা ভল্লুকীর সমীপ হইতে বিক্রত সর্পের ন্যায় আমি সদ্বুদ্ধির নিকট হইতে পলায়ন করিয়াছিলাম[৩৬।৩৭]। আমি ভুজঙ্গ-পরিত্যক্ত নির্ম্মোকের ন্যায় দয়াকে দূরে পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। নিদাঘান্তে কাল মেঘের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া আমি প্রাণিদেহে শরনিকর বর্ষণ করিতাম এবং তাদৃশ ক্রূরকার্য্য করিয়াও সুখবোধ করিতাম। ভূতগণের মধ্যে পাশহস্ত কৃতান্তের ন্যায় আমি মৃগকুলমধ্যে বাগুরাহস্তে বিচরণ করিতাম। আমার অঙ্গম্রক্ষিত রক্তের উগ্রতমগন্ধে ভূতগণও

পলায়ন করিত[৩৮।৩৯]। আমি আমারই কল্পিত ও পরিমিত কালরূপ অগ্নির-দ্বারা বেষ্টিত নরকরূপ ক্ষেত্রে শত শত দুষ্ক্রিয়াবীজ মুষ্টিগ্রহ (মুট্ মুট্) করিয়া বপন করিয়াছি। আমার মোহরূপ বৃষ্টি ক্রমে তাহার অঙ্কুরাদি উৎপাদন করিয়াছে। আমি দয়াশূন্য হইয়া বিন্ধ্যপর্ব্বতের গুহাস্থিত মৃগ দিগকে পাশদ্বারা বদ্ধ করিয়াছি। পরিশ্রান্ত হইয়া শেষাঙ্কে শৌরীর ন্যায় আমি সেই পামরী ভার্য্যার কণ্ঠদেশে মস্তক সংস্থাপন পূর্ব্বক বিশ্রান্ত ও সুখ-সুপ্ত হইয়াছি। পক্ষিপক্ষরচিত অম্বর (পালকের বস্ত্র) ধারণ করিতাম। ধৃত মৃগাদি জন্তুগণ দ্বারা উল্লাসিত ও রৌদ্রে ধূম্রবর্ণ হইয়া থাকিতাম। অধিক কি বলিব, আমি পক্ষিগণের ও শব্দায়মান ব্যাঘ্রাদি জন্তুগণের দ্বারা উল্লাসিত ধূম্রবর্ণ বিন্ধ্যাচলকন্দরের ন্যায় প্রতীয়মান হইতাম। গ্রীষ্মকালেও আমি যূকমৎকুণাদিকীট বহুল জীর্ণ কন্থা বহন করিতাম। গ্রীষ্মকালে ঐ দেশে ভূতদাহন ভীষণ হুতাশন যেন প্রলয়ের আজ্ঞায় তত্রত্য ভবন সমূহে সমুত্থিত হইতেন।

হে সভ্যগণ! আমি ভ্রান্তির দ্বারা চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইলে, আমার সেই পুক্কশী ভার্য্যা, দুর্গ্রহ যেমন অনর্থপরম্পরা উৎপাদন করে, তাহার-ন্যায় বহুদুঃখপ্রদ বহু অপত্য প্রসব করিয়াছিল। আমি রাজপুত্র হইলেও ভ্রান্তির দ্বারা নানা দুঃখ পরম্পরায় আকৃষ্ট ও দুর্ব্বাসনারূপ শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া বিপদে রোদন, কুৎসিৎ অন্ন ভক্ষণ ও ভগ্নচণ্ডাল গৃহে বাস করতঃ কল্পতুল্য বৎসর সমূহ অতিকষ্টে অতিবাহিত করিয়াছি[৪০।৪৮]।

সপ্তাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টাধিকশততম সর্গ।

রাজা বলিলেন, হে সভ্যগণ! শ্রবণ কর। ঐরূপে সেই চণ্ডাল ভবনে বহুকাল অতীত হইলে, আমি জরাজর্জ্জরিতদেহ হইলাম। বার্দ্ধক্যের প্রভাবে আমার কেশ ও শ্মশ্রু কাশপুষ্পের ন্যায় শুভ্রবর্ণ হইল[১]। তখন বাতনিপতিত সরস ও বিরস পত্র সমূহের ন্যায় আমার সুখদুঃখ সংযুক্ত বয়স ও বর্ষ প্রক্ষেপিত হইতে লাগিল[২]। সমরক্ষেত্রে শরনিকর নিপাতের ন্যায় আমার সুখ দুঃখ পরম্পরা তখন কেবলমাত্র অকার্য্য কলহেই আপতিত হইতে লাগিল[৩]। সমুদ্রস্থিত কল্লোল সমূহের ন্যায় আমি কল্পনারূপ আবর্ত্তে আবর্ত্তিত ও ভ্রান্তির দ্বারা ভ্রামিতচিত্ত হইয়া যেন তৃণের ন্যায় নিরবলম্বে উহ্যমান (ভ্রামিত) হইতে লাগিলাম[৪]। ৫। বিন্ধ্যাচলস্থিত শুক-পক্ষীর ন্যায় তৎকালে একমাত্র ভোজনই আমার জীবনের লক্ষ্যস্বরূপ হইল। মৃত ব্যক্তি যেমন স্বীয় প্রাক্তন মহাগতি বিস্মৃত হয়, তেমনি, আমি ভ্রান্তি বিমোহিত হইয়া স্বীয় ভূপত্ব বিস্মরণ পূর্ব্বক ছিন্নপক্ষ অচলের (পর্ব্বতের) * ন্যায় চণ্ডালত্বে স্থিরীভূত হইয়া বহুবর্ষ অতিক্রম করিলাম[৬]। ৭।

ঐ অবস্থায় একদা সংসারে কল্পান্ত কালের ন্যায়, কাননে দাবাগ্নির ন্যায়, তটে সাগরতরঙ্গের ন্যায় ও শুষ্কবৃক্ষে অশনিপতনের ন্যায় সেই প্রচণ্ড চণ্ডালমণ্ডলের আবাস ভূমি বিন্ধ্যকচ্ছ নামক প্রদেশে অকাণ্ড ভূতবিনা-শন মহাদুর্ভিক্ষ সমুপস্থিত হইল। চণ্ডালগণ সেই বিষম দুর্ভিক্ষে নিপী-ড়িত হইয়া একে একে পরলোক গমন করিতে লাগিল। ক্রমে ঐ প্রদেশ ...বিবর্জ্জিত, তৃণপত্রবিহীন ও জলশূন্য হইয়া নিতান্ত ভীষণ হইয়া উঠিল। জলদমণ্ডল জল বর্ষণ করে না। কেবলমাত্র আকাশে দৃষ্ট হয়, তন্মুহূর্ত্তে আবার কোথায় বিলীন হইয়া যায়। সমীরণ বহ্নিকণার ন্যায় উষ্ণস্পর্শ হইয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল[৮]। ১০। বনস্থলী সকল শীর্ণপর্ণ সংযুক্ত ও দাবাগ্নিবলিত হইয়া জটাধারিণী চিরপ্রব্রজিতার ন্যায় প্রতীয়-মান হইতে লাগিল[১১]। সেই দাবাগ্নিসঙ্কুল ও পাংশুধূষর ভয়ানক দুর্ভিক্ষ

* পুরাণ লেখকেরা বলেন, পূর্ব্বকালে মৈনাক প্রভৃতি পর্ব্বত পক্ষযুক্ত ছিল।

বন সকল পরিশোষিত ও তৃণ নিকর ভস্মীভূতপ্রায় করিল এবং মানবগণ ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া তৃণান্নবারি বর্জ্জিত হইয়া কেহ যমভবনে গমন কেহ বা অতিকষ্টে অবস্থান করিতে লাগিল[১২]। [১৩]। মহিষগণ আতপসন্তপ্ত হইয়া মহামরীচিসলিলে অবগাহন (অর্থাৎ জলভ্রমে দাবানলতুল্য উত্তপ্ত বালুকাময় স্থানে গিয়া পতন) করিয়া মরিতে লাগিল। জীবগণ "জল" "জল" করিয়া ব্যাকুল, পরন্তু বায়ুও বনমধ্যে জলকণা বহন করে না[১৪]। চতুর্দ্দিকে তৃষ্ণাতুর জীবগণের পানীয় প্রার্থনার শব্দ (জল-জল) শ্রুত হইতে লাগিল। মানবগণ আতপসংশুষ্ক ও ঘর্ম্মাক্ত হইতে লাগিল[১৫]। ক্ষুধিতগণের জীবন যেন স্বয়ং গ্রাসার্থ উদ্যত হইয়াই তাহাদিগের নিকট হইতে বহির্গমন করিতে লাগিল[১৬]। প্রাণিগণ ক্ষুধায় ব্যাকুল হইয়া কেহ স্বীয় অঙ্গ চর্ব্বণ বাসনায় দন্তনিষ্পেষণ, কেহ মাংসভ্রমে খদিরকাষ্ঠানল নিগীরণ এবং কেহ বা পিষ্টক বিবেচনায় বনপাষাণ ভক্ষণ করিতে সমুদ্যত হইল[১৭]। পিতা, মাতা, পুত্র, ইহারা পরস্পর পরস্পরের স্নেহে কাতর হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে লাগিল। গৃধ্রাদি মাংসাশী পক্ষী সারিকাদি পক্ষী গ্রাস করিতে লাগিল[১৮]। জনগণ পরস্পর পরস্পরের অঙ্গ কর্ত্তন করতঃ ভক্ষণারম্ভ করিল। তদ্বিনিঃসৃত রুধিরে ধরাতল অভিষিক্ত হইতে লাগিল। ক্ষুধিত বারণগণ সিংহকেও ভক্ষণ করিবার ইচ্ছা করিতে লাগিল[১৯]। এবং সিংহগণও বারণ গণের ভয়ে ভীত হইয়া জনপদ অভিমুখে গমন করিতে আরম্ভ করিল। জনগণ পরস্পর পরস্পরকে ভক্ষণ করিবার আশায় আস্ফালন করিতে লাগিল[২০]। [illegible]রসম বায়ু প্রবাহিত হইয়া শূন্যপত্র পাদপসমূহ সমুড্ডীন করিতে লাগিল। শোণিতপানেচ্ছু মার্জ্জারগণ মেদ-বসাদি-সংলগ্ন ভূতল লেহন করিতে [illegible] হইল[২১]। শুষ্ক বায়ুমণ্ডল অগ্নিশিখার ন্যায় হইয়া আবর্ত্ত সহকারে বনসমূহে প্রবাহিত হইতে লাগিল[২২]। দাবদগ্ধ অজগরগণের ধূমে গুল্মসমূহ সমাচ্ছন্ন হইতে লাগিল। স্থানে স্থানে বায়ুসহায় অগ্নি সমুত্থিত হইয়া সন্ধ্যাকালীন অরুণিম জীমূত মণ্ডলের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল[২৩]। কোথাও রোরুদ্যমানা নারীগণের সম্মুখে ক্ষুধার্ত্ত বালকগণ চীৎকার স্বরে রোদন করিতেছে[২৪], কোথাও সংভ্রান্ত পুরুষগণ দন্ত দ্বারা বৃহৎ মৃত দেহ সকলের মাংস উৎকর্ত্তন করিয়া ভক্ষণের ত্বরতা নিবন্ধন স্বীয় অধর দংশন করিতেছে,[২৫] কোথাও বা ক্ষুধিত জন্তুগণ সুশ্যামল লতাপত্রভ্রমে বনদাহসমুত্থিত নিবিড়িত ধূমরাশি

পান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, কোন কোন স্থলে গৃধ্রগণ নভোগত উগ্র জলদস্থায় প্রচণ্ড সমূহ আমিষ জ্ঞানে ভক্ষণ করিতে উড্ডীন হইতেছে[২৬], অতিপ্রজ্বলিত জাঠর হুতাশনের তেজে অসংখ্য অসংখ্য মনুষ্যের হৃদয় ও উদর বিদীর্ণ হইতেছে, কোন কোন স্থলে পরস্পর পরস্পরের অঙ্গ-মাংস ছেদনের জন্য ভীষণ ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেছে,[২৭] গর্ত্তপ্রবেশ-কারী মারুতের ক্রাঙ্কার ধ্বনির ন্যায় ধ্বনিসম্পন্ন ভীষণ দাবাগ্নি ইত-স্ততঃ বিচরণ করিতেছে, দাবানলে অঙ্গারীকৃত বৃহৎ বৃহৎ পাদপসমূহ ভীত অজগর গণের ফুৎকারবলে ভূমিসাৎ হইতেছে দেখিলাম[২৮]। এবম্প্রকার ভূতবিনাশন "মহাদুর্ভিক্ষ সেই শূন্যকোটর বিন্ধ্যকচ্ছ প্রদেশে সমুপস্থিত হইয়া দ্বাদশাদিত্য নির্দ্দগ্ধ জগতের তুল্যতাপ্রাপ্ত হইলে, ঐ প্রদেশ তখন জ্বলিতদাবাগ্নিজটিল বৃক্ষসমূহ বিলোড়নকারী প্রতপ্ত অনলের দ্বারা নিতান্ত নিপীড়িত জীবগণে পরিপূর্ণ হওয়ায় ভাস্করাত্মজ শনিগ্রহের ক্রীড়া ভূমির সমতাপ্রাপ্ত হইল[২৯]। [৩০]।

অষ্টাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত।

নবাধিকশততম সর্গ।

রাজা বলিলেন, হে সভাসদগণ! ঐ প্রকারে তথায় সন্তাপপ্রদ ঘোর কষ্টপ্রদ বিধিবিপর্য্যয় সমুপস্থিত হইলে তত্রত্য অসংখ্য অসংখ্য লোক স্বস্ব কলত্র ও সুহৃদ্‌গণ সহ নভোমণ্ডলস্থ শারদীয় মেঘমালার ন্যায় সেই দেশ হইতে দেশান্তর গমন করিল। কেহ কেহ দেহসংলগ্ন অবয়বের ন্যায় পুত্র ও আপ্তবন্ধু সংলগ্ন হইয়া অরণ্যমধ্যে ছিন্নদ্রুমের ন্যায় বিশীর্ণ হইল। কেহ কেহ নীড়নির্গত অজাতপক্ষ পক্ষিশাবকের ন্যায় স্বীয় মন্দির হইতে বিনির্গত হইয়া ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক ভুক্ত হইল। কেহ কেহ অনলে প্রবিষ্ট হইয়া শলভের ন্যায় বিনাশ প্রাপ্ত হইল, এবং কেহ কেহ শৈলচ্যুত শিলাখণ্ড সমূহের ন্যায় শ্বভ্রে নিপতিত হইয়া প্রাণপরিত্যাগ করিল। ১।৫। কিন্তু আমি আমার সেই সমস্ত শ্বশুরাদি পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র পুত্র ও কলত্রের সহিত তথা হইতে অতিকষ্টে বহির্গত হইলাম।

আমি কথিত প্রকারের দারা ও পুত্র সহ তথা হইতে বহির্গত হইয়া অনল, অনিল, ব্যাঘ্র ও সর্পাদি হিংস্র জন্তুগণকে বঞ্চনা করতঃ মৃত্যুভয় হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া তদ্দেশের প্রান্তভাগ প্রাপ্ত হইলাম।৭ এবং তত্রস্থ তালতরুতলে মদীয় স্কন্ধ হইতে অনর্থরাশির ন্যায় সেই সন্তানগণকে অবতারিত করিলাম৬।৮। পাপীরা যেমন পাপক্ষয়ান্তে রৌরব নরক হইতে নির্গত হয়, তাহার ন্যায় আমি সেই চণ্ডালমণ্ডল হইতে বিনির্গত হইলাম এবং গ্রীষ্মতাপে তাপিত ভেক যেমন সুশীতল পাদপমূলে বিশ্রাম সুখ অনুভব করে, তাহার ন্যায় দাবাগ্নি উত্তাপে নিপীড়িত ও পথপর্য্যটনে পরিশ্রান্ত আমিও সেই তালতরুমূলে বহুক্ষণ বিশ্রাম করিলাম।৯।

অনন্তর সেই চণ্ডালকন্যা পুত্রদ্বয় ক্রোড়ে লইয়া তরুতলস্থ শীতল ছায়ায় শ্রান্তির অপগমে নিদ্রিত হইল১০। সেই সময়ে আমাদিগের অত্যন্ত প্রিয় পৃচ্ছানামক কনিষ্ঠ পুত্র মদীয় সম্মুখে আগমন করতঃ

বাষ্প পূরিত লোচনে দীনভাবে কহিল, হে পিতঃ! সত্বর আমাকে ভোজনার্থ মাংস ও পানার্থ শোণিত প্রদান করুন।১১।১২। সেই বালক আমার সম্মুখে পুনঃ পুনঃ ঐরূপ বলিয়া রোদন করিতে লাগিল। পরে প্রাণান্তিকী দশা প্রাপ্ত হইয়া শুষ্কবদনে কেবল 'ক্ষুধা ক্ষুধা' এই বলিতে লাগিল ও তাহার নেত্রে অবিরল ধারে অশ্রু নির্গত হইতে লাগিল১৩। কি করি, আমি তখন অনেক বুঝাইয়া বলিলাম। বলিলাম পুত্র! আমার নিকট মাংস নাই। তথাপি সে আমার সে বাক্যে প্রবোধিত না হইয়া কেবল "আমাকে মাংস দাও মাংস দাও" এই বলিয়া অতিকাতরে পুনঃ পুনঃ রোদন করিতে লাগিল১৪। অগত্যা তখন আমি পুত্রবাৎসল্যে মুগ্ধ ও দুঃখভাবে সমাক্রান্ত হইয়া কহিলাম, পুত্র! তুমি আমার এই বৃদ্ধশরীরস্থ স্বভাবপক্ক মাংস ভোজন কর১৫। ক্ষুধিত বালক তখন তাহাই অঙ্গীকার করিল, এবং সন্তুষ্ট চিত্তে আমাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক আমার দেহমাংস-ভক্ষণের নিমিত্ত "দাও দাও" বলিয়া রোদন করিতে লাগিল। তখন আমি তাহাকে নিতান্ত ক্ষুধার্ত্ত দেখিয়া স্নেহে ও কারুণ্যে বিমোহিত, দুঃখসম্ভারে সমাক্রান্ত হইয়া এবং তদবধি তীব্র আপদ পরম্পরা সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া সর্ব্বদুঃখাপনোদনকারী মৃত্যুকে তখন পরম মিত্র বলিয়া স্থির করিলাম১৬।১৮।

অনন্তর আমি মরণে কৃতনিশ্চয় হইয়া তথায় কাষ্ঠরাশি আহরণ পূর্ব্বক চিতা প্রস্তুত করিলাম। চিতা প্রজ্বলিত হইল এবং আমাকে গ্রহণ করিবার বাসনায় চটচটা শব্দ করতঃ আমার পতন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল১। তৎপরে আমি সেই চিতাতে যেমন আত্মনিক্ষেপ করিবার উদ্যোগ করিলাম, অমনি এই রাজসিংহাসন হইতে সেই আমি সবেগে বিচলিত হইলাম। * জনগণ যেমন ভীষণ স্বপ্ন দেখিয়া শয্যা হইতে বিচলিত হয়, উঠিয়া বসে আমিও ঠিক সেইরূপ হইলাম। এক্ষণে আমি প্রবোধিত হইয়া তূর্য্যধ্বনি ও জয় শব্দ শ্রবণ করিতেছি। হে সভ্যগণ! অজ্ঞান যেমন জীবকে দুর্দ্দশায় নিপাতিত করে, তেমনি, সম্মুখস্থ এই শাম্বরিক কর্ত্তৃক আমার শতদুর্দ্দশা সমন্বিত মোহ সমুৎপন্ন হইয়াছিল।

* অর্থাৎ স্বপ্নের ন্যায় ঐ পর্য্যন্ত অনুভব করার পর আমার ঐন্দ্রজালিক মোহ অপগত হইল এবং পূর্ব্ববৎ স্বাভাবিক সংজ্ঞা বা জ্ঞান লাভ করিলাম।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রামচন্দ্র! মহাপরাক্রম রাজেন্দ্র লবণ ঐরূপ কহিলে, সেই শাম্বরিক অর্থাৎ সেই সমাগত ঐন্দ্রজালিক তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইল, আর তাহাকে কেহ দেখিতে পাইল না। তদ্দর্শনে সভ্যগণ বিস্ময়োৎফুল্ল লোচন হইয়া বলিল,[২০]।[২৩] হে মহারাজ! এই ব্যক্তি শাম্বরিক নহে। কেন না, ইহার অর্থস্পৃহা থাকা অনুভূত হইল না। বোধ হয় ইহা কোন দৈবী মায়া অর্থাৎ কোন দেবতা আপনার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া সংসার গতি বুঝাইবার জন্য ঐরূপ মায়া প্রদর্শন করিয়াছেন।[২৪]। বস্তুতঃ "এই সংসার মনোবিলাস ব্যতীত অন্য কোন সার পদার্থ নহে। মনঃও অনন্ত অপ্রমেয় পরমেশ্বরের বিলাস এবং তাদৃশ মনঃই জগৎ।[২৫] সর্ব্বশক্তি পরমেশ্বরের শক্তি অনন্ত, এবং তাহা শত শত ব্রহ্মার পক্ষেও বিচিত্র। কেন না, শক্তিবিবেকিগণের মনঃও তদীয় মায়ায় বিমোহিত হয়[২৬]। ওঃ কি আশ্চর্য্য! লোকরহস্তবিৎ (রহস্য=তত্ত্ব) এই রাজার মহীপতি নামই বা কোথায়, আর সামান্যমনোবৃত্তি জনগণের ন্যায় ইহার এতাদৃশ বিপুল ভ্রমই বা কোথায়?[২৭]। আমাদের মনে হইতেছে, এই মনোমোহিনী মায়া কখনই শাম্বরিকের নহে। কেন না, শাম্বরিকগণ সর্ব্বদা ধনাদি প্রার্থনায় ধনিগণকে ঐন্দ্রজালিক কৌতুকাদি প্রদর্শন করিয়া থাকে এবং তাহারা কৌতুক প্রদর্শনান্তে যত্নপূর্ব্বক অর্থই প্রার্থনা করে, এ রূপে অন্তর্হিত হয় না[২৮]।[২৯]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রামচন্দ্র! যে সময়ে শাম্বরিকী মায়ায় হরিশ্চন্দ্র-কুলোদ্ভব মহামতি লবণ রাজার চণ্ডালভ্রম সমুপস্থিত হইয়াছিল, সেই সময়ে আমি সেই রাজেন্দ্রের মহাসভায় উপস্থিত ছিলাম। উপস্থিত থাকিয়া আমি ঐ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছি; কাহারও নিকট শ্রবণ করি নাই। হে মহামতে! এই প্রকার বহুকল্পনারূপ ফলপল্লব ও শাখাপ্রশাখা দ্বারা বিস্তৃত মনোরূপ তরুকে বিচার দ্বারা জয় করিয়া পরম স্বভাবে বাসনাসমাপ্তিরূপ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হইলে তুমি অনায়াসে সেই পরম পবিত্র ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইবে[৩০]।[৩১]।

নবাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত।

দশাধিকশততম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, প্রথমে অজ্ঞানসম্বলিত চিদ্বস্তুস্বরূপ পরম কারণ বিচিত্র বিষয়োন্মুখতা প্রাপ্ত হয়। সেই বিকারীভূত প্রথম বাসনাত্মক উল্লাস প্রথমাঙ্কুর।১। চিৎবস্তু বস্তুতঃ অবিকারী; পরন্তু বিকারবতী তুচ্ছ মায়ার বিমোহনে বশীভূত হইয়া মনোরূপে অবস্থিতি করে। সুতরাং চিরকাল জন্মমরণাদি ভ্রমে মুগ্ধ হইয়া অসৎ দুঃখপরম্পরা বিস্তার করিয়া শিশুগণ যেমন মিথ্যা ভূত প্রেত কল্পনা করিয়া ভয়াদি দুঃখ অনুভব করে, তাহার ন্যায় চিদ্বস্তুও (আত্মাও) মিথ্যা অজ্ঞানের কল্পনায় সংসার দুঃখ ভোগ করে।২।৩। সূর্য্যকিরণ যেমন ক্ষণমধ্যে অন্ধকার বিনষ্ট করে, তেমনি, সদা সৎস্বরূপ ও গতবাসন চিদ্বস্তু মনের আলিঙ্গনে অসৎ মহাদুঃখকেও ক্ষণ-মধ্যে আনয়ন করিয়া থাকে।৪। সেইজন্য বলিতেছি, মনঃ নিতান্ত তুচ্ছ। মনঃ নিকটস্থ বস্তুকে দূরে নীত এবং দূরস্থ বস্তুকে নিকটে আনীত করে। শিশুরা যেমন পক্ষিশাবকের অনুসরণে দৌড়াদৌড়ি করে, তেমনি, মনঃও বিবিধ বিষয়ের অনুসরণে ভ্রমণ করে৫। মনঃ বাস্তব ভয়প্রদ না হইলেও বাসনার আবেশ বশে অতি ভীষণ হইয়া থাকে। স্থাণু বাস্তবতঃ ভয়ের কারণ নহে, পরন্তু মোহগ্রস্ত পথিকের তাহাতে পিশাচ জ্ঞান সমুদিত হওয়ায় ভয়-প্রদ হয়৬। মনঃ মলিন হইলে মিত্রকেও শত্রু বলিয়া শঙ্কা করে। ভূতল ভ্রমণ না করিলেও উন্মত্তগণ মনে করে, ভূতল ভ্রমণ করিতেছে। (তাহারা নিজের ঘূর্ণা ভূতলে আরোপিত করিয়া ভূতলের ভ্রমণ অনুভব করে)।৭। পূর্ণাকুলমনা ব্যক্তি শশিকেও শনিজ্ঞান করে এবং অমৃতও বিষভাবে ভুক্ত হইলে বিষবৎ কার্য্যকারী হয়।৮। আকাশে পরিদৃষ্ট গন্ধর্ব্বনগর বস্তুতঃ অসৎ, অর্থাৎ কোন বস্তু নহে, পরন্তু তাহা ভ্রান্ত মনের নিকট সৎ বলিয়া প্রতীত হয়। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, বাসনাযুক্ত মনঃ জাগ্রতেও স্বপ্ন-বৎ দর্শন করিয়া থাকে।৯।

হে রামচন্দ্র! জন্তুগণের বাসনাপ্রবল মনঃই মোহের প্রধান কারণ। সেই জন্য প্রযত্ন সহকারে তাহার উচ্ছেদ কর্ত্তব্য। বাসনার উচ্ছেদ হইলেই

মনের ক্রিয়া রুদ্ধ হইয়া যায়[১০]। নরগণের মনোরূপ মৃগ এই সংসাররূপ বনখণ্ডে বাসনারূপ বাগুরার দ্বারা বিজড়িত হইয়া নিতান্ত বিবশতা প্রাপ্ত হইতেছে[১১]। যিনি বিচারদ্বারা উক্ত বাসনাজাল ছেদন করিতে পারেন তিনিই নির্দ্দোষ মার্ত্তণ্ড কিরণের ন্যায় বিরাজ করিতে পারক হন[১২]। হে অনঘ! মনকেই তুমি দেহসম্পন্ন নর বলিয়া জানিবে। পণ্ডিতেরা নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, জন্তুগণের দেহ জড় কিন্তু মনঃ জড় নহে, অজড়ও নহে।[১৩]। হে রাঘব! মনঃ যাহা করে তাহাই কৃত হয়, এবং যাহা পরিত্যাগ করে তাহাই পরিত্যক্ত হয়[১৪]। একমাত্র মনঃই ব্রহ্মাণ্ড, মনঃই সূর্য্যমণ্ডল, মনঃই ব্যোমমণ্ডল, মনঃই মহান্ বায়ুমণ্ডল এবং তুমি আমি সমস্তই মনঃ[১৫]। মনঃ যদি সূর্য্যাদি পদার্থকে প্রকাশাদিরূপী বলিয়া গ্রহণ না করে, তাহা হইলে এই সমস্ত সূর্য্যাদি কোনও ক্রমে প্রকাশ পাইতে পারে না[১৬]। যাহারা মনোমোহে সমাক্রান্ত, তাহারাই মূঢ় শব্দে অভিহিত হয়। শরীর মোহাপন্ন হইলে (অর্থাৎ মনঃপরিত্যক্ত হইলে) পণ্ডিতগণ তাহাকে মূঢ় বলেন না; পরন্তু শব বলেন (মৃত্যু বলেন)[১৭]। অতএব, মনঃই দর্শনক্রিয়ায় চক্ষুঃ, শ্রবণক্রিয়ায় কর্ণ; স্পর্শন ক্রিয়ায় ত্বক্, ঘ্রাণ-ক্রিয়ায় নাসিকা এবং আস্বাদনক্রিয়ায় জিহ্বা হইয়া অবস্থিতি করিতেছে। দেহ একটা নাট্যশালা, মনঃ ইহাতে নট, বৃত্তি বা জ্ঞান সকল তাহার অভিনয়[১৮।১৯]। ফলতঃ মনঃ লঘুকে দীর্ঘ, সত্যকে অসত্য, কটুকে মধুর ও রিপুকে মিত্র ও মিত্রকে শত্রু করিয়া থাকে।[২০]। যাহা বৃত্তিশালী চিত্ত, যাহা তাদৃশ চিত্তের প্রতিভাস অর্থাৎ যাহা চৈতন্যের দ্বারা উজ্জ্বলিত মনের ঘটপটাদি বিষয়াকারা বৃত্তি, লোক মধ্যে ও শাস্ত্রমধ্যে তাহারই নাম প্রত্যক্ষ প্রমাণ।[২১]। চিত্তের প্রতিভাস বশে অর্থাৎ চৈতন্যসম্বলিত তাদৃশী মনের উদয়ে হরিশ্চন্দ্রের এক রাত্রিকে দ্বাদশবৎসর অনুভূত হইয়াছিল।[২২]। চিত্তের অনুভবাত্মক প্রতিভাস উদিত হইলে মুহূর্ত্তকালও যুগশতের ন্যায় প্রতীয়মান হয়, এবং মনোজ্ঞ বৃত্তি উদিত হইলে রৌরবও সুখজনক বলিয়া বোধ হয়। মনঃ যদি জানে রাজ্য পাইয়াছি, রাজা হইয়াছি, তাহা হইলে নারকীও রাজ্যসুখ অনুভব করে, এবং রাজ্যস্থ রাজার রাজ্যনাশ মনে হইলে রাজ্যস্থ রাজারও নরকযন্ত্রণা অনুভূত হয়। যেমন আধারসূত্র দগ্ধ হইল আধেয় মুক্তাফল বিশীর্ণ হইয়া পড়ে, সেইরূপ মনঃ বিজিত হইলে সমস্ত ইন্দ্রিয় বিজিত হয়[২৩]। ২৫।

হে রামচন্দ্র! মনঃ মূক অর্থাৎ বাক্‌শক্তি বিহীন হইলেও, সর্ব্বত্র স্থিতা, স্বচ্ছরূপিণী, বিকারহীনা, সূক্ষ্মা, সর্ব্বসাক্ষীরূপা ও সর্ব্বভাবানুগতা চিৎশক্তিরূপিণী আত্মসত্তার সহিত একলোল হইয়া দেহাদির অন্তরে এবং গিরি, নদী, সরিৎ, ব্যোম, সমুদ্র, পুর ও পত্তনাদিতে লীলা করিতেছে বা ব্যর্থ পরিভ্রমণ করিতেছে[২৬]। [২৮]। মনঃ যাহাতে অনুরক্ত হয় তাহা স্বাদুহীন উচ্ছিষ্ট হইলেও তাহাতে অমৃততুল্য বোধ জন্মায় এবং মনঃ যাহাতে অনুরক্ত না হয়, তাহা অমৃত হইলেও বিষ বলিয়া অবধারণ করায়। অতএব, মনঃই ব্যবহার্য্য বস্তুতে আপনার অভিমত আকার সৃজন করে।[২৯]। [৩০]। তাই বলিতেছি, মনঃ চিচ্ছক্তির দ্বারা প্রস্ফুরিত হইয়া স্পন্দশক্তিতে স্পন্দত্ব, প্রকাশশক্তিতে প্রকাশতা, দ্রবশক্তিতে দ্রবতা, পৃথিবীভূতে কঠিনতা ও শূন্যদৃষ্টিতে শূন্যতা প্রাপ্ত হয়। সুতরাং বুঝা উচিত যে, মনঃই স্বীয় ইচ্ছানুসারে বিবিধরূপ ধারণ করে[৩১]।[৩২]। মনের সামর্থ্যের বিষয় ভাবিয়া দেখ, মনঃ দেশকালাদির প্রতীক্ষা করে না, যখন তখন শুক্লকে কৃষ্ণ ও কৃষ্ণকে শুক্ল করিতে বিন্দুমাত্র ভ্রমবোধ বা শ্রমবোধ করে না।[৩৩]।

মনঃ যদি অন্যত্র আসক্ত থাকে, তাহা হইলে মধুর ভক্ষ্য চর্ব্বণ করিলেও তাহার মধুর স্বাদ অনুভূত হয় না।[৩৪]। চিত্ত যাহা দেখে তাহাই দৃষ্ট হয়; চিত্ত যাহা না দেখে তাহা কদাচ দৃষ্ট হয় না। যেমন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় থাকিলেও অন্ধকারে দর্শন হয় না, তেমনি, ইন্দ্রিয়গণ থাকিলেও মনঃ ব্যতীত বস্তু দর্শন হয় না। এই ব্যাপারেব প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে ইহাই বুঝা যায় যে, ইন্দ্রিয়গণও মনে কল্পিত।[৩৫]। মনঃকল্পিত ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা মনঃ দেহসম্পন্ন বা দেহাদি আকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মনঃ হইতেই ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে, ইন্দ্রিয় হইতে মনঃ উৎপন্ন হয় নাই।[৩৬]। চিত্ত ও শরীর আপাত দৃষ্টিতে অত্যন্ত বিভিন্ন। পরন্তু যে সকল অভিজ্ঞ লোক উক্ত উভয়কে অভিন্ন জ্ঞান করে, বস্তুতঃ তাঁহারাই জ্ঞাতজ্ঞেয় ও সুপণ্ডিত এবং তাঁহারাই সকলের নমস্য।[৩৭]। আরও দেখ, কুসুমসুশোভিত কবরী লোলনয়না সুন্দরী অঙ্গনাগণ অমনস্ক পুরুষের অঙ্গে সংলগ্ন হইয়াও তদ্দেহের বিকার উৎপাদনে সমর্থ হয় না। কোন এক সময়ে বীতরাগ নামক এক মুনি বিপিনমধ্যে তপস্যা করিতেছিলেন, এমন সময় এক ক্রব্যাদ সহসা তাঁহার ক্রোড়নিহিত হস্ত

চর্ব্বণ করিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার মনঃ অন্যত্র (ধ্যেয় বস্তুতে) আসক্ত থাকায় সেই ক্রব্যাদের আক্রমণ তাঁহার অনুভূত হয় নাই।৩৮।৩৯। অন্যমনস্কের নিকট প্রযত্ন সহকারে কথা বলিলেও তাহা পরশুছিন্ন লতার ন্যায় বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়।৪০। মনঃ যদি সমুদ্রতটে যায় তবে গৃহে থাকিয়াও সমুদ্রতীর অনুভব করে এবং মনঃ যদি পর্ব্বতকন্দরে যায় তবে গৃহে বসিয়াও পর্ব্বতারোহণের দুঃখ অনুভব করে। স্বপ্ন ও ভ্রান্তি তাহার নিদর্শন৪১।৪২। মনঃ স্বপ্নকালে অতি সঙ্কুচিত হৃদয়প্রদেশে পুর পর্ব্বতাদি ও আকাশাদি কেবলমাত্র কল্পনার দ্বারা প্রস্তুত করিয়া সত্য আকাশাদির ন্যায় দর্শন করিয়া থাকে৪৩। তথা সমুদ্র ও সমুদ্রের তরঙ্গ প্রত্যক্ষবৎ দেখিয়া ভীত হয়।৪৪। যেমন সমুদ্রান্তর্গত জল তরঙ্গমালায় পরিণত হয়, তেমনি, দেহান্তর্গত মনঃও স্বপ্নের আবেশে পুর পর্ব্বতাদির আকারে পরিণত হয়।৪৫। পত্র, লতা, পুষ্প, ফল, এ সকল যেমন একমাত্র অঙ্কুর হইতে সমুৎপন্ন হয়, সেইরূপ, জাগ্রৎ ও স্বপ্নাদিবিভ্রম সমুদয় একমাত্র মনঃ হইতেই সমুৎপন্ন হয়।৪৬। সুবর্ণ পুত্তলিকা যেমন হেম হইতে ভিন্ন নহে, তেমনি, কি জাগ্রৎ কি স্বপ্ন, চিত্ত হইতে ভিন্ন নহে।৪৭। ধারা, কণা, বিন্দু, ফেণ, বুদ্বুদ, তরঙ্গ, সমস্তই জলের বিকার বা অবস্থা বিশেষ। সেইরূপ বিবিধ সৃষ্টিবৈভবও মনের বিকার বা মনের অবস্থা বিশেষ।৪৮। নট যেমন বিবিধ ভূমিকা বিস্তার করে, তদ্রূপ, চিত্তই জাগ্রদ্দৃশ্য ও স্বপ্নদৃশ্য বিস্তার করিয়া থাকে।৪৯। রাজা লবণ যেমন মনের কুহকে চণ্ডাল হইয়াছিলেন, তেমনি, এই জগৎও মনের মননে সম্পন্ন হইয়াছে।৫০। মনঃ যখন যাহাকে যেরূপে জানে তখনই তাহা সেইরূপ হয়। হে রাঘব! যখন সমস্তই মনোনির্ম্মিত, তখন তুমি অবশ্যই মনের দ্বারা ইচ্ছানুরূপ সৃষ্টি করিতে পার।৫১। জাগ্রৎ ও স্বপ্নযুক্ত মনঃই পুর, পর্ব্বত, সরিৎ, শৈল ও সমুদ্রাদির আকারে দেহিগণের অন্তরে সমুদিত হয়৫২। লবণ রাজা যেমন ক্ষণমধ্যে মনের প্রতিভাসে চণ্ডাল হইয়া ছিলেন, তেমনি, মনের প্রতিভাসে দেবতা দেবত্ব হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া দৈত্য, নাগ নাগত্ব ত্যাগ করিয়া নগ, নর নরত্ব পরিহারে নারী, পিতা পিতৃত্ব পরিত্যাগ করিয়া পুত্র হইতেছে৫৩।৫৪ জন্ম, মরণ, জীবন সমস্তই মনের সঙ্কল্প। মনঃ আকারবিহীন হইয়াও চিরাভ্যাস বশতঃ সেই সেই ভাবে পরিবর্ত্তিত হয়।৫৫। মনন (বৃত্তির উদয়) সমুল্লসিত মনঃ বাসনা বিস্তৃত করিয়া

ভয়াবহ যোনি প্রাপ্ত হয় ও সুখ দুঃখ অনুভব করে। তিল মধ্যে তৈলের অবস্থিতির ন্যায় সুখ দুঃখ মনেই অবস্থিতি করে। হে রামচন্দ্র! মনের বিশেষ বিশেষ সঙ্কল্পই দেশকালাদি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। তাহার কারণ—মনের সঙ্কল্পই দেশকালাদির আকারে স্থিতি লাভ করে এবং তদনুরূপে সুখ দুঃখের ও ভয় অভয়ের বহুলতা ও অল্পতা প্রতীত করায়। তিল যন্ত্রনিষ্পীড়িত হইলে তাহা হইতে তৈল নিষ্কাশিত হয়। তাহার ন্যায় চিত্তস্থ নিবিড় সুখ দুঃখ মননের (বৃত্তির) দ্বারা বিস্পষ্ট হইয়া থাকে৫৬।৫৯ মনঃ যখন "অহং শরীরী" এতদ্রূপ দৃঢ় সঙ্কল্প করে তখন সে স্থূল শরীরী হইয়া উল্লসিত, বল্গিত, আনন্দিত, গমন, আগমন প্রভৃতি করিতে থাকে। এতাদৃশ মনঃ অন্তঃপুর-মধ্যে সাধ্বীগণের ন্যায় স্বীয় সঙ্কল্পকল্পিত বিবিধ উল্লাসের সহিত এই দেহমধ্যে বিচরণ করিতেছে। কিন্তু যিনি স্বীয় অন্তরে মনকে বিষয়ানুসন্ধানে নিযুক্ত না করেন, তাঁহার মনঃ আলানবদ্ধ হস্তীর ন্যায় বিচলিত হইতে সমর্থ হয় না।৬০। ৬২।

হে অনঘ! যাঁহার মনঃ সদ্বস্তু (ব্রহ্ম) হইতে স্পন্দিত অর্থাৎ বিচলিত না হয়, তিনিই উত্তম পুরুষ, অবশিষ্ট কর্দ্দমকীট বা কুপুরুষ৬৩। যাহার মনঃ একস্থানে অর্থাৎ ব্রহ্মে সংস্থিত হইয়াছে, স্থিরতা প্রাপ্ত হইয়াছে, তিনি অনুত্তম ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন। হে রাঘব! মন্দর ভূধরের বিলোড়ন স্থগিত হইলে পর ক্ষীর সমুদ্রের যদ্রূপ স্তিমিভাব হইয়াছিল, মনের সংযমে সংসারবিভ্রম শান্তিপ্রাপ্ত হইলে মনঃ তদ্রূপ স্তৈমিত্য প্রাপ্ত হয়। ভোগসঙ্কল্প সমুদিত মানসিক বৃত্তি হইতেই সংসাররূপ বিষবৃক্ষের অঙ্কুর সমুৎপন্ন হয়। কুপুরুষরূপ ভ্রমরগণ সংসাররূপ প্রবাহবতী নদীতে চিত্তরূপ উৎপল পরিত্যাগ করিয়া জাড্যপ্রবাহরূপ জলবেগে বিদীর্ণ ও বিশীর্ণকারী চিন্তারূপ আবর্ত্তে নিমগ্ন হইয়া থাকে৬৬।৬৭।

দশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত।

একাদশাধিক শততম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, চিত্তরূপ মহাব্যাধির চিকিৎসার্থ স্বপুরুষকারই একমাত্র সাধু ও সুস্বাদু মহৌষধ। আমি তাহা বর্ণন করি, শ্রবণ কর[১]। বাহ্যবস্তু পরিত্যাগ পূর্ব্বক আত্মসম্বেদনরূপ পুরুষকার দ্বারা চিত্তবেতালকে জয় করা যায়।[২]। যে ব্যক্তি মনোভিলষিত বিষয় (রূপরসাদি) পরিত্যাগপূর্ব্বক অবস্থিতি করিতে পারেন তিনিই চিত্তব্যাধিবিহীন হইতে পারেন, এবং দন্তী যেমন কুদন্তীকে পরাজয় করে তাহার ন্যায় তিনিই মনোরূপ ব্যাধিকে জয় করিতে পারেন[৩]। কেবল তাহা নহে, যত্ন সহকারে আত্মতত্ত্ব জ্ঞান অর্জ্জন দ্বারা চিত্তরূপ বালককে অবস্তু (বিষয় বা বাহ্যবস্তু) হইতে আনয়ন পূর্ব্বক সত্য বস্তুতে (ব্রহ্মপদে) সংযোজন করিয়া, তাহাকে বোধ প্রদান করিতে সমর্থ হন।[৪]। অতএব হে মননশীল সাধো! রামচন্দ্র! তুমিও শাস্ত্র ও সৎসঙ্গ দ্বারা ধীরতা লাভ করিয়া চিন্তারূপ অনলে অনুতপ্ত স্বীয় লৌহস্থানীয় মনের দ্বারা চিন্তানলতপ্ত লৌহান্তরস্থানীয়রূপ মনকে ছেদন কর।[৫]। যেমন বালক দিগকে সহজে নানা বিষয়ে সংযোজিত করা যায় তাহার ন্যায় চিত্তকেও অল্প যত্নে আত্মবস্তুতে যোজিত করা যায়। তাহা তত দুষ্কর নহে[৬]। মনকে পৌরুষদ্বারা ভাবী শুভ ফলের উদয়কারী সৎকর্ম্মে (সমাধি অভ্যাসে) নিযুক্ত করিবে[৭]। যে ব্যক্তি বিষয়াভিলাষ পরিত্যাগরূপ স্বাধীন বৈরাগ্যবৃত্তি অবলম্বনকে দুষ্কর জ্ঞান করে, সে পুরুষ-কীট, তাহাকে ধিক্।[৮] এই সকল অরম্য বিষয়কে পরমরমণীয় রূপে (ব্রহ্মভাবে) ভাবিত করিয়া, মল্লগণ যেমন প্রতিকূল মল্ল দিগকে বলপূর্ব্বক জয় করে তাহার ন্যায় তুমি বিরোধী চিত্তকে জয় করিবে[৯]। পৌরুষ প্রযত্ন উদ্দীপিত করিলেই চিত্তরূপ শিশুকে শীঘ্র জয় করা যায়। এবং চিত্ত উহার পর অচিত্ত হওয়ায় ব্রহ্মপদ লাভ করা যায়।[১০] চিত্ত আপনার, সুতরাং তাহাকে আক্রমণ করা সুসাধ্য বৈ দুঃসাধ্য নহে। যাহারা আপনার চিত্তকে আপনার বশ্য করিতে না পারে, তাহার মানুষ্যত্বকে এবং তাহাকে শত ধিক![১১]। আপনিই আপনার দ্বারা বাঞ্ছিত ত্যাগ

করিতে হয়, এবং তাহা আপনারই প্রযত্নসাধ্য। অতএব তুমি বাঞ্ছিত পরিত্যাগরূপ পুরুষকার দ্বারা অল্পে অল্পে মনকে শমিত করিবে। কেন না, মনের প্রশম ব্যতীত শুভ লাভের সম্ভাবনা নাই।[১২]। হে রাঘব! সেইজন্য বলিতেছি, তুমি পৌরুষ প্রয়োগ করিয়া মনকে সংহার কর, এবং নিঃশত্রু ও নিরাপদ হইয়া জীবন্মুক্ত দেহে আদ্যন্তরহিত অনন্ত সাম্রাজ্য (ব্রহ্ম সুখ) উপভোগ কর।[১৩]। মনঃ যদি প্রশমিত না হয় তাহা হইলে গুরূপদেশ, শাস্ত্রার্থবোধ ও মন্ত্রাদির সাধন সমুদয়ই বৃথা[১৪]। (যখন দেখিবে যে,) চিত্ত সঙ্কল্পপরিত্যাগরূপ তীক্ষ্ণাস্ত্রে ছিন্ন হইয়াছে তখনই জানিবে যে, সর্ব্বগত ও সর্ব্বময় শান্ত ব্রহ্মপদ লব্ধ হইয়াছে[১৫]। স্বসম্বেদন দ্বারা সঙ্কল্পরূপ অনর্থ পরিত্যক্ত হইলে জীবন্মুক্তি সিদ্ধ হয়। তখন পুরুষের শরীর থাকিলেও তাহা ক্লেশপ্রদ হয় না[১৬]। তুমি মূঢ়সঙ্কল্পকল্পিত দৈবকে অনাদর অর্থাৎ তুচ্ছজ্ঞান করিয়া পুরুষার্থসম্বিত্তির দ্বারা চিত্তকে অচিত্ত কর[১৭]। সেই অচিত্ততারূপ মহাপথ অবলম্বন করিয়া চিত্তকে চিৎকর্তৃক বিনষ্ট করতঃ সাক্ষীর (ব্রহ্মের) স্বারূপ্য লাভ কর[১৮]। তুমি অগ্রে আপনাকে চিন্মাত্রে পরিভাবিত কর, পশ্চাৎ পরমার্থবুদ্ধিসম্পন্ন হও, তদনন্তর অব্যগ্র হইয়া গ্রস্তচিত্ত পরমাত্মাকে ধারণ এবং পরম পৌরুষ অবলম্বন পূর্ব্বক চিত্তকে অচিত্তে (ব্রহ্মে) সমাপণ করতঃ অবিনাশী মহাপদবীতে অবস্থান কর। ১৯। ২০।

হে রামচন্দ্র! বিপর্য্যয়রূপিণী ভ্রান্তিজ্ঞানকে যেমন স্থির বুদ্ধির (প্রমাজ্ঞানের) দ্বারা জয় করা যায়, তেমনি, মনকেও পুরুষকার (যোগ সমাধির) দ্বারা জয় করা যায়।[২১]। যিনি সেইরূপে মনোজয় করিতে পারেন, তিনিই এই লোকত্রয় তৃণের ন্যায় জয় করিতে সমর্থ হন।[২২]। এই যুদ্ধে তাঁহার শস্ত্রদলন, মৃত্যুমুখে গমন, মৃত্যুর পর স্বর্গ গমন, তদনন্তর পাপদ্বারা অধঃপতন প্রভৃতি ক্লেশপরম্পরা কিছুই ভোগ করিতে হয় না। কেবলমাত্র স্বভাবের পরিবর্ত্তন করিবে, তাহাতে আবার কষ্ট কি?[২৩]। যে নরাধম কেবল আপনার সম্বেদনকে আক্রমণ (পরিবর্ত্তন বা বশ্য) করিতে না পারে তাহারা কি প্রকারে ব্যবহার পরম্পরা নির্ব্বাহ করিবে ও সুখী হইবে?[২৪]।

আমি মৃত, আমি জাত, আমি জীবিত, এ সকল কুকল্পনা, অর্থাৎ কেবল চিত্তবৃত্তি। সুতরাং ঐ সমস্তই অসৎ।[২৫]। বস্তুতঃ, কেহই মৃত

অথবা জাত হয় না। মনঃ আপনাকে মৃতবোধ করিয়া ইহলোক হইতে পরলোক গমন করতঃ প্রস্ফুরিত হয়। মনঃ যখন মোক্ষ না হওয়া পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকে, প্রকৃত প্রস্তাবে মরে না, তখন আর মৃত্যুভয় কোথায়? ২৬।২৭। ইহলোকে ইহলোকের ভাবে বিচরণ করুক, আর পরলোকে পরলোকের ভাবেই বিচরণ করুক, চিত্ত মোক্ষ না হওয়া পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিবেই করিবে২৮। সংসারের রূপ কি? চিত্তই সংসারের রূপ। ভ্রাতার মৃত্যু হইলে অথবা ভৃত্যাদির মরণ (দেহপাত) হইলে, যে মিথ্যা (আরোপিত) ক্লেশ হয়, তাহা আমার মতে চৈতন্যব্যাবৃত্ত (চৈতন্য হইতে পৃথক) চিত্তভিন্ন অন্য কিছু নহে২৯। চিত্তোপশম ব্যতীত, প্রমাণরাজ বেদান্তের প্রধান প্রমেয় মায়ামালিন্যবর্জ্জিত সৎস্বরূপ ও পরম হিত পরম পদ (প্রাপ্য) পাইবার অর্থাৎ মোক্ষলাভের অন্য কোন উপায় নাই ইহা ঊর্দ্ধ অধ ও তির্য্যক্ প্রভৃতি লোকে নির্দ্ধারিত আছে।৩০।৩১। * যে মুহূর্ত্তে মনোলয় হয় সেই মুহূর্ত্তেই পরম বিশ্রান্তি জন্মে। তৎ কারণে বলিতেছি, তুমি অতিবিস্তীর্ণ হৃদয়াকাশস্থ চিদ্রন্ধ্রে চিদ্রূপ চক্র ধারণ করতঃ মনকে সংহার কর৩২।

মনকে বিনাশ করিলে দুঃখপরম্পরা উপস্থিত হইয়া তোমাকে আর বন্ধন করিতে পারিবে না। যদি তুমি আপাত রমণীয় বিষয়কে দোষানুসন্ধান পূর্ব্বক অরমণীয় বলিয়া অবধারণ করিতে পার, তাহা হইলে অবশ্যই মনোমারণে সমর্থ হইবে৩২।৩৩। এই আমি, এ সকল আমার, ইত্যাকার ভ্রমপরম্পরাই মনের শরীর। আমি, আমার, ইত্যাদি কল্পনা অনুত্থিত বা বিনিবৃত্ত হইলে সুতরাং মনের উক্তবিধ শরীর ছিন্ন হইয়া যায়। যেমন বায়ু প্রবাহিত হইলে অতিনিবিড় মেঘ ছিন্ন ভিন্ন ও বিলীন হইয়া যায়, তেমনি, সঙ্কল্পবর্জনে মনঃও তিরোহিত হইয়া যায়। শস্ত্র, অগ্নি ও পবনাদির উৎপাতে লোকের ভয় হয়, পরন্তু অনায়াসসাধ্য ও স্বায়ত্ত সঙ্কল্পবর্জ্জনে কিসের ভয়? "ইহা শ্রেয়ঃ, ইহা শ্রেয়ো নহে" এ বোধ আবালপ্রসিদ্ধ৩৪।৩৭। সেইজন্য বলিতেছি, জনগণ শিশু পুত্রকে যেমন

---

* ঊর্দ্ধলোকে=দেবলোকে। অধোলোকে=পাতালাদিতে। তির্য্যক্ লোকে=দ্বীপান্তরাদিতে। অর্থাৎ সর্ব্বদেশীয় তত্ত্বজ্ঞগণের বিচারে ঐ সিদ্ধান্ত নিষ্পন্ন হইয়াছে।

* চিদ্রূপচক্র=তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্য জনিত ব্রহ্মাকারা মনোবৃত্তি হৃদয়াকাশে উত্থাপিত করা। পুনঃ পুনঃ ঐরূপ মনোবৃত্তি উত্থাপন করিলে মায়িক মনঃ ক্রমে নিবৃত্তি অবস্থা পাইবে এবং অবশেষে লয়প্রাপ্ত হইবে।

উদারভাবে নিয়োজিত করে। তাহার ন্যায় তুমি ত্বদীয় মনকে শ্রেয়োবিষয়ে সংযোজিত কর। এই সংসার যাহার গর্জ্জন, সেই দুর্ব্বিনীত চিত্তরূপ সিংহকে যিনি সংহার করিতে পারেন, তিনিই নির্ব্বাণ পদের অধিকারী শ্রেষ্ঠ পুরুষ এবং তিনিই ইহলোকেও জয়লাভে সুসমর্থ[৩৮]। মরুভূমিতে যেমন মৃগনদী প্রবাহিতা হয়, তাহার ন্যায় মনেরই সঙ্কল্পকামনা হইতে ভ্রমদায়িনী বিপদ্ সমূহ সমুত্থিত হইয়া থাকে[৩৯]। তাহা জানিয়া যিনি মনকে সংহার করিয়াছেন, কল্পান্ত পবন প্রবাহিত হউক, অর্ণব সকল এক হইয়া যাউক, দ্বাদশ মার্ত্তণ্ড উদিত হইয়া তাপ প্রদান করুক, কিছুতেই সেই নির্ম্মল পুরুষের কিছুমাত্র ক্ষতি নাই[৪০]। এই সপ্তলোকরূপ পল্লবসম্পন্ন সংসাররূপ বৃক্ষ মনোরূপ বীজ হইতে সমুদিত হইয়াছে[৪১]। তুমি সঙ্কল্পত্যাগসাধ্য সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ সঙ্কল্পাতীত পরম পদ আক্রমণ পূর্ব্বক অবস্থিতি কর।[৪২]। জ্বলন্ত অঙ্গার যেমন ক্রমে ভস্মীভূত হইয়া তাপোপশমসুখার্থী দিগের আনন্দ উৎপাদন করে, তেমনি, এই মনঃও ক্রমে ক্ষীয়মাণ হইয়া চিত্তোপশমার্থী দিগকে অনুপম আনন্দ প্রদান করিয়া থাকে[৪৩]। যদি তুমি সঙ্কল্প বাড়াও তাহা হইলে এরূপ লক্ষ লক্ষ ব্রহ্মাণ্ড সেই একমাত্র চিদণুর অন্তরে কল্পিত, ব্যক্ত ও বিভক্ত দেখিতে পাইবে, অথচ তাহাতেও সঙ্কল্পের পরিশেষ হইবে না।[৪৪]। যাহার প্রয়োজিত সঙ্কল্পমাত্র বিভাবনে এরূপ ব্রহ্মাণ্ডকোটি ও জন্মমরণনিরয়াদি অনর্থ পরম্পরা বিস্তৃত হইয়াছে ও হইতেছে, তুমি বাসনাশূন্য হইয়া সন্তোষমাত্র বিভাবন দ্বারা সেই মনকে সম্যক্ প্রকারে জয় কর। আত্মবিদ্গণের পরম পাবন শান্ত অবৈষম্যবৃত্তিসম্পন্ন নির্ম্মল নিরস্ত-অহম্ভাব দ্বারা তাঁহাদিগের অন্তরে যে অজ অবিনাশী পরম পদ অবশিষ্ট বিরাজিত থাকে, তুমি স্বীয় নির্ম্মল বুদ্ধি অবলম্বনে অবিলম্বে তাহাই প্রাপ্ত হও।[৪৫]।[৪৬]।

একাদশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত।

দ্বাদশাধিক শততম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, মনঃ যে পদার্থে ও যে যেরূপ বাসনায় তীব্রবেগসম্পন্ন হয়, সেই পদার্থ তাহার নিকট সেই প্রকারেই পরিদৃষ্ট ও বাঞ্ছিত হয়। মনের সেই বাসনানির্ম্মিত তীব্রবেগ জলবুদ্বুদের ন্যায় স্বাভাবিক; পরন্তু উপেক্ষা প্রাবল্যে তাহার অনুদয় বা অনুত্থান এবং নিরোধ প্রযত্নে তাহার বিলয় হইয়া থাকে। মনের তাদৃশ লোলস্বভাব (চঞ্চলতা) হিমের শীততার ও কজ্জলের কৃষ্ণতার অনুরূপ।১।৩।

রামচন্দ্র বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! অতিচঞ্চল মনের বেগকে অর্থাৎ চাঞ্চল্যকে আপনি স্বাভাবিক বলিতেছেন। যদি তাহা স্বাভাবিক হয়, তাহা হইলে বলপূর্ব্বক তাহার নিবারণের সম্ভাবনা কি? কজ্জলের কৃষ্ণতা কি কেহ বলদ্বারা অপহার করিতে পারে?৪। বশিষ্ঠ বলিলেন, চাঞ্চল্য বিহীন মনঃ কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। সেইজন্য বলা যায়, মনের চঞ্চলতা বহ্নির উষ্ণতার ন্যায় স্বাভাবিক।৫। চিত্তে যে চঞ্চলা স্পন্দশক্তি রহিয়াছে, তুমি সেই মানসী শক্তিকে জগদাড়ম্বরাত্মিকা বলিয়া জানিবে। স্পন্দন ব্যতীত বায়ুর অস্তিতা কোথায়? যেমন স্পন্দ ব্যতীত বায়ুর পৃথগস্তিতা প্রতীত হয় না, তেমনি, চিত্তস্পন্দ ব্যতীত এই জগদ্রূপ পরিণতির অন্য কোন পৃথক্ উপাদান বা পৃথক রূপ অবধারণ করিবে না৬। জগৎ ব্যতীত পৃথকরূপে চিত্তের অস্তিতা অনুভূত হয় না৭। সেই কারণে চাঞ্চল্য বর্জিত মনকে মৃত বলা যায় এবং তাহাই শাস্ত্রবক্তা দিগের অনুমোদিত মোক্ষ। মনের বিলয়ে সর্ব্বদুঃখ প্রশান্তি এবং মনের সম্বেদনে দুঃখপরম্পরা সমুদিত হইয়া থাকে৮।৯। ঐ চিত্তরূপ রূপক (নাট্য) উত্থিত থাকিলে সে অশেষ দুঃখ প্রদান করিবেই করিবে। তৎকারণে পুনঃ পুনঃ বলিতেছি; তুমি তাহাকে যত্নসহকারে বিনাশ কর, করিলে অসীম ও অনন্ত সুখের অধিকারী হইবে।১০।

রামচন্দ্র! শাস্ত্রকারেরা ঐ মানস চাঞ্চল্যকেই অবিদ্যা বলেন। শাস্ত্রকারগণ যাহাকে বাসনা বলেন, তাহাও মানস চাঞ্চল্যের প্রভেদ সুতরাং

তাহাও 'অবিদ্যাপদের বাচ্য। তুমি ঐ বাসনানাম্নী অবিদ্যাকে বিদ্যার দ্বারা প্রযত্ন সহকারে বিনাশ করিবে[১১]। বিষয়ানুসন্ধান পরিত্যাগ দ্বারা বাসনানাম্নী ও অবিদ্যারূপিণী চিত্তসত্তাকে অন্তরে বিলীন করিবে। করিলে পরম শ্রেয়ঃ প্রাপ্ত হইবে[১২]। রামচন্দ্র! যাহা সৎ ও অসৎ এবং চিত্ত ও জাড্য, উভয়ের মধ্যে মধ্যবর্ত্তী অর্থাৎ সাক্ষী অথচ উভয় দিকেই লোল অর্থাৎ দোদুল্যমান, তাহাকেই তুমি মনঃ বলিয়া জানিবে। মনঃ জাড্যানুসন্ধানের দৃঢ়াভ্যাসে জাড্য প্রাপ্ত এবং বিবেকানুসন্ধানের দৃঢ়াভ্যাসে চিদংশারূঢ় হওয়াতে চিতের সহিত একত্ব প্রাপ্ত হয়[১৩]।[১৫]। পুরুষকার প্রয়োগে অর্থাৎ শাস্ত্রীয় ধ্যানাদিরূপ প্রযত্নে ঐ মনকে যাহাতেই নিবিষ্ট করিবে, অভ্যাস দৃঢ় হইলে তুমি তাহাই লাভ করিবে[১৬]। অতএব তুমি পুনঃ পুনঃ পৌরুষ অবলম্বন ও চিৎ কর্ত্তৃক চিত্তকে আক্রমণ করিয়া বিশোকপদ লাভ কর, করিয়া নিঃশঙ্ক ও সুস্থির হও।[১৭]। হে রাঘব! সংসারচিন্তায় নিমগ্ন মনকে যদি তুমি শাস্ত্রীয় উপায়ে বলপূর্ব্বক উদ্ধার না কর, তাহা হইলে তদুদ্ধারের আর অন্য উপায় নাই।[১৮]। একমাত্র মনঃই মনের নিগ্রহে সমর্থ। বল দেখি, কোন্ অরাজা রাজার নিগ্রহে সমর্থ হয়?[১৯]। অপিচ, একমাত্র মনঃই এই সংসার সমুদ্রে বিষয়তৃষ্ণারূপ কুম্ভীরাদি ভীষণ জলজন্তুগণে আক্রান্ত ও বাসনাময় আবর্ত্ত সমূহে উহ্যমান মানবগণের নৌকাস্বরূপ[২০]। মনের দ্বারাই মনোরূপ বন্ধনরজ্জু ছেদন করিয়া আত্মাকে বিমুক্ত করিতে হয়। আত্মার বন্ধনবিমোচনের অন্য উপায় দৃষ্ট হয় না[২১]। বাসনাবাসিত মনঃ যখন যখনই উদয় প্রাপ্ত হইবে অর্থাৎ যেমন যেমন বাহ্যার্থ বিষয়ে মনন বা ভাবনা উপস্থিত হইবে, বুদ্ধিমান্ পুরুষ তখন তখনই মিথ্যাবোধে সে সকল পরিহার করিবেন। বিষয়মনন পরিহার করা অভ্যস্ত হইলে অভ্যাসের ঘনতায় অবিদ্যাভিধ মনঃ বিলীন হইয়া যাইবেক[২২]। তুমি প্রথমতঃ, প্রয়াস ও ভোগবাসনা, পরে দ্বৈতবাসনা, তৎপশ্চাৎ চিত্ত ও চেত্য পরিত্যাগ করিয়া বিকল্পশূন্য অর্থাৎ কেবল চিৎস্বরূপ হও[২৩]। ভাব্যভাবনা পরিত্যাগ আর বাসনাক্ষয় সমান কথা। মনোনাশ ও অবিদ্যানাশ কথাও ঐ অর্থের বোধক[২৪]। পরমাত্মবিজ্ঞানের গোচরে যে কিছু জ্ঞাতব্য আগমন করিবে সে সকলকে প্রশ্রয় প্রদান না করিলেই অর্থাৎ আমি জানিতেছি, আমি জানিলাম, আমি করিলাম, এরূপ মনে না করিলেই ক্রমে অসম্বিত্তি অবস্থা পাইবে এবং তাহা স্থায়ী ও

হইবে। সেই স্থায়ী অসম্বিত্তির অপর নাম নির্ব্বাণ ও মোক্ষ। যত দিন না অসম্বিত্তি দশা উপস্থিত হইবে ততদিন দুঃখ পরম্পরা হইবেই হইবে[২৫]। পুরুষ আপনারি প্রযত্নে ঐরূপ অভাবন (ভাবনাবর্জ্জনরূপ মোক্ষ) সম্পাদন করিতে সক্ষম। সুতরাং তুমি উহা পুরুষকার দ্বারা আহরণ করিতে সক্ষম[২৬]। রাম! বিষয়ানুরাগ প্রভৃতি যে কিছু, সমস্তই, মানসী ইচ্ছার বিকার, এইরূপ বুঝিয়া ঐ সকল মিথ্যা কল্পনা পরিত্যাগ করিবে। এবং হর্ষশোকাদিরূপ সংস্কারের বীজস্বরূপ বা অঙ্কুরস্বরূপ মনকে সংস্কার (হর্ষ-শোকাদি রূপ দোষের উন্মার্জ্জন) করতঃ স্বস্থ ও সুখী হইবে এবং মনের সহিত সর্ব্বদা বাস পরিহার করিবে। যদি তুমি মনের সঙ্গে বসতি না কর, তাহা হইলে স্বস্থ বা স্বপ্রতিষ্ঠ হইবার অধিকারী হইবে।[২৭]।

দ্বাদশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত।

ত্রয়োদশাধিক শততম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! অভিহিত বাসনা দ্বিচন্দ্রভ্রান্তির ন্যায় মিথ্যা, সেজন্য তাহা পরিত্যাগ করা উচিত।[১]। যাহারা নষ্টপ্রজ্ঞ, তাহাদিগেরই হৃদয়ে ঐ মিথ্যাভূত বাসনা বিরাজ করে, পরন্তু যাহারা প্রাজ্ঞ, তাহাদের নিকট উহা বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় অলীক[২]। হে রাম! তুমি অজ্ঞ না হইয়া প্রাজ্ঞ হও। আকাশে যে কদাচিৎ দ্বিতীয় চন্দ্র দৃষ্ট হয় তাহা ভ্রান্তি ব্যতীত বাস্তব নহে[৩]। সেইরূপ, উক্ত চিত্তরও ব্রহ্ম, সুতরাং প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মতত্ত্ব ব্যতীত অন্য কিছু নাই। যেমন জলতরঙ্গ জলভিন্ন অন্য কিছু নহে, তেমনি, বেদ্য সকল চিৎ অর্থাৎ ব্রহ্মচৈতন্য ব্যতীত অন্য কিছু নহে[৪]। 'ভাবাভাব অর্থাৎ চিত্ত ও চৈত্ত্য সমস্তই স্বাত্মকল্পনামূলক, সেজন্য অসৎ। তুমি আর সেই নিত্য মহান্ ব্যাপী পরমাত্মায় ঐ অসৎ সবিকল্প সমারোপ করিও না[৫]। তুমি যখন কর্ত্তা নহ, তখন আর তোমার ক্রিয়ায় মমতা কি? যখন এক বৈ দ্বিতীয় নাই, তখন আর কে কি করিবে?[৬]। আমি অকর্ত্তা, এরূপ অভিমানও করিও না। কেন না, তাহাও অসৎ সুতরাং তাহাতেও কোন ফল নাই। তুমি কর্ত্তা অকর্ত্তা, এই দুই প্রকার অভিমান রহিত ও স্বস্থ হও[৭]। হে রঘুকুলপাবন রাম! যদি তুমি অভিমান পরিত্যাগে অসমর্থ হইয়া কর্ত্তা হও তাহা হইলে তুমি দোষলিপ্ত হইবে। নচেৎ অকর্ত্তা হইয়া যদি অসমর্থতা ক্রমে কর্ত্তার মত হও (কার্য্যনির্ব্বাহ কর), তাহা হইলে তোমার পক্ষে তাহা দোষাবহ নহে। কেন না, যে নিষ্ক্রিয়াত্মজ্ঞানী, সে দেহের ক্রিয়া ও কর্ত্তৃত্বাদি আত্মায় সমারোপ করে না[৮]। ক্রিয়াফল সত্য হইলে তদানার্থ কর্ম্মাসক্ত হওয়া এবং মিথ্যা হইলে তাহার হেয়তায় স্থির হওয়া সঙ্গত। যখন দেখা যাইতেছে, সমুদায় হেয়োপাদেয় ইন্দ্রজাল তখন আর উক্ত উভয়ে আস্থা কি?[৯।১০]। হে রঘুনাথ! এই যে অবিদ্যা, যাহা এই সংসারের সূক্ষ্মবীজ, ইহা অবিদ্যমান অর্থাৎ অসৎ হইলেও (না থাকিলেও) সতের ন্যায় স্ফারতা প্রাপ্ত হইয়াছে[১১]। এই যে ভোগপ্রদ সংসারাড়ম্বর, ইহা বাসনার বিকার ও চিত্তের আভোগ-

বিস্তৃতি ব্যতীত অন্য কিছু নহে। ইহা বংশ নামক উদ্ভিদের ন্যায় অন্তঃশূন্য অসার। ইহা নদীর তরঙ্গপরম্পরার ন্যায় অবিচ্ছিন্না দৃষ্ট হইলেও নশ্বরী ১২।১৩। ইহা গৃহ্যমাণ হইলেও হস্তের অগ্রাহ্য এবং মৃদু হইলেও অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। যেমন স্বপ্নদৃষ্ট নদী স্বাপ্ন স্নানপানাদি কার্য্যসাধনে সমর্থা হইলেও আকার মাত্রে (ভাবমাত্রে) পরিনিষ্ঠিত, পরন্তু প্রকৃত অর্থক্রিয়ায় পরিনিষ্ঠিত নহে, সেইরূপ, এই অবিদ্যাও বিভ্রান্ত কার্য্যসাধনে সমর্থা হইয়াও সদর্থ-ক্রিয়ায় পরিনিষ্ঠিত নহে[১৪।১৫]। এই অবিদ্যা কখন বক্র, কখন অবক্র, কখন স্পষ্ট, কখন দীর্ঘ, কখন খর্ব্ব, কখন স্থির এবং কখন চঞ্চল আকারে আবির্ভূত হইতেছে। এই যে মহাড়ম্বরযুক্ত জগচ্চক্র, ইহা যাহার প্রসাদে সমুদ্ভূত তাহা হইতেই উহা ভেদ প্রাপ্ত হইতেছে।[১৬] এই অবিদ্যা অন্তঃসার শূন্যা হইলেও সারময়ীর ন্যায় প্রতীতা হইতেছে। বস্তুতঃ উহা কোথাও নাই, অথচ সর্ব্বত্র বিদ্যমানার ন্যায় লক্ষিত হইতেছে[১৭]। চিত্তস্পন্দোপ-জীবিনী অবিদ্যা স্বয়ং জড়রূপিণী হইয়াও চিন্ময়ীর ন্যায় এবং নিমেষ অপেক্ষাও অস্থায়িনী হইয়াও চিরস্থায়িনীর ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে[১৮]। ইহা সত্ত্বগুণের সম্ভ্রমে শুভ্রবর্ণা হইয়াও তমোগুণের উদ্রেকে কৃষ্ণবর্ণা। এই অবিদ্যা পরমাত্মার সান্নিধ্যে বিবিধ বিকার প্রসব করে, এবং তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভে বিনষ্ট হয়।[১৯]। অপিচ, অবিদ্যা পরমাত্ম-রূপ নির্ম্মল আলোকে থাকিলেও ম্লানা এবং তমোরূপ অন্ধকারে অব-স্থিতি করিলেও রাজমানা। ইহা নানা বর্ণে (আকারে) বিলাস করি-লেও মৃগতৃষ্ণিকার ন্যায় শুষ্ক ও স্বরূপশূন্যা[২০]। এই তৃষ্ণারূপিণী সূক্ষ্মা অবিদ্যা কৃষ্ণসর্পিণীর ন্যায় মৃদ্বী, স্বভাবে কর্কশা ও বিষময়ী এবং ললনার ন্যায় চপলা ও লুব্ধা।[২১]। দীপ যেমন স্নেহ (তৈল) ক্ষয়ে ক্ষীণা হইয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, বর্ণিত অবিদ্যাও স্নেহ (মমতা) ক্ষয়ে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এবং বিনা রাগে (একপক্ষে বিনা স্নেহে, অন্যপক্ষে বিনা রঙে) সিন্দুরধূলীর ন্যায় বিরাজ করে[২২]। দীপের ও বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষণপ্রকাশিনী, চঞ্চলা, মুগ্ধজনগণের ভয়জননী অবিদ্যা কেবল আশার দ্বারা সজীব থাকে[২৩]। এই দুশ্চরিত্রা জীবকে যত্নপূর্ব্বক গ্রহণ করে, করিয়া দুঃখানলে দগ্ধ করে। এবং পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হয় ও আবার পুনঃ পুনঃ লয়প্রাপ্ত হয়। ইহাকে অন্বেষণ করিতে হয় না, অথচ পাওয়া যায়। আবার বিদ্যুৎ চকিতের ন্যায় বিনষ্ট হইয়া যায়।[২৪]। ইহাকে কেহ প্রার্থনা করেনা, অথচ এ

উপস্থিতা হয়। ইহাকে রমণীয় মনে করা যায়, অথচ এ শত অনর্থের প্রদায়িনী। যেমন অকালজাত কুসুমের মালা দেখিতে সুন্দর হইলেও অমঙ্গলের কারণ, তেমনি, অবিদ্যাও ভবিষ্যৎ অনর্থের কারণ[২৫]। দুঃস্বপ্ন যেমন অনর্থের সূচক এবং তাহার বিস্মৃতি যেমন সুখের কারণ, তাহার ন্যায় এই অবিদ্যাও, অনর্থের জননী এবং তাহার অত্যন্ত বিস্মরণ সুখাবহ[২৬]। ইহা মুহূর্ত্তমধ্যে ত্রিজগৎরূপ ধারণ করিয়া পুনর্ব্বার তাহা ক্ষণমধ্যে গ্রাস করিয়া থাকে[২৭]। ইহারই প্রভাবে লবণ রাজার এক মুহূর্ত্তে বৎসরসমূহ ও হরিশ্চন্দ্রের এক রাত্রে দ্বাদশ বৎসর অনুভূত হইয়াছিল।[২৮]। ইহারই প্রভাবে বিরহী দিগের এক রাত্রি এক বৎসরের অধিক বলিয়া অনুভূত হয়[২৯]। এবং দুঃখিত দিগের জীবিতকাল দীর্ঘ এবং সুখী দিগের সময় হ্রস্ব হইয়া থাকে।[৩০]। এই শক্তিরূপিণী অবিদ্যার বাস্তব কর্তৃত্ব না থাকিলেও তাহার সত্তা বা সান্নিধ্য হেতু ব্রহ্মে জগৎ সৃষ্টি হয়।[৩১]। চিত্রলিখিত বা চিত্রবিস্তৃত স্ত্রীলক্ষণান্বিত নারী যেমন স্ত্রীকার্য্য (গৃহকার্য্যাদি) করে না, তেমনি, এই অবিদ্যাও কোন কিছু সৃষ্টি করে না। কারণ এই যে, অবিদ্যা কেবল পূর্ব্বানুভূতবাসনাময়ী[৩২]। যেহেতু তাহার আকার মনোরাজ্যের অনুরূপ সেই হেতু তাহাতে অল্পমাত্রও সত্তা নাই। সুতরাং তাহা অলীক পদার্থ[৩৩]। মৃগতৃষ্ণিকা মিথ্যা আড়ম্বর সম্পন্না, অথচ মৃগ দিগকে প্রতারিত করে। এই অবিদ্যাও তেমনি, মোহগ্রস্ত মানবদিগকে বিড়ম্বিত করে[৩৪]। ফেনবুদ্বুদাদিতুল্য, উৎপত্তিধ্বংসশালিনী, নীহারসদৃশী, ও চাঞ্চল্যবতী এই অবিদ্যা অবিচ্ছেদে বহমানা হইতেছে অথচ কিছু গ্রহণ করিতেছে না[৩৫]। এই অবিদ্যাই ধুলিধুসরমূর্ত্তি প্রচণ্ড মল্লের ন্যায় রজোগুণধুসরা হইয়া কল্লান্তপবনের ন্যায় বলদ্বারা ভুবনান্তর আক্রমণ করিয়া থাকে[৩৬]। এই দাহসদৃশ খেদপ্রদায়িনী অবিদ্যা জীবে সঙ্গতা হইয়া তাহাদের পরমাত্মরূপ রস পান করতঃ সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করে[৩৭]। এই অবিদ্যা মৃণালিনীর ন্যায় বহুছিদ্রা (দোষসম্পন্না) পঙ্ক (পাপ) সংলগ্না ও জড়াত্মিকা। ধারাজলের ন্যায় আয়তা (দীর্ঘা), তৃণনির্ম্মিত রজ্জুর ন্যায় সংসারসংস্কারে সুদৃঢ়া, পরিবল্গিত তরঙ্গে উৎপলমালার ন্যায় কল্পিতরূপিণী।[৩৮]।[৩৯]। হে রাঘব! জনগণ ইহাকে বর্দ্ধনশীল অবলোকন করে, পরন্তু উহা বর্দ্ধিত হয় না।[৪০] অপিচ, বিষমিশ্রিত মোদকের ন্যায় আপাত মধুরা অথচ পরিণামে অত্যন্ত দারুণা।

৪১। তত্ত্বজ্ঞানপ্রসঙ্গে ইহা যে কোথায় গমন করে তাহা জানা যায় না। যেমন নীহারধূম দেখা যায়, এবং পুনঃ বিনষ্ট হয়, অবিদ্যা ঠিক তদনুরূপা।[৪১] ইহা দ্বিচন্দ্রমোহরূপে উৎপন্ন হইয়া স্বপ্নবৎ সংভ্রম উৎপাদন করে। ধূলিনিক্ষেপ করিয়া দৃষ্টি পরিচালন করিলে যেমন আকাশে পরমাণু সম্বন্ধীয় নৈল্য দৃষ্টিগোচর হয়, তাহার ন্যায় এই অবিদ্যাও বৃথা অনুভূতিগোচর হইয়া থাকে। নৌকারোহীরা যেমন স্থাণুর (মুড়া গাছ) পরিভ্রমণ দর্শন করে, তাহার ন্যায় জনগণ ইহাকে পরিদৃশ্যমান হইতে দেখে[৪২]।[৪৩]। এই অবিদ্যা যখন চিত্তকে উপহত (আচ্ছন্ন) করে, তখনই জনগণ এই স্বপ্নবিভ্রমরূপ দীর্ঘসংসার দর্শন করে।[৪৪]। সমুদ্রে যেমন তরঙ্গ জন্মে, তাহার ন্যায় অবিদ্যোপহত চিত্তে বিবিধ বিভ্রম জন্মে, আবার বিলীন হয়।[৪৫]। অবিদ্যা একভাবে সত্যও বটে; মনোজ্ঞও বটে; এবং অন্যভাবে অসত্যও বটে; অমনোজ্ঞও বটে। অর্থাৎ ব্রহ্মভাবে সত্য ও মনোজ্ঞ এবং অব্রহ্মভাবে অসত্য ও অমনোজ্ঞ।[৪৬]। এই মহা-পরাক্রমশালিনী বাসনারূপিণী অবিদ্যা পদার্থরূপ (বিষয়) রথে আরোহণ করতঃ বাগুরা দ্বারা (বাগুরা=জাল) বিহগ আক্রমণের ন্যায় চিত্ত আক্রমণ করিয়া থাকে[৪৭]। এই অবিদ্যা করুণোৎফুল্লনয়না স্নেহসমুল্লাসিতা জননী ও গৃহিণীর অনুরূপা।[৪৮]। এই অবিদ্যা ত্রিজগৎশীতলকারী সুধার্দ্র চন্দ্র-কিরণকেও ক্ষণমধ্যে বিষরূপে পরিণামিত করিয়া থাকে।[৪৯]। স্থাণুরাও ইহার প্রভাবে ভূত প্রেত পিশাচ হয়, এবং সন্ধ্যাদিকালে বালুলোষ্ট্রাদিও সর্প ও অজাগরাদিরূপে প্রতীয়মান হয়[৫০]।[৫১]। এই উন্মত্তস্বভাবা অবি-দ্যার প্রভাবে একই বস্তু দ্বিধারূপে সমুদিত এবং স্বপ্নে স্বমরণ অনুভবের ন্যায় দূরও সমীপ বলিয়া অনুভূত হয়।[৫২] একটী সুদীর্ঘকালও ক্ষণ এবং ক্ষণও সুদীর্ঘ (বৎসর) হইয়া থাকে।[৫৩]।

হে রাঘব! অকিঞ্চন অর্থাৎ তুচ্ছ অবিদ্যার আশ্চর্য্য শক্তির কথা কি আর অধিক বলিব। অবিদ্যা যাহা না করে বা করিতে পারে এমন কিছুই নাই[৫৪]। যেমন বিবেকবুদ্ধি বিষয়বুদ্ধিকে সংরুদ্ধ করে, যেমন স্রোতঃ রুদ্ধ হইলে নদী শুকাইয়া যায়, তেমনি, বিচারণায় ঐ অবিদ্যার নিরোধ এবং অবিদ্যার নিরোধে মনের অভাব হইয়া থাকে[৫৫]।

রাম বলিলেন, কি আশ্চর্য্য! অবিদ্যমান, সুতরাং তুচ্ছ, অথচ মনোজ্ঞ অথচ মিথ্যাজ্ঞান, এরূপ রূপিণী অবিদ্যা সর্ব্বাশ্রয় আত্মাকে অন্ধীভূত করিয়া

রাখিয়াছে।৫৬। রূপ নাই, রস নাই, আকার নাই, চেতনা নাই, সত্যতাও নাই, বিনাশ প্রাপ্তও হয় নাই, অথচ সে জগৎ অন্ধীকৃত করিয়া রাখিয়াছে।৫৭। আরও অদ্ভুত এই যে, যে ত্রিজগৎ অন্ধীভূত করিয়াছে তাহা আলোকে বিনষ্ট হয় অথচ অন্ধকারে স্ফুরিত হয়। আমি দেখিতেছি, অবিদ্যা পেচক চক্ষুর সমধর্ম্মিণী। (দিবান্ধ পেচকেরা সূর্য্যের আলোকেও অন্ধকার দেখে)।৫৮। কুকর্ম্মে রত ও বোধ বিলোকনে অসমর্থ, জ্ঞানশক্তির অভাবে স্বীয় দেহ পর্য্যন্তও অপরিজ্ঞাত, অথচ সে ত্রিজগৎ অন্ধীকৃত করিয়াছে ইহা সামান্য আশ্চর্য্য নহে৫৯। অনাচাররতা ও মূঢ় জীবের কমনীয়া, অসত্যা, প্রবাহরূপিণী, দুঃখময়ী, মৃতকল্পা ও বোধবর্জিতা অবিদ্যা যে, জগৎ অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে, ইহা সমধিক আশ্চর্য্যের বিষয় বটে ৬০।৬১। কাম ও ক্রোধ যাহার অঙ্গ, তমঃ যাহার মুখ, সে যে ক্ষণমধ্যে ত্রিজগৎ অন্ধীভূত করে, ইহা অল্প আশ্চর্য্য নহে৬২। যাহার আশ্রয় বা আবাস স্থান অজ্ঞ জীব, যে জরা ও জাড্যজীর্ণা, যে দীর্ঘপ্রলাপবাদিনী, সে যে ত্রিজগৎ অন্ধ করে, ইহা অপেক্ষা অধিক আশ্চর্য্য আর কি হইতে পারে৬৩। আরও আশ্চর্য্য এই যে, যে পুরুষের অঙ্গসঙ্গিনী ও অনুরাগিনী, যে বিকল্পরচনার তত্ত্ববিচার মাত্রে পলায়ন করে, যে অচেতনস্বভাবা, সেই নশ্বরী আবরণশক্তিসমন্বিতা স্ত্রীরূপিণী অবিদ্যা পুরুষকে একবারে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। হে ব্রহ্মন্! দুশ্চেষ্টা ও দুঃশীলা বিলাসকারিণী জন্মমরণাদিদুঃখ প্রদায়িনী ও মনোনিলয়া বাসনা কি প্রকারে ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে তাহা আমাকে বলুন৬৪।৬৭।

ত্রয়োদশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশাধিক শততম সর্গ।

রামচন্দ্র বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! পুরুষের যে অবিদ্যা জনিত অন্ধতা, তাহা কি প্রকারে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তাহা আমাকে বলুন।১। বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! যদ্রূপ নীহার ভাস্করের আলোকে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ, পরমাত্মার অবলোকনে ঐ অবিদ্যা ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে২। যত দিন না মোহক্ষয়কারিণী, অবিদ্যাবিনাশসাধনা শুভ্রা (নির্ম্মলসত্ত্বরূপা) আত্মদর্শনেচ্ছা উদিত হয়, তত দিন ঐ অবিদ্যা এই নিচ্ছিদ্র ও দুঃখ-কণ্টকাবিল সংসাররূপ গিরিপ্রপাতে দেহাভিমানী আত্মাকে পাতিত করিয়া পুনঃ পুনঃ বিলুণ্ঠিত ও বিক্ষোভিত করে৩।৪। হে রামচন্দ্র! যদ্রূপ ছায়াদি আতপ দেখিতে ইচ্ছা করিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ, এই অবিদ্যাও আত্মদর্শন মাত্রে বিনষ্ট হইয়া যায়।৫। পূর্ব্বাদি দিগ্বিভাগে অর্ক সমুদিত হইলে যেমন অন্ধকার দূরীভূতা হইয়া যায়, তেমনি, সর্ব্বগত পরমাত্ম-বিষয়ক বোধ উদিত হইলে অবিদ্যা স্বয়ং আশু বিলীন হইয়া যায়৬। হে রামচন্দ্র! যাহা ইচ্ছা, তাহাই অবিদ্যা এবং তাহারই বিনাশ মোক্ষ। মোক্ষ, সঙ্কল্পমাত্র পরিত্যাগ দ্বারা সিদ্ধ হইয়া থাকে৭। মনোরূপ আকাশে সৃষ্ট্যাদি বাসনারাত্রির অবসানে যদি অল্পমাত্রও চিদাদিত্যের উদয় হয়, তাহা হইলে তন্মুহূর্ত্তে তত্রস্থ কালিমা তনুতা (সূক্ষ্মতা) প্রাপ্ত হয়।৮। দিনকর সমুদিত হইলে তমস্বিনী রজনীর ন্যায়, বিবেকের উদয়ে উক্তবিধ অবিদ্যা লয় পাইয়া থাকে।৯। সন্ধ্যাকালেই বেতালবাসনান্বিত (ভূতের ভয়যুক্ত) শিশুর চিত্তে বেতালভয় (ভূতের ভয়) নিবিড় হইয়া থাকে, অন্য সময়ে নহে। সেইরূপ, সংসারবন্ধনও চিত্তস্থ বাসনার প্রাচুর্য্যে নিবিড় হয়, বাসনার ক্ষয়কালে নহে।১০।

রাম বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! বুঝিলাম, এই পরিদৃশ্যমান সকল বস্তুই অবিদ্যার রূপ এবং এ সমস্তই আত্মভাবনা দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। পরন্তু ভাব্যমান পরমাত্মা (পরমেশ্বর আত্মা) কিরূপ এক্ষণে তাহা আমাকে উপদেশ করুন?১১। বশিষ্ঠ বলিলেন, হে অনঘ! যাহা বিষয়ব্যাপ্তি (সম্পর্ক)

রহিত, অবিদ্যাসম্পর্ক বর্জ্জিত অর্থাৎ অবিদ্যার আবরণ ও বিক্ষেপ উভয় পরিশূন্য, সর্ব্বত্রাবস্থিত অর্থাৎ পূর্ণস্বভাব ও আখ্যা (নাম) বর্জিত, সেই চিন্ময় আত্মা পরমেশ্বর।[১২]। এই যে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা হইতে তৃণ পর্য্যন্ত সুবিস্তীর্ণ জগৎ, এ সমস্তই আত্মা[১৩]। শ্রুতির উপদেশ—এ সমস্তই উদয়াস্ত বর্জিত ঘনচিৎ ব্রহ্ম, তাঁহাতে মনোনাম্নী কল্পনার অনস্তিতা।[১৪]। এই জগত্রয়ের কোনও কিছু জন্মে না ও মরে না। যাহা জন্মে ও মরে তাহার সত্তা নাই অর্থাৎ তাহা কেবল মায়িক প্রতিভাস (ভ্রান্তি) মাত্র[১৫]। ব্রহ্ম কেবল অর্থাৎ বিশেষণবর্জিত, সর্ব্বকারণ, বিক্ষত, ও বিষয়সম্পর্কাতীত। ঈদৃশ ব্রহ্মনামক চিদ্বস্তুই আছে, তাহারই সত্তা, অবশিষ্ট প্রতিভাস মাত্র, সুতরাং সে সকলের সত্তা সত্তা নহে।[১৬]। সেই নিত্য, মহান্ ব্যাপী, শুদ্ধ, নিরুপদ্রব, শান্ত, নির্ব্বিকার ও চিদ্রূপ অধিষ্ঠানে যে চিৎস্বভাবের বিরোধী আবরণ রূপ প্রথম উল্লাস ও বিক্ষেপ বিশেষের কল্পনা আপনি সমুদিত হয়, তাহাই অধ্যাত্মশাস্ত্রের মনঃ[১৭]।[১৮]। সেই সর্ব্বগ সর্ব্বশক্তি মহাত্মা মনোদেব হইতে সমুদ্রসমুত্থিত লহরীর ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ কল্পনা সকল নিষ্পন্ন হইয়াছে।[১৯]। সেই বিতত পরম শান্ত পরমাত্মায়, যাহাতে বস্তুতঃ কিছুই নাই, তাহাতে কেবলমাত্র বিক্ষেপ (বিক্ষেপ=সৃষ্টি) কল্পনায়, এ সকল সিদ্ধবৎ উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং যেমন বায়ুতে বেগ উৎপন্ন হয়, আবার বায়ুতেই তাহা বিলীন হয়, সেইরূপ, এই সঙ্কল্পময় সংসারও সঙ্কল্পের দ্বারা উৎপন্ন ও সঙ্কল্পান্তে বিনাশ প্রাপ্ত হয়[২০]।[২১]। ভোগারূপিণী অবিদ্যা পৌরুষোদ্যোগসিদ্ধ অসঙ্কল্পন অর্থাৎ সঙ্কল্প পরিত্যাগ দ্বারা বিলীন বা লুক্কায়িত হইয়া থাকে, অন্য কিছুতে নহে।[২২]। জনগণ, আমি ব্রহ্ম নহি, এইরূপ সঙ্কল্পে বদ্ধ এবং কেবল আমি নহি, সমস্তই বদ্ধ, এইরূপ সঙ্কল্পে মুক্ত হইয়া থাকে[২৩]। রাম! সঙ্কল্পই বন্ধন এবং অসঙ্কল্পই মোক্ষ; ইহা অবগত হইয়া তুমি অন্তঃস্থ সঙ্কল্প জয় করিয়া পরে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিও[২৪]। আকাশে কিছুই নাই, অথচ অজ্ঞ লোক তাহাতে ভ্রান্তির প্রতারণায় নানারূপ (রঙ্) দর্শন করে। সুবর্ণের "পঙ্ক (কর্দ্দম), তদুদ্ভব পদ্ম, তাহাতে বৈদূর্য্যমণির ভ্রমর, তাহার সুরভিতে দিঙ্মণ্ডল সুবাসিত, এবম্বিধ হেমনলিনী স্বীয় সুবিস্তীর্ণ মৃণাল উর্দ্ধীকৃত করিয়া হাস্য করিতেছে।" এইরূপ বিকল্প জাল যেমন বালকগণ কর্ত্তৃক মনের ইচ্ছাপূরণের নিমিত্ত সত্যরূপে কল্পিত হয়, তদ্রূপ, মুগ্ধ লোকেরা

বর্ণিত প্রকারের অবিদ্যাকে স্বীয় দুঃখের নিমিত্তই কল্পনা করিয়া থাকে[২৭।২৮]। জীবগণ আমি দুঃখী, আমি কৃশ, আমি বদ্ধ এবং আমি হস্তপদাদিমান্ মনুষ্য, ইত্যাদিবিধ মনোভাবে ও তদনুরূপ ব্যবহারে লিপ্ত থাকায় বদ্ধ এবং আমি নির্দুঃখস্বভাব, আমি মুক্তস্বভাব, আমি কোনও কালে বদ্ধ নহি, আমি অদেহ, ইত্যাদিবিধ অসন্দিগ্ধভাবের ও ব্যবহারের দ্বারা মুক্ত হয়[২৯]। [৩০]। 'আমি মাংস নহি, অস্থি নহি; দেহও নহি,—আমি দেহাদি হইতে ভিন্ন, এইরূপ দৃঢ়নিশ্চয়বান্ অন্তঃকরণকে ক্ষীণা অবিদ্যা বলে।[৩১]। আকাশের কোন বর্ণ নাই, অথচ তাহাতে অজ্ঞ লোক কালিমা কল্পনা করে। ঐ কালিমাকে কেহ সুমেরু শৈলের বৈদূর্য্য শৃঙ্গের প্রতিভাস (ছায়া) এবং কেহ বা সূর্য্যকিরণের অপ্রাপ্তি স্থান বলিয়া বর্ণনা করেন। পৃথিবীস্থ জনগণের ঐ কল্পনা যদ্রূপ, চিদাত্মার সম্বন্ধে অজ্ঞগণের অবিদ্যার কল্পনাও তদ্রূপ[৩২]। [৩৩।৩৪]।

রামচন্দ্র বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! আকাশে যে নীলিমা দৃষ্ট হয়, তাহা সুমেরু শৈলের বৈদূর্য্য শৃঙ্গের প্রতিচ্ছায়া বলিয়া বিবেচনা হয় না। অথবা সূর্য্যরশ্মির অভাবঘটিত তিমিরের প্রতিভাস বলিয়াও মনে হয় না। সুতরাং উহার তত্ত্ব কি? তাহা আপনি আমাকে বলুন।[৩৫]।* বশিষ্ঠ বলিলেন, শূন্য স্বভাব ব্যোমে লেশমাত্রও নীলগুণ নাই। আকাশে যে নীলিমা দৃষ্ট হয় তাহাতে রত্নান্তরের প্রভার সংশ্লেষ না থাকায় উহা সুমেরুর বৈদূর্য্য

* দৃষ্টি প্রসারিত করিলে উর্দ্ধাকাশ প্রগাঢ় নীলবর্ণ বলিয়া বোধ হয়, অথচ আকাশের কোন রঙ নাই। সেইজন্য পণ্ডিতগণ অনুমান করেন, আকাশের ঐ নীলিমা ঔপাধিক। অর্থাৎ উহা আকাশাতিরিক্ত অন্য কোন পদার্থের প্রতিভাস বা প্রতিচ্ছায়া। এই বিষয়ে যোগিগণের অনুমান বা কল্পনা—সুমেরুর উর্দ্ধ শৃঙ্গ ইন্দ্রনীলমণিময়, তাহারই প্রভা প্রতিক্ষিপ্ত হইয়া উর্দ্ধাকাশের গায় নৈল্য প্রদর্শন করায়। জ্যোতির্বিদ্‌গণ বলেন, অতি দূরত্ব কারণে সূর্য্যের রশ্মি ব্রহ্মাণ্ডকর্পরের সন্নিধিস্থ তিমির নাশ করিতে পারে না, সুতরাং সেই তিমিরের প্রতিবিম্ব উর্দ্ধাকাশে ভূমিস্থ জনগণ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয়। দর্শনশাস্ত্র লেখকেরা বলেন, ঐ নীলিমা উর্দ্ধপাতী পার্থিব চ্ছায়ার দ্বারা সম্পন্ন হয়। এই তিন কল্পনার কোনও কল্পনা রামের সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা না হওয়ায় রাম ঐ নৈল্যতত্ত্ব জানিতে চাহিলে বশিষ্ঠ তাঁহার প্রত্যুত্তরে বলিলেন, জীবগণের দৃষ্টিশক্তি কুণ্ঠিত হইলে অর্থাৎ সামর্থ্যবিহীন হইলে বস্তুদর্শনাভাবরূপ তমঃ প্রস্ফুরিত হয়। সেই তমঃ (আলোকাভাবরূপ অন্ধকার) আকাশের কালিমা বলিয়া অজ্ঞ লোকের জ্ঞানে আরূঢ় হয়। ফলকথা এই যে য পক্ষই হউক সমুদায় পক্ষই ভ্রান্তিকল্পিত।

শৃঙ্গের প্রতিভাসও নহে।[৩৫]। ব্রহ্মাণ্ডখর্পরও তেজোময়। তেজঃপদার্থও প্রসরণস্বভাব। সুতরাং ঐ নৈল্য অণ্ডপ্রান্তস্থ অন্ধকারও নহে।[৩৬]। † বস্তুতঃ আকাশ কেবল অসীম শূন্য এবং অবিদ্যার অনুরূপা সখী[৩৮]। তবে যে উহাতে নৈল্য দেখা যায়, তাহার কারণ এই—চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দর্শনশক্তি অসীম নহে, পরন্তু সসীম। সেইজন্য দৃষ্টি যত দূর যায় তত দূর নৈল্য দর্শন হয় না। যে স্থানে গিয়া দৃক্‌শক্তির প্রতিঘাত হয়, অথবা দৃষ্টির দৃশ্যদর্শন শক্তি ফুরাইয়া যায়, সেই স্থানেই নীলবর্ণ দৃষ্ট হয়। সুতরাং ঐ নৈল্য নিজেরই চাক্ষুষ জ্যোতির অভাবমূলক। অর্থাৎ নিজের চাক্ষুষ তিমির আকাশে আরোপ করিয়া অজ্ঞ লোক বলিয়া থাকে, আকাশ নীলবর্ণ। বস্তুতঃই চাক্ষুষ তেজের অব্যাপ্তি স্থান অন্ধকার সুতরাং সে অন্ধকার নিজেরই চক্ষুর দোষ। অজ্ঞলোক তাহা না জানিয়াই বলে আকাশ নীল[৩৯]। ফলিতার্থ—দৃষ্টিদোষপ্রযুক্তই আকাশে কালিমা লক্ষিত হইয়া থাকে; বস্তুতঃ তাহা আকাশের কালিমা নহে। অতএব, আকাশে কালিমা দৃষ্ট হইলেও যেমন তদভিজ্ঞ লোকের কালিমা বুদ্ধি হয় না, সেইরূপ, অবিদ্যা তিমিরকেও তুমি আকাশ-নৈল্যের অনুরূপ করিয়া অবগত হও[৪০]। পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, অবিদ্যা নিগ্রহের (বিনাশের) উপায় সঙ্কল্প বর্জ্জন, তাহাও দুষ্কর নহে; প্রত্যুত সুকর।[৪১]। হে সাধো! আকাশবর্ণ-সদৃশ ভ্রমাত্মক জগৎকে বিস্মৃত হওয়াই শ্রেয়স্কর।[৪২]। যেমন "আমি নষ্ট হইলাম" এইরূপ সঙ্কল্পে নষ্ট ও "আমি প্রবুদ্ধ" এইরূপ সঙ্কল্পে প্রবুদ্ধ ও সুখী হওয়া যায়, তেমনি, মূঢ়সঙ্কল্পের দ্বারা মূঢ়তা ও বোধসঙ্কল্পের দ্বারা প্রবোধ (তত্ত্বজ্ঞান) জন্মিয়া থাকে[৪৩]।[৪৪]। অবিদ্যার ক্ষণমাত্র স্মরণও (আমি অজ্ঞ এইরূপ অনুধ্যানও) দোষাবহ এবং তাহার ক্ষণ-বিস্মরণও তাহার নাশক[৪৫]। এই নশ্বরী অবিদ্যা সকল ভাবের উৎপত্তিকারিণী

† ভাবার্থ এই যে, সুমেরুশৃঙ্গের প্রতিভাস হইলে তত্রস্থ রত্নান্তরের প্রতিভাসও লক্ষিত হইত। সূর্য্যরশ্মির অপ্রচার নিবন্ধন ব্রহ্মাণ্ড প্রান্তের অন্ধকার হইবারও সম্ভাবনা নাই। কেন না, শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, ব্রহ্মাণ্ডকর্পর তেজোময়। এই বিষয়ে মনুর উক্তি—"তদণ্ডমভবদ্ধৈমং সহস্রাংশুসমপ্রভম্" ইত্যাদি। পৃথিবীচ্ছায়া শঙ্কাও সম্ভব হয় না। কেন না, শূন্যস্বভাব গগনে ছায়ার অবস্থিতি সম্ভবে না। অতএব, নিজের দৃষ্টি যে পর্য্যন্ত আলোকিত করে তাহারই পরে যখন নৈল্য দর্শন হয় তখন অবশ্যই বুঝা যায়, গগনের নীলিমা নিজেরই চাক্ষুষ তিমির।

ও সর্ব্বভূতবিমোহিনী বলিয়া উক্ত হইয়াছে এবং আত্মার অদর্শনে উহার বিস্তৃতি ও আত্মার দর্শনে উহার বিনাশ হইয়া থাকে।[৪৬] মন যাহা অনুসন্ধান করে, ইন্দ্রিয়গণ মন্ত্রিগণের রাজাজ্ঞা সাধনের ন্যায় তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করে[৪৭]। অতএব, যিনি মনকে কোন কিছুর অনুসন্ধান না করিতেদেন, তিনিই ইন্দ্রিয়বৃত্তিবর্জ্জিত হইয়া "অহং ব্রহ্ম" এইরূপ ভাবনার দ্বারা পরমা শান্তি লাভে সমর্থ হন[৪৮]। এই দৃশ্যজাল যখন পূর্ব্বে কখন উৎপন্ন হয় নাই, তখন বুঝিতে হইবে, ইহা বর্ত্তমানেও বিদ্যমান নাই। অপিচ, যাহা যাহা প্রতিভাত হয়, সমস্তই সেই শান্ত ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছু নহে[৪৯]। এ পর্য্যন্ত যে মনের বর্ণন করিলাম, তাহাও আদ্যন্তবিবর্জ্জিত নিত্যব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে।[৫০]। অতএব, যৎপরোনাস্তি পৌরুষ অর্থাৎ উৎকট শাস্ত্রীয় প্রযত্ন এবং শাস্ত্রীয় বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া চিত্ত হইতে ভোগবাসনার ভাবনাকে (অনুধ্যানকে) সমূলে উন্মূলিত করা কর্ত্তব্য[৫১]। জনগণের এই যে জরামরণাদির কারণীভূত পরম মোহ উদিত রহিয়াছে ইহাও বাসনার বিজৃম্ভণ। কেন না, বাসনাই সেই সেই মোহকারণের আকারে সমুদিত হইয়া শত শত আশা পাশ দ্বারা উল্লসিত হইতেছে।[৫২]। বাসনাই "এই আমার পুত্র" "এই আমার ধন" "এই আমি" এইরূপ এইরূপ বা ইত্যাদিবিধ ইন্দ্রজাল বিস্তার করিতেছে[৫৩]। বায়ু যেমন জলে তরঙ্গ জন্মাইয়া তাহাতে দূরস্থ পথিকের সর্পভ্রান্তি জন্মায়, সেইরূপ, বাসনাই পরমাত্মায় অহম্ভাবরূপ অহির (সর্পের) কল্পনা করাইতেছে[৫৪]। হে অমরপ্রভ রাম! আমার, আমি, ইহা, এ সমস্তই কল্পনা। কিন্তু যাহা ঐ সকলের আধার, তাহা আত্মতত্ত্ব ব্যতীত অন্য কিছু নহে[৫৫]। আকাশ, অদ্রি, দিব্, উর্ব্বী ও নদীশ্রেণী প্রভৃতি সমস্তই অবিদ্যা। কেন না, অবিদ্যাই ঐ সকল ভিন্ন ভিন্ন নামে ও পদার্থে পরিবর্ত্তিত হইতেছে[৫৬]। যেমন রজ্জুর অজ্ঞানে ভুজঙ্গভ্রান্তি, তাহার ন্যায় আত্মার অজ্ঞানে অবিদ্যার উদয়। যেমন রজ্জুর জ্ঞানে ভুজঙ্গের তিরোভাব, তেমনি, আত্মজ্ঞানে অবিদ্যার বিলয়।[৫৭]। হে রামচন্দ্র! যাহারা অজ্ঞ, তাহাদিগেরই অবিদ্যা এবং তাহাদিগেরই নিকট আকাশ, পর্ব্বত, সমুদ্র ও পৃথিবী প্রভৃতি বিদ্যমান। পরন্তু যাহারা জ্ঞানী, তাহাদিগের নিকট এ সকল ব্রহ্ম।[৫৮]। অজ্ঞেরাই ইহা রজ্জু, ইহা সর্প, এইরূপ ভেদ কল্পনা করে, কিন্তু যাহারা জ্ঞানী, তাহাদিগের নির্ণয়ে এক অকৃত্রিম চিন্ময় ব্রহ্ম ব্যতীত বস্তুস্তর নাই।[৫৯]। তাই বলিতেছি,

তুমি অজ্ঞ হইওনা, প্রাজ্ঞ হও। সংসারবাসনা ত্যাগ কর। অজ্ঞেরা যেমন অনাত্মদেহে আত্মভাব স্থাপন করিয়া শোকাদি অনুভব করে, তাহার ন্যায় তুমি বৃথা শোক করিও না৬০। রাম! ভাবিয়া দেখ, যাহার জন্য তুমি সুখদুঃখে পরিভূত হইতেছ, সেই জড় ও মূক দেহ কি তোমার? কিসে তোমার? যেমন জতু ও কাষ্ঠ অথবা যেমন কুণ্ড (আধারপাত্র) ও বদর একযোগ হইয়া থাকিলেও বস্তুতঃ এক নহে; সেইরূপ, দেহ ও দেহী প্রশ্লিষ্ট থাকিলেও এক নহে৬১।৬২। যেমন ভস্ত্রা (কর্ম্মকারের জাঁতা) দগ্ধ হইলে তদন্তর্গত বায়ু দগ্ধ হয় না, তেমনি, দেহ বিনষ্ট হইলেও এতদধিষ্ঠিত আত্মা বিনষ্ট হন না৬৩।

হে রঘুনাথ! আমি দুঃখী, আমি সুখী, এই জ্ঞানকে মৃগতৃষ্ণার অনুরূপ ভ্রান্তি বিশেষ বিবেচনা করিয়া পরিত্যাগ কর, এবং যাহা সত্য, তুমি তাহারই আশ্রয় লও৬৪। অহো! যাহা সত্য ব্রহ্ম, নরগণ তাহা বিস্মৃত হইয়াছে, অধিকন্তু যাহা অসত্য অবিদ্যা, তাহারই স্মরণ করিতেছে৬৫। রঘুনাথ! তুমি অবিদ্যাকে অবসর প্রদান করিও না। কারণ, চিত্ত অবিদ্যায় উপহত হইলে নানাপ্রকার পরাভব ঘটনা হয়৬৬। ঐ অবিদ্যা সর্ব্বতোভাবে মিথ্যা ও অনর্থকারিণী। উহা বৃথা মনোবৃত্তির দ্বারা স্থূল বা বর্দ্ধিত হয়, হইয়া দুঃখ ও মোহ উৎপাদন করে।৬৭। এবং উহারই কল্পনায় জীবগণ সুধার্দ্র চন্দ্রবিম্বকেও রৌরব কল্পনা করতঃ নরকদাহ অনুভব করে৬৮। তথা উহারই প্রভাবে মূঢ় জীবেরা কুমুদকুসুমমকরন্দবাহী কল্লোলযুক্ত সরোবরকে মৃগতৃষ্ণাযুক্ত মরুরূপে দর্শন করে, আবার মরুস্থলীকেও তরঙ্গিণী জ্ঞান করে, এবং স্বপ্নাদি সময়ে আকাশে নগরনির্ম্মাণাদি ভ্রমপরম্পরা দর্শন করে৬৯।৭০। চিত্ত যদি সংসারবাসনায় পরিপূর্ণ না হয়, তাহা হইলে কি জাগ্রৎ কি স্বপ্ন কোনও কালে কোনও প্রকার বিপদ ঘটনা হয় না।৭১। মিথ্যাজ্ঞান বর্দ্ধিত হইলে প্রমোদকাননেও রৌরব-নরকশাসন অনুভূত হয়৭২। চিত্ত অবিদ্যায় বিদ্ধ হইলে মৃণালতন্তু মধ্যেও সংসারসমুদ্রের মহাড়ম্বর দৃষ্ট হয়, সিংহাসনোপবিষ্ট রাজাও চণ্ডালত্ব অনুভব করেন৭৩।৭৪। রাম! আমি তোমাকে প্রোক্ত কারণে পুনঃ পুনঃ বলিতেছি, তুমি ভববন্ধনী বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপ্রাপ্ত প্রতিবিম্ব স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ ও স্বস্থ হইয়া অবস্থিতি কর৭৫। তুমি কার্য্যে অবস্থান কর, তাহা নিষেধ্য নহে; পরন্তু তাহাতে তোমার যেন রঞ্জনা না হয়। স্ফটিক যেমন

শীতাবস্থ সমূহ গ্রহণ করে, পরন্তু তাহাতে সমাসক্ত বা লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ, তুমিও রাগশূন্য হইয়া কার্য্যে অবস্থিতি কর৭৬।

যদি তুমি বিদিতব্রহ্ম তত্ত্বদর্শিগণের নিকট অবস্থান করতঃ তাঁহাদিগের সহিত পুনঃ পুনঃ বা সর্ব্বদা "আমি ব্রহ্ম" এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয়বান্ হও, আর অবিদ্যা-ক্রিয়াবিহীন হইয়া সর্ব্বত্র সমদর্শী সুশীল ব্রহ্মবুদ্ধি ও ব্রহ্ম ব্যবহারপরায়ণ হও, তাহা হইলে তুমি জীবন্মুক্ত হইয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের সহিত সমভাব প্রাপ্ত হইবে।৭৭।

চতুর্দ্দশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চদশাধিক শততম সর্গ।

বাল্মীকি বলিলেন, হে ভরদ্বাজ! মহাত্মা বশিষ্ঠ এই কথা কহিলে কমলপত্রাক্ষ রাম পদ্মের ন্যায় প্রফুল্ল হইয়া উৎকৃষ্ট শোভা ধারণ করিলেন[১]। পদ্ম যেমন নিশান্তে সূর্য্যালোক দর্শনে প্রমুদিত ও শোভা প্রাপ্ত হয়, তাহার ন্যায় তিনি অন্তঃকরণের বিকাশে সমাশ্বস্ত হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন[২]। পরে বোধোদয় হেতু জাতবিস্ময় হইয়া ঈষৎ হাস্যে সভাস্থল শুভ্রীকৃত করতঃ সুধাধৌত বাক্য সকল বলিতে লাগিলেন। অহো! যাহা বিদ্যমান নাই, সেই অবিদ্যা যে এই বিশ্ব বশীকৃত করিয়াছে, ইহা "পর্ব্বত মৃণালতন্তুতে বদ্ধ হইয়া দুলিতেছে" এই ব্যাপারের সহিত তুলিত হইতে পারে[৩।৪]। অহো! জগত্রয় তৃণ অপেক্ষাও তুচ্ছ, অথচ ইহা অবিদ্যার প্রভাবে পর্ব্বতবৎ সুদৃঢ় এবং অসৎ হইয়াও সৎস্বরূপে অবস্থিত রহিয়াছে[৫]। হে ব্রহ্মন্! ভুবনাঙ্গনে এই যে সংসারনামিকা মায়া তরঙ্গিনী প্রবাহিতা হইতেছে, ইহার তথ্য পুনর্ব্বার আমার বোধবৃদ্ধির নিমিত্ত বর্ণন করুন[৬]। সম্প্রতি আমার হৃদয়ে অন্য এক সংশয় জাগরূক রহিয়াছে। সংশয় এই যে, লবণ রাজা মহাভাগ; তথাপি তিনি সেই মহা আপদ প্রাপ্ত হইলেন কেন?[৭]। অপর এক সংশয় এই যে, জতু ও কাষ্ঠ, সংযুক্ত উভয়ের ন্যায় পরস্পর সংশ্লিষ্ট অথবা মল্লমেষের ন্যায় পরস্পর সংযুক্ত দেহ দেহীর মধ্যে কে শুভাশুভ ফলভোগ করে?[৮]! অন্য জিজ্ঞাস্য এই যে, সেই ঐন্দ্রজালিক, মহাভাগ লবণ রাজাকে তাদৃশ কষ্টতম অবস্থায় পাতিত করিয়া পলায়ন করিল কেন? এবং সেই বা কে?[৯]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে অনঘ! যেমন কাষ্ঠ, যেমন কুড্য, দেহও তেমনি, অর্থাৎ জড়। ইহাতে যে কিছু আছে, তাহা নহে। ইহা কেবল চিত্তের কল্পনায় স্বপ্নের অনুরূপে পরিদৃষ্ট হয়।[১০]। চঞ্চলস্বভাব ও সংসারবীজ চিত্তই চিৎশক্তি ভূষণে ভূষিত হইয়া জীব হইয়াছে[১১]। সেই জীবই দেহী এবং সেই নানাপ্রকার শরীরধারী হইয়া কর্ম্মফল ভোগ করিতেছে। এই দেহী অহঙ্কার, মন ও জীব, ইত্যাদি নামে অভিহিত হয়[১২]। হে রাঘব!

সেই অপ্রবুদ্ধাবস্থ জীবেরই সুখ দুঃখ পরম্পরা সঙ্ঘটিত হয়; পরন্তু সে প্রবুদ্ধ হইলে তখন আর শরীরসমুত্থিত সুখ দুঃখাদি কিছুই থাকে না। ১৩। অপ্রবুদ্ধ মনঃই নানাপ্রকার বৃত্তি উত্থাপন করতঃ বিচিত্রাকৃতি প্রাপ্ত হয়।১৪।। অপ্রবুদ্ধ মনঃই নিদ্রিতাবস্থায় বিবিধ ভ্রম অর্থাৎ মিথ্যা দৃশ্য সমূহ দর্শন করে, পরন্তু প্রবুদ্ধ মনঃ কদাচ সেরূপ ভ্রম দর্শন করে না১৫। অজ্ঞাননিদ্রায় সমাকুল জীব যাবৎ প্রবোধিত না হয়, তাবৎ এই দুর্ভেদ্য সংসারবিভ্রম নিবৃত্ত হয় না।১৬। যেমন দিবসের আলোক দর্শনে কমলের হৃদয়ান্ধকার বিলীন হইয়া যায়, সেইরূপ, প্রবুদ্ধমনের তমোভাগও জ্ঞানালোকে তিরোহিত হইয়া যায়১৭। পণ্ডিতগণ যাহাকে চিত্তা, অবিদ্যা, জীব, বাসনা ও কর্ম্মাত্মা বলেন, তাহাকেই তুমি সুখদুঃখজ্ঞ বলিয়া জানিবে১৮। দেহ জড়, সেজন্য তাহা দুঃখার্হ নহে। যাহাকে দেহী বলা যায়, তাহাই অবিচারপ্রযুক্ত দুঃখানুভব করে। তদাশ্রিত অজ্ঞানই তাহার দুঃখের কারণ এবং তাহার গাঢ়তা অবিচারের মূল১৯। কোশকার কীটেরা যেমন স্বস্ববিরচিত কোশদ্বারা বদ্ধ হয়, তেমনি, জীবও স্বীয় অবিবেক দোষে বদ্ধ হইয়া শুভাশুভ ফলভোগ করে২০। মনঃ অবিবেকের বেগে প্রেরিত হইয়া বিবিধ বৃত্তি ধারণ পূর্ব্বক নানা আকারে চক্রবৎ পরিভ্রমণ করে২১। মনঃই এই শরীরে উদিত হয়, ক্রন্দন করে, হনন করে, গমন করে, বিচলিত হয় ও নিন্দা করে। শরীর ঐ সকলের কিছুই করে না।২২ হে রাম! যেমন গৃহস্বামী গৃহমধ্যে বিবিধ কার্য্য চেষ্টা করে, কিন্তু জড়রূপ গৃহ সেরূপ কিছু করে না, তেমনি, জীবই দেহমধ্যে বিবিধ কার্য্য করে, জড়দেহ তাহার কিছুই করে না২৩। সুখ দুঃখ যত প্রকারই থাকুক, মনঃই সে সকলের কর্ত্তা ও ভোক্তা। সুতরাং তুমি এই সকল মানবকে মানস (মনোনির্ম্মিত) বলিয়া জানিবে২৪। এই বিষয়ে আমি তোমাকে এক উত্তম বৃত্তান্ত বলিব, প্রণিহিত হইয়া শ্রবণ কর। লবণরাজা যে প্রকারে মানস বিভ্রমে চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই প্রকার অর্থাৎ তাহার কারণাদি ক্রমপরম্পরা কীর্ত্তন করি, শ্রবণ কর। রাম! মনঃই শুভাশুভ কর্ম্মের ফলভোগ করে, এই সত্য যাহাতে উত্তমরূপ বুঝিতে পারিবে, সেই প্রকারেই তাহা বলিব, তুমি প্রণিহিত হও ও শ্রবণ কর২৫।২৬।

হে অনঘ! পুরা কালে হরিশ্চন্দ্রকুলোদ্ভূত মহীপাল লবণ একদা উপবিষ্ট ও একান্তমনা হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে,২৭ আমার মহাত্মা

পিতামহ পূর্ব্বে সুমহান্ রাজসূয় যজ্ঞ করিয়াছিলেন। আমি তাঁহারই বংশে সমুৎপন্ন হইয়াছি; অতএব আমিও মনের দ্বারা ঐ যজ্ঞ করিব২৮। *

মহীপতি লবণ মনে মনে ঐরূপ চিন্তা করিয়া, মনে মনে যথাযথ যজ্ঞীয় দ্রব্যাদি আহরণ কল্পনা করিতে লাগিলেন। পরে মনের দ্বারাই রাজসূয় যজ্ঞে দীক্ষিত হইলেন২৯। অনন্তর মনের দ্বারা ঋত্বিক্‌গণকে আহ্বান ও মুনিগণকে পূজা করিলেন এবং পাবক প্রজ্বালিত করিয়া যজ্ঞদেবতা দিগকে আহ্বান করিলেন৩০। ঐরূপে যাগকারী মহীপতির সেই উপবনমধ্যে মানস এক বৎসর (কল্পনাময় এক বৎসর) অতিবাহিত হইল৩১। পরে সেই উপবনমধ্যে তিনি মনে মনে প্রাণিদিগকে অন্নাদি প্রদান ও ব্রাহ্মণ-দিগকে সর্ব্বস্ব দক্ষিণা প্রদান করতঃ সেই মনোযজ্ঞ সমাপন করতঃ দিব-সান্তে ধ্যান পরিত্যাগ করিয়া প্রবুদ্ধ হইলেন।৩২ লবণরাজা অভিহিত প্রকারে মনোদ্বারা রাজসূয় করিয়া তাহারই অবান্তরফলে চণ্ডালত্বভ্রান্তিরূপ অনিষ্ট-ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন৩৩। অতএব, তুমি চিত্তকেই সুখদুঃখভোক্তা জীব বলিয়া অবধারণ করিবে, এবং যাহাতে তুমি মনকে পবিত্র করিতে পার তাহার চেষ্টা করিবে। একমাত্র সত্যই মনঃপবিত্রতার প্রকৃষ্ট উপায়, সুতরাং তুমি তাহাতেই মনকে যোজিত কর৩৪। বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রামচন্দ্র! হে সভ্যগণ! মনোরূপ পুরুষ পূর্ণে (ব্রহ্মে) সংস্থিত হইলে পূর্ণতা প্রাপ্ত ও নষ্টদেশে (ক্ষণভঙ্গুর দেহে) সংস্থিত হইলে বিনষ্ট হইয়া থাকে। অতএব যাহার অহংভাব দেহে নিবদ্ধ—তাহারা কেবল অনর্থভাগী। কিন্তু যেমন রবিকিরণ প্রকটিত হইলে কমলের সঙ্কোচ, জড়তা ও তিমিরাদি তিরোহিত হয়, তেমনি, চিত্তও উত্তম বিবেকে প্রবুদ্ধ হইলে দুঃখপরম্পরা ক্ষণকাল মধ্যে বিগলিত হইয়া যায়৩৫। ৩৬।

পঞ্চদশাধিক শততম সর্গ সমাপ্ত।

* শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, বাহ্যিক দ্রব্যাদি আহরণে অশক্ত হইলেও কোনরূপ বাধা বিঘ্ন বিদ্যমান থাকিলে মনে মনে অর্থাৎ কেবল মানস ব্যাপারে যাগ যজ্ঞ পূজা হোমাদি সমস্তই নির্ব্বাহ করা যাইতে পারে এবং সে সকলের ফলাফলও বাহ্যিক যাগ যজ্ঞাদির ফলাপেক্ষা অধিক। মহারাজা ঐ শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা অনুসারে, মানস রাজসূয় করণে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তাঁহার অভিপ্রায়—বাহ্যিক রাজসূয়ে প্রবৃত্ত হইলে রাজ্যবিপ্লবাদি উপস্থিত হইতে পারে, মন্ত্রিপুরোহিতাদি প্রতিদ্বন্দ্বী হইতেও পারেন, সুতরাং আমার মনের দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করাই কর্ত্তব্য। এইরূপ কৃতনিশ্চয় হইয়া লবণরাজা মনোমধ্যে রাজসূয় যজ্ঞের কল্পনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ষোড়শাধিকশততম সর্গ।

রামচন্দ্র বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! ভূপতি লবণ যে মনঃকল্পিত রাজসূয় যজ্ঞের অবান্তর ফলে শাম্বরিকী মায়ার দ্বারা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে চণ্ডাল-ভাবাদি ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে প্রমাণ কি?[১]। বশিষ্ঠ বলিলেন, রঘুনাথ! শাম্বরিক যখন লবণ রাজার সভায় আগমন করিয়াছিল, তৎ-কালে আমি তথায় উপস্থিত ছিলাম এবং যোগবলে তৎসমুদায় আমি বিজ্ঞাত হইয়াছিলাম[২]। শাম্বরিক অন্তর্হিত ও তাহার মায়া অপগত হইলে লবণ রাজা ও সভ্যগণ আমাকে যত্নপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "ভগ-বন্! এই মায়িক ব্যাপার কি অদ্ভুত!" আমি সেই সভাস্থলে ঐরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করতঃ যোগবলে সমস্ত অবগত হইয়া তাঁহাদিগের নিকট আমি সেই মায়িক কাণ্ডের বিষয় যাহা বলিয়াছি-লাম, তোমার নিকট তাহা কীর্ত্তন করি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর[৩।৪]। রাজসূয় যজ্ঞে রাজ্যের উন্নতি হয় বটে, কিন্তু যাহারা রাজসূয় যজ্ঞ করে তাহারা দ্বাদশবর্ষব্যাপী নানাপ্রকার ব্যথাপ্রদ আপদ অর্থাৎ দুঃখপরম্পরা প্রাপ্ত হয়। * লবণ রাজার মানসিক রাজসূয় সমাপ্ত হইলে, মহেন্দ্র তাঁহাকে দুঃখ প্রদান করিবার নিমিত্ত গগনমণ্ডল হইতে শাম্বরিকরূপধারী এক জন দেবদূত প্রেরণ করিয়াছিলেন[৫।৬]; সেই দেবদূত ঐ শাম্বরিক-রূপে রাজসভায় আগমন করতঃ রাজসূয়যজ্ঞকর্ত্তা নৃপতি লবণকে ভীষণ-আপদ্ পরম্পরা প্রদান করিয়া সিদ্ধগণনিষেবিত উত্তম নভোমার্গে প্রতি-গমন করিয়াছিল[৭]। হে রাঘব! ঐ সমস্ত আমি যোগবলে ও প্রত্যক্ষে অবলোকন করিয়াছি; উহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ করিও না।

রাম! মনঃই বিশিষ্ট ক্রিয়ার কর্ত্তা ও ফলভোক্তা। সেইজন্য আমি পুনঃ পুনঃ বলিতেছি, তুমি চিত্তরূপ (চিত্ত=মনঃ) রত্নকে নির্ঘষণ ও

* দ্বাদশবর্ষব্যাপী, ইহা বাহিক রাজসূয়ের কথা; পরন্তু মানস রাজসূয়ের কথা তাহার পাঁচগুণ অধিক। সেইজন্য ৬০ বৎসর চণ্ডালতা অনুভব। রাজসূয়ের যে স্বর্গফল, তাহাও মানস পক্ষে পাঁচগুণ অধিক।

সংশোধন কর। আতপ যেমন হিমরাশি বিলীন করে, তেমনি, বিবেক দ্বারা তুমি মনঃকে বিলীন কর। তাহা হইলে তুমি মোক্ষরূপ পরম শ্রেয়ঃ প্রাপ্ত হইবে। বৎস! তুমি চিত্তকেই ভূতাড়ম্বরকারিণী অবিদ্যা বলিয়া জানিবে। সেই অবিদ্যা বিচিত্ররচনাকারিণী ও ইন্দ্রজালসদৃশী বাসনার দ্বারা এই দৃশ্যজাল উৎপাদন করিয়াছে। যেমন বৃক্ষ ও তরু শব্দের বাচ্যার্থে প্রভেদ নাই, তেমনি, অবিদ্যা, জীব, বুদ্ধি, ও চিত্তশব্দেরও বাচ্যার্থে প্রভেদ নাই। ইহা অবগত হইয়া তুমি চিত্তকে নিঃসঙ্কল্প কর। চিত্তবৈমল্যরূপ (সঙ্কল্পশূন্য চিত্তই বিমল) সূর্য্য উদিত হইলে বিকল্পনরূপ তিমির তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়। তখন এমন কিছুই থাকে না, যাহা না দেখা যায়, না আত্মীয় হয়, না পরিত্যক্ত হয়, এবং যাহা না মরে। অর্থাৎ সর্ব্বত্র ব্রহ্ম দর্শন হয়, সমস্তই আত্মভূত বলিয়া অনুভূত হয়, এবং তুচ্ছতাবোধে দ্বৈত ভাব সর্ব্বথা পরিত্যক্ত হয় এবং আত্মাতিরিক্ত সমস্ত পদার্থই মরণশীল অর্থাৎ ক্ষণধ্বংশী বলিয়া প্রতীয়মান হয়। যাহা বস্তুতঃ আত্মার নহে, পরকীয়ও নহে, তাহা নিত্য বিদ্যমান ও সর্ব্বময় অর্থাৎ তাহাই চিদ্ব্রহ্ম[৮]। রাম! তখন জলস্থিত অপক্ক মৃত্তাণ্ড যেমন জলের সহিত একতা প্রাপ্ত হয়, তেমনি, সংসারাবস্থার বিচিত্র ভাবরাশি (দৃশ্যসমূহ) ও তদ্বিষয়ক বোধ (বৃত্তিজ্ঞান) জ্ঞানপরিপাকজ বোধের সহিত একপিণ্ড (ব্রহ্মৈকরস) হইয়া যায়[৯]। রামচন্দ্র বলিলেন, আপনি বলিলেন, মনঃ পরিক্ষীণ অর্থাৎ পৃথক্ সত্তাবিহীন হইলে সকল দুঃখের অন্ত হয়। তাই আমি জানিতে চাহি, তাদৃশ চঞ্চল মনঃ কি প্রকারে সত্তাবিহীন হইবে[১০]?

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রঘুকুলেন্দো! যাহা পরিজ্ঞাত হইলে মনোবৃত্তিসমূহ পরব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হয়, তুমি সেই মনঃপ্রশমনের প্রধান উপায় শ্রবণ কর। শ্রবণ করিলে মনঃকে বিষয়াকারা বৃত্তি হইতে উঠাইয়া পরব্রহ্মে ধারণ (স্থাপন বা লীন) করিতে পারিবে[১১]। ইতিপূর্ব্বে আমি ব্রহ্মা হইতে ভূতগণের ত্রিবিধ উৎপত্তির কথা বলিয়াছি[১২]। তন্মধ্যে প্রথমোৎপন্ন মনঃ আপনার প্রভাবে (স্বীয় অজ্ঞাত সামর্থ্যে অর্থাৎ পূর্ব্বকল্পীয় শুভাদৃষ্টের প্রভাবে) উৎপন্ন মাত্রেই "অহং দেহী চতুর্ম্মুখঃ" এইরূপ সঙ্কল্পময় হন। হইয়া ব্রহ্মাশ্রিত আপনাকে উক্তরূপেই সন্দর্শন করেন। এই বিচিত্র ভুবনাড়ম্বর সেই চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মানামধেয় আদ্য মনের কল্পিত অর্থাৎ তাঁহারই কল্পনার জনন, মরণ, সুখ, ও দুঃখ প্রভৃতি

সংসার ধর্ম্ম সম্পন্ন হইতেছে এবং অন্যান্য যে কিছু বলিবে সে সমস্তই উক্ত মনের কল্পিত। এ সকল রচনা কল্পান্ত পর্য্যন্ত থাকে, পরে আবার লয় প্রাপ্ত হয়। এমন কি অনন্তকালব্যাপী বিষ্ণুর কল্পনাও বিলীন হইয়া যায়[১৩,১৪]। পরে আবার সৃষ্টিকাল অভ্যুদিত হয়, এবং পুনঃ প্রজাত ও পুনঃ প্রলয় উপস্থিত হয়[১৫]। এই যেমন ব্রহ্মাণ্ড, এমন কোটি কোটি অর্থাৎ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড আছে। সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড প্রোক্ত প্রকারে উৎপন্ন ও অতীত হয়। সে সকল ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মাও ঐরূপে আবির্ভূত ও তিরোভূত হন[১৬]। হে রঘুনাথ! পরমাত্মায় বিরাজিত অভিহিত প্রকারের ব্রহ্মাণ্ডে ব্যষ্টি মনঃ বা ব্যষ্টি জীব যেরূপে ঈশ্বর হইতে আগমন করে, জীবনযাত্রা বা সংসার নির্ব্বাহ করে, এবং সংসার হইতে বিমুক্ত হয়, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর[১৭]।

প্রথমে পরব্রহ্ম হইতে মনঃশক্তি (সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা) আবির্ভূত হয়। পরে তাহা শব্দতন্মাত্রাত্মক আকাশশক্তি অবলম্বন পূর্ব্বক স্পর্শতন্মাত্রাত্মক পবনানুপাতিনী হইয়া ঈষৎ প্রচলনরূপ ঘনসঙ্কল্পতা প্রাপ্ত হয়[১৮]। তৎপরে তাহা হইতে রূপ, রস ও গন্ধাদিক্রমে পঞ্চীকৃত ভূতপঞ্চক এবং তদ্দ্বারা জীবের উপাধি সকল সম্পন্নাকার ধারণ করে (জীবের উপাধি—অন্তঃকরণ)। সেই উপাধি অর্থাৎ সেই অন্তঃকরণই স্থূলভূত অর্থাৎ স্থূলগগন পবনাদি সংকল্পদ্বারা সৃজন করে। যাহা ব্যষ্টিজীব, তাহারা তেজোরূপ নীহার ও বৃষ্টি জল প্রভৃতি অবলম্বন পূর্ব্বক ওষধি ও শস্য প্রভৃতিতে আবিষ্ট হইয়া ক্রমে সে সকলের পরিণাম অনুসারে প্রাণিগণের গর্ভগত হয়। তদনন্তর পুরুষ (দেহবান্ জীব) উৎপন্ন হয়[১৯,২০]। পুরুষ জাত হইয়া যদি বাল্যকাল হইতে গুরুগণের অনুগত থাকিয়া বিদ্যা গ্রহণ করে, তাহা হইলে তৎক্রমে তাহাদের বিবেক বৈরাগ্যাদি সমুৎপন্ন হয়। তখন সেই স্বচ্ছচিত্তবৃত্তিসম্পন্ন পুরুষের সংসার হেয় অর্থাৎ পরিত্যাজ্য এবং মোক্ষ উপাদেয় অর্থাৎ পরম প্রার্থনীয়, এইরূপ বিচার সমুদিত হইতে থাকে। "আমি বিমলসত্ত্ব ব্রাহ্মণ" এইরূপ সঙ্কল্পাভিমানী পুরুষ বিবেকসম্পন্ন হইলে তখন তাহার চিত্তবিকাশকারিণী যোগভূমিকা সকল ক্রমানুসারে আবির্ভূত হইতে থাকে[২১,২৪]।

ষোড়শাধিক শততম সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তদশাধিক শততম সর্গ।

রামচন্দ্র বলিলেন, হে ভগবন্! আপনি তত্ত্ববিদ্‌গণের শ্রেষ্ঠ। অতএব, আপনি যোগভূমি (যোগের পর পর ক্রম বা অবস্থা) সকল কি প্রকার তাহা আমার নিকট সংক্ষেপে কীর্ত্তন করুন[১]। বশিষ্ঠ বলিলেন, রামচন্দ্র! অজ্ঞানভূমি ও জ্ঞানভূমি উভয়ই সপ্তপদা পরন্তু গুণবৈচিত্র্যপ্রযুক্ত ঐ দুই অসংখ্য পদে বিভক্ত হইয়া থাকে। স্বাভাবিক প্রবৃত্তিরূপ পুরুষকার, ও ভোগ রাগের দার্ঢ্যরূপ রসাবেশ, * এই দুই অজ্ঞানভূমি প্রতিষ্ঠার (স্থিতির) কারণ। আর শাস্ত্রোক্ত নিয়মে শ্রবণ মননাদিরূপ পুরুষকার এবং মুমুক্ষারূপ রসাবেশ, (মোক্ষই পরম সুখ, এইরূপ বিবেচনায় মোক্ষ রসের রসিক হওয়া) এই দুই জ্ঞানভূমি প্রতিষ্ঠার হেতু। আর সর্ব্বাধার ব্রহ্ম উক্ত উভয়ের আধার এবং তাঁহারই অস্তিতায় উক্ত উভয়ের অস্তিতা। পরন্তু তদীয়প্রকাশের উৎকর্ষাপকর্ষ হইতে উক্ত উভয়ভূমির হ্রাস বৃদ্ধি পরিদৃষ্ট হয়। এবং সেই সেই কারণে ঐ সকল ভূমি স্ব স্ব বিষয়ে বদ্ধমূল হয়, হইয়া যথাক্রমে সংসারস্থিতিলক্ষণ দুঃখ এবং মুক্তিরূপ নিরতিশয়ানন্দরূপ উত্তম ফল প্রসব করে[২।৩]। প্রথমে তোমার নিকট আমি সপ্তপ্রকার অজ্ঞানভূমির বিষয় কীর্ত্তন করি, শ্রবণ কর। পরে তুমি সপ্তপ্রকার জ্ঞানভূমির বিষয় শ্রবণ করিও[৪]। স্বরূপাবস্থিতিই মুক্তি এবং অহন্তা তাহার ভ্রংশ (অর্থাৎ অহং এই বোধ হইলেই স্বরূপাবস্থানরূপ মুক্তি চ্যুত হইয়া যায়, সুতরাং বদ্ধ অবস্থা আইসে) কেননা, অহং-এর উদয় হইলেই স্বরূপস্থিতির বিস্মৃতি জন্মে। ইহাই তত্ত্বজ্ঞ অতত্ত্বজ্ঞের সংক্ষেপ লক্ষণ[৫]। যাহারা রাগদ্বেষাদিরহিত শুদ্ধ সন্মাত্র স্বরূপ হইতে বিচলিত না হয়, তাহাদের অজ্ঞত্বসম্ভব নাই[৬]।

* স্বাভাবিক প্রবৃত্তি=ইন্দ্রিয়গণের যথেষ্টাচার। যাহা ইচ্ছা তাহাই হওয়া, যেমন ইচ্ছা তেমনি কার্য্য করা, বিধি নিষেধ না মানা, পরিণাম ও হিতাহিত বিবেচনা না করা, ইত্যাদি। ভোগরাগের অর্থাৎ ভোগাসক্তির উৎকট্য। অর্থাৎ স্ত্রীসংসর্গাদি সুখ অতি উৎকৃষ্ট, কিসে সেই সেই সুখ হইবেক, ইত্যাদি প্রকার মনোভাবের অধীন হওয়া, অথবা সেই সেই সুখের প্রত্যাশায় সেই সেই কার্য্যে ব্যাপৃত হওয়া, ইত্যাদি।

যাহারা স্বরূপ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া চেত্য অর্থে নিমগ্ন হয়, তাহারাই মোহরূপী অর্থাৎ বদ্ধজীব। চেত্য বিষয়ে মগ্ন হওয়া অপেক্ষা প্রবল মোহ আর নাই। মননবর্জ্জিত হইয়া অবস্থান করার নাম স্বরূপাবস্থিতি। জাড্য ও নিদ্রা এই দুই অবস্থা হইতে বিনির্ম্মুক্ত ও সর্ব্বপ্রকার কল্পনা হইতে নিরস্ত এবং শান্তস্বভাব হইয়া শিলান্তরের ন্যায় (যেমন, প্রস্তরের অভ্যন্তর নিশ্চল নিস্পন্দ, তাহার ন্যায়) অবস্থিতি করাকে স্বরূপাবস্থান বলা যায়। অথবা অহম্ভাব উপশম প্রাপ্ত সুতরাং ভেদজ্ঞানের প্রস্পন্দ রহিত হইলে যে চিৎ মাত্রের অবশেষ থাকে, তাহাই স্বরূপাবস্থান শব্দের অভিধেয়। ১০। সেই চিদ্রূপ অধিষ্ঠানে (আধারে বা আশ্রয়ে) যে অজ্ঞানের সংস্রব থাকে সম্প্রতি তুমি তাহার ভূমি বা অবস্থা (অজ্ঞান-ভূমিকা) সকল শ্রবণ কর। বীজজাগ্রৎ, জাগ্রৎ, মহাজাগ্রৎ, জাগ্রৎস্বপ্ন, স্বপ্ন, স্বপ্নজাগ্রৎ ও সুষুপ্তি, এই সাত প্রকার অবস্থা মোহশব্দে শব্দিত। ঐ সাত প্রকার মোহ পরস্পর সংশ্লিষ্ট হইয়া বহুপ্রকার হয়। ঐ সপ্তবিধ মোহের লক্ষণ বলি, শ্রবণ কর। প্রথমে বীজজাগ্রৎ। মায়াসম্বলিত ব্রহ্মচৈতন্য হইতে সৃষ্টির আদিতে এবং অস্মদাদির জাগ্রতের মূলে যে চেতনার প্রথম স্ফুরণ অর্থাৎ চিদাভাসসম্বলিত মায়াশক্তির আদ্য বিকাশ, যাহার আখ্যা অর্থাৎ নাম নাই, তাহাই প্রাণধারণাদিক্রিয়ার আলম্বন বা উপাধি এবং তাহাই চিত্ত জীবাদি শব্দের প্রকৃত অর্থ। বক্ষ্যমাণ জাগ্রৎ অবস্থার বীজ বলিয়া তাহাকেই বীজজাগ্রৎ বলা যায়। ১১।১৪। এই বীজজাগ্রৎ জ্ঞপ্তির অর্থাৎ চিদ্বস্তুর নূতন বা প্রথম পরিচয়। অতঃপর জাগ্রৎ অবস্থার কথা বলি, শ্রবণ কর। পরমাত্মা হইতে নবপ্রসূত ঐ বীজজাগ্রতের পরে যে স্বরূপ বিস্মরণ পূর্ব্বক সামান্যতঃ "এই আমি" "ইহা আমার" এইরূপ জ্ঞান প্রস্ফুরিত হয়—তাহাকে আমরা জাগ্রৎ বলি। এই জাগ্রৎ অবস্থা জন্মান্তরীয় সংস্কার বিশেষের উদ্রেকে ও অভ্যাসের পটুতায় পীবর অর্থাৎ স্থূল হইলে মহাজাগ্রৎ শব্দের বাচ্য হয়। * রূঢ়ভাবে হউক আর

---

* সুষুপ্তি ব্যতীত অন্য ছয় অবস্থা কর্ম্মফলভোগের স্থান। সেইজন্য শাস্ত্রে ঐ ছয় অবস্থা কর্ম্মপ্রভব বলিয়া উক্ত হয়। পরন্তু সুষুপ্তি অবস্থা, ভোগদ্বারা উদ্ভূত কর্ম্মের ফল (পূর্ব্বোপার্জিত অদৃষ্টের শক্তি) ক্ষয় এবং ভবিষ্যদ্ভোগপ্রদ কর্ম্মের অনুদয়, উভয়ের অন্তরালস্বরূপ। সুতরাং ঐ অবস্থা, পূর্ব্বাবির্ভূত (যাহা ভুক্ত বা দৃষ্ট হইতেছে সেই সকল) স্থূল সূক্ষ্ম প্রপঞ্চের (দ্রষ্টব্য বা ভোক্তব্য পদার্থের) লয়স্থান এবং ভবিষ্যৎ প্রপঞ্চের

অরূঢ়ভাবে হউক, অর্থাৎ অদৃঢ়ভাবে হউক আর দৃঢ়ভাবে হউক, জাগ্রদ্দশায় যদি তন্ময়ীভাবে সত্যবৎ মনোরাজ্য উদিত হয় তবে তাহাকে জাগ্রৎস্বপ্ন বলা যায়। যেমন লবণ রাজার হইয়াছিল। দ্বিচন্দ্র ও শুক্তিরৌপ্য প্রভৃতি ভ্রান্তিজ্ঞানও জাগ্রৎস্বপ্নবিশেষ[১৭।১৮]। জীব পূর্ব্বাভ্যাসের প্রভাবে জাগ্রদ্ভাব প্রাপ্তির পর মধ্যে মধ্যে অনেকবিধ স্বপ্নভাব অনুভব করে। নিদ্রা মধ্যে যাহা প্রতীয়মান হয়, এবং নিদ্রাবসানে যাহার উপর "আমি ইহা অল্পকাল দর্শন করিয়াছি, আমার এই দৃষ্টি অসত্য"; ইত্যাকার অনুসন্ধান জন্মে তাহার নাম স্বপ্ন। এই স্বপ্ন মহাজাগ্রতের অন্তর্গত এবং ইহা স্থূলদেহের কণ্ঠ ও হৃদয় এই দুই স্থানের অভ্যন্তরস্থ নাড়ী বিশেষের মধ্যে উপস্থিত হইয়া থাকে[১৯।২০] *। স্থায়ী সন্দর্শন নহে বা স্থায়ী অনুভব হয় না, দৃষ্ট হয় অথচ অপ্রফুল্ল অর্থাৎ অস্পষ্ট, এরূপ অবস্থাও স্বপ্নবিশেষ। তাদৃশ স্বপ্ন যদি জাগ্রতের ন্যায় রূঢ় অর্থাৎ দৃঢ়াভিনিবেশ দ্বারা বা স্থায়িত্ব কল্পনার দ্বারা উপচিত (স্থূল বা বিস্পষ্ট) হইয়া মহাজাগ্রতের সমান হয় তাহা হইলে সে অবস্থাকে স্বপ্নজাগ্রৎ বলা যায়। এ অবস্থা রাজা হরিশ্চন্দ্রের হইয়াছিল। এই স্বপ্নজাগ্রৎ অবস্থাকে স্থূল দেহের স্থিতি ও নাশ উভয় কালে হইতে দেখা যায়। পূর্ব্বোক্ত ইন্দুতনয়গণের ও অনেক যোগীর বিদেহ অবস্থার জ্ঞান তাহার উদাহরণ। পূর্ব্বোক্ত ইন্দুপুত্রগণের শরীর নষ্ট হইলেও মনোরাজ্য নষ্ট হয় নাই। অভিহিত ছয় অবস্থা ত্যাগ হইয়া জীব যে জড়াবস্থায় অবস্থিতি করে, সেই জড়াবস্থা তাহার সুষুপ্তি। এই সুষুপ্তি অবস্থা সেই সেই ভবিষ্যৎ সুখদুঃখাদি বোধের বীজস্বরূপ এবং এই অবস্থারই অভ্যন্তরে এই সমুদায় তৃণলোষ্ট্রশিলাদিপদার্থ বীজভাবে অবস্থিতি করে। অজ্ঞানভূমির এই সাত অবস্থা বর্ণন করিলাম, অতঃপর ইহাদের অপর প্রভেদ শ্রবণ কর[২১।২২]।

ঐ সাত অবস্থার প্রত্যেক অবস্থা নানাবিভবরূপিণী ও শতশতশাখাসম্পন্না। পূর্ব্বোক্ত জাগ্রৎস্বপ্ন অভ্যাস দ্বারা জাগ্রদ্ভাব প্রাপ্ত হইয়া নানা

বীজ। যেহেতু উহা সর্ব্বপ্রপঞ্চের বীজ, সেই হেতু উহা ভবিষ্যদ্দুঃখকারণ কাম-কর্ম্মবাসনাদিতে আঢ্য অর্থাৎ পরিপূর্ণ।

* শাস্ত্রকারেরা বলেন, মনঃ যখন মেধ্যানাড়ীতে সংযুক্ত হয় তখন নিদ্রা ও স্বপ্নদর্শন হইতে থাকে। মেধ্যা নাড়ী নাকি হৃদয়ের ঊর্দ্ধে কণ্ঠের নিম্নে অবস্থিত।

তাকারে বিজৃম্ভিত হয় এবং পূর্ব্বোক্ত জাগ্রৎস্বপ্নের উদরে মহাজাগ্রৎ অবস্থা অতি সূক্ষ্মভাবে অবস্থিতি করে।২৩ * নৌকাযাত্রিগণ যেমন নদীজলের ঘূর্ণনে নৌকাঘূর্ণন অনুভব করে, সেইরূপ, জীবগণ জাগ্রদ্দশায় অবস্থান করিয়া ও উক্ত প্রকারে মোহ হইতে মোহান্তর প্রাপ্ত হয়২৭। কোন কোন অজ্ঞানাবস্থা স্বপ্নজাগ্রতাকারে দীর্ঘকাল বিদ্যমান থাকে এবং কোন কোন স্বপ্নজাগ্রৎ জাগ্রৎস্বপ্নের ন্যায় অতিবাহিত হয়২৮। এবম্বিধা সপ্তপদী অজ্ঞানভূমি, যাহা আমি সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলাম, তাহা নানা-বিকারে বিকৃত সুতরাং হেয়। বক্ষ্যমাণ বিচারযোগ অবলম্বনে যদি মালিন্য-বর্জ্জিত প্রবোধ লব্ধ হয় অর্থাৎ নির্ম্মল পরমাত্মা দৃষ্ট হয়, ঐ হেয়রূপা অজ্ঞানভূমি হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়২৯।

সপ্তদশাধিক শততম সর্গ সমাপ্ত।

---

* ইহার একটী উদাহরণ—যেমন অনেকে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন, অথচ তাঁহাদের ব্রাহ্মণোচিত ক্রিয়ায় প্রবৃত্তি হয় না। কাহাকে কাহাকে স্বকুলোচিত ক্রিয়ায় অভ্যস্ত ও দৃঢ়াভিনিবিষ্ট হইতে দেখা যায়। অতএব, ঐহিক ও প্রাক্তন অভ্যাসের প্রাবল্যে জাগ্রৎজ্ঞানের উপচয় অর্থাৎ অভিনিবেশের পটুতা দৃষ্ট হইলে তাহাকেও, মহাজাগ্রৎ শব্দের বোধ্য বলিয়া স্থির করিবে।
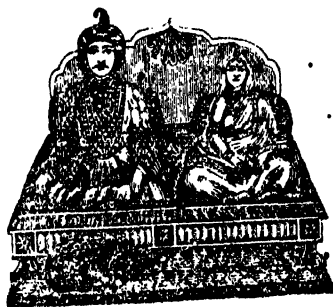
অষ্টদশাধিক শততম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে অনঘ! সপ্তপদা অজ্ঞানভূমি শ্রবণ করিলে, এক্ষণে সপ্তপদা জ্ঞানভূমি শ্রবণ কর। ইহা সম্যক্ অবগত হইলে অতঃপর আর তুমি মোহপঙ্কে নিমগ্ন হইবে না[১]। বাদিগণ অনেক প্রকার যোগভূমির কথা বলেন, পরন্তু আমার মতে বক্ষ্যমাণ ভূমিই শুভপ্রদ[২]। হে রামচন্দ্র! অখণ্ডাত্মাকারা চিত্তবৃত্তি (জ্ঞান) সমারূঢ় ব্রহ্মই জ্ঞানপদের প্রকৃত অভিধেয়। উহা অজ্ঞানের নাশক বলিয়া জ্ঞান নাম প্রাপ্ত। * এবং অজ্ঞান নাশে তাহারই ঔপচারিক (সাংকেতিক) নাম জ্ঞেয় ও মুক্তি। ঐ জ্ঞান সপ্তভূমিক। মুক্তি বা জ্ঞেয় নামক স্বস্থাবস্থা, ভূমিকা সপ্তকের পর প্রতিষ্ঠিত হয়[৩]। জ্ঞানভূমি সপ্তকের বিবরণ এই যে, উহার প্রথমা ভূমি শুভেচ্ছা, দ্বিতীয়া ভূমি বিচারণা, তৃতীয়া তনুমানসা, চতুর্থী সত্ত্বাপত্তি, পঞ্চমী অসংসক্তি, ষষ্ঠী পদার্থাভাবনী এবং সপ্তমী ভূমি তুর্য্যগা[৪।৫]। এই তুর্য্যগা ভূমির অব্যবহিত পরেই মুক্তি। মুক্তি উপস্থিত বা প্রতিষ্ঠিত হইলে তখন আর শোক থাকে না। যে সাত প্রকার ভূমি অভিহিত হইল, সেই সাত প্রকার ভূমির নির্ব্বচন অর্থাৎ লক্ষণ বলি, শ্রবণ কর[৭]। "কেন আমি মূঢ়ের ন্যায় বৃথা কাল কর্ত্তন করিতেছি? সৎশাস্ত্র ও সজ্জন সকাশে আমি জ্ঞাতব্য কি? ও কর্ত্তব্য কি? তাহা জানিব।" বৈরাগ্যপূর্ব্বক ঐরূপ ইচ্ছা হওয়ার নাম শুভেচ্ছা[৮]। শাস্ত্রানুশীলন, সজ্জনসংসর্গ ও বৈরাগ্য অভ্যাস পূর্ব্বক যে সদাচারপ্রবৃত্তি প্রবাহিতা হয়, (দিন দিন বাড়িতে থাকে), তাহা বিচারণা নাম্নী দ্বিতীয়া ভূমি[৯]। † এই বিচারণা ও শুভেচ্ছা উভয়ের দ্বারা যে বিষয়-রসে অনাসক্তি বা অপ্রবৃত্তি জন্মে, সেই অনাসক্তির প্রভাবে যে বিষয়বাসনার

---

* আত্মা পৃথক্ ব্রহ্ম পৃথক্, ইত্যাকার বোধের নাম অজ্ঞান। যখন সাধনা বলে ঐ বোধের অন্তর্ধান হয়, তখন এক ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান অর্থাৎ একটীমাত্র মনোবৃত্তি জন্মে। এই মনোবৃত্তির নাম তত্ত্বজ্ঞান।

† এ স্থলে সদাচার শব্দের অর্থ—গুরুসেবা, অযাচিতাহার বা ভিক্ষাহার, শৌচ, সন্তোষ, ব্রহ্মচর্য্য, শ্রবণ ও মনন, এই সকল বিষয়ে ব্যাসক্ত থাকা।

অল্পত্ব বা ক্ষীণতা জন্মে, সেই বিষয়বাসনার ক্ষীণতা তনুমানসা নাম্নী তৃতীয়া ভূমি[১০]। শুভেচ্ছা, বিচারণা ও তনুমানসা, এই ভূমিত্রয় অভ্যস্ত করিতে করিতে চিত্ত হইতে বাহ্যবিষয়ের সংস্কারও অল্পে অল্পে লুপ্ত হইয়া যায় এবং তদ্বলে যে কেবল আত্মনিষ্ঠতা জন্মে পণ্ডিতগণ সেই আত্মনিষ্ঠতাকে সত্ত্বাপত্তি বলেন[১১]। শুভেচ্ছা, বিচারণা, তনুমানসা ও সত্ত্বাপত্তি, এই অবস্থা চতুষ্টয়ের অভ্যাস দ্বারা বিষয়াসংসর্গরূপ উৎকৃষ্ট ফল (অস্পর্শযোগ) সমুৎপন্ন হয়। বিষয়াসংসর্গরূপ ফল জন্মিলে তাহা হইতে যে আত্ম-চমৎকৃতি অর্থাৎ আত্মানন্দসাক্ষাৎকার হয়, পণ্ডিতগণের মতে তাহাই অসংসক্তিভূমিকা। উক্ত শুভেচ্ছাদি পাঁচ জ্ঞানভূমির দৃঢ় অভ্যাস এবং বাহ্য ও আভ্যন্তর পদার্থের অভাবন (বাহ্য ও অভ্যন্তর ভুলিয়া যাওয়া) বশতঃ আত্মা মাধ্যস্থ বৃত্তি অবলম্বন করেন অর্থাৎ সাক্ষীর ন্যায় অথবা উদাসীনের ন্যায় দ্রষ্টা মাত্র হইয়া অবস্থান করেন এবং পরেচ্ছামাত্র প্রেরিত হইয়া দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করেন। এই ষষ্ঠী অবস্থা বা ভূমিকা এতৎশাস্ত্রে পদার্থাভাবনী নামে কথিত হয়[১২।১৪]। যথোক্ত ষড়বিধ জ্ঞানভূমির পরিপাকে ভেদজ্ঞানের অভাব হইলে যে একনিষ্ঠতা জন্মে, তাহাকে এতৎশাস্ত্রে (অধ্যাত্মশাস্ত্রে) তুর্য্যগা গতি বলে[১৫]। এই তুর্য্যগা গতি বা অবস্থা জীবন্মুক্ত ব্যক্তিতেই দৃষ্ট হয়। ইহার পর বিদেহমুক্তি, বা তুর্য্যাতীত ব্রহ্মপদ[১৬]। হে রামভদ্র! যে মহাভাগ ও মহাত্মা তুর্য্যগা-গতি প্রাপ্ত হন, তিনিই প্রকৃত আত্মারামতা ও মহৎপদ প্রাপ্ত হন[১৭]। জীবন্মুক্ত জনগণ কোন কার্য্য করুন্ বা না করুন্, সুখদুঃখরসে নিমগ্ন হন না[১৮]। যেমন সুপ্ত ব্যক্তি প্রবুদ্ধের ন্যায় হইয়া কার্য্য করে, তদ্রূপ তাঁহারা (প্রবুদ্ধ হওয়ায়) দৈহিক কার্য্য নির্ব্বাহ করেন অর্থাৎ ফলা-সক্তিরহিত হইয়া কুলক্রমাগত সদাচার মাত্র পরিপালন করেন[১৯]। যেমন সুন্দরী রমণীরা সুপ্ত ব্যক্তিকে সুখ প্রদান করিতে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ, আত্মারাম পুরুষকে কোন জগৎক্রিয়া সুখ অথবা দুঃখ প্রদান করিতে পারক হয় না[২০]। এই সপ্তপদী জ্ঞানভূমি ধীমান্ জীবন্মুক্ত-গণেরই গোচর; অন্যের নহে। এ অবস্থা পশু ও ম্লেচ্ছাদির ন্যায় দেহাত্মবুদ্ধি মানবগণের অলভ্য[২১]। পশু ও ম্লেচ্ছাদি জীব যদি কদাচিৎ পূর্ব্বসাধন বলে ঐ সমস্ত জ্ঞানভূমি প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে তাহারাও

মুক্তি লাভ করিতে পারে। * অর্থাৎ বিমল তত্ত্বজ্ঞানই সংসারবন্ধন ছেদনের একমাত্র উপায় এবং তৎকর্তৃক এই ভববন্ধন ছিন্ন হইলে মুক্তি লাভ হয়। মুক্তি কি? মুক্তি ভ্রান্তির উপশম। বন্ধন যখন মরুমরীচিকায় জলবুদ্ধির অনুরূপ; তখন মুক্তি অবশ্যই ভ্রান্তির উপশম ব্যতীত অন্য কিছু নহে[২২।২৩]। যাঁহারা মোহ হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, কিন্তু পাবন পদ প্রাপ্ত হন নাই, তাঁহারা আত্মলাভে ব্যগ্র হইয়া পূর্ব্বকল্পিত সপ্তপদী জ্ঞানভূমিতে বিচরণ করেন[২৪]। এই জগতে কোন কোন জ্ঞানবীর অভিহিত সমস্ত ভূমিই জয় করিয়াছেন। কেহ এক ভূমি, কেহ দুই ভূমি, কেহ তিন ভূমি, কেহ ছয় ভূমি, কেহ ভূমিসপ্তক, কেহ চারি ভূমি, কেহ অন্ত্যা অর্থাৎ শেষ ভূমি, কেহ বা কোন এক ভূমির অংশ জয় করিয়াছেন। কেহ সার্দ্ধত্রিভূমিতে, কেহ সার্দ্ধচতুর্ভূমিতে এবং কেহ বা ষষ্ঠ ভূমিতে অবস্থিত আছেন[২৫।২৭]। যাঁহারা ঐ সকল ভূমি জয় করিতে পারেন, তাহারাই উৎকৃষ্ট রাজা। তাঁহাদিগের নিকট দন্তিগণসমবেত মহাভটগণের পরাভব তৃণস্বরূপ। যাহারা ঐ সমস্ত জ্ঞানভূমি জয় করেন, সেই ইন্দ্রিয়শত্রুবিজয়িগণই বন্দনীয়। তাঁহারা সম্রাট্ বিরাটকেও তৃণতুল্য জ্ঞান করেন এবং তাঁহারাই ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন[২৮।৩০]।০

অষ্টদশাধিক শততম সর্গ সমাপ্ত।

---

* হনুমান্ প্রভৃতি পশু জাতীয় জীব, ধর্ম্মব্যাধ প্রভৃতি ম্লেচ্ছ জাতীয় জীব এবং প্রহ্লাদ কর্কটী প্রভৃতি অসুরকুলোদ্ভব জীব জ্ঞানভূমি লাভ করিয়া মুক্ত হইয়াছিলেন।

একোনবিংশত্যধিক শততম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, যেমন সুবর্ণ স্বকল্পিত অঙ্গুরীয়ক বুদ্ধির উদয়ে আপনার সুবর্ণতা ভুলিয়া গিয়া * "আমি সুবর্ণ নহি" বলিয়া খেদ করে, রোদন করে, সেইরূপ, পরমাত্মাও অহন্তার উদয়ে আপনার স্বপ্রকাশ ও পরিপূর্ণ স্বভাব বিস্মৃত হইয়া নানাবিধ শোক তাপাদি অনুভব করেন[১]।

রামচন্দ্র বলিলেন, মুনে! সুবর্ণের অঙ্গুরীয় জ্ঞানের উদয়, এবং আত্মার অহন্তার উদয়, এই দুই কথার তাৎপর্য্য কি তাহা আমাকে বিশদ করিয়া বলুন[২]?

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! যাহা সত্য সত্যই আছে, তাহারই আগম ও অপায় (কি প্রকারে হয় ও কি প্রকারে যায়) জিজ্ঞাস্য। পরন্তু অহং, ত্বং, উর্দ্মিকা, এ সকল কোনও কালে নাই[৩]। অঙ্গুরীয় বিক্রেতা "অঙ্গুরীয় ক্রয় কর" বলিয়া মূল্য লইয়া ক্রেতাকে যাহা দেয় তাহা কি? তাহা সুবর্ণ ব্যতীত বস্তুন্তর নহে। সেইজন্য সে অগ্রে সুবর্ণের মূল্য লয়, পশ্চাৎ বিকারনিষ্পাদক পরিশ্রমের ব্যয় বা মূল্য লয়। অতএব, সে স্থলে যেমন সুবর্ণই সত্য, বিকার মিথ্যা, তেমনি, ব্রহ্মই সমুদায় ব্যবহারের মধ্যে সত্য ও সে সকলের মূলে ব্যবস্থিত[৪]। রামচন্দ্র বলিলেন, প্রভো! যদি সুবর্ণই ক্রয় বিক্রয় ব্যবহারের গোচর (বিষয়) হয়, তাহা হইলে তাহারা অঙ্গুরীয় কথা বলে কেন? অর্থাৎ তবে অঙ্গুরীয় কি? তাহা আমাকে বলুন। অঙ্গুরীয়তত্ত্ব বিজ্ঞাত হইলে তদ্দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব বা ব্রহ্মস্বরূপ বোধগম্য করিতে ক্ষমবান্ হইব[৫]। বশিষ্ঠ বলিলেন, রাঘব! অঙ্গুরীয় কি? যদি বলিতে হয়, তবে তাহাই বলা যাইতে পারে যে, উহা বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় নিঃস্বরূপ। অর্থাৎ উহা সুবর্ণের কল্পিত আকৃতি মাত্র[৬]।

* সুবর্ণ অচেতন, তাহার বুদ্ধি উদয় ও খেদ অসম্ভব; সুতরাং ঐ উক্তি ঔপচারিক। মঞ্চাঃ ক্রোশন্তি—মাচা ক্যাচ্ কোঁচ্ শব্দ করিতেছে, এই প্রয়োগ যদ্রূপ, সুবর্ণের খেদ, এ প্রয়োগও তদ্রূপ। মঞ্চস্থ পুরুষের কৃত শব্দ মঞ্চে উপচরিত। অঙ্গুরীয়ধারীর খেদ, অঙ্গুরীয়ে উপচরিত, এইরূপ বুঝিতে হইবে।

সুবর্ণের, উর্ম্মিকা ভাব মোহের বা ভ্রান্তির বিকার মাত্র। তাহা অসত্য হইলেও মায়ার প্রভাবে সত্যের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। বিচার দৃষ্টিতে দেখিলে সুবর্ণ বৈ উর্ম্মিকা (অঙ্গুরীয়) দৃষ্ট হয় না, সুতরাং সুবর্ণই উহার স্বরূপ[৭]। মৃগতৃষ্ণিকাজল, দ্বিচন্দ্র, অহন্তা, এ সকলেরই রূপ বা আকৃতি ঐ প্রকার অর্থাৎ বিচার দৃষ্টির সকাশে তুচ্ছ বা মিথ্যা[৮]। শুক্তিতে যে রজত দর্শন হয়, প্রণিধান সহকারে দেখিলে ও অন্বেষণ করিলে তাহাতে অণুমাত্রও রজত পাওয়া যায় না[৯]। অতএব, যাহা অসৎ, অসম্যক্ দর্শনে তাহাই সত্যের ন্যায় প্রকটিত হয়। শুক্তিতে রজত, মরুস্থমরীচিকায় জল, ঐ নিয়মের অধীন[১০]। বিচার দৃষ্টিতে দেখিলে যাহা নাই তাহা নাই বলিয়াই প্রকাশ পায়, পরন্তু ভালরূপ না দেখিতে পাইলে অথবা না দেখিলে মরুমরীচিকায় জলস্ফূর্ত্তির ন্যায় যাহা নাই তাহারই মিথ্যা স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে[১১]। যাহা অসৎ অর্থাৎ নাই, তাহাও ভ্রান্তির প্রভাবে থাকার ন্যায় কার্য্যকারী হয়। তাহার দৃষ্টান্ত—শিশুদিগের বেতাল ভ্রম (ভূতের ভয়)। হেমে হেম ব্যতীত অঙ্গুরীয় বা অন্য কিছু নাই, সুতরাং অঙ্গুরীয়াদির অস্তিতা বালুকামধ্যে তৈলের অস্তিতার অনুরূপ[১২,১৩]। জগৎ-নামধেয় দৃশ্যের মধ্যে সত্য মিথ্যা উভয়ের অস্তিত্ব (উভয়ের সমাস্তিত্ব) কিছুই নাই। বালকদিগের যক্ষবিকারের ন্যায় (যক্ষবিকার=ভূতাবেশ) যখন যাহা যেরূপে প্রতিভাত হয়, তখন তাহাই সেই সেই রূপেই অর্থক্রিয়াকারী হয়[১৪]। থাকুক বা না থাকুক—জ্ঞানে দৃঢ় সমারোপিত হইলেই তাহা অর্থক্রিয়াকারী (অর্থক্রিয়া= ফল বা প্রয়োজন নির্ব্বাহ) হইবে। তাহার দৃষ্টান্ত—বিষও দৃঢ় ভাবনায় অমৃতের কার্য্যকরে[১৫]। এই যে অসৎ অহংভাব, ইহাও সেই অবিদ্যার কার্য্য। যেমন হেমে অঙ্গুরীয়ত্ব নাই, তেমনি, আত্মাতেও অহন্তাবাদি নাই। অসৎ ও অপ্রতিষ্ঠ অহন্তাবই মায়া, এবং অবিদ্যাই সংসার[১৬]। অহন্তা অভাববস্তু, অর্থাৎ অসৎ, সুতরাং তাহা কোনও কালে স্বচ্ছ শান্ত শুদ্ধ পরমাত্মায় নাই[১৭]। সনাতনতা, বিরিঞ্চিত্ব, ব্রহ্মাণ্ডতা, পিতাপুত্রতা, ত্রিকালতা, ভাব, অভাব, বস্তুতা, তুমি, আমি, ত্বদীয়ত্ব, মদীয়ত্ব, সত্ত্ব, অসত্ত্ব, ভাব, রাগ, ইত্যাদি ইত্যাদি কোনও প্রকার ভেদ নাই। সমস্তই কল্পিত; কেবলমাত্র এক, অদ্বয়, বাক্য ও মনের অগোচর, শূন্য হইতেও শূন্য ও স্থূল হইতেও স্থূল, সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম বোধ মাত্র আছেন[১৮।২৩]।

রামচন্দ্র বলিলেন, প্রভো! যদিও আমি বুঝিয়াছি, এ সমস্তই ব্রহ্ম,

তথাপি পুনর্ব্বার বলুন, এ সৃষ্টি কেন অনুভবগম্য হয়[২৪]। * বশিষ্ঠ বলিলেন, সৃষ্টি শান্ত ব্রহ্ম পরমাত্মায় ইদন্তা প্রকারে অর্থাৎ এই সৃষ্টি ইত্যাকারে বা অমুক অমুক প্রকারে অবস্থিত নাই। অর্থাৎ পৃথক্ রূপে নাই। সৃষ্টি ও সৃষ্টিসংজ্ঞা উভয়ই অসৎ অর্থাৎ স্বাজ্ঞানের বিমোহন (কল্পিত)। সুতরাং বুঝিতে হইবে, কল্পিত সৃষ্ট্যাদি আত্মস্বভাবেরই অন্তর্গত[২৫]। যেমন মহার্ণবে জলের অবস্থিতি, (জল মহার্ণবেরই স্বরূপে সন্নিবিষ্ট), সেইরূপ, পরমেশ্বরেও সৃষ্টির অবস্থিতি। প্রভেদ এই যে, জল দ্রবত্বহেতু স্পন্দিত হয়, পরম পদ স্পন্দিত হয় না। যাহা পরম পদ (ব্রহ্ম) তাহা স্পন্দরহিত[২৬]। সূর্য্যাদি জ্যোতিঃপদার্থ স্বাত্মসত্তাতে প্রকাশ পায়, পরন্তু তৎপদ (ব্রহ্ম) স্বয়ংপ্রকাশ। সুতরাং তাহা সূর্য্যাদির ন্যায় পরাধীনরূপে প্রকাশিত হয় না। প্রকাশ পাওয়া সূর্য্যাদির স্বভাব, তাহা ক্রিয়া বিশেষ, পরন্তু যাহা তৎপদ (ব্রহ্ম) তাহা নিষ্ক্রিয়। (প্রকাশ ও পাওয়া, দুই কথাই ক্রিয়াবোধক। তৎপদ প্রকাশক্রিয়া বর্জ্জিত। তাঁহার প্রকাশ ক্রিয়াত্মক নহে পরন্তু চিরনিত্য। সুতরাং সূর্য্যাদির প্রকাশ পরম পদের প্রকাশ ব্যতীত নহে)[২৭]। যদ্রূপ সমুদ্রের মধ্যে কেবল জলেরই স্ফূর্ত্তি, তেমনি, পরমাত্মায় চৈতন্যেরই স্ফূর্ত্তি। চৈতন্যই নানা আকারে স্ফুরিত হইতেছে[২৮]। তুমি ঈষৎ জ্ঞানী, অর্থাৎ এখনও তোমার জ্ঞান পরিপক্ক হয় নাই, তাই তুমি বলিতেছ, ইহা সৃষ্টি এবং এ সৃষ্টি অনন্তকাল থাকিবেক। পরন্তু জ্ঞান পরিপক্ক হইলে বুঝিবে, শাশ্বত ব্রহ্মই ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান, এই ত্রিকালে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন[২৯]। পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক ইহাই নিশ্চিত হইয়াছে যে, যেরূপ আকাশের আর আকাশ নাই, তদ্রূপ, পরমার্থের পরমার্থ নাই। সুতরাং প্রচলিত সৃষ্টি শব্দ কেবল পরমার্থেরই সংজ্ঞাপ্রভেদ[৩০]। অহন্তাবসম্পন্ন চিত্তের দ্বারাই সৃষ্টি হয়, সুতরাং চিত্তের পরিক্ষয়ে সৃষ্টিরও অভাব হয়। চিত্তের উদয়ে এই অসতী সৃষ্টি সত্যবৎ প্রতীত হইতেছে এবং চিত্তের অনুদয়ে বা তিরোভাবে ও শাশ্বত ব্রহ্ম ভাবের উদয়ে বা আবির্ভাবে এই অসতী সৃষ্টিও ব্রহ্মসত্তায় অবশেষিত হইবে। অহন্তাববিশিষ্ট সম্বেদন (অনুভাবন) কালে

* অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্মজ্ঞানে জগৎকারণ অজ্ঞান ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে অজ্ঞানকার্য্য জগতের অদর্শন হওয়াই সুসম্ভব, পরন্তু তাহা হয় না। প্রত্যুত তাহা (জগৎ) পূর্ব্বের ন্যায় দৃষ্ট হয়। এরূপ হয় কেন? তাহা আমাকে বলুন।

সৃষ্টির আড়ম্বর ভ্রান্ত প্রথায় বিরাজ করে, কিন্তু অসম্বেদন কালে সেই শান্ত পরমাত্মাই প্রথিত থাকেন। শান্ত পরমাত্মা জড় নহেন; প্রত্যুত চেতন। সৃষ্টি অজ্ঞগণের নিকট বহুপ্রকার হইলেও তত্ত্বজ্ঞগণের নিকট বহু বা অনেক নহে। যেমন সুবর্ণে বলয়ভ্রান্তি, তেমনি, আত্মাতে সৃষ্টিভ্রান্তি। সেইজন্য বলিতেছি, এই সৃষ্টিকে তুমি শিবাত্মক আত্মামাত্র বলিয়া জানিবে। যেমন শিল্পিনির্ম্মিত সেনা সকল যুদ্ধাদি কার্য্যোপযোগীর ন্যায় প্রতিভাত হয়, তাহার ন্যায় এই সৃষ্টিও ব্যবহারোপযোগী বলিয়া প্রতিভাত হয়[৩১।৩৪]। সুতরাং এই ভ্রমময় জগৎ পূর্ণ, অনারম্ভ, বিনাশ-রহিত, অনন্ত ও নিষ্পাপ। ইহা পূর্ণাকারে পূর্ণ হইয়াই রহিয়াছে[৩৫]। দৃশ্যমানা সৃষ্টি ব্রহ্ম বটে, ব্রহ্মেও বটে। যেমন আকাশে আকাশ, তেমনি, শান্ত শিব ব্রহ্মে শান্ত শিবই অবস্থিত রহিয়াছে[৩৬]। মুকুর-প্রতিবিম্বিত দূরবিস্তৃত নগরের ন্যায় ব্রহ্মেই ইহার দূরাদূর ক্রম বিদ্যমান রহিয়াছে[৩৭]। বিশ্ব অসৎ হইয়াও সর্ব্বদা সৎস্বরূপে প্রতিভাত হইতেছে। ইহা ব্রহ্মসংসর্গী প্রতিভাস বশতঃ সদা প্রসন্ন ও অবস্তুত্বহেতু অসৎ। ফলতঃ সঙ্কল্পনগরের ন্যায়, মৃগতৃষ্ণিকা জলের ন্যায় ও দ্বিচন্দ্রভ্রমের ন্যায় এই প্রতিভাত সৃষ্টিতে সত্যতা নাই। যাবৎ জর্জ্জরলতারূপিণী অবিদ্যা বিচাররূপ হুতাশন কর্ত্তৃক সমূলে দগ্ধ না হয়, তাবৎ এই শাখাপ্রশাখাপ্রতা-নিত গহনবনরূপ নানাবিধ সুখদুঃখপরম্পরা প্রসব করিবেই করিবে[৩৮।৪১]।

একোনবিংশত্যধিক শততম সর্গ সমাপ্ত।

বিংশত্যধিক শততম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! আমি সুবর্ণাঙ্গুরীয়ের তুলনা দিয়া যাহার মিথ্যাত্ব বর্ণন করিলাম, সেই বিশ্বকারণ অবিদ্যার ক্ষয়োন্মুখত্ব (ক্ষয়োন্মুখত্ব=বিচারসম্পর্কে অদর্শন প্রাপ্ত হওয়া) ও মহত্ত্ব (অদ্ভুতত্ব) কিরূপ তাহাও বর্ণন করি, শ্রবণ কর ও বুঝিয়া দেখ[১]। পূর্ব্ববর্ণিত লবণ রাজা ক্ষণমধ্যে সেই প্রকার ভ্রম সন্দর্শন করিয়া তাহার পর দিবসেই সেই ভ্রান্তিদৃষ্ট মহাটবী গমনে প্রবৃত্তিমান্ হইলেন[২]। তিনি মনে করিলেন, কল্য আমি বিন্ধ্য পর্ব্বতে গিয়া যে মহারণ্যে বহুল দুঃখপরম্পরা অনুভব করিয়াছি, সেই মহারণ্য আমার চিত্তদর্পণে এখনও সংলগ্ন রহিয়াছে, এবং আমি তাহা এখনও অবিচ্ছেদে স্মরণ করিতেছি। অতএব অদ্যই আমি সেই বিন্ধ্যাটবী গমন করিব এবং দেখিব, যাহা দেখিয়াছি—তাহা ঠিক্ কি না[৩]।

মহীপতি লবণ মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া সেই দিবসেই দিগ্বিজয়ব্যাজে (ব্যাজ=ছল) সচিবগণের সহিত পুনর্ব্বার দাক্ষিণাত্য যাত্রা করিলেন। অনন্তর বিন্ধ্য মহীধর প্রাপ্ত হইয়া, কৌতুক বশতঃ, সূর্য্য যেমন নভোমার্গে পরিভ্রমণ করেন তাহার ন্যায় তিনি ক্রমে ক্রমে পূর্ব্ব, দক্ষিণ, ও পশ্চিম দিক্স্থিত সমুদ্রের তটভূমির ন্যায় বিন্ধ্যভূমিতে পরিভ্রমণ করিলেন[৪।৫]। ঐরূপ ভ্রমণ করিতে করিতে এক স্থানে গিয়া দেখিলেন, পুরোভাগে এক উগ্র মহারণ্য রহিয়াছে। চিন্তা মূর্ত্তিমতী হইয়া সম্মুখে উপস্থিত হইলে চিন্তকের মন যেরূপ হয় এবং পরলোক ভূমি দর্শন করিলে পরলোক দিদৃক্ষুর মন যেরূপ হয়, এই উগ্র মহারণ্য দর্শনে লবণ রাজার মন ঠিক্ সেইরূপ হইল[৭]। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, যেন এই অরণ্যই পূর্ব্বে তাঁহার দৃষ্টি গোচর হইয়াছে[৮]। অনন্তর তিনি কৌতুক সহকারে তথায় গমন করিলেন, এবং তত্রস্থ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গমন করতঃ পূর্ব্বানুভূত সমস্তই দর্শন করিলেন। তিনি যৎপরোনাস্তি বিস্ময়ে আবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসার দ্বারা পরিজ্ঞাত হইয়া

অধিকতর বিস্ময়ে আবিষ্ট হইলেন[৭]। সে স্থানে যে সকল মনুষ্যকে দেখিতে পাইলেন, তাহাদিগকে পূর্ব্বানুভূত ব্যাধ বা চণ্ডাল বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন। এই ব্যাপারে সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া কৌতুকের প্রেরণায় তিনি পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন[৮]। অনন্তর তিনি সেই ধূমধূসর মহাটবীতে, যেখানে তিনি বহুপুক্কশসম্পন্ন (পুক্কশ=চণ্ডাল) হইয়াছিলেন, সেই ক্ষুদ্র গ্রাম প্রাপ্ত হইয়া তথায় প্রাগনুভূত সেই সমস্ত চণ্ডালাদি জনগণ ও তাহাদের স্ত্রীগণ, এবং সেই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর, তথা সেই সকল ক্রীড়াস্থান, তথা সেই দুর্ভিক্ষ দ্বারা দুর্দ্দশাপ্রাপ্ত ও বাস পরিভ্রষ্ট সেই সমস্ত স্বজনগণ ও অনুচরবর্গ, তথা সেই সকল বৃক্ষ ও বন্ধুবিবর্জ্জিত ও চণ্ডালগণ দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন, কোন কোন ব্যক্তি দারুণ দুর্ভিক্ষের তাড়নায় পুত্রকলত্রাদিবিহীন হইয়াছে, কোন শিশু পিতৃমাতৃহীন হইয়াছে, কোন ব্যাধ অসহায় ও একল হইয়াছে, এমন কি, যাহা যাহা ভ্রমদৃষ্ট হইয়াছিল সে সমস্তই দেখিতে পাইলেন[৯।১১]। এক স্থানে দেখিলেন, কতকগুলি শোকাতুরা বৃদ্ধা স্ত্রী অজস্র অশ্রু বর্ষণ করতঃ রোদন করিতেছে। সেই সমস্ত বৃদ্ধাগণের মধ্যে একটী বাষ্পাকুলনয়না অবান্ধবা দীনা কৃশাঙ্গী শুষ্কস্তনী ছিন্নকন্থাবৃতা বৃদ্ধা স্ত্রী আর্ত্তনাদ সহকারে অন্য বৃদ্ধা দিগের নিকট বক্ষ্যমাণ প্রকারে অসংখ্য দুঃখপরম্পরা বর্ণন করিতেছে এবং অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন সহকারে রোদন করিতেছে[১২।১৩]।

বলিতেছে "হা পুত্রি! তোমার সুকুমার শিশু পুত্রগুলি তোমাকে আলিঙ্গন দ্বারা আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল। হায়! হায়! তোমরা চণ্ডাল-রাজের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তম হইয়াও ভীষণ দুর্ভিক্ষে দিনত্রয় অনাহারে ক্ষীণ প্রাণ ও জীর্ণদেহ হইয়াছিলে? তাদৃশ অবস্থায় তিনি তোমাদিগকে কি প্রকারে এবং কোথায় পরিত্যাগ করিলেন? অথবা তোমাদের প্রাণ সকল কোথায় কি প্রকারে তোমাদিগের অনাহারজীর্ণদেহ বিসর্জন করিল[১৪]। উঃ কি দুঃখ! তোমার যে সেই অমরহাসী (দেবতার ন্যায় হাস্যকারী) ভর্ত্তা সমুন্নত পর্ব্বতে অত্যুচ্চ তালবৃক্ষ হইতে রক্তবর্ণ সুপক্ক তালফল দন্তে ধারণ করতঃ অবরোহণ করিতেন তাহার সে গুণ আমার স্মৃতিপথে এখনও জাগরূক রহিয়াছে। হায়! আর কি আমার সেই পুত্রাপেক্ষা প্রিয়তম কদম্ব, জম্বীর, লবঙ্গ, তাল, তমাল ও গুঞ্জবননিহারী,

বয়স্রগণের ভয়জনক মদীয় জামাতা তরক্ষু বিনাশের নিমিত্ত আমার সম্মুখে লম্ফ প্রদান করতঃ বিচরণ করিবে১৫। আর কি আমি তাঁহার মাংস চর্ব্বণ-কালীন শৈবালনীলশ্মশ্রুশোভিত চিবুকের শোভা দেখিতে পাইব? হায়! মন্মথের বদনেও তাদৃশ সৌন্দর্য্য নাই১৬,১৭। হায়! কি হইল! আমার নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, সমীরণ যেমন তমাল-বল্লী উড়াইয়া লইয়া যায়, তাহার ন্যায় যম আমার সেই যমুনার ন্যায় শ্যামবর্ণা কন্যাকে তাহার ভর্ত্তার সহিত কোথায় লইয়া গিয়াছে১৮। হা গুঞ্জাফল-হারভূষিতে! এবং পত্রবস্ত্র-ধারিণি! হা প্রিয়পুত্রি! হা তালফলসদৃশ পয়োধর সুন্দর বক্ষদেশে! হা কজ্জল-লজ্জিতবর্ণে! হা পকজম্বুদন্তে? সুপুত্রি! তোমরা কোথায় রহিলে? হা রাজ-পুত্র! তুমি ত্বদীয় ইন্দুসমাননা বিলাসিনী কান্তা পরিত্যাগ পূর্ব্বক মদীয় কন্যাতেই রতিপ্রাপ্ত হইয়াছিলে, কিন্তু তোমার সে স্ত্রীও চিরস্থায়িনী হইল না, এ খেদ আমি কোথায় রাখিব১৯,২০। অহো দুঃখ! অহো আশ্চর্য্য! এই সংসাররূপ তরঙ্গিণীর ক্ষণভঙ্গুর ক্রিয়াবিলাস কি খেদজনক! তাহা কি না করিতে পারে? সমস্তই পারে। কারণ, সেই রাজপুত্র নৃপেশ হইয়াও চণ্ডাল-কন্যাতে যোজিত হইয়াছিলেন২১। ওঃ কি কষ্ট! মহামনোরথযুক্ত আশা যেমন অর্থের সহিত বিনাশ প্রাপ্ত হয়, বোধ হয় সেইরূপ, আজ আমার সারঙ্গত্রস্তনয়না সেই কন্যা এবং সেই ক্রুদ্ধশার্দ্দূলবিক্রম রাজা (যামাতা) উভয়ই যুগপৎ বিনষ্ট হইয়াছেন২২। সখীগণ! আজ আমি অনাথা, মৃতাত্মজা, দুর্দ্দে-শবাসিনী, মহাদুর্গতি প্রাপ্তা, দরিদ্রা ও মহাবিপদে নিপতিতা। আমি হীনজাতি সম্ভূতা হইয়াও উচ্চ হইয়াছিলাম, কিন্তু তাহা আমার সহিল না। হায়! এক্ষণে আমি মূর্ত্তিমতী ঘোর আপৎ ও ভয়স্বরূপ হইয়াছি। আমি অনাথা, বিধাতা অনাথা দেখিয়া আমাকে নীচবৃত্তি ক্রোধের, ক্ষুধাপ্রপন্ন পোষ্যবর্গের ও অনিবার্য্য শোকের নারীরূপ আগার নির্ম্মাণ করিয়াছেন২৩,২৪। হে সখিগণ! আমার ন্যায় দৈবোপতপ্ত বিবান্ধব মূঢ় ব্যক্তির এরূপ মনঃকষ্টে পৃথিবীতে জীবিত থাকা ও জীবিত থাকিয়া আপৎপরম্পরা ভোগকরা অপেক্ষা নির্জীব লোষ্ট্র পাষাণাদির ন্যায় জীবন-হীন হওয়া শ্রেয়স্কর২৫। যে ব্যক্তি স্বজনবিহীন ও কুদেশবাসী, তাহার অনন্তদুঃখপরম্পরা, বর্ষাকালে সহস্রসহস্র শাখাপ্রশাখান্বিত তৃণলতাদির ন্যায় দিন দিন উল্লসিত হইয়া থাকে২৬।

নরনাথ লবণ বিলাপকারিণী এই বৃদ্ধাকে অভিহিত প্রকারে রোদন

করিতে দেখিয়া দয়ার্দ্রচিত্ত হইলেন। (এই বৃদ্ধাই ইহার ভ্রমদৃষ্ট চণ্ডালী শাশুড়ী)। চণ্ডালিনীরা সম্ভাষ্যা (সাক্ষাৎ আলাপের যোগ্যা) নহে, সেজন্য, তিনি স্বীয় পরিচারিকাগণ দ্বারা তাহাকে আশ্বাসিত করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, বৃদ্ধে! তোমার কন্যা কে এবং পুত্রই বা কে?[২৭]। অনন্তর সেই বাষ্পবিলোচনা চণ্ডালিনী বলিল, এই গ্রামে পুক্কশঘোষ নামে এক চণ্ডাল বাস করিতেন। তিনি আমার পতি। তাঁহার ইন্দুসমাননা এক কন্যা হইয়াছিল। সেই কন্যা এই কানন-কোটরে পাদপসমাশ্রিত তুম্বীলতারন্যায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। অনন্তর সেই কন্যা দৈবযোগে এই স্থানে সমাগত ইন্দুতুল্য এক রাজাকে ভাগ্য বশতঃ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করতঃ বহুদিন তাঁহার সহিত সুখভোগ করিয়া এক কন্যা ও কতিপয় পুত্র প্রসব করিয়াছিল[২৮]। ৩০।

বিংশত্যধিক শততম সর্গ সমাপ্ত।

একবিংশত্যধিক শততম সর্গ

চণ্ডালী বলিল, হে জনেশ্বর! তৎপরে এক সময়ে এই ক্ষুদ্র গ্রামে ভীষণ জনবিনাশন অনাবৃষ্টি-দুঃখ উপস্থিত হইল[১]। সেই ভীষণ দুঃখে গ্রাম-বাসিগণ এই গ্রাম হইতে নির্গত হইয়া দূরে গমন করিয়াও অব্যাহতি পায় নাই, অনেকেই তদবস্থায় পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে[২]। হে প্রভো! সেই কারণে আমরা স্বজনশূন্য হইয়াছি এবং বন্ধুবিয়োগ দুঃখে সাতিশয় কাতর হইয়া অবিরত বাষ্পবারি বিসর্জ্জন করতঃ শোক করিতেছি[৩]।

রাজা চণ্ডালীর ঐ সকল কাতর বাক্য শ্রবণ করিয়া বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হইলেন এবং মন্ত্রিগণের বদনে দৃষ্টি রাখিয়া চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন[৪]। অপিচ, মনে মনে সেই অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় ভূয়ো ভূয়ো চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং তৃপ্ত না হওয়ায় পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন[৫]। পরে সেই রাজা নিতান্ত করুণাবিষ্ট হইয়া সমুচিত অর্থদান ও সম্মানবর্দ্ধনদ্বারা তাহাদিগের কথঞ্চিৎ শোকাপনোদন করিলেন এবং বহুক্ষণ তথায় অবস্থান পূর্ব্বক দৈবনিয়তির অদ্ভুত সামর্থ্যের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। অনন্তর পৌরগণকর্ত্তৃক বন্দিত হইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন[৬।৭]। তদনন্তর নৃপতি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া প্রাতঃকালে সভায় সমাগমনপূর্ব্বক আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মুনে! ঐ প্রকার স্বপ্ন (ভ্রান্তিদৃষ্ট) বিষয় কি প্রকারে আমার প্রত্যক্ষবৎ প্রতীত হইল?[৮]। তদনন্তর আমি রাজার ঐ প্রশ্নের যথাযথ সমাধান করিয়া বায়ু যেমন নভোমণ্ডলস্থ মেঘকে ছিন্ন ভিন্ন করে, তাহার ন্যায় আমি তাঁহার সেই সংশয় ছেদন করিলাম[৯]। হে রঘুনাথ! মহদ্‌ভ্রমদায়িনী অবিদ্যা ঐ প্রকারে সৎকে অসতে ও অসৎকে সতে আনয়ন করিয়া থাকে[১০]।

রামচন্দ্র বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! লবণ রাজার ঐ স্বপ্ন কিরূপে সত্য হইল তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন। আমার চিত্ত হইতে ঐ রহস্য বিগলিত হইতেছে না।[১১]। বশিষ্ঠ বলিলেন, মহাবাহো! অবিদ্যায় সমস্তই

সম্ভবে; অসম্ভব কিছুই নাই। তাহার উদাহরণ—অনেক সময়ে স্বপ্নে ও অন্যান্য ভ্রমদর্শন কালে ঘটও পটের আকারে প্রতীত হয়[১২]। এবং দূরও নিকট বলিয়া অনুভূত হয়। দর্পণের অভ্যন্তরে পাহাড় পর্ব্বত দৃষ্ট হয় তাহাও একপ্রকার ভ্রম। ভ্রমের প্রভাবে অতি সুদীর্ঘকালও সুখনিদ্রা প্রভাতা রাত্রির ন্যায় লঘু বলিয়া অনুভূত হয়[১৩]। যে কিছু অসম্ভব; সমস্তই স্বপ্নযোগে ও ভ্রান্তিকালে সম্ভব হয়। উদাহরণ—যৎপরোনাস্তি অসম্ভব আপনার মরণ দর্শন, তাহাও স্বপ্নে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। যাহা সম্পূর্ণরূপে অসত্য, তাহা ভ্রমকালে সত্যের ন্যায় উদিত হইয়া থাকে। তাহার দৃষ্টান্ত—স্বপ্নে আকাশভ্রমণ[১৪]। যে ব্যক্তি আপনি ঘুরে, সে মনে করে, পৃথিবী ঘুরিতেছে। মনঃ মদের দ্বারা বিক্ষুব্ধ হইলে অচল পদার্থও সচল বলিয়া প্রতীয়মান হয়[১৫]। অধিক কি বলিব, বাসনাবলিত চিত্ত যখন যাহা ভাবনা করে, তাহাই সমুদিত বা অনুভূত হইয়া থাকে। পরন্তু সে সমস্তই অসৎ অর্থাৎ অবিদ্যমান[১৬]। এই অহম্ভাবাদিময়ী অবিদ্যা (আমিত্ব বোধরূপ মিথ্যাজ্ঞান) আদ্যন্তমধ্যরহিত ও অনন্ত[১৭]। চিত্তের প্রতিভাসে পদার্থের পরিবর্ত্তন হয় এবং ক্ষণও কল্প এবং কল্পও ক্ষণ হয়[১৮]। মতি বিপর্য্যস্ত হইলে মেষও আপনাকে সিংহ মনে করে, আবার সিংহও আপনাকে মেষ মনে করে[১৯]। অহম্ভাব প্রভৃতি অবিদ্যারই বিকার এবং সে সকল চিত্তবৈপরীত্যেরই ফল[২০]। চিত্ত বাসনা অনুসারে কাকতালীয় ন্যায়ে সমুদিত হয় এবং ব্যবহারপরম্পরাও তদনুরূপ সত্যতায় অভ্যুদিত হয়[২১]। লবণ রাজা যে ক্ষণমধ্যে বিন্ধ্যপকণে (পকণ=চণ্ডালপুরী) চণ্ডালী বিবাহাদি অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা চিত্তেরই কোন এক প্রতিভাস। ঐ প্রতিভাসের মূল কারণ তাঁহারই পূর্ব্বমনোভাব, অর্থাৎ উহা লবণ রাজার মনে কোন এক সময়ে অধিরূঢ় হইয়াছিল। যে ক্রমে অনুভূত বিস্মরণ হওয়া যায়, সেই ক্রমেই পূর্ব্বানুভূত ঘটনাদি স্মৃতিপথে উদিত হয়[২২।২৩]। অতি প্রাকৃত (অনভিজ্ঞ বা নীচ) মনুষ্যেরাও স্বপ্নপ্রতিভাসের ব্যাপার অবগত আছে। ভোজনান্তে পুরুষ স্বপ্নে দেখে—অনাহারে জীবন যায় এবং অভুক্ত ব্যক্তিও স্বপ্ন দেখে—ভোজনে পরিতৃপ্ত আছি[২৪]। অতএব, বিন্ধ্যপকণের ঐ ব্যাপারকে তুমি স্বপ্নানুরূপ রীতির অনুরূপ বলিয়া অবধারণ করিবে। যেমন স্বপ্নে পূর্ব্বকথা, জন্মজন্মান্তরের কথা, প্রতিভাসিত হয়, সেইরূপ, লবণ রাজার চিত্তেও পূর্ব্বোক্ত চণ্ডালীবিবাহাদি

বিস্তীর্ণ ব্যাপার প্রতিভাসিত হইয়াছিল[২৫]। ঐ রহস্য এ ভাবেও বুঝিতে পার যে, বিন্ধ্যপকণবাসিদিগের চিত্তেও ঐরূপ সম্বিদ্‌ উদিত হইয়াছিল[২৬]। অথবা এরূপে বুঝিবে যে, লবণ রাজার চিত্তের প্রতিভাস বিন্ধ্যবাসী চণ্ডাল দিগের চিত্তে এবং বিন্ধ্যবাসী চণ্ডালদিগের চিত্তপ্রতিভাস লবণ রাজার চিত্তে সমারূঢ় হইয়াছিল[২৭]। একই সময়ে একই আকারের কল্পনা যে অনেকের চিত্তে উদিত হয় তাহার অনেক উদাহরণ আছে। যেমন ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন চিন্তাশীল কবির মানসী রচনা অবিকল একরূপ হইয়া থাকে। তথা ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি অবিকল এক-রূপ স্বপ্ন সন্দর্শন করিয়া থাকে[২৮]। ঐ সকল ব্যবহারিক অবস্থার সত্যতা বা অস্তিতা চিত্তপ্রতিভাসের অধীন। ফলতঃ সত্যতা বা অস্তিতা সংবেদন ব্যতীত অন্য কিছু নহে[২৯]। সম্বেদনসত্তা জলে বীচির ন্যায় ও বীজে তরুর ন্যায় সর্ব্বত্র অবস্থিত থাকিয়া ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান প্রপঞ্চের আকার ধারণ করে ও ভ্রান্তির দ্বারা পৃথকরূপে প্রতিভাত হয়[৩০]। সম্বেদনের সত্তা ব্যতীত, পদার্থনামধারীর যে সত্তা, সে সত্তা আছে বলিলেও হয়, নাই বলিলেও হয়। সম্বিত্তির উদয় হইলে তাহা আছে, তাহার অনুদয় কালে তাহা নাই[৩১]। যে অবিদ্যার বিভূতি বর্ণন করিয়াছি, সে অবিদ্যা কোন আধারে নাই। যেমন বালুকায় তৈল নাই, সেইরূপ, অবিদ্যাও কোন আধারে বাস্তবরূপে নাই[৩২]। সুবর্ণের বলয়, এ কথা বলিলে যেমন বুঝিতে হইবে যে, বলয় সুবর্ণই, সুবর্ণাতিরিক্ত নহে, তেমনি, অবিদ্যা শব্দের অর্থে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, তাহা আত্মাই, আত্মাতি-রিক্ত নহে। ভাবিয়া দেখ, অবিদ্যা পৃথক্‌ পদার্থ হইলে তাহার সহিত আত্মার সম্বন্ধ থাকা আবশ্যক হয় কি না। যদি বল, সম্বন্ধ আছে, বস্তুতঃ তাহা নাই। কেননা, সদৃশ সম্বন্ধিদ্বয় ব্যতীত সম্বন্ধকল্পনা দৃষ্ট হয় না। সদৃশ বস্তুর সম্বন্ধই স্বীয় অনুভবে সমারূঢ় হয়[৩৩]। যেমন জতু ও কাষ্ঠ, উভয়ই সমান সাকার বলিয়া পরস্পর সম্বন্ধ হইতে দেখা যায়। পরন্ত ঐ দুএর সংযোগরূপ সম্বন্ধ প্রস্তাবিত বিষয়ে উদাহরণের অযোগ্য; কেন না উক্ত উভয়ও অবিদ্যার বিকার[৩৪]। বিচারচক্ষে দেখিলে দেখা যায়, এ সমস্তই সৎ ও চিৎ। হেতু এই যে, প্রস্তরাদি পদার্থও চৈতন্যের সত্তায় সত্তান্বিত[৩৫]। যখন সমস্ত জগৎ সন্মাত্র ও চিন্ময়, তখন অবশ্যই ইহার অবস্থিতি স্বানুভবমূলক[৩৬]। এ সম্বন্ধে অন্য বিবেচ্য এই যে, বিসদৃশ

স্বভাব পদার্থদ্বয়ের ঐক্য বা কোন বাস্তব সম্বন্ধ সর্ব্বথা অসম্ভব, অথচ বিনা সম্বন্ধে পরম্পরানুভব সিদ্ধ হয় না[৩৭]। সে হেতুতেও স্থির হয়, সদৃশ বস্তুই সদৃশের সহিত মিলিয়া ক্ষণমধ্যে আপনার রূপ বিস্ফারিত করে[৩৮]। চিৎপদার্থ চেত্যে মিলিয়া চেতনাকারে উদিত হয়, তাই বলিয়া যে তদুভয়ের ঐক্য হয়, এরূপ বলা যায় না। কেন না, চিৎ ও জড় পরস্পর ভিন্নলক্ষণাক্রান্ত। জড়ের সহিত জড়ের মেলনে জড়েরই গাঢ়তা জন্মে, চেতনের স্ফুরণ বা অভিব্যক্তি হয় না[৩৯]। এক চিত্তে (ত্রিপুটীরূপ চিত্তে) চিজ্জড়ের মেলন (ঐক্য) সর্ব্বথা অসম্ভব। জড়ের চিন্ময় হওয়া বা চিৎসম্বন্ধে এক হওয়া উভয়ই অসম্ভব[৪০]। কেন না, ইহা কাষ্ঠ, তাহা প্রস্তর, এ সকল ভেদ চৈতন্যের দ্বারাই নিষ্পন্ন হয়, অন্য কিছুর দ্বারা নহে। সুতরাং বুঝা উচিত যে, চৈতন্যই সর্ব্বে সর্ব্বা। সর্ব্বত্রই দেখা যায়, পরিণামী পদার্থমাত্রই পদার্থান্তরের আকারে প্রকটিত হয়[৪১]। জিহ্বা জলীয় ইন্দ্রিয়, সেই কারণে তদ্দ্বারা জল বিকার রসের গ্রহণ হয়। অসমানের ঐক্য কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। যদি জড় ও চেতন ঐক্য বা এক হইয়া যাইত, তাহা হইলে আর প্রস্তর আদি জড় থাকিত না। এই সকল অনুশীলনে বুঝিতে হইবেক যে, চিৎই প্রস্তরাদিরূপিণী এবং সে সকল চৈতন্যেরই বিলাস[৪২।৪৩]। এ বিষয়ে পরমার্থ পক্ষ এই যে, চৈতন্যই নিজের অনতিপ্রকাশে (অজ্ঞানে) একলোল (লপেট্) হইয়া দ্রষ্টৃ দৃশ্যাদি ভ্রম জন্মায় সুতরাং কাষ্ঠলোষ্ট্রাদি সমস্তই পরমার্থতঃ চিন্ময়[৪৪]। চৈতন্যের সহিত চৈতন্যময় দৃশ্যের সম্বন্ধ কল্পিত এবং কল্পিত সম্বন্ধ অনুসারেই দৃশ্যতা ব্যবহার। কল্পনার প্রকার অনন্ত, সেজন্য দৃশ্যও অনন্ত[৪৫]। হে তত্ত্ববিদ্‌শ্রেষ্ঠ রাম! তুমি বিশ্বকে সৎ বলিয়া জানিবে, পদার্থান্তর বলিয়া অবধারণ করিবে না। যদি তুমি মিথ্যাপরিত্যাগনিষ্ঠ হও, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে—এই বিশ্বব্যবহার কেবল শত শত ও লক্ষ লক্ষ ভ্রমের সমষ্টি, অন্য কিছু নহে। যেমন মনোরাজ্যস্থ নরেরা পরস্পর নিষ্পন্দ, কেহ কাহার কিছু করে না, সেইরূপ, মিথ্যাজ্ঞান উপশান্ত হইলেও দেখা যায়, সমস্তই নিষ্পন্দ বা নিঃস্বভাব এবং সমুদায়েরই সার—কেবল চিৎ[৪৬।৪৭]। তত্ত্বজ্ঞদিগের সিদ্ধান্ত এই যে, বোধকালে কি সৃষ্টি, কি তদন্তর্গত দেশকালাদি, কিছুই নাই। কিন্তু ভেদবোধ অবস্থায় সৃষ্টি, সৃষ্টির অন্তর্গত দেশকালাদি ও অহং

মম্যাদি, সমস্তই আছে বলিয়া বিস্ফারিত হয়[৪৮]। যদি ইহা সুবর্ণ, এরূপ বোধ না থাকে, তাহা হইলে বলয়বিভ্রমও থাকে না। কেন না, সুবর্ণেই বলয়াদির ভ্রান্তি জন্মে। অতএব, সুবর্ণের জ্ঞানই সুবর্ণকে স্থানান্তরে বা প্রকারান্তরে সত্তাস্ফূর্ত্তি প্রদান করে[৪৯]। অমুক দ্রষ্টা, ইহা দর্শন (জ্ঞান), তাহা দৃশ্য, এ সকল যদি পরিত্যক্ত হয়; মনোবৃত্তি হইতে তিরোহিত হয়, তাহা হইলে তখন আর অবিদ্যারও পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে না। যেমন বলয়াদি-মহাভেদ-যুক্ত সুবর্ণ দৃক্-দর্শন-দৃশ্য পরিত্যাগে সুবর্ণমাত্রে অবশেষিত হয়, সেইরূপ[৫০]। এই সৃষ্টির মূল বা সার বোধ। তাহাই বিশ্বকে অসৎ ও অসৎ বিশ্বকে সৎ করিতে সমর্থ। তরঙ্গ যতই কেননা নানা ও ভীষণাকারধারী হউক, জল ছাড়া অন্য কিছু হয় না। শালভঞ্জিকা যত প্রকারই হউক, সে সমস্তই কাষ্ঠ। কুম্ভ কুণ্ড শরাব, সমস্তই মৃত্তিকা। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, এই জগৎত্রয় ব্রহ্ম[৫১।৫২]। হে রাঘব! সেই পরমাত্মা নামধেয় পরমপদকে নিম্নোক্ত উপদেশ শ্রবণে বুদ্ধিস্থ করিবে। যথা—দৃশ্যের সহিত দৃষ্টির (জ্ঞানবৃত্তির) সম্বন্ধ হইবার পূর্ব্বক্ষণে অর্থাৎ উক্ত উভয়ের অন্তরালে দ্রষ্টার যে দ্রষ্টৃ-দর্শন-দৃশ্য, এই ভেদত্রয় বর্জ্জিত স্বরূপ এবং যাহা ঐ ত্রিপুটীর (দৃক্, দর্শন ও দৃশ্যের) সাক্ষীস্থানীয়, তাহাকেই তুমি পরম পদ বলিয়া জানিবে। অথবা চিত্ত একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাইতেছে, এক বিষয় পরিত্যাগ করিয়া অন্য বিষয়ের আকারে আকারিত হইতেছে, তাহার অন্তরালে চিত্তের যে জাড্যবর্জ্জিত রূপ, তাহাকে তুমি পরম পদ বলিয়া অবধারণ করিবে। যাহা জড়সম্পর্করহিত সংবিৎ (নির্ম্মল চেতনা), তুমি সর্ব্বদা বা নিত্যকাল তাহাই[৫৩।৫৪]। জাগ্রৎ নহে, স্বপ্ন নহে, নিদ্রাও নহে, এরূপ অনির্ব্বাচ্য অবস্থায় তোমার যে সনাতন (নিত্য নিরাকার) রূপ, সর্ব্বদা তুমি, তাহাই[৫৫]। জড়াংশ ত্যাগ হইলে প্রস্তরের যে ক্ষোভ বিক্ষোভ বর্জ্জিত হৃদয় (আধারীভূত চৈতন্য) অবশিষ্ট থাকে, তুমি সর্ব্বদা তাহাই[৫৬]। চিত্তে কোনও বিষয়ের উদয় ও প্রলয় অনুভব করিও না, ক্ষোভ বিক্ষোভ রহিত হইয়া যথাসুখে অবস্থান করিও[৫৭]। দেহাবচ্ছিন্ন পুরুষ প্রকৃত পক্ষে কোন কিছুর বাঞ্ছা করেন না, বিদ্বেষ করেন না, ইহা জানিয়া তুমি স্বস্থ হও। কদাচ তুমি দেহব্যাপারে লিপ্ত বা ব্যাসক্ত হইও না[৫৮]। যেমন অনাগত ব্যবহার্য্য বিষয়ে চিত্তের কোন আসক্তি বা অনুসন্ধান থাকে না, বর্ত্তমানেও তুমি চিত্তকে সেইরূপ

অননুসন্ধানপর অর্থাৎ উদাসীন কর। কদাচ চিত্তবৃত্তিতে অবস্থান করিও না। ঐরূপ করিলে তুমি সত্যাত্মলাভ করিতে পারিবে[৫৯]। যেমন দূরদেশস্থ ও বিস্মৃত ব্যক্তি, থাকিলেও নাই, (জ্ঞানে না থাকায় নাই), এবং যেমন কাষ্ঠ, যেমন প্রস্তর, চিত্তকে তুমি তদ্রূপ করিবে—থাকিলেও নাথাকার ন্যায় করিয়া তুলিবে। ঐরূপ অচিত্ততা জ্ঞানীর অনুভবসিদ্ধ[৬০]। যেমন প্রস্তরে জল নাই, জলে অনল নাই, তেমনি পরমাত্মায় চিত্ত নাই[৬১]। প্রস্তরে জল ও জলে অনল অধ্যাস বশতঃ দৃষ্ট হয় বা অনুভূত হয়। যাহাকে দেখা যায় না, তৎকর্তৃক যাহা কৃত হয়, তাহা কিছুই নহে। এইরূপ বিবেচনা করতঃ তুমি চিত্ত অতিক্রম করিয়া অবস্থিতি করিবে[৬২]। যে অত্যন্ত অনাত্মচিত্তের অনুগামী হয়, সে প্রত্যন্তদেশবাসী ম্লেচ্ছদিগের সমান। তুমি ম্লেচ্ছদিগের ন্যায় চিত্তের অনুগামী হইও না। ? ৬৩। তুমি সর্ব্বদা নিকটস্থ চিত্তচণ্ডালকে তুচ্ছজ্ঞান (হেয়জ্ঞান) করিবে এবং সেই নিরাশঙ্ক পরম বস্তু অবলম্বন করিবে[৬৪]। আমার চিত্ত নাই, পূর্ব্বে ছিল না, পরেও থাকিবে না, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া তুমি শিলাপুরুষের ন্যায় (শিলাপুরুষ=প্রস্তরের মূর্ত্তি) নিশ্চলভাবে অবস্থিতি করিবে[৬৫]। বিচার দৃষ্টি বিস্তৃত করিলে চিত্তকে পাওয়া যায় না এবং পরমার্থতঃও তুমি চিত্তবিহীন। তবে কেন তুমি তাহার বশীভূত হইয়া কদর্য্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে?[৬৬]। যে ব্যক্তি চিত্তযক্ষের বশ্য হয়, সে দুর্ব্বুদ্ধির নিকট চন্দ্র হইতেও বজ্রের উৎপত্তি হয়[৬৭]। তুমি চিত্তকে দূরে পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুস্থির হও এবং যুক্তির দ্বারা ভবভাবনা হইতে মুক্ত হও, হইয়া পরম পদে অবস্থিতি কর[৬৮]। যাহারা সত্যভ্রমে অসচ্চিত্তের অনুগামী হয়, সেই সকল ব্যক্তিদিগকে ধিক্! তাহারা আকাশ ধ্বংস করিতে ইচ্ছুক হইয়া বৃথা কাল হরণ করে[৬৯]। তুমি গলিতমনা হইয়া ভবপারে গমন করতঃ অমলাত্মা হও। আমি দীর্ঘকাল বিচার করিয়া দেখিয়াছি, তথাপি সেই অমল পদে চিত্তরূপ মলের অল্পমাত্রও অবস্থিতি অথবা অন্য কোন মালিন্যের অবস্থান দেখিতে পাই নাই[৭০]।

একবিংশত্যধিক শততম সর্গ সমাপ্ত।

দ্বাবিংশত্যধিক শততম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, জন্মমাত্রেই পুরুষগণের বুদ্ধি বিকসিত হয় না। ক্রমে সৎসংসর্গদ্বারা তাহাদিগের বুদ্ধি বিকসিত হয়। সেজন্য প্রথমে সৎসঙ্গের অনুসরণ কর্ত্তব্য। অধ্যাত্মশাস্ত্র ও সৎসংসর্গ, এই দুই ভিন্ন, অন্য উপায়ে মহাপ্রবাহশালিনী অবিদ্যা নদী সমুত্তীর্ণ হওয়া যায় না।১।২। শাস্ত্রের ও সৎসঙ্গের প্রভাবে বিবেকবুদ্ধি জন্মে, তৎপরে সে হেয় ও উপাদেয় বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়। সেই সময়ে সে শুভেচ্ছানাম্নী বিবেকভূমিতে অর্থাৎ জ্ঞানভূমিকায় অবতীর্ণ হয়৩।৪। অনন্তর বিবেক ও বিচারদ্বারা সম্যক্ জ্ঞান লাভ করে, করিয়া বাসনাবিহীন হইতে থাকে। বাসনা পরিত্যাগ হইলেই মনঃ সংসারভাবনা হইতে ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়, তখন তাঁহারা তনুমানস-নাম্নী বিবেকভূমিতে অবতরণ করে৫।৬। যে সময়ে যোগিগণের সম্যক্ জ্ঞান-ভূমিকার উদয় হয়, সেই সময়ে তাঁহাদিগের সত্তাপত্তিনাম্নী উৎকৃষ্ট জ্ঞান-ভূমিকা সমুদিত হয় এবং তাহারই দ্বারা তাহাদিগের বাসনাক্ষয় হইতে থাকে। বাসনাক্ষয়ের পর যখন তাঁহারা অসংসক্তিনাম্নী বিবেকভূমিতে উপস্থিত হন, তখন আর তাঁহারা কর্ম্মফলদ্বারা আবদ্ধ হন না।৭।৮। ক্ষীণবাসন-যোগী তখন অসত্যবিষয়ের ভাবনা পরিত্যাগ অভ্যস্ত করিতে থাকেন। (অসত্য বিষয় অর্থাৎ বাহ্যবস্তু) ক্রমে ব্রহ্মাহং-ভাবনা পরিপুষ্ট ও বাহ্যার্থ বিস্মরণ হইতে থাকে৯। যতদিন না তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে বাহ্যার্থ বিস্মৃত না হন্ ততদিন বাহ্যার্থভাবনা পরিত্যাগ অভ্যস্ত করেন। যখন কিছু না করেন, অর্থাৎ সমাধিস্থ থাকেন, তখন বাহ্যার্থবিস্মৃতি হয় সত্য, পরন্তু যখন তাঁহারা ব্যুত্থিত থাকেন, স্নান ভোজনাদি করেন, তখনও তাঁহাদের মনো-বৃত্তিতে বাহ্যার্থের উদয় থাকে না। সেইজন্য তাঁহারা রুচিপূর্ব্বক কোন কিছু করেন না ও চিন্তা করেন না, এবং সর্ব্বদা সর্ব্ববিস্মৃতের ন্যায় থাকেন১০। যেমন মূক, যেমন মোহপ্রাপ্ত, যেমন শিশু, যেমন উন্মত্ত, যেমন সুপ্ত-প্রবুদ্ধ ব্যক্তি ব্যবহার নির্ব্বাহ করে, অর্থাৎ তাহারা যেমন স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কিছু করে না, পরেচ্ছাপ্রযুক্ত হইয়া অন্যমনস্কের ন্যায় কার্য্য করে, তদ্রূপ, তাঁহারা স্নান-ভোজনাদি কার্য্য করিয়া থাকেন১১। ঐরূপে তনুভাবিত-

মনস্ক অর্থাৎ ব্রহ্মৈকরসীকৃতচিত্ত যোগী পদার্থাভাবনী নাম্নী যোগভূমিতে আরোহণ করতঃ অন্তর্লীনচিত্তে কতিপয় বৎসর অতিবাহন করেন, করিয়া তুর্য্যাত্মা ও জীবন্মুক্ত হন[১২।১৩]। তখন তিনি প্রাপ্তিতে আনন্দিত ও অপ্রাপ্তিতে দুঃখিত হন না। যাহা পাইয়াছেন, বিগতাশঙ্ক হইয়া তাহারই অনুগামী থাকেন[১৪]। হে রাঘব! তুমিও জ্ঞাতব্য বিজ্ঞাত হইয়াছ। যাহা নিখিল বিশ্বের অন্তঃসার, তাহা জানিয়াছ। তোমার বাসনাও ক্ষীণ হইয়াছে[১৫]। শরীরস্থ থাক বা শরীরাতীত হও (ব্যুত্থিত বা সমাধিস্থ হও) কদাপি হর্ষশোকের বশ্য নহ। তুমি অনাময় পরমাত্মা[১৬]। রাম! তুমি স্বচ্ছ স্বপ্রকাশ নিত্যোদিত পরমাত্মা, তোমাতে আবার দুঃখ সুখ কি? জন্মমরণই বা কি?[১৭]। তুমি অবন্ধু। তোমার আবার বন্ধু-দুঃখে কাতরতা কি? অদ্বিতীয় আত্মার আবার বান্ধব কে?[১৮]। দেহ কেবল কতকগুলি ভৌতিক পরমাণুর সমষ্টি, তাহা দেশে দেশে ও কালে কালে অন্যথা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু আত্মার উদয় ও অস্ত দুএর কিছুই হয় না[১৯]। তুমি যখন অবিনাশী, তখন তুমি কেন বিনশ্বর দেহের নিমিত্ত বৃথা শোক করিবে? অমরস্বভাব নির্ম্মল পরমাত্মার আবার বিনাশ কি?[২০]। ঘট ভগ্ন হয়, তদুপহিত আকাশ ভগ্ন বা বিনষ্ট হয় না। সেইরূপ এই শরীর বিনষ্ট হয়, আত্মা বিনষ্ট হন না[২১]। মৃগতৃষ্ণকাই বিনষ্ট হয়, আতপ বিনষ্ট হয় না। সেইরূপ দেহই নষ্ট হয়, আত্মা নষ্ট হন না[২২]। কেনই বা তোমার অনর্থ বাঞ্ছা সমুদিত হইবে? যখন দ্বিতীয় নাই, তখন আবার কে কি বাঞ্ছা করিবে?[২৩]। রাম! দৃশ্য, স্পৃশ্য, শ্রব্য, আঘ্রেয়, কিছুই নাই। যাহার উল্লেখ করিবে তাহাই আত্মা[২৪]। যেমন আকাশে শূন্যতার অবস্থিতি, তেমনি এ সমস্তই অখিলশক্তি পরমাত্মায় অবস্থিত[২৫]। হে রাঘব! এই লোকত্রয় চিত্ত হইতে উৎপন্ন ও জীবসকল সাত্ত্বিক রাজসিক তামসিক জন্মে মিথ্যা জন্মবান্[২৬]। যখন বাসনাক্ষয়নামক মনঃপ্রশমন সিদ্ধ হইবে, তখন কর্ম্মক্ষয়নামিকা মায়া থাকিবেক না, তিরোহিত হইবেক[২৭]। অতএব, হে রাঘব! তুমি যত্ন সহকারে এই সংসাররূপ পেষণ যন্ত্রে সমারূঢ় ও যন্ত্রবাহিনী রজ্জুরূপা বাসনাকে অবিলম্বে ছেদন কর[২৮]। এই মহাবাসনা যাবৎ অপরিজ্ঞাত থাকিবে, তাবৎ উহা মহামোহ উৎপন্ন করিবেই করিবে। কিন্তু পরিজ্ঞাত হইলে তখন আবার ঐ বাসনাই অনন্তসুখদা ও ব্রহ্মপদদায়িনী হইবে[২৯]। বাসনা ব্রহ্ম হইতেই আইসে

সত্য, পরন্তু উহা সংসারভোগ অন্তে ব্রহ্মকে স্মরণ করতঃ ব্রহ্মে বিলীন হয়[৩০]। হে রামচন্দ্র! যেমন তেজঃ (পরমাত্মজ্যোতিঃ) হইতে প্রকাশের আবির্ভাব, তেমনি, রূপবিহীন অপ্রমেয় নিরাময় শিব হইতে এই সমুদায় ভূত আবির্ভূত হইয়াছে। যেমন পত্রে রেখা (শিরা প্রশিরা), জলে বীচিমালা, সুবর্ণে বলয়াদি, অনলে উষ্ণতা, তাহার ন্যায় এই ভুবনত্রয় সেই বাসনাবচ্ছিন্ন ব্রহ্মে জাত হইয়াছে ও তদভেদে স্থিত আছে[৩১।৩৩]। তিনিই সর্ব্বভূতের আত্মা এবং ব্রহ্মনামের নামী। তাঁহাকে জানিলেই সমস্ত জানা হয়[৩৪]। শাস্ত্রীয় ব্যবহার নির্ব্বাহার্থ তাঁহার ব্রহ্ম, আত্মা, চিৎ, ইত্যাদি নাম কল্পিত হইয়াছে[৩৫]। দৈবাৎ প্রিয়াপ্রিয় বিষয়ের সংযোগ (ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংযোগ হওয়ায় তাঁহাতে হর্ষামর্ষাদির আরোপ) হইলেও বিচার দৃষ্টির দ্বারা সে সকলের অভাব নির্দ্ধারিত হওয়ায় তিনি হর্ষামর্ষাদিবর্জ্জিত অনুভূতি স্বরূপ[৩৬]। আকাশাপেক্ষা সমধিক শুদ্ধ স্বচ্ছ চিদাত্মায় এই জগৎ পদার্থান্তরের ন্যায় ভিন্নাকারে প্রতিবিম্বিত হইতেছে সত্য; পরন্তু মিথ্যা। জগৎ তাঁহাতে নাই। জগৎ আপনারই অন্তরে[৩৭]। এই যে জগদ্বুদ্ধি, ইহা তাঁহার অব্যতিরিক্ত। যেমন দর্পণপ্রতিবিম্বিত নদ নদী বন পর্ব্বতাদি দর্পণের অব্যতিরিক্ত, তেমনি, চিদাত্মায় প্রতিবিম্বিত জগৎ চিদাত্মার অব্যতিরিক্ত[৩৮]।

রাম! তুমি অদেহ ও চিদাকৃতি, সুতরাং কেন তোমার লজ্জা ভয় বিষাদাদি হইতে মোহ হইবে?[৩৯]। কি নিমিত্ত তুমি অদেহ হইয়াও মূর্খের ন্যায় দেহজাত অসৎ লজ্জাভয়াদির দ্বারা অভিভূত হইতেছ?[৪০]। দেহের খণ্ডনে (বিনাশে) অখণ্ডৈকরস চৈতন্যস্বভাব তোমার কি ক্ষতি হইবে? যাহারা অজ্ঞান, তাহাদিগেরই আত্মনাশভ্রান্তি জন্মে। পরন্তু যাহারা জ্ঞানী, তাহাদের ঐ ভ্রম থাকে না[৪১]। চিত্তের গত্যাগতি অব্যাহত। তাদৃশ অব্যাহতগতি চিত্তই পুরুষ, শরীর পুরুষ নহে[৪২]। রাম! শরীর থাকুক বা না থাকুক, এবং পুরুষ জ্ঞ বা অজ্ঞ হউক, দেহনাশের সহিত তাহার নাশ কদাপি ও কুত্রাপি হয় না[৪৩]। তুমি যে এই বিচিত্র দুঃখপরম্পরা দর্শন করিতেছ, এ সমস্তই দেহের, চিদাত্মার নহে[৪৪]। চিদাত্মা মনঃপথের অতীত সুতরাং শূন্যের ন্যায় নির্লেপে অবস্থিত। সুখ দুঃখ কি প্রকারে তাঁহাকে গ্রহণ করিবে?[৪৫]। যদ্রূপ ভ্রমর পঙ্কজ হইতে আকাশে গমন করে, তদ্রূপ, জীবেরাও দেহবিনাশে আপনার আস্পদ পরমাত্মায় গমন করিয়া থাকে[৪৬]। হে রামচন্দ্র! যদি তুমি এমন মনে কর, আত্মতত্ত্বও অসত্য, তাহা হই-

লেও শোক করিতে পার না। কেন না, দেহ নষ্ট হইলে কি নষ্ট হইবে? ৪৭। রাম! সেই হেতু বলিতেছি, তুমি সত্যকেই ব্রহ্মভাবনা কর, আর মোহ অনুভব করিও না। নিরিচ্ছ নিষ্পাপ পরমাত্মার ইচ্ছা নাই, ইহা অবধারণ কর৪৮। এই জগৎ সেই সাক্ষীভূত নিরীচ্ছ ও স্বচ্ছ পরমাত্মায় মুকুরে বন পর্ব্বতাদির ন্যায় প্রতিবিম্বিত হইতেছে৪৯। মণিরত্নরশ্মির ন্যায় এই জগজ্জাল সেই সাক্ষীভূত চিদাত্মায় স্বয়ং প্রতিফলিত হইতেছে৫০। দর্পণ ও প্রতিবিম্ব উভয়ের অনিচ্ছা থাকিলেও যেমন পরস্পর ভেদাভেদ সম্বন্ধ থাকে, তেমনি, আত্মা ও জগৎ উভয়ের অনিচ্ছা সত্ত্বেও উক্তরূপে ভেদাভেদ ব্যবস্থিত রহিয়াছে৫১। জগৎ (জগৎস্থ প্রাণী) যেমন সূর্য্যসন্নিধান মাত্রে ক্রিয়াশীল হয়, সেইরূপ, চিৎসত্তামাত্রে এই জগৎক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়৫২। রামচন্দ্র! এই অবস্থিত জগৎকে যদি মূর্ত্তজ্ঞান বহির্ভূত করিতে পার, তাহা হইলেও ইহা আকাশের ন্যায় সুসম্পন্নস্বভাব হইবে ৫৩। যেমন দীপ থাকিলেই তাহা আলোকপ্রদ হয়, তেমনি, চিৎসত্ত্বের স্বভাবেই জগৎস্থিতি চিৎস্বভাবভুক্ত হয়৫৪। হে রাঘব! প্রথমে পরমাত্মতত্ত্ব হইতে মনঃ (হিরণ্যগর্ভ) সমুদিত হয়। পরে সেই মনঃ কর্ত্তৃক স্ববিকল্পজালদ্বারা সেই পরমাত্মতত্ত্বে এই জগৎজাল বিস্তৃত হয়। তদনন্তর, যেমন আকাশে নীল প্রভা উল্লসিত হয়, তেমনি, সেই ব্যোমরূপী মনঃকর্ত্তৃক এই শূন্যাকার জগৎ উল্লসিত হইতে থাকে। কিন্তু সঙ্কল্পক্ষয়ে চিত্ত বিগলিত হইলে তখন আর সংসারমোহমিহিকা থাকে না, বিগলিত হইয়া যায়। তখন শারদীয় নভোমণ্ডলের ন্যায় একমাত্র আদ্যন্তমধ্যরহিত চিন্মাত্র অজ পরমাত্মাই দীপ্তি পাইতে থাকেন। সারসঙ্কলন এই যে, পূর্ব্বে কর্ম্মাত্মক মনঃ অভ্যুদিত হয়, তদনন্তর সেই মনঃ সঙ্কল্পদ্বারা কমলজ ব্রহ্মার প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া বালক যেমন বেতালদেহ কল্পনা করে, তদ্রূপ, কল্পনাদ্বারা নানাবিধ জগৎ পরম্পরা বৃথা বিস্তার করে। অসৎ মনঃ, স্বয়ং চিত্তভাগ কর্ত্তৃক জগৎস্বরূপে প্রস্ফুরিত হইয়া পুরোভাগে লক্ষিত হয়। এইরূপে এই মনঃ স্বয়ংই সেই পরমাত্মমহার্ণবে বীচিমালার ন্যায় পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন ও বিলীন হয়৫৫।৫৮।

দ্বাবিংশত্যধিক শততম সর্গ সমাপ্ত।

উৎপত্তিপ্রকরণ সম্পূর্ণ।